পাকা বাড়ী চিরস্থায়ী ও সুদৃঢ় করতে

বিসরা চূণই

যোগ্য উপাদান

ইমারতের কাজে 'বিসরা চূণ' চিরদিন
অপরাজেয় অপ্রতীদ্বন্দ্বী

আপনার কাজে আপনিও বিসরা চূণই চাইবেন

বার্ড এণ্ড কোং

চার্টার্ড ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্,

টেলিফোন : কলিকাতা ৬০৪০

●

—কলিকাতার সোল এজেন্টস্—

এস, ডি, হ্যারি এণ্ড কোং

২০০ আপার চিৎপুর রোড, বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন : বড়বাজার ১৮২৩

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

- প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে 'পরিচয়' প্রকাশিত হবে।
- প্রতি সংখ্যার দাম আট আনা ; বার্ষিক চাঁদা সডাক ছয় টাকা, যাণ্মাসিক তিন টাকা। যে কোন মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায়।
- দশ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য প্রতি কপি হিসাবে আট আনা জমা অবশ্য দেয়। এজেন্টদের ২৫৲ হারে কমিশন দেওয়া হয়। অবিক্রীত কাগজ ফেরত নেওয়া হয় না।
- 'পরিচয়' সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠিপত্র এবং টাকা পয়সা 'পরিচয়', ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ব্যক্তিগত নামে চিঠি না লেখা বাঞ্ছনীয়।
- বিজ্ঞাপনের হার চিঠি লিখলেই জানান হয়।

পরিচয় : মাসিক পত্র   রেজিস্টার্ড নং : সি ২৩৬০

সম্পাদক
সুশীল জানা
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

● প্রতি সংখ্যার দাম আট আনা ; বার্ষিক চাঁদা সডাক ছয় টাকা ; ষাণ্মাসিক তিন টাকা। যে কোন মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায়।

● যাবতীয় চিঠিপত্র এবং টাকা পয়সা 'পরিচয়', ... চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ এই ঠিকানায় পাঠাতে ...

বিংশ বর্ষ : প্রথম খণ্ড : তৃতীয় সংখ্যা

আশ্বিন ১৩৫৭

সম্পাদক

সুশীল জানা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় কার্যালয় : ৮, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কার্তিক :: ১৩৫৭

সম্পাদক

সুশীল জানা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

অগ্রহায়ণ : : ১৩৫৭

সম্পাদক

সুশীল জানা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রেস, ১৭।১, সিমলা স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ১৮, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত।

পৌষ : : ১৩৫৭

সম্পাদক

সুশীল জানা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রেস, ৭৭।১, সিমলা স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ১৬, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত।

পাঠকদের প্রতি নিবেদন

বাঙলা সাহিত্যের আজ বিশেষ দুর্দিন। তবু 'পরিচয়'-এর পক্ষ থেকে যদি কিছু বলতে হয়, তাহলে বলতে হবে—বাঙালী পাঠকের যেমন দায়িত্ববোধ ও মর্যাদাবোধ আছে এমন বুঝি আর কারও নেই। 'পরিচয়' নিয়মিত প্রকাশ করবার প্রতিশ্রুতি ও প্রয়াস বারে বারে ভঙ্গ হয়েছে। তথাপি মাসের পর মাস 'পরিচয়' পাঠকদের অকুণ্ঠিত সাহায্য লাভ করেছে। সেজন্য তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। এই পাঠক-সম্প্রদায়ের সাহসেই 'পরিচয়' পরিচালনায় আমরা কৃতসংকল্প। শুধু তাই নয়—আমরা জানি, আজ বিজ্ঞাপন সুলভ হবে না; ব্যয় অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু ব্যয়ভার বহন করেও 'পরিচয়' চালাতে হলে পাঠক-সমাজের কাছেই আমাদের অবস্থা নিবেদন করতে হবে। তাই আমরা পরিচয়ের পাঠক ও গ্রাহকদের নিকট সেই আস্থা নিয়ে নিবেদন করছি, আপনারা (১) 'পরিচয়-এর অগ্রিম গ্রাহক আজই হোন—বার্ষিক চাঁদা পাঠান; (২) চাঁদা ছাড়াও, অন্যরূপে অর্থ সাহায্য করুন, বন্ধু-বান্ধব ও সংস্কৃতি-সেবীদের নিকট হতে তা সংগ্রহ করুন। (৩) 'পাঠকগোষ্ঠীর আলোচনায় আপনারা যোগদান করুন। 'পরিচয়' আপনাদের নিজেদের কাগজ।

নিয়মাবলী

প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে "পরিচয়" প্রকাশিত হয়।

প্রতি সংখ্যার দাম আট আনা; চাঁদার হার (সডাক) বার্ষিক ছ' টাকা ও ষান্মাসিক তিন টাকা। যে কোন মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায়।

দশ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্সি নিতে হলে প্রতি কপির জন্য আট আনা আমানত জমা (Deposit) অবশ্য দিতে হবে এবং প্রতি সংখ্যার বিলের টাকা বিলপ্রাপ্তির পনর দিনের মধ্যে পরিশোধ না করলে পরবর্তী সংখ্যা পাঠান হবে না। এজেন্টদের শতকরা ২৫্ টাকা হারে কমিশন দেওয়া হয়। অবিক্রীত কাগজ ফেরত নেওয়া হয় না।

অমনোনীত রচনা ফেরত পেতে হলে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার চিঠি লিখলেই জানানো হয়।

"পরিচয়" সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠিপত্র এবং টাকা পয়সা "পরিচয়" কার্যালয়, ১৬, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ব্যক্তিগত নামে চিঠি দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

শ্রাবণ : ১৩৫৭

পার্টি সাহিত্য ও পার্টি সংগঠন

ভি, আই, লেনিন

অক্টোবর বিপ্লবের পর (লেনিন এখানে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসের ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করছেন) রাশিয়ায় সোশ্যাল ডেমক্রেটিক কাজের নতুন পরিস্থিতি (১) পার্টি-সাহিত্যের প্রশ্নকে একটি প্রধান প্রশ্ন করে তুলেছে। সামন্ত-তান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাশিয়ার শোচনীয় উত্তরাধিকার হিসেবে আইনসঙ্গত ও বেআইনী কাগজের মধ্যে যে তফাৎ ছিল তা মুছে যাচ্ছে। এই পার্থক্য অবশ্য সম্পূর্ণভাবে মুছে যাওয়া দূরে থাক, আমাদের প্রধান মন্ত্রীর (২) হঠকারী সরকার এখনো এমন অসাধ্যস্ত যে "সোভিয়েট কর্মী সমাচার" (৩) বে-আইনীভাবে প্রকাশ করতে হচ্ছে। তবু, যার গতিরোধ করা এই সরকারের শক্তির অতীত তাকে "নিষিদ্ধ" করার হাস্যকর চেষ্টার ফল শুধু এই যে, সরকারের মুখে আরো চুনকালি পড়ছে, নৈতিক দিক থেকে তারা নিজেদের আরও অসমর্থনীয় করে তুলছে।

আইনসঙ্গত এবং বে-আইনী কাগজের মধ্যে তফাৎ যতদিন ছিল ততদিন পার্টির কাগজ এবং পার্টির বাইরের কাগজের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা হত এক অতি সহজ উপায়ে—যদিও তা ছিল সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও বিকৃত উপায়। বে-আইনী প্রেসের পুরোটুকুই ছিল পার্টি প্রেস, কাগজগুলি প্রকাশ করত এমন সমস্ত সংগঠন এবং তার পরিচালনা করত এমন কয়েকটি দল যা ছিল পার্টি-কর্মীদের বিভিন্ন দলের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে সংযুক্ত। আইনসঙ্গত প্রেসের পুরোটুকুই ছিল পার্টির বাইরের প্রেস কেননা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ তখন নিষিদ্ধ; অবশ্য তা কোনো না কোনো পার্টি-"ঘেঁসা"

(১) ১৯০৫-এর ১৩ই নভেম্বর Novaya Zhizn (নতুন জীবন) পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

(২) এস্ ওয়াইট্

(৩) পিটার্সবুর্গ শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েটের মুখপত্র। এটি ১৩ই অক্টোবর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বে-আইনীভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

হতই। তাই তখন সন্দেহজনক যোগসাজস, অস্বাভাবিক "সঙ্ঘ," কৃত্রিম যুক্তফ্রন্ট প্রভৃতি অনিবার্য ছিল। একদিকে যাঁরা পার্টির মত ব্যক্ত করতে উদগ্রীব তাঁদের অবরদস্তিমূলক কণ্ঠরোধ, আর তার পাশাপাশি ছিল যাঁরা এসব মতাদর্শের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং যাঁরা পার্টির কর্মী নন তাঁদের মতাদর্শগত অপরিণতি ও ভীরুতা।

ছেলেভোলান হিতোপদেশ আর সাহিত্যিক দাসত্ব আর আনুগত্য-মূলক বক্তৃতা আর মতবাদের গোলামি—চুলোয় যাক এ সবের স্মৃত্য দিন। এই বীভৎসতা রাশিয়ার যা কিছু তাজা আর যা কিছু সুস্থ তাকেই ক্ষুণ্ণ করছিল—শ্রমিক শ্রেণী-এই বীভৎসতাকে খতম করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণী রাশিয়ার মাত্র অর্ধেক স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

বিপ্লব এখনো শেষ হয় নি। যদিও জারতন্ত্র ইতিমধ্যেই বিপ্লবকে পরাস্ত করার শক্তি হারিয়েছে তবুও বিপ্লব এখনো জারতন্ত্রকে ধ্বংস করতে পারেনি। আর আমরা এখন এমন একটা সময়ে বাস করছি যখন চারিদিকে সবকিছুর মধ্যেই ফুটে উঠছে প্রকাশ্য, স্পষ্ট, সোজাসুজি, সর্বাঙ্গীন পার্টি-গত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অপ্রকাশ্য, ছদ্মবেশী, "কূটনৈতিক", বিবেকের দোহাই পাড়া "আইনসঙ্গত" দৃষ্টিভঙ্গির অস্বাভাবিক যোগাযোগ। এই অস্বাভাবিক মিশ্র দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দৈনিক পত্রিকাগুলির মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়।

সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক স্বৈরাচারের ফলে কী ভাবে নরমপন্থী লিবারাল বুর্জোয়া কাগজও নিস্তব্ধ—এ কথা বলে মিঃ চাকৃনভ (৪) যতই চতুর বাক্‌বিস্তার করুন না কেন, আসল সত্য হল এই যে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির প্রধান মুখপত্র "সর্বহারা" পুলিস-শাসিত স্বৈরাচারী রাশিয়ায় নিষিদ্ধ হয়েই রয়েছে।

সে যাই হোক, বিপ্লবের প্রথম স্তরের দাবি হল আমাদের সবাইকে এখুনি নতুন করে এ-ব্যাপারে সংগঠন গড়ে তুলতে মন দিতে হবে। সাহিত্য, এমন কি আইনসঙ্গতভাবেও, এখন দশ ভাগের মধ্যে ন ভাগ পার্টি-সাহিত্য হতে পারে। পার্টি সাহিত্য হতেই হবে তাকে। বুর্জোয়া সংবাদপত্রের পাল্টা, বুর্জোয়া সাহিত্যের ভাগ্যান্বেষী সুবিধাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, বনেদী নৈরাজ্যবাদ, মুনাফার লোভ, এ সবের পাল্টা—সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মজুর শ্রেণীর পক্ষে পার্টি

(৪) এ, আই, চাকৃনভ (১৮৬২-১৯৩৬)। বাণিজ্যিক ও শিল্পপতি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি। তৃতীয় ডুমার প্রেসিডেন্ট। ১৯১৭-র অস্থায়ী সরকারের অনৈক মন্ত্রী। ১৯১৯এ শরণার্থি হিসেবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ত্যাগ করেন।

সাহিত্যের আদর্শকে তুলে ধরতে হবে এবং এই আদর্শকে যতটা পরিপূর্ণভাবে, যতটা সমগ্রভাবে চরিতার্থ করা সম্ভব সেই চেষ্টাই করতে হবে।

তাহলে পার্টি-সাহিত্যের মূলসূত্র কি? সোস্যালিস্ট সর্বহারা সাহিত্য যে কোনো ব্যক্তি-বিশেষের বা দলবিশেষের ঐশ্বর্য-অন্বেষী হতে পারে না শুধু তাই নয়, সমগ্র সর্বহারা শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র কোনো ব্যক্তিবিশেষের ব্যাপারই এ হতে পারে না। বে-পার্টি লেখক বরবাদ! সাহিত্যে অতি-মানববাদ বরবাদ! সর্বহারা শ্রেণীর যে সামগ্রিক স্বার্থ তারই অংশবিশেষ হোক সাহিত্য। যে মহান এক এবং অবিচ্ছেদ্য সোস্যাল ডেমোক্রেটিক যন্ত্রবিশেষকে চালনা করছে সামগ্রিক শ্রমিক শ্রেণীর সমগ্র সচেতন অগ্রগামী বাহিনী সেই যন্ত্রের ছোট্ট একটি চাকা বা ছোট্ট একটি স্ক্রুতে পরিণত হোক সাহিত্য। সোস্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির সংগঠিত, পরিকল্পিত ও ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠুক সাহিত্য!

জার্মান এক প্রবাদে বলে : তুলনামাত্রই অথর্ব। সাহিত্যকে একটা স্ক্রুর সঙ্গে, জীবন্ত আন্দোলনকে যন্ত্রের সঙ্গে যে তুলনা আমি করলুম সে তুলনাও অথর্ব। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী হয়ত এই জাতীয় তুলনার প্রতিবাদে হাউমাউ করে চিৎকার করবেন, বলবেন এ হল একেবারে অধঃপতনের কথা, প্রাণশক্তিকে শুষে নেবার কথা. বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামের স্বাধীনতা, সমালোচনার স্বাধীনতা, সাহিত্য সৃষ্টির স্বাধীনতাকে "আমলা-তান্ত্রিক" পদ্ধতিতে নিশমার করবার কথা। আসলে এই রকম হাউমাউ করাটা হল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহই নেই যে, যান্ত্রিকভাবে সমতা বজায় রাখার সাহিত্যে, সবচেয়ে কম সব কিছুকে দিয়ে সমান করার, সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগুরুর প্রতিপত্তি স্থাপন করার চেষ্টার স্থান। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সাহিত্যে ব্যক্তিগত উদ্যম এবং বিশিষ্ট রুচির ব্যাপারে, চিন্তা এবং কল্পনাশক্তির ব্যাপারে, বক্তব্য এবং প্রকাশভঙ্গির ব্যাপারে লাগাম সবচেয়ে ঢিলে করতে হবে। এসব কথায় কোনো তর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু এথেকে শুধু এই কথাই প্রমাণিত হয় যে শ্রমিক পার্টির অন্যান্য কাজের সঙ্গে সাহিত্য-সম্পর্কিত কাজকে মামুলি কায়দায় এক করে দেখা চলে না। বুর্জোয়া শ্রেণী এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাছে তা যতই নতুন বা আজগুবি ব্যাপার বলে মনে হোক না কেন—সাহিত্য যে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির কর্মপদ্ধতির একটি অনিবার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে

বাধ্য এবং তা হওয়া যে একান্তই আবশ্যক—এই মূলনীতির সঙ্গে উপরোক্ত ওই কথাগুলির কোনো বিরোধই নেই। পত্রিকাগুলি বিভিন্ন পার্টি-সংগঠনের মুখপত্র হতে বাধ্য। লেখকদেরও অবশ্যই বিভিন্ন পার্টি সংগঠনে যোগ দিতে হবে। প্রকাশক প্রতিষ্ঠান, গুদাম, বইয়ের দোকান, পাঠাগার, লাইব্রেরি এবং পুস্তক সংক্রান্ত সব রকম বিভাগ পার্টি-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং পার্টির আয়ত্তে থাকবে। সংগঠিত সোশ্যালিষ্ট শ্রমিক শ্রেণীকে এই সমস্ত কাজের উপর নজর রাখতে হবে, পুরোপুরি এইসব কাজ তদারক করতে হবে, শ্রমিক শ্রেণীর প্রাণবান আদর্শের মহৎ প্রেরণায় এই কাজকে জীবন্ত করে তুলতে হবে, আর প্রায় অব্লমোভীয, প্রায় ভাড়াটিয়া যে পুরনো রুশ-নীতি,—"লেখকরা হিজিবিজি কাটে, পাঠকরা তাই ছেঁকে মাখন তোলে—" সেই নীতি এই ভাবেই খণ্ডন করতে হবে।

ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক এবং এশিয়াসুলভ সামন্ততান্ত্রিক বিধি-নিষেধের আগে কলুষিত সাহিত্যের এই রূপান্তর যে রাতারাতি ঘটানো সম্ভব হবে এমন দাবি আমরা নিশ্চয়ই করি না। কোনো সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা নিয়ে ওকালতি করা একবারে আমাদের উদ্দেশ্য নয়, গোটাকতক বাঁধা উপদেশ দিয়ে সমস্যাটির সমাধানও আমাদের মতলব নয়। না: এ ক্ষেত্রে বাঁধাধরা ছকের প্রশ্নই ওঠে না। আসল দরকার হল, আমাদের গোটা পার্টিকে, রাশিয়ার সমস্ত সচেতন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক শ্রমিককে এই নতুন দায়িত্বের কথা মনে রাখতে হবে, স্পষ্টভাবে একে বুঝতে হবে এবং সর্বত্র ও সর্বদা একে পরিপূর্ণভাবে পালন করার চেষ্টা করতে হবে। সামন্ততান্ত্রিক নিষেধাবিধির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে আমরা বুর্জোয়া ব্যবসাদারী সাহিত্যিক সম্পর্ককে স্বীকার করতে রাজি নই; স্বীকার আমরা করব না। আমরা চাই স্বাধীন সংবাদপত্রের সৃষ্টি করতে, স্বাধীন সাংবাদিকতার সৃষ্টি আমরা করবই,—শুধু পুলিসী হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তি এই অর্থে স্বাধীন নয়, পুঁজির শাসনের হাত থেকেও মুক্তি, ভাগ্যান্বেষী সুবিধাবাদের হাত থেকেও মুক্তি আর বিশেষ করে বুর্জোয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বাদের অরাজকতার হাত থেকে মুক্তি।

এই শেষের কথাগুলো পাঠকদের কাছে উলটোপালটা কথার বা রসিকতার মত ঠেকতে পারে। উচ্ছ্বাসপ্রবণ স্বাধীনতা-প্রেমিক কোনো বুদ্ধিজীবী হয়ত আতকে উঠবেন,—সাহিত্যসৃষ্টির মতো সূক্ষ্ম ও ব্যক্তিগত একটি বিষয়কে সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় পরিণত করতে চাও? ক্যাঁ?—শ্রমিকদের ভোটের সাহায্যে বিজ্ঞান,

দর্শন, নন্দনতত্ত্বের সমস্তার সমাধান করতে চাও ? মনের সবচেয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সৃষ্টিপ্রচেষ্টার স্বাধীনতাকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে চাও ?

শান্ত হোন, মশাইরা, শান্ত হোন। প্রথমত আমরা পার্টি সাহিত্যের কথা বলছি, আর বলছি এই সাহিত্য কিভাবে পার্টির আয়ত্তে থাকবে সেই কথা। যার যা মন চায় সে তাই মুখে বলুক বা লিখুক না, এতটুকুও বাঁধাবাঁধির দরকার নেই। কিন্তু পার্টির নামে এর কোনো সভ্য যদি পার্টি-বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করে তাহলে তাকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেবার স্বাধীনতাটুকুও থাকবে প্রত্যেকটি স্বাধীন সংগঠনের (তাই পার্টিরও)। কথা বলার আর লেখার পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চয়ই চাই। কি সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনেরও পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা চাই। বক্তৃতার স্বাধীনতার নামে আপনাদের চিৎকার করবার, মিছে কথা বলবার বা যা-খুশি লেখবার পুরো অধিকার মেনে নিতে আমি বাধ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে সংগঠনের স্বাধীনতার নামে যারা একরকম কথা বলে তাদের সঙ্গে আমাদের সংঘবদ্ধ হবার অধিকার এবং যারা অন্যরকম কথা বলে তাদের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারও আপনারা মেনে নিতে বাধ্য। স্বেচ্ছাঐক্যের ভিত্তিতেই পার্টির প্রতিষ্ঠা; তাই যে সভ্যরা পার্টি-বিরুদ্ধ মতামত প্রচার করেন তাঁদের সংসর্গ থেকে মুক্ত না হলে পার্টি প্রথমে মতাদর্শের দিক থেকে আর তারপর সাংগঠনিক ভাবে ভেঙে যাবে যে! ঠিক কোন কথাটা পার্টির কর্মসূচির সঙ্গে খাপ খায় আর কোন কথা খাপ খায় না, এই দুয়ের মধ্যে সীমারেখা টানবার জন্তে পার্টির কর্মকৌশলগত সিদ্ধান্তগুলি তো আমাদের কাছে রয়েছেই। শৃঙ্খলারক্ষার জন্তে আমাদের আছে পার্টির নিয়মাবলী আর আছে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের,-শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাধীন সংঘ-সংগঠনগুলির সমগ্র অভিজ্ঞতা। এই সংগঠনগুলির মধ্যে ক্রমাগতই নানান ধরনের লোক প্রবেশ করছে, নানান ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিচ্ছে এবং এই সবের মধ্যে যে পুরোপুরিই মিল রয়েছে তা নয়, এদের সবাই যে পুরোপুরি মার্কসপন্থী বা পুরোপুরি নির্ভুল তাও নয়; কিন্তু এই সংগঠনগুলি ক্রমাগতই পার্টির মধ্যেকার অবাঞ্ছিত লোকদের পার্টি-সভ্যপদ থেকে খারিজও করছে। বুর্জোয়াপন্থী "স্বাধীন সমালোচনা"বাদের প্রচারকমশাই! আমাদের দেশাতেও, আমাদের পার্টির মধ্যেও, সেই একই রকম ব্যাপার হবে। পার্টি আমাদের এক লাফে বিশাল একটি গণ-পার্টি হতে চলেছে, প্রকাণ্ড গণসংগঠন গড়ে তোলার দিকে আমরা কড়া নজর রাখতে চলেছি, আর নানান রকম লোক যাদের সবাইকার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে (মার্কসীয় বিচারে)

আনুপূর্বিক সঙ্গতি নেই—হয়ত তাদের মধ্যে খ্রীষ্টান থাকবে, হয়ত এমন কি মিস্টিকও থাকবে—অনিবার্যভাবে তারা আমাদের দলভুক্ত হতে চলেছে। কিন্তু আমরা পেটরোগা নই ; আমরা হলুম কঠিন, পাথরের মত মজবুত মার্কসবাদী। এই সব পরস্পর বিরোধী মতাবলম্বীদের আমরা ঠিক হজম করে ফেলব। পার্টির মধ্যে চিন্তার আর সমালোচনার স্বাধীনতা আছে, এই অজুহাতে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না যে পার্টি নামের স্বেচ্ছাধীন সংগঠন গড়ে তোলবার অধিকারও জনগণের আছে।

বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর দল! দ্বিতীয়ত আপনাদের জানানো দরকার যে আপনাদের মুখে পূর্ণ স্বাধীনতার সমস্ত কথাই হল লোকঠকানে কথা। কেননা টাকার শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজে, যে সমাজে মেহনতকারী জনগণ বাঁচে ভিখিরীর মত আর মুষ্টিমেয় ধনীলোক যাপন করে পরোপজীবীর জীবন, সে সমাজে বাস্তবিকপক্ষে খাঁটি "স্বাধীনতা" বলে কিছু থাকতে পারে না। লেখক! আপনি কি আপনার বুর্জোয়া প্রকাশকের কবল থেকে মুক্ত? কিংবা আপনি কি মুক্ত আপনার বুর্জোয়া দর্শক ও শ্রোতাদের রুচির হাত থেকে, যা দাবি জানায় অশ্লীল দৃশ্য আর নাটকের কাঠামো তৈরি করবার, আপনার "পবিত্র" নাট্য-সাহিত্যকে যা পূর্ণাঙ্গ করতে হুকুম করে সাহিত্যিক বেশ্যাবৃত্তি করতে আপনাকে বাধ্য করে? এই "পূর্ণ স্বাধীনতা" একটা বুর্জোয়া বা নৈরাজ্যবাদী বাঁধাবুলি ছাড়া কিছুই নয় (কারণ, মতাদর্শের দিক থেকে নৈরাজ্যবাদী একজন ভোল পাল্টানো বুর্জোয়া মাত্র)। সমাজে বাস করে সমাজ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়। বুর্জোয়া লেখক, শিল্পী বা অভিনেত্রীর স্বাধীনতা আত্মপ্রবঞ্চনা (বা ভাঁওতা দিয়ে লোক ঠকানো) ছাড়া আর কিছুই নয়, আসলে এরা সবাই টাকার থলি, ঘুষ বা মুরুব্বির মুখাপেক্ষীই।

আর আমরা, সমাজতন্ত্রবাদীরা, এই ভাঁওতাবাজির স্বরূপ ফাঁস করে দিই, টেনে ছিঁড়ে ফেলি এই মিথ্যের কুয়াশা—শ্রেণীহীন শিল্প আর সাহিত্য গড়ে তোলার জন্যে নয় (কেননা তা শুধু সমাজতান্ত্রিক শ্রেণীহীন সমাজেই সম্ভব), আমরা চাই এমন এক সাহিত্যের বিরুদ্ধে যুঝতে মুখে স্বাধীনতার ভান করলেও আসলে যা বুর্জোয়ারই দলীয় এবং আমরা গড়ে তুলতে চাই এমন সাহিত্য যা প্রকাশ্যভাবেই সর্বহারার পক্ষভুক্ত এবং বাস্তবিকই স্বাধীন।

এই সাহিত্য সত্যিই স্বাধীন সাহিত্য হবে কেননা ব্যক্তিগত ভাগ্যান্বেষণ এবং টাকার টানকে অগ্রাহ্য করে এই সাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং শ্রমিকদের

প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি অসংখ্য সংস্কৃতিকর্মীকে ক্রমাগত আকর্ষণ করবে এর ছত্রচ্ছায়ায়। এই সাহিত্য প্রকৃতই স্বাধীন হবে কেননা এ যুগোদয় নায়িকার বা ওজনে তারি, সদাই-ক্লান্ত "সমাজের উপরতলার হাজার দশেক"-এর মনোরঞ্জন না করে লক্ষ কোটি শ্রমিকের সেবা করবে, যে শ্রমিকরাই আমাদের দেশের সেবক, দেশের শক্তি, দেশের ভবিষ্যৎ। এই স্বাধীন সাহিত্য মানবজাতির বিপ্লবী চিন্তাধারার সর্বশেষ অবদানের সঙ্গে সোশ্যালিষ্ট শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা ও প্রাণময় কীর্তিকে সংযুক্ত করবে, সৃষ্টি করবে অতীতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে (আদিম কল্পনাবিলাসী সমাজতন্ত্রবাদের চূড়ান্ত পরিণতি যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ, তার সঙ্গে) বর্তমানের অভিজ্ঞতার (শ্রমিক কমরেডদের বাস্তব সংগ্রামের) স্থায়ী যোগাযোগ।

কাজেই কমরেডস্, আমাদের সামনে যে-দায়িত্ব সে-দায়িত্ব কঠিন ও অভূতপূর্ব তবুও মহান আর গৌরবময়। সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে গভীর ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা বিরাট, বহুমুখী এক রকমারি সাহিত্য রচনা করতে হবে আমাদের। সমগ্র সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক সাহিত্যকে পার্টি-সাহিত্য করে তুলতে হবে। প্রত্যেকটি খবরের কাগজ, পত্রিকা, প্রকাশক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে এখুনি নিজেদের পুনর্গঠিত করে, কোনো না কোনো পার্টি-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনো না কোনো দিক থেকে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্যোগ করতে হবে। শুধু তাহলেই "সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক" সাহিত্য বাস্তব হয়ে উঠবে, শুধু তাহলেই সে পারবে তার কর্তব্য যথাযথ পালন করতে, শুধু তা হলেই বুর্জোয়া সমাজের কাঠামোর মধ্যে থেকেও বুর্জোয়ার কাছে তার দাসখত লিখে দেওয়ার দিন শেষ হবে এবং তার মিলন হবে এমন এক শ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে যে শ্রেণী শেষ পর্যন্ত খাঁটি প্রগতিপন্থী আর খাঁটি বিপ্লবী।

অনুবাদ : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

"সমকালীন সাহিত্য"এর নেতা বিশুদ্ধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী লেখক জনাব আবু সয়ীদ আইয়ুব "সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য" (পরিচয় : পৌষ, ১৩৫৩) প্রবন্ধে লেনিনের যে উক্তিগুলি উদ্ধৃত করে "আশঙ্কার কারণ" সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকদের সচেতন করবার চেষ্টা করেছিলেন সেই উদ্ধৃতিগুলি অনূদিত প্রবন্ধেরই অন্তর্গত। এবং আশ্চর্যের বিষয় শ্রীযুক্ত আইয়ুব যে সব "আশঙ্কা" প্রকাশ করেছিলেন, স্বয়ং লেনিন পূর্বপক্ষ হিসেবে সেই আশঙ্কাগুলির কথা উল্লেখ করতে ভোলেন নি। এবং অবশ্যই তিনি এই সব "আশঙ্কাগুলির" স্পষ্ট জবাব নিজেই দিয়েছিলেন। বিশেষ করে এই দিক থেকে পরিচয়ে লেনিনের পুরো প্রবন্ধটির অনুবাদ প্রকাশ করা অনেকদিন আগেই উচিত ছিল, তাঁর লেখার খাপছাড়া উদ্ধৃতিটুকুর বদলে পরিচয়-পাঠকবর্গের কাছে পুরো রচনাটি এতদিন পরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হল।

অবশ্যই, স্বয়ং লেনিনের সাহিত্য সম্বন্ধে স্পষ্ট মন্তব্য বলেই লেখাটির তর্জমা করবার সবচেয়ে বড় তাগিদ তো রয়েছেই। তা ছাড়াও বিশেষ করে আজকের দিনের নতুন পরিস্থিতি আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন তুলেছে তার মধ্যে অনেক প্রশ্নের জবাব এই এই প্রবন্ধে পাবার আশা রয়েছে।—অনুবাদক

কোরিয়া

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোড়ার কথা

কোরিয়া দেশটা উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৬০০ মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৫০ মাইল প্রস্থ। উত্তরে মাঞ্চুরিয়া, পশ্চিমে পীত সমুদ্র, দক্ষিণ ও পূর্বে জাপান সমুদ্র; জাপান সমুদ্রের উত্তরে রুশিয়ার ভ্লাডিভোস্টক বন্দর। কোরিয়ার সমুদ্রকূলবর্তী এলাকায় ছোট ছোট হাজার খানেক দ্বীপও আছে, সেগুলো কোরিয়ারই অন্তর্ভুক্ত।

দেশটায় পাহাড় এবং জঙ্গল অনেক। ছোট ছোট নদীও অনেকগুলো একটা রেললাইন এবং বড় রাস্তা অনেকগুলো আছে। কিন্তু নদী এবং পাহাড়ের প্রাচুর্যের ফলে পুল এবং টানেল অনেক।

লোকসংখ্যা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ছিল ২ কোটি ১০ লক্ষের মতন। ১৯৪৫ সালে লোকসংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই কোটি। জাতি হিসাবে মোঙ্গল-তাতার জাতির সংমিশ্রণ। কথ্য ভাষার মধ্যে জাপানের একটু ছোঁয়াচও আছে। লিখিত ভাষার মধ্যে দেশীয়ের সঙ্গে চীনা ভাষা ও বর্ণমালার সংমিশ্রণ প্রচুর। শতকরা ৯৬জন লোক কোরিয়। জাতীয় প্রকৃতি তেজস্বী এবং জাতীয় কৃষ্টি উন্নত ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ।

কোরিয়ার ইতিহাস তিন হাজার বছরের পুরানো। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত কোরিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছে। তারপর থেকে জাপান কোরিয়ায় বাণিজ্যবিস্তার এবং হামলা করতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে জাপান কোরিয়া আক্রমণ করে এবং সে আক্রমণে দেশটা বিধ্বস্ত হয়। তার পরিসমাপ্তি ঘটে কোরিয়ার ওপর চীনের প্রভুত্ববিস্তারে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে জাপান কোরিয়ায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা আদায় করে। তারপর ১৯০৪-৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান জয়ী হওয়ার পর কোরিয়া প্রকৃতপক্ষে জাপানের প্রোটেক্টরেটে পরিণত হয়, এবং শেষ পর্যন্ত ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়াকে সম্পূর্ণভাবে কুক্ষিগত করে।

দেশটার প্রধান ফসল চাল। তাছাড়া যব, গম, তুলো, ফলের চাষ, মাছের ব্যবসায়, পশুপালন লোকের উপজীবিকা। অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে লোহা, কয়লা এবং সোণার খনি প্রধান।

জাপ-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন শোষণব্যবস্থা কঠোরতর হতে থাকে এবং কোরিয়ার জাতীয় কৃষ্টির ওপরও দমননীতি চলতে থাকে,—অফিস আদালত স্কুলে জাপানী ভাষার প্রতিষ্ঠা যার মূল সূত্র,—তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়ার যুবক ও ছাত্রদলের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক আন্দোলনও গড়ে ওঠে।

পৃথিবীর ইতিহাসে পরাধীন জাতির স্বাধীনতার সংগ্রামের যত কিছু বিড়ম্বনার বিবরণ পাওয়া যায়, জাপানীদের হাতে কোরিয় বিপ্লবীদের নির্যাতনের বর্বরতার কাছে সেগুলো ম্লান হয় যায়। বিপ্লবী কোরিয় নারী-দের বিনাবিচারে জেলে পুরে উলঙ্গ করে বেত মারা হত।

১৯১১ সালে চীন বিপ্লবের সাফল্যে কোরিয়দের যেটুকু আশাভরসা হয়েছিল, ১৯১৫-১৬ সালে প্রেসিডেন্ট ইউয়ান শিকাইয়ের মৃত্যুর পর সেনাপতি উ পে ফু পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করার পর সে আশাভরসা নির্মূল হয়েছিল।

পক্ষান্তরে প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়াতেই জাপান প্রশান্ত মহাসাগরস্থ জার্মানি অধিকৃত দ্বীপগুলো দখল করে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং প্রাচ্যের বাজার দখল করার সুযোগ পেয়ে শিল্পবাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি করে। সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়ার শোষণ আরো নির্মম হয়ে ওঠে। কোরিয়ার উত্তরে তখন স্বেচ্ছাচারী সমর-নায়ক চ্যাং সো লিন মাঞ্চুরিয়ার একচ্ছত্র ভাগ্যবিধাতা।

মাঞ্চুরিয়ার বিপ্লবী কৃষক,—যাদের পাশ্চাত্যের মহাপ্রভুরা "দস্যু" আখ্যায় ভূষিত করতেন,—তাদের সঙ্গে স্বভাবতই কোরিয় বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল।

১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর সারা পৃথিবীর জনগণের মধ্যে-যে বৈপ্লবিক উত্তেজনা উদ্বুদ্ধ হয়, তার সঙ্গে চীন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়ার শোষিত জনগণও বৈপ্লবিক প্রেরণায় নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। ১৯২৫ সালে কোরিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়। কোরিয়ার ওপর জাপানী নির্যাতনের বহরও বেড়ে চলে।

১৯১৪ সালে এই কোরিয়া থেকেই জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। জাপানেও কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল এবং জাপানী কমিউনিষ্টদের কমিউনিষ্ট বলেই কোতল করার দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং কোরিয় কমিউনিষ্টদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

জাপানী শাসনে কোরিয় কৃষকের অবস্থা অবর্ণনীয়। শতকরা ৭৫ জন লোক কৃষির ওপর নির্ভর করে, অথচ অর্দ্ধেক কৃষকের কোন জমি নেই। প্রধান ফসল চাল, অথচ সেই চাল জাপানীরা বিদেশে চালান দেয়। জমির খাজনার সাধারণ হার ফসলের অর্দ্ধেক।

জাপানী শাসকদের তাঁবেদার দেশী জমিদারশ্রেণী। দেশের চাষযোগ্য জমির শতকরা ৫৮ ভাগের মালিক শতকরা ৩ জন জমিদার জোতদার, যাদের অধিকাংশই জাপানী। দেশী জমিদার মহাজনরা ছিল জনগণের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক শত্রু।

কোরিয়াকে ঘাঁটি করে জাপান মাঞ্চুরিয়া ও চীনের সঙ্গে সোভিয়েটকেও আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল। কাজেই তারা কোরিয়ায় শিল্প প্রতিষ্ঠায় মন দিলে এবং শিল্প-সংগঠনের কাজ চলল কিছুটা দ্রুতই। কিন্তু সমস্ত শিল্পের চাবিকাঠি থাকল জাপানীদের হাতেই। ব্যাঙ্ক, বৈদ্যুতিক শক্তির কারখানা, খনি, এসব থাকল জাপানীদের একচেটিয়া। দেশী ধনিকরা থাকল জাপানী শিল্পপুঁজিপতিদের লেজুড়মাত্র হয়ে।

শিল্প-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারা মজুরশ্রেণীও গড়ে উঠল। কৃষক-শ্রমিকদের সংগঠনও ব্যাপক হয়ে উঠল। কৃষক-মজুরদের সংঘ হল বে-আইনী। তারা গুপ্তভাবেই সংগঠন ও কাজ করে চলল।

১৯৪৫ সালে কৃষক-সংঘের সভ্যসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ। ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য এক লক্ষ। ছাত্র-সংঘের সভ্য বিশ হাজার, নারী-সংঘের সভ্য সংখ্যা দশ হাজার। ইঞ্জিনিয়ারিং সংঘের সভ্য দু'হাজার। সবচেয়ে শক্তিশালী দুটি দল হচ্ছে কমিউনিষ্ট পার্টি এবং পিপলস পার্টি। ১৯৪৫ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার।

কমিউনিষ্ট পার্টি এবং পিপলস পার্টি মিলে কিম সু টিউং এবং কিম ইল সিউং নামক দুজন কোরিয় সেনাপতির পরিচালনাধীনে এক বৈপ্লবিক কোরিয় বাহিনী গঠন করেছিল। উত্তর চীন এবং মাঞ্চুরিয়ার সৈন্যদলের মধ্যে তাদের লোক

ছিল অনেক। এই বৈপ্লবিক সৈন্যদলের সৈন্য সংখ্যা ছিল মোট একলাখ। তখন সমগ্র কোরিয়া ছিল অখণ্ড। ৩৮ অক্ষরেখার নামগন্ধও ছিল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে জাপানীরা যখন মার খেতে খেতে কোণঠাসা হয়েছে এবং লালফৌজ মাঞ্চুরিয়াতে প্রলয়ঝড়ের মতন ঝাঁপিয়ে পড়েছে,—কোরিয় জনগণ তখন কমিউনিষ্ট পার্টি এবং পিপলস্ পার্টির সম্মিলিত নেতৃত্বে জাপানী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং অনেক স্থানে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এক মাসের মধ্যে সমগ্র কোরিয়ায় ১৪৫টা সহরে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত পিপলস্ কমিটি গঠিত হয়। সে আগষ্ট মাসের কথা।

লালফৌজ কোরিয়ার সীমান্তে প্রবেশ করার এবং আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করার আগে,—অর্থাৎ জাপানের আত্মসমর্পণের আগেই,—৬ই সেপ্টেম্বর ঐ সব পিপলস্ কমিটির ৬০০ প্রতিনিধি নিয়ে একটা জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন বসে। ঐ সম্মেলনে এক কেন্দ্রীয় পিপলস্ কমিটি নির্বাচিত হয় এবং এক অস্থায়ী পিপলস্ রিপাবলিক ঘোষিত হয়। এখানে মনে রাখা দরকার, এই সব ব্যবস্থা হয়েছিল অখণ্ড কোরিয়ায়। ৩৮ অক্ষরেখা তখনও জন্মায়নি।

শাসনবিধি প্রণয়নের জন্যে এক কমিটিও গঠিত হয়। একটা প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক কার্যসূচিও ঘোষিত হয়। তার প্রধান কথা ছিল জাপানী ও তাদের তাঁবেদার জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে জমিহীন কৃষকদের মধ্যে সে জমি বিলি করা; খনি, কলকারখানা প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা; নরনারীর সর্ববিষয়ে এবং সর্বতোভাবে সমান অধিকার; শ্রমিকদের আট ঘণ্টার "রোজ;" সর্বনিম্ন মজুরীর হার নির্ণয়; সুদখোরী এবং মুনাফাখোরীর বিরুদ্ধে আইন করা প্রভৃতি।

এইসব কাণ্ডের পর উত্তরে লালফৌজ এবং দক্ষিণে আমেরিকা প্রবেশ করল। জাপানীরা আত্মসমর্পণ করেছে, সুতরাং দুই মিত্রশক্তির সামরিক সামরিক শাসন চলবে, যতদিন না কোরিয়দের একটা স্বাধীন সরকার সংগঠিত হয়। দুই মিত্রশক্তি মিলে জাপানীদের হাত থেকে কোরিয়াকে মুক্ত করে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে নিজেদের সৈন্য সরিয়ে নিয়ে চলে যাবে,—এই হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মিত্রশক্তির শিবিরের বহুবিঘোষিত আদর্শ।

কিন্তু দুই মিত্র শক্তির অস্থায়ী সামরিক শাসন সম্মিলিতভাবে সমগ্র কোরিয়ার জন্যে না হয়ে ৩৮ অক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে দুই মিত্র শক্তির এলাকা ভাগ করা হল।

৩৮ অক্ষরেখায় যুগ

জাপানী আমলে সমগ্র কোরিয়া ছিল উপরতলা ও নিচের তলায় বিভক্ত। উপরে বিদেশী সরকার ও তাদের তাঁবেদার দেশী ধনিক জমিদার শ্রেণী আর নিচে জনসাধারণ,—এই দুইয়ের মধ্যে চলেছিল নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম।

কায়রোতে মিত্রশক্তির সম্মেলনেই এই ৩৮ অক্ষরেখা বরাবর দুই মিত্রশক্তি এলাকা ভাগের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। উত্তরে লালফৌজ প্রবেশ করেই জনগণের গঠিত অস্থায়ী রিপাবলিককে অস্থায়ী সরকার বলে মেনে নিলে এবং নিজেরা সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে তাদের হাতেই দেশের শাসনভার ছেড়ে দিয়ে তাদের ঘোষিত নীতি কার্যকরী করার জন্যে তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে লাগল।

জাপানী জমিদারদের জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হল, জাপানী তাঁবেদার দেশী জমিদাররা দক্ষিণ কোরিয়ায় পালিয়ে গেল, সুতরাং তাদের জমিও বিলি হল, খাজনা এবং ঋণ উড়ে গেল; দেশী জমিদার যারা থাকল, তাদের জমি এবং খাজনা কমিয়ে দেওয়া হল,—জাপানী এবং পলাতক ধনিকদের কলকারখানাগুলোও বাজেয়াপ্ত হল এবং শ্রমিকদের কমিটির হাতে সেগুলো পরিচালনার ভার দেওয়া হল।

এবং তারপর অবশ্য সোভিয়েট-আদর্শে যা হয়ে থাকে,—যা রুশিয়ায় হয়েছে পূর্ব ইউরোপে হয়েছে, চীনে হচ্ছে, সেইরকম কাণ্ড উত্তর কোরিয়ায়ও চললো। প্রগতিশীল স্বাধীন গণসংঘের বিরাট কর্মোন্মাদনা দেশটার সর্বাঙ্গীন পুনর্গঠন, সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তার, বৈজ্ঞানিক কৃষি সমবায়, আধুনিক শিল্পব্যবস্থা ও দেশরক্ষাব্যবস্থার সমস্ত তোড়জোড়ের মধ্যে সর্বত্রই জনগণের কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্বের ফলে উত্তর কোরিয়া এই ক'বছরে যে একটা আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে গত একমাসের যুদ্ধে।

পক্ষান্তরে আমেরিকান জেনারেল হজ দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করে সিউলের জাপানী গভর্নরের হাতেই শাসনভার ন্যস্ত করলেন এবং পিপলস্ কমিটি ভেঙে দিলেন। ফলে সারা দেশে এমন প্রতিবাদের ঝড় উঠল যে জাপানীটাকে গদীচ্যুত করতে অবশেষে তিনি বাধ্য হলেন। কিন্তু পিপলস্ কমিটির ওপর আরো খাপ্পা হলেন এবং নতুন সরকার গঠন করলেন নিজেরই নেতৃত্বে এবং উপদেষ্টা কমিটি গঠন করলেন জমিদার এবং শিল্পপতিদের প্রতিনিধি

এবং এক তথাকথিত ডেমক্রেটিক পার্টির প্রতিনিধি নিয়ে। এই ডেমক্রেটিক পার্টির নেতা কিম সং সু ১৯৪৩ সালেও কোরিয় জনগণের কাছে আবেদন করেছিলেন জাপানের সম্রাট এবং বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার জাপানী নববিধানের জন্তে প্রাণ দিতে।

সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল হজ দক্ষিণ কোরিয়ায় এক তবিয়ত তাঁবেদার কোরিয় সরকার গঠনের তোড়জোড় করতে লাগলেন। এবং তার জন্তে চুংকিং থেকে চিয়াং কাইশেকের সমর্থনে গঠিত "অস্থায়ী কোরিয় সরকারের" নেতা কিম কু এবং তার আমেরিকাস্থিত প্রতিনিধি সিংমান রীকেও নিয়ে এলেন। এই দুই নেতা আমেরিকার শিল্পপতিদের সঙ্গে জড়িত এবং কোরিয়ার বিপ্লবী জনগণ এদের ঘৃণা করে। এরা অবশ্য চিয়াং এবং বাও দাইয়ের মতই "জাতীয়তাবাদী." এবং তাদের মতই গণবিপ্লবের শত্রু।

এরা এসেই কোরিয়ার ধনিক জমিদারদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমেরিকার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার দিকে মনোযোগ দিলে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা দাঁড়াল, দক্ষিণ কোরিয়ায় জাপানীদের স্থলে আমেরিকার প্রতিষ্ঠা।

জাপানে যেমন ম্যাকআর্থারের নেতৃত্বে আবার ফ্যাসিষ্ট শাসনই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জাপানী শিল্পপতিদের সংঘ জাইবাৎসু ভেঙে দিয়ে তাদের শক্তি খর্ব করার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে আমেরিকার শিল্পপতিদের সঙ্গে তাদের মিলিয়ে দিয়ে জাপানী শিল্পে আমেরিকান পুঁজি খাটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায়ও ঠিক তেমনি জেনারেল হজের নেতৃত্বে জাপানী কোম্পানি ওরিয়েণ্টাল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনের ৩০০ কোটি টাকার কারবার আমেরিকান কোম্পানী নিউ কোরিয়ান কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হল।

যাই হোক, এরপর জেনারেল হজ তিনটে জেলায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন। দেখা গেল, লোকে পিপলস্ রিপাবলিকের প্রতিনিধিদেরই ভোট দেয়। কাজেই নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়া হল। এর পরের অবস্থা আমেরিকান সাংবাদিক আনা লুই ষ্ট্রংয়ের দক্ষিণ কোরিয়া ভ্রমণের (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) বিবরণ থেকে উদ্ধৃত করা যাক। তিনি বলেছেন—

"গত এক বছর ধরে গড়ে প্রতিদিন দেড় হাজার করে লোক মার্কিন-শাসিত দক্ষিণ কোরিয়া থেকে উত্তর কোরিয়ায় পালিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক পালাচ্ছে বেকারি এবং পুলিশী জুলুম থেকে বাঁচার জন্তে, কৃষক পালাচ্ছে অতিরিক্ত

খাজনা আদায়ের সরকারী জুলুম এড়াবার জন্যে, ছাত্র পালাচ্ছে মার্কিন-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ঠেলায়।

"উত্তর কোরিয়ায় ভূমিসংস্কার, জাপানী শিল্পের জাতীয়করণ, শ্রমিক-কল্যাণ আইন পাশ প্রভৃতির ফলে মার্কিন এলাকার নিগৃহীত জনগণের কাছে উত্তর কোরিয়া আজ স্বর্গরাজ্য বলে মনে হয়।

"কোরিয়ার রাজবংশের একজন আত্মীয় লি কাং কুক প্রগতিশীল মতবাদের জন্যে সোভিয়েট এলাকায় পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। ইনি আমাকে বলেছেন—১৯৪৬ সালের শরৎকালে মার্কিন এলাকায় ১৫ লক্ষ লোক নিজেদের ন্যায্য দাবী নিয়ে বিক্ষোভ প্রকাশ করে। এই উপলক্ষ্যে পুলিসের গুলিতে ৩০০জন নিহত হয় এবং ১০,০০০ লোক গ্রেপ্তার হয়। বর্তমানে ২০,০০০ রাজনৈতিক কর্মী জেলে আছেন। জাপ-আমলেও রাজনৈতিক বন্দী এর চেয়ে কম ছিল।

"সমগ্র কোরিয়ায় কবে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, সারা কোরিয়ার জনগণ অধীর আগ্রহে তারই প্রতীক্ষায় দিন গুণছে।"

মনে রাখা দরকার,—এ হচ্ছে ১৯৪৬ সালের অবস্থা। তারপর ২৩।২।৪৮-এর ষ্টেটসম্যানে রয়টারের খবরে প্রকাশ,—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোরিয়া কমিশনের সভাপতি মিঃ মেনন নিরাপত্তা পরিষদের কাছে রিপোর্ট দিয়েছেন :

"দক্ষিণ কোরিয়ায় ন্যায্যভাবে নির্বাচন করতে হলে লোকের রাজনৈতিক এবং নাগরিক স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রত্যেকটি লোকের জীবন পুলিশের কৃপার উপর নির্ভর করে। পুলিশ যাকে খুশি বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করতে পারে, যতদিন খুশি জেলে বিনাবিচারে আটকে রাখতে পারে, এবং কোন আদালতের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। এ অবস্থায় নির্বাচন চলে না। নির্বাচনের আগে সব পার্টিকে কাজ ও প্রচার করার স্বাধীনতা দেওয়া দরকার।"

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোরিয় কমিশনের ইতিহাসের গোড়ার কথা হচ্ছে এই যে, দুই মিত্রশক্তি মিলে সমগ্র কোরিয়ার জন্যে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার যে সিদ্ধান্ত যুদ্ধের মধ্যে গৃহীত হয়েছিল,—উত্তর-কোরিয়ার পিপল্স কমিটির অস্থায়ী সরকারকে ভেঙে না দিলে যখন জেনারেল হজ সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে অস্বীকার করলেন, তখন উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার দুই

মিত্রশক্তির মধ্যে ঠোকাঠুকি সুরু হল। তারপর দক্ষিণ কোরিয়ার ফ্যাসিস্ট শাসনের ফলে সে ঠোকাঠুকি বেড়ে চলল। ইউ-এন-ওতে তার প্রতিধ্বনিও উঠলো এবং ফলে কোরিয় কমিশন গজিয়ে উঠলো। তখন দুই কোরিয়ার মধ্যে ৩৮ অক্ষরেখায় বর্ডার ইনসিডেন্ট সুরু হয়েছে।

এরপর সোভিয়েট প্রস্তাব করলে, দুই মিত্রশক্তিই নিজ নিজ সৈন্য নিয়ে সরে পড়ুক, কোরিয়াবাসীরা নিজেরাই নিজেদের যা খুশি ব্যবস্থা করুক। এ প্রস্তাবে আমেরিকা রাজি হল না। কোরিয়ায় গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের কাজ অচল হয়েই রইল।

কাজেই উত্তর কোরিয়ার অস্থায়ী পিপলস্ রিপাবলিক সমগ্র কোরিয়ার জন্তে এক নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে, এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পিপলস্ কমিটিগুলোকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে পার্লামেন্টে পাঠাবার জন্তে আবেদন করলে। দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণ সোৎসাহে সাড়া দিলে। সমগ্র কোরিয়ায় নির্বাচন সুরু হল।

দক্ষিণ কোরিয়ার পিপলস্ কমিটিগুলো নির্বাচনের সভা করে আর পুলিশ সে সভা ভেঙে দিয়ে ধরপাকড় করে। এমনি ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে নির্বাচন চলতে লাগল। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পুলিশ গ্রেপ্তার করতে লাগল। তারা অনেকে গা-ঢাকা দিলে। অনেকে ৩৮ অক্ষরেখা পার হয়ে গোপনে উত্তর কোরিয়ায় হাজির হল। অনেকে সেই চেষ্টা করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল, কেউ কেউ মারাও পড়ল। দক্ষিণ কোরিয়ার পিপলস্ কমিটি ও তার সমর্থক জনগণের ওপর সরকার সমগ্র শক্তি নিয়ে চেপে পড়ল। লোক মরল হাজারের হিসেবে, গ্রেপ্তার হল লাখের হিসেবে।

কিন্তু উত্তর কোরিয়ায় সমগ্র কোরিয়ার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে পার্লামেন্ট গঠিত হয়ে গেল এবং তার মধ্যে উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধিদের চেয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধিদের সংখ্যা হল বেশি। কারণ উত্তর কোরিয়ার এলাকা ছোট এবং দক্ষিণ কোরিয়ার এলাকা প্রায় তার দ্বিগুণ। ফলে একথা বলার উপায় রইল না যে উত্তর কোরিয়ার সরকার শুধু উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত।

দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণ সরকারী নির্যাতন মুখ বুজে কোনদিন সহ্য করেনি, এবারও করল না। জাপানীদের বিরুদ্ধে গেরিলা লড়াইয়ের মতন আজও তারা মার্কিন তাঁবেদারদের ঠেঙাচ্ছে।

যাই হোক, উত্তর কোরিয়াকে নিজেদের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে দিয়ে সোভিয়েট তার সৈন্য নিয়ে কোরিয়া ছেড়ে চলে গেল। দুনিয়ার লোক দেখলে সোভিয়েট সরে গেল, কিন্তু আমেরিকা গেল না। নির্লজ্জ পরদেশ-শোষকদেরও লজ্জা হল। শেষ পর্যন্ত সিংম্যান রীকে গদীতে বসিয়ে একটা মিলিটারি মিশন এবং পরামর্শদাতার দল রেখে আমেরিকাও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে বাধ্য হল।

উত্তর কোরিয়ায় জনগণের সরকার, জনগণের হাতে সমস্ত শক্তি। কয়েকটা বছর ধরে সরকার এবং জনগণ একযোগে সমস্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলে শক্তি-শ্রী-সমৃদ্ধিতে অনেক এগিয়ে গেছে। দক্ষিণে জনগণ যেমন সরকারী নির্যাতনে জর্জরিত, সরকারও তেমনি জনগণের মাথায় ডাণ্ডা মেরে আমেরিকার যোগান দেওয়া অস্ত্র-শস্ত্রের এবং ভাড়াটে সৈন্যের জোরেই শাসন-শোষণ চালাচ্ছে সুতরাং অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হয়নি। জনগণই সরকারের শক্তির উৎস। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন সরকারের ভিত্তিমূলই দুর্বল।

আমেরিকা দেখল উত্তর কোরিয়ার শক্তিবৃদ্ধি এবং দক্ষিণের জনগণের মতিগতি যদি আরও কিছুদিন এমনি চলতে দেওয়া হয়, তাহলে সিংম্যান রীর মতন বাঁধ দিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সাম্রাজ্য রক্ষা করা যাবে না।

সুতরাং ১৭ই জুন থেকে ২১শে জুন পর্যন্ত আমেরিকার স্টেট-সেক্রেটারির উপদেষ্টা ডালেস দক্ষিণ কোরিয়া ঘুরে গেলেন; ১৮ই থেকে ২৩শে পর্যন্ত আমেরিকার ডিফেন্স সেক্রেটারি জনসন এবং চীফ অফ ষ্টাফ ব্রাডলী দক্ষিণ কোরিয়া ঘুরে গেলেন।—আর ২৫শে জুন রী উত্তর কোরিয়া আক্রমণ করলে।

ওরা সর্বদাই এই রকম সম্ভাবনার জন্যে তৈরি ছিল। ফলে দাঁড়াল রী আক্রমণ করা মাত্রই বন্যার মতন উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদল ৩৮ অক্ষরেখা পার করে তাকে দক্ষিণে ঠেলে নিয়ে এল। আমেরিকার তাঁবেদার জগতের শত শত কাগজে বড় বড় হরফে খবর বেরুল উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার "পিপলস রিপাবলিক"কে আক্রমণ করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা ইউ-এন-এর সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে চিঠি লিখল উত্তর কোরিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত পাশ করার জন্যে নিরাপত্তা পরিষদে মিটিং ডাকতে। প্রভুভক্ত ভৃত্যের মতন তিনি তৎক্ষণাৎ মিটিং ডাকলেন। রবিবার, ২৫শের সভায় প্রথম প্রস্তাবে ঘোষণা করা হল, উত্তর

কোরিয়ার দক্ষিণ কোরিয়ার "অভিযান"টা "আক্রমণাত্মক"। আর এক প্রস্তাবে উত্তর কোরিয়াকে ৩৮ অক্ষরেখার পারে ফিরে যেতে বলা হল।

এ অবস্থায় কি করা হবে—তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করা কঠিন। কিন্তু আমেরিকা যেহেতু আগে থেকেই ঠিক হয়ে বসেছিল, অতএব সটান দক্ষিণ কোরিয়ায় সৈন্য পাঠাতে তার একটুও দেরি হল না।

উত্তর কোরিয়া পিওঙিয়াং রেডিওতে খবর দিলে, দক্ষিণ কোরিয়া তিনবার আক্রমণ করেছে এবং আমরা হটিয়ে দিয়েছি। ফের যদি আক্রমণ করে তাহলে আমরা চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

অর্থাৎ তারা তিনবার ৩৮ অক্ষরেখার সম্মানরক্ষার পর দাগ পার হয়েছে।

যাই হোক, ২৫ তারিখেই ট্রুম্যান ম্যাকআর্থারকে হুকুম দিলেন দক্ষিণ কোরিয়াকে সামরিক সাহায্য দিতে। ২৬ তারিখেই তিনি দশখানা "এফ ৫১" বিমান পাঠালেন। তখন উত্তর কোরিয়ার মুক্তিফৌজ সিউলের কাছে পৌঁছে গেছে।

২৭শে জুন আমেরিকা নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলে। ইউ-এন-ওর সদস্য রাষ্ট্রগুলো যাতে দক্ষিণ কোরিয়াকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করে। ২৭শে তারিখেই সিউল মুক্ত হয়ে যায়, ম্যাকআর্থারের "রকেট ফায়ারিং জেট ফাইটার" সেটা ঠেকাতে পারে নি।

২৮শে তারিখে অ্যাচিসন প্রেস কনফারেন্সে বললেন, উত্তর কোরিয়ার গভর্নমেন্টটা গভর্নমেন্টই নয়, ওরা একদল সশস্ত্র দস্যু, যারা কোরিয়ার খানিকটা দখল করে রেখেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার গভর্নমেন্টটাই নাকি কোরিয়ার আসল গভর্নমেন্ট। কারণ সেটা আমেরিকার সমর্থন পেয়েছে। সুতরাং তাদের ওপর উত্তর কোরিয়ার হামলা হলে আমেরিকা অবশ্যই তাকে সাহায্য করতে যাবে। কিন্তু যুদ্ধের বদলে সালিশীর দ্বারা বিবাদ মীমাংসার জন্যে ইউ-এন-ও হয়েছে। সুতরাং তার প্রথম কর্তব্য ছিল উত্তর কোরিয়ার বক্তব্য শুনে কর্তব্য নির্ধারণ করা। তাকে ডাকাও হয় নি। কারণ তারা গভর্নমেন্টই নয়, একদল ডাকাত। বিশ্বাস না হয়, আমেরিকাকে জিজ্ঞাসা করুন।

চীনের যে সরকার পাঁচটা প্রধান রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যতম, সেই চীন সরকারের বিরুদ্ধে যখন মাও সে-তুং'এর ডাকাতের দল হামলা চালাচ্ছিল, তখন আমে-

রিকা একাই তাকে সব সাহায্য দিয়েছে এবং শেষে সবশুদ্ধ বিতাড়িত হয়েছে, ইউ-এন-ওকে ডাকে নি। কারণ গৃহযুদ্ধের মীমাংসায় ইউ-এন-ও যায় না, সেটা একটা রাষ্ট্রের ঘরের কথা। তাতে হস্তক্ষেপ ইউ-এন-ওর শাস্ত্রে বারণ।

কোরিয়ার যুদ্ধ গৃহযুদ্ধ নয়? দক্ষিণ কোরিয়ার জননিপীড়ক সরকার আমেরিকার সাহায্যে অখণ্ড কোরিয়া গঠনে সমগ্র কোরিয়ার জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধতা করছে এবং সমগ্র কোরিয়ার জনগণ এই বিদেশী তাঁবেদারদের গদীচ্যুত করার জন্যে একসঙ্গে লড়ছে, এটাকে গৃহযুদ্ধ না বলে উত্তর কোরিয়াকে একটা পৃথক রাষ্ট্র বলেই স্বীকার করা হয় না কি?

বস্তুত, ইউ-এন-ও এবং তার সঙ্গে আমরা আমেরিকার নির্দেশ মেনে নিয়ে একটা রাষ্ট্র আর একটাকে আক্রমণ করছে বলে আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে গিয়েছি। অথচ উত্তর কোরিয়া একটা রাষ্ট্রই নয়।

ব্যাপার কি? ব্যাপারটা হচ্ছে, ইউ-এন-ও এবং আমরা আমেরিকার তাঁবেদার!

জনগণের প্রতিনিধির কথা শোনা ইউ-এন-ওর শাস্ত্রে বারণ। তাঁরা কথা শোনেন গভর্নমেন্টগুলোর। দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের কথা যদি শুনতেন, তাহলে তাঁরা দেখতেন তারা উত্তর কোরিয়ার শত্রু নয় কিন্তু তাদের কথা শোনা দূরে থাক, রুশিয়া, নতুন চীন, উত্তর কোরিয়া কারো বক্তব্য না শুনে এমন কি নিজেদের কোরিয় কমিশনের রিপোর্ট শোনার আগেই আমেরিকার কথাতেই ইউ-এন-ও উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করলেন।

তারপর ২৭ তারিখে আমেরিকা ইউ-এন-ওর সভ্যদের দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করতে আহ্বান করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশ হয়ে গেল, এবং ইউ-এন-ওর আবেদনও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে আমেরিকার পেছনে গিয়ে দাঁড়লাম।

আমাদের আমেরিকা-পরায়ণতা দেখে তারিফ করে আমেরিকা বলল, "এশিয়ার ঔপনিবেশিক দেশের লোকেরা হয়ত মনে করতে পারত যে কোরিয়ায় আমাদের লড়তে যাওয়া শ্বেত জাতির একটা জুলুম মাত্র, কিন্তু নেহরু আমাদের ডাকে চট্ করে সাড়া দেওয়ার ফলে তারা বুঝবে যে, কোরিয়ার যুদ্ধের পেছনে আমাদের একটা মহান নীতি আছে।"

কিন্তু দুনিয়া দেখছে দক্ষিণ কোরিয়ায় ইউ-এন-ওর অনেক দেশ যুদ্ধে লিপ্ত, কিন্তু উত্তর কোরিয়ায় রুশিয়া লড়ছে না। ইউ-এন-ওর সভ্য হিসেবে

রুশিয়ারও উচিত হত ইউ-এন-ওর ডাকে সাড়া দেওয়া, যদি ইউ-এন-ও আমেরিকার তাঁবেদারদের মতন তাঁদের বাদ দিয়ে এবং কোরিয়ার জনগণের কথা না শুনেই সিদ্ধান্ত না করত।

তাছাড়া ইউ-এন-ওর ডাকে সাড়া দিয়ে যদি আমেরিকা কোরিয়ায় লড়তে যেত, তাহলে তাকে কোরিয়ায় যেতে হত ২৭শে জুনের পর। তাহলে গিয়ে দেখত উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণ মিলে গিয়ে সমগ্র কোরিয়া এক হয়ে গিয়েছে। সেটাকে বাধা দেওয়ার জন্যে আমেরিকা ইউ-এন-ওর -সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা না করেই দক্ষিণ কোরিয়ায় লড়তে গিয়েছে। পরে ইউ-এন-ওর নিশান এবং তকমা মারফৎ সেটাকে চাপা দেওয়া মহান নীতির এই ধাপ্পাবাজীতে তাদের তাঁবেদার ছাড়া আর কেউ ভুলবে না।

সে ধাপ্পাবাজী সেদিন স্বয়ং ট্রুম্যান সাহেবের মুখ দিয়েই ফাঁস হয়ে গেছে। তাঁর সাপ্তাহিক প্রেস কনফারেন্সে তিনি বলেছেন, আমেরিকা কখনও যুদ্ধে হারে নি, এবারেও হারবে না; বলতে বলতে তাঁর রক্তটা গরম হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি তারপরে বলে ফেলেছেন, কোরিয়ায় আমাদের দাঁড়াবার জায়গা (foothold) আমরা বজায় রাখবই, এবং সেটাকে ঠেলে ৩৮ অক্ষরেখা পর্যন্ত নিয়ে যাব। মহান নীতির ঝুকড়ির ভেতর থেকে এই বুকড়ি চাল বেরিয়ে পড়েছে।

চীন থেকে হেরে পালিয়ে কোরিয়া নিয়ে এই বীরত্ব হুঙ্কারটাও নির্লজ্জতার চূড়ান্ত নিদর্শন। তার সঙ্গে অবশ্য রুশিয়ার কাছে অনুরোধও চলেছে উত্তর-কোরিয়াকে ৩৮ অক্ষরেখায় ফিরে যেতে বলার জন্যে।

রুশিয়া বলছে, আমরা পরের দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি না। আমাদের দেশের খোপদস্ত বাবুর দল সটান বলে চলেছেন এদের পিছনে যেমন আমেরিকা আছে, ওদের পিছনে তেমনি রুশিয়া আছে। আমেরিকা কি পরিমাণ লড়ছে, আর রুশিয়া কি পরিমাণ চুপ করে আছে, তা দেখেও এঁরা ঐ কথাই বলবেন।

আরে মশাই, তা না হলে অতটুকু উত্তর কোরিয়ার এতবড় ঠেলা হতে পারে?

পারে। গণশক্তি এবং সোভিয়েট পদ্ধতিতে মিশে গেলে এমনি হয়। ইন্দোনেশিয়ায় হো-চি-মিনকে ফরাসী শক্তি দাবাতে পারছে না কেন? তার পেছনে কতখানি রুশিয়া আছে?

নেহরুর চিঠির উত্তরে যে স্টালিন বলেছেন, কোরিয়ার জনগণের বক্তব্যও শোনা দরকার, সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির শক্তির চাবিকাঠি ঐখানে।

চীনে মাও সে-তুঙ যেমন ছুটেছিলেন, উত্তর কোরিয়াও তেমনি ছুটেই চলেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের পেছনে দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণ গরিলা লড়াই করছে, আর উত্তর কোরিয়া এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই জনগণ তাদের অভ্যর্থনা করে উল্লাসে নৃত্য করছে, দ্বিতীয় দিনেই সেখানে কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানকার লোক উত্তরের সৈন্যদলে ভর্তি হচ্ছে, এমন যুদ্ধ কে কবে দেখেছে?

আমেরিকার বীরত্বের মুখোশ ছিঁড়ে গেছে। রাশিয়া বলতে পারে "আরে বেটা, আগে আমার চেলার সঙ্গে যুদ্ধ, তারপর আমার সঙ্গে লড়বি।" নেহরুজীর দেশের দুই পালোয়ানের গল্প।

দক্ষিণ কোরিয়াকে আমেরিকা গভর্নমেন্ট বলে মানে, তাই ইউ-এন-ও তাকে মানে। কিন্তু নেহরুজী বলেছেন, তিনি কোরিয়ার কোন গভর্নমেন্টকেই মেনে নেন নি। তবু তিনি আমেরিকার পেছনে ছুটলেন কোরিয়ার জনগণের লড়াইয়ের বিরুদ্ধে লড়তে, ইউ-এন ওর নলচে আড়াল দিয়ে।

তারপর সেই কেলেঙ্কারি ঢাকা দেওয়ার জন্যে শান্তির দূত সেজে আমেরিকার কাছে দরবার করলেন, নিরাপত্তা পরিষদে নতুন চীনের প্রতিনিধি গ্রহণ করতে। তাহলে রাশিয়াও পরিষদে ফিরে আসবে এবং তখন শান্তির চেষ্টার একটা পথ হবে।

নতুন চীনকে নেহরুজী ব্রিটেনের সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু আমেরিকা মানে নি বলেই ইউ-এন-ও'ও মানে নি। তাদের মেনে নিলে রাশিয়াও বয়কট করত না, এবং হয় ত নিরাপত্তা পরিষদে কোরিয়ার জনগণের কথাও শোনার কথা উঠত। তাতে হয়ত আমেরিকা বাগ মানত না, কোরিয়ায় লড়তে যেত, কিন্তু সে লড়াই ইউ-এন-ওর লড়াই হত না।

যদি নতুন চীন এবং রাশিয়ার অভাবে নিরাপত্তা পরিষদে শান্তি প্রচেষ্টার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে ওদের অভাব অগ্রাহ্য করে যুদ্ধের আদেশ দেওয়ারই বা তার কি অধিকার আছে? আর নেহরুজীর সে আদেশ পালনেরই বা যৌক্তিকতা কি আছে? আসল কথা আমেরিকাই ইউ-এন-ও এবং নেহরুদের মালিক।

যুদ্ধোত্তর যুগে সমগ্র ধনবাদী জগতের সমস্যা হচ্ছে কমিউনিজমের বন্যা প্রতিরোধ করা। এশিয়ায় চিয়াঙ ছিল ধনবাদী জগতের একচ্ছত্র নেতা আমেরিকার কমিউনিজম ঠেকানোর বড় এজেন্ট। তার পতনের পর আমেরিকাও তার সঙ্গে হটে গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে কমিউনিজমের বন্যা প্রবাহ থেকে বাঁচাবার জন্যে বর্তমানে আমেরিকা নেহরুজীর ওপর ভর করেছেন। তাই ভারতকে একটা 'মেজর পাওয়ারের' মধ্যেও ধরা শুরু হয়েছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের এশিয়ার কলোনিগুলোর মধ্যে ভারত মেজর পাওয়ারই বটে। বনদেশে শিয়াল রাজা।

তাই নেহরুজী ফুলে উঠে শান্তির দূত সেজে সার্কাসের ক্লাউনের মতন হাস্যাস্পদ হয়ে লোক হাসাচ্ছেন। স্টালিনকে বলছেন, আমি আমেরিকার কাছে আবদার করেছি, নতুন চীনকে নিরাপত্তা পরিষদে এনে শান্তির চেষ্টায় যোগ দিও। স্টালিন বলছেন, "তুমি শুভ রয়ের মতন নতুন চীনের জন্য আমেরিকার পিছনে লাগ। তুমি, নতুন চীন এবং আমি মিলে কোরিয়ার জনগণের কথা শুনে শান্তির ব্যবস্থা করব।"

অ্যাচিসনের কাছে নেহরুর আবদারের জবাবে তিনি বলেছেন, "আরে বাপু, দক্ষিণ কোরিয়াকে বাঁচিয়ে তারপর তোমার বোকার মতন আবদার শুনব। নতুন চীনকে মেনে নিলে ফরমোজা যে ছাড়তে হয় এবং আমাদের জাপানী ঘাঁটির দক্ষিণে একটা শাল প্রবেশ করে, এ কথাটা কি তোমার মাথায় ঢোকে না? আর আমরা নিরাপত্তা পরিষদে নতুন চীন আর রাশিয়ার সঙ্গে কোরিয়ার জনগণের কথা শুনতে শুনতে রী-গভর্নমেন্ট যে উপে যাবে, এবং কমিউনিষ্ট কোরিয়া গজিয়ে ওঠবার জন্যে আরও নিরাপত্তা পরিষদের শান্তি প্রচেষ্টার অপেক্ষা থাকবে না। আমরা কি ফরমোজা, দক্ষিণ কোরিয়া কমিউনিষ্টদের হাতে তুলে দিয়ে শান্তি করব? আচ্ছা বেকুব বটে।"

নেহেরু তবু একবার অ্যাচিসনের পিছনে ছুটেছেন, আর একবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সভ্যরাষ্ট্রগুলির কাছে আবেদন করছেন, আমার আবদারে তোমরা যোগ দাও।"

খরিদ্দার এবং দোকানদারের মধ্যে দর কশাকষি হচ্ছে। খরিদ্দার বলছে "দিয়ে ফেল।" দোকানদার বলছে, "কেমন করে দেব, আমার যে লোকসান হয়।" বার বার এক কথা বলার পর খরিদ্দার বলল, "আচ্ছা এক কাজ

কর।" দোকানদার বললে, "কি ?" খরিদ্দার বললে, "চোখ কান বুজে গিলে ফেল।" ইনিই আমাদের ইন্টারন্যাশন্যাল পলিটিক্সের এক্সপার্ট।

যাই হোক, আমেরিকার বীরত্বের পরিচয় দেওয়ার জন্যে লড়াইয়ের দৈনন্দিন রোজনামচা লেখার প্রয়োজন নাই। রয়টারের প্রতিনিধি রয় ম্যাককার্টনির একখানা চিঠি থেকে তার সার সংগ্রহ উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে।

তিনি দক্ষিণ কোরিয়া ঘুরে ফিরে এসে লিখছেন, "এমন বিপদে আমরা কখনও পড়ি নি। লড়াইয়ের খবর চিরকাল সামরিক হেডকোয়ার্টার থেকেই সেন্সার হয়। কিন্তু ম্যাকআর্থার বললেন, 'আমরা আর সেন্সর করব না, তোমরা নিজেরাই এমনভাবে সংবাদ লেখ, যাতে শত্রুর উৎসাহ না হয় এবং আমাদের সেপাইরা ঘাবড়ে না যায়।'

"আমাদের ঘাড়ে এ এক সাংঘাতিক দায়িত্ব চাপানো। বিভিন্ন দেশের কাগজের বিভিন্ন রকমের সাংবাদিক লড়াইয়ের নানা ফ্রন্ট থেকে নানা সূত্রে বিভিন্ন রকম খবর সংগ্রহ করে এবং সমরবিভাগ থেকে যখন সেন্সর করা হয় তখন একটা প্ল্যান অনুসারে সমস্ত সংবাদের মধ্যে খানিকটা সামঞ্জস্য রাখা হয়। তাতে খবরগুলো একতরফা বা মিথ্যে হলেও সহজে ধরা পড়ে না।

"কিন্তু সকল সাংবাদিকের উপর যদি নিজ নিজ সংগৃহীত সংবাদ সেন্সরের ভার চাপানো হয়, তাহলে সামঞ্জস্যও থাকা অসম্ভব এবং মিথ্যে ধরা পড়াও সহজ হয়ে যায়। আর অবিরাম বেধড়ক মার খেয়ে পালাতে দেখে এসে পলাতক সেপাইদের উৎসাহ বাড়ানোর মতন গল্প বানিয়ে লেখা, সেই কি কম মুস্কিলের কথা।

"পালানোর ঠেলায় নির্দিষ্ট লাইনই খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা নির্দিষ্ট লাইন আছে মনে করে সেখানে যেতে যেতেই লাইন ভেঙে গেল, পলাতক সেপাইদের সঙ্গে পালাতে পালাতে সাংবাদিকরাও হয়রান। এমনি করে করে আমেরিকার চুজন সাংবাদিক মারাই পড়ল। এমন অপ্রস্তুত আমরা কখনো হই নি।"

অবস্থা দেখে নির্বোধ গুণ্ডারা অ্যাটম বোমার আশ্রয় নিতে পরামর্শ দিচ্ছে। বিলেতে বলছে, অ্যাটম বোমা ঝাড়লে আমেরিকার গায়ে তো আঁচড় লাগবে না—মারা যাবে জাপান এবং বিলেত। কারণ এশিয়ায় ঘাঁটি জাপান, ইউরোপে ঘাঁটি বিলেত—পাল্টা অ্যাটম বোমা এই দুই দেশেই পড়বে।

বাবুসাহেবরা বলছেন, যাই বলুন মশাই আমেরিকা যে রকম উঠেপড়ে লেগেছে, ফরমোজা ইন্দোচায়নাতে লড়াই ছড়িয়ে পড়ল বলে এবং তার পরেই আরো ছড়িয়ে পড়ে তৃতীয় মহাযুদ্ধ না লেগে আর যায় না।

কিন্তু সে বিষয়ে কয়েকটা কথা বিবেচনা করবার আছে। রাশিয়া এবং আমেরিকাই হচ্ছে তৃতীয় মহাযুদ্ধে দুই পক্ষের সক্রিয় নেতা। রাশিয়া যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ চায় না, তার বাস্তব প্রমাণ কোরিয়ার যুদ্ধে উত্তর কোরিয়ার পক্ষে যুদ্ধ না করা। যদি এতবড় উস্কানীর পরও সে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে, তাহলে অন্যত্র লড়াই ছড়ালেও সে এমনি নিষ্ক্রিয় থাকবে। সারা পৃথিবীর দেশে দেশে শ্রমজীবী জনগণই তার যুদ্ধবিরোধী সেনা।

আমেরিকা কোরিয়ার যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে মাও সে-তুঙ বা হো-চি-মিন নেন, তার জন্যে সে ফরমোজা এবং ইন্দোনেশিয়ায় সতর্কতা অবলম্বন করেছে মাত্র, সেটা সে করতই, যদি সে কোরিয়ার যুদ্ধে লিপ্ত নাও হ'ত। মাও সে-তুঙ বা হো-চি-মিন যে দিনই আক্রমণ শুরু করতেন সেইদিনই সেখানে আমেরিকা যেত। সেটা তৃতীয় মহাযুদ্ধের কথা নয়।

যদি জার্মানিতে কোরিয়ার মতন ব্যাপার হয়, তাহলেও দেখা যাবে পূর্ব জার্মানির পেছনে রাশিয়া লড়ছে না, উত্তর কোরিয়ার মতন পূর্ব জার্মানি একাই 'ভেল দিগদিগ' লাগিয়ে দিয়েছে।

কোরিয়ার ব্যাপারে ইউ-এন-ও আমেরিকার পেছনে থাকলেও সারা দুনিয়ার লোক দেখছে, কোরিয়ার লড়াইটা আমেরিকারই লড়াই। অন্যত্র এমন ব্যাপার হলেও দুনিয়ার লোক দেখবে আমেরিকাই পাণ্ডা। আজও যেমন আমেরিকা বচনে ছাড়া ইউ-এন-ও থেকে বেশি কিছু পাচ্ছে না এবং ইউ-এন-ওর মধ্যে তার চালাও সমর্থনও একটু শিথিল হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, অন্যত্র লড়াইয়ে এই ব্যাপারটাই আরো স্পষ্ট দেখা যাবে।

কোরিয়ার লড়াইয়ে রাশিয়া নামলে ইউ-এন-ওর অ্যাংলো-আমেরিকান ক্যাম্পের দেশগুলোকেও আমেরিকা পুরোপুরিভাবে লড়াইয়ে নামাতে পারত। রাশিয়া নিরপেক্ষ থেকে সেপথে কাঁটা দিয়েছে।

বর্ত্তমান লড়াই ইউ-এন-ওর নামে চলছে। তৃতীয় মহাযুদ্ধের ইউ-এন-ওর মৃত্যু। ইউ-এন-ওকে যারা বাঁচিয়ে রাখতে চায়, তারা তৃতীয় মহাযুদ্ধ চায় না।

৪ঠা জুলাই মস্কোর আমেরিকান দূতাবাসে ভিসিনস্কি এবং গ্রমিকো ব্রিটিশ কেলী এবং আমেরিকান দূতের সঙ্গে আমেরিকার স্বাধীনতা তিথি পালন উপলক্ষ্যে যে ভড্কা খেয়ে ফূর্তি করে এলেন, সেটাও তৃতীয় মহাযুদ্ধের লক্ষণ নয়।

আমেরিকা ব্রিটেনকে বললে কমিউনিষ্ট চীনকে তেল বিক্রি করো না। ব্রিটেন বললে, আমাদের তেল বেসামরিক সুতরাং তেল আমরা বেচবই। আমেরিকা ক্ষেপে ধমক দিলে তারা তেল বিক্রি বন্ধ করেছে বটে, কিন্তু সেটা কোরিয়ার প্রয়োজনের অজুহাতে। অর্থাৎ কমিউনিষ্ট চীনকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলে যে তোমাদের প্রতি শত্রুতা আমাদের লক্ষ্য নয়। এসব তৃতীয় মহাযুদ্ধের লক্ষণ নয়।

হাইফং থেকে দাইরেনে চিয়াং-এর অবরোধ ভেদ করে ব্রিটিশ জাহাজ মাল বয়, আর চিয়াঙ তাদের গুলি করে, ধরে আটক করে। এগুলোও তৃতীয় মহাযুদ্ধের লক্ষণ নয়।

রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত না মেনে "ভেটো" দেয় বলে তার নিন্দায় যারা পঞ্চমুখ ছিল, আজ তারা তাকে নিরাপত্তা পরিষদে আনার জন্যে ধড়ফড় করছে। ব্রিটিশ স্বাস্থ্যসচিব বিভান সাহেব কাতরভাবে রাশিয়ার কাছে আবেদন করছেন, "ওগো তোমরা আর একবার নিরাপত্তা পরিষদে ফিরে এস।" এটাও তৃতীয় মহাযুদ্ধের লক্ষণ নয়।

তবে কি তৃতীয় মহাযুদ্ধ হবেনা? ভাবতে বোধ হয় বাবুসাহেবদের প্রাণে ব্যথা লাগে, যেন একটা আশাভঙ্গের ব্যথা। ভয় নেই। হবে। আমেরিকা এবং তার সঙ্গে ধনবাদী রাষ্ট্রগুলোর ধনিক শিল্পপতিদের তাঁবেদারীর ফলে দেশে দেশে জনগণের দুর্দশা যেমন বেড়ে চলেছে, ধনবাদের সেই সংকট যখন চরমে পৌঁছে দেশে দেশে গণবিক্ষোভ বিপ্লবের রুদ্র তাণ্ডবে ফেটে পড়ার উপক্রম হবে তখন ধনবাদী শয়তানদের বাঁচার চেষ্টার একমাত্র পন্থা বাকি থাকবে, লড়াই বাধিয়ে লোকগুলোকে মেরে ফেলে তাদের ভিড়টাকে পাতলা করে ফেলা।

প্রথম মহাযুদ্ধে তারা রাশিয়া হারিয়েছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আধখানা ইউরোপ এবং চীন গেছে, তৃতীয় মহাযুদ্ধে বাকিটাও যাবে এ তারা জানে তবু তারা মরণকামড় দিয়ে মরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

হানা

অমূল্য দেব

দক্ষিণ মালয়ের একটি ছোট্ট সহর।

সম্প্রতি এখানে বিদ্রোহীদের তৎপরতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন গেরিলা-আক্রমণের একটা না একটা চাঞ্চল্যকর খবর লেগেই আছে। সহরের ইউরোপীয় এবং অভিজাত ধনিক-বণিক মহলে একটা অশরীরী আতঙ্কের কালোছায়া নেমেছে। নানান ধরনের গুজব আর উড়ো খবরে ইংরেজ প্ল্যান্টারদের দিন কাটছে : ওই বুঝি কমিউনিষ্টরা এসে গেল! চীনের পর মালয়!...

স্থানীয় পুলিশের বড়কর্তা এণ্ডারসন্ তাঁর সম্ভ্রান্ত চীনা ব্যবসায়ী বন্ধু চাও সীয়েন'এর বাড়ীতে নৈশ ভোজে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। খানাপিনা শেষ হতে রাত প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। এত দেরি হবে, আগে তাঁর জানা ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে একা নামতে গিয়ে বিরক্ত মনে এণ্ডারসন্ স্থির করলেন, চাওয়ের বাড়ীতে আর নয়। ঐ চীনে বেটার যদি গরজ থাকে ত তাঁর অফিসে গিয়ে খুব দেখা করতে পারবে। কমিউনিষ্টই হোক, আর দালালই হোক, এই এশিয়ার লোকগুলোই সব মহা পাপী!

একটা সিগারেট ধরাবার জন্যে এণ্ডারসন্ একটু থামলেন। ধোঁয়া মাথায় ঢুকতেই মেজাজটা নরম হয়ে এল। না, যাই বল, খুব খাইয়েছে চাও। চাইনীজ্ ডিস্ আর দুষ্প্রাপ্য বিলিতি মদের স্বাদ এখনো মুখে লেগে রয়েছে।... কিন্তু ঐ অস্থিসার বেঁটে দালালটার খাঁদা নাকটা মোটেই যেন বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি। হাজার হোক, চাও পুলিশের খয়েরখাঁ 'নেটিভ্' ছাড়া আর কিছু নয়। একবার যে স্বজাতির স্বার্থ বিকিয়ে দিয়েছে, সে যে আবার ঘুরে দাঁড়াবেনা, তার কিছুই নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া আজ যে ইংরেজের বিশ্বস্ত চর, কাল হয়ত দেখা যাবে, সে-ই বিদ্রোহীদের মোটা রকমের চাঁদা দিয়ে ভালমানুষ সাজার তালে আছে।

যাকগে, ওসব ভেবে কিছু লাভ নেই। এই 'জরুরী' (ইমার্জেন্সি) অবস্থাটা কেটে গেলেই ওর একটা ব্যবস্থা করা যাবে। আপাতত এরাই তো

হাতের পাঁচ।······সিঁড়ির একদম নিচের ধাপে পৌঁছে রাস্তার দরজাটা খুলে সতর্কভাবে চারদিক দেখে নিলেন মিঃ এণ্ডারসন্। ডামাডোলের বাজার, তার উপর রাত্রিও গভীর, রাস্তায় লোকজন একেবারেই নেই। তালই হ'ল, চাণ্ড-এর সঙ্গে পুলিশের সম্পর্কের কথা সহরের লোকের কাছে গোপন রাখাই দরকার। কথাটা জানাজানি হয়ে শেষে বিদ্রোহীদের কানে পৌঁছতে কতক্ষণ ?

এণ্ডারসন তাঁর পেছনে কোনো পদশব্দ শোনেন নি ; কিন্তু সন্দেহ হ'ল কেউ যেন অনুসরণ করে আসছে তাঁকে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের দিকে তাকাতেই একটা চক্চকে ছোরা তাঁর গর্দানে আমূল ঢুকে গেল। টাল সামলাতে না পেরে তিনি পড়ে গেলেন, হত্যাকারীকে চিনতে পারলেন। মুখে রক্ত ওঠার ফলে কোন কথা বলতে পারলেন না বটে, কিন্তু তাঁর মুমূর্ষু দৃষ্টিতে ফুটে উঠল অপার বিস্ময়।

আততায়ী মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর ক্ষিপ্রহস্তে পুলিশের বড়কর্তার পকেটগুলো হাতড়ে দরকারি কাগজপত্র বের করে নেয়। দুই মিনিটের মধ্যেই লোকটা শিষ দিতে দিতে রাস্তা দিয়ে চলে যায়। মোড়ের পোষ্টের আলোয় লোকটা পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে সময় দেখে নেয় : বারোটা বেজে দশ। উনিশশো' পঞ্চাশ সালের পয়লা মার্চ,—ব্রিটিশ সরকার যার নাম দিয়েছে 'দস্যু-বিরোধী মাস'—এভাবেই এই ছোট সহরে শুরু হ'ল।

তিন ঘন্টা বাদে স্থানীয় পুলিস হেডকোয়ার্টার্সে খবর গেল : 'আক্রমণ শুরু হয়েছে।' নৈশ-অপারেটারের কাজ বেড়ে গেল। সারা জেলার সমস্ত অনুচরদের হেড্‌কোয়ার্টার্সে তলব করা হয়েছে। অপারেটার প্রত্যেক লাইনে শুধু একটি কথারই পুনরাবৃত্তি করে গেল : 'গেরিলা আক্রমণ শুরু হয়েছে।' এই জরুরী খবর বোঝবার ব্যাপারে নৈশ-অপারেটার এত বেশি তন্ময় হয়ে পড়েছিল যে স্যুইচ্‌বোর্ডের কাছে একটি যুবকের অস্থিরভাবে পায়চারী করা প্রথমে তার নজরেই পড়েনি। আগন্তুক স্থানীয় অধিবাসী, চেহারা অত্যন্ত সাধারণ, কালো চুল, শীর্ণ শরীর। লোকটা কোনো কারণে যেন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। শেষে অপারেটারের কাছে গিয়ে কোনো ভূমিকা না করেই সে শুরু করে দেয়, "বড়কর্তার সঙ্গে আমার এখুনি দেখা করা অত্যন্ত প্রয়োজন !"

বিস্মিত অপারেটার প্রশ্ন করে, "কে আপনি, কি চাই ?"

"আমার নাম রোনাল্ড" লোকটা ভ্রুকুঞ্চিত করে, "মালয়ী খৃশ্চান। আমি

আমার বক্তব্য মিঃ এণ্ডারসনের কাছেই বলতে চাই”—যুবক মুখটা খানিক বিকৃত করে।

অপারেটার অগত্যা উত্তর দেয়,“মিঃ এণ্ডারসনকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। দু’বার চেষ্টা করেও উত্তর পাই নি।”

ইতিমধ্যে উত্তেজিত পুলিশ-গোয়েন্দার দল একে একে এসে হাজির হচ্ছে। প্রায় সবাই সদ্য ঘুম থেকে উঠে সোজা চলে এসেছে। অনেকের চোখ থেকে এখনো ঘুমের ঘোর কেটে যায় নি। কেউ কেউ এখনো ইউনিফর্মের বোতাম লাগাচ্ছে কিংবা টাই ঠিক করছে। বিদ্রোহীদের হানার খবর পেয়ে ওরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

একজন অফিসার অপারেটারের কাছে গিয়ে মাথার টুপি খুলে প্রশ্ন করে, “কমিশনার সাহেব কি আমার খোঁজ করেছিলেন ?”

“না স্মিথ। উনি এখানে নেই ; কোথায় যে আছেন, তারও ঠিক নেই। তুমি কিছু জান ?”

স্মিথ অস্থিরকণ্ঠে বলে, “আমায় একটা লাইন দাও কয়েকটা ‘কল’ করে দেখি।” স্মিথ অফিসের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আগন্তুক রোনাল্ড আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল, “আমার প্রয়োজনটা অত্যন্ত জরুরি, অপারেটার। এ-মুহূর্তে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। নইলে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তোমাকেই সম্পূর্ণ দায়ী করা হবে।”

অপারেটার রেগে গিয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। অপারেটার কান দিল : “হ্যালো,—ইয়েস্—অ্যা ? কি বললেন বুঝতে পারছি না ঠিক,······আবার বলুন”—অপারেটার গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে। তারপর একটা লাইনে প্লাগ দিয়ে বলে, “মাই গড! তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত স্মিথ। তোমাকে আর টেলিফোন করতে হবে না। কমিশনার সাহেব খুন হয়েছেন !”

অতঃপর অপারেটার পরপর কয়েকটা লাইনে কাঁপা গলায় ঘোষণা করতে থাকে : “স্থানীয় পুলিশ-কমিশনার মিঃ এণ্ডারসন্ খুন হয়েছেন। বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায় নি। অবিলম্বে সব জানানো হবে।”

স্মিথ অফিসের ভিতর থেকে ছুটে এল। অপারেটারকে বলল, “এক্ষুনি পেরাকের পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে খবর দাও।”—স্মিথ আবার ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজাট।

বন্ধ করে দিল। অপারেটার পেরাকের লাইনের সঙ্গে স্মিথের লাইন সংযোগ করে দিল। তারপর হঠাৎ খেয়াল হ'ল সেই অপরিচিত আগন্তুক রোনাল্ডের কথা, বড়কর্তার সঙ্গে যে দেখা করতে চেয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, লোকটা উধাও।

ভোর পাঁচটার সময় খোপ-দুরস্ত পোষাক পরা লম্বা-চওড়া একজন অফিসার স্থানীয় পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে এসে হাজির হলেন। অপারেটারকে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে হুকুম দিলেন, "আমার নাম উইলিয়াম, স্পেশাল অফিসার। পেরাক থেকে বিশেষ বিমানযোগে আমাকে এখানে পাঠান হয়েছে। পুনরাদেশ না হওয়া পর্যন্ত আমি এখানকার কার্যভার গ্রহণ করলাম।"

"আমি লেফ্‌টেন্যান্ট স্মিথকে এখুনি জানাচ্ছি" অপারেটার উত্তর দেয়, "তিনিই এখানকার পুলিশ কমিশনারের সহকারী হিসেবে কাজ চালাচ্ছেন—মানে চালাতেন।"

"ঠিক আছে। সমস্ত অফিসারদের আমার কামরায় পাঠিয়ে দাও"—উইলিয়াম আদেশ দেন, "আমি এখুনি একসঙ্গে সবাইকে দেখতে চাই। এণ্ডারসনের অফিসঘরেই আমি বসছি।"

ঠিক সেই মুহূর্তে আগন্তুক যুবক রোনাল্ডকে আবার দেখা গেল। উত্তেজিত ভাবে সে অপারেটারকে প্রশ্ন করে, "মিঃ এণ্ডারসন্ এখনো আসেননি ?"

সদ্য বিমান-যোগে প্রেরিত স্পেশাল অফিসার উইলিয়াম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, "এই, কী নাম তোমার ? এণ্ডারসনের কাছে তোমার কি দরকার শুনি ?"

অপারেটার বুঝিয়ে দেয়, "ওর নাম রোনাল্ড। প্রায় দু'ঘণ্টা আগে এখানে এসে মিঃ এণ্ডারসনের জন্যে অপেক্ষা করে গেছে। বলছিল, ওর নাকি খুব গোপনীয় কথা আছে বড়কর্তার সঙ্গে।"

চশমার ফাঁক দিয়ে স্পেশাল অফিসারের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে "বটে ! এসব কি ব্যাপার, অ্যাঁ ?"

—"ব্যাপারটা আমি এণ্ডারসনের কাছেই বলব, আর কারো কাছে নয়," যুবক উত্তর দেয়।

অপারেটার আবার বাধা দেয়, "ও বলছিল যে মিঃ এণ্ডারসনের সঙ্গে ওর দেখা না হলে একটা ব্যাপার ঘটে যেতে পারে।"

—"মাই গড্!" মিঃ উইলিয়াম সন্দিগ্ধ হয়ে বলেন, "তা হলে এণ্ডারসন্ যে খুন হবেন সেকথা তুমি জানতে?" স্পেশাল অফিসার বারুদের মত জলে ওঠেন, "কতদূর জানতে তুমি ? কে বলেছিল তোমায় ?"

আগন্তুক দাঁতে দাঁত চেপে বলে, "এণ্ডারসন্ খুন হয়েছেন ? এণ্ডারসন্......" ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে সে আবার প্রশ্ন করে, "তাহলে এখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার এখন কে ?"

"আমিই ভারপ্রাপ্ত অফিসার", স্পেশাল অফিসার মেঝের পা ঠোকেন, "আমার নাম উইলিয়াম।"

রোনাল্ড ইতস্তত করে বলে, "তাহলে......আপনার কাছেই বলতে হ'ল দেখছি! কিন্তু কথাটা অত্যন্ত গোপনীয় ছিল।"

"দাঁড়াও" উইলিয়াম অপারেটারকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার অফিস কোনটা ? অপারেটার দরজা দেখিয়ে দিল। রোনাল্ড সে-ঘরে ঢুকে পড়ল, পিছু পিছু উইলিয়ামও চললেন।

কিন্তু সন্দিগ্ধ স্পেশাল অফিসার ঘরে ঢুকেই আবার কি ভেবে অপারেটারের কাছে ফিরে এলেন। প্রশ্ন করলেন, "লোকটা কে, চেন ?"

—"এর আগে কখনো দেখি নি।"

—"হুম্! লেফ্‌টেনান্ট স্মিথকে এখুনি খবর দাও।"

স্মিথ আসতেই স্পেশাল অফিসার সংক্ষেপে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, "রোনা ল্ড নামে কাউকে জানেন ? লোকটা এণ্ডারসনের খোঁজে এসেছিল, আপাতত আমার ঘরে বসিয়ে রেখেছি।"

স্মিথ মাথা নাড়ে, "কই, না ত! তবে ভূতপূর্ব কমিশনার সাহেবের সমস্ত বিশ্বস্ত অনুচরকে আমি অবশ্য চিনি না। আচ্ছা, লোকটাকে একবার দেখতে পারি ?"

—"তার চেয়ে বরং কোনো রকমে আমার সঙ্গে ওর কথাবার্তা গোপনে শোনাই আপনার সবচেয়ে ভাল। মনে করুন, দরজাটা যদি একটু ফাঁক করে রাখি ?"

"তার দরকার নেই," স্মিথ পরামর্শ দেয়, "ডেস্কের ডানদিকে একটা লাল রঙের বোতাম আছে দেখবেন। ওটা টিপে দিলেই ওঘরের সমস্ত কথা আমার ঘর থেকে শোনা যাবে। বলেন ত নোট বইতে সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু টুকে রাখতেও পারি।"

উইলিয়াম স্মিথকে সম্মতি জানিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ডেস্কের ডানদিকের সুইচের বোতাম টিপে দিয়ে রোনাল্ডকে বসতে আদেশ করলেন। কিন্তু দেখা গেল, বসবার মতো ধৈর্য আগন্তুকের নেই। যুবক অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে শুরু করে, "এণ্ডারসন্ খুন হয়েছেন······আশ্চর্য! সব প্ল্যান্ ভেস্তে যেতে বসেছে······" তারপর স্পেশাল অফিসারের দিকে ফিরে শুরু করে, "ব্যাপার হচ্ছে, আমি ভূতপূর্ব কমিশনার সাহেবের হয়ে অনেক গোপন ব্যাপারেই লিপ্ত ছিলাম। কিন্তু এর আগে আর কখনো এই অফিসে আসি নি। তার কারণ পুলিশের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বরাবরই গোপন রাখতে হয়েছে। সোজা কথায় বিপ্লবীদের 'আণ্ডারগ্রাউণ্ডের' খবরাখবর আমিই সরবরাহ করতাম।"

"তুমি বলতে চাও," উইলিয়াম সন্দেহ প্রকাশ করেন, "তুমি আমাদের এজেন্ট? যদি তাই হয়, আজ রাত্রে তোমার এখানে আসার কারণটা তবে কি?"

দাঁতে ঠোঁট চেপে রোনাল্ড উত্তর দেয়, "আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমাদের মধ্যে চুক্তি ছিল, অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে আমি কমিশনার সাহেবের সঙ্গে সোজাসুজি দেখা করব। আজকে তেমনি একটা বিশেষ কারণ ঘটেছে। আমি বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছিলাম, এই রাত্রেই বিদ্রোহীরা হানা দেবে ঘটেছেও ঠিক তাই।"

স্পেশাল অফিসার অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "তার মানে, তুমি বলতে চাও আমাদের সিকিউরিটি ফোর্স, পুলিশ, মিলিটারি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ সব ঘুমিয়ে ছিল, আর তুমি একাই গোপন খবরটা জানতে পেরেছিলে?"

রোনাল্ডের মুখভঙ্গির কোনই পরিবর্তন দেখা গেল না। বললে, "আমার কর্তব্য শুধু খবর দেওয়া। মিঃ এণ্ডারসন আমার খবরের উপর নির্ভর করেই জরুরী অবস্থায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। আপনি কি এসব জানেন না? আশ্চর্য!"

উইলিয়ামের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। বলেন, "মানে, আমি সবেমাত্র এখানে এলাম কিনা! তা হোক, আমার সহকর্মীরা নিশ্চয় সবকিছু জানেন।"

রোনাল্ড বাধা দেয়, "না, তাঁদের কারো জানার কথা নয়। ব্যাপারটা আমার আর মিঃ এণ্ডারসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।"

আবার স্পেশাল অফিসারের মনে সন্দেহ জাগে, "কিন্তু আমি কি করে বিশ্বাস করব যে তুমি সত্যি সত্যি আমাদের লোক? তুমি যে গেরিলাদলের লোক নও তারই বা প্রমাণ কি?"

রোনাল্ড পকেট থেকে একখণ্ড সরকারি কাগজ বের করে দিল। ভূতপূর্ব কমিশনারের সই করা একটা সার্টিফিকেট। তাতে লেখা আছে যে, পত্রবাহক রোনাল্ডকে সমস্ত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষই যেন সর্বপ্রকারে সহায়তা করতে দ্বিধা না করেন। রোনাল্ডের জন্যে মিঃ এণ্ডারসন স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

পড়া শেষ করে স্পেশাল অফিসার নিশ্চিন্তমনে জিজ্ঞেস করেন, "তাহলে, এখন কী করতে হবে আমাদের? বিদ্রোহীদের আক্রমণের অব্যবহিত পরের কর্তব্য সম্বন্ধে মিঃ এণ্ডারসন্ কিছু স্থির করে গেছেন কি?"

রোনাল্ড গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়, "আমি যতদূর জানি, মিঃ এণ্ডারসন দু'টি বিশেষ তালিকা তৈরী করে রেখে গেছেন। একটাতে আছে সমস্ত জেলার বিশ্বাসভাজন লোকের নাম, আর একটাতে রয়েছে সন্দেহজনক এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, এমন সব লোকের নাম। জরুরী ব্যবস্থার উদ্ভব যখন হয়েছে, তখন সমস্ত সন্দেহজনক লোকদের গ্রেপ্তার করে গুলি করাই উচিত। অন্ততঃ মিঃ এণ্ডারসন বেঁচে থাকলে নিশ্চয় এতক্ষণে তাই করতেন।"

"বেশ, বেশ," স্পেশাল অফিসার কিছু করার মত কাজ হাতে পেয়ে খুশি হ'য়ে উঠলেন। বললেন, "সেই তালিকা দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি এখুনি করছি।"

—"কিন্তু তালিকাগুলো ঐ বড় আলমারীতে নেই। যেখানে আছে, আমি ছাড়া আপাতত আর কেউ জানে না। আর এক জানতেন মিঃ এণ্ডারসন্।"

উইলিয়াম অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, "তুমি ঠিক জানো তো?"

রোনাল্ড ইতস্তত করে বলে, "আসল কথা কি, মিঃ এণ্ডারসন স্থানীয় অফিসের কাউকেই খুব বেশি বিশ্বাস করতেন না। তার প্রমাণ, সেই তালিকা যে সিন্দুকে রাখা হয়েছে তার চাবি আমার কাছে আছে। এই নিন।" রোনাল্ড চাবি বের করে দিল।

আধঘণ্টা বাদে সারা সহর থেকে 'সন্দেহজনক' বন্দীদের একে একে নিয়ে আসা হ'ল। বন্দীরা ওয়েটিংরুম অতিক্রম করার সময় অপারেটার পর পর বন্দীদের নাম টেলিফোনযোগে জানাতে লাগল, আর স্পেশাল অফিসার একটা লিষ্টের

সঙ্গে নাম মেলাতে লাগলেন। অপারেটার বলে যেতে থাকে : "ভিক্টর ইমাম, স্থানীয় হাইস্কুলের মালয়ী-খৃশ্চান শিক্ষক। লি ফো—ঔষধ বিক্রেতা। আলি হাসান—মস্ত ব্যবসায়ী। আজিজা আমেদ—নাইট্-ক্লাবের গায়িকা। মিঃ হাসান—ব্যাঙ্কের কেরানি।..."

উইলিয়াম ঘড়ি দেখে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলেন। তারপর স্মিথকে সঙ্গে নিয়ে বন্দীশালায় ঢুকলেন। চশমার পুরু কাঁচের মধ্যে দিয়ে শ্যেনদৃষ্টিতে অপরাধীদের ভাল করে দেখে নিয়ে স্পেশাল অফিসার হুকার দিলেন, "চমৎকার! আমার মাননীয় অতিথিবৃন্দ নিশ্চয়ই অবগত আছেন, কি কারণে আপনাদের এখানে আনা হয়েছে!"

একটা গুঞ্জন ওঠে। বন্দীরা সবাই প্রায় একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। কেন যে তাদের মত 'সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের' এই অসময়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ডেকে আনা হয়েছে, তা তারা কিছুতেই ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। অনেকে দস্তুরমত বিস্মিত হয়ে গেছে।

নাইট্-ক্লাবের গায়িকা মিস্ আজিজা মেয়েলি কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ জানায়, "সহরে আমাদের একটা সুনাম আছে স্যার! বিশেষত সরকারি দপ্তরে আমাদের দেখা গেলে লোকের মনে একটা সন্দেহও উঠতে পারে যে আমরা ইংরেজের চর।"

—"চুপ!" স্পেশাল অফিসার ধমকে উঠলেন, "বাজে ন্যাকামি শোনার সময় আমার নেই। আজ রাত্রে গেরিলারা সহরে হানা দিয়েছে!" সমস্ত ঘরে একটা স্তব্ধতা। তিনি বলে চললেন, "এবারে বাছাধনরা ঠিক বুঝতে পেরেছেন ত? আপনাদের এখানে আটকে রাখা হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনাদের বাইরে রাখা বিপজ্জনক।"

—"তার মানে?" ওষুধ-বিক্রেতা চেঁচিয়ে ওঠে। বাকি সবাই উদ্বেগে অস্থির।

—"মানে খুব খারাপ।" উইলিয়াম স্মিথের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। রোনাল্ডের সঙ্গে কয়েকটি কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। চিন্তিতভাবে স্মিথকে তিনি বলেন, "মিঃ স্মিথ, বন্দীদের দেখে ত 'আণ্ডারগ্রাউণ্ডের' নেতা বলে মনে হয় না।...কিন্তু ভূতপূর্ব কমিশনার নিশ্চয়ই যথেষ্ট প্রমাণ না পেয়ে এদের নাম 'বিপজ্জনক' তালিকায় ঢুকিয়ে দেন নি!"

স্মিথ মাথা চুলকোয়, "এদের মধ্যে অনেকেই ভূতপূর্ব কমিশনারের কাছে ইতিপূর্বে একাধিকবার দেখা করতে এসেছে। কিন্তু মিঃ এণ্ডারসন অত্যন্ত চাপা

প্রকৃতির লোক ছিলেন। হয়ত এদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ তাঁর জানা ছিল, কিন্তু বাইরে প্রকাশ করেননি।"

রোনাল্ড ঘরে ঢুকতেই স্পেশাল অফিসার বললেন, "ভাল করে ভেবে দেখ বাপু, কোনো ভুলচুক নেই ত এর মধ্যে ?"

—"মোটেই না। আপনার অনুমতি পেলে বন্দীদের ডেকে একে একে সনাক্ত করে দিতে পারি," রোনাল্ড জবাব দেয়।

—"সনাক্ত না করাই ভাল। আমি চাইনা যে তোমার মত একজন সরকারি লোককে সবাই পুলিশের চর বলে জানুক। আমাদের ভূতপূর্ব কমিশনার সাহেবের ইচ্ছানুসারেই সব কিছু করা হবে। এর জন্যে আমাকেও কেউ দোষ দিতে পারবে না।"

টেলিফোন বেজে উঠল। স্পেশাল অফিসার ফোন ধরলেন। তারপর রোনাল্ডকে বললেন, "আর একজন আসামীকে এখুনি হাজির করা হবে। তোমার পক্ষে ওর সামনে না থাকাই উচিত। স্মিথের ঘরেই আপাতত লুকিয়ে থাক।"

তারপর টেলিফোনে হুকুম দিলেন, "লোকটাকে নিয়ে এস।"

এবারে ঘরে ঢুকল চাও সীয়েন। বেচারাকে সন্ত ঘুম থেকে তুলে ধরে আনা হয়েছে। পাগলের মত চাও চীৎকার করে বলে, "এর মানে কী? এমন পুলিশি ঠাট্টা হজম করতে পারব না আমি। তার চেয়ে গুপ্তচরগিরি ছেড়ে দিতে হয় সেও ভাল।"

উইলিয়াম হুঙ্কার ছাড়েন, "ওসব চালাকি আমার কাছে খাটবে না।"

—"কিন্তু আপনি কে ?" চাও প্রশ্ন করে, "এর আগে ত কথনো দেখিনি !"

—"খুব শীগগিরই আমার যথার্থ পরিচয় পাবে, ব্যস্ত হয়ো না। আপাতত আমি যে তোমাকে চিনি, এইটেই যথেষ্ট," ঝুনো গোয়েন্দার মত উইলিয়াম আরম্ভ করেন, "তোমার সম্বন্ধে সব খবরই আমরা রাখি। 'সাবোতাজের' পেছনে তোমার হাত আছে, তাও আমরা টের পেয়েছি। আমাদের চোখে ধুলো দেবে ভেবেছিলে ? সে গুড়ে বালি।"

—"কি সাংঘাতিক!" চাও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, "সাবোতাজ করব আমি! এসব অযথা সন্দেহের এখনি অবসান করা যেতে পারে; শুধু একবার কমিশনার

মিঃ এণ্ডারসনের কাছে নিয়ে চলুন আমায়। তিনি আমায় খুব ভালরকম চেনেন।”

উইলিয়াম যেন একটা সূত্র খুঁজে পেলেন, “ঠিক এরকম কথা বলবে তা আমি আগেই জানতাম,” গম্ভীরভাবে তিনি বলে যান, “মাস ছয়েক আগে তোমার ঘরে একটা গোপন সভায় অনেক সন্দেহজনক প্রকৃতির লোক উপস্থিত ছিল; বিদ্রোহীদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের একটা চুক্তিও সেখানে সম্পন্ন হয়েছিল,” ফাইলের কাগজ ওল্টাতে ওল্টাতে উইলিয়াম বলে যান,—“ট্রেন উড়িয়ে দেবার একটা ষড়যন্ত্রের কথাও আমার জানা আছে। তোমার কারখানার কর্মীদের তুমিই বিস্ফোরকের বোতল সরবরাহ করেছিলে। নিশ্চয়ই সে-সব বৃত্তান্ত এর মধ্যে তুমি ভুলে যাওনি।”

চাও হতভম্ব হয়ে পড়েছে। উত্তেজিত হয়ে বলে, “কখখনো নয়। এণ্ডারসন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেই বুঝতে পারবেন, এ-সব ডাহা মিথ্যে কথা।”

উইলিয়াম সংযতকণ্ঠে বলেন, “এণ্ডারসনের দোহাই দিয়ে বেশ অভিনয় করলে যা'হোক। শোন, এণ্ডারসন খুন হয়েছেন, ঠিক তোমার বাড়ির সামনে। রক্তের চিহ্ন তোমার দরজার দিকেই মিলিয়ে গেছে। গত রাত্রিতে তোমার বাড়িতে মিঃ এণ্ডারসনকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোর খবরও আমরা রাখি।”

চাও এবারে সত্যি খুব ভয় পেয়ে গেছে। কম্পিত কণ্ঠে বলে, “সবই মিথ্যা কথা।”

উইলিয়াম উঠে চাও-এর সামনে যান। চোখ পাকিয়ে বলেন, “তুমিই মিঃ এণ্ডারসনকে হত্যা করেছ।”

চাও ভয়ে নীল হ'য়ে গেছে। বলে, “আমি! হত্যা!”—তারপর একটু সাহস সঞ্চয় করে বলে, “তদন্ত করলেই আসল ব্যাপারটা বোঝা যাবে। এই মুহূর্তেই তদন্ত করার দাবি আমি জানাচ্ছি। তার আগে একবার আমার উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।”

উইলিয়াম এবারে প্রহরীকে আদেশ দেন, “ওকে নিয়ে যাও।” প্রহরী বন্দীকে নিয়ে যায়। স্মিথের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বলেন, “আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।......অথচ ‘ফাইলে’ ওর বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। এণ্ডারসনের খুন হওয়ার খবর পেয়ে লোকটা বেশ অবাক হয়েছে বলে মনে হ'ল।”

—"ওসব হ'চ্ছে বাপ্পা," স্মিথ উড়িয়ে দেয়, "এখন যা করবার, খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে। সামান্য একটু দুর্বলতার জন্যে সব ভেস্তে যেতে পারে। চাই কি আজকের গাফিলতির জন্যে কাল সকালে আমাদের সবাইকে প্রাণ হারাতেও হতে পারে। কমিশনার সাহেবও বরাবর 'শুভস্য শীঘ্রম' নীতি অবলম্বন করতেন।"

ছোট্ট 'সেল্'-এ সূচীভেদ্য অন্ধকার। একটা লোহার খাটে বসে চাও সীয়েন অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভাবছে। জীবন কিংবা মৃত্যু। এক সময়ে সে টের পেল, কেউ যেন দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছে। কিন্তু এই গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায়না।

—"কে ওখানে ?" চাও অবশেষে ভীতকম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

উত্তর আসে, "আমি।"

—"কে 'আমি' ? নাম নেই ?"

—"আছে, ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? ইয়া-সান্-এর নাম শুনেছ কখনো ?"

চাও আতঙ্কে শিউরে ওঠে, "ইয়া-সান্! তুমি এখানে এলে কি করে ? আমার ধারণা ছিল, পুলিশ গোয়েন্দার দল এতক্ষণ তোমার পেছনে ঘুরছে।"

—"আমাদের সর্বত্র অবাধ গতি," ইয়া সান গম্ভীর কণ্ঠে বলে, "আমরা হচ্ছি মালয়ের সাচ্চা দেশ-প্রেমিক। তোমার মতো বিদেশির দালাল কুকুর নই আমরা। মালয় আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের দেশে আমরা যেখানে খুশি যাব না ত কি ?"

চাও-এর ভীতি-বিহ্বল মস্তিষ্কে হঠাৎ একটা ফন্দি ঢুকল। বললে,—"এসেছ বটে, কিন্তু যাবার পথটি বন্ধ। আমি এখনি চিৎকার করে পুলিশ ডাকছি। তোমাকে হাতে পেলে ওরা আমায় নির্ঘাৎ ছেড়ে দেবে, আর তোমার মাথার উপর যে হাজার পাউণ্ডের পুরস্কারটা ঝুলছে, সেটাও—"

—"না, চেঁচাতে তুমি পারবে না। একবার চেষ্টা করে দেখতে পার," বক্তার হাতের আঙুল চাও-এর কণ্ঠনালি চেপে ধরল।

চাও অতি কষ্টে বললে, "ছেড়ে দাও! মেরোনা আমায়! পুলিশের কাছে কিছুই বলিনি আমি। তোমাদের সম্বন্ধে কোনো সংবাদ ওরা পায়নি।"

—"তুমি স্বজাতির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, দেশকে শত্রুর হাতে বিকিয়ে দিয়েছ।"

—"না, আমি কিছুই করিনি।.....মানে, আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে ওরা নিশ্চয় আমার ব্যবসা বাজেয়াপ্ত করে নিত," চাও মিনতি করে।

আগন্তুক কোন উত্তর দেয় না, কিন্তু লোহার মত ওর আঙুলগুলো চাওয়ের কণ্ঠ চেপেই থাকে। চাও দ্রুতগতিতে বলে যায়, "বিশ্বাস কর, আমি খুব বেশি ক্ষতি করিনি তোমাদের। রবার বাগানের সেই সব শ্রমিক-হত্যার জন্যে সম্ভবত আমার উপর তোমাদের সন্দেহ হচ্ছে, না? কিন্তু সেজন্যে প্রকৃত দায়ী ....."

—"কে দায়ী সেজন্যে?"

—"বললে আমায় ছেড়ে দেবে তো? দেখ, আমি কথা বলতে পারছিনা, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।" চাও-এর গলা থেকে আঙুল সরে যায়। চাও ঢোঁক গিলে বলে, "সেজন্যে দায়ী,———নৈশ ক্লাবের গায়িকা আজিজা। সে-ই পুলিশকে খবর দিয়েছিল।"

—"আর সেই পুলের খবর ব্রিটিশপক্ষকে কে দিয়েছিল?"

—"কোন পুলের খবর?"

—"তুমি খুব ভাল করেই জান, কোন পুল। তিন মাইল দূরে ক্ল্যাংনদীর উপরের সেই পুল, যে-টা আমরা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম।"

—"আমি.....জানিনা,..........তবে...যদি ছেড়ে দাও ত বলতে পারি। পুলের খবর দিয়েছিল······মিশনারী স্কুলের মাষ্টার ভিক্টর।"

—"আর আমাদের বুলেটিন কোথায় ছাপা হয়, সে-খবর কে দিয়েছিল পুলিশকে?"

—"কেবল প্রশ্ন। আমায় ছেড়ে দেবে কিনা আগে বল, নইলে আর একটি কথারও জবাব তুমি পাবে না।"

আবার সেই লোহার মত শক্ত আঙুলের চাপ শুরু হল। তাড়াতাড়ি চাও শুরু করে, "প্রেসের খবর দিয়েছিল.....ব্যাঙ্কের কেরানি হাসান। ওর সঙ্গে আবার কেমিস্ট লি কো জড়িত রয়েছে।"

আস্তে আস্তে আঙুল সরে গেল। চাও ক্রমাগত কাসতে লাগল, ওর সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। তারপর চাও অনুনয় করে বলে, "এবারে আমায় ছেড়ে দেবে ত?....দেবে না? আমি

ত তেমন কিছু ক্ষতি করিনি তোমাদের।" আবার স্তব্ধতা।—"তাহলে আমায় ছেড়ে দেবে ?"

কোন উত্তর নেই। এবারে চাও বুঝতে পারে, 'সেল্'-এ এখন সে একা।

বেলা দশটার সময় চাও এবং অন্যান্য বন্দীদের সবাইকে সারবন্দী দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হল। ঘণ্টাখানেক বাদে রোনাল্ড আর একটা চমকপ্রদ খবর নিয়ে এল, "একটা রুশ বিমানের সম্বন্ধে খবর পাওয়া গেছে।"

"সোভিয়েটের বিমান! মালয়ের এই সহরে!" উইলিয়াম চেয়ার থেকে উঠে পড়েন। তাঁর মাথার চুল প্রায় খাড়া হয়ে উঠেছে।

"—না, এই সহরে কেন হবে ? কয়েক মাইল দূরে রবার জঙ্গলে বিমানটি অবতরণ করবে। রুশ-বিমান কিনা জানিনা, চীনা কমিউনিষ্টদেরও হতে পারে। তবে বিদ্রোহীদের জন্যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই হয়ে আসবে সেই বিমানে "

উইলিয়াম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। চশমার কাঁচ বারবার মুছতে মুছতে মন্তব্য করেন, "আশ্চর্য! রুশ-বিমান এই সুদূর মালয়ে......অথচ মস্কোর কর্তারা ওদিকে নিরপেক্ষতা এবং বিশ্বশান্তির বড় বড় বুলি কপচাচ্ছে হাক, জঙ্গলটা চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলতে হবে আগে থেকে।"

—"না, সেটা ঠিক হবেনা।" রোনাল্ড চিন্তিতভাবে জবাব দেয়, "তাহলে পাইলট উপর থেকেই সব টের পেয়ে যাবে। সিঙ্গাপুর বিমান-ঘাঁটিতে খবর দিয়েও কাজ নেই। তার চেয়ে বিমান থেকে নেমে লোকটা যখন বিদ্রোহীদের আড্ডায় যাবে, তখন মাঝপথে ওকে আটকালেই হবে'খন। অবশ্য যদি আপনার কোন নিজস্ব পরিকল্পনা থাকে—"

"হুম!" উইলিয়াম মতিস্থির করতে পারেন না। বলেন, "কিন্তু, ধর তুমি একা যদি সামলাতে না পার শেষকালে —"

—"সেজন্যে ভাববেন না। ও আমি ঠিক পারব," রোনাল্ড সামরিক কায়দায় সেল্যুট জানিয়ে বিদায় নেয়।

দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে উইলিয়াম স্মিথকে ডাকেন। বলেন, "দেখুন আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছেনা রোনাল্ডের কথাবার্তায়। চারজন মিলিটারী গার্ড দিন আমার সঙ্গে। আমি ওর পিছু পিছু যাচ্ছি। আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত অফিসের ভার আপনার হাতেই রইল।"

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। কিন্তু উইলিয়াম অথবা রোনাল্ড, কারো কাছ থেকেই কোনো খবর নেই। স্মিথ অস্থির হয়ে পড়েছে। শেষে প্রায় ছ'টার সময় খবর পাওয়া গেল যে সিকিউরিটি-কোর্সের একজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিককে ছুরিকাহত অবস্থায় নিকটবর্তী জঙ্গলে পাওয়া গেছে। লোকটা বাঁচবে না বলেই মনে হয়। খানিক বাদে আর একটা খবর এল; একজন পুলিশ অফিসারের মৃতদেহ মাইলখানেক দূরে পাওয়া গেছে।

—"হায়, হায়!" স্মিথ কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে ভাবে, "উইলিয়াম নির্ঘাৎ ফাঁদে পা দিয়েছে।"

ঠিক সাতটার সময় দরজা খুলে একজন লম্বাটে অফিসার পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্সে ঢুকলেন। অসামরিক পোষাকে এলেও তিনি 'ইমার্জেন্সি কমিশনার' বলে নিজের পরিচয় দিলেন। প্রথমে অপারেটারকে পরে স্মিথকে তিনি পরিচয়পত্র খুলে দেখালেন। স্মিথ তাঁকে উইলিয়ামের পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হতেই ইমার্জেন্সি অফিসার মিঃ লকহার্ট ক্রোধে ফেটে পড়লেন, এখানে সব হচ্ছে কি আজকাল? এসব ভৌতিক কাণ্ডের মানে কি শুনি?

তারপর টেবিলে ঘুসি মেরে তিনি বলেন, "আমি এইমাত্র সিঙ্গাপুর থেকে স্পেশাল চার্টার্ড প্লেনে এসে পৌঁছেচি। এখান থেকে অত্যন্ত অবিশ্বাস্য সংবাদ আমরা পেয়েছি। চাও-কে নাকি গুলি করা হয়েছে? কমিশনার ম্যালকম্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড ত খবর পেয়ে রেগে কাঁই হয়ে আছেন। চাও তাঁর বিশেষ হাতের লোক ছিল।"

স্মিথ জিভ দিয়ে শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট চেটে নেয়। কাঁপা গলায় বলে, "স্পেশাল অফিসার উইলিয়াম ভীষণ ভুল করে ফেলেছেন তাহলে..."

—"কে উইলিয়াম?" লক্‌হার্ট হুঙ্কার ছাড়েন।

"যিনি পেরাক থেকে এখানকার ভার পেয়ে এসেছিলেন।"

"পেরাকে তাহলে গাঁজাখোরের অভাব নেই দেখছি। যাক্‌গে, আমি এখানকার ভার নিলাম। আপাতত দু'জন লোক আমার দরকার। মিশনারী স্কুলের মিঃ ভিক্টর ইমাম আর মালয় ষ্টেট ব্যাঙ্কের মিঃ হাসানকে এখুনি ডেকে পাঠান, বিশেষ দরকার।"

স্মিথের মুখে কথা যোগায় না। তারপর আস্তে আস্তে বলে, "ওদের ত গুলি করা হয়েছে, মানে...স্পেশাল অফিসার উইলিয়ামের আদেশে—"

লক্‌হার্ট উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে ওঠেন, "কবে থেকে বিশ্বস্ত লোকদের গুলি করা অভ্যাস করছি আমরা ?

স্মিথ ভীতকণ্ঠে জবাব দেয়, "কেন ওরা ত ঠিক 'বিশ্বস্ত' ছিল না। ওরা আণ্ডারগ্রাউণ্ডের লোক। উইলিয়াম নিজে ফাইল দেখে বলেছেন।"

"সে-সব ফাইল নিয়ে আসুন শীগ্‌গির।"

দেখা গেল, ফাইলগুলো যে আলমারিতে আছে, তার চাবি কারো কাছেই নেই।

লক্‌হার্টের মুখ রাগে টক্‌টকে লাল হয়ে গেছে। বলেন, "যেমন করেই হোক, আলমারি খুলতে হবে আপনাকে। আমি এখুনি ফাইল চাই।"

সন্ধ্যার দিকে ষ্টিলের আলমারি ভেঙে ফাইল বের করা হ'ল। লক্‌হার্টের মনে হল, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সব উধাও হয়ে গেছে।—"প্ল্যানগুলো কোথায় ?" লক্‌হার্ট আরেকটা হুঙ্কার ছাড়েন।

—"কিসের প্ল্যান ?" লেফটেনান্ট স্মিথ আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে।

—"এই সহর থেকে পশ্চাদপসরণের প্ল্যান। আপনি কিছুই খবর রাখেন না ? হায়, হায়!"—তারপর একটা ফাইলের ফিতে খুলে ফেললেন ইমার্জেন্সি অফিসার। উপরে লেখা আছে, "আমাদের সাহায্যকারী বিশ্বস্তদের চূড়ান্ত তালিকা।"

সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠল। অপারেটার খবর দিল, "জঙ্গলে আর একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে। বিবরণ শুনে মনে হয়, লোকটা রোনাল্ড।"

"গুড্ গড্! তাহলে উইলিয়াম হানাদারটাকে খতম করেছে।"—লকহার্ট গভীর অন্ধকারের মধ্যে যেন একবিন্দু আলোর দেখা পেলেন।

কিন্তু তাঁর জন্যে আরো প্রচুর বিস্ময় অপেক্ষায় ছিল।

লকহার্ট ফাইল খুললেন। 'বিশ্বস্ত' তালিকায় যাদের নাম আছে, তাদের সবাইকে গুলি করে মারা হয়েছে। স্মিথ তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে নামগুলো পড়ছিল : "চাও, সীয়েন, ভিক্টর ইমাম, আলি হাসান, আমিজা আমেদ, লি ফো........."

—"হায়, হায়! আমি কী করি এখন!" লকহার্ট ফাইল ওল্টান। ছোট্ট একটা কাগজে পরিষ্কার লেখা আছে : "রোনাল্ড,—অত্যন্ত বিশ্বাসী সংবাদদাতা। গেরিলা দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে।"

লকহার্ট শেষ ফাইলটি খুলে ধরলেন। উপরে লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা : "গেরিলা আক্রমণের পরিস্থিতিতে এদের গুলি করতে হবে।" ভেতরে শুধু একটিমাত্র নাম : "ইয়া-সান"। পরিচয় : "শুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বলে। মাঝে মাঝে বোনাল্ডের ছদ্মবেশ ধরে থাকে। গুপ্ত আন্দোলনের একজন বড় নেতা। অত্যন্ত বিপজ্জনক।"

স্মিথ কপালের ঘাম মুছে ফেলে বলে, "ফাইল গোলমাল হয়ে গেছে।"

লকহার্ট থামিয়ে দেন, "আমি সব বুঝতে পেরেছি। এবারে আমি কি করব জান? আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করে আজই সিঙ্গাপুর পাঠিয়ে দিচ্ছি। ম্যাক্‌ডোনাল্ড এসব শুনলে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। আর মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড যখন রেগে যান—"

স্মিথ প্রায় ককিয়ে ওঠে। বলে, "না, আমাকে আপনি পাঠাতে পারবেন না স্যার! আমি কিছুই করিনি, সব ওই ছদ্মবেশি বোনাল্ডের জন্যে—"

লকহার্ট স্মিথের দিকে চোখোচোখি চেয়ে আস্তে আস্তে বলেন, "ম্যাক্‌ডোনাল্ড যখন রেগে যান......।"

মালয়-প্রত্যাগত অনৈক বন্ধুর মুখে শোনা বিভিন্ন ঘটনার সংযোগ এবং কিছুটা কল্পনার সাহায্য নিয়ে গল্পটি লেখা। —লেখক।

কারার প্রার্থনা

জগন্নাথ চক্রবর্তী

আমাকে ভেঙে ফেল, আমাকে মুক্তি দাও
আমার এই লাল দেয়ালের নীল দাঁড়ায় হাতুড়ির ঘা মারো
আমার এই ইস্পাত ফলকের পেশীতে কুঠার হানো,
কে তোমরা বাইরে ? কে তোমরা এদেশের মানুষ ?
আমি জেলখানা—আমি ইংরেজের কারাগার—
আমাকে দয়া করো
আমার এই পাথর সত্তার অসহ অচলায়তন থেকে
আমাকে মুক্তি দাও।

দেখলাম, এল
শহরতলী থেকে কারখানার শ্রমিক
মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা
এল স্লোগান মুখে ক'রে ;
দেখলাম, কার্বনের ক্রোধ তাদের ঠোঁট জুড়ে
দেখলাম, বাটার ট্রামের এলেনবেরির উত্তেজনায় তারা তেজোদৃপ্ত
এল বাংলার ভাবীকাল
শৃংখল প'রে।

দেখলাম, এল
শীতের সন্ধ্যায় ঠায় নগ্ন দেহ
দ্বীপ নদী পরগনার সন্তানেরা
কোমরে দড়ি, লাঠি পাকানো হাতের কব্জিতে হাতকড়া
সামনে পিছনে প্রহরী
ভাবীকালের অজাতশত্রুরা এল,
চোখে মুখে আগুনের ঝলক
বুঝি বজ্রের ঝিলিক।...

এ কে ?
চুপিসাড়ে মশাল জ্বালে ও কারা
গভীর রাত্রির বীভৎস প্রেতমূর্তিরা
ওরা কারা ?
দমবন্ধ অন্ধকারে
আতঙ্কে ইঁটের পাঁজর আমার শিউরে ওঠে,
এখানে কে ও ?
এখানেও জতুগৃহ ?
প্রহরীবেষ্টিত আমি পাষাণ হয়ে চেয়ে দেখি :

বন্যায় হাঁপিয়ে ওঠা খালের জলের মত
কলকল ক'রে ওঠে ইয়ার্ডের বন্দীরা
ফুলে ওঠে রাগে, ফুলে ওঠে ত্রাসে আতঙ্কে
ঘুম ফেলে লাফিয়ে ওঠে তারা
বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ ফলার মত
স্লোগান ওঠে আকাশ চিরে
দেয়াল পার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চিৎকার
কেঁপে ওঠে রাত্রির অন্ধকার
কেঁপে ওঠে জল্লাদের বুক।
মাঠ-গ্রাম-শহর-কারখানার একচ্ছত্র মালিকের পোষা-কুকুর
এগিয়ে আসে :
কিন্তু পিছু হটে কি কেউ ?
না, পিছু হটে না শ্রমিক, পিছু হটে না কৃষক
কাকদ্বীপের জোয়ান খালের কুমিরের মত
লেজের বাড়ি মারে দুশমনকে
কার্নেনের শ্রমিক কারখানার বয়লার হয়ে
ঝলসে দেয় শয়তানকে ;
পিছু হটে না কেউ।

আমি শুনি :
"আগুন আগুন !
সাথীরা এগোও
ঘুম ভেঙে ওঠো গা-ঝাড়া দাও,
দুশমনদের হাতিয়ার কেড়ে
আঘাত ফেরাও।
আগুন আগুন !
হ'টো না কেউ
স্লোগান তোলো
এখানে দাঁড়াও
কমরেড তুমি সামনে এগোও
ওদের আগুনে ওদেরই পোড়াও
শত্রু তাড়াও
স্লোগান তোলো
ভুলোনা কেউ
আমাদের সাথে অমর জনতা
স্লোগান তোলো !"...

শয়তান,
তোমার লোভের বুঝি সীমা নেই,
ওকেও ধরে এনেছ এখানে ?
বাস্তুহারা মা-মরা মেয়েটাকেও রেহাই দেবে না ?
ছিন্নমূল মানুষ তাড়িয়ে নেওয়া তোমার ব্যবসা
দেশ থেকে দেশান্তর
এপার থেকে ওপার
হন্তে কুকুরের মত পিছু নিয়েছ ?
তবু এখনও হয়নি, হয়নি বুঝি ?
সৈরন্ধ্রীর সম্মানেও বুঝি হাত দেবে ?…
"খবরদার শয়তান !"…
কে ও ?…
কিন্তু এখানে কেন ?
এই পাষাণপুরীর পাতালগহ্বরে
আলো-হাওয়ার ত্রিসীমানার বাইরে
এখানে কেন ?
"খবরদার"…
কে ও ?…
"কেউটে সাপের বাচ্চা তুমি শুনে রাখো
এ বিষ আমি ফিরিয়ে দেবো
তোমার কণ্ঠনালিতে,
মনে রেখো
এদেশের বেহুলারা বিধবা হয় নি,
তাদের ভেলা ভাসছে আলেমখুনের খালে,
ঝিলে জঙ্গলে মাঠে জালেমী শিবিরের মাথায়
তাদের সঞ্জীবনমন্ত্র জ্বলছে দাউদাউ।
শয়তান চেয়ে দেখ
তেলেঙ্গানার লখিন্দর পাশ ফিরছে,
কৃষ্ণা গোদাবরীর দুই তীর দিয়ে
দপদপ করছে তোমার সর্বনাশ।
এখানেও আমরা আজ
আমাদের ব্যাণ্ডেজবাঁধা হাত তুললাম—
শয়তান নিপাত যাও।"

এ অবদমিত যন্ত্রণা আমার অসহ,
ফেটে পড়বো ফেটে পড়াবো আমি
চৌচির হয়ে যাবো।
ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে যমের কুকুর লেলিয়ে দিয়ে
অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ছো ?
রাত্রির অন্ধকারে টুঁটি চেপে মারবার বীভৎস উল্লাসে
নেচে উঠছো ?
পিশাচ, পিশাচ !...
এ নরকযন্ত্রণার শেষ কবে ?
আমাকে ভেঙে ফেল,
কে তোমরা এদেশের মানুষ
আমাকে দয়া করো।

বারুদে বারুদে বিস্ফোরক হয়ে উঠলো দেশ—
এখানে উঁকিঝুঁকি, ওখানে হানা
ঘরে ঘরে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা
গোয়েন্দা পঙ্গপালের উৎপাতে নিরুৎসব আকাশ
সঙীনের খোঁচায় গ্যাসে গোঙানিতে
অসহিষ্ণু মাঠ-দেশ অধৈর্য কারখানা।
আর না !

পাগলাঘণ্টিতে ঘা দেয় কারা ?
শিলং থেকে সালেম ছড়িয়ে পড়ে ঝড়ের সংকেত
হিমালয়ের গুহা গমগম ক'রে ওঠে
বিন্ধ্যগিরি থেকে পশ্চিমঘাট পর্বত
ফুঁসে গর্জে ওঠে রাগে,
আমি কারাগার
আমি ক্ষুধা হরতালের দাবানলে জ্বলে উঠি
জ্বলে ওঠে দেশ—অগ্নিগর্ভ জনতা ;
গরাদ-বন্ধ কুঠুরিতে বুকের পাঁজর ঠুকে
চকমকি ঝরায় দধীচিরা
ঝরায় আগুন, ঝরায় মিহির—
আবীর হয়ে ওঠে দিগদিগন্ত বৃত্রসংহারের মহড়ায়

শুনি :
"আকাশ-কুন্তলা দেশ রৌদ্রস্নাত ভারতবর্ষ
কার ?
আমার।

বিপ্লবসরণী বাঁধা মহাভারতের দীর্ঘ উত্তরাধিকার
কার ?
আমার।
তোমার সর্বনাশ আসন্ন শয়তান!
আমাকে তুষানলে দিয়েছো কতবার—
মরিনি।
আমাকে সঙীনে বিঁধেছো কতবার
মরিনি।
বিষের বাটিতে চুমুক দিয়েছি
মরিনি।
আমি মানব-সভ্যতার উত্তরসাধক
আমার মৃত্যু নেই।
আজ তুমি আবার সেই নেকড়েগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছ
দেয়ালের গহ্বরে এখানে,
চাবুকে চাবুকে কালসিটে পড়িয়েছ পিঠে
জল্লাদ পাঠিয়েছো বুকে হাঁটু দিতে
কিন্তু জেনে রাখো
আমার আপাতমৃত্যুর দাম তোমার চূড়ান্ত সর্বনাশ।
তোমার এই জেলখানার—
এই নরহত্যার বীভৎস কারখানার
দরজায় ঐ কিসের আঘাত ?
শোন
কিসের শব্দ ?···
তোমার মৃত্যুর আমার উত্থানের ;
আমার পুনরুত্থানের দুন্দুভি।"···
শুনে শুনে বধির হয়ে যাবো,
আমি মুক্তি চাই,
যদিও আমি গোলাম জেলখানা মাত্র
তবু অসহ্য
অসহ্য এই অভিজ্ঞতা।
জাহান্নমের লাল আগুনের এই অন্ধকার থেকে
আমি মুক্তি চাই।···
তোমরা বাইরে ? তোমরা এদেশের মানুষ ?
এসো, এগিয়ে এসো
আমাকে বাঁচাও
আমাকে মুক্তি দাও তোমরা।

নতুন চীনের চিন্তা-বিপ্লবের অগ্রদূত

অ্যাগ্‌নেস স্মেডলে

চীনের নতুন সংস্কৃতি-শিবিরের সব চেয়ে বড় এবং সব চেয়ে সাহসী নেতা ছিলেন লু স্যুন। চীনের সংস্কৃতি-বিপ্লবের প্রধান সেনানায়ক তিনি। তিনি শুধু মস্ত সাহিত্যিক নন, বড় চিন্তাশীল ও বড় বিপ্লবীও। পর্বতের মত অটল, কখনও কারও কাছে মাথা নত করেননি বা কারও মন ভুলিয়ে চলেননি—ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের কাছে তাঁর চরিত্রে এক দুর্লভ সম্পদ। তিনি অভূতপূর্ব, সব চেয়ে সাহসী, সব চেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সব চেয়ে খাঁটি, সব চেয়ে নির্ভুল এবং সব চেয়ে একনিষ্ঠ জাতীয় নেতা। জনগণের সুর্ব বৃহৎ অংশের প্রতিভূ হয়ে তিনি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাত করেছেন শত্রুকে। লু স্যুনের পথ চীনা জাতির নতুন সংস্কৃতির পথ।

—মাও সে-তুঙ

সময়টা ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি। গরম কাল। একদিন অপরাহ্নে এক শিক্ষকদম্পতির আবির্ভাব হল আমার বাসায়। তাঁরা আমায় দুটি অনুরোধ করলেন : প্রথমটি হল—"তা তাও" (মহান পথ) নামে একখানি প্রকাশিতব্য নতুন সাময়িক পত্রিকায় লিখতে হবে এবং চাঁদা দিতে হবে; পত্রিকাখানি নিয়োজিত হবে এশিয়ার পরাধীন মানুষের আলোচনায়। তাঁদের অন্য অনুরোধটি হল—একটি বিদেশী রেস্তোরাঁ ভাড়া করা সম্বন্ধে। সেখানে লু স্যুনের পঞ্চাশোত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁকে অভিনন্দন দেওয়া হবে এবং সান্ধ্যভোজের ব্যবস্থা করা হবে। লু স্যুন সেই মস্ত লেখক—চীনারা যাঁকে বলতেন "চীনের গোর্কি"। আমার কিন্তু মনে হয় বাস্তবিক পক্ষে তিনি ছিলেন চীনের ভল্‌তেয়র।

তাঁদের প্রথম অনুরোধ সম্পর্কে আমি তখুনি রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু দ্বিতীয়টা ছিল কিছুটা বিপজ্জনক। কারণ, প্রস্তাবিত সভায় যে শ'খানেক নর-নারী নিমন্ত্রিত হয়ে আসবেন তাঁরা সবাই ছিলেন "বিপজ্জনক চিন্তারাজ্যের" প্রতিনিধি। শিক্ষকদম্পতি অবিশ্যি আমাকে এ আশ্বাস দিলেন যে, নিমন্ত্রিতদের সকলকে মুখে মুখেই জানানো হবে এবং তাঁরা নীরব থাকার প্রতিশ্রুতি

দেবেন; তাছাড়া রেস্তোরাঁয় আসার পথে প্রতিটি চৌরাস্তার মোড়ে সতর্ক পাহারা মোতায়েন থাকবে।

জন্মোৎসবের দিন বিকেলবেলা শহরের ফরাসী এলাকায় একটি ওলন্দাজ রেস্তোরাঁর বাগানের গেটের কাছে দুটি বন্ধুর সঙ্গে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। ওখান থেকে গোটা লম্বা রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল—ঐ পথেই অভ্যাগতরা আসবেন। আমার সামনের চৌরাস্তার মোড়ে ঝোলা পাউন পরা একটি চীনা ভদ্রলোক যেন বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন এবং আর একজন পাশাপাশি একটি বাড়ির সিঁড়িতে বসেছিলেন।

লু স্থন এসে পৌছলেন আগে আগেই, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী এবং বাচ্চা ছেলেটি। এই আমি প্রথম দেখলাম সেই মানুষটিকে, যিনি আমার চীন প্রবাসের সমস্ত বছরগুলি জুড়ে আমার জীবনে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। রোগা ছোটখাটো মানুষটি, গায়ে ছিল তাঁর ক্রীমরঙের রেশমী জোব্বা, পায়ে নরম চীনে জুতো। মাথায় টুপি ছিল না, ছোট ছোট করে ছাঁটা খাড়া খাড়া চুল দেখাচ্ছিল বুরুশের মত। মুখের চেহারা তাঁর সাধারণ চীনাদেরই মত, তবু আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁর সেই উদ্দীপিত মুখ—যে রকমটি আমি আর কখনও দেখি নি। এক ধরনের জীবন্ত বুদ্ধিমত্তা ও সচেতনতা সে মুখ থেকে যেন ক্ষরিত হয়ে পড়ছিল। ইংরেজি তিনি জানতেন না, দখল ছিল জার্মান ভাষায়, ঐ ভাষাতেই আমাদের কথাবার্তা হল। তাঁর আচরণ, তাঁর কথাবার্তা, তাঁর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি থেকে ক্ষরিত হয়ে পড়ছিল আশ্চর্য সুসংহত এক ব্যক্তিত্বের মাধুর্য ও এমন এক সুসামঞ্জস্য, যা বলে বোঝান যায় না। হঠাৎ নিজেকে আমার কেমন যেন অস্বচ্ছন্দ ও অসাব্যস্ত বলে মনে হল।

প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই অভ্যাগতরা আসতে থাকলেন এবং লু স্থন গেলেন বাগানের দিকে। আমি বার বার তাঁকে ফিরে ফিরে দেখতে লাগলাম, তাঁর রোগা রোগা হাতটার আন্দোলিত ভঙ্গি আমার দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ করে নিচ্ছিল।

অভ্যাগতরা ভেতরে ঢুকলেন। সঙ্গী বন্ধু দুটি বলছিলেন যে, এঁদের মধ্যে আছেন লেখক, শিল্পী, অধ্যাপক, ছাত্র, অভিনেতা, সংবাদপত্রের সংবাদদাতা, রিসার্চ স্কলার, এমনকি দুজন অভিজাত-বংশীয়ও। এই অভিজাত বংশীয় জোড়াটি লু স্থনের মতামত সমর্থন করতেন বলে যে এসেছিলেন তা

নয়, এসেছিলেন তাঁর সংহত ব্যক্তিত্ব, সাহস এবং বিদ্যাবত্তাকে সম্মান দেখানোর জন্যেই।

মজলিশটি ছিল খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। দেশের চিন্তা-বিপ্লবে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, সমায়েত হয়েছিলেন এমনি নানা ধরনের মানুষ। জীর্ণ সাজসজ্জা ও স্পষ্টই বোঝা যায় যে আধপেটা খেয়ে থাকেন এমন একদল লোক এলেন, শুনলাম ওঁরা আধুনিক ও রুচিসম্পন্ন রঙ্গমঞ্চের রূপকার ও প্রতিনিধি—ওয়াইল্ড্-এর "সালোমে" ও "লেডি উইণ্ডারমিয়ারের হাতপাখা" জাতীয় নাটকের ফাঁকে ফাঁকে সামাজিক সমস্যাপূর্ণ নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছেন ওঁরা। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চেহারার আর একটি দল এল, এঁরা ফুতান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র; এদের এনেছেন অধ্যাপক হুঙ্ শেঙ্। এঁরা ইবসেনের কিছু নাটক অভিনয় করেছেন এবং উক্ত অধ্যাপকের লেখা কয়েকটি নাটকও মঞ্চস্থ করেছেন। উক্ত অধ্যাপকটি হলেন আবার চীনের প্রথম চলচ্চিত্র কোম্পানিগুলির একটির চিত্র-পরিচালক। আগত মঞ্চশিল্পীদের তৃতীয় দলটি ছিল বামপন্থী অভিনেতা, লেখক ও অনুবাদকদের নিয়ে গঠিত—এঁরা রোঁমা রোলাঁ্যা, আপটন সিনক্লেয়ার, গোর্কি ও রেমার্কের নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। সর্বশেষ তাঁরা "কারমেন" নাটক মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ের তৃতীয় দিনে পুলিস গিয়ে হামলা করে, কিছু ধরপাকড় হয়, তারপর অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। দর্শকদের মধ্যে যে সমস্ত গোয়েন্দা বসেছিল তারা নাকি এর শেষ দৃশ্যটা সহ্য করতে পারে নি—যেখানে ডন্ যোশে কারমেনকে ছুরি মেরে হত্যা করল: কারমেন তার প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের দিকে হাতের আংটিটা ছুঁড়ে দিয়ে যে কথাগুলি বলে চিৎকার করে উঠেছিল তা নাকি তাদের মনে পড়িয়ে দিয়েছিল কমিউনিস্ট ও কুয়োমিনটাঙ-এর বিচ্ছেদের কথা!

বাগানের ফটকের কাছে যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে এবার দেখতে পেলাম বেশ কয়েকজন আসছেন এদিকে। একজনকে দেখলাম—বেশ লম্বা আর রোগা রোগা, তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছেন এবং বারে বারে দেখছেন পেছন ফিরে ফিরে। তাঁকে স্পষ্টতই ছাত্রের মত দেখতে। আমার সামনে দিয়ে চলে গেলেন তিনি। সঙ্গী বন্ধুটি ফিসফিস করে বললেন যে, ইনি হলেন "সাংহাই পাও" কাগজের সম্পাদক। কাগজটি কমিউনিস্টদের, গোপনে বে-আইনীভাবে প্রকাশিত হয় এবং শহর অঞ্চলে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক ধরনের গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা করে। এর কিছুক্ষণ

পরেই আর একজন এলেন। বিদেশী পোষাকে তাঁর অসংখ্য তাঁজপড়া, মাথার চুলগুলি এলোমেলো, অবাধ্য। কয়েক মাস কারাভোগের পর সবে-মাত্র জেল থেকে বেরিয়েছেন তিনি। চীনের রেড-এড সংঘের প্রতিনিধি বলে তাঁকে সন্দেহ করা হয়েছিল। অভিযোগটা অবিশ্যি সত্যি; কিন্তু ঘুষের মোটা অঙ্কটা তার চেয়েও বড় সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। মুক্তির জন্যে তাঁর কারারক্ষকদের ঘুষের খাতে তাঁর পরিবারকে প্রায় গোটা একটা সম্পত্তিই বিলিয়ে দিতে হয়েছে।

বাগানটি তখন অভ্যাগততে ভরে গেছে। আর নতুন কেউ অবিশ্যি আসছিল না, তবু আমি ও আমার সঙ্গী বন্ধুটি খাড়া দাঁড়িয়ে রইলাম প্রহরায়। তারপর অন্ধকার যখন ঘন হয়ে এল এবং অভ্যাগতদের অর্ধেক প্রায় চলে গেলেন, কয়েকজন তখন আমাদের জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। বাকি অভ্যাগতদের সঙ্গে আমরা রেস্তোরাঁর ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম।

ভোজের পর বক্তৃতা শুরু হল। বন্ধুটি আমাকে অনুবাদ করে বুঝিয়ে যাচ্ছিলেন। রেস্তোরাঁর ওলন্দাজ মালিক চীনা ভাষা জানত না, তার সম্বন্ধে তাই দুর্ভাবনার কিছু ছিল না। তবে চীনা ওয়েটারের দল নিবিষ্ট হয়ে শুনছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সেই এলোমেলো চুল যাঁর মাথায়—তিনি যখন জেলের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট দিচ্ছিলেন তখন ওয়েটারদের প্রতিটি চলাফেরার উপর আমরা নজর রাখছিলাম। এঁর বলার পরে উঠলেন "সাংহাই পাও"র সেই সম্পাদক। তাঁর মুখেই আমি প্রথম শুনলাম লাল-ফৌজের জন্মের সঠিক তথ্য এবং কৃষকদের "ফসলের জন্যে" সেই "সশস্ত্র অভ্যুত্থানের" কাহিনী—যে সময়ে জমিদারদের সঙ্গে তারা লড়াই করেছে ও তারপর অজস্র শাখানদীর মত এসে মিশে গেছে লালফৌজ বাহিনীর ক্রমবর্ধমান স্রোতধারায়।

এরপর উঠলেন বেঁটে খাটো ভারিক্কি মত একজন মহিলা। চুলগুলি তাঁর বব্ করে ছাঁটা। তিনি বললেন প্রোলেটারিয়ান সাহিত্যের বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা। তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন তিনি লু স্বনকে আহ্বান জানিয়ে। বললেন—লু স্বন হোন নবগঠিত বামপন্থী লেখক লীগ ও বামপন্থী শিল্পী লীগের রক্ষক ও "গুরু"। প্রথম দিককার এই দুটি লীগ পরে "চীনের সাংস্কৃতিক ফেডারেশন" নামে সংগঠিত হয়।

লু স্বন শুনে যাচ্ছিলেন আগাগোড়া গভীর মনোযোগ দিয়ে। যখনই

যিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তাঁর দিকে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পড়ছিল তাঁর সতর্ক মনোযোগ। আর এই সময়টায় সারাক্ষণ ধরে তাঁর তর্জনী আঙুলটি আস্তে আস্তে খুঁজছিল চায়ের কাপের হাতলটা। সকলের বক্তৃতা যখন শেষ হল তখন উঠলেন তিনি, বলতে শুরু করলেন খুব শান্তভাবে। পঞ্চাশ বছর জুড়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে ওলটপালট চলেছে—তিনি বললেন তার কাহিনী; এ তাঁর জীবনেরও কাহিনী—ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু চীনের কাহিনী এ।

তিনি জন্মেছিলেন মাঞ্চু সাম্রাজ্যের আমলে গরীব, পণ্ডিত এক গ্রাম্য-পরিবারে। বড় হয়ে উঠেছিলেন সামন্ত-সমাজব্যবস্থার ভেতরে। ১৯১১ সালের আগেকার প্রথম গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা তাঁর ওই পরিবেশে এসে প্রবেশ করেছিল খুবই ধীরে ধীরে। পাশ্চাত্যে গিয়ে পড়াশোনা করবার মত সঙ্গতি ছিল না তাঁর। অগত্যা গেলেন তিনি চীনের তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের প্রতি দরদী দেশ, জাপানে। তাঁর পাঠ্য বিষয় ছিল আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান। তবু টলস্টয়ের রচনাবলীর যে প্রথম অনুবাদ হয় জাপানী ভাষায় তা তিনি পড়ে ফেলেছিলেন। টলস্টয়ই তাঁকে পরিচিত করান সামাজিক সমতামূলক চিন্তার সঙ্গে, তাঁর লেখা থেকেই তিনি উপলব্ধি করেন—আধুনিক সাহিত্যের শক্তি কী দুরন্ত।

চীনে ফিরে এলেন তিনি নব্য ডাক্তার হয়ে। কিন্তু চিকিৎসা করতে গিয়ে শীঘ্রই তিনি পাশ্চাত্যের ডাক্তারদের মতই দেখতে পেলেন—সমস্ত রোগ ব্যাধির মূলে আছে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যজাত আনুষঙ্গিক অজ্ঞতা। আধুনিক চিকিৎসার খরচ যোগান দিতে পারে শুধু ধনীরাই। রুশিয়ার ক্লাসিক্যাল লেখকদের প্রভাবে তিনি হাত দিলেন সাহিত্যে এবং তাকেই অস্ত্র হিসেবে হাতে তুলে নিয়ে লড়তে নামলেন তিনি সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে। ক্লাসিক্যাল রুশ সাহিত্যের স্টাইলে তিনি গল্প লিখতে শুরু করলেন এবং ক্রমে ক্রমে ডাক্তারি ব্যবসায় একেবারে ছেড়েই দিলেন। চীনের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের সময়ে নব্যচিন্তার জন্মভূমি পেকিং-এ তিনি করতেন সাহিত্যের অধ্যাপনা।

পরবর্তীকালে তিনি জার্মান ও রুশভাষা শিখতে শুরু করেন এবং রুশিয়ার কিছু উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলী অনুবাদ করে ফেলেন। তাঁর কথায়—তাঁর তখন উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক সামাজিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলিকে চীনের যুবশক্তির কাছে তুলে ধরা। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও তিনি পাশ্চাত্যের

প্রাচীন ও নবীন নিদর্শনগুলি ও হস্তলিপি (গ্র্যাফিক)-শিল্পের নিদর্শনগুলিকে সংগ্রহ করতে শুরু করে দেন এবং নবীন চিত্রশিল্পীদের জন্যে কয়েক খণ্ডে তা প্রকাশও করেন।

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন যে, প্রোলেটারিয়ান সাহিত্যের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে তাঁকে এখন আহ্বান করা হচ্ছে এবং কিছু কিছু তরুণ বন্ধু তাঁকে প্রোলেটারিয়ান সাহিত্যের লেখক হওয়ার জন্যে পীড়াপিড়ি করছেন। তিনি বললেন যে, তাঁকে প্রোলেটারিয়ান সাহিত্যের লেখক বলে ভান করলে খুব ছেলেমানুষী হবে। তাঁর রচনার আসল ভিত্তি হল গ্রাম—গ্রামের কৃষকজীবন এবং তার সাংস্কৃতিক জীবন। চীনের বুদ্ধিজীবী যুবকেরা শ্রমিক ও কৃষকের জীবন সম্বন্ধে, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে বর্তমান অনভিজ্ঞতা নিয়েই যে প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য সৃষ্টি করবেন—এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। সৃষ্টিশীল রচনার জন্ম হবে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে, কোন বাঁধাধরা নীতিবাক্যি নয়।

বরং তিনি চীনের যুবশক্তির কাছে পৌঁছে দেবেন পাশ্চাত্য সাহিত্য ও শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি। তরুণদের সব রকমে সহায়তা করা সম্পর্কে তিনি সব সময়ে প্রস্তুত—যাকে তাঁর তরুণ বন্ধুরা বলেছেন তাঁদের "গুরু" হওয়া। কিন্তু রক্ষক হওয়া? তা কে পারে এখন!—এই রকম একটা রাষ্ট্রব্যবস্থায়—যেখানে সামাজিক সাহিত্যের খুব নরম গোছের নিদর্শনকেও বলা হয় অপরাধমূলক! "গুরু" হিসেবে তিনি শিক্ষিত যুবকদের আহ্বান জানালেন—অগ্রসর হয়ে আসুন তাঁরা শ্রমিক ও কৃষকের জীবনের অংশীদার হতে। জীবন থেকে সংগ্রহ করুন তাঁরা সাহিত্যের উপাদান। কিন্তু শিল্প-আঙ্গিকের জন্যে পাশ্চাত্যের সামাজিক সাহিত্য ও শিল্প তাঁদের অনুশীলন করতে হবে।

সভা যখন শেষ হয়ে গেল তখন একটি যুবক আমার দিকে ঝুঁকে এসে হতাশভাবে মাথা নাড়লেন:

"খুবই হতাশ করলেন উনি—নয় কি? মানে, আমি বলছি প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য সম্পর্কে ওঁর দৃষ্টিভঙ্গির কথা। যুবকদের খুবই হতাশ করলেন।"

শুনতে শুনতে পেশাদার বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আমার স্বভাবগত বিরূপতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। চীনের বুদ্ধিজীবীরা কখনো কায়িক পরিশ্রম করেন নি এবং লেখা তাঁদের কাছে অভিজ্ঞতা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন একটি

পেশা মাত্র। তাঁদের কাছে এমনকি "যুবশক্তি" কথাটির মানে হল শুধু ছাত্র এবং শ্রমিক কৃষকের প্রতি তাঁদের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা দরদী হলেও সেটা হল উঁচু থেকে নিচুর দিকে। সে-সময় পর্যন্ত তাঁরা ওই "প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য" বলে যা কিছু লিখেছিলেন তার বেশির ভাগই ছিল কৃত্রিম, রুশ সাহিত্যের ব্যর্থ দুর্বল অনুকরণ।

তরুণ সমালোচকটিকে জানালাম যে, লু স্যুনের মতামত আমি পুরোপুরি সমর্থন করি।

লু স্যুন এবং তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মাও তুন-এর সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়লাম ধীরে ধীরে। আমরা তিন জনে মিলে জার্মান লোক-শিল্পী কাথে কোল্‌উইৎসের আঁকা এচিংগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করলাম। তাছাড়া, সে সময়ে চীনের বুদ্ধিজীবীদের ক্ষতিকারক রাজনীতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে-সব আবেদন বিবৃতি প্রভৃতি লেখা হত পাশ্চাত্য জগতে প্রচারের জন্যে তার প্রায় সবগুলিই লিখতাম আমরা তিনজনায়। প্রায়ই হয়ত মাও তুন ও আমি মিলিত হতাম কোনো রাস্তার কোণায়। তারপর লু স্যুন যে রাস্তায় থাকতেন তা সতর্কভাবে দেখে শুনে তাঁর ঘরে গিয়ে কাটিয়ে আসতাম কোন কোন সন্ধ্যা। রেস্তোরাঁয় দিয়ে আসতাম খাবারের অর্ডার—তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত আলোচনায়। কেউই আমরা কমিউনিস্ট ছিলাম না। তবু যাঁরা গরীবের মুক্তির জন্যে লড়ছেন, প্রাণ বলি দিচ্ছেন তাঁদের সমর্থন ও সহায়তা করাকে আমরা চূড়ান্ত সম্মানের কাজ বলে মনে করতাম। চীনের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের কাছে লু স্যুন ছিলেন সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত, ছিলেন তাঁদের "শিক্ষক" অথবা "গুরু"। এই যুবকদের মধ্যে ছিল তখন প্রচুর দলাদলি এবং প্রত্যেক দলই চাইত তাঁকে তাদের পক্ষে, তাদের "মতে" নিয়ে আসতে। লু স্যুন ছিলেন এ-সমস্তের ঊর্ধ্বে। এই দলাদলির ক্ষুদ্রতার মধ্যে নিজেকে তিনি পক্ষভুক্ত করতে চাইতেন না। সকলেরই কথা শুনতেন তিনি, আলোচনা করতেন তাঁদের সমস্যার, সমালোচনা করতেন তাঁদের লেখা নিয়ে এবং দিতেন উৎসাহ। তাঁরা যে-সব পত্রিকা প্রকাশ করতেন তার প্রথমেই থাকত লেখক লু স্যুনের নাম। লু স্যুন প্রায়ই আমাকে বলতেন তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার সঙ্কল্পের কথা—তাঁর নিজের জীবনকে অবলম্বন করে; কিন্তু সামাজিক প্রতিক্রিয়ার যে পঙ্কিলতায় তাঁর স্বদেশ ডুবে যাচ্ছিল তার মধ্যে তিনি যেন হাঁফ ছাড়বার সময়

পাচ্ছিলেন না। "নির্বিরোধ মানুষের নির্বিচার হত্যা" এবং মানুষের অধিকার হরণের প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল এমনি অপরিসীম যে, এই সময় থেকে তিনি লিখতে শুরু করলেন শুধুই রাজনৈতিক সমালোচনা—তাঁর কলম হল এক সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার, তীক্ষ্ণধার ছোরার মত।

চীনের সমস্ত লেখকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন চীনের ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সবচেয়ে গভীরভাবে জড়িত। তাঁর লেখা কিছু কিছু "রাজনৈতিক সমালোচনা" ইংরেজিতে অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কারণ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সোজাসুজি লড়াই করতে না পেরে মতপ্রকাশের উপায় হিসেবে তিনি তাঁর লেখায় চীনের অন্ধকারতম অতীতের ব্যক্তিত্ব, ঘটনা এবং ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করতেন। প্রত্যেকটি শিক্ষিত মানুষই বুঝতে পারত যে, তিনি বর্তমানের যথেচ্ছাচারকে তুলনা করছেন অতীতের স্বেচ্ছাচারের সঙ্গে। এই সমস্ত রাজনৈতিক সমালোচনায় ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকত চীনা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমৃদ্ধির ধারা—লেখার ভঙ্গি যেন এচিংয়ের মত সূক্ষ্ম। তিনি পরের পর সাহিত্য-পত্রিকাগুলিকে জনসাধারণের কাছে পরিচিত করে গেছেন—আর একের পর এক সেগুলির কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। এই পত্রিকা-পরিচিতিগুলি রচনা-সৌষ্ঠবে ও সুসংহত গাম্ভীর্যে ছিল তাঁর জয়পতাকার মত উড্ডীন। তাঁর কাছে চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছিল মানুষের সমস্ত কীর্তির সার কথা। তাঁর লেখার ভঙ্গি ছিল এমনি এক বিশেষ ধরনের যে কোন ছদ্মনামই আসল পরিচয় ঢেকে রাখতে পারত না। সেন্সারে কেটেকুটে তাঁর লেখাগুলি শেষ পর্যন্ত বেরুত কিম্ভূতকিমাকার হয়ে। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত লেখক, সম্পাদক এবং শিল্পীরা কোন সূত্র না রেখেই হঠাৎ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেতেন চিরকালের মত; শুধু তাঁর বয়স ও খ্যাতি তাঁকে বাঁচিয়েছে গারদের হাত থেকে। তাঁর রচনার পুরোপুরি সবটুকু শুধু জাপানের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরাই ছাপতে পেরেছেন কয়েক বছর ধরে। জাপানের বুদ্ধিজীবীদের কাছে তিনি ছিলেন চীনের সবচেয়ে সম্মানিত ও খ্যাতিসম্পন্ন লেখক।

তাঁর সহকর্মী শিষ্যদের এই সহসা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাপার অথবা তাঁদের মৃত্যু লু স্যুনের দেহে ও মনে সৃষ্টি করল বিষের মত প্রদাহ—তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকলেন। মাঝে মাঝে এমনই অসুস্থ হয়ে পড়তেন তিনি যে, উঠতে পর্যন্ত পারতেন না। তিনি বুঝতে পারলেন—তাঁর হৃদযন্ত্রের

কাজ বন্ধ হয়ে আসছে। তখন সাংহাইয়ের শ্রেষ্ঠ বিদেশী ডাক্তারকে দেখানোর জন্যে তাঁকে সম্মত করা গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন, তারপর একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে জানালেন, যক্ষ্মায় মরণাপন্ন তিনি। শুকনো ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সুদীর্ঘ বিশ্রামই কেবল তখন তাঁর রোগবৃদ্ধি বন্ধ করতে পারে। ডাক্তার আরও বললেন: "কিন্তু আমার উপদেশ তো উনি শুনবেন না। এই সমস্ত সেকেলে অজ্ঞ চীনেরা আধুনিক ওষুধবিষুধে বিশ্বাসই করে না।"

লু সুন অবিশ্যি ডাক্তারের উপদেশ শোনেন নি, তার কারণ এ নয় যে তিনি ছিলেন সেকেলে বা অজ্ঞ। আমাদের কাছে তিনি অভিযোগ করে বলতেন: "আর সবাই যখন লড়াই করছে, মারা যাচ্ছে তখন আপনারা আমাকে সারা বছর ধরে শুয়ে পড়ে থাকতে বলেন?" আমরা যখন তাঁর কথার যোগ্য জবাব দিয়ে চেপে ধরতাম তখন তিনি মনে করিয়ে দিতেন তাঁর দারিদ্র্যের কথা। তবু আমরা যখন বলতাম প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহের কথা তখন তিনি সোজা না-করে বসতেন। ম্যাকসিম গোর্কি তাঁকে সোভিয়েট ইউনিয়নে যাওয়ার আমন্ত্রণ পাঠান—বছর খানেকের মত তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে সেখানে থাকবার জন্যে, তাতেও তিনি রাজি হলেন না। তিনি বললেন, তাহলে কুওমিনটাঙ সরকার এখুনি চিৎকার করে সারা চীনে প্রচার করবে যে আমি "মস্কোর টাকা" খাচ্ছি।

"ও কথা তারা এখনও বলে", আমি বললাম।

"সে সাহস তাদের নেই", তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, "সকলেই জানে তারা মিথ্যে কথা বলে। সে যাই হোক, চীনে এখন আমার থাকা দরকার। আমি কিছুতেই যেতে পারি না।"

আমরা বৃথাই খানিকটা অনুনয়বিনয় করলাম।

"সবাই পালালে চলে না।" তিনি বললেন, "লড়াই করবার জন্যে নিশ্চয়ই কাউকে থাকতে হবে বৈকি!"

১৯৩০ সালের শেষের দিকে কয়েক সপ্তাহের বিশ্রামের জন্যে আমি ফিলিপাইনে যাই। যাওয়ার আগের দিন রাত্রে লু সুন এবং আরও তিন জন নবীন লেখক আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁদের সঙ্গে সন্ধ্যেটা কাটাবার জন্যে। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক জৌ শি। লু সুনের

বন্ধু ও ছাত্রদের মধ্যে সম্ভবত তিনি ছিলেন সব চেয়ে কর্মক্ষম এবং লু স্যুনের সবচেয়ে প্রিয়। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে ফিরে এসে আমার সেক্রেটারী ফেঙ্‌'দার মুখে শুনলাম ইতিমধ্যে ২৪ জন তরুণ সাহিত্যিক, শিল্পী ও অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারী মাসের ২১ তারিখ রাত্রিতে তাঁদের গারদ থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে জোর করে নিজেদের কবর খোঁড়ানো হয় এবং গুলি করে হত্যা করা হয়। কয়েকজনকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হয়। জৌ শিও ছিলেন এঁদের মধ্যে।

তাড়াতাড়ি ছুটলাম লু স্যুনের বাড়ি। দেখলাম—পড়ার ঘরে বসে আছেন তিনি। মুখটা থম্‌থম্ করছে, এক গাল দাড়ি, মাথার চুল এলোমেলো, গাল ছুটো বসে গেছে, চোখ ছুটি জ্বরতপ্ত। কণ্ঠস্বরে তাঁর ফেটে পড়ছে সুতীব্র ঘৃণা।

রেখাচিত্রের মত আঁকা একখানা পাণ্ডুলিপি আমার হাতে তুলে দিয়ে তিনি বললেন, "যে রাত্রিতে ওঁদের খুন করা হল সেই রাত্রিতে লিখেছি এই প্রবন্ধটা। নাম দিয়েছি—'গভীর রাত্রির লেখা'। এটা ইংরেজিতে অনুবাদ করে বাইরের জগতে প্রকাশ করুন।"

তিনি তাঁর লেখাটির বক্তব্য বুঝিয়ে বলার পর আমি তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিলাম—এটা প্রকাশিত হলে তাঁকেও হয়ত মেরে ফেলা হবে।

"কী আসে যায় তাতে!" তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন, "কাউকে তবু কথা বলতে হবে তো!"

সেদিন চলে আসার আগে এই শিল্পী সাহিত্যিকের হত্যা সম্পর্কে আমরা ছ-জনে মিলে একটি ইশতেহার তৈরি করলাম পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে। তারপর গেলাম মাও তুনের কাছে। মাও তুন সেটার এক-আধটুকু সংশোধন করে দিলেন এবং ইংরেজি অনুবাদে আমাকে সাহায্য করলেন খানিকটা। এই ইশতেহারে কাজ হল। বিদেশ থেকে প্রথম প্রতিবাদ এল। চীনের সাহিত্যিকদের হত্যা করার জন্যে আমেরিকা থেকে পঞ্চাশ জনেরও বেশি শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিক প্রতিবাদ পাঠালেন। পাশ্চাত্যের দেশগুলি এই জঘন্য ব্যাপারটা যে সমর্থন করল না এতে কুওমিন্‌টাঙ্‌ সরকার যেন কিছুটা হকচকিয়ে গেল।

"গভীর রাত্রির লেখা"—লু স্যুনের এই প্রবন্ধটি পাশ্চাত্যের কোন দেশেও আজ পর্যন্ত ছাপা হয় নি। লেখাটি এখনও আমারই কাছে আছে। চীনে আমি

যত কিছু পড়েছি তার মধ্যে এই লেখাটিই আমার মনে করেছে গভীরতম রেখাপাত। এটি যেন আবেগোন্মত্ত এক চিৎকার, লেখা হয়েছে চীনের ইতিহাসের অন্ধকারতম এক নিশীথে। লেখাটি শুরু হয়েছে এই ভাবে :

> কেউ হয়ত হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর এই মৃত্তিকার উপরে কাগজ পোড়া একগাদা ছাইয়ের কিংবা ধ্বসে পড়া দেয়ালের গায়ে ক্ষুরে ক্ষুরে আঁকা ছবির পাশ কাটিয়ে চলে যাবে, ফিরেও চাইবে না। তবু এর প্রত্যেকটিই ভালবাসা, গভীর বিচ্ছেদ অথবা মর্মান্তিক ক্রোধে মুখর—মানুষের কল-কণ্ঠ যা কোনদিন প্রকাশ করতে পারে না।

"উন্মত্ত পৃথিবীর মৃত্তিকার উপরে একগাদা ছাই" এই কথাটিতে তিনি চীনের শব সৎকার করার রীতিকেই বুঝিয়েছেন—যাতে মৃতের আত্মার উদ্দেশে কাগজ পোড়ান হয়। তারপর তিনি কীথ কোলউইৎস্-এর আঁকা কাঠখোদাই "আত্মবলি" ছবিটির উল্লেখ করেছেন। ছবিটিতে বিশীর্ণ এক জননী দু'হাতে তুলে ধরেছে তার মৃত শিশুকে; মৃত্যুর কাছে এ যেন জনসাধারণের উপচার। লু সুনের কাছে ঐ মৃত শিশুটি হল ২৪ জন নিহত শিল্পী সাহিত্যিকের প্রতীক। তিনি আরও লিখেছেন :

> সেকালে চীনে যখন কোন বন্দীকে মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হত তখন সাধারণত তাকে নিয়ে যাওয়া হত এমন এক বড় রাস্তা দিয়ে যেখানে মানুষের আনাগোনা খুব বেশি। বন্দীকে "ইউয়েন ওয়াং" বলে চিৎকার করে ওঠার অধিকার দেওয়া হত—সে পারত নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করতে, বিচারককে গালাগালি দিতে, ঘোষণা করত সে নিজের বীরত্বের কীর্তিকলাপ এবং মৃত্যুকে যে সে ভয় করে না—এ জাহির করার সুযোগ ছিল তার। হত্যার মুহূর্তে দর্শকরা প্রশংসায় হাততালি দিত এবং তার সাহসের কথা ছড়িয়ে পড়ত চারদিকে। এই ধরনের ব্যাপারটাকে তরুণ বয়সে আমি ভাবতাম অত্যন্ত বর্বর ও নিষ্ঠুর প্রথা বলে। এখন আমার বোধ হয়—এই প্রথা চালু রেখেছিল অতীতের যে-সব শাসক তারা ছিল ঢের বেশি সাহসী; নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে ছিল তাদের সুদৃঢ় আস্থা। এমন কি আমার এও মনে হয়, এই প্রথায় দণ্ডিতের প্রতি ছিল কিছুটা করুণার আভাস, কিছুটা ঔদার্য।

তারপর তিনি তাঁর তীক্ষ্ণধার ছুরি ঘুরিয়ে ধরেছেন চু তাঙের দিকে। এই লেখকটি ডুবে ছিলেন তাঁর চরম আত্মপ্রসাদে। ডক্টর লিন য়ু-তাঙ-এর

পত্রিকা "ইউ চৌ ফ্যাঙ"-এ এক প্রবন্ধে এই লেখকটির এ কথা বলার মত ধৃষ্টতা হয়েছিল যে, দণ্ডিতের প্রশংসা করা বা তার প্রতি দরদ দেখান যত উঁচু আদর্শ হতে পারে, তবে তা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর মোটেই না; কারণ, এতে দণ্ডদাতা যে বিজয়ী এ সত্য চাপা পড়ে যায়। লু স্যুন তাঁকে জবাব দিলেন চূড়ান্ত শ্লেষে, তারপর হত্যার নির্মমতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখলেন :

> আজ যখন আমি কোন বন্ধু বা ছাত্রের মৃত্যুর খবর শুনি এবং এ-ও শুনি যে, কেউই জানে না কেমন করে সে মারা গেল তখন শোকটা আঘাত করে বড় গভীরভাবে। সে শোক হয়ত এর চেয়ে হাল্কা হত যদি শুনতে পেতাম কেমন করে তাকে হত্যা করা হল তার বিবরণ। স্বল্পপরিসর অন্ধকার একটা কুঠুরিতে ঘাতক যাকে হত্যা করল তার নারকীয় নিঃসঙ্গতার কথা ভাবি আমি। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' প্রথমে পড়তে গিয়ে 'নরক বর্ণনা'র দৃশ্যে আমি চমকে উঠেছিলাম একদিন—নির্মমতার এ কী কল্পনা। আর আজ অনেক অভিজ্ঞতার পরে দেখছি, দান্তের কল্পনাও কত সাধারণ—তুচ্ছ! আজকের দিনে মানুষের চোখের অন্তরালে যে নির্মমতার অনুষ্ঠান চলেছে প্রতিনিয়ত তার গভীরে গিয়ে পৌঁছতে পারে নি দান্তের কল্পনা।

লেখাটির শেষের দিকে জুড়ে দিয়েছিলেন তিনি একটি চিঠি—যেটিকে সাক্ষাৎ "নরক-বর্ণনা"র অংশবিশেষ বলা চলে। চিঠিটি লিখেছিল আঠার বছরের একটি বন্দী। তাকে এবং আরও দুটি ছাত্রকে সাংহাই কলেজ থেকে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা লু স্যুনের প্রতিষ্ঠিত একটি দলের সভ্য ছিল—কাঠ-খোদাই শিল্পের অনুশীলন করত তারা। তাই কমিউনিস্ট এই অভিযোগে তাদের অভিযুক্ত করা হয়। লুনাচারস্কির একটি কাঠ-খোদাই চিত্র ছিল তাদের বিরুদ্ধে অন্যতম প্রমাণ। আজগুবি এক যুক্তিতে কাঠ-খোদাই শিল্পকে বলা হত কমিউনিস্টপন্থী। লু স্যুনকে গারদে পুরতে না পেরে সরকার গারদে ভরেছিল লু স্যুনের এই শিষ্যদের।

ছেলেটির চিঠির প্রথম ভাষণ হল—"গুরুদেব"। চিঠিতে বলে গেছে সে কদিনের কথা—তার বন্দী হওয়ার দিন থেকে প্রহরীকে ঘুষ দিয়ে লু স্যুনের কাছে যে রাত্রিতে চিঠি পাঠাল সে-রাত্রি পর্যন্ত। এই চিঠিতে বিশেষ করে বলেছে সে একজন কৃষকের উপরে অত্যাচারের কাহিনী।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হল—লালফৌজের সে একজন কমাণ্ডার। প্রত্যেক নখের ভেতরে তার পেরেক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নিঃশব্দে হাঁটু গেড়ে বসেছিল সে—মুখটা হয়ে গেছে যেন কাদা কাদা, নখ দিয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে রক্তের ফোঁটা।

"গুরুদেব, আমি যখন তার কথা ভাবি তখন বুক আমার বরফের মত হিম হয়ে যায়"—চিঠিতে এই বলে চিৎকার করে উঠেছে সে।

মাও তুন আর আমি অনুবাদ করছিলাম চিঠিটা। এইখানে এসে মাও তুন থমকে গেলেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন :

"হয়ত এ চিঠিটাও লেখা রাত যখন গভীর।"

"এতো সত্যিই গভীর রাত", আমি শুধু বললাম।*

অনুবাদ : সুশীল জানা

*Agnes Smedley-র বহুখ্যাত বই Battle Hymn of China-র Lu Hsün শীর্ষক পরিচ্ছেদের অনুবাদ।

যুগের হাওয়া

লু স্থন

নদীর ধারে চাষীবাড়ির খামারে অস্তগামী সূর্যের রশ্মি অপস্রিয়মান। নদীর পাড়ে ট্যালো গাছের রোদে-পোড়া পাতাগুলি তাজা হয়ে উঠছে, কাঁপছে শির্‌শির শব্দে—আর তারই তলায় এখানে-ওখানে নাচানাচি করছে পালে পালে মশা। খড়ে ছাওয়া চালাগুলোর চিমনি থেকে বেরিয়ে-আসা কালো ধোঁয়ার রেখা আরও ম্লান হয়ে এল। মেয়ে ও শিশুরা ব্যস্ত হয়ে পরিষ্কার জলের ছিটে দিচ্ছে সুমুখের দরজার সামনের আঙিনায় আর টেবিল ও টুল বার করে আনছে। সান্ধ্যভোজনের সময় উত্তীর্ণ।

বড়রা বসেছে টুলের ওপর, মস্ত মস্ত তালপাতার পাখা নাড়তে নাড়তে গল্পগুজব করছে। ছোটরা ছুটোছুটি করছে এদিক ওদিক কিংবা ঘুঁটি খেলছে ট্যালো গাছের তলায় উবু হয়ে বসে। বড় বড় বাটিতে ভাত আর তরকারি এনে রাখছে মেয়েরা—খাবারগুলো এখনো গরম, ধোঁয়া উঠছে। ছোট ছোট নৌকা ভাসছে নদীর ওপর। আর এই নৌকোতে যদি কোন কবি থাকেন তবে তাঁর মনে হবে যে চাষীদের জীবন স্বর্গীয় আশীর্বাদের মত।

কিন্তু এই ধারণাটা হত অপ্রাসঙ্গিক ও অসত্য কারণ বুড়ী ঠাকুমা নয়-চিন্‌-এর মন্তব্য কবি শুনতে পান নি। ঠিক সেই সময়ে বুড়ী ঠাকুমা নয়-চিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন, তালপাতার পাখাটা টুলের পায়াতে ঠুকতে ঠুকতে তিনি বলছেন, 'উনসত্তর বছর বয়স হল, একটা জীবনের পক্ষে যথেষ্টই বলতে হবে। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোর এই অধঃপতন চোখের ওপর না দেখতে পেলেই ভাল হত। মরে যাওয়াই উচিত ছিল আমার। এই দেখ না, নাকের ডগায় তৈরী খাবার সাজানো, সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই, মটরভাজা চিবোচ্ছে বসে বসে। এই না হলে সংসারের দুর্গতি হবে কেন?'

বুড়ীর নাতির মেয়ে ছয়-চিন মুঠোবোঝাই মটরভাজা নিয়ে টেবিলের দিকে আসছিল। কথাগুলো কানে যেতেই চট্‌ করে পেছন ফেরে, তারপর নদীর পাড়ের দিকে ছুটে গিয়ে গা ঢাকা দেয় একটা ট্যালো গাছের আড়ালে।

দুপাশ থেকে অবাধ্য চুলের গোছা এসে পড়েছে গালের ওপর, দুষ্টু মিতরা মুখ বাড়িয়ে বেশ জোর গলাতেই সে বলে, 'মর্ বুড়ী ডাইনী, মরিস না কেন ?'

বুড়ী ঠাকুমা নয়-চিঙ যে কালা ছিলেন তা একেবারেই নয়। কিন্তু কথাগুলো তিনি শুনতে পেলেন না, আপন মনেই বিড়বিড় করে বলে চললেন, 'দিন দিনই অধঃপতন হচ্ছে। বংশের কোন আমলের ছেলেমেয়েরাই তার আগের আমলের সমান নয়।'

এই গ্রামে একটা অদ্ভুত প্রথা আছে। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক শিশুকে কাঁটাযন্ত্রে ওজন করা হয়, আর ঠিক যত 'চিঙ' ওজন সেই সংখ্যাটি জুড়ে দেওয়া হয় নামের সঙ্গে। পঞ্চাশ বছর বয়স থেকেই বুড়ী ঠাকুমা নয়-চিঙের মেজাজটা খিট্‌খিটে হয়েছে। তিনি বলেন যে তাঁর ছোট বয়সে দিন কখনো এত গরম হত না, শুকনো মটর যে এত শক্ত হয় তাও একালেই। জগৎটা বদলে গেছে আর বদলে গিয়ে আরও খারাপ হয়েছে। ছয়-চিঙ তার বাপের ঠাকুর্দার চেয়ে তিন 'চিঙ' কম আর তার বাপের চেয়ে এক 'চিঙ' কম। এ হবেই। 'দিন দিনই অধঃপতন হচ্ছে। বংশের কোন আমলের ছেলেমেয়েরাই তার আগের আমলের সমান নয়,' কথাগুলো বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন তিনি।

এক ঝুড়ি ভাত নিয়ে বুড়ীর নাতবৌ অর্থাৎ সাত-চিঙের বৌ এল টেবিলের কাছে। ভাতের ঝুড়িটা টেবিলের ওপর রেখে ঝাঁজের সঙ্গে বলল, 'আবার সেই বকরবকর শুরু হয়েছে তো ? কিন্তু জন্মের সময় ছয়-চিঙের সত্যিকারের ওজন ছিল ছয় 'চিঙ' সাড়ে-ছয় 'লিয়াঙ'। আর ঐ কাঁটাযন্ত্রটা একেবারেই খারাপ। ওর এককে 'চিঙ' আঠারো 'লিয়াঙ'-এর সমান, ষোল 'লিয়াঙ' নয়—যা হওয়া উচিত। তখন যদি খাঁটি ওজনের কাঁটাযন্ত্র ব্যবহার করা হত তবে ওর ওজন হত সাত 'চিঙ'। আর কি জান, আমার খুব বিশ্বাস, যে কাঁটাযন্ত্রে ঠাকুর্দাকে ওজন করা হয়েছিল তার এককে 'চিঙ' ছিল চোদ্দ 'লিয়াঙ'-এর সমান…'

'দিন দিনই অধঃপতন হচ্ছে। বংশের কোন আমলের ছেলেমেয়েরাই তার আগের আমলের সমান নয়…'

সাত-চিঙের বৌ কিছু একটা কড়া উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখে যে একটা ছোট গলি থেকে বেরিয়ে সাত-চিঙ নিজেই আসছে। এক ঝট্‌কায়

সান্ত-চিত্তের দিকে ফিরে সে বলল, 'এই যে যাটের মড়া এসেছ, এত দেরি করে ফেরার অর্থটা কি শুনি? কোথায় থাকা হয়েছিল এতক্ষণ? এদিকে আমরা বসে আছি তোমার জন্যে, বাড়া ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

যদিও সান্ত-চিত্তের সারাটা জীবন এই গ্রামেই কেটেছে কিন্তু বহু দিন থেকেই তার মনে মনে এই দৃঢ় ধারণা যে গ্রামের অন্য সবার চেয়ে তার স্থান উঁচুতে। তার ঠাকুর্দার আমল থেকে আজ পর্যন্ত এই তিন পুরুষের কেউ হাল ধরে নি বা চাষ করে নি। তার সময় কাটে একটা বেসাতি ভিত্তিতে। দু চেন্ আর কাছাকাছি একটা শহরের মধ্যে ভিক্টিটার চলাচল, ভোর বেলা রওনা হয়ে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে। আর এইভাবেই বাইরের পৃথিবীর খবরাখবর কানে এসে পৌঁছয়।

কোথায় কে একটা বিছে মেরেছে, বিকটাকার বাচ্চা বিইয়েছে কোথাকার কোন্ মেয়ে—সব খবর সে-ই শোনে সবার আগে। সুতরাং স্বভাবতই গাঁয়ে সে রীতিমত তারিফী গোছের লোক। তাহলেও গাঁয়ের অনেক দিনের পুরনো নিয়ম যে দিনের আলো থাকতে থাকতে বাতি না জেলে সন্ধ্যার খাওয়া শেষ করে নিতে হবে। সুতরাং দেরি করে ফেরার জন্য তার বৌয়ের গঞ্জনা কিছুমাত্র দোষের হয় নি।

সান্ত-চিত্তের এক হাতে একটা দু'ফুট লম্বা পালিশ-করা বাঁশের পাইপ। পাইপের সঙ্গে লাগানো শ্বেতাভ পেতলের কল্‌কে আর হাতির দাঁতের মুখনল। মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে টেবিলের দিকে হেঁটে গিয়ে সে বসল একটা টুলের ওপর। হয়-চিত্ত এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল ট্যাংলো গাছের পেছনে, সুযোগ বুঝে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বাবার পাশে বসল। 'বাবা', ফিসফিস করে ডাকে সে কিন্তু ডাকের উত্তরে বাবার হাসিভরা মুখ দেখতে পেল না।

বুড়ী ঠাকুমা নয়-চিত্ত বললেন, 'ক্রমেই অধঃপাতে যাচ্ছে সব। কোন আমলের ছেলেমেয়েরাই তার আগের আমলের সমান নয়।'

মুখ তুলে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সান্ত-চিত্ত বলে, 'সম্রাট সিংহাসনে ফিরে এসেছেন।'

খবরটা শুনে সান্ত-চিত্তের বৌয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাবার মত অবস্থা। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, 'তাদই তো, বেশ হল, কি বল? দোষী এবং পাপীদের সম্রাট এবার ক্ষমা করবেন।'

আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সাত-চিঙ বলে, 'কিন্তু আমি আমার মাথার বেণী কেটে ফেলেছি।'

'সম্রাট কি চান যে সবার মাথায় বেণী থাকবে?'

'চান বৈকি।'

'তুমি কি করে জানলে?' অধৈর্য হয়ে বৌ জিজ্ঞেস করে।

'বাড়কপালে সরাইখানায় সবাই বলাবলি করছে।'

এবার সাত-চিঙের বৌ সত্যি সত্যিই ভয় পেল। 'বাড়কপালে' সরাইখানা হচ্ছে স্থানীয় সংবাদের কেন্দ্র। সাত-চিঙের নেড়া মাথার দিকে তাকিয়ে নিজের উৎকণ্ঠা চেপে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল তার পক্ষে। একটা বাটিতে ভাত নিয়ে বাটিটা স্বামীর দিকে একরকম ছুঁড়ে দিয়ে সে বলল, 'হয়েছে, ওভাবে গোমড়া মুখ নিয়ে বসে থাকলেই তো আর তোমার বেণী গজাবে না। বরং এগুলো গেল বসে বসে।'

অবশেষে সূর্যের শেষ আলো মিলিয়ে গেল। একটা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে ভাব নিঃসাড়ে ছড়িয়ে পড়ছে নদীর ওপর। খাবার কাঠির সঙ্গে বাটির ঠোকাঠুকির ধাতব শব্দ হচ্ছে একটানা। ছোট ছোট মুক্তার মত ঘামের ফোঁটা শিরশির করে নামছে মেরুদণ্ড বেয়ে, প্রত্যেকেই অনুভব করে সেটা। সাত-চিঙের বৌ নিজের বরাদ্দ তিন বাটি ভাত শেষ করল। বুকের ভেতরটা ধুকপুক করে লাফাচ্ছে, ট্যালো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সাত-চিঙের বৌ দেখে, দূরের একটা ছোট কাঠের পুল পার হয়ে চাও-সাত বেড়াতে বেড়াতে তাদের দিকেই আসছে। পরনে আসমানি ক্যালিকোর লম্বা জামা।

চাও-সাত হচ্ছে 'কুসুম' সরাইখানার মালিক, আশপাশের এলাকার মধ্যে একমাত্র লোক যার প্রতিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্য আছে। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ফলে তার চালচলনটা হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর মত। দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'ত্রিরাজ্য' বইখানির সব ক'টি খণ্ড তার আছে এবং প্রায়ই সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে এই বইটি পড়ে। ১৯১১ সালের বিপ্লবের পর থেকে সে বেণী পাকিয়ে পাকিয়ে ঝুঁটি করে রাখে মাথার ওপর। প্রায়ই সে বলে যে 'ত্রিরাজ্য' বইয়ের নায়ক চাও জেলুঙ বেঁচে থাকলে চারদিকের এত গোলমাল বিশৃঙ্খলা কিছুতেই হতে পারত না।

সাত-চিঙের বৌয়ের দৃষ্টি ভয়ানক রকম ধারালো। এত দূর

থেকেও সে দেখতে পেল যে চাও-সাত আজ বেণীর ঝুঁটি খুলে দিয়েছে, একপোছা কালো চকচকে সুন্দর চুল ছড়িয়ে পড়েছে পেছন দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তার আর কোন সন্দেহই থাকে না যে সম্রাট সিংহাসনে ফিরে এসেছেন এবং সম্রাট নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে প্রত্যেককে বেণী রাখতে হবে। তার স্বামীর অবস্থা যে কী ভয়ানক তাও বুঝতে বাকি থাকে না।

এই আসমানি জামা চাও-সাত কদাচিৎ পরে। গত তিন বছরে মাত্র দু-বার সে জামাটা পরেছে—একবার যখন তার শত্রু বসন্তের-দাগওয়ালা আ-কুয় ভয়ানক অসুখ করে আর একবার যখন বুড়োদাদা লু মারা যায়। বুড়োদাদা লু একবার তার সরাইখানার ভয়ানক ক্ষতি করেছিল। স্পষ্টই বোঝা যায় যে চাও-সাত আজ বিজয়গর্বে উৎফুল্ল।

আর সাত-চিণ্ডের বৌয়ের একথাও মনে পড়ে যে দু-বছর আগে একবার সাত-চিণ্ড মদ খেয়ে চাও-সাতকে গালাগালি দিয়ে বলেছিল—'দাঁওকষা দালাল'।

গাঁয়ের লোকেরা সবাই খেতে বসেছে। চাও-সাত একেক বাড়ির সামনে আসছে আর সে বাড়ির লোকেরা একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ভাতের বাটির দিকে ভাত খাবার কাঠি বাড়িয়ে গলা মিলিয়ে বলে উঠছে, 'সগুণ প্রভু, অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে কিছু আহার্য গ্রহণ করুন।' চাও-সাত কোথাও থামছে না, শুধু হাত নেড়ে বলতে বলতে আসছে—'চিন্ চিন্', শেষকালে সাত-চিণ্ড আর তার বাড়ির লোকেরা যে টেবিলে ভাত খাচ্ছিল সেখানে এসে সে থামে। তারাও সবাই উঠে দাঁড়িয়ে আহার্য গ্রহণের প্রার্থনা জানায় আর আগের মতই সে বলে, 'চিন্ চিন্।' তারপর সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে টেবিলের ওপরে সাজানো খাবারগুলো দেখতে থাকে।

'ওই শুকনো আনাজটা তো চমৎকার দেখাচ্ছে···হ্যাঁ, কোন খবরটবর শুনলে নাকি সাত-চিণ্ড?' কথাগুলো সে বলে সাত-চিণ্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে, সাত-চিণ্ডের বৌয়ের মুখোমুখি হয়ে।

'শুনছি সম্রাট নাকি সিংহাসনে ফিরে এসেছেন।' নীরস গলায় সাত-চিণ্ড জবাব দেয়।

সাত-চিণ্ডের বৌ চাও-সাতের দিকে তাকিয়ে হাসে।

'হ্যাঁ', সাত-চিণ্ডের বৌ বলে, 'সম্রাট সিংহাসনে ফিরে এসেছেন

শুনছি। আমার তো মনে হয় তিনি এবার দোষী ও পাপীদের ক্ষমা করবেন।'

'তা করবেন, সে আজই হোক বা দু-দিন পরেই হোক', মুখখানা অস্বাভাবিক রকম গুরুগম্ভীর করে চাও-সাত বলে, 'কিন্তু তুমি এ কি করেছ সাত-চিঙ, তোমার বেণী কোথায়? মাথার বেণী—তা ছেলাখেলার জিনিস নয়। তাইপিং বিদ্রোহের কথা মনে আছে তো? যারা মাথায় বেণী রেখেছিল তারা মাথা রাখতে পারে নি আর যারা মাথা রেখেছিল তারা মাথার বেণী রাখতে পারে নি…'

সাত-চিঙ আর তার বৌ দুজনেই অশিক্ষিত, সুতরাং এই প্রাচীন কাহিনীর অর্থ তারা ধরতে পারল না। কিন্তু এটুকু তারা জানে যে চাও-সাত একজন বিদ্বান লোক আর তার কথা কখনো মিথ্যে হয় না। আর একথাও তারা বুঝতে পেরেছে যে অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর, এখন আর কোন দিকে কোন উপায় নেই। দুজনেই নির্বাক হয়ে রইল—যেন তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে বা হঠাৎ একটা বাজ পড়েছে কাছাকাছি।

'দিনে দিনে সব রসাতলে যাচ্ছে। কোন আমলের ছেলেমেয়েরাই আগের আমলের সমান নয়…'বুড়ী ঠাকুমা নয়-চিঙ প্যান্‌প্যান্‌ করছিলেন, এবার সুযোগ পেয়ে তিনি চাও-সাতকে উদ্দেশ করে বলতে থাকেন, 'আজকালকার এই স্বদেশীগুলোর চালচলনও বেয়াড়া। ধরে ধরে লোকের বেণী কাটবে, যেন বোষ্টমের মত চেহারা হয় সকলের। উনসত্তর বছর বেঁচে রয়েছি, একটা জীবনের পক্ষে যথেষ্টই বলতে হবে। হলদে রেশমি উড়িয়ে রাজপুত্তুররা যেত—হ্যাঁ, হলদে রেশমি আর লাল রেশমি…একটা জীবনের পক্ষে যথেষ্টই বলতে হবে—উনসত্তর বছর তো আর কম নয়…'

মাথা নাড়তে নাড়তে চাও-সাত বলে, 'বড় দুঃখের কথা। বেণী না রাখা যে ভয়ানক অপরাধ তাতে কোনও ভুল নেই। বইয়েও একথা লেখা আছে, খুব স্পষ্টভাবেই লেখা আছে। পরিবারে যত বড় রুক্ষাকর্তাই থাকুন না কেন—এই অপরাধের গুরুত্ব কিছুমাত্র কমে না।'

বইয়ে লেখা আছে—একথা শোনার পর সাত-চিঙের বৌয়ের মনে যেটুকু আশা ছিল তাও নির্মূল হয়ে গেল। মনে হল যেন সে এক অন্ধ গলিতে গিয়ে হাজির হয়েছে। নিজের স্বামীর ওপরেও যে প্রতিশোধ নেবে সে উপায়টুকুও আর নেই। ভাত খাবার কাঠি দুটো সাত-চিঙের নাকের ডগার

সামনে নাড়তে নাড়তে সে বলল, 'যেমন কর্ম তেমনি ফল, বুঝেছ ঘাটের মড়া? বিপ্লব হবার পরে নৌকো চেপে শহরে যেতে বারণ করিনি তোমাকে? তখন তো আর আমার কথা কানে ঢোকেনি। নানা ওজরওজুহাত তুলে তবুও তুমি শহরে গেলে। আর হল কি? না, শহরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ধরেবেঁধে ওরা তোমার বেণী কেটে দিল—আহা রে, অমন চমৎকার কালো কুচকুচে বেণীটা। যেমন কর্ম তেমনি ফল, বুঝেছ ঘাটের মড়া?…'

চাও-সাতকে আসতে দেখে গাঁয়ের লোকেরা তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিয়েছিল, ইতিমধ্যে সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়েছে যেখানে সাত-চিঙ আর তার বাড়ির লোকেরা খেতে বসেছিল। সাত-চিঙ বরাবরই নিজেকে খুব ভারিক্কী গোছের লোক বলে ভাবতে অভ্যস্ত, সুতরাং এতগুলো লোকের সামনে বৌয়ের এই মন্তব্য শুনে নিজেকে ভয়ানক ছোট বলে মনে হতে থাকে। নিজের এই বিব্রত অবস্থা কাটিয়ে উঠবার জন্যে খুব শান্ত স্বরে সে বলল:

'আজ এ সব কথা বলতে আর কি, কিন্তু সে সময়ে…'

'আর কথা বলতে হবে না, ঘাটের মড়া!'

আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে আট-ওয়ানের বৌয়ের মনটা ছিল সবচেয়ে নরম, অন্য কারও সঙ্গে তুলনাই হয় না। নিজের দু-বছরের ছেলেকে কোলে নিয়ে সে দাঁড়িয়েছে সাত-চিঙের বৌয়ের গা ঘেঁষে এবং স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া উপভোগ করছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও হচ্ছে ওদের জন্যে। চাপা গলায় সাত-চিঙের বৌকে সে বলে, 'রাগ কোরো না দিদি। মানুষ তো আর দেবতা নয়। পরে কি হবে তা কি কেউ বুঝতে পারে? আমার তো মনে আছে দিদি, তখন তুমিও বলতে যে বেণী কেটে ফেললে মানুষকে আগের চেয়ে খারাপ দেখায় বলে তো মনে হয় না। আর তাছাড়া একটা কথা আছে, শহরে এখনো তো আর ঢেঁড়া পড়েনি যে…'

সাত-চিঙের বৌ এসব কথা বেশিক্ষণ আর সহ্য করতে পারে না। কাঠি দুটো হাতে ধরাই ছিল, স্ত্রীলোকটির নাকের সামনে কাঠি নাড়তে নাড়তে বলে ওঠে, 'কি বলছ তা তোমার খেয়াল নেই। ভদ্র ঘরের মেয়ে আমি, এমন একটা অসম্ভব কথা আমি বলতেই পারি না। আমার মনে আছে, সে সময়ে পুরো তিন দিন তিন রাত্রি আমি কেঁদেছিলাম। সকলেই তা দেখেছে …এমন কি ঐ ছয়-চিঙ বজ্জাতটাও কেঁদেছিল…' ছয়-চিঙ তখন সবেমাত্র এক

বড় বাটিভর্তি ভাত শেষ করে বাটিটা বাড়িয়েছে আরও ভাতের জন্তে। সাত-চিঙের বৌ তার দিকে তাকিয়ে দেখে, তারপর হাতের কাঠি দিয়ে খটাস্ করে বাড়ি মারে তার মাথায়। 'চুপ করো বলছি!' কর্কশ গলায় আগের কাথার জের টানে সে, 'তোমার মত নষ্ট স্বভাবের বিধবার কথায় কে কান দেয়?'

ঠিক সেই সময়ে ছয়-চিঙের হাতের বাটিটা সশব্দে মাটিতে পড়ে যায় আর একটা বড় টুকরো ভেঙে বেরিয়ে আসে বাটির কানা থেকে। লাফিয়ে উঠে সাত-চিঙ বাটিটা কুড়িয়ে নেয় এবং ভাঙা অংশ ছুটো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে করতে জোড়া দেবার চেষ্টা করে। 'খান্‌কির বাচ্চা!'* হঠাৎ গালাগালি দিয়ে উঠে এক চড় কষায় ছয়-চিঙের কানের ওপর। মেয়েটা মাটিতে পড়ে যায় আর লম্বা হয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে প্রচণ্ডভাবে। বুড়ী ঠাকুমা নয়-চিঙ মাথা নাড়েন তারপর তুলে নিয়ে যান মেয়েটাকে আর অনবরত বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, 'রসাতলে যাচ্ছে সব, রসাতলে যাচ্ছে। বংশের একেক পুরুষ তার আগের পুরুষের চেয়ে খারাপ…'

আট-ওয়ানের বৌও চটে উঠে সাত-চিঙের বৌকে লক্ষ্য করে চিৎকার করতে থাকে:

'তুমি মাগী কম নও—কুচকুরে, জানোয়ার, গর্দভ!'

চাও-সাত এতক্ষণ নেহাৎ দর্শকের মত দাঁড়িয়েছিল কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ে যে শহরে এখনো ঢেঁড়া পড়েনি। তখন আবার সে পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলে, 'কি জান, এখনই হোক বা ছ'দিন পরেই হোক রাজকীয় বাহিনী এই পথে যাবে। আর সেই রাজকীয় বাহিনীকে পরিচালনা করবেন চ্যাঙ নামে একজন সেনাপতি। 'ত্রিরাজ্য' বইএ যে ব্যাঘ্র-সেনাপতি চ্যাঙ ই-তের উল্লেখ আছে তাঁরই বংশধর হচ্ছেন এই চ্যাঙ। এই সেনাপতির একটা বর্শা আছে যেটা আঠারো ফুট লম্বা আর সাপের মত আঁকাবাঁকা। দশ হাজার সৈন্যকে একা ঠেকাতে পারে এমন লোকেরও ক্ষমতা নেই এই বর্শার একটা খোঁচা সহ্য করতে পারে…' কথাগুলো বলবার সময় সে শক্ত করে মুঠো পাকাচ্ছিল যেন সে নিজেই সেই সাপের মত আঁকাবাঁকা বর্শাটা

---

*চীনা ভাষায় পুরো কথাটা হচ্ছে, 'সাও তা মা-তি পি'। সংক্ষেপে 'তা মা-তি'। প্রথম, মধ্যম, উত্তম,—যে কোন পুরুষে কথাটা ব্যবহৃত হয়। চীনা চলিত ভাষায় কথাটা একটা মাত্রার মত দাঁড়িয়ে গেছে। —অনুবাদক।

ধরে আছে। তারপর খানিকটা এগিয়ে এসে আট-ওয়ানের বৌকে উদ্দেশ করে বলে, 'এই লোককে ঠেকাতে পার তুমি ?'

বাচ্চা কোলে আট-ওয়ানের বৌ রাগে ও ভয়ে কাঁপছে। চাও-সাত এগিয়ে আসছে তার দিকে, সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম—আতঙ্কে সরে যায় আট-ওয়ানের বৌ। চাও-সাতও এগিয়ে আসে সঙ্গে সঙ্গে। অন্য যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা সরে গিয়ে জায়গা করে দেয় দুজনের জন্যে আর পরের ব্যাপারে মাথা গলাতে যাবার জন্যে দোষ দিতে থাকে স্ত্রীলোকটিকে। 'হ্যাঁ বলো, এই লোককে ঠেকাতে পার তুমি ?' পুলটার কাছ বরাবর পৌঁছে চাও-সাতকে বলতে শোনা যায়। তারপরেই দেখা যায় সে মাথা উঁচু করে বড় বড় পা ফেলে চলে যাচ্ছে।

গাঁয়ের লোকেরা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্যাপারটা বারবার মনে মনে তোলপাড় করে তারা এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে চ্যাও হু-তেকে ঠেকাতে পারে এমন কেউ নেই, সুতরাং সাত-চিঙ যে মাথা বাঁচাতে পারবে এমন সম্ভাবনা খুব কম। তাদের মনে পড়ে, শহর থেকে সাত-চিঙ যে-সব খবর নিয়ে আসত তাই নিয়ে তার কী না বাগাড়ম্বর। এখন সে যে নিজেই রাজকীয় ঘোষণাপত্র অমান্য করেছে তা দেখে সবাই খুশি। চাপা মন্তব্য আর কানাকানি শোনা যেতে থাকে আর সেই সব চাপা মন্তব্য আর কানাকানি তালগোল পাকিয়ে মিশে যায় মশার গুনগুন শব্দের সঙ্গে। লোকগুলোর খোলা বুকের ওপর মশাগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে আর তারপরেই মিলিয়ে যাচ্ছে ট্যালো গাছের ঝাপ্‌সা অন্ধকারে।

তারপর একে একে যে যার ঘরে ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। সাত-চিঙের বৌকে আরও কিছুক্ষণ জেগে থাকতে হয় টেবিল ও টুল সরাবার জন্যে কিন্তু সেও আপন মনে কি যেন বিড়বিড় করে বকে যাচ্ছে। তারপর এক সময়ে সেও দরজা বন্ধ করে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

ভাঙা বাটিটা হাতে নিয়ে সাত-চিঙ ফিরে গিয়ে বসল চৌকাঠের ওপর। তার বিমর্ষ ভাবটা তাকে এতদূর অভিভূত করেছে যে হাতির দাঁতের মুখ-নলটায় টান দিতে ভুলে যায়। খেতাভ পেতলের কলকেতে টিকের আগুন পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। সামনে যে অদৃশ্য ও ভয়ঙ্কর বিপদ দেখা দিয়েছে এবং যা থেকে পরিত্রাণের কোন উপায়ই সে খুঁজে পাচ্ছে না—সেই চিন্তাতেই তার মন ডুবে থাকে একেবারে।

কিছু একটা ফন্দিফিকির বার করবার চেষ্টা করে সে কিন্তু আগাগোড়া ব্যাপারটা এমন তালগোল পাকানো ও এত অস্পষ্ট যে কোন একটা যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌছনো একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে তার পক্ষে। 'আসল সমস্যা হচ্ছে—বেণী…সাপের মত আঁকাবাঁকা বর্শা, আঠারো ফুট লম্বা… রসাতলে যাচ্ছে সব, বংশের একেক পুরুষ আগের পুরুষের চেয়ে…আর সম্রাট ফিরে এসেছেন সিংহাসনে আর ভাঙা বাটিটা শহরে নিয়ে যেতে হবে সারাবার জন্যে…এই লোককে ঠেকাতে পার তুমি?…বইএ একথা লেখা আছে, খুব স্পষ্টভাবেই লেখা আছে। খানকির বাচ্চা!'

পরের দিন অভ্যেসমত সান্ত-চিও খুব ভোরে ওঠে তারপর কাজ করতে যায় নৌকোতে। শহরে না পৌছনো পর্যন্ত অনবরত লগি ঠেলে তারপর সন্ধ্যার দিকে সে যখন আবার লুচেন্‌-এ ফিরে আসে তখনো তার হাতে সেই ছ-ফুট লম্বা বাঁশের পাইপ, আর তাছাড়া সেই বাটিটাও সারানো হয়েছে। সান্ধ্যভোজনে বসে সে বুড়ী ঠাকুমা নয়-চিওকে বুঝিয়ে বলে কি ভাবে বাটিটা সারানো হয়েছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে ভেঙেছিল, ষোলটা পেতলের কাঁটা লাগাতে হয়েছে। এক-একটা কাঁটার দাম তিন মুদ্রা, সুতরাং আট-চল্লিশ মুদ্রা খরচ করতে হয়েছে তাকে।

খরচের বহর শুনে বুড়ী ঠাকুমা নয়-চিও বিরক্তি চেপে রাখতে পারেন না।

'বংশের একেক পুরুষ তার আগের পুরুষের চেয়ে নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। অনেক বয়স হল আমার, যথেষ্টই বলতে হবে। একটা কাঁটার দাম তিন মুদ্রা? এমন কথা কস্মিনকালেও শুনিনি বাপু। আগেকার দিনে একটা কাঁটার দাম ছিল…উনসত্তর বছর বেঁচে আছি আমি!'

তবুও সান্ত-চিও রোজই শহরে যায়। কিন্তু তার বাড়ীর আবহাওয়া ক্রমশ বিষণ্ণ হয়ে উঠছে। গাঁয়ের লোকেরা তাকে এড়িয়ে চলে, শহর থেকে সে যে-সব খবর নিয়ে আসে তা শুনবার জন্যে ঔৎসুক্য দেখায় না। কথায় কথায় তার বৌও তাকে 'ঘাটের মড়া' বলে গালাগালি দেয়।

দিন দশেক পরে একদিন শহর থেকে ফেরার পর তাকে অবাক করে দিয়ে তার বৌ প্রসন্ন মুখে তার দিকে তাকাল।

'কোন খবরটবর শুনলে?' বৌ প্রশ্ন করে।

'কই, এমন কিছু না।'

'সম্রাট কি সত্যিই সিংহাসনে ফিরেছেন?'

'কই, কেউ তো সে-কথা বলে না...'

'তার মানে, বাড়কপালে সরাইখানাতেও কেউ কিছু বলেনি ?'

'না।'

'এখন কি মনে হচ্ছে জান, সম্রাট কোন দিনই সিংহাসনে বসেননি। আজ আমি চাও-সাভের সরাইখানার পাশ দিয়ে এসেছি। দেখলাম সে বসে বসে বই পড়ছে। মাথার বেণী আবার সে ঝুঁটি পাকিয়েছে। আর কি জান, সেই জামাটা আর তার গায়ে নেই।'

'তাই নাকি...'

'আমার মনে হচ্ছে, সম্রাট সিংহাসনে ফিরে আসেননি।'

'তাহলে তো ভালই।'

সেই দিন থেকে সাত-চিঙ আবার তার পুরনো প্রতিষ্ঠা ফিরে পেয়েছে। তার বৌ এবং গাঁয়ের অন্ত সবাই আবার তাকে খাতির-সম্মান করতে শুরু করে। গ্রীষ্মকালে বাড়ীর লোকেরা তেমনি ভাবেই আঙিনায় টেবিল পেতে সান্ধ্যভোজনে বসে, পাড়াপড়শিরা হাসিমুখে আসে তাদের কাছে। বুড়ী ঠাকুমা নয়-চিঙ অশীতি জন্মোৎসব করেছেন, এখনো তেমনি তাঁর স্বাস্থ্য আর তেমনি খিটখিটে মেজাজ। ছয়-চিঙের অবাধ্য চুলের গোছা সত্যিকারের বেণীর রূপ নিচ্ছে। আর যদিও তার পা নতুন বাঁধানো হয়েছে কিন্তু এখনো সে তার মাকে সংসারের কাজে সাহায্য করে। প্রায়ই দেখা যায় সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উঠোনের এদিক-ওদিক চলাফেরা করছে, তার হাতের ভাত খাবার বাটিটায় বোলটা পেতলের কাঁটা লাগানো। *

অনুবাদ : অমল দাসগুপ্ত

---

*মাঞ্চুরা আদেশ জারি করেছিল যে প্রত্যেক চীনাকে বেণী রাখতে হবে। চিঙ রাজবংশের রাজত্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথার বিলোপ হয়। ১৯১৭ সালে বালক-সম্রাট পু-ঈকে মাত্র সাতাশি দিনের জন্তে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। তখন একটা সম্ভাবনা ছিল যে পুরনো নীতি ও প্রথার পুনরায় প্রচলন হবে। গল্পে চাষীদের ভিতর যে উত্তেজনার চিত্র আঁকা হয়েছে তা এই ঘটনা উপলক্ষে।

কেন আমি অ্যাটমবোমা বেআইনী করার পক্ষে

টমাস মান্‌-এর জবানবন্দী

[বিশ্ববিখ্যাত নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত জার্মান সাহিত্যিক টমাস মান্‌ অ্যাটম্‌-বোমাকে বেআইনী করার স্বপক্ষে বিশ্বশান্তি-কমিটি কর্তৃক প্রচারিত 'স্টক্‌হল্‌ম্‌ আবেদনে' স্বাক্ষর করেন (এই আবেদনটি 'পরিচয়'-এর গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে)। কিছুদিন আগে মান্‌ যখন প্যারিসে আসেন, তখন বিশিষ্ট ফরাসী লেখক ও সাংবাদিক ক্লড্‌ মর্গ্যান-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারপ্রসঙ্গে তিনি কেন স্টকহল্‌ম্‌-আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন তার কারণ হিসেবে নিচের এই বিবৃতি দেন।

নাৎসি-বিরোধিতার জন্যে টমাস মান্‌ স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে আমেরিকায় যান এবং মার্কিন নাগরিক হন। আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী মহলে নাৎসি-বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে টমাস মান্‌ বরাবর খুব বড়রকম শক্তি জুগিয়ে এসেছেন। গ্যেটের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্যে বারো বছর পরে স্বদেশে এসে টমাস মান্‌ পূর্ব-জার্মানিকে অভিনন্দিত করেন এবং অবিভক্ত, গণতান্ত্রিক জার্মানির প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করেন।]

টমাস মানের সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথন হয়, সে-সম্বন্ধে ক্লড্‌ মর্গ্যান লিখছেন : বিশ্বশান্তি-কমিটির পক্ষ থেকে টমাস মান্‌-কে অভিনন্দন জানাবার পর স্বভাবতই তাঁকে আমি প্রথমে এই প্রশ্নটাই করলাম :

"অ্যাটম-বোমা সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?"

তিনি বললেন : "অ্যাটম-বোমা সব দিক দিয়েই মানুষের পক্ষে এক ভয়ানক বিপদের কারণ। এই বোমা যাঁরা তৈরি করেছেন সেই বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে আরও বাড়িয়ে তোলার কাজে এর ব্যবহার হতে পারবে—এ কথা ভেবে তাঁদের বিবেক স্বস্তি পাচ্ছে না। খোদ আমেরিকাতেই তাঁরা অ্যাটম-বোমা ব্যবহারের তীব্র বিরোধিতা করছেন এবং একে নিষিদ্ধ করার জন্যে সচেষ্ট আছেন। এর জন্যে তাঁরা লিখছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন। আইনস্টাইনও এ সম্বন্ধে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।"

প্রশ্ন : "স্টক্‌হল্‌ম্‌-আবেদনে আপনার স্বাক্ষর করার কারণ কি?"

উত্তর : "স্টক্‌হল্‌ম্‌-আবেদনে আমি সই করেছি, তার কারণ শান্তি-

প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করছে এমন ধারা যে কোন আন্দোলনকেই আমি সমর্থন করি।

"এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে আণবিক যুদ্ধের শেষে জয়ী বা পরাজিত বলে কেউ থাকবে না, গোটা দুনিয়াটাই সাধারণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই জন্যেই আমি আমার স্বাক্ষর দিয়েছি।

"আমার বিশ্বাস, আমি যা করছি তা আমার নতুন স্বদেশ আমেরিকার স্বার্থেই। আমেরিকার পক্ষে আরেকটি যুদ্ধের পরিণাম শুধু বাস্তব ক্ষতিই নয়, নৈতিক বিনাশও বটে ; গণতন্ত্রের চূড়ান্ত হার হবে।

"এ সম্বন্ধে আমি কোন ভুল হতে দিতে চাই না। আমার নতুন দেশকে আমার ভাল লাগে ; কিন্তু আমি যেটা অনুভব করছি তার সঙ্গে এই ভাল লাগাটা ঠিক মিলছে না—এবং নিজের দেশ সম্বন্ধে খারাপ কিছু বলাটা মোটেই সুরুচির পরিচয় নয়। এ কথা আমি বারবার বলতে চাই : অ্যাটম-বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমেরিকায় খুব শক্তিশালী একটা বিরোধিতা রয়েছে—বিশেষত বৈজ্ঞানিক, পাদ্রী, কোয়েকার আর অধ্যাপকদের মধ্যে।

"আমরা যেখানে থাকি সেই ক্যালিফোর্নিয়ায় আমি একজন লুথারীয় পাদ্রীকে ভালভাবে জানি যিনি একাধারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং সদাজাগ্রত একজন শান্তির প্রহরী।

"আমেরিকার এই ১৯৫০-এ যে আন্তর্জাতিক 'মধ্য-শতাব্দী শান্তি সম্মেলন' হবে, সেই সম্মেলনে আমি আমার ভাষণ পাঠিয়েছি, কারণ ওই সম্মেলন হবার সময় আমি ইওরোপে থাকলেও আমি চাই যে শান্তির স্বপক্ষে সেখান থেকে যে-আওয়াজ উঠবে তাতে আমার কণ্ঠস্বর যুক্ত হোক।

"অনেকেই আমার সঙ্গে তাঁদের কথোপকথনের এমন সব বিবরণ ছাপিয়েছেন যার ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আমি কমিউনিস্ট নই ; কিন্তু কমিউনিজ্‌ম্ আর ফ্যাশিজ্‌ম্-এর মধ্যে পার্থক্যটুকু আমি ধরে থাকি যা বহু আমেরিকানই ধরেন না। মানুষের আর তার ভবিতব্যের ধারণার সঙ্গে কমিউনিজ্‌ম্-এর একটা সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ফ্যাশিজ্‌মের সে রকম কিছু নেই, ও জিনিসটা খাঁটি নৈরাজ্যবাদ। আমি সর্বদা এই বিভ্রান্তির বিরোধিতা করি।"

প্রশ্ন : "ফ্রান্স আর জার্মানির মধ্যে লোহা আর কয়লা সম্বন্ধে মসিয়ঁ শুমান্-এর প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন ?"

উত্তর : "রসির" শুমান্-এর প্রস্তাব? আমার মনে হয়, ওটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। 'মহা-শিল্পপতি রুহ্-ব্যারন' গোত্রের লোক—যারা শুধু ক্ষমতা পেতেই চায়, সহযোগিতার সততায় যাদের কোনই আগ্রহ নেই—তাদের সম্বন্ধে শুমান্ যেন খানিকটা মোহ পোষণ করেন। ফ্রান্সের পক্ষে আত্মনির্ভর জার্মানির একটা অর্থনৈতিক প্রদেশে পরিণত হবার বিপদ আছে যার ফলে ফ্রান্স সব দিক থেকে দেউলে হয়ে যেতে পারে।"

প্রশ্ন : "পূর্ব-জার্মানির গণতান্ত্রিক রিপাব্লিকে স্টকহল্‌ম্-আবেদনের পক্ষে এক কোটি দশ লক্ষ সই সংগ্রহ করা হয়েছে, আপনি জানেন?"

উত্তর : "এক কোটি দশ লক্ষ? খুবই উৎসাহের কথা। কিন্তু নিশ্চয় জানবেন যে পশ্চিম-জার্মানিতেও সমস্ত সাধারণ লোক যুদ্ধ আর সামরিক প্রস্তুতির বিরুদ্ধে। ইওরোপের জনগণ যুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামায় না, সুতরাং আর একটি যুদ্ধের বোঝা বইতে তারা বিশেষ রাজি নয়।

[জুন, ১৯৫০]

বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারি না

['পরিচয়'-এর গত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের ডাক' প্রকাশিত হওয়ার পর সে ডাকে প্রথম সাড়া দিয়ে আমাদের কাছে চিঠি লিখেছেন চক্রধরপুর থেকে শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়। নিচে তাঁর পুরো চিঠিটি উদ্ধৃত হল।—সম্পাদকমণ্ডলী, 'পরিচয়']

"একজন প্রগতিশীল লেখক হিসেবে আমি বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারি না সেইসব যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে—যারা আজ কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নৃশংসভাবে নারী, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করছে—যারা হত্যা করছে আমারই প্রেরণার উৎস, আমারই রচনার নায়ক-নায়িকাকে। এই সব সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, হাসিকান্না ও সংগ্রাম—এই তো আমার রচনাকে মূর্ত করে তোলে। তাই আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই যুদ্ধবাদীদের এই অসহ্য বর্বরতার বিরুদ্ধে। ট্রুম্যান-এট্‌লি-স্নুম! জেনে রাখো, হিটলারের অভিনয় ধ্বংস হয়েছে, তোমরা যদি তারই পুনরভিনয় কর, আমরা—শান্তির সৈনিকরা—তাকে বন্ধ করে দেবই।"

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পত্রিকাপ্রসঙ্গ

দাঙ্গাবিরোধী সাহিত্যিকদের আহ্বান

হত্যার অধ্যায় থেমেছে, তিন মাস ধরে আমরা দিল্লী-করাচীর চুক্তি-কৃত সৌহার্দের আবহাওয়ায় বাস করছি। দিল্লীর সরকারি হিসাবে শুনছি, লোকের আস্থা ফিরে আসছে। এবং শিয়ালদহ ষ্টেশনে দেখছি সে 'আস্থার' অবস্থা! পূর্ব বাঙলার সুদূর চট্টগ্রাম থেকে এমনি সময়ে হাতে এসে পৌঁছল 'সীমান্ত' নামে মাসিকপত্রের 'দাঙ্গা-বিরোধী সংখ্যা'—তৃতীয় বর্ষের প্রথম (বৈশাখ) সংখ্যা। পূর্ব বাঙলায় দাঙ্গা-বিরোধী মানুষ আছেন এবং তাঁরা আপনাদের সেই মতামত ঘোষণা করতে ভীত নন, এই সংবাদ আমরা পশ্চিম বাঙলার মানুষরা কয়জন জানি? কয়জন তা বিশ্বাস করি? তবু সেই অভ্রান্ত ঘোষণা নিয়ে এসেছে 'সীমান্ত', আর সে একাও নয়। পূর্ব-পাকিস্তানের একাধিক বাঙলা মাসিকপত্রে এই প্রমাণ। পশ্চিম বাঙলা থেকে এমনি কোন 'দাঙ্গা-বিরোধী সংখ্যা'র আশ্বাস দিয়ে কোনো সাময়িকী এ সময়ে পূর্ব বাঙলায় গিয়েছে কিনা জানি না। এ প্রশ্ন তুলতেও ভয় পাই। কারণ তৎক্ষণাতই উঠে পড়বে এই তর্ক—কোন্ বাঙলা কতটা দাঙ্গামুখী, তারপর 'কে ঢিল ছুঁড়েছিল' প্রথম কবে; আর কারা হত্যা করেছে বেশি, কারা সে দিকে কতটা পিছিয়ে আছে। অসহ্য! ঘৃণার সঙ্গে এ তর্ক বর্জন করতে চাই। তথাপি জিজ্ঞাসা করতে হয়—পশ্চিম বাঙলার সংস্কৃতি-সেবকদের পক্ষ থেকে সম্প্রতি এই ১৯৫০'এর দুর্দিনে এরূপ কোনো প্রচেষ্টা হয়েছে কি না। কারণ এখনো বাঙালী সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র পশ্চিম বাঙলা, আর সে সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা। কিন্তু এরূপ সুস্পষ্ট কোনো প্রয়াস কলিকাতার সংস্কৃতি সেবকদের পক্ষ থেকে সংস্কৃতির এই দুর্যোগে হয়েছে বলে আমার মনে পড়ছে না। দুই-একটি মিলনচক্রের চেষ্টার কথা জানি, তাও সার্থক আকার লাভ করতে পারে নি। অথচ একথা সত্য যে, কি পূর্ব বাঙলায়, কি পশ্চিম বাঙলায় কোনখানেই দুষ্কৃতকারী বা দাঙ্গাজীবীদের সংখ্যা বড় জোর দু'এক লক্ষের বেশী নয়। সাধারণ মানুষ, শান্তিকামীদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, আসলে তাঁরাই শতকরা ৯০ জন। কিন্তু তাঁরা সক্রিয় নন, সংগঠিত হতে জানেন না বরং

নানাবিধ অকল্যাণকর প্রচারে তাঁদের সেই শুভবুদ্ধিও এক একবার আচ্ছন্ন হয়। আর সাধারণ সময়েও সংগঠনেচ্ছা তাঁদের অবসন্ন হয়ে থাকে। তাঁদের অবসাদ ও নিষ্ক্রিয়তার এই সুযোগ নিয়েই দাঙ্গাজীবীরা সমাজে বেঁচে থাকে এবং সাময়িকভাবে দলবৃদ্ধিও করে নিতে পারে। এই সত্যও বুদ্ধিজীবী বা সংস্কৃতিবান্দের অজানা নেই। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত বাঙালীর এই বুদ্ধিজীবী-সমাজ তথাপি নিজেদের কর্তব্যপালনে একেবারে অশক্ত হন নি। দুই বাঙলার বিচ্ছেদ তাঁরা রোধ করতে পারেন নি, কিন্তু দুই বাঙলার বিরোধ বন্ধ রাখতে তাঁরা সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন কিন্তু ১৯৪৯'এর শেষে এইবার বাঙালী সংস্কৃতিবানদের পক্ষে আর সেই গৌরবময় ঐতিহ্য রক্ষা করাও সম্ভব হচ্ছে না। এমনি সময়ে পূর্ব বাঙলার পূর্ব-সীমান্ত থেকে 'সীমান্ত' পত্রের আহ্বান আমরা শুনতে পেলাম—'সীমান্তের' সহকারী সকল বন্ধুদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। সূর্য পূর্বদিকেই ওঠে। অন্ধকারের মধ্যেও এই আলোকচ্ছটা সেখানেই আজ বাঙালী সংস্কৃতি-সৈনিকেরা দেখতে পেল।

বোধ হয় কথাটা বলা প্রয়োজন—'সীমান্ত' সাম্যবাদীদের পত্র নয়। 'সীমান্তের' প্রধান আবেদন কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নিকট, তার প্রধান দাবি মনুষ্যত্বের নামে, "বর্বরতা যে কারণেই ঘটুক না কেন, তা বর্বরতাই; এবং বর্বরতার জয়জয়কারে কোনো মনুষ্যত্বকামী মানুষই খুশি হতে পারেন না"। তাই অধ্যাপক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর বিশেষ দাবি পশ্চিমবঙ্গের কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নিকট। রাজনীতি ও ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর অবিশ্বাস; তিনি আহ্বান করেছেন, "এ ব্যাপারে সত্যেন মজুমদার, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুশোভন সরকার, সুধীন দত্ত, যামিনী রায়, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কাছে"। আর এই উদ্দেশ্যে তিনি চান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের দুই বঙ্গে মিলিত পরিভ্রমণ ব্যবস্থা। সুসংবাদও তিনি জানিয়েছেন—চাটগাঁ শহরের তরুণ শিল্পী ও সাহিত্যিকরা মিলে সেখানে একটি দাঙ্গা-বিরোধী প্রতিষ্ঠান এবং শান্তি ফৌজও গড়ে তুলেছেন। পশ্চিম বাঙলার শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ হয়ত তা শোনেন নাই। তাই আমরা বিশেষ করে পশ্চিম বাঙলার শিক্ষিতদের দৃষ্টি এই উদারপ্রাণ বাঙালী বন্ধুর প্রবন্ধটির দিকে আকৃষ্ট করতে চাই। পশ্চিম বাঙলার শিল্পীরা পূর্ব বাঙলার এই সংস্কৃতি-সহধর্মীর হাতে হাত মিলান।

অবশ্য 'প্রান্তিকের' এ সংখ্যার সাহিত্যিক মূল্যও কম নয়—কৃষণ চন্দরের 'দুই অমৃতসর' (উর্দু থেকে অনূদিত) মর্মান্তিক গল্প। কয়েকটি কবিতা, বিশেষত জনাব মহবুব আলম চৌধুরীর 'স্মৃতি নেই', হাসিনা নেই : কাকাবাবু নেই দরদের জোরে অন্তর স্পর্শ করে। প্রবন্ধ কয়টিতে সীমান্তের উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

কিন্তু এই উদ্দেশ্যের স্পষ্টতাই যথেষ্ট নয়, সীমান্তের বন্ধুদের আজ একথা আমরা সহকর্মীর সমস্ত শ্রদ্ধা নিয়ে জানাতে চাই। ১৯৪৬ থেকে আজ তিন বৎসর আমরা বাংলার সংস্কৃতিবাদীরা শুধু এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে বারবার দাঙ্গাবাজ ও দাঙ্গা-প্ররোচকদের বিরুদ্ধে সমবেত হতে গিয়েছি। সার্থকতা আমরা একেবারেই লাভ করি নি তা নয়, কিন্তু উদ্দেশ্য যে আমাদের সিদ্ধ হয় নি তাও মানতেই হবে। 'দুই রাষ্ট্র, এক দেশ, এক অর্থনীতি, এক সংস্কৃতি' এমনি একটা চিন্তাকে আশ্রয় করে আমরা 'পনেরই অগস্টের' বিচ্ছেদকে মেনে নিতেও চেষ্টা করেছি। কিন্তু একটু পরেই দেখলাম রাজনীতির খড়্গ তাতে মাথার উপর উঁচিয়ে উঠল। যারা বাঙলাকে দ্বিখণ্ড করেছে তারা বাঙালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও বাঙালী সংস্কৃতিকে অখণ্ড থাকতে দেবে না—একথা ক্রমশই সুস্পষ্ট হল। বোঝা গেল, রাজনৈতিক ভেদরেখা অমোঘ করবার উদ্দেশ্যেই অর্থনৈতিক বিচ্ছেদও প্রবর্তিত করা হবে, আর ক্রমেই বাঙালী ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্যও বিপন্ন হবে। আজ দুই বৎসরে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে 'অগস্টের অভিশাপের' অর্থ কি—মাউণ্টব্যাটন-নীতিতে স্বাধীনতা আসে নি, এসেছে বিচ্ছেদ। আর যারা মাউণ্টব্যাটন-নীতিতে 'নকল বাদশাহী' ভোগ করছে তারা এই সাম্রাজ্যবাদী-ভেদকে দুরতিক্রম করবে। অর্থাৎ তাদের নিকট বাঙালীর জাতীয় ঐক্যের, জাতীয় অর্থনীতির, জাতীয় ঐতিহ্যের, জাতীয় সংস্কৃতির কোনো মূল্য নেই। সাম্রাজ্যবাদের এই চালটাই আজ এই : দাঙ্গার অবস্থা জীইয়ে রেখে ভারত ও পাকিস্তান দুই জনাকেই পরস্পরের শত্রু ও ইংরেজ-মার্কিনের কৃপাপ্রার্থী করে রাখা; পুরাদস্তুর যুদ্ধ না বাধিয়ে বরং ভাবীযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটি রূপে দুই রাষ্ট্রকেই মুঠোর মধ্যে রাখা। ব্যাহত স্বাধীনতা সংগ্রাম তাই আবার আরম্ভ না করলে এই চক্রান্তে ও অভিশাপেই আমরা উৎসন্নে যাব। আর তা সম্ভব করতে হলে সাময়িকভাবে যেমন দুই বাঙলায় শান্তি প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সেই শান্তির সৈনিক হিসাবে গণতান্ত্রিক সংগঠন। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিতে নয়, একমাত্র দুই বাঙলার মজুর-কৃষক-বুদ্ধিজীবী-মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর গণতন্ত্রকামী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামেই দু'বাংলার মাইনরিটি বা সংখ্যালঘুরা বাঁচতে পারে, সারা বাঙালী জাতির এই শাপমুক্তি সম্ভব।

গোপাল হালদার

সংস্কৃতি সংবাদ

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের মুক্তি দাবি করে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত প্রমুখ বাঙালী পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক-কর্মীরা একটি বিবৃতি দান করেছেন। সম্ভবত কমরেড মুজফ্‌ফর ছাড়া এমন রাজনৈতিক মানুষ আজ বাঙলায় কেউ নেই যাকে এমন সর্বদলীয় মানুষেরা একবাক্যে শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু তাঁদের বিবৃতিতে সরকার কর্ণপাত করবে, এমন কথা আমরা মনে করি না, হয়ত তাঁরাও মনে করেন না। কারণ, শুধু কমরেড মুজফ্‌ফরকে নয় বর্তমান সরকারকেও তাঁরা নিশ্চয়ই চেনেন। স্পষ্টই দেখা গিয়েছে—ভারতীয় গঠনবিধির মৌলিক অধিকারের সংকীর্ণ ক্ষেত্রকে বিচারকেরা যত বাধামুক্ত রাখতে চেষ্টা করছেন, শাসকেরা ততই তাকে কাঁটা-তারে আরও বেশি ঘিরে দিচ্ছে। এ দৃশ্য নিশ্চয়ই কৌতুককর, খোদ শাসক-মহলের সঙ্গে তার অন্দর মহলের এই দেখা-বিন্তি খেলা। কিন্তু খেলা খেলাই, আর তার শেষ চাল যখন প্যাটেল-পণ্ডিতের হাতে তখন বিচারকরা ভদ্রলোকের মতই মেনে নেবেন যে তাঁরা চালমাৎ হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বার্থ খেলায় নয়—তার পিছনকার মূল ব্যাপারটায়। এ দেশে মৌলিক অধিকারের কোন বালাই কি আছে, না, নেই? 'শাসন ও শৃঙ্খলা'র যে তর্ক আমরা শাদা সাম্রাজ্যবাদীদের মুখে শুনতাম তা কালো কমনওয়েল্‌থ-বাদীদের মুখে শুনলেই যে বেশি গ্রাহ্য হবে এমন কারণ নেই। বিশেষত জানি, শাদাদের দিনে কর্মচারীমহলে যতটুকু শৃঙ্খলা ছিল, আজ তা নেই; যতটুকু সমালোচনার সুযোগ সাধারণের ছিল আজ তাও নিশ্চিহ্ন। সেই এ্যাণ্ডরসনী যুগের "বক্সা বন্দী শিবিরে" এখনো বন্দী চালান হচ্ছে। কিন্তু নেই তখনও বক্সা শিবিরে যেটুকু জীবনধারণের মত ব্যবস্থা ছিল তা-ও এখন। সেই ৬২ বৎসরের বৃদ্ধ কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ—যিনি আজীবন বাঙালী সাহিত্যিকেরও বন্ধু—যখন কঠিন্ রোগে পীড়িত হয়ে মাসের পর মাস জেলে আছেন, নেই তখনো তাঁকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে চিকিৎসা করাবার ব্যবস্থা কিংবা স্বাধীনভাবে তাঁকে আপনার দেহ-ভার বহন করতে দেওয়া।

আমরা তাই ব্যক্তিস্বাধীনতা সংঘের কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করি—তাঁরা জনমতকে এ বিষয়ে জাগ্রত করুন, আর সেই উদ্দেশ্যে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের মত প্রত্যেকটি দেশপ্রাণ রাজবন্দীর কর্মজীবন ও সাংস্কৃতিক সাধনার কথা এবং তাঁদের বর্তমান নিগ্রহের কথা জনগণকে পুস্তিকাদি লিখে জানান।

গোপাল হালদার

বক্সা ক্যাম্পে শিল্পী-সাহিত্যিক

আমি বিশ্বাস করি, বিনা বিচারে মানুষকে আটক রাখার আইনটা এদেশের মানুষকে পরাধীনতার গ্লানি সব চেয়ে বেশি অনুভব করায়। একপেশে স্বেচ্ছাচারিতার, শাসক ও শাসিতের মধ্যে অসৎ সম্পর্কের এমন সুস্পষ্ট নগ্ন অভিব্যক্তি আর আছে কিনা সন্দেহ। গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা যে সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে তার তর্কাতীত প্রমাণ হল প্রকাশ্য বিচার ছাড়াই মানুষকে বন্দী করার আইন।

অনেকে এই আইনটির স্বরূপ তুলে ধরতে রাজবন্দীর সংখ্যা তুলে ধরেন। আমার মতে, বন্দীর সংখ্যাটা আন্দোলনের ব্যাপ্তির স্বরূপ নির্দেশ করে: বন্দীর সংখ্যা লক্ষ হোক বা একজন হোক বিনা বিচারে আটক রাখার আইন চালু থাকার আসল তাৎপর্যের এতটুকু এদিকওদিক তাতে হয় না।

মনে আছে, ছাত্রাবস্থায় ও সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দিকে ইংরেজের নিরাপত্তা আইনটাকে মনে করতাম আমার দেশের মানুষের চরম অপমান, এ দেশের লোকের বিচারবুদ্ধি, মানবতা ও ন্যায়বোধ সম্পর্কে সীমাহীন অবজ্ঞার ঘোষণা। মনে হত, আমরা আইন ও শৃঙ্খলা মানি, গণ-আন্দোলনের পথে ছাড়া অন্যায় আইন পর্যন্ত ভাঙি না, প্রকাশ্য বিচার মানি, তবু বিনা বিচারে আটক রাখার আইন দরকার—এ মিথ্যা নিন্দা আর অপমান কেন? এ প্রশ্নের আসল মানে ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হল। ক্রমে বুঝতে পারলাম বিনা বিচারের আইনটা দেশবাসীর আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি স্বাভাবিক নিষ্ঠা, ন্যায়বোধ, যুক্তিবোধ, নীতিবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠীর অবজ্ঞার

নিদর্শন নয়, সভয় শ্রদ্ধারই প্রমাণ। জনসাধারণের ন্যায়বোধ, নীতিবোধ, বিচারবুদ্ধিতে ভেজাল থাকে না, গোষ্ঠীস্বার্থ ঠিক সেই জন্যেই প্রকাশ্য বিচার এড়িয়ে চলতে চায়।

ইচ্ছা বা সংকল্প থাকে মানুষের মনের গহনে। ধ্বংসাত্মক কাজের ইচ্ছা বা সংকল্প আছে—শুধু এইটুকু ঘোষণা করে একজন মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা চলে কিন্তু গহন মনের নিছক ইচ্ছা বা সংকল্পকে তো প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণ করা যায় না। কিছু বাস্তব প্রমাণ দরকার হয়।

যে অজুহাতেই হোক, একটা অন্যায়কে পোষণ করলে তা থেকে যে শাখাপ্রশাখা গজায় তার নিদর্শন পাই বহু নিরাপত্তা-বন্দীকে বক্সা ক্যাম্পে প্রেরণ করার মধ্যে। সরাসরি ইংরেজ আমলের সেই বক্সা ক্যাম্প, যার স্মৃতি আজও আমাদের মনে কাঁটার মত বেঁধে, ক্ষোভ জাগায়। দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলে নিরাপত্তা বন্দীদের সম্পর্কে দেশবাসীর উদাসীনতা আসবে, এই হীন মনোবৃত্তি ও আজগুবি ধারণা থেকে আবার সেই বক্সা ক্যাম্পকে ব্যবহার করা হবে, ইংরেজের তৈরি সেই বক্সা ক্যাম্পটাই আবার আমাদের জাতীয় আত্মসম্মানবোধকে আঘাত করার সুযোগ পাবে, এটা সত্যই অবিশ্বাস্য ছিল।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, চিন্মোহন সেহানবীশ, পারভেজ শাহিদী, সুনীল বসু, দ্বিজেন্দ্র নন্দী প্রমুখ লেখক, কবি, শিল্পী ও সংস্কৃতি-কর্মীদেরও বক্সায় পাঠান হয়েছে। প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে এবং বহু সাহিত্য-সভা, শিল্প-সাহিত্যের আদর্শ বিচারের আলোচনা বৈঠক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মারফতে এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয়। আমি সাহিত্যিক মানুষ, একটু তাড়াতাড়ি মানুষের ভেতরটা খানিক গভীর ভাবে জানবার ক্ষমতা দাবি করলে কি অহঙ্কার প্রকাশ করা হবে? শিল্প-সাহিত্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করা, মানুষের সেরা সম্পদ সংস্কৃতিকে ক্ষয় ও অপঘাতের বিপদ থেকে বাঁচিয়ে নূতনতর, মহত্তর বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা ও কল্পনাই এঁদের মনপ্রাণ জুড়ে ছিল। বাংলার শিল্প-সাহিত্যে নতুন সৃষ্টি দিয়ে এঁরা প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন, আলোচনা-সমালোচনায় অংশ নিয়ে প্রমাণ দিয়েছেন গভীর ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তির এবং নিয়মিত অক্লান্ত পড়াশোনার, সাংস্কৃতিক কাজে হাতেনাতে খেটে পরিচয় দিয়েছেন কর্মশক্তির। সত্য কথা বলি, এঁদের অক্লান্ত কর্মপ্রেরণা ও বই পড়ার আগ্রহ ও বহর দেখে রীতিমত ঈর্ষা বোধ করেছি।

শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চা একান্তভাবেই প্রকাশ্য ব্যাপার। গোপন ষড়যন্ত্রের এতটুকু স্থান নেই। ছবি আঁকি, গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লিখি, গান গাই, অভিনয় করি, বক্তৃতা দিই—গোপনে করা দূরে থাক, পাঠক শ্রোতা দর্শক পর্যন্ত বেছে নেবার উপায় নেই। সোজাসুজি খোলাখুলি আমার দেশের সকল মতের সকল রুচির সকল মানুষের সামনে তুলে ধরে দিতে হবে আমার সকল রকম সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা। দেশের মানুষই তাই শিল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার একমাত্র বাহক এবং বিচারক: দেশবাসীর গ্রহণ ও বর্জনই এক্ষেত্রে একমাত্র প্রয়োগযোগ্য আইন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োগ তাই সভ্যজগতে এত বড় অনিয়ম বলে গণ্য হয়।

বাংলার একজন সাহিত্যিক হিসাবে আমি এই প্রশ্ন ও প্রতিকারের দাবি তুলছি: সাধারণ আইনে প্রকাশ্য আদালতের বিচার যখন দেশের মানুষ আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত, তখন বিনা বিচারে আটক রাখার আইন কেন? বিদেশী শাসকের নামে রাস্তার নাম পর্যন্ত যখন অপমানজনক বিবেচিত হচ্ছে, তখন জাতীয় অপমানের প্রতীক ইংরেজের তৈরি বক্সা ক্যাম্পে বন্দীদের আটক রাখার ব্যবস্থাই বা কেন? শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিবিদেরা যখন সম্পূর্ণরূপে গণমত ও গণ-বিচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, গোপন কার্যকলাপের কিছুমাত্র সুযোগ সুবিধা যখন তাঁদের বিশেষ পেশায় নেই এবং শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণটাই যখন নির্ভর করে শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিবিদদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার উপর—তখন বাংলার প্রিয়তম শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মীরা বক্সা ক্যাম্পে আটক কেন?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঠকগোষ্ঠী

"বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা"

পৌষ, ১৩৫৬ সংখ্যা "পরিচয়ে" প্রকাশিত "বাংলা প্রগতিসাহিত্যের আত্ম-সমালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধটি আমি সমগ্রভাবে প্রত্যাহার করছি। এদেশে শ্রেণীসংগ্রামের বর্তমান পর্যায় সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী ভ্রান্ত ধারণার ফলেই এই প্রবন্ধটির জন্ম।

এরূপ প্রত্যাহার ঘোষণার প্রয়োজন হবে ভাবি নি। আমার ধারণা ছিল নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল বিষয়টি সমগ্রভাবে পুনর্বিবেচনা-সাপেক্ষ এবং এ লেখাটিও বাতিল বলে বিবেচিত হবে। প্রশ্নটা সামগ্রিক বিচারের, সুতরাং গুরুতর ভুল সত্ত্বেও কোন লেখায় কোন্ কোন্ সঠিক কথা বলা হয়েছিল সেটা তুলে ধরবার চেষ্টা নিরর্থক এবং অনুচিত। সব কিছু বাতিল হোক বা না হোক, সব কিছুই নতুনভাবে বিচার করতে হবে। আনুষঙ্গিক বা আংশিক সত্য যদি বলা হয়ে থাকে তার স্থান হবে ভুলভ্রান্তি সংশোধন করা ও নতুন বিচারের ভিত্তিতে লেখা প্রবন্ধে।

দেখা যাচ্ছে, অনেকের ধারণা এই যে আমি এখনও উপরোক্ত এই প্রবন্ধের মতামত আঁকড়ে আছি। পুনর্বিবেচনার জন্যে তাই এই প্রত্যাহার ঘোষণার প্রয়োজন হল।

আমার এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে ফাল্গুনের "পরিচয়ে" সিতাংশুবাবুর আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটি মার্কসবাদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা-পদ্ধতিকে বৈঠকী তার্কিকের যেন-তেন-প্রকারেণ বিপক্ষকে (?) ঘায়েল করার স্তরে নামিয়ে আনার একটি নিদর্শন বলে মনে হয়েছে। লেখাটি নিয়ে বিশদ আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। আমি শুধু লেখাটির প্রথম প্যারাটির বিচার করব এবং ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক দু'একটি অপ্রাসঙ্গিক অভিযোগের জবাব দেব। কোন লেখার প্রথম প্যারা থেকেই যদি প্রমাণ করা যায় যে সমালোচক তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধটি ভাল করে না পড়েই মার্কসবাদের

উদ্ধৃতিভূষিত আলোচনাটি লিখে ফেলেছেন, তখন সমস্ত লেখাটি নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন থাকে কি ?

ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার একটা মত ছিল, রবীন্দ্র গুপ্ত ঐতিহ্যবিচারের যে নতুন 'ভিত্তি' সরবরাহ করেন, আমি সেটা গ্রহণ করি। এই প্রসঙ্গে আমার আগের মতটা কি ছিল তার বিবরণ আমার প্রবন্ধে দাখিল করি। "আমার মতটা কি ছিল এবং কিভাবে আমি রবীন্দ্র গুপ্তের মত গ্রহণ করেছি একটু বলা দরকার।" (পরিচয়, পৌষ, পৃঃ ৩৬)

সিতাংশুবাবুকে পায় কে! নতুন মত গ্রহণের আগে আমার পুরনো মত কি ছিল তার বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি তুলে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন আমি কেমন নতুন একটা মত মেনে নিয়েও তার বিরোধী কথা লিখেছি।

আরও আছে, প্রথম প্যারাতেই আছে। প্যারার শুরুতেই সিতাংশুবাবু লিখছেন যে আমি "প্রকাশ রায়ের বক্তব্য রবীন্দ্র গুপ্তের লেখা পড়ার পর মেনে" নিবেছি। এটা আংশিক সত্য অবলম্বন করে একটা মিথ্যাকে দাঁড় করানোর চেষ্টা। আমার প্রবন্ধে কি কোনরূপ অস্পষ্টতা আছে যে শুধু ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রকাশ রায়ের মতটা রবীন্দ্র গুপ্তের মতের ভিত্তিতে মেনে নিয়েছিলাম ? প্রবন্ধের গোড়াতেই নম্বর দিয়ে লিস্ট দাখিল করেছি, প্রকাশ রায়ের কোন্ কোন্ বক্তব্য সম্পর্কে আমাব কি বক্তব্য ছিল—এবং নম্বর (২নং বক্তব্য) উল্লেখ করে স্পষ্টই বলেছি যে রবীন্দ্র গুপ্তের লেখা পড়ে কেবল ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার মত বদলেছি। প্রকাশ রায়ের লেখাকে রবীন্দ্র গুপ্ত মোটামুটি সমগ্রভাবে সমর্থন করেন—আমি তা করি নি। প্রকাশ রায়ের খণ্ডিত দৃষ্টি, বামপন্থী বিচ্যুতি না দেখা, যান্ত্রিকতা প্রভৃতির যে সমালোচনা আমার প্রবন্ধে আছে, সেটা কি তাঁর বক্তব্য মেনে নেওয়ার প্রমাণ ?

সিতাংশুবাবু অভিযোগ করেছেন : "এই সম্পর্কে মানিকবাবু গত প্রগতি সাহিত্য-সম্মেলনের ইস্তাহার রচনা নিয়েও কতকগুলি কথা বলেছেন যেগুলি সেই সম্মেলনের ইস্তাহার পুনর্লিখন-কমিটির সভ্য হিসাবে তাঁর বলা ঠিক হয়েছে কিনা তাঁকে ভেবে দেখতে বলি।" (পরিচয়, ফাল্গুন, পৃঃ ৪৯)

অর্থাৎ সিতাংশুবাবু বলতে চান, কমিটির সভায় কিছু না বলে পরে আমার প্রবন্ধে ইস্তাহারটির নিন্দা করা ঠিক হয় নি। কমিটির সভ্য হিসাবে পুনর্লিখিত ইস্তাহার সম্পর্কে আমার দায়িত্ব ভুলে গেছি। নিজেকে বাঁচিয়ে অন্যদের নিন্দা করা আমার অন্যায় হয়েছে।

এও আরেকটা প্রমাণ যে সিতাংশুবাবু আমার লেখাটি ভাল করে না পড়েই সমালোচনা করেছেন। ইস্তাহারটি সম্পর্কে কাকে বা কাদের কটাক্ষ করা হয়েছে আমার প্রবন্ধে? কোথায় অস্বীকার করেছি আমার দায়িত্ব? ইস্তাহারটি মনের মত না হলেও সেটি গ্রহণযোগ্য বলার জন্য, ভাল একটি ইস্তাহার লেখার অক্ষমতার জন্য শুধু আমাকেই বরং আমি খোঁচা দিয়েছি। নিন্দা করেছি, "প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক ও সম্মেলনের কার্যকরী সভাপতি"কে (পরিচয়, পৌষ, পৃঃ ৪৫)। ইস্তাহার পুনর্লিখন-কমিটির সভার বিবরণ স্মরণ আছে, কিন্তু আমিই যে ছিলাম সংঘের সম্পাদক ও সম্মেলনের কার্যকরী সভাপতি সেটা আজ স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে সিতাংশুবাবুকে।

ইস্তাহার পুনর্লিখন কমিটির উল্লেখ আমার প্রবন্ধে নেই। উল্লেখ করলে এ স্বীকৃতিও অবশ্যই থাকত যে আমিও ওই কমিটির সভ্য ছিলাম।

৫১ পৃষ্ঠায় (পরিচয়, ফাল্গুন সংখ্যা) সিতাংশুবাবু লিখছেন: "মানিকবাবুকে আশ্বাস দিচ্ছি তাঁকে শ্রমিক হতে হবে না কেননা শ্রমিক হলেই সাহিত্য লেখা যায় না।"

শ্রেণী-সম্পর্ক, শ্রেণী-বিচ্যুতি, শ্রেণী-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে আমি যা বলি নি তাই আমার বক্তব্য বলে এবং আমি যা বলেছি সেটা বিকৃত করে উপস্থিত করেছেন, তাই কি যথেষ্ট ছিল না? এ ব্যক্তিগত মিথ্যা আক্রমণ কেন? আমি শ্রমিক হতে অনিচ্ছুক, এ নির্লজ্জ ঘোষণা ত আমার লেখায় কোথাও নেই। আমার লেখায় বরং শ্রমিক শ্রেণীকেই ষোল আনা বিপ্লবী, সেরা মানুষ বলে অভিনন্দিত করা হয়েছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে চয়ন করে নয়, সিতাংশুবাবু নিজে আমাকে আশ্বাস দিচ্ছেন। অথচ শ্রমিক শব্দের মানেই তিনি জানেন না। তাই তিনি নির্বিবাদে ঘোষণা করেছেন জগতের শ্রমিক শ্রেণীর নেতা স্টালিনও শ্রমিক নন।

বুঝতে পারা যায় যান্ত্রিক অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি সিতাংশুবাবুকে কোন্ ধাঁধায় ফেলেছে: কারখানায় না খেটে কি করে শ্রমিক হওয়া যায়? শ্রমিক না হয়েও শ্রমিক শ্রেণীর নেতা হওয়া সম্ভব, যেমন স্টালিন, কিন্তু কারখানায় না খাটলে মানুষ শ্রমিক হবে কোন যুক্তিতে?

সিতাংশুবাবু নিজেই এ সমস্যার মীমাংসা করতে পারেন। শ্রমিক শ্রেণীর বন্ধু আছেন, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ, সংগ্রাম ও চেতনা ষোল আনা নিজের করে

নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর একজন হয়ে পড়ুন। দেখবেন, কারখানায় খাটতে ছাড়া এভাবেও শ্রমিক হওয়া যায়—শ্রমিক শ্রেণীর একজন হওয়ার যুক্তিতে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

"গোর্কির 'মা' ও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব"

'পরিচয়'-এর পৌষ, ১৩৫৬ সংখ্যায় উপরোক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত গোলাম কুদ্দুস সাহেবের কয়েকটি সিদ্ধান্ত ও সে সম্পর্কে আমার মতামত নিচে যথাক্রমে লিপিবদ্ধ করছি :

(ক) "পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকমাত্রেই শোষিত...শোষিত শ্রেণীর মধ্যে খেতমজুর, গরীব কৃষক এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তও রয়েছে। নিজেদের মুক্তির জন্য এদের সকলেরই সংগ্রাম পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং তদীয় সামন্ততান্ত্রিক অনুচরবর্গের বিরুদ্ধে।"

এখানে প্রথমত ভারতকে ধরা হয়েছে প্রাক্-বিপ্লব রুশিয়ার সমপর্যায়ভুক্ত বলে ; অর্থাৎ, ভারতও পুঁজিবাদী দেশমাত্র—সে যে আসলে সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ, তা অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে রাজনৈতিকভাবে বামপন্থী বিচ্যুতি ঘটেছে, যা পরিষ্কার হয়েছে একটু পরে।

(খ) "এদেশে যাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব এবং শ্রেণী সংগ্রামকে পাকেচক্রে অগ্রাহ্য করে ধনী কৃষক, মাঝারি শিল্পপতি বা মুষ্টিমেয় তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে মিলে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের ধাপ্পা দিচ্ছেন, ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' তাঁদের মুখোশ উদ্‌ঘাটনেরও একটা শক্তিশালী অস্ত্র। কারণ গোর্কি দেখিয়েছেন, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে খেতমজুর ও গরীব কৃষকের সঙ্গে যোগাযোগের পথেই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।"

এখানে জনাব কুদ্দুসের বামপন্থী বিচ্যুতি স্পষ্ট। তিনি কেবলমাত্র খেতমজুর, গরীব কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্তকেই শ্রমিক নেতৃত্বে সংগঠিত করতে চান—যার গূঢ় অর্থ এদেশে একমাত্র পুঁজিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এতে তিনি যান্ত্রিকভাবে, মার্কসবাদের শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে এদেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন চালাতে চান। এদেশ এখনও উপনিবেশ, কিন্তু তিনি তা অস্বীকার

করেন। এদেশে গণফ্রন্ট হবে শ্রমিকনেতৃত্বে কৃষক, মধ্যবিত্ত ও এমন কি জাতীয় বুর্জোয়াদেরও নিয়ে ; যা চীন বিপ্লবের শিক্ষা। তিনি এটা অস্বীকার করছেন।

(গ) "খেতমজুর ও গরীব কৃষকের উপর শ্রমিকনেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথেই গোর্কি D. F.'র নির্দেশ দিয়েছেন। তার সঙ্গে ছাত্র, মধ্যবিত্ত আছে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা যে মোটেই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অন্যতম ভিত্তি হতে পারে না, একথা আমাদের বিপ্লবী সাহিত্যিকগণ যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন ততই মঙ্গল।"

এখানেও ঐ পুরনো ভুল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করা হয়েছে। চীনের শিক্ষা নেওয়া হয় নি। লেনিন-স্টালিনের শিক্ষা জনাব কুদ্দুস শুধুমাত্র মুখস্থ করেছেন। আমাদের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও তার সঙ্গে আপসকারী বুর্জোয়া আমলাতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে ; আমাদের দলে নিতে হবে কৃষক-মধ্যবিত্ত-জাতীয় বুর্জোয়াদের। বিপ্লবের নেতা হবে শ্রমিক শ্রেণী। এই হচ্ছে প্রত্যেক উপনিবেশের গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের স্বরূপ—চীনে, ভিয়েৎনামে যা অনুসরণ করা হয়েছে।

(ঘ) "আজ ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে খেতমজুর, গরীব কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শোষকের বিরুদ্ধে প্রবল শ্রেণীসংগ্রাম শুরু করেছে এবং সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক বিরাট গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তুলছে।"

বাস্তবকে প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। এটি যে বাস্তব অবস্থা ছিল না তা পরিষ্কার বোঝা গেছে গত দাঙ্গার ব্যাপারে। এই বাড়িয়ে দেখা ও ভুল বিশ্লেষণ জনাব কুদ্দুসের বামপন্থী বিচ্যুতি।

(ঙ) "বাংলার বিপ্লবী সাহিত্যেরও মূল কথা সাহিত্যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা।...তাকে আরও অগ্রসর হতে সাহায্য করা ত দূরের কথা বাংলার বিপ্লবী সাহিত্য তার তালে তাল রেখে চলতে পারছে না।...মজুর শ্রেণী তাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে।"

সাহিত্য ক্ষেত্রেও ঐ বামপন্থী মনোভাব আমদানির চেষ্টা চলছে। অর্থাৎ, জনসাধারণের অন্যান্য অংশকে অগ্রাহ্য করে শুধু শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে সাহিত্য রচনা। আমরা লিখব শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে—শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের সম্বন্ধে। গণসংগ্রামের সাথে গণসাহিত্যকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত করব ; দেখাব যে শ্রমিকনেতৃত্ব ছাড়া জয়লাভ অসম্ভব। এ সমালোচনা হবে সহানুভূতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

আলোচ্য প্রবন্ধটি মূলত রাজনৈতিক। বামপন্থী মনোভাব প্রচারের উদ্দেশ্যে লেখা। সাহিত্যে শ্রমিকনেতৃত্ব সম্বন্ধে কোন কথাই নেই—আছে এক "নিজস্ব মত"। প্রথমত ঐ ধরনের প্রবন্ধের স্থান হওয়া উচিত কোন রাজনৈতিক পত্রিকায়। দ্বিতীয়ত জনাব কুদ্দুস এমন দুটি ভুল করেছেন যা মার্কসবাদীর পক্ষে অমার্জনীয়—(১) লেনিনবাদকে যান্ত্রিকভাবে জোর করে চাপাতে চেয়েছেন দেশের বাস্তব অবস্থা অস্বীকার করে; (২) সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি অতি-বামপন্থীর পথ নিয়েছেন, তিনি মার্কসবাদ অগ্রাহ্য করেছেন।

সুরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা

'পরিচয়'-এর পথ

পরাধীন দেশের লেখক ও শিল্পী আমরা। আমরা যে কালিতে লিখি তা আসে বিলাত থেকে, যে কলমে আঁচড় কাটি তার গায়ে লেখা থাকে "মেড-ইন্-আমেরিকা"। আমরা শিল্পীরা প্রতিভার জোরে যে সুরের ঝঙ্কার সৃষ্টি করি, তাকে ছড়িয়ে দেবার একচেটে অধিকার বড় বড় বিলাতি কোম্পানির। আমাদের দেশের সব চেয়ে জনপ্রিয় শিল্প—ফিল্ম্-শিল্পের উপকরণ সংগ্রহের একমাত্র উৎস হল আমেরিকা। কিন্তু পরাধীনতার এত কলঙ্ক সারা গায়ে মেখেও কোন কোন লেখক ও শিল্পীকে আজ আমরা বলতে শুনি—আমরা স্বাধীন হয়েছি! সাম্রাজ্যবাদের বেড়াজাল নাকি সরে গেছে, জাতীয় সংস্কৃতির অরুণোদয়ের আলো আমাদের বর্তমানকে নাকি দীপ্তিময় করতে চলেছে! কংগ্রেসী পত্র-পত্রিকায়, কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ বা তার নেতৃত্বে পরিচালিত প্রত্যেকটি সাহিত্যিক বা শিল্পীসঙ্ঘের ফতোয়ায় এবং কংগ্রেসী চিন্তানায়কদের বক্তৃতায় স্বাধীন ভারতের অফুরন্ত সম্ভাবনার কত রঙিন নেশাই না দিনের পর দিন সুপরিকল্পিত কৌশলে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে!

কিন্তু ১৫ই অগস্টের নেশা লেখক ও শিল্পীর চোখের পর্দায় মুহূর্তের জন্য চমক লাগায়, কঠোর বাস্তবের আঘাতে মাত্র মাস কয়েকের মধ্যেই সকল নেশা যায় টুটে। সস্তা বিকৃত-রুচি মার্কিন বইয়ের আমদানিতে বাজার যখন ছেয়ে যায়, পাকিস্তানের বাজার হিন্দুস্থানের লেখকের পায়ের তলা থেকে যখন সরে যায়, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দৈন্যের জন্য বইয়ের বাজারে যখন সংকট দেখা দেয়, তখন লেখক নিজের আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে দিয়ে আত্মীয়তার সন্ধান পান সাধারণ পাঠকের সঙ্গে। লেখক হিসাবে, নাগরিক হিসাবেও তাঁর দৈন্য, ক্লীবতা তাঁকে পীড়া দেয়, উত্তেজিত করে, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের যোগাযোগকে ঘনিষ্ঠতর করে তোলে। লেখক ও পাঠক নিজস্ব আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে থেকে দেখেন যে, জাতির অর্থনৈতিক 'বনিয়াদ' আজও আগের মতই ঔপনিবেশিক জীবনধারার

কাঠামোর মধ্যে বাঁধা। তাঁরা দেখেন—টাটা-বিড়লার যোগসাজতে বিদেশী ধনিকের দোর্দণ্ড প্রতাপ কমে নি একটুও, বরং ব্রিটিশ ও মার্কিন ধনিকদের যৌথ শোষণ বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। দেশের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের কথা ছেড়েই দিলাম, মাঝারি গোছের জাতীয় শিল্পগুলোও আজ বিদেশী ধনবাদ আর স্বদেশী টাটা-বিড়লা নিয়ন্ত্রিত একচেটিয়া ধনবাদের যৌথ শাসন ও শোষণে আগের থেকেও মরণোন্মুখ। ঔপনিবেশিক সমাজের চিহ্নগুলো সব বেঁচে ত আছেই, বরং এই সমাজের সংঘর্ষ তীব্রতায় আগের সমস্ত অবস্থাকেই ছাড়িয়ে গেছে। শ্রমজীবী জনতার অর্থনৈতিক মানের ক্রমাবনতিই হল এর সব চেয়ে জাজল্যমান প্রমাণ।

শুধু ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চিরসাথী দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ আর মুদ্রাস্ফীতিই যে জাতির জীবনকে কণ্টকিত করে রেখেছে তা নয়, এই অর্থনীতির উপর আগের মতই বেঁচে রয়েছে এক দস্যুসুলভ রাজনীতির প্রকাণ্ড পিরামিডও। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সেই যন্ত্রগুলো—যেগুলো এতদিন যাঁতাকলে পিষে এসেছে দেশের কঙ্কালসার মানুষগুলোকে শাসন ও শৃঙ্খলার নামে, সেই আমলাতন্ত্র, সেই পুলিস, সেই মিলিটারির রাজত্ব আজও কায়েম রয়েছে। ক্ষুধা মিছিলের উপর আগে যেমন চলত বেয়নেটের গুঁতো, বন্দুকের গর্জন আজও তাই চলে। বে-আইনী আইনের কসরতে আগে যেমন হাজার হাজার দেশবাসীকে জেলের হাজতে পচে মরতে হত, আজও তাই হয়। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বললেই আগে যেমন চিৎকার করা হত 'রাজদ্রোহ-রাজদ্রোহ' বলে, আজও তাই চলে। আজও আগের মতই বহুবাজারের বুকে ঘরের বউ-এর উপর বন্দুক চলে, আইনের প্যাঁচ কসা হয় জেলের দরজা খুলে রাখার জন্তে, নিরীহ কৃষক-মেয়ের রক্তে গ্রামের সবুজ মাটি আগের মতই লাল হয়ে যায়।

লেখক ও শিল্পীদের সংবেদনশীল মনে জনতার এই ব্যথা, মানুষের এই অবমাননা, মনুষ্যত্বের এই প্রতিরোধ ঝড়ের তুফান না তুলে পারে না। সমাজের প্রবুদ্ধ চেতনার সাড়া সব চেয়ে আগে বাজে লেখক ও শিল্পীর বুকে। মানুষের মনের তারা কারবারি, জনতার তারা বিবেক। তাই মানবতার স্বপক্ষে তাদের কথা না বলে উপায় কি? জোলার কলম তাই একদিন অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছোরার আঘাত হেনেছিল, আর হেনেছিল গোর্কীর, রোঁলার, সকল দেশের সত্যিকারের মনীষীর।

এমনি ভাবেই আমাদের দেশেরও প্রতিটি স্বদেশপ্রেমিক, গণতন্ত্রপ্রিয় লেখকের লেখনী আঘাত হেনেছে সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার বুকে। সত্যানুসন্ধানের পথেই পরাধীন দেশের লেখক প্রবেশ করে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সে হয় স্বেচ্ছা-সৈনিক। লেখনীকে সে গ্রহণ করে তার অস্ত্র হিসাবে। তাই আমাদের দেশের সংস্কৃতি-সংগ্রামের একশো বছরের ইতিহাসে লেখক ও শিল্পীদের পক্ষ থেকে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শয়তানি ও পাশবিকতার বিরুদ্ধে সত্য ও মানবতার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিজ্ঞা। হাজার দুর্বলতা সত্ত্বেও মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যে, বঙ্কিমের আনন্দমঠে, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধে প্রতিধ্বনিত হয় পরাধীন জাতির জীবনাবেগ। এই জীবনাবেগ ও সত্যানুসন্ধানই রবীন্দ্রনাথকে সাম্রাজ্যবাদের শত্রু-শিবিরের নির্ভীকতম সৈনিকের সারিতে এনে হাজির করে। এই সত্যানুসন্ধানের আবেগ রাজনীতির ভাষায় প্রকাশ পায় 'সভ্যতার সংকটের' পাতায়। এই আবেগেই রবীন্দ্রনাথ কলম ধরেন ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে। এই আবেগেই সাম্রাজ্যবাদী শয়তানির বিরুদ্ধে জনতার রাজনীতি রবীন্দ্রনাথের জ্বালাময়ী ভাষায় প্রাণ পায় জালিয়ানওয়ালাবাগের পরে রাজ-পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের যুগান্তকারী ঘটনায়। এই আবেগেই সুকান্তের কলমে আরও পরে আগুন ঝরে, আর আজ ঝরে আরও অনেকের। বক্সার অন্ধকার, তেলেঙ্গনার সত্য, ২৯শে জুলাই-এর অঙ্গীকার তাই আজ নতুন যুগের লেখক ও শিল্পীদের বুকে জাগায় সাড়া, তাদের সৃষ্টিতে জাগায় নতুন করে প্রাণের স্পন্দন।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লেখক ও শিল্পীর এই সংগ্রাম শ্রেণী-নিরপেক্ষ সংগ্রাম নয়। তাই যে-সব লেখক একদিন সাম্রাজ্যবাদের বর্বরতার মধ্যে দেখত মানবতার অবমাননা, আজ তাদের অনেকে তার মধ্যেই দেখে পশ্চিমী সভ্যতার ও গণতন্ত্রের জয়ধ্বজা! যে-সব কংগ্রেসী লেখকের কলম দিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ আর জালালাবাদের স্মৃতি রক্ত ঝরিয়েছে, সেই সব লেখকেরা আজ কাকদ্বীপ আর চন্দনপীড়ির কৃষক মেয়ের রক্তে, পুরনো দিনের আমলাতান্ত্রিক বড়কর্তাদের হার মানিয়ে; খুঁজে বেড়ান ডাকাতির ষড়যন্ত্র, বিশৃঙ্খলার বীজ-মন্ত্র! কংগ্রেসী লেখক ও শিল্পীরা একদিন যাঁরা ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের চরম শত্রু, আজ তাঁরা হলেন পরম ভক্ত।

প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে—কেন এমন হল? যে শ্রেণীর স্বার্থ-সচেতনতা, যার

ভাব-ভাবনা কংগ্রেসী সাহিত্যের ছিল মূল উপজীব্য, সেই শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকার আজ অবসান হয়েছে। তাই কংগ্রেসী সাহিত্যে আজ সাম্রাজ্যবাদের এই স্তব-স্তুতি!

অবশ্য, এ-কথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে একদিন এই কংগ্রেসী সাহিত্যই ছিল পুরোপুরি জাতীয় সাহিত্য, এমন কি জনগণের সাহিত্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার সামাজিক ভিত্তি হিসাবে প্রথম থেকেই নির্ভর করে ভারতের সামন্তবাদী শক্তিগুলোর উপর। এই সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদী মিতালির বিরুদ্ধে সেদিন একটি বলিষ্ঠ শক্তি ছিল ভারতের ধনবাদ। এই ধনবাদ ছিল তখন সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদের শত্রুপক্ষ, ভারতের সমাজ বিবর্তনে এক উন্নততর ও প্রগতিশীল শক্তি। এই ধনবাদের বাহক ছিল সেদিন ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী এবং সেইজন্য এই বুর্জোয়া শ্রেণীই সেদিন ছিল কংগ্রেসী আন্দোলনের তথা জাতীয় সংগ্রামের নেতা। এই সময়ে ধনবাদী সাহিত্যে জাতির এই আত্মনির্ভরতার আবেগ প্রতিধ্বনিত হয় প্রতিটি ছত্রে। সাম্রাজ্যবাদের বর্বরতা হয় চিহ্নিত। স্বাধীন চেতনা প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। সামন্তবাদী আবিলতার ও ক্লীবতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায় যুক্তি, বিজ্ঞান ও গতিশীলতা। রামমোহন-মাইকেল-বঙ্কিম-দীনবন্ধু বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিমাণে ছিলেন এই সত্যেরই সাধক। রবীন্দ্রনাথ হলেন এই ধনবাদী সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক।

কিন্তু ঔপনিবেশিক দেশের একটি বৈশিষ্ট্যই হল যে এখানে ধনবাদ তার জন্মের ক্ষণ থেকেই একদিকে সাম্রাজ্যবাদ আর একদিকে সামন্তবাদের সঙ্গে গাঁট-ছড়া বাঁধা। তাই সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার ভূমিকা হল একান্ত দোলায়মান। ঔপনিবেশিক ধনবাদের বাহক বুর্জোয়া শ্রেণী যে হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি, আমাদের দেশের বুর্জোয়া সাহিত্যও সেই হিসাবেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাহিত্য। তাই এই সাহিত্যে আশার পাশেই আছে নিরাশা, দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আছে একটা আধ-ফোটা স্বপ্ন, সার্থকতার সঙ্গে মিশিয়ে থাকে ব্যর্থতার গ্লানি, যুক্তি ও বিজ্ঞানের পাশাপাশি এসে ভিড় করে থাকে জাতির পুঞ্জীভূত হাজার কু-সংস্কারের জের। বঙ্কিম-দীনবন্ধুর সাহিত্যে এর প্রমাণ মেলে যথেষ্ট। আরও মেলে বাঙলার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে—মিনার্ভা-স্টার প্রভৃতি থিয়েটারের উদ্যোগে অভিনীত প্রায় প্রত্যেকটি নাট্য-নাটিকায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ভারতের ধনবাদের যেটুকু বিরোধী ভূমিকা ছিল তারও ক্রমশ অবসান হয়ে আসে—বিশেষ করে এই ধনবাদের শাঁসালো অংশটা অর্থাৎ টাটা-বিড়লা প্রমুখ উপরতলার বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চলে যেতে থাকে। ১৫ই অগস্টের ঘটনাটা—ভারতের ধনবাদের উপরতলার অংশটার সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণের পালার পূর্ণ পরিসমাপ্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদের সঙ্গে ভারতীয় ধনবাদের একাংশের এই মিতালি জাতীয়-মুক্তি-সংগ্রামের প্রকৃতিতে এক গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসে।

বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশের এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণ ছিল যথেষ্ট। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দুনিয়ার ধনবাদের সংকট এত চরমে ওঠে যে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ এলাকায় ধনবাদের কবর রচিত হয়। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজবাদের অট্টালিকা। এই ঘটনাটি পৃথিবীর সর্বত্র ধনবাদী শক্তিগুলিকে আতঙ্কিত করে তোলে। এদেশেও তার ব্যতিক্রম হয় না। উপরন্ত এদেশেও ধনবাদের কবর-রচয়িতা শ্রমিক শ্রেণী একটি শক্তি হিসাবে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই আত্মপ্রকাশ করে। এই অবস্থায় বুর্জোয়া শ্রেণীর উপরতলার অংশটি এই নতুন বৈপ্লবিক শক্তিকে সাম্রাজ্যবাদের থেকেও অধিক শত্রুস্থানীয় বলে মনে করে। তাই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধের স্থানে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বোঝাপড়াই হয় তাদের প্রধান ভরসা।

বুর্জোয়াদের সংগ্রাম কামনায় যেমন ভাঁটা পড়তে থাকে, তেমনি ধনবাদী সংস্কৃতিরও বিপ্লবী ভূমিকায় ছেদ পড়তে থাকে। রবীন্দ্রনাথের পর থেকেই ধনবাদী সংস্কৃতির সংকট স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে। ধনবাদী সংস্কৃতিতে ক্রমশ জাতীয়তার আবেগ, মানবতার অনুভূতি শিথিল হয়ে আসে, বুর্জোয়া সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথের নাম ভরসা করে কেবলই মৃত-জীবনের মন্ত্র জপ করতে থাকে। ১৫ই অগস্টের পর থেকে টাটা-বিড়লার পৃষ্ঠপোষিত কংগ্রেসী সাহিত্য পুরনো প্রগতিশীল জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। তাই বিজ্ঞানের স্থানে অধ্যাত্মবাদ, মানবতার স্থানে পশুপূজা, জাতির সমষ্টিগত শক্তির স্থানে মহাপুরুষের আরাধনা—এই সাহিত্যের আজ মূল উপজীব্য।

কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশ যেমন আজ সাম্রাজ্যবাদের দোসর, তেমনি সাম্রাজ্যবাদের আজ আর এক বলিষ্ঠতর শত্রু বিদ্যমান। এই শক্তি হল শ্রমিক

শ্রেণী। এই শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং কৃষক শ্রেণী, মধ্যবিত্ত ও মাঝারি শিল্প-পতিদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আজ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নতুন ভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এই সব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী ও একচেটিয়া ধনবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির স্পর্শে এক নতুনতর বলিষ্ঠ সংস্কৃতিও রূপ গ্রহণ করছে ধনবাদের সংকটের দিন থেকেই। নতুন নেতৃত্বে সংস্কৃতির মরা গাঙে আবার জোয়ার আসছে। যে সমস্ত লেখক ও শিল্পী এক সময়ে বুর্জোয়া জীবনাদর্শের প্রভাবে ছিলেন, তাঁরা ক্রমশ জীবন ও শিল্প-সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করে নতুন মতাদর্শ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসছেন। যতদিন যাবে এই সত্যটি প্রতিটি গণতন্ত্র-প্রিয় ও স্বাধীনতা-প্রিয় লেখকের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-একচেটিয়া ধনবাদের হাজার চক্রান্ত সত্ত্বেও আজকের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্রেণীগুলির সংস্কৃতি-আন্দোলনের দুর্বার গতিকে রুখতে পারে—এমন সাধ্য আজ কারো নেই। প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীরা আজ ভারতের নতুন ইতিহাসের রচয়িতা, প্রসিদ্ধ ফরাসী চিন্তাবীর বালজাকের ভাষায় তারা হল আজ Secretary of History। প্রগতিশীল সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ আজ শত সম্ভাবনায় ভরপুর।

এই নব সম্ভাবনার পরিচয়-বার্তা বহন করে চলবে 'পরিচয়'। 'পরিচয়' হবে এই সংস্কৃতি-বিপ্লবের নির্ভীক সৈনিক।

সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল ধনবাদী সংস্কৃতির ধ্বংসসাধনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা 'পরিচয়ের' হবে প্রধান ও পবিত্র ব্রত। এই কাজে সাফল্যলাভের জন্য 'পরিচয়' সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে এক ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মুখপত্র হিসাবে কাজ করবে।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে 'পরিচয়' যে সব ভাবধারা ও শিল্প-তত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করবে তা হল মোটামুটি এই—গোটা জাতির জনসাধারণের সঙ্গে মিলে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র আর একচেটিয়া ধনবাদকে পুরোপুরি পরাস্ত করার জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালাবে। এই কাজকে জোরদার করে তুলতে পরিচয় সাহিত্য ও শিল্পের হাতিয়ারকে গ্রহণ করবে। সাম্রাজ্যবাদী আর আধা সামন্ততান্ত্রিক শিল্প-সাহিত্যের বনিয়াদ হিসাবে যে-সব শিল্পতত্ত্ব আজও বিদ্যমান তার বিরুদ্ধে পরিচয় দুর্জয় অভিযান চালাবে। জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য ও দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদ নানারূপ সমাজবিরোধী নীতির আশ্রয় নেয়। সাম্রাজ্যবাদ প্রচার করে

'শিল্পের জন্য শিল্প'। অর্থাৎ তারা প্রচার করে—জনসাধারণের জন্য লিখো না, তাতে করে আর্টের অবনতি ঘটবে ও তোমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হবে। বলাই বাহুল্য, 'পরিচয়' এই ধরনের সমাজবিরোধী শিল্প-তত্ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

সাম্রাজ্যবাদের আর একটি চেষ্টা হল সংস্কৃতির মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করা। সাম্রাজ্যবাদ প্রচার করে—তোমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ, অন্য ধর্মগুলি বর্বরতার পরিচায়ক। হিন্দু ও মুসলমান-মিলন কি করে সম্ভব যখন তাদের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা স্পষ্টই সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থসেবী ধারা, এই কারণে 'পরিচয়' তার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবে।

সাম্রাজ্যবাদ ও তার এজেন্টদের জনগণকে অন্ধকারে রাখার আর একটি উপায় হল শাসক জাতির ভাষা জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে প্রত্যেকটি জাতি ও প্রদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির ধ্বংসসাধন করা। নেহরু সরকার ইংরেজির মৌরসী পাট্টায় হাত না দিয়ে আর হিন্দীভাষা অন্য প্রাদেশিক জাতিগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে জাতীয়তা-বোধের মূলে কুঠারাঘাত করছে, এবং প্রাদেশিকতায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। 'পরিচয়' ভাষার-ক্ষেত্রে এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালাবে।

(৩) এছাড়া পরিচয় নিশ্চিত জানে যে সাম্রাজ্যবাদ-প্রচারিত এই সব সমাজ-বিরোধী ভাবধারা দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি-চক্রের প্রচার-যন্ত্রের অংশ মাত্র। এই সব তত্ত্ব ইওরোপ আমেরিকার ধনবাদী দেশগুলির শিল্প-সাহিত্যের প্রভাবে গড়ে উঠেছে। কাজেই এই সংস্কৃতির গুরুস্থানীয় সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন ও ব্রিটিশ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক যারা—যেমন এলিয়ট, রাসেল, পাউণ্ড প্রভৃতির সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারার বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার পবিত্র সঙ্কল্পও 'পরিচয়' গ্রহণ করবে।

একদিকে 'পরিচয়' যেমন জনগণের শত্রুস্থানীয় এই সাংস্কৃতিক ধারার ধ্বংস-সাধনে অগ্রণী হবে, তেমনি সচেষ্ট হবে এক নতুন বলিষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচয় যে সংস্কৃতি গড়ে তুলবে তা হবে: চরিত্রে জাতীয় সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়নের বিরোধিতা করবে এবং জাতির মর্যাদা ও স্বাধীনতার দাবি জানাবে। এ সংস্কৃতির মালিক হবে আমাদের জাতি। আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য হবে এর বৈশিষ্ট্য।

আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের সমস্ত সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে 'পরিচয়' খুঁটিয়ে বিচার করে গ্রহণ করবে। সমস্ত প্রগতিশীল আর সুন্দর ঐতিহ্যকে আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। 'পরিচয়' জানে, আমাদের নতুন সংস্কৃতিও পুরনো সংস্কৃতি থেকে এসেছে, অতএব আমাদের নিজের ইতিহাসকে শ্রদ্ধা করতে হবে, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া চলবে না। অবশ্য তাই বলে প্রাচীন আমলকে পূজা ও আধুনিক আমলকে বাতিল করা চলবে না। ইতিহাসকে এই সম্মানের আসন দেওয়ার অর্থ তাকে অন্যান্য বিজ্ঞানের মধ্যে তার যোগ্যস্থানে বসাতে হবে।

'পরিচয়' যে সংস্কৃতির বাহন হবে, সেই সংস্কৃতি প্রকৃতিতে হবে গণ-সংস্কৃতি; সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জনেরও বেশি মেহনতী জনতার স্বার্থ রক্ষা এর কাজ। বাস্তবতার গভীরে পরিচয়ের লেখকদের ডুবতে হবে, এবং তাকে রূপ দিতে হবে। নৈতিক বিষয়বস্তুতে ও প্রকাশভঙ্গিতে সমৃদ্ধ গণ-সাহিত্য ও গণ-শিল্প 'পরিচয়' সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে, যে সৃষ্টি জনগণ গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়বে, দেখবে, শুনবে এবং যে-সৃষ্টির মারফৎ জনগণকে শিক্ষিত করে তুলবার মহৎ সাধনায় আমরা সিদ্ধিলাভ করব। কারখানায় ও গ্রামে আমাদের জনতার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের দিকে 'পরিচয়' মনোযোগ দেবে যাতে জনতার মধ্যে থেকে নতুন নতুন লেখক আর শিল্পী এগিয়ে আসতে পারেন।

সাম্রাজ্যবাদী আর আধা-সামন্ততান্ত্রিক শিল্প-সাহিত্যের যে-সব প্রভাব এখনও আমাদের লেখকদের উপর রয়েছে, 'পরিচয়' সচেতনভাবে তাকে নিশ্চিহ্ন করতে চেষ্টা করবে এবং অন্যান্য দেশের ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির যে-সব প্রভাব আমাদের শিল্প-সাহিত্যকে আজও আড়ষ্ট করে রাখছে, তার বিরুদ্ধেও লড়াই চালাবে। অন্যান্য জাতির সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও প্রগতিশীল জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে 'পরিচয়' পরিবেশন করবে, তাদের সাথে পারস্পরিক গ্রহণ ও বিকাশের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবে, দুনিয়ার প্রগতিশীল সংস্কৃতির অংশ হিসাবে পারস্পরিক ভিত্তিতে তাদের সাথে কাজ করবে। দেশাত্মবোধ ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে জৈব সম্পর্ককে আন্তরিকতার সঙ্গে বিকশিত করে তুলে 'পরিচয়' সোভিয়েট রুশিয়ার মূল্যবান অভিজ্ঞতাগুলিকে পরিবেশন করবে।

পরিচয় মনে করবে—রাজনৈতিক যুক্ত ফ্রন্ট যেমন, তেমনি শিল্প ও

সাহিত্যের যুক্ত-ফ্রণ্টে স্বভাবতই যতগুলি বিভিন্ন শ্রেণী আছে ততরকম শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে। দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা কোন প্রকারেই এখনই দূর করা যাবে না। কাজেই 'পরিচয়' এই বিভিন্নতা স্বীকার করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে তার পাতায় স্থান দেবে; সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সবচেয়ে যা বলিষ্ঠ ও বিজ্ঞান-সম্মত সেই মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেবে, প্রচার করবে। জনগণের কাজে লাগার এই সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে সাহিত্যিক ও শিল্পী চক্রগুলির পারস্পরিক সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিয়ে এবং লেখক ও শিল্পীদের নিজেদের প্রচেষ্টায়। এই কাজে 'পরিচয়' হবে প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীদের প্রধান হাতিয়ার।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচয় তার নতুন পথে জয়যাত্রা শুরু করবে। পরিচয় আজ কুড়ি বছর ধরে এক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। সেই ঐতিহ্যের যা-কিছু ভাল, নতুন 'পরিচয়' তাকে গ্রহণ করবে, যা-কিছু মন্দ তাকে বর্জন করবে। এই লেখা নিয়ে 'পরিচয়' সাহিত্য জগতে এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করবার আশায় বুক বাঁধছে। এই কাজে 'পরিচয়' দল-মতনির্বিশেষে প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লেখক ও শিল্পীর সহযোগিতা চায়।

'পরিচয়ে'র বিষয়-বিন্যাস এখন থেকে এই নতুন লক্ষ্যের উপযোগী হবে। 'পরিচয়ে'র মূল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যকে সফল করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতি সংখ্যায় অন্তত একটি করে মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশের চেষ্টা করা হবে এবং একই উদ্দেশ্যে কখনও কখনও মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্ব ও সাহিত্য বিচার সম্পর্কে ক্লাসিক প্রবন্ধের অনুবাদ এবং অন্যান্য দেশের লেখক ও মনীষীদের লেখা মৌলিক প্রবন্ধের অনুবাদ 'পরিচয়' পরিবেশন করবে। এ-ছাড়া, সার্থক গল্প-কবিতা-নাটিকা রস-সাহিত্যের প্রাচুর্যে পরিচয়ের সাংস্কৃতিক সত্তার উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। এ-ছাড়া 'পরিচয়ে'র কতকগুলি বিশেষ আকর্ষণ থাকবে। সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা হবে একটি প্রধান আকর্ষণ। লেখক ও পাঠকের দূরত্বের অবসান করা আর প্রত্যেক দুটি লেখকের মধ্যে আলোচনার সাহায্যে উন্নততর সৃষ্টির কাজকে ত্বরান্বিত করা হবে এই ক্ষেত্রের প্রধান কাজ। পত্রিকা-প্রসঙ্গ হবে একটি স্থায়ী আকর্ষণ—দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার বাহক প্রধান প্রধান পত্রিকাগুলির সমালোচনা ও প্রগতিশীল ভাবধারার বাহক দেশী ও বিদেশী পত্রিকাগুলির সঙ্গে পাঠকদের

যোগসাধন করা হবে এই আর্কষণের লক্ষ্য, এ-ছাড়া ফিল্ম-রেডিও প্রভৃতি শিল্প-মাধ্যমের আলোচনা করা এবং এ-সম্পর্কে তত্ত্বমূলক দেশী-বিদেশী প্রবন্ধ পরিবেশন করা হবে আর একটি দায়িত্ব। 'পরিচয়' প্রগতি লেখক আন্দোলন, গণ-নাট্য আন্দোলন, শিল্পী আন্দোলন ও শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কিত আন্দোলনের খবর যথাসম্ভব পাঠকদের পরিবেশন করবে। এ-ছাড়া 'পরিচয়ে'র আরও একটি স্থায়ী আকর্ষণ হবে শান্তি-আন্দোলনের খবর সংগ্রহ করা ও প্রকাশ করা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধ-চক্রান্তের প্রতিরোধে দেশী ও বিদেশী লেখকদের শান্তি প্রতিষ্ঠার উত্তমকে তুলে ধরাই হবে এই অংশের কাজ। বলাই বাহুল্য প্রত্যেকটি সংখ্যায় এই সবগুলি আকর্ষণের স্থান দেওয়া সম্ভব হবে না। উপরোক্ত আকর্ষণগুলিকে কোনটি এক-সংখ্যায়, কোনটি অপর-সংখ্যায় স্থান দিয়ে 'পরিচয়ে'র আকৃতিকে নতুন প্রকৃতির অনুগামী করে তোলার চেষ্টা হবে।

এখানে 'পরিচয়ের পথ'-এর খসড়া হিসাবে যেটুকু দেওয়া হল সেটুকু 'পরিচয়ে'র নতুন পথের ইঙ্গিত মাত্র। 'পরিচয়ে'র পাঠকদের আহ্বান জানান হচ্ছে এই খসড়া সম্পর্কে মতামত দিতে। তাঁদের সমালোচনা ও নির্দেশের মধ্যে দিয়ে যে পূর্ণাঙ্গ পথের সন্ধান মিলবে—সেটাই হবে 'পরিচয়ে'র সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী পথ। সেই পথের সন্ধানে এই খসড়াটি প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক কলা প্রেস, ৬২এ, ক্রিক স্কুল স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত
এবং ৩০৯, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

পরিচয়

বিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : ভাদ্র ১৩৫৭

লেনিন ও সাহিত্যের সমস্যা

এ. মায়াস্নিকভ

লেনিনের পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষে এক প্রবন্ধে গোর্কি লিখেছিলেন, "সাহিত্য-চর্চাকারীরা স্বভাবতই উদ্দাম কল্পনার পক্ষবিস্তারকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন—সেই রকম এক একটি মুহূর্তে মাঝে মাঝে আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, নতুন জগতকে লেনিন কি ভাবে দেখেছেন ? আর সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয় এক আশ্চর্য সুন্দর ছবি—স্বাধীন মানুষের শ্রমে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে পৃথিবী রূপ নিচ্ছে প্রকাণ্ড এক মরকত মণির···শ্রমশিল্প-বিজ্ঞানের দ্বারা শ্রমের উৎকর্ষসাধন হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে তার সামাজিক তাৎপর্য—আর শ্রম হয়ে উঠেছে মানুষের কাছে আনন্দের উৎস।"[৮] মানুষের জন্যে সুখী ভবিষ্যত গড়ে তোলার সংগ্রামে এবং কমিউনিজ্‌ম্-এর সাফল্যের জন্যে লেনিন তাঁর মহান জীবন সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন। গোর্কি লিখেছেন, "অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ভ্‌লাদিমির ইলীচ্ লেনিনের জ্ঞান এত গভীর ছিল যে ভবিষ্যত থেকে তিনি বর্তমানকে পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শ্রমিক-কৃষকের অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য যে অবশ্যম্ভাবী এবং নিকট ভবিষ্যতেই যে তা ঘটবে একথা তিনি অনেক আগেই—১৯০৭ সালে লণ্ডন পার্টি কংগ্রেসের সময় থেকেই—বুঝতে পেরেছিলেন। অন্য কারও যে ক্ষমতা ছিল না, তাঁর সেটা ছিল—তিনি ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। এই ক্ষমতা তাঁর ছিল, কারণ তাঁর মানসলোকের অর্ধেক জুড়ে ছিল ভবিষ্যত, তাঁর লৌহদৃঢ় অথচ নমনীয় যুক্তির কাছে ভবিষ্যত ধরা দিত সম্পূর্ণ বাস্তব আকারে এবং অত্যন্ত প্রত্যক্ষ রূপ নিয়ে। আমার মতে, তাঁর এই ক্ষমতা ছিল বলেই তিনি বাস্তব ঘটনাবলী সম্পর্কে আশ্চর্য রকম দৃঢ় হতে পারতেন ; বাস্তব ঘটনা যতই অনমনীয় ও জটিল হোক না কেন তিনি কখনো হতাশ হতেন না।"[৮]

যে বিরাট, বিচিত্র অথচ একীভূত ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার লেনিনের দান সেখানে সাহিত্য ও শিল্প সংক্রান্ত প্রশ্ন একটি বড় স্থান অধিকার করে আছে। সকলেই জানেন যে লেনিন ছিলেন শিল্পানুরাগী এবং শিল্পকর্মের তীক্ষ্ণধী ও সূক্ষ্মদর্শী বিচারক। সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মস্ত হাতিয়ার হিসেবে শিল্পকর্মের বিরাট গুরুত্বের উপর তিনি জোর দিয়ে গেছেন।

নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে লেনিনের মতামতের অন্তর্নিহিত সত্য হচ্ছে, সাহিত্যে পার্টি-চৈতন্যের (The Party spirit of literature) প্রকাশ। 'জ্ভেজ্দা' (zvezda) ও 'লেনিনগ্রাদ' পত্রিকার আলোচনাপ্রসঙ্গে এক অনবদ্য বক্তৃতায় জ্দানভ বলেছেন, "ভি. আই. লেনিন সর্বপ্রথম সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্টতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে প্রগতিশীল সমাজবাদী চিন্তার প্রবণতা (attitude) কী হবে।" প্রগতিশীল সমাজবাদী চিন্তার প্রতিভূ পার্টিই হচ্ছে এই প্রবণতার প্রকাশ এবং এই প্রবণতার ভিত্তিতে লেনিন সাহিত্যে পার্টি-চৈতন্যের নীতি নির্ধারণ করেন। জ্দানভ আরও বলেছেন যে এই নীতি লেনিনের "সাহিত্য-বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ দান"।

সাহিত্যে পার্টি-চৈতন্য—লেনিনের এই শিক্ষা অনুধাবন করলে পৌছনো যায় ১৮৯০ সালে—যখন বুর্জোয়া নন্দনতাত্ত্বিকদের সব চেয়ে ফ্যাশনদুরস্ত ঝোঁক ছিল অবক্ষয় (Decadence) ও ন্যাচারালিজ্‌ম্ (Naturalism)-এ। ন্যাচারালিস্টদের ভিত্তি ছিল তেইনের (Taine) শিল্পগত মতবাদ: নন্দনতত্ত্ব "নিষেধও করে না বা ক্ষমাও করে না, তা শুধু নিরূপণ (indicate) ও ব্যাখ্যা করে।' এই বিষয়মুখ (objectivist) চিন্তাধারার মূলে রয়েছে পজিটিভিস্ট-দের (Positivists) সিদ্ধান্ত এবং এই চিন্তাধারার ভিত্তি হচ্ছে এই ধারণা যে বুর্জোয়া শ্রেণী-সম্পর্ক চিরস্থায়ী ও অনতিক্রম্য।

শিল্পক্ষেত্রে যে-সব ধারণা সর্বপ্রকার স্বাধীনতার স্বপক্ষে, তার বিরুদ্ধে ডেকাডেণ্টরা দিশেহারা হয়ে সংগ্রাম করত। তারা মনে করত যে নন্দনতত্ত্বে বিশুদ্ধ শিল্প (art for art's sake)-এর মতবাদটাই চরম কথা। ন্যাচারালিস্টরা জোর দিত বাস্তবতার অন্ধ অনুকরণের উপর, ডেকাডেণ্টরা চাইত আকাশ-চারী হয়ে আদর্শবিলাসে গা ভাসিয়ে দিতে। ১৮৮৯ সালে আনাতোল ফ্রাঁস লিখেছিলেন, "হয় আমরা পাঁকে গড়াগড়ি দিই আর নয়তো মেঘের রাজ্যে মাথা তুলি। মাঝামাঝি কিছু নেই।" বাহ্যত ন্যাচারালিস্ট ও ডেকাডেণ্টদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন তাদের ভিতর মিলও আছে অনেক।

ও দুটোই প্রতিক্রিয়াশীল ধারা, মানুষের সুখদুঃখের প্রতি দু-দলেরই প্রগাঢ় উদাসীনতা, মানুষের শক্তি সম্পর্কে ও সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কে দু-দলই সন্দিগ্ধচিত্ত।

ভি. আই. লেনিন ছিলেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নির্ভুল অনুগামী। তিনি যা-কিছু তত্ত্বমূলক লেখা লিখেছেন সে-সম্পর্কে কিছু বলতে হলে তিনি নিজে মার্কস্-এর রচনাবলী সম্পর্কে যা বলেছেন সেই কথাগুলোই বলা যেতে পারে: "ভেল্‌কি লাগিয়ে ইউটোপিয়া সৃষ্টি করা, যা জানা যায় না সে সম্পর্কে অলস কল্পনা করা—এমন কোন চেষ্টার কোন রকম আভাস মার্কস-এর রচনায় নেই। প্রকৃতিবিজ্ঞানবিদ যে ভাবে কোন সমস্যার আলোচনা করেন—যেমন, সমস্যাটি যদি হয় প্রাণীজগতের বিশেষ কোন একটি উপগোষ্ঠির (species) বিকাশ এবং তাঁর যদি জানা থাকে যে প্রাণীজগতের সেই বিশেষ উপগোষ্ঠীটি কোথা থেকে এসেছে এবং তার পরিবর্তনের গতি কোন্ দিকে—তাহলে তিনি সমস্যাটি নিয়ে যে-ভাবে নাড়াচাড়া করবেন, কমিউনিজ্‌ম্-এর প্রশ্ন নিয়ে মার্কস্‌ও ঠিক সেইভাবেই আলোচনা করেছেন।"

লেনিন মনে করতেন যে ইতিহাস হচ্ছে নতুন ও পুরনোর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ও আপোষহীন সংগ্রামের প্রবাহ। অনেক আগেই, ১৮৯৪ সালে, "নারোদিজ্‌ম্-এর অর্থনৈতিক আধার এবং স্ট্রুভ্ মহাশয়ের পুস্তকে এই মতবাদের সমালোচনা" বইয়ে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়মুখ ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির তুলনাপ্রসঙ্গে লেনিন লিখেছিলেন, "কোন নির্দিষ্ট ঘটনাবলীর প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করতে হলে বিষয়বাদীর বেলায় সব সময়েই সেই ঘটনাবলীর কৈফিয়ৎদার (apologist) হয়ে ওঠার ঝুঁকি থাকে, অন্যপক্ষে মার্কসবাদী যুক্তিপ্রমাণের দ্বারা ঘটনাবিন্যাসকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শুধু সেটুকু করেই ক্ষান্ত হন না—সংগ্রামে কোন্ কোন্ শ্রেণী অংশগ্রহণ করেছে এবং কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে তাও বলেন তিনি। "সুতরাং একদিকে বিষয়বাদীদের তুলনায় বস্তুবাদীদের বিষয়বাদ অধিকতর সুসমঞ্জস এবং গভীরতর ও সম্পূর্ণতর···অন্যদিকে, যাকে বলা যেতে পারে দলগত মনোভাব, (partisanship), বস্তুবাদ তা পোষণ করে এবং তার ফলে যে-কোন ঘটনা বিচারের সময় সোজাসুজি ও খোলাখুলি তা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর বিচারভঙ্গি গ্রহণ করে। দলগত মনোভাব পোষণ—লেনিনের এই শিক্ষা, শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ধারার নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকরা ছাড়া, জীবনের রূপান্তর

ঘটানোর কাজে যাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন এমন সমস্ত প্রগতিশীল জননেতাদেরই শিক্ষিত করে তোলে। লেনিন বলেছেন, "কোন জীবন্ত মানুষই কোন না কোন শ্রেণীর পক্ষাবলম্বন না করে থাকতে পারে না (বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক যদি সে একবার বুঝে থাকে), থাকতে পারে না সেই বিশেষ শ্রেণীর সাফল্যে আনন্দিত ও বিপর্যয়ে ক্লিষ্ট না হয়ে, যারা সেই বিশেষ শ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং যারা পশ্চাতমুখী ভাবধারা প্রচার করে সেই বিশেষ শ্রেণীর অগ্রগতি রোধ করে তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হয়ে, ইত্যাদি।"

সাহিত্যে পার্টি-চৈতন্যের প্রকাশ—লেনিনের এই শিক্ষা অনুযায়ী যে সাহিত্য অগ্রসর শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে এবং যা কিছু পশ্চাতমুখী ও যা কিছু ঐতিহাসিক অগ্রগতি ব্যাহত করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে, সেই সাহিত্যের লক্ষ্য কি হবে তা জানা যায়।

১৯০৫ সালের বিপ্লব যখন চলছে সেই অবস্থার ভিতরেও লেনিন তাঁর প্রবন্ধ "পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য" প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রবন্ধে সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে একটি বুনিয়াদি (classical) সংজ্ঞা পাওয়া গিয়েছে।

"সমাজে বাস করে সমাজ থেকে মুক্ত থাকে অসম্ভব"—এই সাধারণ সূত্রটির গভীরতা ও সারল্য প্রতিভাদীপ্ত, এবং এই সাধারণ সূত্রটি অবলম্বন করেই লেনিন অগ্রসর হয়েছেন বুর্জোয়া সাহিত্যের নির্মম সমালোচনায়। আর এই সূত্রটির উপর ভিত্তি করেই তিনি প্রলেটারিয়ান সাহিত্যের মূল লক্ষণগুলোকে নির্দিষ্ট করেছেন।

বুর্জোয়া শিল্পী ও শিল্পতাত্ত্বিকেরা শিল্পের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেক কিছু বলে থাকেন। তাঁরা দাবি করেন, সামাজিক অবস্থার উপর শিল্প নির্ভরশীল নয়, শিল্পের স্বরূপ নির্ধারিত হয় শিল্পীর অনুপ্রেরণা ও খেয়াল-খুশির দ্বারা। লেনিন প্রমাণ করেছেন, বুর্জোয়ারা যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কথায় উচ্ছ্বসিত সেটা আসলে নৈরাজ্যবাদী ও বুর্জোয়া বিশ্ব-দর্শনেরই প্রকাশ, শ্রেণীনিরপেক্ষতা বলে কোন কথা তার ভিতরে নেই। যে সব বুর্জোয়া পণ্ডিত দাবি করেন যে বুর্জোয়া সমাজে শিল্প নিরপেক্ষ, তাঁদের মিথ্যের বেসাতি লেনিন ফাঁস করে দিয়েছেন।—"লেখক! আপনি কি মুক্ত আপনার বুর্জোয়া দর্শক ও শ্রোতাদের রুচির হাত থেকে?…" প্রশ্ন করেছেন লেনিন। তিনি বলেছেন, "বুর্জোয়া লেখক, শিল্পী বা অভিনেত্রীর স্বাধীনতা আত্মপ্রবঞ্চনা

(বা ভাঁওতা দিয়ে লোক ঠকানো) ছাড়া কিছুই নয়, আসলে এরা সবাই টাকার থলি, ঘুষ বা মুরুব্বির মুখাপেক্ষীই।"

রুশদেশে ও রুশদেশের বাইরে শিল্পকর্মের সেরা প্রতিনিধিরা, এমন কি যাঁদের রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে মার্কসবাদের বড় রকমের পার্থক্য আছে তাঁরাও, প্রায়ই বুর্জোয়া জগতে শিল্পের বেশ্যাবৃত্তি ও অর্থকরী স্বরূপকে প্রকাশ্যে নিন্দে করেছেন। বুর্জোয়া জগতের শিল্পনীতির চৌহদ্দি ভেঙে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত কোন লেখকের পক্ষে সত্যিকারের শিল্পকর্ম সৃষ্টি করা সম্ভব নয়; কারণ, তা না এলে লেখককে মানুষের উপর মানুষের শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অন্যায় সামাজিক সম্পর্কের সাফাই গাইতে হবে; অর্থাৎ মিথ্যাচার করতেই হবে তাঁকে।

লেনিন লিখেছেন, "বুর্জোয়া সমাজে দলগত মনোভাব পোষণ না করার অর্থ ভোগতৃপ্ত, প্রভুত্বকারী ও শোষণকারীর দলের প্রতি ভাঁওতা-দিয়ে-আড়াল-করা, মুখোস-আঁটা নিষ্ক্রিয় আনুগত্যের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।"

কিন্তু শ্রমিকের স্বার্থে দাঁড়িয়েছেন যে শিল্পী তাঁর অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। দলগত মনোভাব পোষণ না করার ভাঁওতা দিয়ে নিজের মতামতকে ছদ্মবেশ পরাবার প্রয়োজন হয় না তাঁর। শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকে পাল্টাবার জন্যে এবং সর্বোচ্চ মানবিক আদর্শের জয়লাভের জন্যে যে অগ্রসর শ্রেণী সংগ্রাম করছে তার সঙ্গে প্রকাশ্যে হাত মেলান তিনি। প্রলেটারিয়েটের মতাদর্শ মহৎ ও খাঁটি; সমগ্র মেহনতী জনসাধারণ এই মতাদর্শকে তারিফ করে ও মর্যাদা দেয়। এই মতাদর্শের জন্যে সংগ্রামে যে লেখক নিজেকে উৎসর্গ করেন, তিনি পক্ষপাতিত্ব করেন খোলাখুলিভাবে—আর সেই পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের প্রতি।

দলগত মনোভাব পোষণ—এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লেনিন ঘোষণা করলেন, সাহিত্য হচ্ছে সমাজকে ঢেলে সাজবার সংগ্রামে শক্তিশালী হাতিয়ার। তিনি লিখেছেন, "তাহলে পার্টি-সাহিত্যের মূলসূত্র কি? সোশ্যালিস্ট প্রলেটারিয়েট সাহিত্য যে কোন ব্যক্তি-বিশেষের বা দলবিশেষের ঐশ্বর্য-অন্বেষী হতে পারে না তাই শুধু নয়, সমগ্র প্রলেটারিয়েট শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যাপারই এ হতে পারে না। বে-পার্টি লেখক বরবাদ! সাহিত্যে অতি-মানববাদ বরবাদ! প্রলেটারিয়েট শ্রেণীর যে সামগ্রিক স্বার্থ তারই অংশবিশেষ হোক সাহিত্য। যে মহান এক এবং

অবিচ্ছেদ্য সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক যন্ত্রবিশেষকে চালনা করছে সামগ্রিক শ্রমিক শ্রেণীর সমগ্র সচেতন অগ্রগামী বাহিনী সেই যন্ত্রের ছোট্ট একটি চাকা বা ছোট্ট একটি স্ক্রুতে পরিণত হোক সাহিত্য।”

সাহিত্যে ও শিল্পে পার্টি-চৈতন্যের প্রকাশ—এই নীতির ব্যাখ্যা আদিম যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেন না করা হয় এই বলে লেনিন সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই নীতির অন্তর্নিহিত অর্থ এই নয় যে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে স্থূল হস্তক্ষেপ করতে হবে। তিনি লিখেছেন, “এ বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নেই যে, যান্ত্রিকভাবে সমতা বজায় রাখার, সব কিছুকে পিষে সমান করার, সংখ্যালঘুদের ওপর সংখ্যাগুরুর প্রতিপত্তি স্থাপন করার চেষ্টার স্থান সাহিত্যেই সবচেয়ে কম। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সাহিত্যে ব্যক্তিগত উদ্যম এবং বিশিষ্ট রুচির ব্যাপারে, চিন্তা এবং কল্পনাশক্তির ব্যাপারে, বক্তব্য এবং প্রকাশভঙ্গির ব্যাপারে লাগাম সবচেয়ে ঢিলে করতে হবে। এসব কথায় কোন তর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু এথেকে শুধু এই কথাই প্রমাণিত হয় যে শ্রমিক পার্টির অন্যান্য কাজের সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কিত কাজকে মামুলি কায়দায় এক করে দেখা চলে না।”

লেনিন প্রমাণ করেছেন, যে শিল্পী বলশেভিক দলগত মনোভাবের নীতি মেনে নিতে পারেন তিনি হয়ে ওঠেন সমাজতান্ত্রিক মহৎ আদর্শের স্বপক্ষে একজন যোদ্ধা। আর তখন যে স্বাধীনতা তিনি ভোগ করেন সেটা স্বাধীনতার প্রেতচ্ছায়া নয়, খাঁটি স্বাধীনতা। তিনি লিখেছেন, “এরই নাম স্বাধীন সাহিত্য। কামতন্ত্র (Cupidity) বা ভাগ্যান্বেষণ (Careerism) নয়, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ও শ্রমিকদের সহানুভূতিই এই সাহিত্য-শিবিরে নতুন নতুন শক্তির সমাবেশ করতে পারে।”

এমন যে শিল্পী তাঁর সৃষ্টির পরিধি বুর্জোয়া শিল্পীর চেয়ে অনেক বেশি, এত বেশি যে কোন রকম তুলনাই চলে না। সামাজিক ঘটনাবিন্যাসের তাৎপর্য অনেক বেশি গভীরভাবে বুঝতে পারেন তিনি, কারণ তাঁর দৃষ্টি বিশ্বজনীন। সৃষ্টিশীল সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ব্যাপকতর।

শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ মূর্ত হয়ে ওঠে যে সাহিত্যে তার আলোচনা-প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছেন, “এই সাহিত্য প্রকৃতই স্বাধীন হবে কেননা এ স্থূলোদর নায়িকার বা ওজনে ভারি, সদাই-ক্লান্ত ‘সমাজের উপরতলার হাজার

দশেক'-এর মনোরঞ্জন না করে লক্ষ কোটি শ্রমিকের সেবা করবে, যে শ্রমিকরাই আমাদের দেশের সেবক, দেশের শক্তি, দেশের ভবিষ্যত।"

শ্রেণী-বিরোধের উপর পালিশ দেবার চেষ্টা বুর্জোয়া তত্ত্বজ্ঞানীরা কম করেন নি। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার কথা বলা তাঁদের অভ্যাস, অতীত ইতিহাসকে তাঁরা উপস্থিত করেন একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা হিসেবে। "জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য" প্রবন্ধে লেনিন এই মিথ্যে ও প্রতিক্রিয়াশীল থিওরিকে বরবাদ করে দিয়ে লিখেছেন, "প্রত্যেক আধুনিক জাতির ভিতর দু'টি জাতি আছে...প্রত্যেক জাতীয় সংস্কৃতির ভিতর দু'টি জাতীয় সংস্কৃতি আছে।" "বড় রুশজাতির জাতীয় গর্ব" প্রবন্ধে লেনিন বলেছেন, শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতি হচ্ছে দেশের জনসংখ্যার এক-দশমাংশের সংস্কৃতি, আর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি হচ্ছে জনসংখ্যার নয়-দশমাংশের সংস্কৃতি, কোটি কোটি জনসাধারণের সংস্কৃতি। শাসকশ্রেণীগুলির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্ম। তিনি লিখেছেন, "প্রত্যেক জাতীয় সংস্কৃতির ভিতরে গণতান্ত্রিক ও সোশ্যালিস্ট সংস্কৃতির উপাদান আছে—তা সে যত অপরিণত অবস্থাতেই থাক না কেন। কারণ, প্রত্যেক জাতির ভিতরেই শ্রমজীবী ও শোষিত জনসাধারণ আছে আর তাদের জীবন-যাত্রার ফলে গণতান্ত্রিক ও সোশ্যালিস্ট মতবাদের উন্মেষ অবশ্যম্ভাবী।" এই কারণেই যে কোন একটি দেশের জনসাধারণের স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সকল দেশের সকল জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূল।

শিল্পে লোক-চৈতন্যের প্রকাশ, যে মহান ক্লাসিক সাহিত্যের আমরা উত্তরাধিকারী সে সম্পর্কে এবং সমসাময়িক লেখকদের রচনাবলী সম্পর্কে আমাদের মনোভাব—ইত্যাদি সমস্যার সমাধানের চাবিকাঠি রয়েছে সাহিত্যের নানা প্রশ্ন সম্পর্কে লেনিনের যে সমস্ত বিবৃতি আছে তার মধ্যে।

লেনিন ছিলেন মস্ত আন্তর্জাতিকতাবাদী ও মহৎ রুশ দেশপ্রেমিক। তাঁর কাছে দেশপ্রেমের অর্থ ছিল, আপন দেশের জনসাধারণের সুখী জীবনের জন্যে সংগ্রাম। ১৯১৪ সালে তিনি লিখেছিলেন, "আমরা—বড় রুশদেশীয় শ্রেণী-সচেতন প্রলেটারিয়ানরা—আমাদের কাছে জাতিগত গর্ববোধ কি স্বধর্মচ্যুতির নামান্তর? অবশ্যই নয়। আমাদের ভাষা ও আমাদের দেশকে আমরা ভালবাসি। আমাদের দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণের (অর্থাৎ আমাদের দেশের নয়-দশমাংশের) জীবনের মানকে গণতন্ত্রী ও সোশ্যালিস্ট-এর সচেতন

জীবনযাত্রার পর্যায়ে উন্নীত করবার জন্তে আমাদের প্রচেষ্টা অন্ত সকলের চেয়ে বেশি। জারের জল্লাদরা, অভিজাতশ্রেণী ও পুঁজিপতিরা যে ভাবে আমাদের এই আশ্চর্য সুন্দর দেশের মর্যাদাহানি করেছে, যে ভাবে একে শোষণ ও অপমানিত করেছে তা দেখে ও তা অনুভব করে আমরা সকলের চেয়ে বেশি ব্যথা পাই। এ দেখে আমরা গর্ববোধ করি যে এই মর্যাদাহানি আমাদের মধ্যে—এই বড় রুশজাতির মধ্যেই—প্রতিরোধের জন্ম দিয়েছে; আমাদের গর্ব এই ভেবে যে আমাদেরই মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছেন রাদিস্‌চেভ, বেরিয়েছেন ডিসেম্‌ব্রিস্টরা ও সত্তর দশকের বিপ্লবী সাধারণতন্ত্রীরা। এই ভেবে আমাদের গর্ব যে এই বড় রুশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ১৯০৫ সালে সৃষ্টি করেছে এক শক্তিশালী বিপ্লবী গণ-পার্টি আর এই বড় রুশিয়ার মেহনতী চাষী (মুঝিক) এই সময়েই গণতন্ত্রী হয়ে উঠতে শুরু করেছে, শুরু করেছে পাদ্রি ও জমিদারদের উৎখাত করতে।”

ন্যায্য সমাজ-ব্যবস্থার জন্তে সংগ্রাম তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে “প্রত্যেকটি জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যেকার পূর্বাপর-প্রবহমান গণতান্ত্রিক ও সোশ্যালিস্ট ধারাটিকে” সুনির্দিষ্ট করে তোলে। আর শ্রেণীহীন সমাজের জন্তে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রলেটারিয়েট যে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলে তারই সঙ্গে যুক্ত হয় প্রত্যেকটি জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যেকার এই প্রগতিশীল ধারা। রুশদেশের মুক্তি-আন্দোলন তার প্রধান প্রধান পর্যায়ে কতদূর পরিণতি লাভ করল সেই পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন দেশের চিন্তাশীলদের ও লেখকদের রচনাবলীর বিচার করেছিলেন।

রুশদেশের বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের সম্পর্কে লেনিনের ধারণা খুব উঁচু ছিল। এঁদের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে এসেছিলেন রুশদেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও সাহিত্যিকরা। তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন বলেছেন যে তাঁরা ছিলেন তাঁদের সময়ের সব চেয়ে অগ্রসর যোদ্ধা, এবং এই কারণেই তাঁদের সাহিত্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লেনিন তাঁর ক্লাসিক রচনা “করণীয় কী?” বইয়ে লিখেছেন, “...সবচেয়ে অগ্রসর যোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণ করতে সমর্থ একমাত্র ‚সবচেয়ে অগ্রসর মতাদর্শের দ্বারা' পরিচালিত একটি পার্টি। এ কথার বাস্তব অর্থ কি তা খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে পাঠককে স্মরণ করতে হবে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির পূর্বসূরীদের—যেমন, হের্‌ৎসেন, বেলিন্‌স্কি, চের্‌নিশেভ্‌স্কি এবং সত্তর দশকের অন্যান্য বিপ্লবীদের;

আর স্মরণ করতে হবে রুশ সাহিত্য বর্তমানে যে বিশ্বজনীন তাৎপর্য লাভ করছে সে-কথাও।"

তার সমস্ত জটিলতা শুদ্ধ রুশ-সাহিত্যের অগ্রণী প্রতিনিধিদের ভূমিকা, তাঁদের নিজেদের সময় ও তদানীন্তন ভবিষ্যত অবস্থার সঙ্গে তাঁদের সাহিত্যের সম্পর্ক---ইত্যাদি বিষয়গুলি লেনিনের শিক্ষা থেকে স্পষ্ট হয়েছে।

হের্ৎসেন ছিলেন অভিজাত বিপ্লবী সম্প্রদায়ের একজন। লেনিন লিখেছেন, কিন্তু "উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশকের সামন্ততান্ত্রিক রুশদেশে হের্ৎসেন এমন এক স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন যেখানে তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের সমকক্ষ।" তিনি অবশ্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদের স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তাঁর 'অধ্যাত্মিক নাটক'—যার উৎস তাঁর দর্শনের স্ববিরোধিতা—সে সম্পর্কে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। কিন্তু এই স্ববিরোধিতার মূল কোথায় তা প্রথম লেনিনের লেখাতেই স্পষ্ট হয়। লেনিন লিখেছেন, "হের্ৎসেনের অধ্যাত্মিক নাটক পৃথিবীর ইতিহাসের সেই বিশেষ যুগের সৃষ্টি এবং সেই বিশেষ যুগের প্রতিবিম্ব যখন (ইওরোপে) বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিপ্লববাদের (revolutionism) দিন শেষ হতে বাকি নেই কিন্তু সোশ্যালিস্ট প্রলেটারিয়েটের বিপ্লববাদ তখনো পরিণতি পায় নি।"

বেলিন্‌স্কি ছিলেন রুশদেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও সমালোচকদের একজন। তাঁর সম্পর্কে লেনিন বলেছেন যে তিনি হচ্ছেন সেই সব সাধারণতন্ত্রীদের পুরোধা যাঁরা রুশদেশের মুক্তি-আন্দোলনে অভিজাতদের স্থান নিয়েছিলেন। জমিদারদের প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ বেলিন্‌স্কির চিন্তায় প্রেরণা জুগিয়েছিল। লেনিন বলেছেন যে বেলিন্‌স্কির অনুভূতি—যার প্রকাশ তাঁর বিখ্যাত লেখা 'গোগোলের কাছে চিঠি'তে—তা হচ্ছে ভূমিদাস চাষীদের অনুভূতির প্রতিচ্ছবি। ১৯১৪ সালে লেনিন লিখেছেন, "বেলিন্‌স্কির সাহিত্যিক কার্যকলাপের সার কথা ফুটে উঠেছে তাঁর বিখ্যাত লেখা 'গোগোলের কাছে চিঠি'তে। গণতন্ত্রী সংবাদপত্রে যে-সব শ্রেষ্ঠ রচনা সেন্সর না হয়ে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে এটি অন্যতম। আজ পর্যন্ত এই লেখাটির বিরাট জীবন্ত তাৎপর্য অক্ষুণ্ণ আছে।" রুশ গণতন্ত্রের অগ্রসর মতাদর্শের চিন্তানায়ক ও উদ্‌গাতা বেলিন্‌স্কির এই স্বরূপ নির্ধারণে তাঁর সাহিত্যিক উত্তরদানের—বিশেষ করে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর মতামতের—অপরিশেষ তাৎপর্য পরিস্ফুট।

রুশদেশে বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে প্রগতিপন্থী সংগ্রামের পুরোধা ছিলেন এন্. জি. চের্নিশেভ্স্কি। তিনি ছিলেন মস্ত দার্শনিক, সমাজতন্ত্রী ও শিল্পতত্ত্বজ্ঞানী। লেনিন লিখেছেন, "রুশদেশে পঞ্চাশ দশক থেকে শুরু করে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত চের্নিশেভ্স্কি ছিলেন একমাত্র সত্যিকারের মহৎ লেখক যিনি সুসংবদ্ধ দার্শনিক বস্তুবাদের স্তরে অবিচল থাকতে পেরেছিলেন। কান্টপন্থীরা (neo-Kantians), পজিটিভিস্টরা, মাখপন্থীরা (Machians) এবং অন্যান্য ঘোলাটে-বুদ্ধি লোকেরা যে-সব জঞ্জাল স্তূপাকার করে তুলেছিল সেগুলো ঝেঁটিয়ে সাফ করেছিলেন তিনি। কিন্তু মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্-এর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের স্তরে তিনি উঠতে পারেন নি—বা বরং বলা যেতে পারে যে রুশ জীবনের অনগ্রসরতার জন্যে তাঁর পক্ষে ওঠা সম্ভব হয়নি।"

চের্নিশেভ্স্কির সমাজতন্ত্রকে কল্পনামূলক আখ্যা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়ে লেনিন বলেছেন, "তিনি ছিলেন ধনতন্ত্রের অসাধারণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচক।"

যে সময়ে রুশদেশে গণতন্ত্রীদের পথের সঙ্গে সমাজতন্ত্র মিশে গিয়েছিল সেই যুগে চের্নিশেভ্স্কি ছিলেন জঙ্গী সমাজতন্ত্রী। "তাঁর লেখায় শ্রেণী-সংগ্রামের চেতনা পরিস্ফুট," বলেছেন লেনিন। লেনিন দেখেছিলেন, চের্নিশেভ্স্কির 'মুখবন্ধ' (The Prologae) উপন্যাসে ১৮৬১ সালের কৃষি-সংস্কারের ঐতিহাসিক অর্থ সবচেয়ে গভীরভাবে অনুধাবন করা হয়েছে। "কৃষি-সংস্কারটি যখন সবেমাত্র প্রণয়ন করা হচ্ছিল (তখনো পশ্চিম ইওরোপে এই আইনের সঠিক পরিষ্কার ব্যাখ্যা পর্যন্ত হয়নি) সেই সময়ে—কৃষি-সংস্কারটির চরিত্র যে মূলত বুর্জোয়া—এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হলে চের্নিশেভ্স্কির মত প্রতিভার প্রয়োজন ছিল।"

চের্নিশেভ্স্কির অন্যান্য রচনা সম্পর্কেও লেনিনের অত্যন্ত উঁচু ধারণা। পুরনো দিনের কথাপ্রসঙ্গে ক্রুপ্স্কায়া বলেছেন যে চের্নিশেভ্স্কির 'করণীয় কী ?' (What is to be done) বইটি লেনিনের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। "এই বইটি তিনি যতটা মন দিয়ে পড়তেন এবং যে-ভাবে বইটির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ-গুলো চিহ্নিত করতেন তা দেখে আমি অবাক হতাম। এই কারণেই, চের্নিশেভ্স্কির ব্যক্তিত্ব সাধারণভাবে তাঁকে আকর্ষণ করেছে।"

নেক্রাসভ ও সল্তীকভ-শচেড্রিনের রচনাবলী লেনিন অত্যন্ত

ভালবাসতেন। রুশদেশের বিপ্লবী গণতন্ত্রের এই মহান লেখকদ্বয় অতুলনীয় শক্তি ও সৌন্দর্যমণ্ডিত শব্দ ও রূপকের অফুরন্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে রূপ দিয়েছিলেন তিক্ত সত্যকে: শৃঙ্খলিত জনসাধারণের অবস্থা, তাদের মর্মান্তিক দুঃখ ও প্রচ্ছন্ন শক্তি, 'সুসভ্য' শোষণকারীদের ভণ্ডামি ও নিষ্ঠুরতাকে। লেনিন লিখেছেন, "তাঁদের সময়ে, নেক্রাসভ ও সল্তীকভ রুশসমাজকে শিখিয়েছিলেন সামন্ত-প্রভুদের শিক্ষার মসৃণ ও তৈলাক্ত আবরণের নিচে হিংস্র স্বার্থকে চিনে নিতে, শিখিয়েছিলেন এই ধরনের লোকগুলোর নির্মমতা ও ভণ্ডামিকে ঘৃণা করতে।" নেক্রাসভের রূপকগুলোকে লেনিন প্রায়ই নিজের কাজে লাগাতেন এবং বিশেষভাবে পছন্দ করতেন সল্তীকভ-শ্‌চেড্রিন থেকে উদ্ধৃতি দিতে। এই বিশ্ববিশ্রুত ব্যঙ্গ-লেখকের তীক্ষ্ণ রসজ্ঞান লেনিনকে তাঁর তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রামে সহায়তা করেছিল। লুনাচারস্কি লিখেছেন, "লেনিনের রচনাবলীর পাতায় পাতায় শ্‌চেড্রিনের প্রায় সমস্ত চরিত্রগুলোই নতুন রাজনৈতিক চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে।"

বলশেভিক দলগত মনোভাবের নীতি—এই হচ্ছে লেনিনের সাহিত্য-বিচারের গোড়ার কথা, কিন্তু তাই বলে অতীতের প্রগতিশীল অগ্রণীদের অতি-মানবীয় (idealise) করে তোলবার কোন রকম চেষ্টা যে তাঁর ভিতর ছিল তা একেবারেই নয়। তাঁর চরিত্র-নির্ধারণ এত পুঙ্খানুপুঙ্খ যে লেখকের সর্ব দিকে আলোকপাত হয় এবং শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা লেখকের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে যে সব স্ববিরোধিতা সৃষ্টি করে সেগুলোকে প্রকাশ করে। তুর্গেনেভ্‌কে রুশ দেশের একজন অনন্যসাধারণ লেখক বলে লেনিন মনে করতেন। উদারপন্থীদের প্রতারণার মুখোস খুলে দেবার জন্যে "কাউন্ট হীদেন স্মরণে" নামে যে প্রবন্ধটি লেনিন লিখেছিলেন সেখানে তিনি তাঁর বক্তব্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন তুর্গেনেভের একটি চরিত্র—জমিদার পেনোচ্‌কিন। জমিদারের খানসামা সান্ধ্য ভোজনের সময় যে মদ পরিবেশন করেছে তা ঠিকমত গরম করা হয়নি এই অপরাধে খানসামাকে বেত মারতে হবে, কিন্তু জমিদার নিজে সেজন্যে আস্তাবলে যান না, অন্য লোককে পাঠান—কারণ নিজের সম্পর্কে তিনি এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে তিনি একজন খাঁটি মার্জিত রুচির লোক। তুর্গেনেভের সাহিত্য সম্পর্কে লেনিন প্রশংসার সুরে কথা বলে গেছেন। কিন্তু ভিন্ন প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন, "ষাট বছর আগে

তুর্গেনেভের মতাদর্শ ছিল নরমপন্থী রাজতন্ত্রী ও অভিজাতসুলভ···চের্নিশেভ্স্কি বা দোব্রোলুবভ-এর মূষিক গণতন্ত্র তিনি বরদাস্ত করতেন না।'

সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে যে সব প্রশ্ন সব চেয়ে দুরূহ, সব চেয়ে তীব্র ও সবচেয়ে জরুরি তার সমাধান পাওয়া যায় অতীতের ও সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে লেনিনের মন্তব্যগুলোতে। এইভাবেই তিনি অনুপম বিশ্লেষণ করেছেন জগতের একজন শ্রেষ্ঠ ও জটিলতম লেখক লিও টলস্টয়ের রচনাবলীর ও বিশ্বদৃষ্টির। বুর্জোয়া বা উদারপন্থী বা ডেকাডেন্ট—কোন সমালোচকই টলস্টয়ের স্ববিরোধিতাকে বুঝে উঠতে পারেন নি। তাঁরা যেটুকু করেছেন তা হচ্ছে, এই প্রতিভাবান শিল্পীর মহৎ রচনাবলী থেকে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উদ্ধৃতি দিয়ে এবং অংশবিশেষকে পূর্বাপর সঙ্গতিহীন অবস্থায় খাব্‌লে খাব্‌লে তুলে নিয়ে নিজেদের গুরুগর্ভ থিওরিগুলোকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা—এবং এ কাজে প্রত্যক্ষভাবে কুৎসাপ্রচারেও তাঁরা সংকোচ বোধ করেন নি।

লেনিনই সর্বপ্রথম টলস্টয়ের রচনাবলীর বৈজ্ঞানিক ও গভীর বিষয়মুখ অথচ রাজনৈতিক দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্লেষণ দিতে পেরেছিলেন।

লেনিন বলেছিলেন যে টলস্টয় রুশ বিপ্লবের দর্পণ। লেনিন লিখেছেন, "শিল্পী হিসেবে তাঁর বিশ্বজনীন তাৎপর্য এবং চিন্তাশীল ও প্রচারক হিসেবে তাঁর বিশ্বজনীন খ্যাতি এই উভয় ব্যাপারেই এক একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিতে রুশ বিপ্লবের বিশ্বজনীন তাৎপর্য প্রতিবিম্বিত।···যে যুগের সঙ্গে তিনি সংসৃষ্ট তা ছিল প্রধানত ১৮৬১-১৯০৪ সাল এবং শিল্পী হিসেবেও বটে বা চিন্তাশীল ও প্রচারক হিসেবেও বটে টলস্টয় তাঁর রচনাবলীতে আশ্চর্য রকম স্পষ্টতার সঙ্গে সমগ্র প্রথম রুশ-বিপ্লবের ঐতিহাসিক অদ্বিতীয়তা ও বৈশিষ্ট্যগুলি এবং তার শক্তি ও দুর্বলতা রেখায়িত করেছেন।" ১৮৬১-১৯০৪ সালের পিতৃশাসিত সমাজের অকপট চাষীর চিন্তাধারণা প্রতিফলিত হয়েছে টলস্টয়ের সাহিত্যে এবং এই মহৎ শিল্পীর বিভিন্ন সাহিত্যিক রচনায় ও প্রচারমূলক লেখায় যে উচ্চকিত স্ববিরোধিতা আছে তার প্রকৃতিও লেনিন সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। লেনিন দেখিয়েছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিরোধ না করার যে "নীতি" টলস্টয় প্রচার করেছেন তা কি ভয়ংকর রকমের প্রতিক্রিয়াশীল এবং তাঁর অনবদ্য সাহিত্যিক রচনাবলী "সব চেয়ে সুসংহত বাস্তবতার" কি চমৎকার নিদর্শন। এই মহৎ রুশ লেখক—

যিনি আপন বিশ্বদৃষ্টির রূপায়নের স্ববিরোধিতার মধ্যে ক্লেশকর সংগ্রাম করছিলেন—তাঁর সম্পর্কে লেনিনের প্রবন্ধাবলী পাঠকের কাছে তাঁর একটা আলেখ্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

একজন প্রতিভাবান লেখকের উপর বিপ্লবের এই নেতার পরিচালনা-শক্তির একটা বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত গোর্কি সম্পর্কে লেনিনের মনোভাব।

অনেক আগেই, ১৯০১ সাল থেকেই লেনিন গোর্কি সম্পর্কে বলে এসেছেন যে গোর্কি হচ্ছেন "ইওরোপখ্যাত লেখক।" লেনিন ও গোর্কির প্রথম ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ হয় ১৯০৩ সালে। দ্বিতীয়বার তাঁদের সাক্ষাৎ হয় লণ্ডন পার্টি কংগ্রেসের সময় ১৯০৭ সালে। দুজনের ভিতর বন্ধুত্বমূলক চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়েছে। গোর্কির "মা" উপন্যাসটি লেনিন পাণ্ডুলিপি অবস্থায় পাঠ করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন: "এই মুহূর্তে যে বইয়ের দরকার ছিল এটি হচ্ছে সেই বই।" গোর্কির এই বিখ্যাত উপন্যাসটির শিক্ষামূলক তাৎপর্যের উপর লেনিন জোর দিয়েছিলেন: ১৯০৫ সালের বিপ্লবের বহু শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছিলেন যদিও বিপ্লবের লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁরা স্পষ্টভাবে ও পুরোপুরি সচেতন ছিলেন না; গোর্কির বইটি পড়ে তাঁরা বুঝতে পারতেন সামাজিক পরিবর্তনের কী বিরাট লক্ষ্যের জন্যে প্রলেটারিয়েট সংগ্রাম করছে। লেনিনের এই মূল্যবিচার অক্ষরে অক্ষরে নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। সমাজবাদী বাস্তবতার (Socialist Realism) প্রথম নিদর্শন গোর্কির "মা" সত্যিসত্যিই ইওরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর কাছে পথনির্দেশক বই।

সমসাময়িক কালের জটিল সাহিত্য-প্রক্রিয়ায় আপন অবস্থানকে (bearings) উপলব্ধি করতে গোর্কিকে সহায়তা করেছিলেন লেনিন, সাহিত্য-সৃষ্টি সম্পর্কে উপদেশও দিয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রতিক্রিয়ার যুগে গোর্কির অভিপ্রায় হয়েছিল যে তিনি একটি বড় উপন্যাস লিখবেন এবং উপন্যাসটিতে তুলে ধরবেন একটি রুশ বুর্জোয়া পরিবারের তিন পুরুষের চিত্র। লেনিন তাঁকে বললেন, "বিষয়বস্তুটি চমৎকার, যদিও খুব শক্ত এবং লিখতে প্রচুর সময় লাগবে। তুমি যে এই কাজে সক্ষম তা আমি জানি কিন্তু উপন্যাসটি যে কি. ভাবে শেষ হবে তা আমি বুঝতে পারছি না। কথাটা হচ্ছে এই যে জীবনের বাস্তবতায় এখনো এই শেষটুকু আসে নি। না, এই উপন্যাসটি তোমার লেখা উচিত বিপ্লবের পরে।

ইতিমধ্যে 'মা' উপন্যাসের মত আরও কিছু তোমার লেখা উচিত।" রচনার পারম্পর্যের পদ্ধতির (methodological) দিক থেকে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ গোর্কি মেনে চলেছিলেন। যে উপন্যাসটির কথা তখন তাঁর মনে হয়েছিল সেটি তিনি লিখেছিলেন অক্টোবর বিপ্লবের পরে "আরতামনোভ্ কাহিনী" (The Artamonovs) নাম দিয়ে।

লেনিন চেয়েছিলেন, বলশেভিক পুস্তক-প্রকাশের কাজে গোর্কি যোগ দিন। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখে তিনি এই বিষয়েও নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন যে গোর্কির সাহিত্যসৃষ্টিতে যেন কোন রকম প্রতিবন্ধক না আসে। এই লেখকের সম্পর্কে মর্মস্পর্শী উৎকণ্ঠা ছিল বলেই তিনি লুনাচারস্কির কাছে লিখেছিলেন, "যদি তুমি মনে কর যে তার নাম নিয়মিত পার্টি-কাজের জন্যে তালিকাভুক্ত করলে (এবং তা যদি হয় তো পার্টি-কাজের দিক থেকে খুব বেশি রকমের লাভবান হওয়া যাবে।) আল্ ম-চয়ের (গোর্কির) সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটবে না তাহলে এই বন্দোবস্ত করতে চেষ্টা কোরো।"

লেনিন মনে করতেন, গোর্কি হচ্ছেন প্রলেটারিয়েটের মহান শিল্পী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোর্কির বিশ্ব-দর্শনের ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে নীতিগত সমালোচনা করা থেকেও তিনি বিরত হননি।

প্রতিক্রিয়ার যুগে এমন এক সময় ছিল যখন গোর্কি সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক লেখকদের একটি ক্ষুদ্র দলের মতামতের অংশীদার হয়েছিলেন। "ঈশ্বর-রচনাকারী" নামে এই দলটি পরিচিত এবং এঁদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে এঁরা জনগণের সৃজনক্ষমতাকে জাগ্রত করে তোলবার মূলকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারবেন। এই সুবিধাবাদী প্রবণতা যে মূলত প্রতিক্রিয়াশীল একথা গোর্কির কাছে পর পর কয়েকটা চিঠিতে লেনিন বলেছিলেন। ১৯১৩ সালে গোর্কির কাছে এক চিঠিতে লেনিন লিখেছেন, "ঈশ্বর-রচনা বা ঈশ্বর-নির্মাণ বা ঈশ্বর-সৃষ্টি আর ঈশ্বর-অনুসন্ধান—এর মধ্যে বিশেষ কিছু তফাৎ নেই, যেমন তফাৎ নেই হলদে শয়তানে আর নীলবর্ণ শয়তানে।" গোর্কিকে লেনিন বলেছিলেন যে গোর্কি যেন কিছুতেই "প্রলেটারিয়ান দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সাধারণ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির" দিকে না ঝোঁকেন।

১৯১৭ সালে গোর্কি যখন আধা-মেনশেভিক সংবাদপত্র "নোভায়া ঝিজ্ন্"-এ (Novaya Zhizn) যোগ দিলেন লেনিন্ তখন আবার তাঁকে

তীব্রভাবে সমালোচনা করলেন। অক্টোবর বিপ্লবের পরে গোর্কির কাছে তিনি লিখেছিলেন, "তুমি নিজেকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছ যেখান থেকে তুমি শ্রমিক ও কৃষকের জীবনের অর্থাৎ রুশদেশের জনসাধারণের নয়-দশমাংশের জীবনের নতুন দিক সোজাসুজি দেখতে পাবে না।" এবং গোর্কিকে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন "পরিবেষ্টন, পারিপার্শ্বিক, বাসস্থান ও পেশা আমূল পরিবর্তন করতে।"

গোর্কিকে সমালোচনা করার ভিতর দিয়ে লেনিন সংগ্রাম করেছেন গোর্কির নিজেরই বিরুদ্ধবাদী প্রভাবের বিরুদ্ধে। জনসাধারণের জীবনে ও সংগ্রামে প্রেরণার নতুন নতুন উৎসের সন্ধান গোর্কির অপরিসীম প্রতিভার কাছে আপনা থেকে উন্মুক্ত হোক – এই লেনিন চাইতেন। এই মহান প্রলেটারিয়ান লেখক পরে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন লেনিনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা এবং তাঁর ধ্যানধারণায় ও সৃষ্টিশীলতার বিকাশে সে বন্ধুত্ব কী জোরালো অবলম্বন ছিল সেকথা।

মায়াকভ্স্কির প্রথম দিকের রচনাবলীকে লেনিন ভয়ানক নিন্দে করেছেন। ফিউচারিজ্‌ম্ (futurism) নামে পরিচিত এক প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যিক ঝোঁকের দ্বারা সেই সময়ে তাঁর লিখনভঙ্গি প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু মায়াকভ্স্কির "লস্ট্ ইন কন্‌ফারেন্স" কবিতাটির উচ্চ প্রশংসাও লেনিন করেছেন, কারণ কবিতাটির উপজীব্য ছিল একটি যুগোপযোগী রাজনৈতিক প্রশ্ন। ১৯২২ সালে কবিতাটি লেখা এবং কবিতাটিতে আমলাতন্ত্রের পুনরভ্যুত্থানকে অনাবৃত করে চমৎকার ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ফিউচারিস্ট লিখনভঙ্গির অমক্রম কাটিয়ে উঠে মায়াকভ্স্কি সোভিয়েট যুগের শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রতিভাবান কবি হতে পেরেছিলেন।

উভয় লেখকই লেনিনের অপরূপ আলেখ্য চিত্রিত করেছেন—গোর্কি তাঁর বিখ্যাত স্মৃতিকথায়, এবং মায়াকভ্স্কি তাঁর 'ভ্লাদিমির ইলীচ্ লেনিন' কবিতায়।

মহান অক্টোবর সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের জয়লাভের পর সাহিত্যে পার্টি-চৈতন্যের নীতি বাস্তবে পরিণত করার প্রশ্ন উন্নীত হল এক নতুন ও উচ্চতর স্তরে। সাহিত্যিক কার্যকলাপ এখন আর শুধু প্রলেটারিয়েটের পার্টি-কাজের অংশমাত্র রইল না, রাষ্ট্রীয় নীতির অঙ্গীভূত হল। ক্লারা জেট্‌কিনের সঙ্গে কথোপকথন-প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন, "ব্যক্তি-মালিকানার ভিত্তিতে যে সমাজ

প্রতিষ্ঠিত সেখানে শিল্পী উৎপাদন করেন বাজারের জন্তে, ক্রেতার প্রয়োজন হয় তাঁর। আমাদের বিপ্লব শিল্পীদের এই সমস্ত গতময় শর্তাধীনতার অত্যাচার থেকে মুক্ত করেছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রই হয়ে উঠেছে তাঁদের রক্ষক ও ক্রেতা…কিন্তু আমরা নিঃসন্দেহেই কমিউনিস্ট। যেমন খুশি অব্যবস্থা বেড়ে চলুক আর আমরা হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, তা কিছুতেই হবে না। একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী এই প্রক্রিয়াকে আমরা নিশ্চয়ই পরিচালিত করব এবং এক নির্দিষ্ট পরিণতির পথে নিয়ে যাব।" সেই একই কথোপকথনে লেনিন সোভিয়েট শিল্পের গণচরিত্রের চমৎকার একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "শিল্প সম্পর্কে আমাদের মতামত কি, তাতে কিছু যায় আসে না ; লক্ষ লক্ষ জনসংখ্যার কয়েক শত বা এমন কি হাজার খানেক লোকের মনেও শিল্প কি অনুভূতি জাগিয়ে তুলছে তাও বড় কথা নয়। শিল্প জনসাধারণের সম্পত্তি। শ্রমজীবী জনগণের জীবনের মধ্যে গভীরতম মূলবিস্তার করতে হবে শিল্পকে। শিল্প এমন হবে যেন এই জনগণ তা বুঝতে পারে ও তাকে ভালবাসে। এই জনগণের অনুভূতি, চিন্তা ও ইচ্ছাকে ব্যক্ত করবে এই শিল্প, উন্নত করে তুলবে তাঁদের। জনগণের ভিতরকার শিল্পীদের জাগিয়ে তুলে এ বিকশিত করে তুলবে।"

বাস্তব জীবনকে প্রগাঢ়ভাবে অনুশীলন করবার জন্তে লেখকদের প্রতি লেনিন অক্লান্ত আহ্বান জানিয়েছেন। বাস্তবতাকে তিনি দেখতেন নতুন ও পুরনোর অবিরাম সংঘর্ষ হিসেবে। লেনিন, মূর্ত প্রতিভা লেনিন ছিলেন মস্ত স্বপ্নদর্শী। অনেক আগে, ১৯০২ সালেই তিনি তাঁর বিখ্যাত 'করণীয় কী ?' বইয়ে লিখেছিলেন, "স্বপ্ন দেখতে হবে আমাদের !" এবং তারপরেই তিনি উল্লেখ করেছিলেন জীবনে স্বপ্নদর্শিতার ভূমিকা সম্পর্কে পিসারেভ কি বলেছেন তার। স্বপ্নদর্শী যদি জীবনকে সত্যিকারের অনুশীলন করে থাকে, যদি স্বপ্নের প্রতি বিশ্বাস আর স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার জন্তে সক্রিয় আবেগ থাকে তার তবে এই স্বপ্ন তার কর্মশক্তিকেই উদ্দীপিত করে তুলবে। জীবনের আন্তরিক অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল মানুষের চেতনার যে সক্রিয় ভূমিকা আছে—এই কথার উপর লেনিন সব সময়েই জোর দিয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন, "মানুষের চেতনা এই বস্তু-জগৎকে শুধু প্রতিফলিতই করে না, তাকে সৃষ্টিও করে।"

লেনিনের এই সমস্ত বিবৃতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। সমাজ

বাদী বাস্তবতা—যা শুধু বাস্তবতাকে প্রতিফলিতই করে না, সম্মুখের পথেরও নির্দেশ দেয়—তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যকে আরও ভাল করে বোঝবার পক্ষে এই বিবৃতিগুলি আমাদের সহায়।

১৯১৮ সালে লেনিন লিখেছিলেন,"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আজকাল কেউ আর অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে না। অলৌকিক ভবিষ্যদ্‌বাণী রূপকথার গল্প মাত্র। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্‌বাণী হচ্ছে বাস্তব সত্য।" যে লেখক সমাজবাদী বাস্তবতাপন্থী, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির উপর যাঁর ভিত্তি, জীবনকে যিনি অনুশীলন করেছেন—তাঁর ক্ষমতা আছে এই বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্‌বাণী করবার।

লেনিন তাঁর ক্লাসিক রচনা 'মহাপ্রারম্ভ' (A Great Beginning)-এ সাহিত্যিক ও সোভিয়েট জনসাধারণকে ডাক দিয়েছেন নতুন অঙ্কুরটিকে সযত্নে লালনপালন করবার জন্যে। এই অঙ্কুরটি হচ্ছে "খাঁটি সাম্যবাদের অঙ্কুর—সরল, নম্র, আটপৌরে, কিন্তু প্রাণোচ্ছল।" ঠিকভাবে লালনপালন করা হলে এই অঙ্কুর "ঝরে পড়বে না, বাড়তে থাকবে এবং পূর্ণ সাম্যবাদে বিকশিত হয়ে উঠবে।"

সমাজবাদী বাস্তবতাপন্থী লেখক শুধু যে বাস্তবতাকে প্রতিবিম্বিত করেন তা নয়, লেনিনের পার্টি-চৈতন্যের নীতিকে ভিত্তি করে সম্মুখের পথেরও নির্দেশ দেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এই জন্যেই লেনিন দেমিয়ান বেদ্‌নী (Demyan Bedny)-র কবিতার গুরুত্ব যদিও স্বীকার করতেন, কিন্তু কবির রচনা সম্পর্কে পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলেন না। এ-সম্পর্কে গোর্কিকে তিনি বলেছিলেন, "একটু যেন স্থূল। ও যেন চলছে পাঠকের পিছনে পিছনে অথচ ওর চলা উচিত পাঠকের কিছুটা আগে আগেই।"

সমাজবাদী বাস্তবতাপন্থী লেখক কখনো এমন জীবন খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেন না যার কোন অস্তিত্ব নেই। কোন বিশেষ পারিপার্শ্বিকে বিশেষ চরিত্র ফুটিয়ে তোলেন তিনি, জোর দেন চরিত্রগুলির বিকাশের ঝোঁক যেদিকে তার উপর। সোশ্যালিস্ট পুনর্গঠনে সোভিয়েট লেখক সক্রিয় অংশগ্রহণকারী।

যদিও লেনিন নতুন এক সংস্কৃতির ভিত্তিস্থাপন করছিলেন, তবু ক্লাসিক রুশ সাহিত্যের অবদানকে তিনি বড় রকমের মূল্য দিতেন। রুশ-শিল্প সম্পর্কে তিনি কি রকম গর্ববোধ করতেন সে-সম্বন্ধে গোর্কি তাঁর স্মৃতিকথায় বর্ণনা করেছেন। একদিন লেনিনের টেবিলের উপর একখণ্ড 'ওয়র এণ্ড পীস্'

গোর্কির চোখে পড়ল।—লেনিন টলস্টয় সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করলেন। গোর্কি লিখছেন, "তারপর চোখ কোঁচ করে, আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইওরোপে এমন একজনের নাম করতে পার যাকে টলস্টয়ের পাশে দাঁড় করানো যেতে পারে? এবং নিজেই উত্তর দিলেন, একজনও নয়। তারপর হাতে হাত ঘষে পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন। আমি একাধিকবার তাঁর ভিতরে এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছি, লক্ষ্য করেছি রুশ-শিল্প সম্পর্কে তাঁর এই গর্ববোধ। মাঝে মাঝে আমার মনে হত, লেনিনের এই মনোভাব তাঁর পক্ষে বিজাতীয় রকমের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এমন কি অতি-সারল্যের নিদর্শন, কিন্তু পরে তাঁর এই ধরনের উক্তির ভিতরেই মেহনতী জনসাধারণের প্রতি তাঁর দৃঢ়মূল ভালবাসার প্রতিধ্বনি শুনতে পেতাম।"

অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল লেখকদের রচনাবলী সম্পর্কে লেনিন ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। আঁরি বারবুস সম্পর্কে তাঁর মনোভাব এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চিমী শিল্পের অন্ধ ভক্তদের তিনি ঘৃণা করতেন, কারণ বুর্জোয়া সংস্কৃতির অন্তঃক্ষয়ী ব্যাধির লক্ষণ তিনি দেখেছিলেন এর মধ্যে। শিল্পক্ষেত্রে যে কোন 'নতুন' ঝোঁক দেখলেই যে-সব শিল্পতাত্ত্বিক গদ্‌গদ হয়ে ওঠেন, ক্লারা জেট্‌কিনের সঙ্গে কথোপকথনে তাঁদের কথা বলতে গিয়ে লেনিন ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। "বাজে, একেবারে বাজে!" বলেছিলেন তিনি, "এর অনেকটাই ভণ্ডামি, আর পশ্চিমী শিল্পে যা কিছু ফ্যাশন চালু হয় তার প্রতি অচেতন শ্রদ্ধাও অবশ্য এর মধ্যে কিছুটা আছে। এক্সপ্রেসনিজম, ফিউচারিজ্‌ম্‌, কিউবিজম্‌ এবং আরও যে-সব 'মতবাদ' (ism) আছে সেগুলো যে শিল্পগত প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তা মনে করতে আমি অসমর্থ। ওগুলো আমি বুঝতে পারি না। ও থেকে আমি আনন্দ পাই না।"

সাহিত্যের নানা প্রশ্নের উপর লেনিনের বিবৃতিগুলিকে পরিবর্ধিত এবং আরও বিকশিত করেছেন স্টালিন। এবং এই হচ্ছে সোভিয়েট জনসাধারণের ও পৃথিবীর সমগ্র প্রগতিশীল জনসাধারণের অগ্রণী মতাদর্শ। লেনিনবাদের বিজয়ী অভিযান অগ্রসর। এই মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদেশী লেখকেরা সংগ্রাম করছেন শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্যে, স্বাধীনতা-প্রিয় জনসাধারণের সুখী ভবিষ্যত গড়ে তোলবার জন্যে।

অরুণোদয়ের পথে

সলিল চৌধুরী

[একটা জেটির ধারে শিকল আর খোঁটা ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে—মাঝখানে রয়েছে একটা বিরাট পিপে। একপাশে একটা রেলিং দেওয়া। সিঁড়ি ধাপের নিচের দিকে নদী পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। চাঁদনী রাত। একজন পুলিশ অফিসার আর দুজন কনস্টেবলদের একজনের হাতে একটা আঠার পাত্র—সে সেটা নামিয়ে রাখে; আর একজনের হাতে এক বাণ্ডিল প্লাকার্ড—সে সেটা খোলে।]

১ম কনস্টেবল। (পিপেটা দেখিয়ে) এইটের গায়ে নোটিশটা লাগানো যাক্—কি বল?

২য় কনস্টেবল। ওঁকে একবার জিজ্ঞেস করি। (অফিসারকে) এখানে নোটিশটা লাগালে কি ভাল হবে সার?

(অফিসার উত্তর দেয় না)

১ম ক। নোটিশটা কি পিপের ওপর লাগাব?

অফিসার। (নিজের মনে বলতে থাকে) হুম্…সিঁড়িগুলো দেখছি বরাবর নদী পর্যন্ত নেমে গেছে—জায়গাটায় কড়া নজর রাখতে হবে। এখান দিয়ে নেমে গিয়ে থাকলে হয়তো কোন নৌকো এসে ভিড়বে!…হুম্…

১ম ক। (চেঁচিয়ে) এই পিপেটায় নোটিশটা টাঙাব সার?

অফিসার। হ্যাঁ হ্যাঁ, টাঙাতে পার—টাঙাও। (তারা দুজন আঠা লাগিয়ে নোটিশ মারতে থাকে, অফিসার লেখাটা পড়ে) এক হাজার টাকা পুরস্কার! চুল—কৃষ্ণবর্ণ, চোখ—কৃষ্ণবর্ণ, গায়ের রঙ—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখ মসৃণ, লম্বা—পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি।…নাঃ, এ দিয়ে কোন মানুষকে চেনা যেতে পারে না। অন্তত কয়েক লক্ষ লোক আছে যাদের এ রকম চেহারা।…জেল ভেঙে বেরোবার আগে লোকটাকে একবার দেখতে পর্যন্ত পারলুম না! চুঃ চুঃ! অথচ কত কি শুনছি! সে নাকি অদ্ভুত! এত বড় আন্দোলনটা নাকি তার বুদ্ধিতেই চলছে। এইভাবে জেল ভেঙে পালানোর ক্ষমতা বাংলাদেশে নাকি আর কারো নেই! গুজব, স্রেফ গুজব! নিশ্চয়ই জেলারদের মধ্যে তার কোন বন্ধুটন্ধু ছিল। তারা না সাহায্য করলে কেউ কখনো এ-ভাবে পালাতে পারে না। কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত এই সব জেলারদের!

১ম ক। কিন্তু স্যার, ওর মত একজন লোককে ধরার জন্মে এক হাজার টাকা মাত্র পুরস্কার বড় কম। অবিশ্যি এটা ঠিক যে পুলিশের মধ্যে যেই তাকে ধরুক তার প্রমোশন কেউ ঠেকাতে পারবে না।

অফিসার। হুম্, দেখ। এই জায়গাটায় আমি নিজে নজর রাখতে চাই।

১ম ক। আচ্ছা স্যার। (কনস্টেবল দুজন ইঙ্গিতপূর্ণভাবে চায়)

অফিসার। তিনি যদি হঠাৎ এখানে এসে উদয় হন আমি মোটেই আশ্চর্য হব না। জায়গাটা যে-রকম—তাতে—হয়তো ওদিক থেকে সে আসবে—আর এদিক থেকে নৌকোটা আসবে—আর তখন আমি এই এমনি করে রিভল্‌ভারটা ধরে নামব নিচের দিকে···হাঃ হাঃ হাঃ···কিন্তু যদি একবার ফসকায় আর সারা জীবনে তাকে খুঁজে পেতে হবে না। হয়তো কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে থাকবে আর দেশের লোক শালারা জানলেও কেউ টুঁ শব্দটি করবে না। আমার মত লোক এক হাজার টাকা পেল কি না পেল তাতে ওদের বয়েই গেল!

২য় ক। তারা তো ধরিয়ে দেবেই না, উল্টে আমরা যদি ধরি তো শালারা গালাগাল করবে স্যার! আর কাকেই বা বলব স্যার, নিজের আত্মীয়-স্বজনরাই গালাগাল করে!

অফিসার। (সামলে নিয়ে) তাতে কী হল? পুলিশে যখন আছি তখন আমাদের কর্তব্য আমাদের করে যেতেই হবে। এ তো আর ছেলেখেলা নয়—সারা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রাখার ভার আমাদের ওপর! আমরা না থাকলে এই গোটা দেশটাই আজ ওলটপালট হয়ে যেত। (স্বগত) যারা আজ নিচে সবাই উঠত ওপরে, আর যারা ওপরে?···(কনস্টেবলদের উদ্দেশ্যে) যাক্ তোমরা তাড়াতাড়ি কর···এখনো অনেক জায়গায় নোটিশ টাঙানো বাকি রয়েছে। কাজ শেষ হলে আবার চলে আসবে এখানে ···বেশি দেরি না হয়। হাঁ আলোটা তোমরা নিয়ে যেতে পার (টর্চটা দেয়)। জায়গাটার আশেপাশে জনমনিষ্যি নেই···নির্জন খাঁ খাঁ করছে একেবারে!

১ম ক। কি করব স্যার! আপনার সঙ্গে থাকতে পারছি না! এন্‌ফোর্সমেন্ট নাকি এসে পৌঁছয় নি! ওর মত লোক জেলে থাকতে থাকতেই গবমেন্টের উচিত ছিল আরও পুলিশ নিয়ে আসা। আচ্ছা, আমরা তাহলে চলি স্যার! চল। (দুজনের প্রস্থান)

[অফিসার পায়চারি করতে থাকে আর একবার করে নোটিশটার দিকে তাকায়]

অফিসার। এক হাজার টাকা আর প্রমোশন! ওঃ! এক হাজার টাকা পেলে কত কী করা যায়! কিন্তু টাকার জন্তে তো নয়—এ আমার কর্তব্য! দেশের মধ্যে এই বিশৃঙ্খলা আর অশান্তি চালাচ্ছে যারা, গরীব বড়লোকে ঝগড়া বাধিয়ে হিংসের সৃষ্টি করছে—তাদের ধরা হচ্ছে পেট্রিয়টিক ডিউটি! কমিশনার যা বলেন ঠিক বলেন! (পায়চারি করে আবার পোস্টার পড়ে) এক হাজার টাকা! সুমিতার কতদিনের শখ একসেট জড়োয়া গয়না—বেচারা কোথাও বেরোতে পর্যন্ত পারে না। মেয়ের বিয়ে দিতে তো অর্দ্ধেক বিকিয়ে গেল!...কমিশনার মাইনে পান কত? এক হাজার টাকা! আর আমি পাই কত?...না না—আবার গরীব বড়লোক এসে যাচ্ছে—শ্রেণীসংগ্রাম নাকি বলে যা তা...ওঃ! লোকগুলো দেখছি আমাকেও পেয়ে বসছে! ডেন্জারাস থট্! (পায়চারি করতে থাকে)...কিন্তু এক হাজার টাকা! আমি চুরি করছি না—আমার প্রাপ্য—My reward! কেন নেব না? আমার ডিউটি করে আমি নেব! নিশ্চয় নেব...হাঃ এই তো সমস্যার সমাধান! কিন্তু আমি কি পাব? ভগবান! আমার মত লোকের বরাতে কি আর এক হাজার টাকা জুটবে?

[শতচ্ছিন্ন জামাকাপড় পরা একজন লোক ঢোকে। একমুখ দাড়ি গোঁফ, মাথায় লম্বা চুল। হাতে একতারা। লোকটা অফিসারকে পেরিয়ে চলে যেতে থাকে। অফিসার হঠাৎ ফিরে দেখে]

এই! কিধার যাতা?

লোক। হেঁ হেঁ...এই যেতেছি কত্তা, এদিক পানে যেতেছি। ঐ সিঁড়ি দিয়ে উটে অমনি হই দিকে চলি যাব! (যেতে থাকে)

অফি। দাঁড়াও! কে তুমি?

লোক। এজ্ঞে আমি একজন বাউল গো কত্তা। ঐ মাঝি-মাল্লাদের দুটো গান শোনাব বলে যেতেছি আর কি। (আবার যেতে থাকে)

অফি। এই! বলছি না দাঁড়াতে? ওদিক দিয়ে যাওয়া আজ বন্ধ। যাও, ভাগো হিঁয়াসে!

বাউল। যাওয়া বন্ধ বুঝি? আচ্ছা গো বাবু, তাহলি যাই। গরীবির বরাতে আর কোন সুখ নি গো বাবু—সারা জগতই তার বিরুদ্ধে!

অক্ষি। তুমি কে ? ঠিক করে বল তুমি কে ?

বাউল। এজ্ঞে তা যদি বলতি বল কত্তা, শোনলে আপনার খুউব ভালো নাগবে। তা যাগগে আমার নাম হোল গে আপনার ইয়ে—ভদ্রেশ্বর ধাড়া—একজন বাউল আর কি।

অক্ষি। ভদ্রেশ্বর ধাড়া! কই নামটা তো আগে কখনো শুনেছি বলে মনে হয়না ?

বাউল। সে কি কত্তা, আমার নাম শোননি ? তা হতি পারে—তবে সোণারপুরির নোকেরা ও নাম একবার ওচ্চারণ করলিই চেনবে। তা আপনি বুঝি কখনো সোণারপুরে যাওনি কত্তা ?

অক্ষি। তা এখানে কি করতে এসেছ তুমি ? কি মতলবে ?

বাউল। এই দুটো পয়সার ধান্দায়—ভাবলাম মাঝিদের কাছে গান সোনালি হয়তো দুটো চারটে পয়সা মিলতি পারে—হেই আর কি। তা অনেকখানটা পথ হেঁটে আসতিছি গো কত্তা! হেই ধরো গে আপনার চৌরাটি যে—গ'ড়ে হয়ে—

অক্ষি। তা যদি এতদুর হেঁটে আসতে পেরে থাক, আরও কিছুদূর যেতে পারবে। এখানে তোমার থাকা হবেনা—যাও।

বাউল। হাঁ্যা তা যাব বইকি কত্তা—আমি কি আর চেরকাল এখানেই থাকব! যেখানে যাবার আমি ঠিক যাব। (সিঁড়ির দিকে যায়)

অক্ষি। এই! ওদিকে নয়—এদিক দিয়ে যাও। চলে এস সিঁড়ির ধার থেকে!

বাউল। আমি যাবুনি গো কত্তা—এই সিঁড়ির ওপর চুপটি মেরে বসে থাকব। দেখি যদি কোন মাঝিমাল্লা এদিকে এসে পড়ে। এর আগেও তো দেখিচি অনেক আত্তির পের্যন্ত হয়তো কোন মালটাল নিয়ে জাহাজে ফিরে যায়। দুটো চারটে পয়সা দিলি কাল সকালের খাওয়াটা হয়।

অক্ষি। (রেগে যায়) আমি বলছি তোমাকে ভালয় ভালয় ওখান থেকে সরে পড়। আজ রাত্তিরে কাউকে এই জেটির ধারে থাকতে দেয়া হবে না—যাও নিকালো! (চাবুক আস্ফালন করে)

বাউল। (ভয়ে ভয়ে) হ্যাঁ হ্যাঁ যাই কত্তা—এবার ঠিক চলে যাব···যাচ্ছি···গরীবির ওপর আর নাঞ্ছনার শেষ নি—(চোখের জল মোছে, ফের দাঁড়ায়)

অক্ষি। কি হল আবার দাঁড়ালে কেন ?

বাউল। এই একটা কতা বলব কত্তা? বলিই চলে যাব—হেঁ হেঁ—! তা আমি তো চলেই যেতেছি—কিন্তু যাবার আগে আপনি একটা গান শোনবে কত্তা! শোনলে আপনার লিশ্চয় ভাল লাগবে—একেবারে কানের মধ্যি দিয়ে সেঁদিয়ে পরাণের সঙ্গে কথা কয়ে যাবে—হেঁ হেঁ—। (সুর দেয় একতারায়) এটা হোলগে আপনার অনাবিষ্টির গান।

অফি। আচ্ছা জ্বালালে তো! যাও! যাও এখান থেকে!

বাউল। আচ্ছা আপনি একবার শুনিই ভাখো—ভাল না লাগলি তখন আমি চলে যাব। (গান শুরু করে)

আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে
ছায়া দে রে তুই।
আসমান অইল টুডা ফুডা
জমিন অইল ফাডা
আর ম্যাঘ রাজা ঘুমাইয়া আছে
পানি দিব কেডা!···

অফিসার। বাস্—যাও এবার এখান থেকে, এখানে হাল্লা করলে ভীষণ মুস্কিল হবে।

বাউল। আচ্ছা—(হন্ হন্ করে সিঁড়ি দিয়ে আবার নামতে থাকে)

অফিসার। এই! আবার ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?

বাউল। এজ্ঞে আপনি তো বল্লে আমারে চলে যেতে, তাই চলে যাচ্ছি।

অফি। রাস্কেল কোথাকার! যেদিক থেকে এসেছ সেদিকে চলে যাও।

বাউল। (কাতরভাবে) এজ্ঞে যেখান থেকে এইচি আবার সেখানে চলে যাব?

অফি। ভাল কথায় হবেনা তোমার! (ঘাড় ধরে) যাও বেরোও এখান থেকে—বেরোও! (ধাক্কা দেয়। কিছুদূর গিয়ে বাউল আবার দাঁড়িয়ে পড়ে—নোটিশটা হঠাৎ দেখতে পেয়ে মন দিয়ে দেখতে শুরু করে)

আবার দাঁড়াচ্ছ কেন? এবার চাবকে তোমায়—

বাউল। ও! এতক্ষণে বোঝলাম!

অফি। কি বুঝলে?

বাউল। এতক্ষণে বোঝলাম আপনি কেন এত ছিটফিট করতিছ—আর কার জন্তি অপেক্ষা করতিছ।

অক্ষি। তাতে তোমার কি ?

বাউল। এজ্ঞে কিছু নয়। আমি নোকটারে চিনি কিনা—মানে বেশ ভাল করেই চিনি কিনা—তাই আর কি। তা সে যাগ্‌গে—আমি চলি—(যেতে থাকে)

অক্ষি। তুমি চেনো ওকে ?…এই! এদিকে এস—এদিকে এস।

বাউল। এজ্ঞে আমারে আবার কেন ফিরে আসতি বলতিছ কত্তা—ওরে বাবা! শেষে কি সবংশে মারা পড়ব কত্তা ?

অক্ষি। ও কথা কেন বলছ ? কেমন লোক সে ?

বাউল। (দু'হাত কপালে ঠেকায়) আমি ওসবের মধ্যি ঘুণাক্ষরেও নি কত্তা, আমি চলি। ও দশ হাজার টাকা পেলিও আমি আপনার মত হতাম না কত্তা…বাপ্‌স্! (চলে যেতে থাকে)

অক্ষি। এই! এদিকে এস! শুনে যাও (জামা ধরে নিয়ে আসে) কেমন লোক সে, কোথায় দেখেছ তুমি ? শিগ্‌গির বল, নইলে তোমাকে হুম্ভু জেলে পুরব।

বাউল। ওরে বাবা! বোকা নোক পেয়ে যে একেবারে আমারে মারীচের কলে ফেললে কত্তা! এখন কোন্ দিকে যাই আমি—ওদিকে রাবণের বাণ এদিকে রামের—

অক্ষি। ওকে কোথায় দেখেছ তুমি ?

বাউল। (ভয়ে ভয়ে চারদিক চেয়ে) এজ্ঞে আমার দেশেই আমি তারে দেখেচি—সোণারপুরিতেই। আমি আপনারে সোজা কথা বলতিছি কত্তা তার দিকে চাইলি আপনার অন্তরাত্মা একেবারে শুকিয়ে যাবে। তার সঙ্গে এক জায়গায় থাকতি পেরথম আপনার গা ছমছম করবে। ছুরি, নাঠি, বন্দুক, কামান, বোমা এমন কোন-অস্তর নিই যা সে আপনার চালাতি জানে না। আর তেমনি শক্তি—হাতের এই গুল্ যেন এই নোয়ার মত শক্ত (পিপেটা চাপড়ায়) নোয়ার মত শক্ত!

অক্ষি। (একেবারে বেকুব বনে গিয়ে) এত সাংঘাতিক লোক সে ?

বাউল। হাঁ কত্তা। তারে সাংঘাতিক বলতি পার বটে!

অক্ষি। তুমি-এ সব ঠিক বলছ তো ?

বাউল। ঠিক নয় আবার? ঠিক না হলি তো আমিও থাকতি পারতাম আপনার সঙ্গে।...একবার এক বেচারি সারজন্ট আমাদের ওখানে এয়েছ্যাল। হুই আপনার কেনিং থেকে—তা আপনারে বলব কি কত্তা—দেখ এখনও আমার গায়ে কাঁটা দি উটতেছে...একটা এই এমনি পাথর দিই তারে শেষ করে দিলে!

অফি। কই, এ খবর শুনিনি তো কখনো?

বাউল। কোথেকে শোনবেন কত্তা! যা সব ঘটনা ঘটে তার সবি কি আর রটে! আর এ সব নিয়ে যে বলাবলি করবে কার ঘাড়ে এমন দুটো মাতা আছে! আর একটা ঘটনা...সেও একজন পুলিশ...অবিশ্যি সাদা জামাকাপড়-পরা। ব্যাপারটা হ্যান কোথায়...হ্যাঁ সেই ডায়মণ্ডহারবার... সেই যেবারে আপনার চন্দননগরির থানা লুট হল ঠিক তার পরে...সেও এমনি চাঁদনী রাত...এই রকম নদীর ধার...কি যে ঘটল তা কেউ বলতি পারল না...লোকটা যেন হাওয়ার মধ্যে উপে গেল!

অফি। (দুবার ঢোঁক গিলে গলাখাঁকরি দিয়ে) মানে, এ সব ঠিক বলছ তো তুমি? ওঃ! বাংলাদেশে থাকাটাই একটা বিপজ্জনক ব্যাপার!

বাউল। ঠিক! ঠিক বলেছেন কত্তা! একেবারে খাঁটি কতা! হয়তো আপনি এখানে দাঁইড়ে আছ হুই দিকে চেয়ে—মনে কর আপনি লোকটারে দেখলে জেটির এই ধার দে গুঁড়ি মেরে মেরে আসতিছে...কোথাও কিছু নিই আবার দেখবে হঠাৎ সে ওইধার দে আসতিছে। আপনি নিজে কোথায় দাঁইড়ে আছ এ-কতা ভাল করে বোঝপার আগেই সে একেবারে আপনার ঘাড়ের ওপর নেইপে পড়বে।

অফি। (ভীষণ চমকে উঠে) চুপ কর! ওঃ! এ রকম একটা লোককে ধরার জন্যে আমি একলা কি করব? একদল পুলিশ দেয়া উচিত ছিল ওদের!

বাউল। তা তো বটেই! অবিশ্যি আপনি যদি মনে কর তাহলে আমি আপনার সঙ্গে জেটির এই দিকটায় নজর রাখতি পারি! তা আপনার কাছে বন্দুক আছে তো কত্তা? তাহলি আমি বরং এই পিপেটার উপরি বসে থাকি!

অফি। হ্যাঁ হ্যাঁ—তুমি তো তাকে দেখলে চিনতে পারবে, তাই না?

বাউল। এক কোশ দূর থে আমি তারে চিনতি পারব কত্তা!

অফি। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই ঐ টাকার ভাগ চাইবে না?

বাউল। এজ্ঞে কত্তা—আমার মত একজন গরীব লোক—হাটে-মাঠে গান করে আমারে খেতি হয়—আমি তারে ধরিয়ে দিইছি জানলি আর লোকে একটা পয়সাও দেবে না!…আমি বরং চলি কত্তা, আমার তো থাকার কোন দরকার নি তেমন—সহরে আমি নিশ্চিন্তে থাকব'খন।

অফি। না না—তুমি এখানে থাকতে পার—তুমি থাক।

বাউল। যা বলেন আপনি! (পিপেটার ওপর উঠে বসে। অফিসার পায়চারি করতে থাকে—বাউল দেখে) কত্তা!…আপনারে দেখে আমি অবাক হচ্ছি কত্তা! সেই তখন থেকে যে রকম ভাবে আপনি ঘোরাঘুরি করতেছ কই তাতে তো আপনি অবসন্ন হচ্ছ না?

অফি। অবসন্ন হলেও আমার অভ্যেস আছে।

বাউল। এই পিপের উপরি অনেকখানি জায়গা রয়েছে। একটু জিরিয়ে নিলি পারতে—আজ আত্তিরেই তো আবার অনেক ধকল পোয়াতি হতি পারে! আর এখেনে উটলি আপনি অনেকখানি দূর পের্যন্ত দেখতিও পাবে।

অফি। হুম্…তা বটে! (উঠে বসল)

[অফিসার আর বাউল দুজনে দুদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইল।
দূর থেকে কুকুরের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। অফিসার মাঝে
মাঝে এদিক ওদিক দেখছে]

অফি। তুমি এমনভাবে কথা বল শুনলে গায়ের মধ্যে কেমন শিরশির করতে থাকে!…

বাউল। দেশলাই আছে কত্তা?…(অফিসার পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে দেয়—বাউল একটা বিড়ি বের করে ধরায়) খাবেন নাকি একটা? (অফিসার একটা সিগারেট বের করে) হ্যাঁ খেয়ে নাও! খেলি অনেকটা সোয়াস্তি পাবেন। দাঁড়ান আমি জেলে দিচ্ছি—হুঁ হুঁ এদিকে মুখ ফেরাবেন না—জেটির ওপর থে একটু নজর সাড়বেন না—(ধরিয়ে দেয়)

(দুজনে টানতে থাকে চুপচাপ)

অফি। বড় ঝামেলা এই পুলিশের চাকরি। রাত নেই বিরেত নেই কত বিপদ-আপদের মধ্যে—মরলে একটা কেউ আহা বলবে না পর্যন্ত!

বাউল। তা বটে!

অফি। অথচ কর্তব্য! হুকুম তামিল করা ছাড়া কোন উপায়ও নেই!

একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করবে না তুমি বিবাহিত কিনা—তোমার ওপর সংসার নির্ভর করছে কিনা—

বাউল। (একতারায় সুর দিতে আরম্ভ করে—তারপর গান ধরে)

দিনের শোভা সুরুয রে
রাইতের শোভা চান্দ
আর চাষীর শোভা হালকৃষি
জমিনের শোভা ধান্দ।

অক্ষি। (বিরক্তভাবে) আঃ থাম! ও গান করার সময় এটা নয়।

বাউল। শরীলটা এট্টু গরম রাখবার জন্যি গাইতিছি কত্তা! সে নোকটার কথা মনে পড়লিই আমার গায়ের অক্ত ঝ্যান হিম হয়ে আসে।

অক্ষি। চুপ কর তুমি!

বাউল। একবার ভাবুন তো কত্তা—আমরা দুজনা এখেনে বসে রইছি—আর হঠাৎ দেখি হোই জেটির ধার দে সে থাবা মেরে মেরে গুটিগুটি আসতিছে—এই বুঝি একেবারে নেইপে ঘাড়ের উপরি পড়ে—

অক্ষি। (বাউলের কাছে সরে এসে) তুমি ভাল করে নজর রাখছ তো?

বাউল। তা তো রাখতিছি কত্তা—আর কোন পুরস্কারের নোভেও নয়।

অক্ষি। ভগবান তোমায় পুরস্কার দেবেন।

বাউল। তা জানি কত্তা—কিন্তু জীবনেরও একটা টান আছে। আমি নোকটা অমনি বোকা! এই ঝ্যাখনই কোন নোককে বিপদে পড়তি দেখিছি ত্যাখনই তারে উদ্ধার করতে নেগিছি—ওটা আমার একটা অভ্যেস হয়ে গেছে।

অক্ষি। বেশ, গান গাইলে যদি তোমার সাহস আসে তাহলে গাইতে পার আস্তে আস্তে—

বাউল। (আবার সুর দেয়—আর গান ধরে)

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি
অভিরামের দ্বীপচালান মা ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
হাতে যদি থাকত ছোরা
তোর ক্ষুদি কি চড়ত ঘোড়া
চিনতে যদি না পার মা
দেখো গলায় ফাঁসি।...

অক্ষি। আঃ থাম থাম। কি সব যা তা বলছ ? গান গেয়ে যাও—অথচ গানটাও জান না ?

বাউল। ভুল হল বুঝি কত্তা ?

অক্ষি। ভুল হল না ?—গানটার একেবারে শ্রাদ্ধ করে ছাড়লে।…

—"হাতে যদি থাকত ছোরা
তোর ক্ষুদি কি পড়ত ধরা
রক্তে মাংসে এক করিতাম
দেখত ভারতবাসী।"

বাউল। (অবাক হয়ে) ঠিক বলেছ কত্তা। একেবারে ঠিক বলেছ—আমার বিস্মরণ হয়ে গিয়েছিল।

(বাউল ঠিক করে গায়)

…কত্তা! আপনি এসব গান জানো ভাবত্তি কেমন লাগে—

অক্ষি। কেন ? ওটা তোমার একলার সম্পত্তি নাকি ?

বাউল। না, তাই বলতিছি।

অক্ষি। ছোটবেলায় কত গেয়েছি ও সব গান!

বাউল। তাই নাকি ?…তাহলে…বলেই ফেলি কত্তা ?

অক্ষি। কি ? কি বলে ফেলবে ?

বাউল। হয়তো আপনার ছোটবেলায় ঠিক এখন আপনি যেমন বসে আছ তেমনি করে বসে থাকতে আর আপনার আশেপাশে আরও অনেক ছেলে বসে থাকত আর আপনারা সকলে মিলে গাইতে ক্ষুদিরামের গান।

অক্ষি। হ্যা—তা গাইতাম—সকলে মিলে গাইতাম।

বাউল। আর সেই "চিত্তরঞ্জন স্বদেশের প্রাণধন" ?

অক্ষি। হ্যা তাও গাইতাম।

বাউল। "ওদের যতই আঁখি অন্ধ হবে ?"

অক্ষি। হ্যা।

বাউল। আর "শিকল পরা হল মোদের" ?

অক্ষি। হ্যা। ওটাও গাইতাম। তাতে কি হয়েছে ? ওসব কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ?

বাউল। না এমনি। আমি ভাবতিছি কত্তা—যে লোকটারে তুমি

আজ আত্তিরে খুঁজে বেড়াচ্ছ সেও হয়ত তার ছেলেবেলায় ঠিক ঐ গানগুলোই গাইত ?…জগত অতি বিচিত্ত কত্তা !

অফি। চুপ—হিস্-স্-স্…কে যেন আসছে…না ওটা কুকুর।

বাউল। আচ্ছা কত্তা, এমনও তো হতি পারে হয়তো যাদের সাথে বসে আপনি গান করেছেলে তাদের একজনকেই হয়তো আজ কিম্বা কাল গেরেপ্তার করবে—জেলে পাটাবে।

অফি। হ্যাঁ, তা তো হতেই পারে—কিন্তু এমন করে তো কখনো ভাবিনি।

বাউল। সত্যি নাও হতি পারে—কিন্তু ভাবতে তো কোন দোষ নি কত্তা ! মনে কর সেদিন কোন ছেলে যদি আপনারে বলত যে, দেশ স্বাধীন করবার একটা পথ খুঁজে পেয়েছে—হয়তো আপনিও যোগ দিতে তার সঙ্গে আর হতে পারে হয়তো আজকের এই বিপদে আপনিই পড়তে।

অফি। হ্যাঁ, তা পারতুম। তখনকার দিন ছিল আলাদা, তখন মনে একটা তেজ ছিল আমার !

বাউল। বিচিত্ত জগত কত্তা—বড় বিচিত্ত ! ছেলে যবে মেঝের উপরি হামাগুড়ি দেয় তখন তার মাও বলতি পারে না বড় হলে সে কি হবে ! কে যে কি হবে তা কেউ বলতি পারে না।

অফি। ঠিক বলেছ তুমি ! কে যে কি হবে তা কেউ বলতে পারে না। এই ধর আমি, মানে আমার যদি এত বুদ্ধিশুদ্ধি না থাকত—স্ত্রী সংসার ছেলেপুলে না থাকত কিম্বা পুলিশের চাকরি না পেতুম—হয়তো আজ আমিই জেল ভাঙতুম…কে জানে !…হয়তো আমিই অন্ধকারে লুকিয়ে বেড়াতুম… আর সেই লোকটা যে জেল ভেঙে বেরিয়েছে সে-ই হয়তো এখানে আমার জায়গায় বসে থাকত ! সে-ই হয়তো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করত আর আমিই তা ভাঙতুম। হয়তো আমিই চাইতুম তার মাথার খুলিটা গুলি করে গুঁড়ো করে দিতে কিংবা একটা পাথর দিয়ে এমনি করে এক ঘায়ে তার মাথাটা চুরমার করে দিতুম…আর তার লাসটা টেনে ঐ নদীর জলে ভাসিয়ে দিতুম… হ্যাঁ আমিই করতুম। (অফিসার হাঁপাতে থাকে। বাউল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। হঠাৎ অফিসার তার গলাটা চেপে ধরে) না না আমি কিছু হতুম না…এই তোমাকে জেলে দিচ্ছি শয়তান…আমি কোন কথা বলিনি তোমাকে…আমি শুধু দেখছিলুম তোমার কল্পনার কতদূর দৌড় ! (হঠাৎ কি

একটা শব্দ হতেই অফিসার হাত সরিয়ে নেয়) ওটা কী? কি শব্দ হচ্ছে ওটা? কারা আসছে ওখানে? (বাউল লাফিয়ে নেমে পড়ে, অফিসারও নেমে পড়ে)

বাউল। ও কিছু নয় কত্তা, ও কিছু নয়।

অফি। না, একটা নৌকোর শব্দ হচ্ছে—আমি ঠিক তাই শুনেছিলাম। তার দোস্তরা এখানে এসে নৌকো ভেড়াবে। ঐ শোন—

বাউল। কত্তা, আমি ভাবতিছি আগে আপনি ছিলে দেশের লোকের সঙ্গে আর এখন আপনি আছ আইনের সঙ্গে।

অফি। হ্যাঁ, তখন যদি আমি বোকামি করেও থাকি, সে সব দিন এখন চলে গেছে।

বাউল। আমি ভাবতিছি এখনও এমন হতি পারে, আপনার ঐ টুপি আর পোশাক থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে আপনার মনে হয় যে ঐ লোকটার মত আপনিও দেশের পথ ধর।

অফি। সাট্ আপ! আমার মাথায় কি আসে না আসে তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না!···শব্দটা থেমে গেল মনে হচ্ছে!

বাউল। হতি পারে কত্তা যে এখনও আপনি দেশের লোকের পক্ষেই আছ। আপনার মুখখান দেখলি কেবল আমার ঐ কথাই মনে হয়।

অফি। তুমি আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বললে খুব খারাপ হবে। কার সঙ্গে কথা বলছ তোমার খেয়াল আছে? (আবার কান পেতে শোনে)··· হ্যাঁ নিশ্চয়ই একটা নৌকো আসছে, পরিষ্কার দাঁড়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

বাউল। (হঠাৎ গাইতে শুরু করে)

> কারার ঐ লৌহকপাট
> ভেঙে ফেল্ কর রে লোপাট
> রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণবেদী!

অফি। চুপ···এ গান বন্ধ কর।

বাউল।
> লাথি মার্ ভাঙ্‌রে তালা
> যত সব বন্দীশালায়
> আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা
> ফেল্ উপাড়ি···

অফি। যদি বন্ধ না কর আমি তোমাকে এখনি গ্রেপ্তার করব। (নদীর দিক থেকে শোনা যায় শিষ দিয়ে কেউ ঠিক ঐ সুরটাই বাজাতে থাকে) নিশ্চয় কেউ সংকেত করছে—সিগন্যালিং! হল্ট! দাঁড়াও ওখানে…এক পা নড়লে তোমার খুলি আমি উড়িয়ে দেব…কে তুমি? তুমি বাউল নও…তুমি…

বাউল। ও-কথা জিজ্ঞাসা করে আর লাভ নেই…ঐ নোটিশেই লেখা আছে আমি কে—

অফি। (বজ্রাহত) তুমি! তোমাকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি…

বাউল। (একটানে মাথার চুল আর গোঁফ-দাড়ি খুলে ফেলে) আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সে-ই—আমার মাথার ওপরেই এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে! কিন্তু আমার বন্ধুরা এসে গেছে…তারা নিচে নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করছে।

অফি। তুমি…আপনি…কেন আপনি আমাকে এ-রকম অপদস্থ করলেন? আপনি আমাকে কেন ঠকালেন?

বাউল। কেন? আমি দেশকে স্বাধীন করতে চাই—দেশের মানুষকে ভালবাসি!

অফি। আমি দুঃখিত! কিন্তু আমার উপায় নেই। (চুল-দাড়ি কেড়ে নেয়)

বাউল। আপনি কি আমায় যেতে দেবেন…না, যেতে দিতে বাধ্য করব আপনাকে?

অফি। আমি পুলিশের লোক—আপনাকে আমি যেতে দিতে পারি না।

বাউল। আমি ভেবেছিলাম আমার মুখের জোরেই কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে। (কোমরে হাত দিল) ও কি? ওরা কারা?

(কনস্টেবলদের কথা শোনা যায়—"এই যে এখানে, এখানে")

অফি। আমার লোকেরা এসে পড়েছে।

বাউল। আপনি নিশ্চয় শত্রুতা করবেন না। (পিপের পিছনে লুকোয়)

(কনস্টেবল দু'জন ঢোকে)

২য় ক। পালালে নিশ্চয় সে কথা জানাজানি হবে।

(অফিসার চুল দাড়ি পিছনে লুকিয়ে ফেলে)

১ম ক। এ দিকে কেউ এসেছিল সার?

অফি। (চুপ করে থেকে) না।

২য় ক। কেউ না ?

অফি। না।

১ম ক। আশ্চর্য তো!

২য় ক। আমাদের কাজ শেষ সার। আপনার সঙ্গে এখন থাকতে পারি।

অফি। কোন দরকার নেই···তোমরা ফিরে যেতে পার।

১ম ক। আপনি যে বল্লেন সার তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে···আপনার সঙ্গে থাকার জন্তে—

অফি। না। আমি একলা থাকতে চাই! এরকম হাল্লা করলে এখানে আর কোন লোক আসবে বলে মনে কর? যাও···জায়গাটা নিরিবিলি থাকতে দাও।

২য় ক। তাহলে আলোটা এখানে রেখে যাই সার?

অফি। না আমার দরকার নেই আলো—তোমরা নিয়ে যাও।

১ম ক। আপনার কাজে লাগতে পারে সার, রাত পোহাতে এখনও অনেক বাকি। ঐ পিপের ওপর বরং এটা রেখে যাই। (পিপের দিকে যায়)

অফি। (ধমক দেয়) আমি যা বলছি তোমাদের, তাই কর! যাও, আর একটা কথা নয়।

১ম ক। বেশ, তাই যাচ্ছি সার! যখন টর্চটা আমার হাতে থাকে, কেবল ইচ্ছে হয় অন্ধকার কোণগুলোয় এমনি করে আলো ফেলি···মনে যেন সাহস পাই তখন (টর্চ জ্বালায়)।

অফি। (ফেটে পড়ে) ক্লিয়ার আউট আই সে!

(কনস্টেবল দুজন তাড়াতাড়ি চলে যায়)

[বাউল পিপের পিছন থেকে বেরিয়ে আসে···অফিসার আর বাউল পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে]

এখনো কি জন্তে দাঁড়িয়ে আছেন ?

বাউল। এই···আমার চুলটা আর দাড়িটা যদি দিয়ে দেন দয়া করে··· (অফিসার দিয়ে দেয়। লোকটা আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে চলে যায় তারপর ফিরে দাঁড়ায়) আচ্ছা চলি। ধন্তবাদ দিয়ে আর আপনাকে ছোট করব না।

অফি। দয়া করে আপনি চলে যান এখান থেকে।

বাউল। বিদায়! আবার দেখা হবে অরুণোদয়ের পথে···যেদিন নিচু তলার মানুষরা ওপরে উঠবে সেদিন আপনাকে মনে থাকবে! অভিনন্দন!

[সিঁড়ি দিয়ে নিচে চলে যায়]

অফি। (দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে নোটিশটা পড়ে) এক হাজার টাকা! এক হাজার টাকা পেলে কত কী না করা যায়!···ওঃ কি গর্দভ আমি! কিন্তু (দর্শকদের দিকে ফিরে এগিয়ে আসে)···কিন্তু আপনারা! আপনারাও কি তাই বলবেন? আপনারাও কি বলবেন আমি গর্দভ? *

—যবনিকা—

* (Lady Gregory-র At the rising o tl eMoon নাটিকার অবলম্বন ভাবানুবাদ.

কবিতাগুচ্ছ

কোনো মা-কে

(চারুদির উদ্দেশে)

রোহীন্দ্র চক্রবর্তী

আমার চোখে তো একটুও জল নেই
কান্নায় বুক হিম হয়ে গেছে তবু,
তবুও হাসছি, তুমি কেন আজ কাঁদছ ?
বারো বছরের ছেলেটা আমার
খেতে পায়নিক' মরবার আগে, আহা,
এক কৌটো জলও পায়নি তৃষ্ণা মেটাতে !
মিছিলে মিছিলে পায়ে পায়ে হেঁটে গেছি,
কচি ছেলেটার মুখ
ঘিরেছিল সারা দেহ-মন ঝোড় হাওয়ার মতন শ্বাসে।
জীবনে হাওয়ার শ্বাস টেনে টেনে গিয়েছি
চিড় খাওয়া আর পোড় খাওয়া মানুষের
ঝড়ের রাতের ফুটো চালটার মত
দুই হাত জুড়ে খড় ফুটো গুঁজে দিয়েছি,
তবুও পারিনি, তবুও ঝরেছে জল,
ঝড়ের ঝাঁকুনি দাঁতে দাঁত চেপে সয়েছি
দুই হাত দিয়ে সারা বুক দিয়ে ঢেউ ঠেলে ঠেলে গিয়েছি।

হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সাথে লড়েছে
(বারো বছরের ছেলেটা একলা লড়েছে)
খেতে পেত নাক' চিৎকারে সাড়া পেত না
পেটের ব্যথায় কুঁকড়িয়ে নীল হ'ত,
তবু সাড়া কারো পেত না।

আমারও মনের অলিগলি বেয়ে দিনান্তে অবকাশে
কচি কালো চোখ স্বপ্নে হড়াত ব্যথা,
প্রাত্যহিকের বাস্তব মাঝে কখনও সময় হ'ত না।
হাটে, বন্দরে, সভায়, মিছিলে গিয়েছি
যেখানে যে দেশে খোকারা হয়েছে বড়ো,
তাদেরই মাঝেতে ঘুরেছি
আকাশ ছোঁয়ানো ব্যথার পাহাড়ে তাদেরই মনকে ছুঁয়েছি।

মনে পড়ে তার মৃত্যুর আগে, মৃত্যুর বুঝি দিন কত আগে হবে
বহুকাল বাদে সময়কে পেয়েছিলাম,
তার কাছে গিয়েছিলাম,
কালো দুই চোখ আকাশেতে মেলে সীমাহীন ভালোবাসায়
বলেছিল সে যে, "আমাকে তোমার মনে পড়ল মা এতদিন পর?"
অভিমানী ছেলে হায়রে আমার!
অনেক কথাই বলেছি সেদিন আমি
মৃত্যু-ভয়ের দম-আটকানো অনেক কথাই :
"তোকে বড় বেশি মনে পড়ে, বাবা আমার,
তাইত আজকে বরফ-জমানো রাতের অন্ধকারে
দুই হাত দিয়ে সূর্যকে ছিঁড়ে বুকের পাশেতে টেনে নামাই
তাইত আজকে মিছিলের মুখে, ঝড়ের আগুনে এগিয়ে যাই।"

—"খিদে পেলে মাগো দেয় না আমায় খেতে
ডেকে খুন হই কারো সাড়া তবু পাই না,
ঘুম ভেঙে দেখি রক্তে রক্তে কালো দাগ এঁকে গেছে
বর্ষার ধারাজলের মতন হাড় বের-করা চোয়াল বেয়ে...
তোর কিগো মা একটুও মনে পড়ে না?"

আশ্বাস দিই,
নিদাঘের এই রোদে পোড়া মাঠে বসন্ত ফিরে আসবেই,
আশ্বাস দিই, আবার আসব আমি।

"তুইত জানিস তোর মার কত কাজ,
কত শত দুখ কত বেদনার পথ ঘাট ভেঙে ভেঙে
কত ঝড় জল আঁধার পাহাড় বুক দিয়ে যুঝে যুঝে
বিস্ময়-ভরা মানুষের এক পৃথিবী গড়ার কাজ···
কথা বলেনিক', চুপচাপ শুয়েছিল
চোখ দুটি ছিল আকাশের নীল মেঘের মতন
সাগরের বুকে মেলা।
ফিরে চলে আসি, পিছনে চাইনি মুহূর্তেকও
বাতাস কাঁপানো তীব্র এক নিঃশ্বাসে
পায়ে পায়ে দিই সমগ্র দেহটাকে
জীবনের রক্তস্রোতের মধ্যে ঠেলে;
ফিরে দেখা আর হয়নি,
এ পোড়া পৃথিবী কথা দিয়ে কথা রাখেনি।

তাই আজ আমি মিছিলে সবার আগে
পায়ে পায়ে চলি সবাকে পিছনে ফেলে,
সব চেয়ে জোরে স্লোগানকে তুলে ধরি,
রক্তের নদী উজিয়ে এগোই
সব চেয়ে আগে আকাশে পতাকা মেলি।

তুমি গিয়েছিলে তার কাছে এরই মাঝে
মার কথা বুঝি জিজ্ঞেসও করেছিলে।
অভিমানী, আহা, অভিমানী ছেলে আমার,
বলেছিল হেসে, "মার যে অনেক কাজ
কী করে আসবে এখানে?···
আমাদেরি কাজ সে তো,
আমাদের এই ভাঙাচোরা পৃথিবীতে
কবিতার এক পৃথিবী গড়ার কাজ,
মৃত্যুভয়কে ঠেলে ফেলে দিয়ে
অনাগত এক পৃথিবী গড়ার কাজ।"

খেতে তোমার জল এসেছিল,
বেদনায় বুক টনটন করেছিল,
তুমি বলেছিলে :
"আমার স্বামীও দুবছর হল জেলে,
খেতে পারে নাক', পেটেতে ক্ষতের যন্ত্রণা তার
'আলসার' তারও কুরে কুরে খায় দিনরাত
দিনরাত সেও অসহ ব্যথায় ধোঁকে,
আমার হাতের চুড়িদুটো তুমি নাও
অমন সোণার ছেলেটা তোমার।
এ সোণার দামে সোণাকে বাঁচাও তুমি।"

হাত থেকে তুমি খুলে দিয়েছিলে চুড়ি
বাছাকে আমার বাঁচাতে পারিনি তবু।
ক্ষণিক ঝড়ের সমুদ্র তার আগেই, অনেক আগেই
　　　　ছোট্ট লক্ষী ছেলেটার মত চুপ করে গেছে ধীরে ;
তোমার টাকায় ফুল কিনে তাকে দিয়েছি
অজস্র ফুলে সাজিয়ে দিয়েছি তাকে…
সোণা দিলে তুমি সোণাকে আমার বাঁচাতে পারিনি তবু।

তোমার চোখেতে জল কেন আজ, ওকি,
　　　　আমার চোখে তো একটুও জল নেই ;
আমি আজ চলি মিছিলে সবার আগে
সবচেয়ে জোরে স্লোগানকে তুলে ধরি
রক্তের নদী উজিয়ে এগোই
　　　　সবচেয়ে আগে আকাশে পতাকা মেলি।
কেঁদোনা কেঁদোনা
বলো না একটিবারও,
বলো না :　"কী করে, সইলে কী করে এত ?"

বলেছিল সে যে, "সাড়া পাই না মা ডেকে
কারো সাড়া খুঁজে পাই না,
সারা পৃথিবীতে এত লোক আছে
আমার বুঝি বা কেউ না?"...
তাই আমি ডেকে বেড়াই
যেখানে যেদেশে স্বর্ণকণারা আছে।

বন-মহোৎসব

ভাস্কর বসু

সে এক দেশের স্বপ্নরঙিন কল্পনাতে
মুগ্ধ চোখের বিস্ময়কে
নিশ্চয় কে
হরণ করে নিয়েছে তার নেই ঠিকানা—
বৃষ্টি-জলে ছন্দে-ভরা
অন্ধ-করা
আকাশ-প্রদীপ দেয় না হানা।
লাল কাঁকরের দৈন্য, তাকে
কেবল ঢাকে
রাস্তা ধূলি লাল গোধূলি
পথের বাঁকে।
বনের কোণের নেই সাহসী,
পূর্ণশশী
ছড়ায় আলো চকিত চোখের
চাউনি যেন ত্রাসে কাঁপা,
নীল জোছনায় কালো বাজার
যায় না মাপা।
মেঘ মাটিতে নেইক' মিলন
সর্বদা তাই

পিচের পথে কালো রঙে
বৃষ্টি পড়ে উছলে ওঠে
জল ছিটিয়ে যন্ত্র ছোটে।

বন-বিড়ালির ঘর ভাঙানো এল শমন
ভাঙল শালের স্বচ্ছ-গমন,
তৈরি হল রাস্তা বাড়ি
সঙিন দিয়ে রঙিন ছবি
মুছলো সবই।

আজকে হঠাৎ সেই মানুষে
কুটিল চোখে চশমা কসে
সাদা-লালের চামড়া-ঘেরা ভারতটাকে
বন-পলাশের গন্ধে আঁকে :
মৃত্যু যাকে করল হরণ
আবার তাকে
বলছে যেন মৃত্যু—এ এক মহোৎসবই।
ফসল যারা উত্তল ক'রে
নেয় হুঁশিয়ার
মাশুল টানে মাগ্‌গী-ভাতার
তারাই আবার বলে চেঁচায়
ফসল ফলাও ঘরে ঘরে
চালার তলায় টুক্‌রো কোণে,
গোলায় গোলায়।

অদ্ভুত এ প্রহসনের
আজব কথার ছড়াছড়ি :
আদেশ এল ; কী আর করি
আমাদের এ রক্ত দিয়ে
বুকের ভাঙা পাঁজর দিয়ে
পুঁতে দিলাম শিশুর চারা,
রক্তবীজের বংশ যারা—
অরণ্যানী করবে আবার
আসছে-কালের বাসিন্দারা।

সংঘাত

সুলেখা সান্যাল

খুব ভোরে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। কান পেতে শব্দটা একবার শুনে নিল অমিতা, চায়ের কেটলিতে চামচ নাড়ার শব্দ। এ শব্দের অর্থ আজ অমিতার কাছে খুব স্পষ্ট, যদিও প্রথম প্রথম কেমন হতভম্ব হয়ে যেতে হয়েছিল—শেষে সব বুঝতে পেরেছে নিজেই। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, চায়ের কাপে চা ঢালার আগে উঠে পড়তেই হবে। সুকুমার শক্ত করে হাত ধরে থাকে, পাগল হয়েছ, এখনও রাত রয়েছে যে!

—ছাড় তুমি। ভুলে গেছ সব কথা? আমার ভীষণ খারাপ লাগে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে উপরে উঠে এল অমিতা। বিমলা চুপ করে বসে আছে চায়ের কেটলিটা সামনে করে—হতাশ করুণ ভঙ্গিতে। চাকর ফিরিয়ে দিয়ে গেছে চায়ের কেটলি—ঘুমই ভাঙেনি কারো এখন।

ক্ষেত্র নিজেও বিরক্ত হয়ে উঠেছে, এত সকালে এ বাড়িতে কেউ আবার চা খেয়েছে নাকি? বৌদির সব নতুন। অনেকদিনের পুরনো চাকর কাউকে ভয় পায় না।

অমিতা মুচকি হাসে, এত ভোরে ওঠার সব কষ্ট ভুলে গিয়ে বলে, আসুন, আমরা অন্তত খেয়ে নিই। এখনও সকালই হয়নি ভাল করে—চা না খেলে আবার আমি ঘুমিয়ে পড়ব।

এমনি চলছে আজ কতদিন: প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে বিমলার।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে বাঁহাতি ওদের ঘরটা। কখনও থাকে বন্ধ, কখনও খোলা। প্রাণপণ চেষ্টায় বিমলা অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করে তবু কানে আসে টুকরো টুকরো কথা আর হাসি—উচ্ছল হাসি আর কৃত্রিম অভিমান। নিস্তব্ধ হয়ে পাশের সিঁড়িতে একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে তারপর সশব্দে উঠে যায় সিঁড়ি দিয়ে। একটু পরে নেমে এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলে, খেয়ে মিটিয়ে দিয়ে তারপর যত খুশি গল্প করতে হয় করুন না ঠাকুর তো নেই বাড়িতে।

পাংশু হয়ে ওঠে অমিতা। এ ধাঁচের সঙ্গে ওর কেমন যেন পরিচয় হয়ে গেছে ক'মাসে। তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে ও।

দুপুরে আবার চোখে পড়ে ওদের বন্ধ দরজা।

বাচ্চা চাকরটাকে বিনা কারণে গালাগালি করে বিমলা, ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকে সুখন। কখনও আবার দেড় বছরের ছেলেটার পিঠে গুমগুম করে কিল বসিয়ে বলে, মর্ না হতভাগা! তিনটে গেছে, তোরা দুটো আছিস কি করতে?—সঙ্গে সঙ্গে নিজের শরীরের দিকে চোখ পড়তেই বুকের মধ্যে জ্বালা করে। আবার আসছে আর একটা। গুমরে গুমরে ওঠে বুকের ভেতরটা, আর ছোট ছেলেটার কান্না বেড়ে যায়। তারপর এক সময়ে হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে আসে অমিতা। ছোট ছেলেটাকে বিমলার কোল থেকে টেনে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকে পড়ে। এক মুহূর্ত কেমন অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে গিয়ে আঁচল পেতে শুয়ে পড়ে বিমলা।

এমনি চলছে আজ মাসের পর মাস, দিনের পর দিন।

আশ্চর্য হিংস্র হয়ে উঠেছে বিমলার সমস্ত কিছু।

এরকম কিন্তু ছিলেন না বৌদি, সুকুমার বলে। অমিতা শোনে অবাক হয়ে: ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন আর শ্রদ্ধা করতেন আমাকে। প্রত্যেকের কাছে আমার প্রশংসা করেছেন!

কই? তোমার সম্পর্কে তো ওঁর অদ্ভুত ধারণা দেখি, মানুষ বলে মনে করেন বলে তো মনে হয় না, অমিতা বিশ্বাস করে না ওর কথা।

পনেরো বছরে বিয়ে হয়েছে বিমলার আর এই দশ বছরে সে ছ'টি সন্তানের জননী। বছরে বছরে কয়েকখানা করে শাড়ি আর গয়নার সঙ্গে ওদেরও উপহার পেয়েছে বিমলা। তাই সে শাড়ি-গয়না তোলাই থেকেছে বাক্সে—পরবার আর সময় হয়নি। আরও একটা জিনিস তার সঙ্গে উপহার পেয়েছিল সে এ বাড়িতে পা দিয়েই, খাটুনি। বিরাট পরিবার, অজস্র লোকের অজস্র ফরমাস, পছন্দ আর মেজাজ, ঠাকুর চাকরের হাতে খাবেনা ওরা কেউ। উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে বিমলাকে। প্রতিটি লোকের মনস্তুষ্টি করে প্রত্যেককে খুশি করে সকলের শেষে স্বামী কি দেওরের পাতের ভুক্তাবশিষ্ট দিয়ে উদরপূরণ। এতটুকু ত্রুটি হবার উপায় ছিল না। অসহ রাগী ছোট দেওর ঝোলের বাটি ছুঁড়ে মেরেছে কপাল লক্ষ্য করে, হাসিমুখে সহ্য করেছে

সব; নতুন করে সেধে এনে খাওয়াতে বসেছে তাকে। শ্বশুরকে কেবল ভয় করা ছাড়া অন্য কিছু জানত না, বিরাট এক ঘোমটা টেনে চারিদিকে তাকাবার অবসর পায়নি, স্বাভাবিকভাবে নির্ভয়ে কথা বলার কথা ভাবতে বুকের মধ্যে শিউরে উঠেছে।

স্বামীর সঙ্গে ক'টা ভাল কথা, ক'টা মধুর কথা বলেছে সে কথা আজ আর মনেও পড়ে না। সে হয়তো ছিল বিয়ের পর ক'টা রঙিন মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আজ আর তার কোন চিহ্ন নেই। শুধু বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আর কোন কথা হয় না। রাত্রে কাজ সেরে যখন ঘরে ফিরেছে স্বামীর পা টিপতে হয়েছে তখন, তারপর পায়ের কাছেই ঘুমিয়ে পড়েছে এক সময়ে। এর মধ্যে অভাব কোথায় ছিল, সে কথা অমিতা আসবার আগে কোনদিনই মনে হয়নি বিমলার।

যে দিকে না তাকাবে সে দিকেই বিশৃঙ্খলা, গোলমাল। শাশুড়ি তাকিয়েও দেখেন নি সংসার গেল কি থাকল; অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল বিমলার। সে ক্ষমতায় কেউ অংশ গ্রহণ করবে একথা ভাবলেও বিরক্ত হয়েছে।

রাত বারোটা পর্যন্ত মেজ দেওর সুকুমারের ভাত নিয়ে বসে থেকেছে, অনুযোগ করেছে, বিয়ে টিয়ে করবেন না? ভাত নিয়ে এমনি করে আর কতদিন বসে থাকব? দেব একটা মেয়ে ঘাড়ে গছিয়ে, বেরিয়ে যাবে দেশের কাজ করা।

এত তাড়াতাড়ি কেন? থাকনা কিছুদিন!—সুকুমার হেসেছিল। বিমলা অন্যমনস্ক হয়ে একটা নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলে হঠাৎ চমকে উঠেছিল।

কিন্তু শেষপর্যন্ত একটু তাড়াতাড়িই বিয়েটা করে ফেলল সুকুমার, আকস্মিকভাবে। বাড়ির সমস্ত বাধাকে অগ্রাহ্য করে।

বাপের হুঙ্কার, দাদার রূঢ় সমালোচনা কিছুই তাকে ভয় পাওয়াতে পারল না। যে বংশের ছেলেরা বউ মরে গেলে দুঃখ পাওয়াকে অপৌরুষেয় মনে করেছে, দিনের বেলা বউয়ের সঙ্গে কথা বলা লজ্জাকর মনে করেছে, সেই বংশের ছেলে সুকুমার ভালবাসার জন্যে বাড়ি ছাড়ল।

শ্বশুরের সমস্ত রাগ জল হয়ে গেল একদিনের মধ্যে। নিজেই চললেন ওদের ফিরিয়ে আনতে। কিনে আনলেন ফুলের মালা, টোপর; বললেন, তুমিও চল বউমা—দেখে শুনে আনতে হবে।

—আপনি আর মা যান বাবা, আমি এদিকের সব ঠিক করি, কি রকম পাংশু হাসিতে বিমলা জবাব দিল। গাড়ী চলে গেল। শব্দটা মিলিয়ে যেতেই বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল তার।

অমিতাকে দেখে পাথরের মত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়লও। অবগুণ্ঠনের মধ্যে সংকোচ-কুণ্ঠাহীন একখানা মুখ—পরিণত গাম্ভীর্য আর অভিজ্ঞতায় চিহ্নিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ জিনিস—অপূর্ণতা ঢাকতে বিমলাকে এতটুকু প্রয়োজন হবে না ওর।

আজকাল আর ভাত নিয়ে বসে থাকতে হয় না সুকুমারের জন্যে।

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বিমলা হাসে: আজকাল আর মেজদার ফিরতে রাত হয় না! যত অত্যাচার গেছে কেবল আমারই ওপর দিয়ে। নিজের বেলায় সবাই ঠিক থাকে।—নিঃশব্দ সুকুমারের দিকে তাকিয়ে চোখ জ্বালা করে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অমিতা। সকলের সামনেও ওর কুণ্ঠা নেই, ঘোমটা টানে না তাড়াতাড়ি শ্বশুরের সামনে, অসংকোচ ওর চলাফেরা, সম্মান দেখানোর ব্যস্ততা নেই—বড় বেশি নির্লজ্জ! সকলের সামনেই সুকুমারের সঙ্গে কথা বলে, হাসে। বিমলা শ্বশুরকে দেখলে এখনও সসব্যস্ত হয়ে ঘোমটা টেনে দেয়—স্বামীর সঙ্গে কথা বলে না। অমিতা আসবার পরে ওর আরও বেড়েছে সে সব।

অমিতা হাসে: আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করেন দিদি। বাবার গলা শুনলে ওরকম ব্যস্ত হয়ে ওঠেন কেন? অতবড় ঘোমটা না টানলেও চলে।

—আমরা মুখ্যু মেয়ে, ছোটবেলা থেকে যা শিখেছি তা আর ছাড়ি কি করে? আর ওসব নির্লজ্জপনা আমার ভাল লাগে না, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি—এ আমাদের করতেই হবে।

আহত অমিতা চুপ করে থাকে।

বারান্দায় আলো এসে পড়েছে ওদের বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে; স্তব্ধ হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে বিমলা। কী যেন পড়াশুনো করছে ওরা—কখনও হেসে উঠছে। টুকরো টুকরো কথা আর হাসি। বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। এখুনি ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত স্বামীর পা টিপে দিতে হবে। ঘরে ঢুকে শ্রান্ত দেহে ঘুমিয়ে-পড়া স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে ও, নিজের প্রয়োজন ছাড়া তাকে আর স্বামীর দরকার নেই। পাথরের মূর্তির শীতলতা

নিয়ে ঘুমোচ্ছে সুরেশ ; ঘুমের ঘোরে পাখানাকে এগিয়ে দিয়ে জড়িত স্বরে কি যেন বলে পাশ ফিরে শোয়। আজ বিমলার মাথায় আগুন জ্বলছে ; পাখানাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বেরিয়ে আসে ঘর ছেড়ে।

—দরজা খোল তো অমিতা, থার্মোমিটারটা নেব।

এক মুহূর্তে থেমে গেল ভিতরের কলগুঞ্জন। দরজা খুলে অমিতা বেরিয়ে এল : থার্মোমিটার তো দুপুরে আপনিই নিয়ে গেলেন দিদি!

তারপর আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে ওরা। নিঃশব্দে ভূতের মত দরজার কাছে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিমলা অনুভব করে, ওরা ক্ষুব্ধ হয়েছে। তারপর সরে আসে দরজা ছেড়ে।

নিচের ঘরে বড় ছেলেটা কাঁদছে। একটু আগে খেয়েছে, তবু আবার খাবার আব্দার ধরেছে। শ্বশুর আর শাশুড়ির হাতের জিনিস ওরা, ওদের কোন কিছুতে বিমলার অধিকার নেই কথা বলার। প্রায় ন বছরের ছেলে, এখনও শিশুর মত আব্দার ধরবে, বাড়িশুদ্ধ লোককে বায়নায় পাগল করে তুলবে অথচ এতটুকু শাসনের অধিকার নেই বিমলার—ছেলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার!

ঘরে ঢুকে আজ যেন কথাটা নতুন করে উপলব্ধি করে বিমলা। আগে কিন্তু খুশিই হত ভেবে! তার প্রয়োজন সংসারে পরিশ্রম করতে আর সন্তানের জন্যে—আর কিছুতে নয়। চোখে জল আসে না, চোখদুটো জ্বালা করে। দশ বছরের সমস্ত অভ্যস্ত চিন্তা আর ধারণা বদলে যাচ্ছে বিমলার।

সুকুমারের নাকি চাকরি গেছে, কি সব গোলমাল হয়েছে অফিসে। অত কথা ভাল বোঝে না বিমলা শুধু অবাক হয়ে ওদেরই দেখে—কেমন স্বাভাবিক-ভাবে গল্প করছে, হাসছে। এতটুকু ভাবান্তর নেই—যেন চাকরি যাওয়াটা কত স্বাভাবিক! আজ যদি সুরেশের অমনি হত, বিমলা ভেবে থৈ পায় না। নিজের জন্যে ভাবনা হয় না, হয় বাচ্চাগুলোর কথা ভেবে ; আবার একটা আসছে। আবার দুঃখ হয়, রাগও হয়। এই দশ বছরে তার চারিদিকে যেন নাগপাশের বন্ধন অথচ কতই বা বয়স তার! মাত্র পঁচিশ বছরে সব কিছু হারিয়ে বসে আছে সে। রাগলে সুরেশ তাকে 'গলগ্রহ' বলে গালাগাল দেয়। সে কথা মনে মনে এতদিন স্বীকার করে নিয়েছে বিমলা, স্বাভাবিক-

তাবেই গ্রহণ করেছে তার ভীরুতাকে; কিন্তু আজ সে কথা ভেবে কিসের বিরুদ্ধে একটা আক্রোশ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে—আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে ইচ্ছে করে অলক্ষ্য কাউকে।

হাসে আর বলে: ভালই হল আপনাদের। এখন থেকে দুপুরেও মুখোমুখি বসে থাকতে পারবেন, সেই শুধু বাকি ছিল।

সুরেশ ঘরে শুয়ে ছিল। সেদিকে তাকিয়ে ঝাঁঝালো স্বরে বলে: যাও না, বেরোও না বাপু ঘর ছেড়ে। দেখতে পারি না ঘরমুখো পুরুষগুলোকে! আঁচলের তলা ছাড়া কি কাজ নেই?

অমিতার সাহস ধীরে ধীরে বাড়ছে। বিমলা লক্ষ্য করছে সেটা অনেক-দিন থেকে।

এ বাড়ির বউরা একা কোনদিন কোথাও যায়নি। ও বেরিয়ে যায় দুপুরে আর ফিরে আসে সন্ধ্যের পর। শ্বশুর পর্যন্ত কিছু বলেন না। রান্না করতে হয় বিমলাকেই। মনের মধ্যে ক্ষোভ জমে, তার বেলায় যত কিছু বাড়াবাড়ি। কোনদিন একা বেরুনো তো দূরের কথা, নিজের থেকে কোনোদিন যাবার নাম করতে পারেনি।

কোথায় যায় অমিতা? বিমলা যদি এত স্বাধীনতা পেত!

কিন্তু কোথায়ই বা যেত সে? সিনেমা থিয়েটার কিংবা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি, এ ছাড়া আর কোথায়ই বা যায় লোকে? আর পুরুষেরা যায় চাকরিতে। কিন্তু অমিতা যায় না এসব জায়গায় বিমলা সে কথা খুব ভাল করে জানে। কোথা থেকে ও যেন রোজ অমূজ্জ্বলে চোখে ফিরে আসে, সুকান্তের সঙ্গে আলোচনা করে, আর লেখে আলো জ্বালিয়ে।

কী যেন এক সংকল্প নিয়ে রোজ বাড়ি ফেরে অমিতা। বিমলা গম্ভীর হয়ে থাকে।

চাকরি নিলাম দিদি: অমিতা বলে, ওরটা গেল। একজন না চালালে চলবে কেন!

চাকরি? ভাত গলায় আটকে গেছে বিমলার।

—রায় বংশের বউ চাকরি করবে? বাবার সামনে ওকথা মুখেও এনোনা। একেই তো তুমি ট্রামে-বাসে একা একা যাতায়াত কর। সেজন্যে আত্মীয়-স্বজনের কাছে কান পাতবার জো নেই।

খিলখিল করে হাসে অমিতা: আরে, বাবা নিজেই তো মত দিলেন

আর এতো স্কুলের চাকরি, লজ্জার কি আছে? লেখাপড়া শিখেছি কি পোশাকী কাপড়ের মত তুলে রাখবার জন্তে, কাজেই যদি না লাগল?

বিমলা স্তম্ভিত হয়ে গেছে, বাবা মত দিয়েছেন!

—যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারলে, অমত হবার কি থাকতে পারে? বংশ-মর্যাদা নিয়ে গর্ব করার দিন চলে গেছে দিদি। যা দিন আসছে সামনে, আমাদের মত মধ্যবিত্তদের বাঁচতে দেবে নাকি ভেবেছেন?

রাত্রে বুকের ব্যথাটা অসম্ভব বাড়ল বিমলার। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করল। অথচ শব্দ নেই, চোখের কোণ দিয়ে শুধু নিঃশব্দে জল পড়ছে।

অমিতা কাছে এসে পাশ ফিরে শুয়ে বলল: যাও তুমি। শুধু শুধু কেন কষ্ট করবে! কাল থেকে আবার চাকরি আছে!

সুরেশ কাছে গেলে জীবনে বোধ হয় এই প্রথম বিমলা বিদ্রোহ জানাল। ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল: বেরিয়ে যাও তুমি! ভালবাসা দেখাতে হবে না! আমি তো তোমাদের বাড়ির চাকরাণী! বিনা মাইনের বাঁদি! আমি তো তোমার গলগ্রহ!...

অস্ফুট করুণ স্বরে বিমলা বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে। অমিতা মাথার কাছে বসে, বলে: এই সামান্য ব্যাপারে কাঁদছেন? চাকরি গেছে, আবার হবে। এর জন্তে দুঃখ করার কি আছে?

—কিন্তু শুধু শুধু ওঁর চাকরিটা কেন গেল? উনি তো ধর্মঘট করেন নি? এত বছরের পুরনো কাজ—। অমিতা হাসে: ওদের কাছে যোগ্যতার কোন দাম নেই দিদি। ওরা শুধু নিজেদের লাভটুকু বুঝে নিয়ে কুকুরের মত তাড়িয়ে দেয় বিশ্বস্ত লোকগুলোকে। নইলে বড়দা তো কোন রাজনীতির মধ্যেই ছিলেন না, তবু দেখুন ওঁকেও ওরা তাড়িয়ে দিল। এমনিই ওরা—কাউকে বাঁচতে দেবে না! দেশের লোক আশা করে আছে আর ওরা এমনি করেই আমাদের বাঁচাচ্ছে!

বিমলা চোখের জল মুছে সোজা হয়ে বসে: তাহলে আবার চাকরি পেলে, আবারও তো তাড়াতে পারে?

—পারেই তো! ওরা চায় সবাই ওদের হয়ে দালালি করুক। যারা ওদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে তারাই ওদের শত্রু—দেশদ্রোহী।

—দালালি?...মানে?

—মানে, যাদের ওরা ভয় পেয়ে তাড়িয়ে দেবে, তাদের বদলে একদল লোক টাকার লোভে চোরের মত ওদের খোশামোদ করে কাজ চালু রাখবে। সেইজন্তেই ওঁর চাকরিটা গেল—ওদের অন্তায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন বলে। আমার ইস্কুলের চাকরি—সেটাও হয়তো যাবে। শিক্ষা দেওয়া—সেখানেও ওরা চায় দালালি।

বিমলা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে: এরাই আবার আমাদের বাঁচানোর দায়িত্ব নিয়েছে! অমিতা ম্লান হাসে। বিমলার চোখ দুটো এখন শুকিয়ে গিয়ে কর কর করে।

একদিন রাত্রে বাড়ি ফিরল না সুকুমার। বাড়া ভাতের সামনে বসে ঢুলছিল বিমলা, চমকে জেগে উঠল যখন অনেক রাত্রে অমিতা বাড়ি ফিরল—একা। বিমলা শুনল, সুকুমার এখন কিছুদিন বাড়িতে থাকবে না। শুনল, অফিসের মালিক শুধু তার চাকরি খেয়েই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না, ইউনিয়নের নেতা সুকুমারকে জেলে পোরাও নাকি বিশেষ দরকার তাদের! আফসোসে, ক্ষোভে, রাগে ডাক ছেড়ে কাঁদতে গিয়েও অমিতার চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল বিমলা।

আরও একটা অঘটন ঘটে গেল। একদিন ভোরবেলা পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল—অমিতাকে! সমস্ত বাড়িটা ওরা তছনছ করে ফেলল একঘণ্টার মধ্যে—বিমলার রান্নাঘর পর্যন্ত বাদ গেল না। বিরক্তিতে আর ঘৃণায় আর ভয়ে বিমলার গা শিরশির করে—ঘোমটা দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে ও। অমিতা আশ্চর্য গাম্ভীর্য নিয়ে চলাফেরা করে, বিমলা অবাক হয়ে যায়।

অমিতা চলে গেলে আর এক পশলা কাঁদল বিমলা। সেটা নিরুপায় দুঃখের কান্না নয়—অনুতাপ আর ক্ষোভের বুক পোড়ানো কান্না। এবার আর সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। রায় বংশের যে বউ চাকরি করবে শুনে একদিন বিস্ময়ে গলায় ভাত আটকে গিয়েছিল বিমলার, আজ তার জেলে যাওয়া দেখেও এতটুকু বিস্ময় জাগল না—অন্তায়ের প্রতিবাদ করেছিল ওরা···অন্তায়? হ্যাঁ, সুকুমারের, সুরেশের আর ওদেরই মত হাজার হাজার লোকের চাকরি যাওয়ার অন্তায়, এই অসহ্য অভাবের অন্তায়···কেঁদে কেঁদে নিজেই এক সময় চুপ করে গেল বিমলা।

সংসার অচল। কোনমতে টেনে টেনে চলছে। বিমলা যেন কেমন হয়ে গেছে আজকাল, কি যেন ভাবে দিনরাত।

রাত্রে সুরেশ খবরটা দিল : চাকরি পাচ্ছি একটা, জানো।

—কোথায় ? নিস্পৃহস্বরে বিমলা জিজ্ঞেস করে।

—পার্মানেণ্ট নয় যদিও। অফিসে সব স্ট্রাইক করে আছে, তাই তাদের বদলে কিছুদিনের জন্তে কাজ করতে হবে। মোটা টাকা দেবে, পুলিশ দিয়ে গাড়ি করে অফিসের ভেতরে পৌঁছে দেবে আবার বাড়ি দিয়ে যাবে—আরও অনেক সুবিধে।

হঠাৎ আহত বাঘের মত গর্জন করে উঠল বিমলা : কি বললে ? দালালি করবে তুমি ? সে টাকা আমি ছোঁব ?... তুমি না বড় ভাই সুকুমারের—দাদা ? অমিতা এর জন্তে লড়াই করে জেলে গেল, আর তুমি— ? কান্নায় গলার স্বর আটকে আসে বিমলার : কত টাকা চাই তোমার ? এই নাও, এই নাও···। আলমারি খুলে সমস্ত গয়না জড়িত সুরেশের পায়ের কাছে বিমলা একটা একটা করে ছুঁড়ে ফেলে। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে গেলো। তারপর ঝড়ের মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

ওদের ঘরটা খোলা পড়ে আছে। এতক্ষণের আটকানো কান্না এবার সেদিকে তাকিয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ে। বিমলা কাঁদে বেশ ছিল সে এতদিন চোখ বুঁজে, কিছু না বুঝে—কেন অমিতা তাকে দুঃখের মধ্যে এমনি করে জাগিয়ে দিয়ে গেল

শান্তির স্বপক্ষে

শান্তির সংগ্রামে চীনের কবিরা

শান্তির আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন চীনের কবিরা। প্যারী ও প্রাগে প্রথম বিশ্ব-কংগ্রেসের সময় থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শান্তির স্বপক্ষে রচিত বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, গণ-সমাবেশ ও মঞ্চ থেকে সেই সমস্ত কবিতা পাঠ করা হয়েছে এবং বেতারে সেগুলি দেশব্যাপী প্রচারিত হয়েছে। যুদ্ধের বীভৎসতা এবং ধ্বংসলীলা সম্পর্কে জনগণের স্মৃতিতে যে দারুণ ঘৃণা এবং প্রতিরোধ জমে রয়েছে, এই সমস্ত শান্তি-কবিতা তা আরও জাগিয়ে তুলেছে এবং শান্তির স্বপক্ষে জনগণের চেতনাকে সংহত করেছে।

কবিরা যে শুধু লিখেছেন তাই নয়, শান্তি-আন্দোলনে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সাংগঠনিক অংশ গ্রহণও করেছেন। স্টকহল্‌ম শান্তি-কংগ্রেসে চীনের কবি-প্রতিনিধি এমি সিয়াও এবং সে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সমালোচক আই, চিঙ্‌ সম্প্রতি শান্তির স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযানে দেশব্যাপী এক সফর শেষ করে পেকিঙে ফিরে এসেছেন। উত্তরে পেকিঙ থেকে শুরু করে দক্ষিণে ক্যাণ্টন এবং উত্তর-পশ্চিমে সিয়ান পর্যন্ত চীনের সমস্ত প্রধান প্রধান শহর-গুলিতে এঁরা জনসভা ডেকেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন এবং শান্তি-সংগ্রামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বেড়িয়েছেন। শান্তির আবেদনে তাঁর স্বাক্ষরদান-প্রসঙ্গে আই, চিঙ্‌ একটি কবিতায় লিখেছেন :

> সূর্য-জলন্ত আকাশ, শান্তির কপোত ডানা ছড়িয়েছে বাতাসে,
> সবুজের সমুদ্রে স্নান সেরে নেয়
> আমাদের পেকিঙ।
> সেখানে আমিও এসে দাঁড়াই,
> আর
> শান্তির মহান আহ্বানে আমার নাম
> যোগ করে দিই ;…

তাঁকে ঘিরে দাঁড়ানো স্বাক্ষরকারীদের দেখে তিনি বলছেন :

একজন যোদ্ধা, তার বাহুতে ক্ষত—
সে-ই তার সম্মান,
সবে সে লেখার তুলি রেখে দিয়েছে ;
আর একটি কোমল কিশোর হাত
সেই তুলিটা তুলে নিল,
আর
ছোট ছোট অক্ষরে লিখে রাখল তার নাম
শান্তির আবেদনে।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময়ে আই, চিঙ্‌ ছিলেন মুক্ত এলাকার রাজধানী ইয়েনানে। সেখানে তিনি একটি সাহিত্যিক কর্মীদলের নেতৃত্ব করতেন, বহুবার তাঁকে সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ-সংগ্রামের কাজে শত্রু-ব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়েছে। মুক্তি-যুদ্ধের সময়ে কৃষি-সংস্কারের কাজে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। তাঁর বহু রচনা ও গীতিকাব্য রুশ, ইংরেজি, জাপানী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

তাঁর স্বগ্রামে শান্তির স্বাক্ষর সংগ্রহের কাহিনী হল তরুণ কবি সুয়েহ্‌-পাই-এর একটি কবিতার বিষয়বস্তু। কবিতাটি তিনি লিখেছেন গ্রাম্য-গাথার ধরনে—

সূর্য অস্ত গিয়েছে, কাজ শেষ,
ঘণ্টার শব্দ বাজতে থাকল ;
গ্রামের পথ দিয়ে একটা দৃঢ়কণ্ঠ
হেঁকে গেল :
উত্তর-পশ্চিমের মাঠে
আজকের সভা—
গ্রামবাসীরা মিলবেন রাত্রে।

তারপর বর্ণনা : একে একে সকলে হাজির হল, কৃষক-সভার সভাপতি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন দুনিয়াজোড়া শান্তি-সংগ্রামের কথা, দুনিয়া তার শান্তি হারিয়েছে, কেননা মেই-তি—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। তারা অ্যাটম বোমা নিয়ে লোফালুফি খেলছে, যুদ্ধ আর মৃত্যুকে ডেকে আনছে। কিন্তু কে কবে তার আত্মীয়ের বিরুদ্ধে লড়তে চায় ? আমরা, জনতা চাই শান্তি, নিশ্চিতি।

কিন্তু মেই-তি'র স্বপ্ন—যুদ্ধ। মেই-তি ধ্বংস হোক, সে আমাদের চরম শত্রু। বিশ্ব-কংগ্রেস ডাক পাঠিয়েছে, শান্তির আহ্বানে কে সাড়া দেবে?—

…বজ্রের মত জনতার কণ্ঠ
বেজে উঠল,
জনতার কণ্ঠস্বর কী গম্ভীর!
সেই আহ্বানে উঠে দাঁড়াল হাজার হাজার হাত
যেন অরণ্য,
একটি উত্তর জাগল: "আমাদের সকলের জন্যে শান্তি"।

প্রদীপের আলো কাগজখানার উপর
ছড়িয়ে পড়েছে,
তাদের চোখের সামনে ছড়ানো রয়েছে।
আর হাওয়ায় যেমন বড় বড় ঘাস নুয়ে পড়ে
তেমনি শান্তিকামী জনতা
ঝুঁকে পড়ল শান্তির আবেদন-পত্রে,
ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা—
শান্তির স্বাক্ষরকারীরা।

এরপরে রয়েছে বিভিন্ন স্বাক্ষরকারীদের সম্পর্কে জীবন্ত বর্ণনা, তার শেষে:

ছোট্ট ওযাঙ্, সবে ন'য়ে পড়েছে,
মাথা তার ছোঁয় কি না ছোঁয়
উঁচু টেবিলে।
কাগজটা কোনরকমে টেনে নিয়ে
তুলি বুলোচ্ছে,
—"ওয়াঙ্ সিয়াও…কো, চু গ্রাম
উয়াঙ্ সিয়েন।"

অনেক রাত্রে, রাত্রি যখন স্তব্ধ
যখন সকলে তাদের স্বাক্ষর দান করেছে,
গ্রামবাসীরা চলল ঘরের দিকে,
গলায় গান রয়েছে: "পুব আকাশ কেমন লাল।"

পেকিঙ-এর জনপ্রিয় কবিতা-পত্রিকা "পোয়েট্রি এণ্ড দি মাসেস" কাগজে পাশাপাটি বেরিয়েছিল। এমন আরও অনেক রচনা আত্মপ্রকাশ করছে। গণজীবনে, নতুন চীনের সাংস্কৃতিক জীবনে শান্তির সংগ্রাম এক অভূতপূর্ব জোয়ার এনেছে।

["পিপল্‌স চায়না" পত্রিকা থেকে] অনুবাদ : সিদ্ধেশ্বর সেন

পশ্চিমবঙ্গে শান্তি-আন্দোলন

সারা বিশ্বে শান্তি-সংগ্রামে আজ এক অভূতপূর্ব জোয়ার এসেছে। বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের স্টকহল্‌ম আবেদনকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর জনমতের এই সুদৃঢ় অভিব্যক্তি এক ঐতিহাসিক ব্যাপক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। একই প্রশ্নে, বিভিন্ন দেশে একযোগে দলমতশ্রেণী-নির্বিশেষে জনসাধারণের ব্যাপক অংশের সক্রিয় সহযোগিতায় এমনি আন্দোলন আর কখনও পরিচালিত হয়নি। প্রায় ২৮ কোটি জনসাধারণ একবাক্যে ঘোষণা করছেন, বিনাশর্তে আণবিক অস্ত্র বেআইনী করতে হবে, এর বিরুদ্ধে কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। তাঁরা ঘোষণা করছেন প্রথম আণবিক অস্ত্র প্রয়োগকারী সরকারই আক্রমণকারী, তারা মানবতার চরম শত্রু।

সুদূর দক্ষিণ আমেরিকা থেকে শুরু করে আফ্রিকার কৃষ্ণকায় কৃষক, আর চীনের অজ্ঞাতনামা গ্রাম থেকে শুরু করে আমাদের মেদিনীপুর, হাওড়া, চব্বিশ পরগণার নিরক্ষর কৃষক নরনারী পর্যন্ত এই আবেদনে টিপসহি দিয়ে ঘোষণা করছেন—আমরা যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে, আমরা মানবতার স্বপক্ষে, আমরা তার জন্যে সংগ্রাম করব। সারা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীও এই একই শপথ নিচ্ছেন।

আর এই জনসাধারণেরই সঙ্গে হাত মিলিয়ে দুনিয়ার হাজার হাজার বুদ্ধিজীবী, শ্রেষ্ঠ শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীরাও শান্তির সৈনিকদের প্রথম সারিতে এসে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন মানবজাতির সেই মুষ্টিমেয় শত্রুশ্রেণীকে, যারা চায় দুনিয়ার ধ্বংস, যারা চায় হাজার হাজার বছরের গড়ে ওঠা সৃষ্টি ও সভ্যতার চরম বিনাশ। নিঃসন্দেহে আজ প্রমাণিত হচ্ছে বিশ্বের জনসাধারণ

যুদ্ধ চায় না , চায় না ধ্বংস আর বিনাশ, মহামারী আর হত্যালীলা, তারা চায় শান্তি, তারা চায় সৃষ্টি, তারা চায় প্রগতি, আর তারই জন্তে তারা আজ বদ্ধপরিকর সংগ্রামে নামতে।

সর্বশ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী ও সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক, রাজনীতিবিদ ও ধর্মযাজক, বৈজ্ঞানিক ও আইনজীবী সকলেই দলমত-নির্বিশেষে এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করছেন। তাঁদের সামনে আজ প্রশ্ন সহজ।—ভয়াবহ আণবিক অস্ত্রের প্রয়োগে নরনারীশিশু-নির্বিশেষে কোন দেশকে, কোন শহরকে, কোন গ্রামকে তার সভ্যতা আর সংস্কৃতি শুদ্ধ শ্মশানে পরিণত করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাঁরা দাঁড়াবেন কি না? স্বাভাবিক ভাবেই শিল্পী-সাহিত্যিকের সংবেদনশীল মন সচেতন হয়ে ওঠে এই পাশবিকতার বিরুদ্ধে, এই নারকীয় মারণ যজ্ঞায়োজনের বিরুদ্ধে। তাই দেখি, দেশে দেশে মানবতার স্বপক্ষে এই সংগ্রামে নামতে দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁরা এগিয়ে আসছেন। তাঁরা শপথ নিচ্ছেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার। মুষ্টিমেয় যুদ্ধোন্মাদকে তাঁরা জানিয়ে দিচ্ছেন: মানবতার চরম শত্রু তোমরা, যারা আজ চাইছ হাজার হাজার ঘর জ্বালিয়ে দিতে, লক্ষ লক্ষ নরনারী হত্যা করতে, সদ্যোজাত শিশুরও হৃৎপিণ্ড বেয়নেটের খোঁচায় টুকরো টুকরো করতে।

যে চক্রান্ত পৃথিবীতে ঔপনিবেশিক দাসত্বের কলঙ্কময় "সভ্যতা"র জয়গান করে আজও তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, যে চক্রান্ত তথাকথিত পশ্চিমী "সংস্কৃতি"র নাম করে বর্বরতম সামরিক অভিযান চালিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে স্বাধীনতার আর প্রগতির পথ রুদ্ধ করে, সেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত আজ মরীয়া। সাম্রাজ্যবাদী বিকৃত দর্শন, সাহিত্য আর শিল্প, তাদের শোষণ-ব্যবস্থা জনসাধারণের সমর্থনলাভে বঞ্চিত। তাই তারা জনসাধারণকে এই ভয়াবহ মারণাস্ত্র প্রয়োগে দমন করতে চায়। অন্ত দেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায় হাজার হাজার "হিরোসিমা" ও "নাগাসাকি" সৃষ্টি করে। আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদীরা মরীয়া হয়ে এই পথে তাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করবে। কিন্তু কোটি কোটি জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ—এদের যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্তে, এদের পরাজিত করে দুনিয়াব্যাপী শান্তি-সংগ্রাম সফল করবার জন্তে।

কোরিয়ার স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের বিরুদ্ধে হাজার হাজার টন বোমা

ফেলে তার শহর, গ্রাম, মাঠ, ঘাট ধ্বংস করা হচ্ছে কি কোরিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্তে ? ফরমোজায় আমেরিকান সামরিক ঘাঁটি কি চীনের স্বাধীনতা রক্ষার জন্তে ? ভিয়েৎনামে ফরাসি সৈন্ত আর মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র কাদের স্বাধীনতা রক্ষা করছে ? মালয়ে বৃটিশ সৈন্ত কাদের হত্যা করছে দিনের পর দিন ? কথা উঠেছে, কোরিয়ায় আণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কেন ? কারণ কোটি কোটি ডলার আর আধুনিক অস্ত্রসজ্জা দুর্বার গণশক্তির কাছে পরাজিত। তাই যুদ্ধায়োজনে বা পররাজ্য আক্রমণে জয়লাভ অসম্ভব, আণবিক অস্ত্রের মত মারণাস্ত্র হাতে না থাকলে।

সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণে নিপীড়িত ভারতের শান্তি-সংগ্রামে সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী এবং বৈজ্ঞানিকেরা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করছেন। পশ্চিম বঙ্গে স্টকহল্ম আবেদন আজ পরিচিত। বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের এই আবেদনে মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলীর গ্রামে গ্রামে স্বাক্ষর উঠেছে, টিপসহি আর বাঁকাচোরা হস্তাক্ষরে কৃষক নরনারীর হাজার হাজার স্বাক্ষর ; হিন্দি, উর্দু সম্বলিত কলকাতার শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন-পত্র শান্তি-আন্দোলনের নতুন পথনির্দেশ করে। আর এঁদেরই সঙ্গে আছেন বাংলার অনেক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও শিল্পী। বাংলার শিক্ষাব্রতী, অধ্যাপক এবং শিক্ষকেরা দলে দলে এতে স্বাক্ষর দিয়ে ঘোষণা করেছেন তাঁরা কি চান। অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অগ্রণী হয়ে ছাত্র ও শিক্ষক সকলের স্বাক্ষর পাঠাচ্ছেন। কয়েকটা কলেজে এবং অনেক স্কুলে অধিকাংশ অধ্যাপক বা শিক্ষক স্বাক্ষর দিয়েছেন। বহু স্থানের বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবীরা স্টকহল্ম আবেদন গ্রহণ করেছেন। কোন রাজনৈতিক মত মানবতার এই আহ্বানে বাধাসৃষ্টি করছে না। পুরোহিত, ধর্মপ্রচারক এঁরাও এগিয়ে এসেছেন এই আন্দোলনে। বাংলার ব্যাপকতম মত এবং পথকে একত্রিত করছে এই শান্তি-সংগ্রামের আবেদন-পত্র। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজন বাস্তব অভিজ্ঞতায় সহজ করে প্রকাশ করেছেন মহিষাদলের এক জেলে বুড়ি-মা, "যদি সে বছরও এমনি সমস্ত পৃথিবীর মানুষ সই দিয়ে জানিয়ে দিতে পারত আমরা যুদ্ধ চাই না তবে পঞ্চাশ সালে লাখ লাখ মানুষ না খেয়ে মরত না।"

একথা সত্যি যে শান্তি-আন্দোলনের সম্ভাবনা এবং আণবিক অস্ত্রবিরোধী, যুদ্ধবিরোধী সমাবেশ পশ্চিমবঙ্গে স্টকহল্ম আবেদনে প্রায় ৭৫,০০০ স্বাক্ষরের

ভিতর প্রতিফলিত হয় নি। তবুও আরও বাস্তব সত্য শান্তি-আন্দোলনের উপর সরকারী দমননীতি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অভাব। এমন কি স্বাক্ষর সংগ্রহের স্টকহল্‌ম আবেদন-পত্রও পুলিস শান্তি-কংগ্রেসের অফিস থেকে নিয়ে যায়। শান্তি আন্দোলনের অনেক শ্রেষ্ঠ কর্মী আজ কারারুদ্ধ, প্রতিনিয়ত যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন এবং শান্তি-আন্দোলন নিষ্পেষিত হচ্ছে। এ সব সত্ত্বেও গড়ে উঠছে দুর্ভেদ্য ফ্রন্ট লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, সাংবাদিক, অধ্যাপক, শিক্ষক, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, ধর্মযাজক, ছাত্র, মহিলা, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সকলকে নিয়ে। আর একথাও জানি জনসাধারণের সঙ্গে বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিক তাঁদের বিপ্লবী ঐতিহ্য নিয়ে এগিয়ে যাবেন আজকের সমস্ত প্রতিবন্ধক উপেক্ষা করে, প্রগতির আর গণতন্ত্রের, স্বাধীনতার আর শান্তির সংগ্রামকে জয়যুক্ত করবার জন্যে।

পশ্চিমবঙ্গে স্টকহল্‌ম আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রায় ৭৫,০০০ স্বাক্ষর এসেছে তার ভিতর মধ্যবিত্ত, চাকুরিজীবী ইত্যাদি আছেন প্রায় চৌত্রিশ হাজার, কৃষক চৌদ্দ হাজার, ছাত্র-ছাত্রী তের হাজার, শ্রমিক নয় হাজারের বেশি, মহিলা সাড়ে তিন হাজার, অধ্যাপক ও শিক্ষক প্রায় সাত শত, চিকিৎসক পৌনে দুই শত, আইনজীবী একশত, শিল্পী প্রায় একশত, লেখক ও সাংবাদিক প্রায় দুই শত। এ ছাড়াও এঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক কর্মী, ধর্মযাজক ও সেনা বিভাগের লোকও কিছু কিছু আছেন। বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের ভিতর বিশিষ্ট যাঁরা স্বাক্ষর দিয়েছেন নিচে তাঁদের নাম উল্লিখিত হল। আর সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান জানানো হল শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন প্রতিটি সাহিত্যিক ও শিল্পীকে, প্রতিটি বুদ্ধিজীবী ও নাগরিককে এবং ব্যাপক জনসাধারণকে, স্টকহল্‌ম আবেদনে স্বাক্ষর দেবার জন্যে। যাঁরা স্বাক্ষর দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন :

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, রমেশ সেন, গজেন্দ্র কুমার মিত্র, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, অশোক গুহ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল জানা ; ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন বসু, অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, অধ্যাপক

নরহরি কবিরাজ, অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সতীন্দ্র চক্রবর্তী; বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, যুগান্তর); মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ধীরাজ ভট্টাচার্য, অজিত ভট্টাচার্য, বনানী চৌধুরী; সুচিত্রা মিত্র, সুখেন্দু গোস্বামী, কুমারেশ বসু, দেবব্রত বিশ্বাস; সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়, (চিত্র পরিচালক), অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় (চিত্র পরিচালক), সত্যেন বসু (চিত্র পরিচালক), চিত্ত বসু (চিত্র পরিচালক); রামনাথ বিশ্বাস (ভূ-পর্যটক)।

[৩১শেঅগস্ট, ১৯৫০]

হরিদাস নন্দী

পুস্তক পরিচয়

চীন বিপ্লবের নীতি ও কৌশল—মাও সে-তুঙ; প্রকাশক, এস, রায় চৌধুরী, ৩০৯ বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম ছয় আনা।

এই পুস্তিকাটিতে মাও সে-তুঙের তিনটি লেখা ও বক্তৃতা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে—(১) চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৯); (২) বর্তমান অবস্থা ও আমাদের কর্তব্য (১৯৪৭ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে রিপোর্ট); (৩) চীনের ভূমি-সংস্কার ও জনগণের মহান জয় (১৯৪৮ সালের পয়লা এপ্রিল মাও সে-তুঙ কর্তৃক সান্‌সি-সুইওয়ান মুক্ত এলাকার কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতা)।

মাও সে-তুঙের এই লেখাগুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া নিতান্তই ধৃষ্টতা হবে। ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের রাজনীতি বুঝতে হলে, মাও সে-তুঙের এই লেখাগুলি দাগ দিয়ে দিয়ে পাঠ্য-পুস্তকের মত করে পড়তে হবে। এই লেখাগুলিতে আছে ঔপনিবেশিক রাজনীতির, ঔপনিবেশিক দেশে মুক্তি-সংগ্রামের নীতি ও কৌশলের মৌল বিশ্লেষণ। প্রধানত চীনের মুক্তি-সংগ্রামের ক্ষেত্রে যদিও এই নীতি ও কৌশল প্রযুক্ত হয়েছে, তথাপি সকল ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশে, জাতীয় ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের জন্ত কিছুটা পরিবর্তন আবশ্যকীয় হলেও, মূলত এই নীতি ও কৌশল প্রযোজ্য। এই অমূল্য রচনাগুলির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় বাংলার শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার যে অশেষ সুবিধা হল তা বলাই বাহুল্য।

এই তিনটি রচনার মধ্যে "চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি" শীর্ষক প্রবন্ধটি বুনিয়াদি রাজনৈতিক শিক্ষার জন্তে পাঠ্য হিসেবে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রবন্ধটিতে মাও সে-তুঙ চীনের ইতিহাসকে মার্কসীয় পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে প্রথমে দেখিয়েছেন যে চীনের জনতা গৌরবময় বিপ্লবী ঐতিহ্যের অধিকারী। প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে চীনা কৃষক শোষণ, উৎপীড়ন, দুর্নীতি ও বিচ্ছেদমূলক ব্যবস্থা সইতে না পেরে জমিদার সামন্তপ্রভু ও কেন্দ্রীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে অসংখ্যবার বিদ্রোহ করেছে এবং বহুবার তার আক্রমণে শাসকশ্রেণী পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে।

তা সত্ত্বেও, মাও দেখাচ্ছেন, গত তিন হাজার বছর ধরে চীনের সমাজ এক অচল সামন্ততান্ত্রিক অবস্থায় ছিল। নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা, নতুন শ্রেণী ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক পার্টির অভাবে প্রতিটি কৃষক-বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে, কৃষক বিদ্রোহগুলি ভূমি-বিপ্লবাত্মক হলেও ভূমি-বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারেনি, সামান্য কিছু সংস্কারমূলক প্রগতি হয়ে থাকলেও কোন সামাজিক বিকাশ সম্ভব হয়নি।

১৯৪০ সালে বিদেশী পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক চীন আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে চীনের সমাজে ও ইতিহাসে পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে। চীনের পুরনো স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক ব্যবস্থা ও কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে চীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পণ্যোৎপাদন ও পণ্য বিনিময়মূলক আর্থিক ব্যবস্থা। উনিশ শতকের শেষে চীনে জাতীয় পুঁজিবাদ জন্মলাভ করে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে তা কিছুটা বিকাশলাভ করে। জাতীয় পুঁজিবাদের সঙ্গে চীনে জন্মগ্রহণ করেছে দুটি নতুন শ্রেণী, চীনের বুর্জোয়া ও চীনের শ্রমিক শ্রেণী।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনকে পুঁজিবাদী দেশে পরিণত করতে চীনে আসেনি। তারা সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত আক্রমণের নানা কায়দা অবলম্বন করে স্বাধীন চীনকে একটা উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশে পরিণত করেছে এবং একদিকে যেমন তারা চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ভেঙে দিয়ে পুঁজিবাদের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনই তারা চীনের সামন্ততান্ত্রিক ধ্বংসাবশেষকে জোরদার করে চীনের সমাজকে একটা আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পর্যবসিত করেছে।

চীন দেশের ও চীনা জাতির জীবন্ত দেহে সাম্রাজ্যবাদের বহুমুখী হিংস্র আক্রমণের একটা অবিস্মরণীয় রক্তরঞ্জিত ছবি এঁকে মাও দেখাচ্ছেন, ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীনা সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো এই—(১) পরগাছা ও সুদখোর পুঁজিপতিদের শোষণব্যবস্থার ভিতরে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা; (২) জাতীয় পুঁজিবাদের দুর্বলতা এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের সামন্ততান্ত্রিক ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে জাতীয় পুঁজিবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; (৩) রণ-নায়ক ও আমলাতান্ত্রিক নেতাদের শাসন অথবা জমিদার ও বড় বুর্জোয়াদের শাসন; (৪) চীনের উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আর্থিক দখল এবং রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব; (৫) চীনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার এবং

সভ্যতার অসমান বিকাশ ; (৬) সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক ধ্বংসাবশেষের দ্বারা অত্যাচারিত চীনের জনসাধারণের, বিশেষ করে চীনা কৃষকের, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, দুর্দশা ও অসহনীয় অবস্থা।

চীনা সমাজের এই সব বিশেষ লক্ষণ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ, এই উভয়ের প্রতিক্রিয়াশীল মিতালিরই ফল। দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এর জন্যে প্রধানত দায়ী।

চীনের ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে প্রধান দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা জাতির মধ্যে এবং আর একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে চীনের সামন্ততান্ত্রিক ধ্বংসাবশেষ ও চীনের জন-সাধারণের মধ্যে। কিন্তু আরও অনেক দ্বন্দ্বই আছে, যেমন বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব, চীনের শাসক শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। এই সব দ্বন্দ্বের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা জাতির ভিতরের দ্বন্দ্ব। এই সব ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের ফলেই সম্ভব হয়েছে চীনা বিপ্লবের অভূতপূর্ব অগ্রগতি।

সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের বিরুদ্ধে চীনের বীর জনতা গত একশো বছর ধরে বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। চীন কোনদিনই সাম্রাজ্যবাদের কাছে মাথা নত করবে না এবং চীন-জাপান যুদ্ধের সময়ে লিখিত এই প্রবন্ধে মাও বলেছেন যে, চীন জাপানী সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রামের শেষ হবে না।

চীনবিপ্লবের প্রধান শত্রু প্রথমত বিদেশী বুর্জোয়া অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ এবং দ্বিতীয়ত চীনের জমিদার শ্রেণী। ১৯৩৯ সালে জাপানী সাম্রাজ্যবাদই ছিল চীনের প্রধানতম শত্রু। চীনের বুর্জোয়ারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে "কয়েকটি গৌরবময় বিপ্লবে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল" —যেমন, মাঞ্চু রাজবংশের উচ্ছেদ, উত্তরাঞ্চলে অভিযান এবং ১৯৩৭-৪৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধ। কিন্তু ১৯২৭-৩৭ সালে চীনা বুর্জোয়ারা তাদের মিত্র ও সহায়ক কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক শ্রেণী, কৃষককুল ও পেটি-বুর্জোয়াদের পরিত্যাগ করে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। এই বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্যে চীনা বুর্জোয়ারাও বিপ্লবের শত্রুরূপে পরিগণিত হয়েছিল। পরবর্তী চীন-জাপান যুদ্ধে বড় বুর্জোয়ার একাংশ জাপানী সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে, সেজন্যে তারাও চীন বিপ্লবের শত্রু। এতগুলি প্রবল

শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়েছে বলে চীন বিপ্লব দীর্ঘকালব্যাপী রক্তাক্ত সংগ্রামের রূপ ধারণ করতে বাধ্য। দীর্ঘদিন ধরে শক্তিসঞ্চয় ও শক্তিবৃদ্ধি করার পর তবেই কেবল শত্রুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ সম্ভব। যেহেতু শত্রুরা চীনা জনগণকে কোন রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেবে না এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্দোলন চালাতে দেবে না, তাই চীন বিপ্লব শান্তিপূর্ণ হতে পারে না এবং তা সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নিতে বাধ্য। স্টালিন ঠিকই বলেছিলেন যে "সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনতার বিদ্রোহই চীন বিপ্লবের বিশেষত্ব।"

মাও বলেছেন যে, গ্রামাঞ্চলকেই বিপ্লবের ঘাঁটি করে চীন বিপ্লবকে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয়ের ভিতর দিয়ে চূড়ান্ত জয়লাভের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। চীন বিপ্লব যেহেতু শত্রুর কাছে নতিস্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, যেহেতু শেষ পর্যন্ত ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পথ সে বেছে নিয়েছেই, তাই এই পথই তার কাছে একমাত্র পথ। বড় বড় শহরগুলো সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের দখলে। সেখানে বিপ্লবের ঘাঁটি স্থাপন করতে যাওয়া বা গোড়া থেকে শত্রুর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে যাওয়ার ফলে শুধু শক্তিক্ষয় ও পরাজয়লাভই ঘটবে। চীনের বিরাট আয়তন বিপ্লবী বাহিনীকে পিছু হটে আসার মত যথেষ্ট অঞ্চল যোগাবে এবং যেহেতু চীনের অর্থনৈতিক অবস্থার অসমান বিকাশ হয়েছে তাই চীনের গ্রামাঞ্চল শহরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয় এবং তাই শহরগুলি কুওমিনটাঙের দখলে থাকলেও গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি স্থাপন করা সম্ভব। বিশেষত গ্রামাঞ্চলেই আছে চীন বিপ্লবের প্রধান বাহিনী চীনের কৃষক, যারা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত। গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের ঘাঁটি করার ফলেই চীনের দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী সংগ্রাম প্রধানত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষকের গেরিলা যুদ্ধের রূপ নিয়েছে।

সশস্ত্র সংগ্রামের উপর জোর দিতে গিয়ে বিপ্লবী সংগ্রামের অন্যান্য পদ্ধতিগুলোকে তুচ্ছ করা চলবে না। শহরেও কাজ চালাতে হবে, কেননা বিপ্লবের চরম উদ্দেশ্য শহরের ঘাঁটিগুলোকে শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া।

অধৈর্য হয়ে দুঃসাহসিক কার্যকলাপ শুরু করার নীতি কিছুতেই চলবে না। উচ্ছৃঙ্খল, পরিকল্পনাহীন ও এলোপাথাড়িভাবে কাজ করে কোন কাজে সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়।

তারপর চীন বিপ্লবের কার্যসূচী সম্বন্ধে মাও বলছেন, সাম্রাজ্যবাদ ও ধ্বংসাবশিষ্ট সামন্ততন্ত্র, এই দুই শত্রুকে পরাজিত করাই চীন বিপ্লবের প্রধান

কাজ। বাইরের কাজ হবে সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়নের উচ্ছেদ করে জাতীয় বিপ্লব-সম্পূর্ণ করা আর ভিতরের কাজ হবে ধ্বংসাবশিষ্ট সামন্ততন্ত্রের মূল উচ্ছেদ করে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা।

যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ ও ধ্বংসাবশিষ্ট সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করাই চীন বিপ্লবের প্রধান কর্মসূচী, তাই বিপ্লবী সংগ্রামের মূল পরিকল্পনা (Strategy) তৈরি করার জন্যে বিচার করে দেখতে হবে, চীনের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যে কারাই বা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্যে এগিয়ে আসবে এবং কারাই বা এই দুই শত্রুর সঙ্গে যোগ দেবে বা আপস করবে।

জমিদার শ্রেণী চীনের ধ্বংসাবশিষ্ট সামন্ততন্ত্রেরই প্রতিনিধি, অতএব বিপ্লবের শত্রুস্থানীয়। জমিদার শ্রেণীর মধ্যে সব চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশ হল বড় জমিদারগোষ্ঠী। যখন শুধু সাম্রাজ্যবাদ ও বড় জমিদারদের বিরুদ্ধেই বিপ্লবের আঘাত সীমাবদ্ধ থাকে, তখন ছোট জমিদার ও দেউলিয়া ছোট জমিদাররা নিরপেক্ষ থাকে। এমন কি তারা সাময়িকভাবে বিপ্লবে অংশ গ্রহণও করে। এদের ভিতর যাঁরা বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে শিক্ষিত তাঁদের বেলায় একথা বেশি করেই খাটে। মাঝারি ও ছোট জমিদারদের ভিতরে যাঁরা সুশিক্ষিত, তাঁরা পুঁজিবাদী মনোভাব সত্ত্বেও জাপ-বিরোধী সংগ্রামে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। তাই জাপবিরোধী সংগ্রামের সময়ে এঁদের সঙ্গে বিপ্লবী শক্তিগুলির সহযোগিতা করা উচিত।

চীনের বুর্জোয়া শ্রেণী দুই অংশে বিভক্ত, এক অংশ উচ্চ স্তরের পরগাছা ধরনের বড় বুর্জোয়া ও অপর অংশটি জাতীয় বুর্জোয়া। পরগাছা বড় বুর্জোয়া খোলাখুলিভাবে সাম্রাজ্যবাদের সেবা করে এবং এরা গ্রামাঞ্চলের আধা-সামন্ততান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এরা চীন বিপ্লবের ইতিহাসে কোনদিন বিপ্লবের শক্তি হিসেবে দেখা হয়নি এবং এরা বরাবরই বিপ্লবের শত্রু। পরাগাছা বড় বুর্জোয়ারা বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী জোটের অনুগত। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের দলভুক্ত বড় বুর্জোয়ারা জাপ-বিরোধী যুদ্ধে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের কাছে প্রকাশ্যভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল। ইওরোপীয় ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দলভুক্ত বড় বুর্জোয়ারা একদিকে জাপানী সাম্রাজ্য-বাদের বিরোধী অন্যদিকে ঘোরতর কমিউনিস্ট-বিরোধী। জাপবিরোধী যুদ্ধে এই শেষোক্তদের জাপ-বিরোধী মনোভাবের সুযোগ গ্রহণ করার

সঙ্গে এদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে আবার এদের কমিউনিস্ট-বিরোধী ও গণতন্ত্র-বিরোধী দমননীতির বিরুদ্ধে জোর লড়াই চালাতে হবে।

চীনের জাতীয় বুর্জোয়ারা প্রধানত মাঝারি বুর্জোয়া। এরা সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারে জর্জরিত ও ধ্বংসাবশিষ্ট সামন্ততন্ত্রের শিকলে আবদ্ধ। এই দিক থেকে জাতীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লবেরই একটা শক্তি। "চীন বিপ্লবের ইতিহাসে এই জাতীয় বুর্জোয়ারা বহুবার সাম্রাজ্যবাদ, আমলাতন্ত্র ও রণনায়কদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে।"

যেহেতু জাতীয় বুর্জোয়ারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে দুর্বল এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ধ্বংসাবশিষ্ট সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই একটা বিশেষ সময়ে ও বিশেষ অবস্থায় এরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে পারে আবার জনতার বিপ্লব দুর্বার শক্তিতে এগিয়ে যাওয়ার ফলে এরা বিপ্লববিরোধী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করে বড় বুর্জোয়াদের সাহায্য করতেও পারে। কিন্তু মাও বলছেন, "আজ পর্যন্ত এরা (জাতীয় বুর্জোয়ারা) আমাদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেশি মিত্রতা বজায় রেখেই চলেছে।"

মধ্যবিত্তের ভিতরে আছে বুদ্ধিজীবী, শহরের ভবঘুরে, চাকুরে. কর্মচারী, কুটিরশিল্পী, স্বাধীন পেশাদার ও ব্যবসাদার। মধ্যবিত্ত ও কৃষকেরা বরাবর সাম্রাজ্যবাদ, ধ্বংসাবশিষ্ট সামন্ততন্ত্র ও বড় বুর্জোয়াদের দ্বারা অত্যাচারিত। মধ্যবিত্তেরা তাই বিপ্লবের একটা বড় শক্তি। এরা শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বস্ত মিত্র। কেবল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বেই এই মধ্যবিত্তেরা মুক্তির আশা করতে পারে।

চীনের বুদ্ধিজীবী ছাত্রদের মধ্যে সামান্য গণবিরোধী অংশ ছাড়া বৃহত্তম অংশটি সাম্রাজ্যবাদ, ধ্বংসাবশিষ্ট সামন্ততন্ত্র ও বড় বুর্জোয়ার শোষণে এবং বেকারি ও শিক্ষাভাবের ফলে উৎসন্ন যেতে বসেছে। "এরা সম্পূর্ণভাবে বিপ্লবের শক্তি। এরা বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত, আর রাজনৈতিক চেতনাও এদের যথেষ্ট। তাই এরা বিপ্লবের পথ-প্রদর্শক ও অগ্রগামী দল হতে পারে।" "এই বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের ভিতরই প্রথমে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জনপ্রিয়তা ও সমাদর লাভ করেছিল। বিপ্লবের ভিতর বুদ্ধিজীবীরা অংশ গ্রহণ না করলে বিপ্লবের শক্তিসমূহকে সংগঠিত করা ও বিপ্লবের পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা মোটেই সম্ভব হত না।" কিন্তু জনতার বিপ্লবে পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করার আগে এবং জনতার অংশ হিসেবে জীবনধারণ করার আগে বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা থাকে অন্তঃসারশূন্য, কাজ হয়

সামন্ততন্ত্রহীন। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী সংগ্রামে তাদের সবাই টিঁকে থাকতে পারে না, কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকতাও করে। বুদ্ধিজীবীরা সাধারণত সচেতনভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী। "জনতার ভিতরে থেকে দীর্ঘকালের সংগ্রামের ভিতর দিয়েই তাদের এই দোষ কাটানো সম্ভব।"

মফঃস্বল শহরের গরীব লোক, নিঃস্ব কুটিরশিল্পী, উৎসন্ন বেকার কৃষক, ফেরিওয়ালা ইত্যাদি আধা-সর্বহারারা গরীব কৃষকের মতই শ্রমিকদের স্বাভাবিক মিত্র এবং শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে। কারখানা ও ব্যবসায়ী ফার্মের কর্মচারী, সরকারী অফিস ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবীরা মানসিক শ্রম করে এবং কাউকেও শোষণ করে না। এরাও বিপ্লবের এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। কুটিরশিল্পী ও স্বাধীন পেশাদার ব্যক্তিরা সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের দ্বারা নিপীড়িত, অতএব তারাও বিপ্লবের পক্ষে আসতে পারে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নিচের অংশ অন্যকে শোষণ করে না এবং নিজেরা মহাজনী শোষণের দ্বারা নিপীড়িত। তাই তারাও বিপ্লবের এক প্রয়োজনীয় শক্তি।

চীনের কৃষকদের তিন অংশ। ধনী কৃষকেরা গ্রামের বুর্জোয়া। তাদের অধিকাংশেরই আধা-সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে এবং শহরের বুর্জোয়াদের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। বিপ্লবী সরকার ধনী কৃষককে জমিদারের সঙ্গে এক স্তরে ফেলবে না এবং ধনী কৃষকদের অর্থনীতি ধ্বংস করবে না। মাঝারি কৃষকরা যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ, জমিদার ও বড় বুর্জোয়া কর্তৃক শোষিত হয়, তাই তারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবেই শুধু যোগ দেয় না, সমাজবাদী বিপ্লবেও যোগ দিতে পারে। সুতরাং সমগ্র মাঝারি কৃষকই শ্রমিকদের নির্ভরযোগ্য মিত্র। বিপ্লবের প্রতি মাঝারি কৃষকের মনোভাবই ঠিক করে দেয় বিপ্লব সফল হবে কিনা। কৃষকদের শতকরা সত্তর জনই হচ্ছে আধা-সর্বহারা ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক। এরাই হচ্ছে চীন বিপ্লবের প্রধান শক্তি ও শ্রমিকদের স্বাভাবিক ও সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য মিত্র। কৃষক সম্প্রদায় বলতে প্রধানত মাঝারি ও গরীব কৃষকদেরই বোঝায়।

চীনের শ্রমিকদের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে যার ফলে তারা চীন বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। চীনের শ্রমিক সাম্রাজ্যবাদ, বুর্জোয়া ও সামন্তপীড়ক এই তিন শক্তির দ্বারা নিপীড়িত। দুনিয়ার আর কোথাও এই ত্রিশক্তির এমন চরম নৃশংসতা দেখা যায় না। তাই চীনের শ্রমিক শ্রেণী অন্য সব শ্রেণীর চেয়ে বেশি দৃঢ়তার সঙ্গে ও চূড়ান্তভাবে বিপ্লবে

অগ্রসর হচ্ছে। চীনের ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থায় পশ্চিম ইউরোপের মত সমাজ সংস্কারের কোন ভিত্তি নেই। চীনের শ্রমিক বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করার প্রথম দিন থেকেই পরিচালিত হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। চীনের শ্রমিকদের সঙ্গে কৃষকদের একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, কারণ বেশিরভাগ শ্রমিকই গ্রামের নিঃস্ব কৃষক। এই সমস্ত কারণে নানারূপ দুর্বলতা সত্ত্বেও (যেমন সংখ্যায় এরা কম, এদের উৎপত্তি অল্প দিনের এবং সাংস্কৃতিক মান নিম্ন) চীনের শ্রমিক শ্রেণীই চীন বিপ্লবের মূল শক্তি। চীনের শ্রমিকের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব ছাড়া চীন বিপ্লব কখনই সফল হতে পারে না। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের শ্রমিক শ্রেণী বোঝে যে শুধু নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে তারা বিপ্লব সফল করতে পারবে না। বিপ্লব সফল হতে হলে শ্রমিক শ্রেণীকে অন্য সব সম্ভাব্য বিপ্লবী শ্রেণীর ও স্তরের সঙ্গে বিভিন্ন অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং বিপ্লবী যুক্ত ফ্রণ্ট গড়ে তুলতে হবে।

চীনের ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থার ফলে শহরে ও গ্রামে বহুসংখ্যক বেকার সৃষ্টি হয়েছে। এরা ভিক্ষাবৃত্তি, চুরি, দালালি, বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতি নানা অসৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে। এই স্তরটি দোলায়মান, প্রতিক্রিয়াশীলরা এদের এক অংশকে সহজেই কিনতে পারে এবং দেশে গুণ্ডামির ও অরাজকতার সৃষ্টি এদের থেকেই। কমিউনিস্ট পার্টি এদের সতর্কতার সঙ্গে পরিচালিত করবে।

চীন বিপ্লবের প্রকৃতি সম্বন্ধে মাও বলেছেন, বর্তমান স্তরে চীন বিপ্লব শ্রমিক-সমাজবাদী বিপ্লব নিশ্চয়ই নয়, এ হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। চীন বিপ্লবের প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও আধা-সামন্তবাদী শক্তিগুলি। এই শত্রুর উচ্ছেদের সংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়ারা ও বড় বুর্জোয়ার একাংশ এখনও যোগ দেয় এবং যদিও বড় বুর্জোয়ারা বিপ্লবে বিশ্বাসঘাতকতা করে বিপ্লবের শত্রুতে পরিণত হয়েছে, তবু বিপ্লবের ছুরিকা সমগ্র ধনবাদী সম্পত্তির বিরুদ্ধে চালিত হবে না; শুধু সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক একচেটিয়া সম্পত্তির বিরুদ্ধে চালিত হবে। তাই এই বিপ্লব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু চীনের বিপ্লব এক নতুন ও বিশেষ ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এর নাম নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লব দুনিয়াজোড়া শ্রমিক-সমাজবাদী বিপ্লবেরই একটা অংশ। সাম্রাজ্যবাদের অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ধনবাদের

বিরুদ্ধে এর লড়াই। রাজনৈতিক ভাবে এই বিপ্লব গড়ে ওঠে কয়েকটি বিপ্লবী শ্রেণীর দ্বারা ; এরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব গড়ে তোলে, চীনের সমাজকে বুর্জোয়া একনায়ক সমাজে পরিণত হতে বাধা দেয়। অর্থনৈতিকভাবে এই বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সমস্ত বৃহৎ পুঁজি ও কল-কারখানা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে। বড় বড় ভূসম্পত্তি ভাগ করে কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেয় কিন্তু ধনী কৃষকদের অর্থনীতি উচ্ছেদ করে না এবং মাঝারি ও ছোট ব্যক্তিগত কারখানাকে সাহায্য করে। তাই নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যদিও ধনবাদের একটি পথ সাফ করে, আবার অন্যদিকে সমাজবাদের পূর্বাবস্থাও প্রস্তুত করে।

চীন বিপ্লবের ভবিষ্যত সম্বন্ধে মাও বলছেন, যদিও নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ধনবাদের বিকাশ হবে, তথাপি এর গোটা ফল হচ্ছে, একদিকে ধনবাদী উপাদানের বিকাশ, অন্যদিকে সমাজবাদী উপাদানের বিকাশ। চীনের রাজনীতিতে শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির আনুপাতিক বৃদ্ধি এবং কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও পেটি-বুর্জোয়া কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব স্বীকার, এইগুলি সমাজবাদী উপাদান। "অনুকূল আন্তর্জাতিক অবস্থায় চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ পর্যন্ত ধনবাদের পথ এড়িয়ে সরাসরি সমাজবাদ অর্জনও করতে পারে।"

বর্তমান অবস্থা ও আমাদের কর্তব্য

আগের পুস্তিকাটির সঙ্গে মাও-এর এই ভাষণের তুলনা করে দেখা যাচ্ছে চীন বিপ্লবের পটভূমির বিরাট পরিবর্তন। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ের পর আমেরিকার পদলেহী কুকুর চিয়াং কাই-শেক ও তার নেতৃত্বে চীনের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর যখন প্রয়োজন ছিল ও সম্পূর্ণ সম্ভব হয়েছিল চীনা জাতির পূর্ণ ঐক্য ও পূর্ণ স্বাধীনতালাভ, যখন প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করা ও তারই অনুরূপ অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত সংস্কার সম্পন্ন করা—তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আদেশে চিয়াং-এর দস্যুবাহিনী শুরু করে দিল নির্মম গৃহযুদ্ধ, আক্রমণ করল দশ কোটি লোকের বাসস্থান কমিউনিস্টদের মুক্ত অঞ্চল। আমাদের

দেশে যাঁরা 'হিংসার' নামে আঁৎকে ওঠেন, কমিউনিস্টদের 'হিংসাত্মক' কার্য-কলাপের নিন্দায় মুখর হয়ে যাঁরা আমেরিকায়, জাভায় ছুটে যান, তাঁরা যে কতদূর মিথ্যাবাদী, চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে। কেননা চীনের কমিউনিস্টরাই শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, বারংবার শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছিল, কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনটাঙ-এর মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে ও বিভিন্ন দল-উপদল নিয়ে গড়া শান্তির প্রস্তাবকে অলঙ্ঘনীয় মনে করেছিল, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্র গঠনের দ্বারা স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ চীনের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্যে চিয়াং-এর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত 'আলোচনা' চালিয়েছিল। কিন্তু মদমত্ত যুদ্ধ-পাগল চিয়াং-এর কাছে এ সমস্তই মনে হল শুধু কমিউনিস্টদের দুর্বলতার ও ভীরুতারই লক্ষণ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরাট সামরিক সাহায্যে মোহাচ্ছন্ন হয়ে নিজেকে অপরাজেয় ভেবে চিয়াং মুক্ত অঞ্চল ও কমিউনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে বিশ্বাসঘাতকতা করে ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে বিপ্লব-বিরোধী যুদ্ধ শুরু করে দিল।

চীনের সেই ঘোর দুর্দিনে মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি চিয়াং কাই-শেকের দস্যুবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ না করে বিপ্লবী ন্যায়যুদ্ধ চালানোর জন্য বদ্ধপরিকর হল। যখন চারিদিক থেকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল তখন তাঁরাই শুধু বুঝতে পেরেছিলেন যে শীঘ্রই অন্ধকার কেটে গিয়ে দেখা দেবে নতুন উষার আলো। যদিও চিয়াং-বাহিনী প্রথম দিকে মুক্ত অঞ্চলের বড় বড় শহরগুলি দখল করেছিল, তথাপি অপূর্ব রণকৌশলের সাহায্যে কমিউনিস্ট বাহিনী দেড় বছরের মধ্যে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের স্তর অতিক্রম করে চিয়াং-এর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু করে দিল। সেই সন্ধিক্ষণে ও শুভ মুহূর্তে প্রদত্ত মাওয়ের এই ভাষণ।

মাও এই বক্তৃতাটিতে কমিউনিস্টদের সকল রণকৌশলগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার পর বলছেন যে ভূমি-ব্যবস্থার পূর্ণ সংস্কারই চীন বিপ্লবের বর্তমান স্তরের প্রধান কাজ এবং এই ভূমি-সংস্কারের দ্বারাই শত্রুকে পরাজিত করার প্রধান ও মূল ভিত্তি স্থাপিত হবে। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের কালে জাপ-বিরোধী ঐক্য গঠনের জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টি জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা স্থগিত রেখেছিল এবং কৃষকদের খাজনা ও সুদ কমাবার নীতি গ্রহণ করেছিল। আসন্ন

গৃহযুদ্ধের প্রাক্‌কালে, ১৯৪৬-সালের ৪ঠা মে তারিখে, নিজেদের পিছন অঞ্চল অর্থাৎ মুক্ত গ্রামাঞ্চলের ঘাঁটি দৃঢ়তর করার জন্যে—চীনের কমিউনিস্ট পার্টি জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করার নির্দেশ দেয়। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটা জাতীয় ভূমি-সংস্কার সম্মেলন আহ্বান করে ভূমি-সংস্কার সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করা হয়। সেই আইনের মূল নীতিগুলি ও তার প্রয়োগ মাও বর্তমান বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করছেন। (এই আইন প্রধানত পুরনো মুক্ত অঞ্চলে প্রযুক্ত হয়। নতুন মুক্ত অঞ্চলে প্রযোজ্য ভূমি-সংস্কার আইন সম্প্রতি ১৯৫০ সালে প্রণীত হয়েছে)। উক্ত আইনের (১৯৪৬ সালের) প্রধান লক্ষ্য হল জমিদারদের জমি ও পুরনো ধরনের ধনী কৃষকদের বাড়তি জমি বাজেয়াপ্ত করা এবং জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষকদের মধ্যে সমানভাবে জমি বিলি করা। মুষ্টিমেয় অত্যাচারী ও দেশদ্রোহী জমিদার ব্যতীত অন্যান্য জমিদার সাধারণ ও ধনী কৃষকরাও গরীব কৃষকদের সঙ্গে সমানভাবে জমি পাবে। মাও দেখাচ্ছেন যে ভূমিসংস্কারের মূল নীতি হল গরীব কৃষক ও খেতমজুরদের দাবি পূরণ করা এবং গরীব কৃষকের উপর নির্ভর করে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, যাতে করে জমিদার শ্রেণী ও পুরনো ধরনের ধনী কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থা ধ্বংস হয়।

জমিদার শ্রেণীর শোষণ ও অত্যাচারের মূলোচ্ছেদ ব্যতীত চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আর একটি প্রধান লক্ষ্য হল বুর্জোয়া (বড় বুর্জোয়া) কর্তৃক শোষণ-ব্যবস্থার উচ্ছেদ। চীনের বড় বুর্জোয়ার কয়েকটি লক্ষণ হল, প্রথমত তা পরগাছা অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের সহচর ও আজ্ঞাবহ, দ্বিতীয়ত তা ধ্বংসাবশিষ্ট সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তৃতীয়ত তা একচেটিয়া অর্থাৎ মাত্র চারটি পরিবার বিপুল পরিমাণ বড় পুঁজির মালিক, চতুর্থত তা আমলাতান্ত্রিক অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতার সাহায্যে তার বৃদ্ধি ও সঞ্চয় হয়েছে এবং পঞ্চমত তা মাঝারি বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়াকে উৎপীড়ন করে। তাই চীনের নিরুদ্ধ উৎপাদন শক্তির বিকাশের জন্যে একদিকে যেমন জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করতে হবে অন্যদিকে তেমনই আমলাতান্ত্রিক পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে পেটি-বুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়াকে দৃঢ়ভাবে ও বিনা দ্বিধায় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। মাও দেখাচ্ছেন যে

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পেটি-বুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়ার কোন সম্পর্ক নেই অথবা সম্পর্ক থাকলেও তা অতি সামান্য। পেটি-বুর্জোয়ার ও মাঝারি বুর্জোয়ার উপরতলার এক অংশের যদিও দক্ষিণপন্থী মনোভাব আছে এবং এই অংশের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করতে হবে তথাপি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে এদের উচ্ছেদ করা মারাত্মক ভুল হবে। চীনের গোটা অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ বলে সারা দেশে বিপ্লব জয়যুক্ত হবার পরেও অসংখ্য পেটি-বুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়াদের তৈরি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দীর্ঘকাল ধরে জিইয়ে রাখার প্রয়োজন হবে।

তা সত্ত্বেও স্বাধীন, মুক্ত চীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়, তার চরিত্র ও সংজ্ঞা হল নয়া গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। নয়া গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হল এই যে, "সারা দেশময় বিপ্লব জয়যুক্ত হবার পরে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে এবং সামন্ততন্ত্রের কবল-মুক্ত কৃষিব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্র একটা বিপুল পরিমাণ পুঁজি লাভ করবে। রাষ্ট্রের এই পুঁজি তখন দেশের গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রভুত্ব করবে।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রের অধিকৃত পুঁজির পরিমাণ হবে বিরাট এবং সেই পুঁজির ভিত্তিতে রাষ্ট্র একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে পরিচালিত করবে। রাষ্ট্রীয় পুঁজির এলাকাটা ব্যক্তিগত পুঁজির এলাকার চেয়ে ক্রমশ অধিকতর হারে বিস্তার লাভ করবে এবং সকল প্রধান শিল্পে (ও কৃষিতেও) পুঁজির বিনিয়োগ রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তারপর নয়া গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বিতীয় বিশেষত্ব হল, "কৃষিব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে যৌথ কৃষিব্যবস্থার দিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।" তৃতীয় বিশেষত্ব হল, ব্যক্তিগত পুঁজির ভিত্তিতে গড়া ছোট ও মাঝারি শিল্পের নিরাপত্তার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা। এই তিনটে মিলিয়ে চীনের নতুন গণতন্ত্রের জাতীয় অর্থনীতি; যার মূল লক্ষ্য হল, উৎপাদন বৃদ্ধি, সমৃদ্ধিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, জনতা ও ব্যক্তির স্বার্থরক্ষা এবং শিল্পপতি ও শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা।

ভাষণের (ছ)-অংশটিতে মাও জাপ-বিরোধী যুদ্ধের পর গৃহযুদ্ধের ফলে যুক্ত ফ্রন্টের অভূতপূর্ব বিস্তারের ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সকল রাজনৈতিক কর্মীকে মনে রাখতে বলেছেন যে, "চীনা জাতির সমগ্র জনসংখ্যার

বেশিরভাগের উপরে ভিত্তি করে গড়া যুক্ত ফ্রন্ট ব্যতীত চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়লাভ অসম্ভব।" আমেরিকার আদেশে গৃহযুদ্ধ শুরু করার পর চিয়াং ও কুওমিনটাঙ্ জনতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। চিয়াং-এর জনস্বার্থ-বিরোধী গৃহযুদ্ধ-নীতি ও দমননীতির ফলে কুওমিনটাঙ্ শাসিত অঞ্চলের বিরাট জনতার দুঃখকষ্ট ও ক্ষুধার জ্বালা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল; শ্রমিক, কৃষক, পেটি-বুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়া সকলেই চিয়াং-এর প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। তারা রণধ্বনি তুলল ক্ষুধার বিরুদ্ধে, দমননীতির বিরুদ্ধে, গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। এই বাস্তব অবস্থায় চীনা কমিউনিস্টরা ভূমিসংস্কার ও সমগ্র জনতার পূর্ণ স্বার্থরক্ষা—এই দুইয়ের ভিত্তিতে একটা সঠিক সংকীর্ণতা-বিবর্জিত নীতি গ্রহণ করেছিলেন বলে কুওমিনটাঙ্ অঞ্চলের কৃষক, পেটি-বুর্জোয়া, মাঝারি বুর্জোয়া সকলেরই পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছিলেন এবং এঁদের সকলকে নিয়ে নিজেদের পার্টির নেতৃত্বে একটা বিরাট যুক্ত ফ্রন্ট গড়তে পেরেছিলেন। এটাই চীনের মুক্তি-সংগ্রামের অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রধান কারণ।

চীনের ভূমি-সংস্কার ও জনগণের মহান জয়

এই বক্তৃতাটিকে প্রধানত ভূমি-সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী—এই উভয় প্রকার বিচ্যুতি থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত বলশেভিক নীতি অনুসরণ করে ভূমি-সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এই সঠিক নীতি অবলম্বন করতে পারার জন্যে সানসি-সুইওয়ান এলাকার কর্মীদের নীতি অনুমোদন করা হয়েছে। কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জমিদারদের শারীরিক ভাবে হত্যা করার নীতি অসঙ্গত, অধিকাংশ জমিদারকে সাধারণ চাষীর প্রাপ্য সমপরিমাণ জমি দিতে হবে। তাঁদের মেহনত করে সমাজহিতকর উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত থাকার সুযোগ দিতে হবে। নতুন মুক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে দুঃসাহসিকের মত অবিলম্বে ভূমি-সংস্কার সম্পন্ন করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত নয়, প্রথম দিকে গৃহযুদ্ধ-বিরোধী যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের জন্যে জমি বিলি করার কাজ স্থগিত রেখে সুদ ও খাজনা কমানোর ব্যবস্থাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবলম্বন করতে হবে। সমানভাবে জমি বিলি করার নীতিকে একটা সূত্রের মত অন্ধভাবে

অনুসরণ করা উচিত নয়, পূর্ণ সমতাবাদী কৃষক-সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার দ্বারা চালিত হওয়া প্রতিক্রিয়াশীলতা মাত্র। সকল প্রকার আমলাতান্ত্রিক আদেশ-মূলক ও জনস্বার্থ-বিরোধী ঝোঁকের সঙ্গে নির্মমভাবে সংগ্রাম করতে হবে। শুধু কাজ করে যাও, শুধু জনতার ইচ্ছা পালন কর—এই ধরনের মনোভাব নিমজ্জনবাদী। কাজের মূলনীতি বুঝতে হবে, তার জন্যে চাই মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা এবং জনতাকে যেমন মান্য করতে হবে তেমনই জনতাকে শিক্ষিত ও পরিচালিত করতেও হবে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত পরিপক্কতার ও দায়িত্বশীলতার সুন্দর পরিচয় এই ভাষণটিতে পাওয়া যাবে।

অনিমেষ রায়

পত্রিকাপ্রসঙ্গ

একতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংসদের বার্ষিক সংকলন,
সম্পাদক—পীযূষ চট্টোপাধ্যায় ও শোভন মুখোপাধ্যায়।

স্নাতকোত্তর ছাত্রসমাজের এই বার্ষিক সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ("নবসমীক্ষা") লেখা হয়েছে, "ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণের চরম সংকটসময়ে বর্তমান বিশ্ব উপস্থিত হয়েছে। বৈষম্যের ভীষণতায়, বিদ্বেষের বিষে আর আঘাতের তাড়নায় এর জীবনীশক্তি মুমূর্ষু, প্রাণস্রোত নির্বীর্য অবরুদ্ধতায় বিলীন। জাতির বর্তমান, জাতির ভবিষ্যত আজ সমাচ্ছন্ন প্রগাঢ় অনিশ্চয়তা ও অচৈতন্যের ধূম্রজালে"।—সম্পাদকদ্বয় স্বভাবতই পৃথিবীর তথা জাতির বর্তমান সংকট সম্পর্কে সচেতন, চিন্তিত। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ভবিষ্যত অগ্রগতি সম্পর্কেও একান্ত সন্দিহান।—"নবযুগের জীবনধর্মের ব্যাখ্যাতার ভূমিকায়" আদর্শবাদী কয়েকজন ব্যক্তির আবির্ভাব তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, যাঁরা এঁদের মতে না পারলেন কোন "প্রকৃত জীবনের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করতে, না পারলেন কোন সংস্কারমুক্ত ধর্মের স্বরূপ নির্ণীত করতে"। এই সমস্ত "আদর্শবাদী" বলতে কাদের উদ্দেশ করা হয়েছে তা যে শুধু বোঝা গেল না তাই নয়, এই সমস্ত উক্তির ফলে এটা স্পষ্ট যে, মানুষের সমাজ, সভ্যতা ও আমাদের জাতির ভবিষ্যত সম্বন্ধে প্রগাঢ় "অনিশ্চয়তা"-ই শুধু সম্পাদকদ্বয় দেখতে পেয়েছেন; "মুমূর্ষু জীবনীশক্তি" পুনরুজ্জীবনের জীবনপণ সংগ্রামে দেশে দেশে এবং আমাদের দেশেও প্রতিনিয়ত যে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল সমাজ ও সংস্কৃতির ভিত্তিস্থাপন করে চলেছে তা তাঁদের চোখে পড়েনি। তাঁদের চোখে পড়েনি, পৃথিবীর এক বিরাট অংশে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতি এই অগ্রগতির ও গুণগত রূপান্তরের সংগ্রামে উত্তীর্ণও হয়েছে। যদিও এই আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁরা স্বপ্ন দেখেছেন "নূতন সমাজতন্ত্রের বনিয়াদের," তবু তার তত্ত্বগত ভিত্তি, তার রূপ ও বাস্তব জীবনে তার সম্ভাবনা কতদূর সে—সম্বন্ধে তাঁরা একেবারে নীরব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক পথের নির্দেশ দেওয়াই ছিল ছাত্র-সংসদের এই পত্রিকাটির মুখ্য কর্তব্য। যে দায়িত্ব এড়িয়ে বাস্তব জীবন ও জীবন-সংগ্রাম সম্পর্কে ভাববিলাসী বুদ্ধিজীবীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি ও বাগাড়ম্বরপ্রিয়তা দেখে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আমরা হতাশ হয়েছি।

ছাত্র-সম্পাদকদের দৃষ্টিভঙ্গির অপরিচ্ছন্নতার জন্যেই সংকলন-সম্পাদনার ব্যাপারেও কোন সুনির্দিষ্ট নীতি বা আদর্শ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, বরঞ্চ একটা বিচ্ছিন্নতা ও অসংলগ্নতা ছেয়ে আছে সবগুলি প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা প্রভৃতি সংযোজনার মধ্যে। কিন্তু এ-সমস্ত সত্ত্বেও কৃষ্ণ ধরের "বুর্জোয়া সাহিত্যের ভবিষ্যত" শীর্ষক প্রবন্ধে কিংবা প্রণব ঘোষের রূপকচিত্রে সুনির্দিষ্ট প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর আছে। এই দুটি রচনা চিন্তার খোরাক হিসেবে ও সঠিক পথনির্দেশের দিক থেকে ছাত্রসমাজের উপকারসাধনে, অন্তত কিছুটা, সমর্থ হবে। পত্রিকাটিতে উল্লেখযোগ্য গল্প একটিও নেই; কবিতার অংশ মোটামুটি ভালো। ইংরেজি রচনার বিভাগটি সম্পর্কেও আমাদের মৌল অভিযোগ: এক্ষেত্রে প্রগতিশীল রচনার সামান্য ইঙ্গিতমাত্র নেই। এছাড়া পত্রিকাটির মুদ্রণ-পারিপাট্য, গঠনসৌষ্ঠব ও আলোকচিত্র-সংযোজনা পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্মত।

মানবেন্দ্র রায়চৌধুরী

চলচ্চিত্র

মাইকেল মধুসূদনের চিত্ররূপ

উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কবি মাইকেল মধুসূদন ছিলেন অন্যতম। চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত মধু বসুর "মাইকেল মধুসূদন"-এর চিত্ররূপ বর্তমানে তাই বাঙালী দর্শকদের মধ্যে যে আগ্রহের সৃষ্টি করবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এ উপলক্ষে কলকাতা ও মফঃস্বলের চিত্রামোদীদের মধ্যে যে সাড়া পাওয়া গিয়েছে তাতে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

বিদেশী বণিকরাজ ছলে-বলে-কৌশলে একদা ভারতকে নাগপাশে বাঁধতে শুরু করে বাংলাদেশ থেকেই। দেশের স্বাভাবিক প্রগতি বন্ধ করে এদেশে তারা সুদীর্ঘকাল সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালাবার ও সামন্তবাদকে সুদৃঢ় করে রাখবার যে ফন্দি আঁটে, তারই ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্ম। বাঙলার বুকে কয়েক শো জমিদার তৈরি করে বসানো হল সাধারণ মানুষের উপর খবরদারী করতে এবং ইংরেজকে শোষণের সুযোগ করে দিতে। ইংরেজ-প্রভু এবং তাদের অনুগ্রহপুষ্ট জমিদারদের দাপটের বিরুদ্ধে প্রজাদের লড়াইয়ের ইতিহাসও রয়েছে প্রচুর, তবু সাম্রাজ্যবাদ যখন তাদের অপেক্ষাকৃত সুখের দিন অতিবাহিত করছিল সেই সময়ে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যশোহরে এই রকম এক ছোট জমিদারগৃহে মধুসূদনের জন্ম।

এই সময়ে বিদেশী বণিককুলের সহচর এদেশী এক বণিককুলেরও উৎপত্তি হয়। বিদেশী মালের একটা অংশ পাইকারী কেনা বা এদেশ থেকে সংগ্রহ করে বিদেশী ব্যবসায়ীদের কাঁচা মাল যোগান দেওয়াই ছিল এদের কাজ। উপরোক্ত জমিদার এবং এই দেশী বণিককুলের একটা প্রধান কাজ ছিল প্রভু ইংরেজদের আদবকায়দা নকল করা। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সংরক্ষণশীলতাও তারা বজায় রাখতে চাইত এবং এর ফলে এক খিঁচুড়ি ইঙ্গ-বঙ্গ আদব কায়দায় সংমিশ্রণ দেখা দিল জমিদার ও দেশী বণিকমহলে।

শাসন-যন্ত্র সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদ এ দেশে প্রভু ভাষার তথা ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করে। এদেশীয়দের পক্ষে ইংরেজ

দরবারে চাকুরি এবং ইংরেজ-মহলে মেশবার সুযোগলাভই এই ইংরেজি শিক্ষালাভের প্রধান কারণ। জমিদার-পুত্ররা বা কলকাতার মুৎসুদ্দী ব্যবসায়ীদের বংশধরেরা এই শিক্ষা গ্রহণে আসত পিতার তাগিদেই। কিন্তু এ ছাড়া এর আরও একটা দিক ছিল যা বিদেশী শাসকদের কিংবা দাস-মনোবৃত্তিসম্পন্ন অভিভাবকদের মোটেই আকাঙ্খিত ছিল না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত ইওরোপীয় ভাবধারা ও ইওরোপের বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে ফরাসি সামাজিক বিপ্লবের, প্রভাব নানা বাধা সত্ত্বেও এই পাশ্চাত্য শিক্ষার মারফত কিছুটা আসত। বিশেষ করে কয়েকজন প্রগতিশীল ইওরোপীয় ও ইঙ্গদেশীয় শিক্ষাব্রতী এ দেশের যুবকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসারে সচেতন চেষ্টাও করেন। তাই চিন্তাশীল ও প্রতিভাবান যুবকদের অনেকে শাসক-অভিভাবকদের ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষালাভ ছাড়াও অন্য ধরনের অর্থাৎ প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষাও অর্জন করেন।

মাইকেলের শিক্ষাজীবনে হিন্দু কলেজই ছিল এদেশীয়দের উপরোক্ত ধরনের শিক্ষালাভের প্রধান কেন্দ্র। প্রগতিশীল চিন্তাধারা-সম্পন্ন খ্যাতিমান ডিরোজিও ও রিচার্ডসন প্রমুখ ছিলেন তাঁদের শিক্ষক। এঁদের প্রভাব ও চিন্তাধারা তরুণ মধুসূদন ও তাঁর সতীর্থদের মধ্যে এক বৈপ্লবিক সাড়া আনে। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার এই পরিণতি মধুসূদনের পিতার মোটেই কাম্য ছিল না, সুতরাং সামন্ততন্ত্রী পিতার সঙ্গে মধুসূদনের হল সংঘাত। সংকীর্ণতার নিষ্পেষণী নাগপাশে বাঁধা হিন্দু সমাজের আঘাত এল মধুসূদনের উপর। সুতরাং ধর্ম ও সমাজের সঙ্গেও হল তাঁর সংঘাত। তিনি ছিটকে পড়লেন তৎকালীন সমাজগণ্ডীর বাইরে। কবি-প্রতিভাসম্পন্ন মধুসূদন, সৃষ্টির আবেগে অধীর মধুসূদন ছিটকে পড়লেন—কিন্তু কোথায়?

বিদেশী শাসকদের আর একটা প্রচেষ্টা হল এদেশের রাজার ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার। ঐতিহাসিক অগ্রগতির দিক থেকে সে যুগে ইংলণ্ড ছিল ভারতের চেয়ে অগ্রবর্তী, সুতরাং খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে বাহ্যিক উদারতাও এদেশী সনাতন ধর্মের চেয়ে বেশি ছিল। সে যুগের আরও অনেক গণ্যমান্য লোকের মত মধুসূদনও স্বাভাবিকভাবেই খ্রীষ্টধর্মের দিকে ঝুঁকলেন। কিন্তু একথা ভাবলে ভুল হবে যে ধর্ম প্রেরণাই তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণের কারণ। জগদ্দল হিন্দু সমাজের শ্বাসরোধী পেষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং নিজের ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত বিকাশের আগ্রহ—এগুলিই ছিল তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণের মূল কারণ।

এবং সে যুগে ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থায় সাধারণত ধর্মান্তর গ্রহণই ছিল এই বিদ্রোহ ঘোষণার তীব্রতম অভিব্যক্তি।

সামন্ততন্ত্রী চিন্তাধারার সঙ্গে বুর্জোয়া মানবতাবাদ ও ব্যক্তিত্ববাদী চিন্তাধারার অবিরাম সংঘাত—এ-ই মাইকেল মধুসূদনের জীবন। এবং এই-ই মাইকেল-প্রতিভার ধাত্রী ও সেই প্রতিভার ট্রাজিক পরিণতির কারণ। ঔপনিবেশিক সামন্তবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে শক্তি শ্রেণী ও সংগঠন হিসেবে প্রথম বৈপ্লবিক চিন্তাধারা নিয়ে অগ্রসর হয় তা হচ্ছে উপনিবেশের জাতীয় বুর্জোয়া শক্তি। কিন্তু মাইকেলের সময় সংহত শ্রেণী ও সংগঠন হিসেবে কোন জাতীয় বুর্জোয়া-শক্তি দেখা দেয়নি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাও তখন হয়নি। যদি সে সময়ে কোন জাতীয়তাবাদী সমাজ-সচেতন প্রতিষ্ঠান থাকত তাহলে হয়ত তার মধ্যে মাইকেল তাঁর বিপ্লবী ব্যক্তিত্ববাদ ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রকাশের ও প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক পথ খুঁজে পেতেন। কিন্তু একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী চিন্তাধারা ও প্রভাবের বিরুদ্ধে চিন্তা-বিপ্লবে তিনি তাঁর সমরকার আরও অনেক বুদ্ধিজীবীর মত ছিলেন বিচ্ছিন্ন ও একক, অন্যদিকে তেমনি বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অগ্রণী মাইকেলের একাকীত্ব ছিল আরও দুস্তর। গভীর আবেগ ও উন্মাদনা নিয়ে তিনি লিখতেন, সে লেখায় প্রশংসাও তিনি পেতেন। কিন্তু তাঁর প্রশংসামুখর পাঠকদের জীবনের ভিতে সে লেখা সে-রকম নাড়া দিতে পারত না। মাইকেলের শিল্প-বিপ্লব যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে আনতে পারত বিরাট সাড়া, সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে তখনও দানা বেঁধে ওঠেনি। ফলে উগ্র-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মাইকেল স্বভাবতই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে হয়ে উঠলেন পরম অরাজক। মাইকেল-জীবনের ব্যর্থতার রহস্য এইখানে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং মাইকেলের সময়ের ভারতের ইতিহাসের ও বাস্তব সামাজিক অবস্থার পটভূমিকায় বিচার করলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, মাইকেলের চিত্ররূপ একেবারেই আশানুরূপ হয়নি। যদিও "জিপ্‌সি মেয়ে," "অপবাদ," "মানদণ্ড" প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর শস্তা বিকৃতরুচি প্রতিক্রিয়াশীল ছবির সংঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত অভিযানে বিপর্যস্ত ও বিক্ষুব্ধ সাধারণ বাঙালী দর্শকের গণতান্ত্রিক রুচি ও চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে শ্রীযুক্ত বসু ও তাঁর সহকর্মীদের ও তাঁদের প্রতিষ্ঠানের এই প্রচেষ্টা—প্রচেষ্টা হিসেবেই সমর্থনের যোগ্য। এবং বিরাট ঘটনাবহুল

মাইকেল-চরিত্র প্রকৃতভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয়তো দু-তিনটি পূর্ণ-দৈর্ঘ্য ছবি করতে হতে পারে, এ অসুবিধের কথা মনে রেখেও মাইকেল চিত্রে পোষাক-পরিচ্ছদ, জিনিসপত্র, দৃশ্যপট-রচনা প্রভৃতি দেখে খেদের সঙ্গে বলতে হয়, এখনও পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প ঐতিহাসিক জীবনী চিত্রে হাত দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি।

খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ অন্যায় নয়—একেই মাইকেলের ধর্মত্যাগের, পিতার সঙ্গে সংঘাতের যুক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। অথচ মাইকেলের শিক্ষা-জীবন, হিন্দু কলেজ-জীবন, আত্মবিশ্বাসী মাইকেলের জীবন গঠন—এক কথায়, কি করে সামন্ততন্ত্রী পিতার পুত্র হয়ে উঠলেন চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, তার এতটুকু পরিচয় কোথাও নেই। মাতৃস্নেহে বিগলিত মাইকেল, পুত্রস্নেহে বিগলিতা মাইকেল-মাতা—এই হল মাইকেল চিত্রের অর্ধাংশ। সামন্ত-জমিদার গৃহে নারীরা যে রকম নিপীড়িতা ও লাঞ্ছিতা হয়ে থাকেন, মাইকেলের মা-ও ছিলেন তাই। অন্ধ আশীর্বাদ ছাড়া তাঁর আর কোন বলিষ্ঠ দান মাইকেলের চরিত্রে নেই। কিন্তু পরিচালক এ ব্যাপারে অনর্থক কিছুটা মাত্রাতিরিক্ত করুণ রস সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। অথচ এরই পাশাপাশি রেবেকার সঙ্গে মাইকেলের বিচ্ছেদ এবং হেনরিয়েটার সঙ্গে বিয়ে এমন আপত্তিকর নির্মমতার সঙ্গে ও হালকাভাবে দেখানো হয়েছে যে তা মাইকেলের মানবতাধর্মী হৃদয় সম্বন্ধে রীতিমত অশ্রদ্ধা উদ্রেকের সুযোগ দেয়।

মাইকেলের কবিজীবন, সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনার দৃশ্য প্রভৃতি ফুটিয়ে তুলতে পরিচালক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দু-একটি দৃশ্য বাদে সামগ্রিকভাবে মাইকেলের সাহিত্যিক জীবন দর্শক সাধারণের মনে বিশেষ কোন রেখাপাত করতে পারেনি। আর, তৎকালীন সাহিত্যিক আসরের পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টায় চূড়ান্ত অক্ষমতাই প্রকাশ পেয়েছে। এবং এ সবই মাইকেলের কবি-প্রতিভার বৈপ্লবিক তাৎপর্য পরিচালকের পক্ষে বুঝে উঠতে না পারার ফল। তাই মাইকেলের কবি-কৃতির অভূতপূর্ব অভি-নবত্বের দিকে তাঁর নজর পড়ে না, নজর পড়ে না রামায়ণের পৌরাণিক ঘটনার অভিনব বুর্জোয়া মানবতাবাদী ব্যাখ্যা (মেঘনাদবধ কাব্য)-র প্রতি। তাই তিনি অতিরিক্ত মনোযোগ দেন মাইকেলের বাজি রেখে অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা, অনবরত পায়চারি করে কবিতার পংক্তি সংযোজনা

ও মুখে মুখে এক সঙ্গে দু-তিনটি কাব্যগ্রন্থ রচনার মত চমকপ্রদ, অথচ মাইকেল-প্রতিভা বোঝবার পক্ষে গৌণ, বিষয়ের দৃশ্যের অবতারণা করে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিতে। আর এই মৌল ঐতিহাসিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে চিত্রে বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন, রাজনারায়ণ প্রভৃতি মাইকেলের সমধর্মী বন্ধু ও উনিশ শতকের বাঙালী চিন্তা-নায়কদেরও চিত্রণ ও আলাপ-আলোচনায় দৃশ্য হাস্যকর রকম ব্যর্থ হয়েছে।

ছবিতে দীর্ঘ বার হাজার ফিটে এমন অনেক কিছু আছে যার প্রায় অর্ধেক অনায়াসে কেটে বাদ দেওয়া যায় কিন্তু একান্ত অভাব সত্যিকার মাইকেলকে বোঝা যায় বা সেই সময়ের বাঙলাকে জানা যায় এমন দৃশ্যের। বস্তুত, "মাইকেল মধুসূদন" চিত্রে মাইকেলকে উপস্থিত করা হয়েছে এমন এক সমাজ-ঊর্ধ্ব অলৌকিক শক্তিধর পুরুষ হিসেবে, অবতার হিসেবে—যাঁর ধর্মান্তর গ্রহণ, চারটি সন্তানের জননী প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ, অস্থিরমতিত্ব, জীবনে ব্যর্থতাবোধ, অমিতব্যয়িতা, অতিরিক্ত মদ্যপান প্রভৃতি সবই অযৌক্তিক অথচ সব কিছুই সমালোচনার (বা, এই "মাইকেল"-এর পক্ষ থেকে কৈফিয়তের) ঊর্ধ্বে। অথচ আগেই বলেছি, মাইকেলের জীবন, তার ইতিহাস-সম্মত সামাজিক পটভূমি ও সেই পটভূমিতে জীবনের নানা ক্ষেত্রে পুরনো সামন্তবাদী মতাদর্শের সঙ্গে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নতুন মতাদর্শের সংঘর্ষ ও চিন্তা-বিপ্লব—এ-ই মাইকেল-প্রতিভার ধাত্রী এবং এ-ই সেই প্রতিভার ট্র্যাজিক পরিণতির কারণও। কিন্তু আলোচ্য চিত্রে অনুপস্থিত সেই সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিই। বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে নীল-বিদ্রোহ জাতীয় ইতিহাসের অবিস্মরণীয় আন্দোলন। সেই পটভূমিকায় লেখা দীনবন্ধুর বিখ্যাত "নীলদর্পণ" নাটক মাইকেলই ইংরেজিতে অনুবাদ (প্রবাদ একরাত্রির মধ্যে) করেন। বইটি প্রকাশিত হয়, পাদ্রি লং-এর নামে। এই সূত্রে বিচারে লং সাহেবের শাস্তি হয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ এক হাজার টাকা দিয়ে তাঁকে খালাশ করেন। মাইকেলের ঘটনাবহুল জীবনে এমনি আরও কাহিনীর খোঁজ মিলবে, যা একসঙ্গে গ্রথিত হলে বোঝা যাবে সত্যিকার সামাজিক মানুষ মাইকেলকে। কিন্তু মাইকেলের জীবনের এই দিকটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এই চিত্ররূপে; এবং মাইকেল-জীবনী রূপায়ণে এর ব্যর্থতার মূল উৎসও এইখানে।

চিত্রের অন্যান্য দিক নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে, কিন্তু স্থানাভাবে

তা বাদ দিতে হল। শুধু অভিনয় সম্পর্কে কিছুটা বলা দরকার। মাইকেলের ভূমিকায় শ্রীউৎপল দত্ত, মাইকেল-জননী জাহ্নবীর ভূমিকায় শ্রীমতী মলিনা ও রেবেকার ভূমিকায় শ্রীমতী মেরিয়াম স্টার্কের অভিনয় বাদে আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য অভিনয়ই নেই। মাইকেলের ভূমিকায় শ্রীউৎপল দত্তর আশ্চর্য নিষ্ঠা, প্রশংসনীয় আবৃত্তি-গুণ এবং জায়গায় জায়গায়, বিশেষ করে ছবিটির শেষভাগে, তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয় দেখে মনে হল, শ্রীযুক্ত বসু পরিকল্পিত "মাইকেল"-চরিত্র চিত্রজগতে এই তরুণ নবাগতের আন্তরিকতার প্রতি অবিচার করেছে। লাঞ্ছিতা ও অসহায় মাইকেল-জননীর ভূমিকায় শ্রীমতী মলিনার অভিনয় মর্মস্পর্শী।

চিত্রে জাতীয় কবি হিসেবে সাধারণ বাঙালীর অসীম শ্রদ্ধাভাজন মাইকেল মধুসূদনের সত্যিকার চরিত্র সৃষ্টি হলে দর্শকের আকর্ষণ যে আরও বহুগুণ বেড়ে যেত এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

মনোরঞ্জন বড়াল

সংস্কৃতি সংবাদ

'পরিচয়'-এর উনবিংশতি বার্ষিকী

"পরিচয়" গত শ্রাবণে বিশ বছরে পদার্পণ করল। এ উপলক্ষে গত ৩রা ভাদ্র টালিগঞ্জে "দীপ্তি" চিত্রগৃহে "পরিচয়"-এর উনবিংশতি বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় এবং বিখ্যাত সোভিয়েট প্রযোজক আইজেন্‌স্টাইনের "আইভান দি টেরিব্‌ল" চিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

দীর্ঘ উনিশ বছর আগে বাংলার সংস্কৃতি-জগতে নতুন গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার সন্ধানে যাত্রা শুরু করেছিল "পরিচয়"—সেই থেকে আজ পর্যন্ত তার এই দীর্ঘ সময়যাপনের পিছনে রয়েছে প্রধানত প্রগতিশীল মতবাদ প্রচারেরই ইতিহাস। তাই "পরিচয়"-এর উনবিংশতি জন্মবার্ষিকীতে প্রগতি-পন্থী সঙ্গী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়েই ছিল এই উৎসবের আয়োজন; মুখর সভাগৃহের পরিচিত কণ্ঠস্বরে "পরিচয়"-এর দীর্ঘ জীবন কামনায় সদিচ্ছা। তাই সেদিন ছিল একাধারে শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যাল, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমর সেন, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, শুভো ঠাকুর, নবেন্দু ঘোষ, কালী সরকার এবং দেবনাথ দাশ, প্রমোদ সেনগুপ্ত প্রমুখ সুধী ও সমাজকর্মীদের সোৎসাহ উপস্থিতি।

"পরিচয়" সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতিসেবী পত্রিকা। "পরিচয়"-এর পৃষ্ঠায় তাই রবীন্দ্রনাথ থেকে সেদিনের কবি সুকান্তের স্বাক্ষর। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সৌহার্দ বজায় রাখার জন্যে "পরিচয়' সচেষ্ট—দেশবিদেশের গণসংগ্রামের কাহিনী আর প্রগতিশীল দুনিয়ার সাহিত্যিক, কবি, শিল্পীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করানোর মহৎ দায়িত্ব এ-যাবৎ গ্রহণ করেছে "পরিচয়"। এরই মারফত গোর্কি থেকে লু স্যুন, আরাগঁ থেকে নেরুদার সাহিত্য-প্রতিভা আজ আমাদের অজানা নয়। শান্তি-সংগ্রামে লেখকদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকার জন্যে "পরিচয়" আহ্বান জানিয়েছে—আণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ এর পৃষ্ঠায় চিহ্নিত। অন্যদিকে প্রতিনিয়ত অসংখ্য ঘাতপ্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়ে তাকে পথ চলতে হচ্ছে। শাসক-গোষ্ঠী ও

প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্রে আজ "পরিচয়"-এর জনপ্রিয় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক ননী ভৌমিক, চিন্মোহন সেহানবীশ, দ্বিজেন্দ্র নন্দী, সুলেখা বিশ্বাস প্রভৃতি কয়েদার বন্দীশালায় নিক্ষিপ্ত। "পরিচয়"-এর প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারকেও নানাপ্রকার নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। "পরিচয়"-এর কার্যালয়ে একাধিকবার খানাতল্লাসী হয়েছে, পুলিশী সন্ত্রাসের ফলে অনেক মুদ্রণালয় "পরিচয়" মুদ্রণে অসম্মত হয়েছে।

মার্কসবাদী সাংস্কৃতিক আদর্শ প্রচারের মহান ব্রত "পরিচয়"-এর। গণ-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার সাধনায় "পরিচয়" অগ্রগামী। বাংলার সংস্কৃতি-জগতের সমস্ত প্রতিভাবান গণতন্ত্রী শিল্পী-সাহিত্যিকের প্রতি আজ "পরিচয়"-এর আহ্বান—আপনারা আমাদের সঙ্গী হোন। প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির আক্রমণে "পরিচয়" প্রতিনিয়ত উদ্‌ব্যস্ত—"পরিচয়"কে বাঁচিয়ে রাখুন। "পরিচয়" মুনাফাখোর মালিকের সম্পত্তি নয়, বাংলার গণতন্ত্রী জনগণের নিজেদের সাংস্কৃতিক মুখপত্র। তাঁদের সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা "পরিচয়"এর প্রাণ। সেদিন একে একে হিরণকুমার সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই আবেদনই জানান উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে।

বিংশতি বর্ষে নতুন উদ্যমে ও আশায় "পরিচয়"-এর যাত্রা শুরু হল। এ যাত্রায় জনসাধারণ তার পথসঙ্গী; গণতন্ত্রী সাহিত্যিকদের সহযোগিতা তার পাথেয়। "পরিচয়"-এর পক্ষ থেকে তাই "পরিচয়"-এর লেখকগোষ্ঠী এবং গ্রাহক ও পাঠকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এই যাত্রার সূচনা।

দিলীপ চৌধুরী

নীলদর্পণ অভিনয়

'নীলদর্পণ'-এর শেষ অভিনয় কবে হয়েছিল তা জানি না। বাংলাদেশের মনে শুধু অর্ধেন্দুশেখরের রোগ সাহেবের ভূমিকা অভিনয় ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটি ছুঁড়ে মারাটাই জনশ্রুতিরূপে বেঁচে আছে। ব্রিটিশ শাসনের দিনে এ নাটক যে অভিনীত হতে পেরেছিল, তা-ই আশ্চর্য। তারপর থেকে নীলদর্পণ-এর অভিনয় নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলেছে। যাঁরা নতুন সাহিত্য ও নতুন নাট্যকলার পক্ষপাতী তাঁরা 'নীল দর্পণ'এর মূল্য আজ বিশেষ করেই

বুঝতে পারেন। তাই 'নীল দর্পণ'-এর পুনরভিনয়ও কামনা করেন। কিন্তু যাঁরা অভিনয়-কুশল তাঁরা বারেবারেই 'নীল দর্পণ' অভিনয়-কলার দিক থেকে যাচাই করতে গিয়ে নিবৃত্ত হয়েছেন। নাট্যকলা হিসাবে বঙ্কিমও বন্ধুর এ নাটককে গ্রাহ্য করতে চান নি। তাই নতুন করে 'নীল দর্পণ' অভিনয় করতে হলে তাকে বেশ ছাঁট-কাট করে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করতে হয়। দ্বিতীয়ত, দীনবন্ধুর উপভাষা আজ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দোরস্ত্ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার—সেদিকেও ছাঁট-কাট প্রয়োজন। এই সব দুস্তর বাধা উত্তীর্ণ হয়ে "নাট্যচক্র"-গোষ্ঠী গত ২৭শে অগস্ট, "শিয়ালদহ ম্যান্সন ইনস্টিটিউটে" তাঁদের প্রথম নিবেদন উপস্থিত করেছেন—'নীল দর্পণ'। প্রথমত সাহস, সঙ্কল্প ও উদ্যোগের জন্য "নাট্যচক্র"কে সম্বর্ধনা জানানো সকলেরই কর্তব্য।

নাট্যাভিনয় যে সব শিল্পের সুসঙ্গত প্রয়োগের উপর নির্ভর করে তার মধ্যে প্রধান একটি জিনিস অভিনয়-কলা। সে বিদ্যার দিক থেকে "নাট্যচক্র"-এর সদস্যদের অকুণ্ঠিত প্রশংসা করতে হয়। সেদিন ছিল তাঁদের প্রথম নিবেদন—এবং আমরা ভালো করেই জানি, এ জাতীয় গণশিল্পের বিরুদ্ধে মঞ্চ-মালিক ও মালিক শ্রেণীর কত বড় বিরোধিতা আছে। তাই ইতিপূর্বে কোন মঞ্চে মহড়া দেবার সুযোগও অভিনেতারা লাভ করেন নি। এই তাঁদের মঞ্চ-মহড়া বলতে মঞ্চ-মহড়া, প্রথম রাত্রি বলতে প্রথম রাত্রি। এই কথা মনে রাখলে তাঁদের কলা-কৃতিত্ব যথার্থ উপলব্ধি করা যায়। সেদিন সার্থকতা দেখান স্ত্রী-ভূমিকার অভিনয় যাঁরা করেছেন, তাঁরা—বিশেষ করে শোভা সেন। পুরুষের ভূমিকা অভিনয়ে গঙ্গাপদ বসু, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, নকুলেশ্বর চক্রবর্তীরা উল্লেখযোগ্য। কারো অভিনয়ই অভিনয় হিসাবে তুচ্ছ হয় নি, কিন্তু অনেকের নাটকস্থ ভূমিকাই এরূপ যে, অভিনয়ে সুযোগ অপেক্ষা অসুবিধা বেশি। তবু সমালোচনার দিক থেকে বলা চলে—গোপীর অভিনয়ে প্রথম দিককার ইতর-ইয়ার্কির ভাবটা আর একটু সংযত করা দরকার; তোরাবের অভিনয়ে, কথার স্বরে, দাঁড়াবার ভঙ্গিমায় একটা গৎ-বাঁধা রীতি অনুসরণ করা হয়েছে, তা বর্জনীয়। তা ছাড়া তোরাব সরল গোঁয়ার কৃষক; মানুষকে উস্কিয়ে দেবার মত বুদ্ধি সে চরিত্রে মানায় না, তাও স্মরণীয়। আদালতে মোক্তারদের দৃশ্যটি আরও জমানো উচিত।

কিন্তু অভিনয়-কলার সার্থকতা বারেবারে ক্ষুণ্ণ হয়েছে মঞ্চের জন্য: দৃশ্য-

পরিবর্তন তাড়াতাড়ি না হলে অনেক সজীব মূকাভিনয়ও যান্ত্রিক ভঙ্গিমায় পরিণত হয়, অথচ তা অভিনেতার দোষেও নয়। অতএব, এ নাটক অভিনয়ের জন্য ঘূর্ণা-মঞ্চ প্রয়োজন। নইলে শুধু একরঙা পটের রূপক-পরিপ্রেক্ষিতই গ্রহণ করা কর্তব্য। শুধু তাতেও হবে না। অনেক কাট-ছাঁট সত্ত্বেও দৃশ্যগুলি এখনো সর্বাংশে অভিনয়-যোগ্য নয়; বড় বড় বক্তৃতা না কাটলে চলত না, অথচ দৃশ্য তাতে খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছে, জমতে না জমতে শেষ হয়, আবার দৃশ্যান্তরও তাড়াতাড়ি আসে না। এক্ষেত্রে এ কালের মঞ্চ-নাট্যকারকে আরও পরীক্ষা করতে হবে—কি করা যায়। নির্বাক অর্থপূর্ণ ঘটনা (significant action) ফুটিয়ে, মূকাভিনয় দিয়ে কি এ ছেদ ভর্তি করা যায়—যেমন করা যেত নির্বাক চিত্রের (movie) যুগে?

অভিনযোপযোগী নাটক হিসাবে দীনবন্ধুর 'নীল দর্পণ' প্রায় অচল; তাকে অভিনয়োপযোগী করা, সার্থক অভিনয় করা একটা বড় কৃতিত্ব। আমরা "নাট্যচক্র"-এর নিকট সে প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। তাই তাঁদের শুভ দীর্ঘজীবন কামনা করি।

গোপাল হালদার

প্রগতি নাট্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমননীতি

"সম্প্রতি 'জাতীয় মুক্তি সংস্থা' নামে একটি সুপরিচিত কর্মী-প্রতিষ্ঠান পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সাহায্যকল্পে শ্রীরঙ্গম প্রেক্ষাগৃহে একটি নাটিকা ও বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন। ভারতীয় গণ-নাট্য কর্তৃক 'সংকেত' নামে নাটকটির অভিনয় হওয়ার কথা ছিল…।…কিন্তু অভিনয়ের দিন, অর্থাৎ ৯ই জুন তারিখ অকস্মাৎ কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এক হুকুমনামা জারি করিয়া সমগ্র অভিনয় ও বিচিত্র অনুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেন।…এই হুকুমটি এতই চিত্তাকর্ষক যে, আমরা ইহার গোটাটিই নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

Whereas Commissioner of Police, is of the opinion that the drama entitled 'Sanket' and other musical shows about to be performed on 9-6-50 at Sree Rangam by I.P.T.A and Alam Bazar Udbastu Sibir organised by Jatiya Mukti Sangstha is likely to excite feeling of dis-affection to the Government established

by law or likely to deprave and corrupt persons present at the performance. The Commissioner of Police, Calcutta, under section 3 of Act No. XIX of 1876 herely prohibit the performance of the said drama Sanket and other musical shows at Sree Rangam on 9-6-50 or any date thereafter. Any person disobeying the order and assisting in the said performance is liable to be punished with imprisonment for a term of 3 months under section 4 of Act No. XIX of 1876."

(যুগান্তর, ১৪ই জুন, ১৯৫০)

"The District Magistrate of Ludhiana has prohibited for an indefinite period throughout the district the performance of dramas under section 3 of Dramatic Performance Act, 1876."　　　　(The Nation, 10th June, 1950)

১৮ই জুন তারিখে গণনাট্য সংঘের আরও একটি অনুষ্ঠানের সময় রামমোহন লাইব্রেরী হলে পুলিশ আসে এবং 'সংকেত' নাটক হবে এই অজুহাতে অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেবার দাবি করে। শেষপর্যন্ত অনুষ্ঠান বন্ধ না হলেও উপস্থিত দর্শকদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়।

বর্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে ২৪ পরগণার জয়নগর ও অন্যান্য অঞ্চলে যে-কোনরকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে এক আদেশ জারি হয়। এমন কি ঘরের মধ্যেও কোনরকম নাটক কিম্বা গানের মহড়া দেওয়া নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।

গত ২০শে জুলাই মেদিনীপুরের সমস্ত ছাত্রদের মিলিত উদ্যোগে কলেজ হলে বাস্তহারাদের সাহায্যের জন্যে গণ-নাট্য সংঘের একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। পুলিশ কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠানের আগের দিন উদ্যোক্তাদের ডেকে নানারকম প্রশ্ন করেন এবং গ্রেপ্তারের ভয় দেখান। ফলে অনুষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়।

"কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ১৮৭৬ সালের ১৯ নং বিধানের ৩ ধারা অনুযায়ী দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তরঙ্গ' নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন। গত ২৯শে জুলাই অম্বিকা সংঘ কর্তৃক ল্যান্সডাউন রোডস্থ ন্যাশনাল স্কুলে নাটকটির অভিনয় হইবার কথা ছিল। কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ভিত্তি করিয়াই নাটকটি লিখিত বলিয়া জানা গিয়াছে।"

(যুগান্তর, ৩১শে জুলাই, ১৯৫০)

উপরের ঘটনাগুলির দিকে তাকালেই দেখা যায় যে এগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়, এর প্রত্যেকটিরই যোগসূত্র রয়েছে এক সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যটা কি ?—সরকার তাঁদের প্রেসনোট আর আধা-সরকারী প্রচার-যন্ত্রের মারফত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন—সাহিত্য আর শিল্পের মধ্য দিয়েই নাকি 'দুষ্কৃতকারীরা' লোকপ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাবার মতলবে আছে। সরকারের লোকপ্রিয়তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুলেও এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, রাজনৈতিক বিরোধিতার অজুহাতে যে সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেগুলো জনপ্রিয়তার দিক থেকে গৌরবের দাবি রাখে। তার কারণও সুস্পষ্ট—জনসাধারণ শিল্পী সাহিত্যিকদের সত্যোপলব্ধির প্রকাশকে শ্রদ্ধা করেন আর তার মধ্যেই দেখতে চান তাঁদের অনাগত ভবিষ্যতের ছবি। তাই দেখতে পাই গণ-নাট্য সংঘের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে জনতার ভিড়—অনুষ্ঠানকারীদের প্রতি তাঁদের অপরিসীম দরদেরও প্রমাণ পাই যখন দেখি কোন রুগ্ন শিল্পীর নামে সাহায্যের আবেদন করতেই সমস্ত দর্শকদের মধ্যে থেকে অদ্ভুত সাড়া ওঠে। একই কারণে বোধ হয় অফিস-ফেরতা কেরানির দল, ভারি বোঝা মাথায় ঝাঁকা মুটে, পরস্পর প্রতিযোগিতার কথা ভুলে গিয়ে কাঠের বাক্স হাতে "সু সাইনেরা", পথ-চলতি সুবেশ তরুণ তরুণীর দলও ভিড় করে দাঁড়িয়ে শোনে এক অন্ধ বাউলের গান—যে গানে সে বলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার বীভৎসতার কথা, প্রকাশ করে এর পিছনকার দেশী বিদেশী চক্রান্তকারীদের কারসাজি আর সবার কাছে আবেদন জানায় মিলিত প্রতিরোধের। হয়তো কবে শুনতে পাব সেই অন্ধ বাউলের উপরই আইনজারি হয়েছে।

সরকারী প্রচার যতই কর্ণবিদারী হোক এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিরোধিতাই এই আক্রমণের কারণ। এই অভিযানের উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক, কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই এ সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।

প্রাচীন রোমের মানুষরা বলত : যখন অস্ত্র কথা কয়ে ওঠে, কলালক্ষ্মীরা স্তব্ধ হয়ে যান।

সারা পৃথিবীর যুদ্ধোন্মাদেরা আজ দুনিয়া জুড়ে নরমেধ-যজ্ঞের আয়োজনে ব্যস্ত। ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধলিপ্সুদের শবসাধনার প্রেতোল্লাসকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার ভার পড়েছে তাদের বশংবদ সাকরেদদের উপরে। তাদের মারণযজ্ঞে

পূর্ণাহুতি দেবার আয়োজনের জন্তেই কি দেশে দেশে কলালক্ষীদের স্তব্ধ করে দেবার এই সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা? এই কারণেই কি যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মনোরম, যা কিছু সত্য তারই উপর এই নিষ্ঠুর আক্রমণ? হয়তো তাই। যতদিন পর্য্যন্ত লোকের কণ্ঠে গানের সুর থাকবে, যতদিন কবি তার কাব্যের ভাষা হারিয়ে না ফেলবে, যতদিন শিল্পী তার তুলির টানের যাদু না ভুলবে, যতদিন সাহিত্যিকরা "মানবতার বিবেকের" প্রতিভূ থাকবে ততদিন সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের অস্ত্রের ঝনৎকার যুদ্ধোন্মাদনায় মেতে উঠতে পারবে না। তাই দেশে দেশে এবং আমাদের এখানেও সারা দেশ জুড়ে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি আর মানবতার উপর এই পুলিশী তৎপরতার নমুনা।

এই অভিযানের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হবার জন্তে সকলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আবেদন জানাচ্ছি সাহিত্যিক, শিল্পী আর সংস্কৃতি-সেবীদের কাছে—রাজনীতিগত ভাবে তাঁদের মধ্যে বিরোধ হয়তো আছে, আঙ্গিক সম্বন্ধেও হয়তো সবাই একমত নন, কিন্তু সকলের শিল্পের বিকাশের জন্তেই তো চাই প্রকাশের স্বাধীনতা। আবেদন জানাচ্ছি তাঁদের কাছেও যাঁরা শখের যাত্রার দল বেঁধে গ্রামের চণ্ডীতলায় অভিনয় করেন—যাঁরা সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর শহরের ফুটপাতের উপর চট বিছিয়ে ঢোল করতাল নিয়ে গানের আসর জমান—বিভিন্ন পাড়ায় যাঁরা ক্লাব ঘরে কিংবা কারও বৈঠকখানায় নাটক কিম্বা গানের মহড়া দেন। এ আবেদন তাঁর উদ্দেশ্তেও যিনি গান শুনতে ভালবাসেন, অভিনয় দেখে এসে নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে আলোচনা করেন, সুন্দর ছবি দেখলে যাঁর মনে নাড়া লাগে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি ক্ষণকাল তাকিয়েও যিনি আনন্দ পান, শিশুর অনাবিল হাসি যাঁর অন্তরকে স্পর্শ করে। সবাই মিলিতভাবে এগিয়ে আসুন, দৃপ্ত ঘোষণাধ্বনি উঠুক উদাত্তকণ্ঠে: কলালক্ষীদের স্তব্ধ হতে আমরা দেব না। কলালক্ষীর বীনাধ্বনিকে আরও উচ্চতর মার্গে তুলব, অস্ত্র যাতে মুখর হয়ে না ওঠে।

অনুপমা রায়

পাঠকগোষ্ঠী

পরিচয়-এর শ্রাবণ সংখ্যা

"পরিচয়"-এর শ্রাবণ সংখ্যা পড়লাম। পড়ে যেমন অত্যন্ত আশান্বিত হয়েছি আবার তেমনি আশঙ্কিতও হয়েছি। "পরিচয় এর পথ" শীর্ষক বক্তব্যে যা বলা হয়েছে তা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার এবং এই পথে এগোলেই আজ আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে সাহিত্যকে তার অগ্রণী ভূমিকায় দাঁড় করানো সম্ভব হবে। সঙ্কীর্ণতার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে থেকে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার ব্যাপক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে তার মূল ভিত্তি; আর তার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে মার্কসবাদ। একথা আজ পৃথিবীর অর্ধেক সংখ্যক লোক কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করে দিয়েছে—সুতরাং এ সম্বন্ধে সন্দেহ বা দ্বিধার প্রশ্ন আজ খুবই কম। কিন্তু এই মার্কসবাদকে তো দেখেছি বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দেশে বিকৃতভাবে প্রয়োগ করে বিকৃত ব্যাখ্যাও করেছেন। আমাদের দেশের খুব হালের ঘটনাও তার প্রমাণ। "মার্কসবাদ" বলে তো আজ শুধু চিৎকার করলেই হবে না—তাকে যেমন আয়ত্ত করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, আবার ঠিক তার সঠিক প্রয়োগক্ষমতাও অর্জন করতে হবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে। দুটির একটিকে বাদ দিলে মার্কসবাদের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। আপনারাও এই পথ গ্রহণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখছি আপনারা প্রথমেই ব্যর্থ হয়েছেন। "পরিচয়-এর পথে" আপনারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে "পরিচয়" হবে সাম্রাজ্যবাদ-বড় বুর্জোয়া-সামন্ত নৃপতিদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে প্রগতিশীল সাহিত্যিক, শিল্পী ও জনগণের প্রধান হাতিয়ার। এখানে আপনারা যেমন বলেছেন "সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি 'পরিচয়ে'র পাতায় প্রধান স্থান" দেবেন, তেমনি বলেছেন "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এই যুক্তফ্রন্টে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির স্থানও পরিচয়-এর পাতায়" থাকবে। এই প্রসঙ্গে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী ও তার অগ্রগামী মার্কসবাদী দল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করলেও ব্যাপক ভারতীয় জনতার অবিসংবাদী নেতা এখনও হতে পারেনি। এই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে তাঁদের কাজ—তবেই জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে

চূড়ান্ত জয়লাভের নিশ্চয়তা। কিন্তু জোর করে তো এই প্রাধান্য বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এর জন্য চাই অবিচল নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে সকল ক্ষেত্রে আদর্শগত ও নীতিগত লড়াই। এদিক দিয়ে বিচার করলে "পরিচয়"-এর শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথমেই "পার্টি সাহিত্য ও পার্টি সংগঠন" একটা খাপছাড়া অসময়োচিত (লেনিনের হলেও) প্রবন্ধ, যা প্রকাশ করা উচিত হয় নি। এটি পরে দিলে "পরিচয়"-এর আসল ও আশু জরুরি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কাজটা আরও ফলবতী হত। তা না করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন কলেবরে প্রকাশিত এই প্রথম সংখ্যাটিতে এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করায় সঙ্কীর্ণতাবাদের ছোঁয়াচ থেকে যাচ্ছে বলে মনে হয়। অবশ্য আপনারা মার্কসবাদীরা তা মনে নাও করতে পারেন, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বহু প্রগতিশীল সাহিত্যিক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী তা মনে করছেন—এ সম্বন্ধে আমি অনেকের মুখে অভিযোগ শুনেছি। 'পরিচয়'কে তাঁরা অত্যন্ত ভালবাসেন এর স্ট্যাণ্ডার্ড, রুচি ও সুষ্ঠু আঙ্গিক-সজ্জার ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। কিন্তু এটার সুযোগে মাঝে কিছুদিন যেমন "পরিচয়"কে (গোলাম কুদ্দুস ও সরোজ দত্তের সময়) মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাঁদের সম্পত্তি করে তুলেছিলেন, আজও প্রথম সংখ্যায় প্রথমেই লেনিনের ঐ প্রবন্ধ প্রকাশ করায় সেই পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যাচ্ছে বলে মনে করি। এতে প্রথমেই বহু সৎ প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিককে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টে টেনে আনার পরিবর্তে তাঁদের দূরে ঠেলে দেওয়া হবে। কিন্তু এটাই কি ভারতের জনগণের এখনকার লক্ষ্য ? আমার এই বক্তব্যের ফলে মনে করবেন না যে, তা বলে আদর্শগত লড়াই করতে আমি নিষেধ করছি। তা করলে আমাকে ভুল বুঝবেন। কিন্তু সব কিছুই আমাদের করতে হবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে। জনতার চেতনাকে আমাদের তুলে ধরতে হবে, কিন্তু চেতনার স্তরের বাইরে আমরা কিছু করে ফেললে তা হবে হঠকারিতা, আর তার ফলে আমরা হব বিচ্ছিন্ন, "যুক্তফ্রণ্ট" হবে ক্ষতিগ্রস্ত। তাই অত্যন্ত বুঝে শুনে চলা দরকার। আর আইয়ুব সাহেবের সে লেখাটা "পরিচয়"-এ বহুদিন আগে বেরিয়েছে, অনেকের মনেও নেই ঠিক (অবশ্য আপনাদের মত কয়েকজন ছাড়া) ঘটনাটা। তাই আমার মনে হয়, শুধু লেনিনের প্রবন্ধটি তুলে না দিয়ে সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতিদের মত আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রবন্ধ ও লেনিনের বক্তব্য পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে এক সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখলে দেবীবাবু

(অনুবাদক) আরও উৎকটভাবে আমাদের দেশের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চোরাকারবারীদের মুখোশ খুলে ধরতে পারতেন। এটা হলে খুব ভালো হত। সেইদিক থেকে উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করি—সমস্ত লেখক-পাঠকদের এ বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষালাভের দিক থেকে অন্তত।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কোরিয়া" প্রবন্ধটি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে শেষ করব। প্রবন্ধটি সুলিখিত ও সুপাঠ্য হয়েছে। নারায়ণবাবু সমস্ত ঘটনাটা অত্যন্ত সহজ সুন্দর ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন; প্রবন্ধ পড়তে সাধারণত পাঠকদের ভাল লাগে না—এটা কিন্তু ভাল লাগবে। তবে "কমিউনিস্ট চীনকে তেল বিক্রি করা" নিয়ে বৃটেনকে শান্তিকামী দেখাতে যাওয়ার ধরনটা বেশ পরিষ্কার ও সঠিক হয়নি। বৃটেনের শান্তিকামী জনগণের চাপ ও সরকারের যুদ্ধনীতিটা যদি তুলে না ধরা যায়, তাহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে—যা হতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। "তৃতীয় মহাযুদ্ধ হবে না?" উত্তরে প্রবন্ধ লেখক বলেছেন—"হবে"। একথা বলে দেওয়া মারাত্মক অন্যায় বলে মনে করি। "হবে না" বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করাও ঠিক নয়। অসম্ভব করে তুলতে হবে ও তা সম্ভব—এই কথাই শেষে বলা উচিত ছিল। এ বিষয়ে আশা করি "পরিচয়"-এর পাতায় উত্তর পাব।

এ ছাড়া "পরিচয়"-এর শ্রাবণ সংখ্যা সত্যই এবারে ভাল হয়েছে। "পরিচয়"সমস্ত বাঙালীর নিজস্ব অতি প্রিয় মুখপত্র হয়ে উঠুক অতি শীঘ্র—এই কামনা করি।

গোবিন কাঁড়ার

'প্রগতি লেখক সংঘের খসড়া বিবৃতি'

পঞ্চম সংখ্যা "মার্কসবাদী" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র গুপ্ত প্রগতি সাহিত্যের নিরিখ বিচারে যে একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার জন্য আমাদের সাহিত্য-আন্দোলন বিপুল ক্ষতি সহ্য করেছে। অর্থাৎ যে সময়ে আমাদের ফ্রন্টকে বহুবিস্তৃত করার প্রয়োজন ছিল, সে সময়ে আমাদের সংঘ বন্ধদরজার নীতি অবলম্বন করেছিল। তাই রবীন্দ্রবাবুর থিসিসের উপর কঠোর সমালোচনা সঙ্গত এবং আশা করা যায় এর মধ্যে দিয়ে এক সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু ভুল ধরা পড়ার পর বহুদিন গত হলেও এবং সাহিত্য সম্বন্ধে

বিদেশের এবং বিশেষ করে চীনের বহু মূল্যবান দলিল আমাদের নজরে এলেও এখনও পর্যন্ত আলোচনা কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রয়েছে, তা থেকে যে বিশেষ এগিয়েছে মনে হয় না। এদিক থেকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "পরিচয়"-এ যথেষ্ট সাহসিকতার সঙ্গে আলোচনার জন্য "নিখিল ভারত প্রগতি লেখক এবং শিল্পী সঙ্ঘের" যে খসড়া বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত সময়োপযোগী। নতুন সাহিত্যিক হিসেবে এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

কিন্তু এত সত্ত্বেও উল্লিখিত খসড়াতে যে ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি দেখা দিয়েছে, আমার বর্তমান চিঠিটিতে আমি সেগুলি সম্বন্ধে লিখতে চেষ্টা করব

(১) প্রথমত, খসড়া-প্রস্তাবটিতে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে "জনগণের হিতকামী" "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী" সকল দলমতশ্রেণীর সাহিত্যিক, শিল্পীদের আহ্বান জানানো হয়েছে, এমন কি কৃষকশ্রেণীর নিজস্ব লোককবিদেরও বাদ দেওয়া হয়নি, কিন্তু খসড়া প্রস্তাবটির কোথাও শ্রমিক-শ্রেণীর নাম উল্লেখ নেই। এর কারণ কি?—শ্রমিকদের ভিতর কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী জন্মগ্রহণ করেন না, না অন্য কিছু? অথচ প্রগতি লেখক-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বহু ব্যক্তিই জানেন যে বোম্বাই এবং কলকাতার ট্রাম-শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক আছেন। অবশ্যই শিল্পের চমক তাঁদের কম। আমরা জানি, যে কোনও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মেরুদণ্ডই শ্রমিকশ্রেণী, অবশ্য কৃষক এবং পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির সহযোগিতায়। রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতিগত আন্দোলনে যে চীনের নেতৃত্বকে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি, সেখানেও "সাহিত্যে এবং শিল্পে সংযুক্ত ফ্রন্ট" সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কুয়ো মো-জো লিখেছেন,"চীনা বুর্জোয়া শ্রেণী সাহিত্যে ও শিল্পে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় নামতে চাইলেও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে" এবং তিনি সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন নূতন সংস্কৃতির জয়ের মূলে নির্বিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব। এবং অপরাপর শ্রেণীগুলি নেতৃত্বগ্রহণে অক্ষম কেন এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "The petty-bourgeoisie and the national bourgeoisie can be allies of the working class in the anti-imperialist struggle, neither of these classes has the qualifications for leading the revolution. The national bourgeoisie, although oppressed by imperialism, still have many ties with the imperialist rulers

and feudal landlords. They therefore tend to vacillate between the revolutionary and the reactionary camps. Deep in their hearts, they fear a real revolutionary movement of the people, and they are inclined to compromise with the enemy before the revolution has reached its final goal. The petty-bourgeoisie are also unable to play a leading role in the liberation movement, for as a class they are also irresolute and often inclined towards opportunistic extremism and advanturism. It is the working class alone that can remain brave, confident, faithful, steadfast, thoroughgoing and unselfish throughout all the stages of the revolution to its very end." (People's China, No 4., Vol I., Editorial)

শ্রেণী সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা সংস্কৃতিক্ষেত্রেও সঠিক। অবশ্য প্রশ্ন আসতে পারে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার মত যোগ্যতা ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর আছে কি না? এই যোগ্যতা যে আছে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ভারতের শ্রমিক শ্রেণী দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা, করাচী, বোম্বাই, অমলনীরে বারবার চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের প্রতি তাঁদের পরম অবিচলতা প্রদর্শন করেছেন। অবশ্যই নেতৃত্বে "শ্রমিক শ্রেণীকে আনা হোক"—এই স্লোগানের অর্থ এমন নয় যে শিক্ষাগত মান বিচার না করে যান্ত্রিকভাবে শ্রেণীগত জন্মের দিক থেকে বিচার করা হোক। কিন্তু যেহেতু শ্রমিক শ্রেণী অত্যন্ত দ্রুত শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম, সেহেতু বিশ্বাস রাখা যায় যে, শিক্ষা পেলে শ্রমিক শ্রেণী অল্প সময়ের মধ্যেই নেতৃত্বে আসবার যোগ্যতা অর্জন করবেন।

(২) খসড়াপ্রস্তাবে "জনগণের হিতসাধন" এবং "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী" এই দুটি কথা বলা হলেও সামন্তবাদ-বিরোধিতার কথা উল্লেখ নেই। এর অর্থ, হয় খসড়ার লেখকেরা সাহিত্যক্ষেত্রে "সামন্তবাদের ধ্বংসাবশেষের" অর্থ জানেন না অথবা বর্তমান পর্যায়ে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে তাঁরা লড়তে প্রস্তুত নন। মনে হয় শেষেরটিই সত্যি। তার কারণ, কমরেড মাও-এর সংজ্ঞা অনুসারে "সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদ-বিরোধী নতুন সংস্কৃতির রূপটা জাতীয়, তার মর্মবস্তু হল বিজ্ঞানসম্মত এবং জনপ্রিয়।" এবং আমরা জানি, সামন্তবাদ চিরকালই ধর্ম এবং ইন্দ্রজালের পক্ষপাতী, বিজ্ঞানের সঙ্গে তার 'আদায়

কাচকলার সম্বন্ধ'। তিনি আরও বলেছেন, "এ আন্দোলন (নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলন) সামন্তবাদী চিন্তাধারা এবং কুসংস্কারের বিরোধী; ন্যায়-অন্যায়ের বিচারে এ আন্দোলন কেবল বাস্তব ঘটনারই অনুশীলন করে। বাস্তব সত্য ছাড়া অন্য কিছুই এ গ্রাহ্য করে না; এ আন্দোলন তত্ত্ব এবং ব্যবহারের ঐক্য চায়।" অর্থাৎ ধর্মগত কুসংস্কারের উচ্ছেদ, সামাজিক অবিচারের প্রতিকার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, নারীমুক্তি-আন্দোলন ইত্যাদি যে সকল জিনিস সোজাসুজি সামন্তবাদের অচলায়তনকে আঘাত করে, সেগুলির জন্য যে লেখক এবং শিল্পী নিজের শিল্পকলাকে উৎসর্গ করতে চান, তাঁরাই আমাদের সহযোদ্ধা। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে মনে রাখা দরকার, "জনগণের হিতসাধন" "স্থায়ী শান্তি" ইত্যাদি বুলি আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক ভারতে সাম্রাজ্যবাদের অনুগৃহীতরা এবং সামন্তবাদীরা বারবার নিজেদের শোষণের দুর্গকে কায়েম রাখার জন্য ব্যবহার করে। প্রগতিশীল হিসেবে আমাদের বোঝা দরকার যে, দীর্ঘদিনের বিদেশী শাসন এবং সামন্তবাদী জোয়াল থেকে জনগণকে মুক্ত করতে না পারলে জনগণের সত্যকার হিতসাধন কিংবা স্থায়ী শান্তি কোনটিই সম্ভব নয়।

(৩) বর্তমান খসড়াপ্রস্তাবটির কোথাও সাম্রাজ্যবাদী দেশ এবং অন্য দেশের প্রগতিশীল লেখকদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। অথচ আমরা জানি, ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, আমেরিকায় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের দেশের পরস্বাপহারীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন চালাচ্ছেন। এবং মার্ক্সবাদ আমাদের এই শিক্ষাই দেয়, শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে সত্যকার জাতীয়তার কোনও বিরোধ নাই। বরং বিদেশের প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের ধারাকে মেলাতে পারলে আন্দোলন যথেষ্ট শক্তিশালী হবে অপরদিকে যোগাযোগ না রাখলে আমরা যে কোনও মুহূর্তে "জাতীয় গোঁড়ামি"র পাঁকে ডুবতে পারি।

(৪) সমস্ত খসড়াটিতে জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবার কথা কোথাও বলা হয়নি, অথচ আমরা জানি জনগণের চেতনায় অনেক জিনিস ঠিক ঠিক রূপ পরিগ্রহ করে। এবং যদি আমাদের সকল লেখা এবং শিল্পকলাকে আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হয়

তবে আমাদের "বাস্তবতার গভীরে" ডুবতে হবে এবং সেখানে জনগণই হবেন আমাদের প্রধান শিক্ষক।

(৫) অবশ্যই ভারতের আন্দোলনের এই পর্যায়ে আমরা লেখকদের কাছ থেকে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি আশা করি না, কারণ কোনও দেশে সোশ্যালিজমের বিজয় না হওয়া পর্যন্ত তা হওয়া অসম্ভব। কিন্তু বাস্তব চরিত্রচিত্রণের দিক থেকেও সোভিয়েট আর্ট যে মহান স্তরে পৌঁছেছে তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য আমরা আমাদের সাহিত্যিকদের কাছে দাবি করতে পারি।

মণীন্দ্র দাশ

'বক্সা ক্যাম্পে শিল্পী-সাহিত্যিক'

গত শ্রাবণ সংখ্যা "পরিচয়"-এর পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় "বক্সা ক্যাম্পে শিল্পী-সাহিত্যিক"দের বিনাবিচারে বন্দী দিনযাপন সম্বন্ধে কিছু বলেছেন। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বার্থান্ধ শাসকগোষ্ঠী যেমন দেশের ভাবুক সমাজের স্বাদেশিকতা ও সমাজ-সচেতনাকে টুঁটি চেপে স্তব্ধ করার জঘন্য ইচ্ছার পরিচয় প্রকাশ্যে বহন করছেন, ভারতীয় সাহিত্যিক-শিল্পী সমাজ কিন্তু তার উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক আন্দোলন বা প্রতিবাদের সক্রিয় চেষ্টায় অংশ গ্রহণ করছেন না। বে-আইনী পশুশক্তির যথেচ্ছাচারের উপযুক্ত প্রতিবাদ যদি এ দেশের সাহিত্যিক সমাজ থেকে উচ্চারিত হত তাহলে হয়তো আরও অনেক 'ষড়যন্ত্র'-নিরপেক্ষ সাহিত্যিককেই বর্তমানে বক্সায় বা অনুরূপ অন্য কোনখানে পিঞ্জরাবদ্ধ হতে হত; কিন্তু তাতে এ দেশের এবং আমাদের সাহিত্যিকদেরও শেষ পর্যন্ত মঙ্গল হত। তাই বিশেষভাবে উপলব্ধি করছি, মানিকবাবুর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি সমস্ত শিল্পী-সাহিত্যিকদের মুখ থেকে উচ্চারিত হোক, নইলে এই হতভাগা দেশের মঙ্গল এখনো সুদূরপরাহতই থাকবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর বিজেন্দ্র নন্দী এই দু-জন সাহিত্যিককে আমি অন্তত কিছুটাও জানি; তাতে এঁদের এটুকু পরিচয় অন্তত পেয়েছি, সাধারণ মানুষের এক নিকট বন্ধু সচরাচর পথেঘাটে মেলে না। এঁদের অপরাধও বোধহয় এই—এঁরা সাধারণ মানুষের বন্ধু; আর এই অপরাধের ক্ষমা বর্তমান গণতন্ত্রী দেশগুলিতে হয়তো কোথাও মেলে না। তবু অন্তত একজন শিল্পী

বা সাহিত্যিকের সাধারণ নাগরিক স্বাধীনতার উপর এমন বর্বর হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে অন্তত সে দেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা প্রতিবাদের ঝড় তুলতেন। এই আফিং-খাওয়া দেশে আমরা পরস্পর লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠীকে গাল দিয়ে, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছি ; কিন্তু পাশবিকতার প্রতিরোধে এখন থেকেই যদি ভারতীয় সাহিত্যিক সমাজ-সক্রিয় পথ অবলম্বন না করে তাহলে একদিন সমগ্র সাহিত্যিক সমাজকেই শাসকগোষ্ঠীর শিকার হতে হবে। সেদিন নিরপেক্ষ সাহিত্যিককে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে আত্মবিক্রয়ের মাধ্যমে অথবা আত্মবিলোপে। এ-বিষয়ে এ দেশের প্রবীণ ও তরুণ লেখকদের ভাববার সময় কি আজও আসেনি ?

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রতিবাদ

গত শ্রাবণের 'পরিচয়ে' অমূল্য দেব লিখিত "হানা" গল্প প্রসঙ্গে আমার সামান্য বক্তব্য আপনাদের জানাচ্ছি। "হানা" গল্পটি অমূল্যবাবু নিজের মৌলিক রচনা বলে দাবি করেছেন। এ দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। পরিচয়ের কোন লেখক যে এরকম মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবেন, এ বড়ই দুঃখের।

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের Esquire পত্রিকায় প্রকাশিত Curt Riess রচিত "Friend of the abergruppenfuehrer" গল্পের প্রায় হুবহু অনুবাদ অমূল্য দেব রচিত "হানা" গল্পটি। মৌলিকতা অবশ্য আছে অমূল্যবাবুর। তিনি ফ্রান্সের স্থানে মালয়, Lucien Arocat-এর জায়গায় রোনাল্ড ও Himmler-এর আসনে ম্যাকডোনাল্ডকে বসিয়েছেন।*

সলিল ভট্টাচার্য

* শ্রীঅমূল্য দেবের "হানা" গল্পটি সম্পর্কে পাঠকদের কাছ থেকে বহু আপত্তি ও সমালোচনামূলক চিঠিপত্র সম্পাদকদের হাতে এসেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ-সম্বলিত চিঠিটি উপরে ছাপা হল। সলিলবাবু তাঁর এ অভিযোগ প্রমাণও করেছেন এবং যদিও এ-ব্যাপারে পত্রিকা-সম্পাদকদের চেয়ে লেখকের ত্রুটির বহর ও দায়িত্ব কম নয়, তবু পাঠকগোষ্ঠী ও লেখকের মধ্যবর্তী হিসেবে সম্পাদকেরা আগে থাকতেই পাঠকবর্গের কাছে তাঁদের এই অনিচ্ছাকৃত অথচ মারাত্মক ত্রুটির জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। লেখককেও আমরা এ-ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য বলবার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি।

—যুগ্ম-সম্পাদক

আলোচনা

'পরিচয়ের পথ' বলে আলোচনা-বিভাগে গতবার যে খসড়াটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে লেখকের স্বাক্ষর না থাকাতে অনেকে ওটিকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সম্পাদকীয় খসড়া বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু তাঁদের এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। খসড়া হিসেবেই ওটি প্রণয়নের ভার সম্পাদক-মণ্ডলী দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত নরহরি কবিরাজকে। তিনি তা প্রণয়ন করেন, সম্পাদক-মণ্ডলীর কেউ কেউ তা দেখেনও; কিন্তু সম্পাদক-মণ্ডলী তাকে গ্রহণ করে নিজেদের খসড়া বলে উপস্থিত করেছেন, এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। এ জন্যেই একে 'আলোচনা' বিভাগে আলোচনার সূচনা হিসেবে 'খসড়া' রূপেই উপস্থিত করা হয়েছে—সে কথা লেখাটির শেষ দিকেও পরিষ্কার। 'পরিচয়ের পথ' পাঠক-লেখক-সম্পাদক ও জনসাধারণ সকলের আলোচনা-সমালোচনায় স্থিরীকৃত হবে, এটাই পরিচয়-পরিচালিকদের মত। অতএব, আলোচনা-সমালোচনার জন্যে সকলকে তাঁরা সাদরে আহ্বান করছেন,—শুধু যেন সুহৃদ্‌বর্গ মনে রাখেন পুনরুক্তি বর্জনীয়, এবং "brevity is the soul of wit".

বর্তমান সংখ্যায় 'পরিচয়-এর পথ' সম্পর্কে কোনও আলোচনা সম্পাদকদের হাতে এসে না পৌঁছনোয় বাধ্য হয়ে 'আলোচনা' স্থগিত রাখতে হল। পরবর্তী শারদীয় সংখ্যাতেও অন্যান্য বিভাগের মত এ বিভাগটিও বন্ধ থাকবে। তারও পরবর্তী সংখ্যা থেকে আবার যথারীতি 'আলোচনা' শুরু হবে।

—যুগ্ম-সম্পাদক

ত্রুটি স্বীকার

গত শ্রাবণ সংখ্যা "পরিচয়"-এ ১৯ পৃষ্ঠায় শেষ প্যারাগ্রাফে "ইন্দোচীনে হো-চি-মিনকে"-এর জায়গায় "ইন্দোনেশিয়ায় হো-চি-মিনকে" এবং ২৬ পৃষ্ঠায় তৃতীয় প্যারাগ্রাফে "ফরমোজা এবং ইন্দোচীনে"-এর জায়গায় "ফরমোজা এবং ইন্দোনেশিয়ায়" ভ্রমক্রমে মুদ্রিত হয়েছে। দু-জায়গাতেই একই ধরনের ভুল হওয়ায় ভুলটি ইচ্ছাকৃত মনে করার কারণ ঘটলেও ওটি মুদ্রাকরপ্রমাদই। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্যে আমরা পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

—যুগ্ম-সম্পাদক

প্রবন্ধ

মার্কসবাদীর চোখে পৌরাণিক ভারত

এ. ডায়াকভ

[শ্রীযুক্ত দাঙ্গের "ভারতবর্ষে আদিম সাম্যতন্ত্র থেকে দাসব্যবস্থা" (India From Primitive Communism To Slavery) শীর্ষক ইংরেজিতে লেখা এই আলোচ্য বইটি গত ১৯৪৯ সালে প্রথম প্রকাশের পর দেশ-বিদেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ সাড়া পড়ে যায় এবং বইটি তাঁদের দ্বারা বিপুলভাবে সমর্থিত হয়। ইংলণ্ডের "লেবর মান্থলি" পত্রিকার সমালোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রজনী পাম দত্ত বইখানিকে ভারতের মার্কসবাদী সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট অবদান বলে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, "মডার্ন কোয়ার্টারলি" পত্রিকাতেও বইটির প্রশংসাসূচক সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এদেশে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই বইটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়। শুধু তাই নয়, পোলাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রীয় পুস্তক-প্রকাশালয়গুলি এর প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান পিপ্‌লস পাবলিশিং হাউস-এর কাছে পোলিশ ও চেক্ ভাষায় বইটি অনুবাদ করার ও পুনর্মুদ্রণের অনুমতি চেয়ে পাঠান। কিন্তু এ-সমস্ত সত্ত্বেও এদেশের কোন কোন তথাকথিত মার্কসপন্থী গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে "অ-মার্কসবাদী", "সংস্কারপন্থী" ও "হিন্দু রিভাইভালিস্ট" আখ্যা দিয়ে পাঠক-সাধারণকে বেশ কিছুটা বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হন। বিশেষ করে আমাদের দেশের পাঠকদের এই বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যেই ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাত সোভিয়েট প্রবন্ধকার এ. ডায়াকভের এই রচনাটির অনুবাদ নিচে প্রকাশ করা হল।

শ্রীযুক্ত ডায়াকভের এই পুস্তক-পরিচিতিটি রুশ ভাষায় সর্বপ্রথম ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৯নং "প্রব্লেম্‌স অব হিস্ট্রি" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত এই রচনাটি সেই মৌলিক রচনার প্রামাণ্য ইংরেজি অনুবাদের বাংলা। —সম্পাদক]

এস. এ. দাঙ্গের এই বইটি ভারতীয় কমিউনিস্ট সাহিত্যে একটি অসাধারণ অবদান এবং এটি সোভিয়েটের পাঠকদের গভীর মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে। গ্রন্থকার নিজে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং তার কেন্দ্রীয় কমিটির অনেক সদস্য। গত ১৯২০ থেকে তিনি ভারতবর্ষের বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছেন।

১৯২০ সালে ছাত্রাবস্থাতেই এস. এ. দাঙ্গের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা। ঐ বছরেই ইউ. এস. এস. আর-এর মহান অক্টোবর সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতবর্ষে সেই সর্বপ্রথম একটি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সংগঠিত হয়। সে সময়ে ভারতে প্রথম কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। দাঙ্গে ছিলেন এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠীটির অন্যতম নেতা ও সংগঠক। এই গোষ্ঠীটি গড়ে উঠেছিল বোম্বাইয়ে।

১৯২২ সালে দাঙ্গের উদ্যমেই ভারতবর্ষের প্রথম কমিউনিস্ট মতাবলম্বী সাপ্তাহিক "দি সোশ্যালিস্ট" প্রকাশিত হয়। ভারতের বৃটিশ শাসকেরা ১৯২৪ সালে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দেয়; ঐ বছরেই তথাকথিত "কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র" মামলার দায়ে দাঙ্গেকে এবং আরও বহু কমিউনিস্টকে তারা গ্রেপ্তারও করে। বিচারে দাঙ্গের চার বছর কারাদণ্ড হয়। ১৯২৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই তিনি বোম্বাইয়ে সুতাকল শ্রমিকদের এক বিরাট ধর্মঘট সংগঠনে লেগে যান। তাঁর নেতৃত্বেই বোম্বাইয়ের সুতাকল শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন, গির্‌নি-কামগর ইউনিয়ন গড়ে ওঠে; ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের অগ্রগতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই ইউনিয়নটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐ বছরেই (১৯২৮ সালেই) প্রথম কমিউনিস্ট-মতাবলম্বী পত্রিকা "ক্রান্তি" ("বিপ্লব") মারাঠি ভাষায় প্রকাশিত হয়।

১৯২৯ সালে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে দাঙ্গে আবার গ্রেপ্তার হন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে এই মামলাই "মীরাট (ষড়যন্ত্র) মামলা"* (১৯২৯-৩১) নামে কুখ্যাত। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটির ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আদালতে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মীরাট মামলার বন্দীরা ভারতের বৃটিশ দাস-শাসকদের এবং ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর জাতীয় সংস্কার-পন্থীদের আপসনীতির স্বরূপ সাহসের সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করে দেখান এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য ব্যাখ্যা করে বোঝান। ঐ বিচারে তাঁদের গুরুতর দণ্ড হয় (যেমন, দাঙ্গের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়)।

---

*১৯৪৯ সালের "প্রব্লেম্‌স অব হিস্ট্রি" পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় এন্‌, সোনিন-এর প্রবন্ধ "ভারতবর্ষে মীরাট মামলা ও শ্রমিকপন্থীদের ঔপনিবেশিক নীতি" দ্রষ্টব্য।

যাইহোক, এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে প্রতিবাদ-আন্দোলন গড়ে ওঠে, তার চাপে বৃটিশ শাসকেরা মীরাট মামলার বন্দীদের মুক্তি দিতে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়। ছাড়া পেতে না পেতেই বোম্বাইয়ের সূতাকল-শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গে আবার সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী কাজকর্ম শুরু করেন। ঐ সময়ে বোম্বাই প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল কংগ্রেস সরকারের উপর। ১৯৩৯ সালে ধর্মঘট সংগঠিত করার অভিযোগে এই সরকারের হাতে দাঙ্গে আবার গ্রেপ্তার হন। ছ-মাসের জন্যে কারাদণ্ড হয় তাঁর। ১৯৪০ সালে মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বোম্বাইয়ের সূতাকল-শ্রমিকদের একটি বড় রাজনৈতিক ধর্মঘটের নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে তিনি আবার গ্রেপ্তার হন ও জেলে যান। ১৯৪৩ সালে জেল থেকে ছাড়া পাবার পর দাঙ্গে সারা-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সংগঠিত করার কাজেও ঐ সময়ে তিনি সক্রিয় অংশ নেন এবং ঐ সংগঠনের কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ প্রতিষ্ঠানের কাজেই ১৯৪৬-৪৭ সালে দাঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও (ইওরোপের) নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলি পরিভ্রমণ করেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বোম্বাইয়ের শ্রমিকেরা তাঁকে বোম্বাই আইন-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করেন। এরপর ভারতের মেহনতী জন-সাধারণের স্বার্থে দাঙ্গে সক্রিয়ভাবে লড়াই চালিয়ে যান এবং নেহরু সরকার যখন কমিউনিস্টদের ও ভারতের অন্যান্য সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বর্বর দমননীতি প্রয়োগ করতে শুরু করে তখন তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে এখনও পর্যন্ত দাঙ্গে জেলেই আছেন এবং ভারত সরকার আজ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে কিনা এ সম্পর্কে তো বটেই—এমন কি, কী কী অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করা হবে, সে সম্পর্কেও মনস্থির করে উঠতে পারেনি।

অতঃপর, জেলে থাকা সত্ত্বেও, দাঙ্গে আবার বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির সদস্যপদে নির্বাচিত হন।

দাঙ্গে তাঁর এই আলোচ্য বইটি লিখেছেন বন্দী-জীবনযাপনের সময়ে এবং সেইজন্যেই বর্তমান ভারতীয় সমস্যাগুলি বইটির আলোচ্য বিষয় হতে পারেনি। সুদূর প্রাচীন যুগের সমস্যাগুলিই প্রধানত বইটির আলোচ্য

বিষয়। জেলে থাকার দরুণ দাঙ্গের পক্ষে তাঁর দেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী অনুধাবন করার সুবিধে ছিল না, সুযোগ ছিল না শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম ও কৃষক-আন্দোলন প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের। রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে তাঁর পক্ষে বিনা বাধায় শুধুমাত্র বেদ, ব্রাহ্মণ, মহাভারত প্রভৃতি হিন্দুদের পবিত্র ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্য ইত্যাদি পাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু এই অসুবিধা-জনক অবস্থার মধ্যে থেকেই দাঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে, ভারতবর্ষে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম চালালেন, সংগ্রাম চালালেন তাঁর দেশের মেহনতী জনসাধারণকে গান্ধীবাদের দূষিত প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্যে।

সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে দাঙ্গে হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থগুলিকে মার্কসবাদের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে জেল-শাসনে তিনি অসম্ভব রকম সীমাবদ্ধ যেটুকু সুযোগ-সুবিধে পেয়েছিলেন তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। এবং ভারতবর্ষের সমাজবিকাশের "বিশিষ্ট পথ"-এর কল্পনা এবং এই বিকাশের ক্ষেত্রে মার্কস-এঙ্গেলস্‌-লেনিন ও স্টালিন নির্ণীত সামাজিক বিকাশের নিয়মগুলি অপ্রযোজ্য এই ধারণা যে একেবারেই গাঁজাখুরি রূপকথার গল্পমাত্র—তা তিনি এইভাবে ফাঁস করে দিলেন।

ভারতবর্ষের বিকাশের বিশিষ্ট রাস্তা ও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে, এক কথায় বলতে গেলে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব মোটেই প্রযোজ্য নয়—ঠিক এই গান্ধীবাদী তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনই এই আলোচ্য বইটির কাজ। এইজন্যেই, সুদূর পুরাকালের ঘটনাবলী নিয়ে যদিও এই বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও বর্তমান সময়ের পটভূমিতেও বইটির আকর্ষণ অত্যন্ত বাস্তব হতে বাধ্য।

মুখবন্ধে গ্রন্থকার জানিয়েছেন, কী ভাবে কারান্তরালে বসে ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক মালমশলার উপর নির্ভর করে পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি বই লেখার কথা তাঁর মনে উদয় হল। "অল্প কিছুদিনের জন্যে কংগ্রেসী বন্দীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ আমায় দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে, যতক্ষণ আমি ব্যাপারটির গোড়ায় না ঘা দিচ্ছি, অর্থাৎ, যতক্ষণ না আমি ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভারতীয় সমাজে শ্রেণীসমূহ ও রাষ্ট্রের উত্থানের একটা মোটামুটি ইতিহাস তাঁদের সামনে উপস্থিত করতে পারছি, ততক্ষণ

তাঁদের খুশি করা যাবে না। এঁরা সবাই ছিলেন তাজা-মনের তরুণ, জানতে এবং বুঝতে সবাই উৎসুক।”

বইটির ভূমিকায় গ্রন্থকার ভারতীয় বুর্জোয়া ইতিহাস-রচনার বিকাশের বিভিন্ন স্তরের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ভারতবর্ষে আধুনিক ঐতিহাসিক-সাহিত্য কখনই পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত উদ্দেশ্যের অনুশীলন করেনি। এই সাহিত্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তৎকালীন বৃটিশ শাসনের বিরোধী ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগ্রামই প্রতিফলিত হয়েছে। “ভারতের ইংরেজ শাসকেরা ইতিহাসকে ব্যবহার করত বর্ধিষ্ণু স্বাধীনতা-আন্দোলনের মনোবল নষ্ট করার উদ্দেশ্যে, জনগণের নেতৃত্বকে মনের দিক থেকে পঙ্গু করে দেবার জন্যে। তারা প্রচার করত যে, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস, তার বয়স ও তার কীর্তিকলাপের তুলনায় ভারতবর্ষ ও তার জনসাধারণ নগণ্য; এবং এর যেটুকু ইতিহাস পাওয়া গেছে তা থেকে এই একটিমাত্র সিদ্ধান্তই করা চলে যে, চিরকাল বিদেশী আক্রমণকারীদের হাতে বিজিত ও শাসিত হওয়াই ইতিহাস এই দেশ ও এর জনসাধারণের ভাগ্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আমাদের ভৌগলিক অবস্থান, আবহাওয়া ও সংস্কৃতিই নাকি আমাদের জন্যে এই অপরিবর্তনীয় ভাগ্য নির্ধারিত করে রেখেছে।” (পৃষ্ঠা ২)

গ্রন্থকার লিখছেন যে, বৃটিশ ঐতিহাসিক ভাবধারার এই মৌল সিদ্ধান্তটির প্রতিবাদেই ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী—উনিশ শতকের শেষভাগে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে নিজেদের শ্রেণীর দখল কায়েম করতে সমর্থ হয়ে—গড়ে তোলে নিজেদের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ভাবধারা। এই শেষোক্ত ধারার মৌল কাজ ছিল এই কথাই প্রমাণ করা যে, ভারতবর্ষই হচ্ছে আসলে মানব-সভ্যতার লীলাভূমি, সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ কীর্তির উৎস এবং এটি এমন একটি দেশ যে প্রথম পৃথিবীকে সভ্যতার আলো দেখিয়েছে। “আমাদের ইতিহাস-বিদ্‌রা প্রমাণ করতে চাইলেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের সূচনাই প্রায়, বলতে গেলে, বর্তমান মানুষের ও পৃথিবীর ইতিহাসের সূচনা; বর্তমানে এদেশে যে আর্যজাতির বাস—কয়েক হাজার বছর আগে সেই আর্যদেরই পূর্ব-পুরুষ উত্তর মেরু অঞ্চল থেকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ভারতবর্ষে তারা যে কীর্তি রেখে গেছে তা এ পর্যন্ত মানুষ যা কিছু করেছে তার মধ্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠ তো বটেই ভবিষ্যতেও এর তুল্য কিছু করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।”(ঐ)

প্রচুর পরিমাণে ঐতিহাসিক কাঁচামাল সংগ্রহ করে এবং বহু ঐতিহাসিক তথ্য ও দলিলপত্র প্রভৃতি সাধারণ্যে প্রকাশ করে ভারতীয় ইতিহাসবেত্তারা যে ভারতে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের বিকাশের পথে অনেকখানি সাহায্যও করেন, দাঙ্গে এই ভূমিকায় সে কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "কিন্তু এ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদানকে উপস্থাপিত করা হয়েছে একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে—কী করে ইওরোপীয় (বৃটিশ) লেখকদের দ্বারা প্রচারিত ভারতীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করা যায়···কাজেই, উনিশ শতকের শেষভাগে ও বিশ শতকে আমাদের জ্ঞানীগুণীদের হাতে ইতিহাস-রচনা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সংগ্রামে একটি মতাদর্শগত অস্ত্রবিশেষ। এরই মারফত প্রাচীনত্ব, জাতিগৌরব, আমাদের পৌরাণিক পূর্বপুরুষদের কীর্তিকলাপ ও জ্ঞানগরিমা প্রভৃতির দাবিতে জাতীয় স্বাধীনতার দাবি জানান হত এবং এর পাঠকবর্গকে আক্রমণকারীকে অগ্রাহ্য করতে এবং তার কাছে নতিস্বীকার না করতে অনুপ্রাণিত করা হত, অনুপ্রাণিত করা হত আমাদের সুপ্রাচীন ইতিহাসের নজির দেখিয়ে আমাদের বর্তমান অস্তিত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধে আস্থাশীল হতে।" (পৃষ্ঠা ৪-৫)

গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে, এই ঐতিহাসিক ধারাটি এই জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীরই স্বার্থরক্ষা করেছিল এবং মেহনতী জনতার রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ সাধন ও তাদের বিপ্লবী সংগ্রামের স্তরে উন্নীত করার আদর্শে নিজেকে নিয়োজিত করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা এর ছিল না। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন, "এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধ-পরবর্তী সংকট সময়ের আগে পর্যন্ত জনসাধারণের এক বিরাট বৃহত্তম অংশ বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবী অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করেনি। ১৯০৫ সালের সংকটের আগে পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীরা জনসাধারণকে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করার ও এই উদ্দেশ্যে তাদের মুখে প্রয়োজনীয় স্লোগান দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে খুব কমই জনসাধারণের সঙ্গে মিশেছেন। সেই সময়ে পেটি-বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও উদারনীতিক বুর্জোয়া শ্রেণী—যারা তাদের ঐতিহাসিক রচনাবলীর মারফত নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করত—সবেমাত্র ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ('ডমিনিয়ন স্টেটাস') দাবির ভিত্তিতে তাদের কর্মসূচী নির্ধারণ করছিল, অর্থাৎ তারা যে শাসক সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া গোষ্ঠীর সমান পর্যায়ে—তাদের মত একই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র

প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার পর্যায়ে উন্নীত হবার যোগ্যতা রাখে, এই দাবি জানাচ্ছিল।"
(পৃষ্ঠা ৫)

'দাঙ্গে এই ঐতিহাসিক ধারার বহু ভারতীয় গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করেছেন, যাঁদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের তিলক, রাজওয়াড়ে, রানাড়ে, সরদেশাই, পাণ্ডে, কুন্তে, ভাণ্ডারকার, কেত্কার এবং অন্যান্যদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন যে, মতাদর্শের দিক থেকে এই সমস্ত বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা ছিলেন একেবারে হাপমারা ভাববাদী এবং এঁদের রচনাপদ্ধতির সমস্তটুকুই তত্ত্বের ক্ষেত্রে এঁদের নিজেদেরই বিরুদ্ধপক্ষ—বৃটিশ বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে ধার করা। এর উদাহরণস্বরূপ, "শ্রীযুক্ত বসু (জনৈক বাঙালী ঐতিহাসিক—এ. ডায়াকভ) লিখিত প্রকাণ্ড গ্রন্থে বৃটিশের সততার সম্পূর্ণ অভাব এবং তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও দুর্নীতির ব্যাপক প্রয়োগ এবং দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় শাসকদের পক্ষে এগুলির বিরুদ্ধে সমান তালে বুঝতে না পারাকেই বৃটিশের সাফল্যের কারণ হিসেবে দর্শানো হয়েছে। তাঁদের মতে সমগ্র ঐতিহাসিক অগ্রগমনই এইরকম মানুষের চিন্তাধারার, রাজনীতিজ্ঞ ও নেতৃবৃন্দের পাপপুণ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁদের মতে, কোটি কোটি মেহনতী মানুষ, যুগ যুগ ধরে মানুষের এই সমাজদেহের অগ্রগমন—এ সমস্তই হচ্ছে ইতিহাসের "রথী-মহারথী", "গুরু" ও "অবতার"-দের খেয়াল-খুশি ও অন্ধ সংস্কারের, নীতিবোধ ও ধর্মবিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। এঁদের কেউ বা এই মৌল চালকশক্তির সন্ধান পেয়েছেন অসাধারণ ব্যক্তিবিশেষদের মধ্যে, আবার কেউ বা তার সন্ধান পেয়েছেন অমুক বর্ণের (caste) বা জাতির (race) বা তমুক বর্ণের বা জাতির জন্মগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে।

"কিন্তু তাই যদি হবে, তা হলে এত সমস্ত ধারণা, মূল্যবোধ, নীতিজ্ঞান কিংবা বিশ্বাস প্রভৃতি কি করেই বা গজিয়ে উঠল, আবার লুপ্ত হয়ে গেল, কি করেই বা আবার তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং কি করেই বা আবার এক দেশের এক এক বিশিষ্ট ধরনের ভাবধারা অন্য আরেক দেশের সেই একই ধরনের ভাবধারাকে পর্যুদস্ত করল—এসব প্রশ্নের জবাব কি ? উঁরা এ সবের জবাবে শুধুই দৈবক্রম আর ভাগ্যের দোহাই পেড়েছেন। (পৃঃ ৮)

গ্রন্থকার লিখছেন যে, বুর্জোয়া ইতিহাসবেত্তারা তাঁদের রচনাবলীতে এ কথা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ভারতীয় সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের

কোন স্থান নেই, শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমগ্র জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার এবং তাহলেই প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনে—তা তিনি যে কোন শ্রেণীভুক্তই হোন না কেন—আসবে মুক্তির সুপ্রভাত। "বুদ্ধিজীবীরা, বুর্জোয়ারা তর্ক করত যে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এবং ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ও পেশার পার্থক্য সত্ত্বেও প্রত্যেকটি ভারতবাসীর পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও স্বাধীনতাকামী হওয়া এবং কাজেকাজেই ত্যাগ স্বীকারের জন্যে প্রস্তুত থাকা উচিত এবং তাঁরা তা বটেনও। এর অর্থ, যেহেতু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের প্রত্যেকেরই ক্ষতি করেছে, সেই হেতু নীতির দিক থেকে, এই দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীই বিপ্লবী শক্তির অংশবিশেষ হতে বাধ্য।" (পৃঃ ১২)

কিছুকালের জন্যে দেশপ্রেমের এই মিথ্যে আলেখ্য ভারতের মেহনতী জনতাকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছিল এবং তারা (বুর্জোয়ারা) এই জনতাকে এ কথা বোঝাতে সক্ষমও হয়েছিল যে, জাতীয় স্বার্থের স্থান "সংকীর্ণ" শ্রেণী বা বর্ণগত স্বার্থের অনেক উপরে। যদিও শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং ইউ.এস.এস.আর-এ সমাজতন্ত্রের বিজয়ের পর বিশেষ করে ভারতের এই বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ধারার বাহকদের কাজের পদ্ধতিও বেশ কিছুটা পাল্টে গেল। "কোন দেশের শ্রমিকশ্রেণী যখন তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং নিজেদের এই নবলব্ধ মতাদর্শ অনুযায়ী সংগঠিত করতে শুরু করে, তখন ঐ দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের সহিংস উপায়ে দমন করবার চেষ্টা করা ছাড়াও, সম্ভব-অসম্ভব নানা উপায়ে নিজেদের জীবনাদর্শের সাহায্যে তাদের মনকে বিষিয়ে তুলতেও চেষ্টা করে। এরই একটা নমুনা হচ্ছে, শ্রমিকদের ভুল ইতিহাস শেখানো। তাঁদের এমন ইতিহাসের পাঠ দেওয়া, যা তাঁদের বুর্জোয়া শ্রেণীর লেজে লেজে বেঁধে রাখবে এবং বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থাকে অবশ্যম্ভাবী, চিরস্থায়ী, শাশ্বত, ঈশ্বরদত্ত ও নৈতিক দিক থেকে উন্নত ও সবচেয়ে সুখী ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করতে ও একে রক্ষা করতে বাধ্য করবে।" (পৃঃ ১৬-১৭)

ভারতীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের ঐতিহাসিক ধারার এই নতুন উদ্দেশ্যের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখছেন, "এবং তারা বেদ, স্মৃতি, উপনিষদ, মহাকাব্যসমূহ ও পুরাণের কাহিনী মন্থন করে চতুর্বর্ণাশ্রমের যুগযুগব্যাপী প্রথা, সিংহাসনে আসীন রাজর্ষিদের ও আশ্রমবাসী রাজতুল্য ঋষিদের কাহিনী

প্রভৃতি তাদের মতবাদের সমর্থনে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরল এবং দেখাল যে পৃথিবীর অন্য কোথাও যা হয়নি এদেশে তাই হয়েছে, এদেশে এই সমস্ত প্রথা ও আচার হাজার হাজার বছর ধরে টিঁকে রয়েছে। আর তারপর তারা কমিউনিস্টদের চেপে ধরল : বাপু হে, তোমাদের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিয়ম অনুযায়ী এ সমস্তের ব্যাখ্যা কি ? ভারতবর্ষে না ছিল আদিম সাম্যতন্ত্র, না ছিল যৌথ সম্পত্তি আর মাতৃতন্ত্র, না ছিল সাম্য-সমাজ ব্যবস্থা ; আর তোমরা যাকে বল ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর রাষ্ট্র, শ্রেণী আর শ্রেণী-সংগ্রাম, দাসপ্রথা আর সামন্ততন্ত্র, আমাদের ইতিহাসে তো তাদের উৎপত্তির আর বিনাশের আর পারস্পরিক যোগসূত্রের কোন চিহ্নই নেই। হ্যাঁ, এখন অবশ্য ইংরেজ আর তার শাসনযন্ত্রের অভিশপ্ত দান হিসেবে আমাদের দেশে ধনতন্ত্র কায়েম আছে বটে, কিন্তু দেখ, আমাদের ধনতন্ত্রও বিশেষভাবে ভারতীয় গুণসমন্বিত। কাজেই, আমাদের পক্ষে অপরিহার্যভাবে শ্রেণী-সংগ্রাম আর বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই সমাজতন্ত্রে পৌঁছনোর দরকার করে না। আমাদের দেশে গড়ে উঠবে আমাদের এক নিজস্ব নতুন সমাজব্যবস্থা—গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র, এবং অতীতেও যেমনিধারা হয়েছে তেমনি ভবিষ্যতেও দেখবে ভারতবর্ষের নিজস্ব স্বকীয় ভবিতব্য তোমাদের কমিউনিজ্‌মের, তোমাদের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিয়মকানুনকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করে দেবে।" (পৃঃ ১৮)

এস. এ. দাঙ্গে তাই নিজেকে নিয়োজিত করেছেন ভারতীয় সমাজ-বিকাশের ধারা সম্পর্কে এই গান্ধীবাদী মতাদর্শের মূলোচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে, নিজেকে নিয়োজিত করেছেন মার্কস, এঙ্গেল্‌স, লেনিন ও স্টালিন কর্তৃক নির্ধারিত সমাজবিকাশের নিয়মগুলি যে ভারতের পক্ষেও পুরোপুরি প্রযোজ্য তা প্রমাণ করতে।

বইটির **প্রথম পরিচ্ছেদে** গ্রন্থকার বেদ-রচয়িতারা, যাঁরা নিজেদের এবং গ্রন্থকারও যাঁদের "আর্য" আখ্যা দিয়েছেন, তাঁরা কোথেকে এসেছিলেন —এই প্রশ্নের উপর আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন। এশিয়ার উত্তরাঞ্চল থেকে আর্যদের ভারতে প্রবেশের প্রচলিত থিওরি তিনি মেনে নিয়েছেন এবং এরই উপর নির্ভর করে তিনি আর্যদের ভারত-বিজয়ের প্রচলিত ইন্দো-ইওরোপীয় থিওরিও গ্রহণ করেছেন। যাই হোক, ভারতবর্ষে বহু-প্রচলিত এবং সমস্ত ভারতীয়দের দ্বারা, বিশেষত বেদের মারাঠি ভাষ্যকারদের দ্বারা

স্বীকৃত, অথচ অত্যন্ত বিতর্কমূলক এই প্রকল্পটি (hypothesis) গ্রন্থকার গ্রহণ করলেও এটি আলোচ্য বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তাঁর বিশ্লেষণের ধারাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, ঋগ্বেদের (প্রাচীন ধর্মমূলক স্তোত্রের সংকলন-গ্রন্থ) আখ্যানবস্তুর আলোচনার ভিত্তিতে এস. এ. দাঙ্গে গৃহপালিত পশু-উৎসর্গসূচক প্রাচীনতম ধর্মানুষ্ঠান—"যজ্ঞ"-কে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, "যজ্ঞ" জিনিসটা হচ্ছে সাড়ম্বর ধর্মানুষ্ঠানের আকারে, যৌথ-মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আদিম সাম্য-সমাজের অত্যন্ত আদিম উৎপাদনের হাতিয়ারের সাহায্যে উৎপাদনের পদ্ধতির পুনরভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, বেদে যে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে—আদিম সাম্য-সমাজই হচ্ছে সেই ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞ হচ্ছে এই সাম্য-সমাজের যৌথ উৎপাদনের রীতি মাত্র। প্রাচীনকালে "বেদ" বলতে এই উৎপাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানকেই বোঝাত। আজকের দিনেও এই ধর্মানুষ্ঠান উদ্‌যাপনের সময়ে উৎসর্গীকৃত পশুর জন্যে যে ঘাস কাটা হয়, তা ইস্পাতের তৈরি কাস্তের বদলে ঘোড়ার পাঁজরের হাড় দিয়ে কাটা হয় এবং এটি এই অনুষ্ঠানটির প্রাচীনত্বেরই প্রমাণ। গ্রন্থকার জানিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের পুরোহিত শ্রেণী, ব্রাহ্মণদের মধ্যে দু'দশ জন মাত্র বর্তমানে এই অনুষ্ঠানটির উদ্‌যাপনে সমর্থ, কিন্তু বেদের বুর্জোয়া ভাষ্যকারদের মত তারাও এ-অনুষ্ঠানের গূঢ় অর্থ জানে না। আরোপিত বৈদিক দেবদেবীদের ক্রিয়াকলাপমূলক সত্র এবং ক্রতু প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানও যজ্ঞের মতই, তবে এগুলি আঙ্গিকের দিক থেকে আরও কিছুটা প্রচ্ছন্ন।

ঋগ্বেদ অনুসারে, যে-সমস্ত দেবদেবীদের যৌথ-উৎপাদনের ফল হল সোমরস, তাঁরা সকলে সত্র-যজ্ঞের উদ্‌যাপনের রীতি অনুযায়ী সেই রস একত্রে একই পাত্র থেকে পান করেন এবং এইভাবে সত্রে অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানটির নাম সমক্ষ এবং গ্রন্থকারের মতে, এটি আর্যদের আদিম সাম্য-সমাজের বিকাশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্তরের অভিব্যক্তি—যা বর্তমানে নিতান্তই একটি ধর্মানুষ্ঠান হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত। এই অনুষ্ঠানে অংশ-গ্রহণকারীদের সকলকে এক গোত্র-সম্ভূত, অর্থাৎ তাদের সবাইকে রক্ত-সম্পর্কে আত্মীয় হতে হত। অবশ্য অন্যান্য যজ্ঞের ক্ষেত্রে এ-ধরনের কোন নিয়ম নেই।

সত্র যজ্ঞের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, সাময়িকভাবে নির্বাচিত একজন লোককে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতে হত এবং সবশেষে এর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—সমস্ত স্ত্রী-পুরুষই সমান অধিকারের ভিত্তিতে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত। গ্রন্থকারের পক্ষে এ-কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সমাজে সামাজিক কাজের ভাগাভাগি যখনও পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি, সামাজিক যৌথ মালিকানা এবং স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু-যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সাম্য সমাজের সভ্যদের মধ্যে সমানাধিকার যখনও পর্যন্ত পুরোপুরি কায়েম আছে—সমস্ত নামক অনুষ্ঠানটি ভারতীয় সাম্য-সমাজের বিকাশের ঠিক সেই স্তরের অভিব্যক্তি।

একটিমাত্র পরিবারের গৃহপালিত পশু উৎসর্গসূচক সুপ্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানটিই সত্রযজ্ঞ নামে পরিচিত—ভারতীয় পণ্ডিতদের এই দাবি এস. এ. দাঙ্গে খণ্ডন করেছেন। সত্রযজ্ঞের যে-সমস্ত বিশিষ্ট অনুষ্ঠান-অঙ্গের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি—দাঙ্গে বলেছেন যে, সেগুলিকে কিছুতেই একটিমাত্র পরিবারভুক্তদের ধর্মানুষ্ঠানের কাঠামোয় খাপ খাওয়ানো যায় না এবং ওগুলির তাৎপর্য কেবলমাত্র তখনই উপলব্ধি করা যায় যখন আমরা সত্রযজ্ঞকে আরোপিত ঐশ্বরিক ক্রিয়াকলাপের, ধর্মানুষ্ঠানের আকারে প্রাচীনতম সমাজের উৎপাদন পদ্ধতিরই পুনরভিনয় এই অর্থে গ্রহণ করি। (পৃঃ ৪১-৪৩)

এই পরিচ্ছেদেই গ্রন্থকার, যৌথভাবে প্রতিপালিত তিনটি ক্রতু (যজ্ঞ)-র সমাহার, ত্রিরাত্রক্রতু অনুষ্ঠানটিকেও ব্যাখ্যা করেছেন। ঋগ্বেদের বর্ণনা অনুসারে: দেবতাদের মধ্যে বসু, রুদ্র এবং আদিত্য নামে তিনটি দৈবী সাম্য-সমাজগোষ্ঠী বা দেব গণ ছিল। মানুষের পিতা এবং সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি এদের সৃষ্টি করেন। তিনি ঐ প্রত্যেকটি গোষ্ঠীকে একটি করে অগ্নিকুণ্ড দান করেন এবং তাদের তা পুজো করতে বলেন। তারা সকলেই এক বছর ধরে যৌথভাবে সেই অগ্নির আরাধনা করে এবং একটি গাভী উৎপাদন করে। প্রজাপতি খুশি হয়ে গাভীটি বসু-গোষ্ঠীকে দিলেন, তারা কালক্রমে ঐ গাভী থেকে জাত ৩৩৩টি গাভী লালনপালন করতে লাগল। অতঃপর প্রজাপতি সেই প্রথম গাভীটিকে বসুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে রুদ্রগোষ্ঠীকে দিলেন, তারাও আবার ঐ গাভী থেকে জাত ৩৩৩টি গাভী লালনপালন করতে থাকল। এরপর আদিত্য-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার ঘটল। এইভাবে সেই প্রথম গাভীটি সমেত মোট ১,০০০টি গাভী অতঃপর দেবতাদের নামে উৎসর্গ করা হল।

ঋগ্বেদ থেকে এখানে যে-অংশটি উদ্ধৃত করা হল, দাঙ্গের মতে, তা প্রাচীন ভারতবর্ষের গোষ্ঠীগত (tribal) সাম্য-সমাজে সামাজিক ব্যবহার (consumption) ও উৎপাদনের অস্তিত্বই প্রমাণ করে এবং সেইসঙ্গে তৎকালীন ধর্মানুষ্ঠানগুলির বিশ্লেষণ এই সমস্ত সাম্য-সমাজে সামাজিক কাজ ভাগাভাগির যে অস্তিত্ব ছিল না, তা-ই প্রমাণ করে। এই পরিচ্ছেদে তাঁর এই প্রতিজ্ঞা (proposition)-র প্রামাণিক সমর্থন হিসেবে উদাহরণস্বরূপ দাঙ্গে আরও অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। (পৃঃ ৪৪-৪৫)

পরবর্তী (তৃতীয়) পরিচ্ছেদে "যজ্ঞ", "ব্রহ্ম" বা "ব্রাহ্মণ" এবং "বেদ" প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের প্রশ্নটি আলোচনা করে দাঙ্গে প্রমাণ করেছেন যে, "যজ্ঞ" শব্দের অর্থ "সাম্য-সামাজিক শ্রম", "ব্রাহ্মণ" বলতে প্রথমত গোষ্ঠীগত সাম্য-সমাজকেই বোঝাত এবং শুধুমাত্র পরবর্তী যুগেই ঈশ্বর-স্রষ্টা এবং সমাজের সবচেয়ে উচ্চ বর্ণ (পুরোহিতরা) ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়। "বেদ" শব্দটি দ্ব্যর্থ-ব্যঞ্জক: একদিকে শব্দটির মূল "বিদ" অর্থে "জানা" বোঝায়, অন্যদিকে এর অর্থ উৎপাদন করা, সংগ্রহ ও বৃদ্ধি করা। ফলে, দাঙ্গে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "বেদ" শব্দটির আদিম অর্থ "সম্পদ সংগ্রহ ও বৃদ্ধির স্থান"—এবং সম্পদ বলতে সে-যুগে বংশপরম্পরা ও গৃহপালিত পশুই বোঝাত।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে গ্রন্থকার প্রমাণ করেছেন যে, আর্যদের আদিম সাম্য-সমাজ ছিল আসলে গোষ্ঠীগত সাম্য-সমাজ এবং সেগুলি "গণ গোত্র" বা "গণ সংঘ" নামে অভিহিত হত। এছাড়া তিনি এদের এই নামের সঙ্গে ইওরোপের গোষ্ঠীগত সাম্য-সমাজগুলির নামের ভাষাগত তুলনাও টেনেছেন: গ্রীকদের "জেনস" (genes), রোমানদের "জেন্স" (gens), গথদের "কুনি" (kuni) প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে তিনি সাদৃশ্য দেখিয়েছেন বেদের "গণ" শব্দটির এবং সংস্কৃত ভাষায় এর শব্দমূল "জন" শব্দটির। এই সূত্রে তিনি এফ. এঙ্গেল্‌স-এর বই "পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" থেকে এই সম্পর্কিত সেই বহুখ্যাত অংশটি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তুলে ধরেছেন। (পৃঃ ৬১)

পঞ্চম পরিচ্ছেদে ভারতীয় উপাখ্যানগুলি এবং বিশেষ করে মহাকাব্য মহাভারত সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় গোষ্ঠীগত সাম্য-সমাজে প্রথম দিকে প্রধানত দলবদ্ধ বিয়ে

(group-marriage)-র রীতিই প্রচলিত ছিল। মহাভারত থেকে তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে প্রামাণ্য উদাহরণও দাখিল করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, রাজা যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তিনি তাঁর দুই স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রীকে সন্তানলাভার্থে অন্য পুরুষের সঙ্গে সহবাসের আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু কুন্তী এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় রাজা তাঁকে এই বলে বোঝালেন যে, প্রাচীন আমলে একপত্নীত্বের প্রচলন ও স্থায়ীভাবে বিবাহিত দম্পতির অস্তিত্বই ছিল না। (পৃঃ ৬৮)

গ্রন্থকার তারপরে দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন যুগে মাতৃকুল অনুসারেই সন্তানের বংশপরম্পরা নির্ধারিত হত এবং একথা তিনি প্রমাণ করেছেন একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে। তিনি দেখিয়েছেন, মহাভারতে উল্লিখিত সমস্ত কটি গোষ্ঠীরই নামকরণ করা হয়েছে তাদের মহিলা প্রতিষ্ঠাত্রীদের নামে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এস. এ. দাঙ্গে বিকাশমান বিভিন্ন সাম্য-সমাজের মধ্যেকার পারস্পরিক সংঘর্ষগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, এই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ (সংস্কৃত ভাষায় "যুদ্ধ"-কে "গাভিষ্টি", অর্থাৎ গাভী-সংগ্রহ—এই অর্থে ব্যবহার করা হয়,) লাগত প্রধানত গাভী নিয়েই। যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে সাম্য-সমাজগুলি একজন করে নেতা বা বৃহস্পতি বা গণপতি নির্বাচিত করে নিত। এই সমস্ত নামধারীরা এখন দেবতারূপে পরিগণিত।

সাম্য-সমাজের বিকাশের এই স্তরে অসাম্যের অঙ্কুর সমাজে মাথা চাড়া দিতে শুরু করে। আলোচ্য পরিচ্ছেদে দাঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের পর অনুষ্ঠিত উৎসর্গসূচক ধর্মানুষ্ঠানগুলির কথা বর্ণনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানে, প্রথম যে ঘোড়া শত্রুর এলাকায় প্রবেশ করত, প্রথমেই তাকে উৎসর্গ করা হত। এইটিই "অশ্বমেধ যজ্ঞ" নামে পরিচিত। নৃত্য এবং রঙ্গরস প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল এবং এই উৎসবে যুদ্ধের সময়ের বন্দিনীরাসহ সমাজের সমস্ত মেয়েরা অংশগ্রহণ করত। সাম্য-সমাজের মধ্যে এই বন্দিনী মেয়েদের নিয়ে মাঝে মাঝে কিছু কিছু অশান্তির সৃষ্টি হত। শুক্ল যজুর্বেদের এক জায়গায় এই মর্মে একটি কথোপকথনের অংশ আছে, যেখানে মেয়েরা এই বলে বিলাপ করছে যে, তাদের পুরুষরা বন্দিনীদের নিয়েই মত্ত হয়ে আছে, তাদের দিকে আর দৃক্‌পাতও করছে না (পৃঃ ৮৯)। অশ্বমেধ অনুষ্ঠানে ঘোড়া উৎসর্গ করার পর পুরুষ বন্দীদের উৎসর্গ করা হত এবং তারপর তাদের মধ্যে

কিছু কিছু লোক সাম্য-সমাজে গৃহীত হত ও বাকি সবাইকে অগ্নি-দেবতার কাছে নিবেদন করা হত। শেষের এই উৎসর্গসূচক অনুষ্ঠানকে বলা হত "পুরুষমেধ যজ্ঞ"।

দাঙ্গে বলছেন যে, ভারতীয় মহাকাব্যগুলিতে সমাজে নরখাদকবৃত্তির কোন উল্লেখ নেই এবং সম্ভবত শুধুমাত্র সুদূর অতীতেই এ বৃত্তির প্রচলন ছিল। বর্তমানকাল পর্যন্ত যে-সমস্ত অনুষ্ঠান চলে এসেছে, তার মধ্যে উৎসর্গীকৃত মানুষের হত্যার কোন প্রতীকী অভিনয় না থাকায় গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, উৎপাদন-শক্তির অতিরিক্ত বিকাশের ফলে যুদ্ধবন্দীদের দাস হিসেবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়ে ওঠায় পরবর্তীকালে এই পুরুষমেধ অনুষ্ঠানটির আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটে। (পৃঃ ৭০-৭১)

সাম্য-সমাজে শেষ যে অনুষ্ঠানটির প্রচলন হয় তার নাম "ব্রহ্মমেধ যজ্ঞ"। এই অনুষ্ঠানে সমাজের মৃত অধিবাসীদের দাহকার্য সম্পন্ন করা হত। এই অনুষ্ঠানের শেষে সেই বিশেষ ক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হত, বেদে যাকে "দানম্" নামে অভিহিত করা হয়েছে। ভাষ্যকারেরা সাধারণত, "দান হিসেবে উপহার বিতরণ"—এই অর্থে "দানম্" শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু দাঙ্গে মনে করেন, শব্দটিকে "দান করা" অর্থে ব্যবহার না করে "যুদ্ধে সংগৃহীত জিনিস-পত্র সাম্য-সমাজের লোকদের মধ্যে বণ্টন করা" অর্থে ব্যবহার করা উচিত। এরপর সাম্য-সমাজে যখন শ্রেণী-বৈষম্যের লক্ষণগুলি একে একে দেখা দিতে শুরু করল এবং একটি বিশিষ্ট যোদ্ধৃ-শ্রেণী, ক্ষত্রিয় শ্রেণীর উদ্ভব হল, তখন সমগ্র সাম্য-সমাজের মধ্যে সমানভাবে সম্পদ বণ্টনের অনুষ্ঠান থেকে "দানম্" যোদ্ধৃ-নেতাদের দ্বারা সংগৃহীত সম্পদের একাংশ সমাজের মধ্যে বিতরণের অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হল। এমন কি, পরবর্তী ধর্ম-সাহিত্যে, রাজারা ও যোদ্ধৃ-নেতারা সাম্য-সমাজের লোকদের মধ্যে কে কতখানি ধন-বিতরণ করে "দানম্" সম্পন্ন করেছেন, তার হিসেব করে তাঁদের মহত্ত্বের বিচার করা হয়েছে। (পৃঃ ৯২-৯৪)

সপ্তম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার "বর্ণ" বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীসমূহের উৎপত্তির প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, বর্ণসমূহ প্রথমদিকে শ্রেণী হিসেবে দেখা দেয়নি বরং সামাজিক উৎপাদন ও যৌথ মালিকানার নিয়ম চালু থাকার সময়েই সাম্য-সমাজের মধ্যে কাজ ভাগাভাগির প্রথা দেখা দেওয়ার ফলেই এই বর্ণের উদ্ভব। প্রথম দিকে সমাজে তিনটি মাত্র বর্ণের উদ্ভব হয়: গ্রন্থকারের মতে ব্রাহ্মণ্য হচ্ছে সামাজিক উৎপাদনের সংগঠকের

বর্ণ, যা পরবর্তীকালে বংশগত পুরোহিতবৃত্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। ক্ষাত্র হচ্ছে যোদ্ধৃবৃন্দের বর্ণ এবং সবশেষে সাম্য-সমাজের সমস্ত পশ্চাদ্‌পদ অধিবাসীদের, অর্থাৎ জনসাধারণের ("প্রজাদের") বর্ণ ছিল বিশ (বা বৈশ্য) বর্ণ। শূদ্রবর্ণ বা গ্রন্থকারের ভাষায় "শূদ্র" বর্ণ নামে চতুর্থ বর্ণটির উল্লেখ শুধুমাত্র পরবর্তীকালের সংস্করণগুলিতেই পাওয়া যায় এবং এস. এ. দাঙ্গে মনে করেন যে, যখন থেকে ধৃত বন্দীদের প্রাণে মেরে না ফেলে তাদের দাসে পরিণত করার প্রথা সমাজে চালু হয়েছে, তখন থেকেই এই বর্ণটির উদ্ভব। গ্রন্থকার আরও মনে করেন যে, শূদ্ররা যে দাস ছিল, তারা যে সাম্য-সমাজের অন্যান্য অধিবাসীদের সম-অধিকারসম্পন্ন ছিল না—তার প্রমাণ, তৎকালীন প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী উপরোক্ত প্রথম তিনটি বর্ণের প্রত্যেকটির জন্যে একটি করে আরাধ্য দেবতা এবং একটি বিশেষ ধরনের গৃহপালিত পশু নির্দিষ্ট থাকত, কেবল শূদ্রদের নির্দিষ্ট পশু ছিল কিন্তু কোন আরাধ্য দেবতা ছিল না। দেখা যাচ্ছে, বেদ অনুসারে, ব্রাহ্মণদের দেবতা ছিলেন অগ্নি এবং তাদের নির্দিষ্ট গৃহপালিত পশু ছিল ছাগল, ক্ষত্রিয়দের দেবতা ছিলেন স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র এবং তাদের গৃহপালিত পশু ছিল ভেড়া; তেমনি বৈশ্যদের দেবতা বিশ্বদেব এবং তাদের গৃহপালিত পশু গরু; আর শূদ্রদের গৃহপালিত পশু ছিল ঘোড়া। দাঙ্গের মতে, এতেই প্রমাণ হয় যে শূদ্ররা ধরা পড়ার আগে শত্রু-গোষ্ঠীগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা আর্যজাতিসম্ভূত ছিল না এবং সেইজন্যেই তাদের কোন আর্য দেবদেবীর আরাধনা করার অধিকার ছিল না (পৃঃ ১০২)। এই চতুর্থ বর্ণটির আবির্ভাবের সঙ্গ-সময়েই প্রথম তিনটি বর্ণ শ্রেণী হিসেবে রূপান্তরিত হতে শুরু করে এবং সাম্য-সমাজে সে-ই প্রথম সম্পত্তিগত অসাম্য ও শোষণের সূচনা হয়। দাঙ্গের ধারণা, ঠিক এই সময়েই ধাতুপাথর (ore) থেকে ধাতু নিষ্কাশনের পদ্ধতি এবং পরিশ্রমের ও লড়াইয়ের হাতিয়ার তৈরির কাজে ধাতুর ব্যবহার প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এবং এই সময় থেকেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুটি বর্ণ শোষক ও দাস-অধিপতিতে পরিণত হয় এবং বৈশ্যদের সামাজিকভাবে ক্রমশ এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করানো হয় যার সঙ্গে তৎকালীন দাস-সম্প্রদায় শূদ্রদের প্রভেদ ছিল অতি সামান্যই।

আদিম সাম্য-সমাজব্যবস্থার পতন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব এবং বংশানুক্রমিক শ্রেণী হিসেবে চতুর্বর্ণের রূপান্তর—এসবই ইতিহাসের দীর্ঘ বিলম্বিত পরিণতি মাত্র। বেদে এবং হিন্দুদের মহাকাব্যসমূহে, বিশেষ করে

মহাভারতে এই ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের কষ্টসাধ্যতার ও বিলম্বিত পদক্ষেপের নজির প্রচুর মেলে। আদিম সাম্য-সমাজের মধ্যেই গরমিল ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিত্তবানদের আবির্ভাব হওয়ায়, ধনসম্ভোগের সাম্য নষ্ট হওয়ায় এবং কাজ-ভাগাভাগি ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় বেদের বহু শ্লোকে এ সম্পর্কে সাম্য-সমাজের মানুষের হা-হুতাশ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এই সমস্ত শ্লোকের রচয়িতারা এই বলে আক্ষেপ করেছেন যে, গণ সংঘ (গোষ্ঠীগত সাম্যসমাজ)-গুলির একদা সুখী ও সন্তুষ্ট অধিবাসীরা আজ দরিদ্রদশায় উপনীত হয়ে বিত্তবানদের জন্যে শ্রম করতে বাধ্য হচ্ছে।

সমাজে এইভাবে কাজ ভাগাভাগি বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং শোষণ ও দাসত্ব কায়েম হওয়ায় পারিবারিক প্রথারও পরিবর্তন ঘটল। পূর্ববর্তী দলবদ্ধ বিয়ের জায়গায় প্রথমে মাতৃশাসিত (matriarchal) ও পরে পিতৃশাসিত (patriarchal) জুড়ি পরিবার (pair family) দেখা দিল। আর সেই সঙ্গে চালু হল স্ত্রীলোকের দাসত্ব—প্রাচীন সমস্ত ভারতীয় উপাখ্যানেই যার ভূরি ভূরি নিদর্শন মিলবে।

অষ্টম, নবম ও দশম পরিচ্ছেদ কটিতে সাধারণভাবে সাম্য-সমাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে সেই আদিম গোষ্ঠীগত সাম্য-সমাজে কী ভাবে শ্রেণী ও শোষণের উদ্ভব হল।

একাদশ পরিচ্ছেদে এস. এ. দাঙ্গে পরবর্তী যুগের ভারতীয় গ্রন্থকার (পানিনি, কৌটিল্য)-দের ও গ্রীকদের লেখা থেকে প্রমাণ উপস্থিত করে দেখাচ্ছেন যে, এমন কি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকেও, আদিম সাম্য-সমাজ-ব্যবস্থার পতন এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রের পত্তনের কাজ তখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি। দক্ষিণ ভারতবর্ষে, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যে, একেবারে দক্ষিণ পশ্চিম (বর্তমানে সিন্ধুপ্রদেশ) অঞ্চলে, হিমালয়ের পাদদেশে এবং বাংলাদেশ প্রভৃতি অঞ্চলেই এই আদিম সাম্য-সমাজব্যবস্থা সবচেয়ে দীর্ঘদিন ধরে টিঁকে ছিল। সেই সময়ে গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর ও মধ্য অঞ্চলেই কেবলমাত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল এবং গ্রন্থকারের মতে, এই রাষ্ট্রগুলির ভিত্তি শুধু যে দাস-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাই নয়, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম হাজার বছরের মধ্যেই এরা ক্রমশ বেশি বেশি এবং দ্রুত সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়ে চলেছিল। মহাভারতের রচনাবলীর বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে গ্রন্থকার অনুমান করেছেন যে, এই মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনাবলী কার্যত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয়

সহস্র বর্ষ থেকে প্রথম সহস্র বর্ষের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ব্যাপকভাবে দাস-শ্রমিক নিযোগ করে জঙ্গল সাফ করিয়ে এবং খাল কাটিয়ে খেতে জল সেচের ব্যবস্থা করার ফলে গাঙ্গেয় উপত্যকায় যে-সমস্ত বড় বড় দাসতন্ত্রী রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তারা যে-সময়ে তাদের ঐ এলাকার চারিদিকের আদিম সাম্য-সমাজগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, মহাভারতের ঘটনাগুলি ঘটে প্রায় সেই একই সময়ে। দাসতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আদিম সাম্য-সমাজগুলোর এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষই গুরুতররকম দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে, দাস-শোষণব্যবস্থার জায়গায় দেখা দিল ভূমিদাস ও আধা-ভূমিদাস কৃষকদের শোষণ এবং সেই সময়েই, খ্রীষ্টপূর্ব চোদ্দ শতকের প্রায় সূচনাতেই, ভারতবর্ষে দাসতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন চালু হয়ে গেছে।

কাজেই, দাঙ্গের মতে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে সমস্ত ঐতিহাসিক প্রামাণ্য রচনা (গ্রীক ও চীনা পরিব্রাজকদের প্রামাণ্য ইতিহাস এবং পরবর্তী কালের ভারতীয় সাহিত্য প্রভৃতি) আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, তাতে যে ভারতবর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায় সে ভারতবর্ষ দাসতন্ত্রী ভারতবর্ষ নয়—দাসতন্ত্র থেকে সামন্ততন্ত্রের পথে বিবর্তমান ভারতবর্ষ। বৌদ্ধধর্মের, এমন কি হিন্দুধর্মের উত্থানকেও দাঙ্গে এই দাসতন্ত্র থেকে সামন্ততন্ত্রের পথে পরিবর্তমান যুগের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, যে কাব্যাংশটি মহাভারতের সর্বশেষ সংযোজনা, সেই ভগবদ্‌-গীতায়, গ্রন্থকারের মতে, এই নতুন সামন্ততান্ত্রিক মতাদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে।

দাঙ্গের এই আলোচ্য বইটি ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেদ এবং মহাভারত বিশ্লেষণের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টার নিদর্শন এবং এই হিসেবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে রচিত মার্কসবাদী সাহিত্যে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ রচনা।

বইটির রাজনৈতিক তাৎপর্যের গুরুত্বকে কম করে দেখলে চলবে না। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় বড় বুর্জোয়াগোষ্ঠী খোলাখুলিভাবে আপস করা সত্ত্বেও এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের মেহনতী জনসাধারণের, বিশেষ করে কৃষক, মেহনতকারী বুদ্ধিজীবী এবং এমন কি শ্রমিক শ্রেণীর কিছু কিছু পশ্চাদ্‌পদ অংশের উপরও কংগ্রেসের সরকারী মতাদর্শ গান্ধীবাদের প্রভাব এখনও অত্যন্ত প্রবল। ভারতের সমাজবিকাশের পথ যে তার স্বকীয় বিশিষ্ট পথ, অন্য সমস্ত দেশের

পক্ষে কার্যকরী সমাজবিকাশের নিয়মকানুন যে ভারতের পক্ষে অপ্রযোজ্য, জনতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যে গান্ধী কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত যে একটি "বিশিষ্ট" ও শান্তিপূর্ণ রাস্তা আছে এবং মানবজাতির কাছে তা চাক্ষুষ প্রমাণ করা যে ভারতের "বিশিষ্ট পবিত্র কর্তব্য"—এই থিয়োরিটি জনগণের উপর মতাদর্শগত দাসত্ব কায়েম রাখার প্রধান প্রধান হাতিয়ারগুলোর মধ্যে অন্যতম। যে গান্ধীবাদ শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে জনগণের হাত থেকে হাতিয়ার কেড়ে নেওয়ার জাতীয় সংস্কারবাদী নীতি ও কৌশল মাত্র নয়, জনসাধারণকে ভারতীয় শোষক শ্রেণীগুলির পদানত করে রাখার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত লম্বা-চওড়া কথায় বোঝাই একটি গালভরা মতবাদও বটে—সেই গান্ধীবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের কাজ ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের সামনে বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির অন্যতম। এই কর্তব্য সম্পাদন না করলে জনসাধারণকে যেমন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের খপ্পর থেকে মুক্ত করা অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব জনগণের (নয়া) গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামে তাদের পরিচালনা করে।

গান্ধীবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম, ভারতবর্ষের "সমাজবিকাশের স্বকীয় বিশিষ্ট পথ" সম্পর্কিত মতটির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের যে কাজে তিনি নিজেকে নিযোজিত করেছিলেন, এস. এ. দাঙ্গে সে কর্তব্য সম্পাদনে প্রধানত সমর্থ হয়েছেন। অবশ্যই, এ কথার অর্থ এই নয় যে, তাঁর এই বইটি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন হয়েছে কিংবা এ বইয়ে তিনি যে সমস্ত প্রতিজ্ঞার অবতারণা করেছেন তার সবকটিই বিনা প্রতিবাদে গ্রহণযোগ্য। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আর্যদের ভারতবিজয় সম্পর্কিত যে মতটি দাঙ্গে বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন, সে সম্পর্কে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। উত্তর ভারতের ভাষাগুলি বা আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির সঙ্গে এশিয়া মাইনর ও ইওরোপের বিভিন্ন ভাষার আক্ষরিক মিলের ভিত্তিতে এই যে মতবাদটি গড়ে উঠেছে, ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার আলোয় বিশেষ করে, এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করার গুরুতর কারণ ঘটেছে। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়েছি যে, এই মতবাদ দাঙ্গের যুক্তি তর্কের ধারাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি এবং যে মৌল রচনা-উৎস তাঁর সিদ্ধান্তগুলির নির্ভর, এই উপরোক্ত মতবাদ যে সেই মূল রচনার বিশ্লেষণের ফল, তাও নয়। এছাড়া, ভারতবর্ষে দাসতন্ত্রের পতন ও সামন্ত-

তান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশের তারিখ-সাল নির্ণয়ের ব্যাপারটিও বিতর্কমূলক। বিশেষ করে যেহেতু গ্রীস এবং রোমের মত ইওরোপের প্রাচীন দেশগুলিতেও সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশের সূচনা হওয়ার বহু শতাব্দী আগেই—খ্রীষ্টপূর্ব পঁচিশ শতক থেকে বিশ শতকের মধ্যেই ভারত-বর্ষে এই পরিবর্তন সাধিত হয়ে গিয়েছিল বলে গ্রন্থকার মতপ্রকাশ করেছেন।

কিন্তু এই সমস্ত মতান্তর এবং গ্রন্থকারের আরও কিছু কিছু প্রতিপাদ্য প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে আপত্তি ওঠার সম্ভাবনা সত্ত্বেও, এর ফলে বইটির গুরুত্ব কমে গেল এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা অনুযায়ী ভারতীয় ধর্মগ্রন্থগুলির এই সমস্ত স্তোত্রের ও মহাকাব্যের অনুশীলন এখনও তার শৈশব অতিক্রম করেনি। আর তাছাড়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অনুশীলনে উৎসাহী যে কোন মার্কসবাদীর কাছেই যে সমস্ত সমস্যা অত্যন্ত জটিল আর দুরূহ ঠেকে, জেলে বন্দী অবস্থায় লেখা দাঙ্গের বইটির এই স্বল্প আয়তনে সেই সমস্ত প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব এবং তর্কাতীত ব্যাখ্যা দাবি করাটাই আশ্চর্য। আমরা শুধু মুক্ত কণ্ঠে এই কথাই বলতে পারি যে, দাঙ্গের এই আলোচ্য বইটি বেদ, মহাভারত ইত্যাদি অনুশীলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ; বলতে পারি যে, **দাঙ্গের অনুশীলনের ধারা মূলত নির্ভুল** এবং হিন্দুধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানগুলির যে ব্যাখ্যা তিনি করেছেন তা সঠিক; এবং আমরা এও বলতে পারি যে, ভারতীয় সমাজ-"বিকাশের স্বকীয় বিশিষ্ট রাস্তা" সম্পর্কে গান্ধীবাদী মতাদর্শের মূলে এই আলোচ্য বইটি কুঠারাঘাত করেছে ও এই হিসেবে জাতীয় সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এটি একটি জঙ্গী হাতিয়ার-বিশেষ।

ব্যাপক ধরপাকড় ও বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষে জনগণের মুক্তি-আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরা অস্ত্রত্যাগ করা দূরে থাক, আজও যে তাঁরা সফল সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন—এস. এ. দাঙ্গের এই বইটি তারই প্রমাণ। এই জন্যেই এই গ্রন্থপ্রকাশকে আমরা সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমরা বিশ্বাস রাখি যে এই ধরনের মৌল তত্ত্বগত আলোচনা-গ্রন্থ ক্রমশ আরও প্রকাশিত হবে। যারা এমন কি গালভরা "সমাজতান্ত্রিক" বুলি আওড়াতেও পিছপা নয়—সেই অভিজ্ঞ ও সুচতুর বিরুদ্ধপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামে ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের কাছে এই ধরনের বইয়ের প্রয়োজন আজ অত্যন্ত বেশি।

"সমকালীন সাহিত্যের পথ"*

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশের "গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা" ভাবতে শুরু করেছেন, সে ভাবনা এখন প্রায় দুর্ভাবনার স্তরে পৌঁছেছে। মার্কসবাদের প্রবল রাজনৈতিক ধারা আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। সমাজতান্ত্রিক, নয়া-গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে মার্কসবাদী সাহিত্যনীতির প্রয়োগে নতুন প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে। শিল্পসাহিত্য মুষ্টিমেয় বুদ্ধিবিলাসীর শখের সামগ্রী না হয়ে জনসাধারণের সম্পত্তি হয়ে উঠছে, এ সব দেখে গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা বড়ই মর্মাহত।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের সাহিত্যকেন্দ্র হল "সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্র", এবং এর নেতা হলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব সাহেব। আইয়ুব সাহেব পণ্ডিত এবং "প্রগতিশীল"; শুধু তাই নয়, মার্কসবাদের অনেক কথাই নাকি তিনি মানেন! তবে মার্কসবাদকে একটু সংশোধন করে নেবার চেষ্টা অনেকদিন থেকেই তিনি করছেন। মার্কসবাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি দূর করে, খাঁটি তত্ত্বটুকু বের করবার প্রেরণায় অনেকদিন থেকেই তিনি "নিস্পৃহভাবে" কাজ করে যাচ্ছেন। আইয়ুব সাহেব সাহিত্যিকের "স্বরাজে" বিশ্বাসী। মার্কসবাদী রাজনীতির রূঢ় আঘাতে যে সাহিত্যের নির্মল সত্তা আবিল হচ্ছে, মার্কসবাদী "অসুস্থ রাজনীতির" স্পর্শে রসোপলব্ধির অলৌকিক আনন্দ যে ব্যাহত হচ্ছে; এ বিপদ থেকে উদ্ধারের আশা যে একমাত্র "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ", এ সম্পর্কে তিনি সম্প্রতি শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

আইয়ুব সাহেব দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত "বিশুদ্ধ সাহিত্য" চান—অথচ সমকালীন সাহিত্যের নেতৃবৃন্দ নিজেরাই এ্যাটলি-বেভিন-ব্লুম

---

*'দ্বন্দ্ব' : সম্পাদনা—আবু সয়ীদ আইয়ুব, জীবনানন্দ দাশ ও নরেন্দ্র নাথ মিত্র। আষাঢ় সংখ্যা।

ও আমাদের দেশের জয়প্রকাশ নারায়ণের "গণতান্ত্রিক সমাজবাদে"র "রাজনীতি" নিয়েই আলোচনা করেছেন। আন্তর্জাতিক সমাজবাদের সব কটি বক্তব্যকেই তাঁরা সাজিয়ে গুছিয়ে বলেছেন। এর থেকেই বোঝা যাবে যে তথাকথিত "বিশুদ্ধ" সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিবিদেরাও রাজনীতি-নিরপেক্ষ নন। 'সাহিত্যিকের স্বরাজ', 'সাহিত্যের নির্মল সত্তা' এ সব উচ্চাঙ্গের কথা বললেও আসলে তাঁরাও এক বিশেষ দলীয় রাজনীতির মুখপাত্র; এক বিশেষ রাজনৈতিক ধারার মুখপাত্র হয়েই তাঁরা কাজ করছেন; আধ্যাত্মিক কথার আবরণে আন্তর্জাতিক দক্ষিণপন্থী সমাজবাদের, "সুস্থ রাজনীতি"র স্পর্শে বিশুদ্ধ সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করে তোলবার চেষ্টা করছেন।

সমকালীন সাহিত্যের নেতারা যে মার্কসবাদকে পরাস্ত করে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের যাদুস্পর্শে সাহিত্যিকের স্বরাজ ফিরিয়ে আনবেন সংকল্প নিয়েছেন, তা মোটেই আকস্মিক নয়। দুনিয়ার সব জায়গায় যেমন, ভারতেও তেমনি, আজ ক্রমশই গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিগুলি সংহত হয়ে উঠছে—পুরনো রাজনীতি ও অর্থনীতির জায়গায় গড়ে উঠছে নতুন রাজনীতি ও অর্থনীতি। সঙ্গে সঙ্গে নতুন সংস্কৃতির বনিয়াদও রচিত হচ্ছে। রাজনীতি ও অর্থনীতির দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক প্রগতিশক্তির লড়াই যতই তীব্র হচ্ছে, মতাদর্শের লড়াইও ততই জোরদার হয়ে উঠছে দেশে দেশে। এতো স্বাভাবিক। ভারতবর্ষে যে এর ব্যতিক্রম ঘটবে এর কোন কারণ নেই। সমকালীন সাহিত্যের নেতারা সময় বুঝেই তাই মতাদর্শগত সংগ্রামে নেমেছেন। মার্কসবাদকে পরাস্ত করে "গণতান্ত্রিক সমাজবাদে"র নামে বুর্জোয়া জীবনদর্শন, বুর্জোয়া সাহিত্যনীতির সমর্থনে কলম ধরেছেন।

মার্কসবাদের "প্রবল রাজনৈতিক ধারা" সত্যিই আজ বিপুল আকার ধারণ করেছে। মার্কসবাদী পার্টির নেতৃত্বে আজ দেশে দেশে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলন এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে ধনিকবণিক ও তার মিত্রদের শিবিরে আজ শিহরণ দেখা যাচ্ছে। আজ তারা বিশেষ দুর্ভাবনাগ্রস্ত। আইয়ুব সাহেব প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের দুর্ভাবনাও তাই আপতিক নয়। তাই তাঁরা আন্তর্জাতিক দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সোভিয়েট-বিরোধী প্রচারে নেমেছেন, সুকৌশলে বলেছেন যে সোভিয়েট-ব্যবস্থা মানব প্রগতির প্রতিবন্ধক, ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত বিকাশের পরিপন্থী।

একটু মিলিয়ে দেখলেই পরিষ্কার হবে যে এ্যাটলি-ব্লুম-বেভিন, ট্রুম্যান-এ্যাচিসন আমাদের দেশের জয়প্রকাশ নারায়ণ-মানবেন্দ্র রায় 'গণতন্ত্র' 'স্বাধীনতা', 'ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত বিকাশ' নিয়ে যেমন উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা দেন, সোভিয়েট ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রবিরোধী, স্বেচ্ছাচারী শাসন বলে প্রচার করেন, আইয়ুব সাহেব প্রভৃতি বক্তব্যও মূলত তাই। অথচ, আজকের দিনের প্রত্যেক শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষই জানে যে 'গণতন্ত্র', 'স্বাধীনতা'র বক্তৃতা সত্ত্বেও, মানবপ্রগতির প্রচণ্ডতম বাধা হল এ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, আর মানবপ্রগতির শ্রেষ্ঠ বন্ধু হল সোভিয়েট। আশ্চর্য হতে হয় এটা দেখে যে 'প্রগতি-বাদী', হওয়া সত্ত্বেও আইয়ুব সাহেব প্রভৃতি এ্যাংলো-আমেরিকান কথাগুলি হুবহু আউড়ে যাচ্ছেন; সাম্রাজ্যবাদী দৌরাত্ম্য সম্পর্কে মৌনতা অবলম্বন করে, মার্কসবাদকে বিকৃত করে, সোভিয়েটের প্রচ্ছন্ন কুৎসাপ্রচার করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন।

আইয়ুব সাহেব প্রভৃতি জানেন যে আজকের দিনে আমেরিকান সাম্রাজ্য-বাদী নীতির দৌরাত্ম্যে সমগ্র মানবতা বিপন্ন। আমেরিকা যে সারা দুনিয়া জুড়ে শুধু যুদ্ধ ঘাঁটি স্থাপন করেছে তাই নয়, টাকার জোরে ইওরোপের স্বাধীন দেশগুলিকে প্রায় নিজের উপনিবেশে পরিণত করেছে। আর অনুন্নত, ঔপনিবেশিক দেশের মুক্তি-আন্দোলনের প্রবলতম শত্রুই হল আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, যার কদর্য কুৎসিত বীভৎস রূপ সম্প্রতি কোরিয়ার যুদ্ধে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ কদর্য কুৎসিত রূপ আবৃত করবার জন্যে, আমেরিকা তার বিপুল প্রচারযন্ত্রের মারফৎ 'গণতন্ত্র', 'স্বাধীনতা' সম্পর্কে আধ্যাত্মিক বুলি আওড়াচ্ছে আর গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সম্পর্কে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সমাজবাদও আমেরিকার সুরে সুর মিলিয়ে মার্কসবাদ ও সোভিয়েটের কুৎসা রচনা করে যাচ্ছে। নির্বিত্ত জনতাকে ঘুম পাড়াবার জন্যে এরা বুর্জোয়া মেকি গণতন্ত্রের জন্যে অনেক অশ্রু বিসর্জন করছে—ক্রেমলিনের "তেরজন লোক"-এর ডিক্টেটরশিপকে বহু অভিশাপ দিচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র নির্দয় রূপ ঢেকে রাখবার জন্যে রহু উচ্চাঙ্গের কথা দিনের পর দিন বলে চলেছে।

'গণতন্ত্র', 'স্বাধীনতা', 'ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত বিকাশ' এ সব সত্যিই মহৎ আদর্শ। সমাজ বিবর্তনের ধারাপথে মানুষের শ্রেয়োবোধের ক্রমঅভিব্যক্তির এক বিশেষ স্তরে এসবের উদ্ভব এবং এ সবের তাৎপর্য অনস্বীকার্য। সঙ্গে

সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে ট্রুম্যান, এ্যাচিসন, এ্যাটলি-বেভিন, এরা সবাই এ সব তত্ত্বকথা বলে থাকেন; 'খ্রীষ্টধর্ম', 'মানবের স্বাধীনতা', 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য,' 'গণতান্ত্রিক জীবনধারা' এসব উচ্চাঙ্গের কথা বলে মালয়ে "সাম্যবাদী দস্যু" শিকারে বের হন, কোরিয়ার নিরস্ত্র জনতার ওপর অতিকায় বোমারু বিমান থেকে হাজার হাজার পাউণ্ড বোমা বর্ষণ করে 'গণতন্ত্র'কে অক্ষয় করেন, এ্যাটম বোমার ঘায়ে পৃথিবী জনমানবশূন্য করে দেবেন বলে নিখিল বিশ্বের জনতাকে শাসান।

দুঃখের বিষয় এই যে সাম্রাজ্যবাদের এই মতাদর্শগত সংগ্রামের সরিক হয়েছেন সমকালীন সাহিত্যপথের নেতৃবৃন্দ। মার্কসবাদী সাহিত্যনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে বাস্তবে 'আর্ট ফর আর্টস সেক'-এর আওয়াজ তুলে তাঁরা ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ও দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের সাংস্কৃতিক ভাবধারারই বাহক হয়ে উঠলেন।

সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্যটা কি? তাঁদের বক্তব্য হল (১) আধুনিক কালের—এ যুগের, সবচেয়ে গুরুতর সমস্যার সমাধান, মানবপ্রগতির পথ হল 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ', যে ব্যবস্থায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হবে "সামষ্টিক-ব্যবস্থা" এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে "ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত বিকাশ"। এ হল "মধ্যপন্থা"র পথ, যা 'ধনতান্ত্রিক লিবারালিজম' ও 'প্রলেটারিয়ান ডিক্টেটরশিপ' এই দুই বিপরীত সমাধানের সারাংশ নিয়ে তৈরি হবে।

(২) শিল্পী ও জ্ঞানীর 'স্বাধীনতা'র শত্রু হল ডিক্টেটরশিপ—একদিকে 'ফ্যাশিস্ট ডিক্টেটরশিপ' অন্যদিকে 'সাম্যবাদী একনায়কত্ব'। সাহিত্যিকের স্বরাজ আজ দুদিক থেকে আক্রান্ত। একদিকে ফ্যাশিস্ট ডিক্টেটরশিপের আসুরিক মূর্তি, অন্যদিকে সাম্যবাদী সর্বময় প্রভুত্ব। দুটো ব্যবস্থাই 'স্বাধীনতা'র প্রত্যাহরণ—শিল্প-সাহিত্যের অপমৃত্যু।

(৩) ধনতান্ত্রিক লিবারালিজমে অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকায় 'গণতন্ত্র', 'স্বাধীনতা' রয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখানে রয়েছে শোষণের অব্যাহত অধিকার। কাজেই এটাও গ্রাহ্য নয়।

(৪) কাজেই সোভিয়েট ডিক্টেটরশিপ নয়, ফ্যাশিস্ট ডিক্টেটরশিপও নয়, ধনতান্ত্রিক লিবারালিজম দিয়েও কাজ চলবে না। আজ তাই চাই "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ"—যে ব্যবস্থায়, স্বাধীনতা ও সাম্য, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিত্বের

বাধামুক্ত বিকাশ, সাহিত্যিকের স্বরাজ সমন্বিত হবে, সমাজ সচেতনার সঙ্গে 'বিশুদ্ধ' সৌন্দর্যের তপস্যা সাহিত্যিককে অমরত্ব দেবে।

আইয়ুব সাহেব বহু জায়গায় ঘোষণা করেছেন যে যুক্তির রাজপথ ধরে চলতে তিনি অভ্যস্ত; খাঁটি বিচার-বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পথে পরিক্রমণই তার স্বভাব। অথচ এ লেখায় দেখা গেল ভক্তিমার্গের আশ্রয়ই তিনি নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদ যে সব মন্তব্য করে থাকে, যে সব রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞা এর তূণে জমা থাকে সব সময়, সেগুলিকেই তিনি স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে ধরে নিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পথ নির্দেশ করেছেন। আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদীরা ধরে নেয় যে অর্থনীতি, নীতিবোধ, মানসসম্পদ সব সমাজরাজ্যে যেথায় রূপায়িত হয়ে চলেছে—বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে এদের স্থান। এদের মধ্যে যোগসূত্র নেই, এরা পরস্পর-নির্ভর নয়। আইয়ুব সাহেব ও কথাটি মেনে নিয়েছেন। দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীরা 'প্রলেটারিয়ান ডিক্টেটরশিপ' জুজুর ভয়ে সন্ত্রস্ত; তাদের মতে 'ফ্যাশিস্ট একনায়কত্বে'র সঙ্গে 'সাম্যবাদী একনায়কত্বে'র প্রভেদ পরিমাণগত, উদ্দেশ্য ও উপায় নিয়েই এদের যেটুকু পার্থক্য। আইয়ুব সাহেবরা হুবহু এই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীরা (এ্যাটলি-বেভিন-ক্রিপস্) "ধনতান্ত্রিক লিবারা-লিজম"-কে যথেষ্ট গাল পাড়েন। আইয়ুব সাহেবরাও তাই করেছেন।

দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীরা সাম্যবাদের হানায় সন্ত্রস্ত; সাম্যবাদকে প্রতিহত করবার জন্যেই এঁদের "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ"। আইয়ুব সাহেব প্রভৃতিও "এক প্রবল রাজনৈতিক ধারা"র অগ্রগতি দেখে দুর্ভাবনাগ্রস্ত, কাজেই সাম্যবাদের অসুস্থ রাজনীতিকে প্রতিহত করে মধ্যপন্থার "সুস্থ রাজনীতি" চালু করার জন্যেই কলম ধরেছেন।

আইয়ুব সাহেব প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ 'পণ্ডিত' এবং 'বুদ্ধিবিলাসী'। তবুও সবিনয়ে কয়েকটা কথা তাঁদের কাছে নিবেদন করতে চাই। নৈয়ায়িক বিচারের একটা নিয়ম হল পূর্বপক্ষ কি বলে সেটাকে সঠিকভাবে উপস্থিত করা, তারপর খণ্ডন করবার কাজ। অথচ, আইয়ুব সাহেবরা এ নীতি মেনে নিয়ে আলোচনা করেছেন মনে হয় না। তা না হলে 'প্রলেটারিয়ান ডিক্টেটরশিপ' ও 'ফ্যাশিস্ট ডিক্টেটরশিপ' নিয়ে তাঁরা এমন অদ্ভুত, ধোঁয়াটে আলোচনা করবেন কেন? ধনতান্ত্রিক লিবারালিজমে 'স্বাধীনতা'ই বা খুঁজে পাবেন কেন? মার্কসবাদ-নিধনের অনির্বচনীয় আনন্দে তাঁরা আত্মহারা হোন, এ অধিকার

তাঁদের নিশ্চয়ই আছে ; কিন্তু "সাম্যবাদী একনায়কত্বে"র মার্কসবাদী বিশ্লেষণ খণ্ডন না করে তুচ্ছ উপমা প্রয়োগ করে 'ডিক্টেটরশিপ একটি ক্ষুদ্র দলের একাধিপত্য', "শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব" বললে তাই শোনায় কিন্তু ডিক্টেটরশিপ হচ্ছে মানব প্রগতির প্রতিবন্ধক— এ সব উচ্চাদের কথা বললে সদুদ্দেশ্য প্রমাণ হয় না, তর্ককুশলতা তো নয়ই।

অবশ্য আইয়ুব সাহেব প্রভৃতি নেতাদের রাজনীতি যখন একবিশেষ "দলীয়" রাজনীতি, সে রাজনীতির মহৎ কর্তব্য যখন সোভিয়েট কুৎসাপ্রচার, গালভরা কথার আড়ালে সাম্রাজ্যবাদ-আশ্রিত দক্ষিণপন্থী সমাজবাদই যখন তাঁদের মোক্ষলাভের প্রশস্ত পথ, তখন মার্কসবাদ-খণ্ডনের জন্যে, সোভিয়েটের ভূমিকা হেয় করবার জন্যে, তাঁরা যে মিথ্যাশ্রয়ী অস্বচ্ছ পথ নেবেন, অবাস্তব কেতাবী তত্ত্ব আলোচনা করে কিছু পরিমাণে বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করবেন, এটা খুবই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক।

সেজন্যেই তাঁরা 'ফ্যাশিস্ট ডিক্টেটরশিপ' ও 'প্রলেটারিয়ান ডিক্টেটরশিপ'কে সগোত্র বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, শত্রু নিধনের অনির্বচনীয় আনন্দে আত্মহারা হন। অথচ 'ফ্যাশিস্ট ডিক্টেটরশিপ' ও 'প্রলেটারিয়ান ডিক্টেটরশিপে'র পার্থক্য অমার্কসবাদী সৎ বুদ্ধিজীবীরাও জানেন। আজকের দিনের রাষ্ট্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, শ্রেণী-শাসনের দিক থেকে এরা তিন পর্যায়ের—(১) বুর্জোয়া-শাসিত রাষ্ট্র (২) প্রলেটারিয়ান-শাসিত রাষ্ট্র ও (৩) কয়েকটি বিপ্লবীশ্রেণীর দ্বারা সমবেতভাবে শাসিত রাষ্ট্র। আইয়ুব সাহেবরা না জানলেও একথা ঠিক যে রাষ্ট্রব্যবস্থা শ্রেণীনিরপেক্ষ নয় ; রাষ্ট্র হল শ্রেণী-কর্তৃত্বের যন্ত্রস্বরূপ, যে যন্ত্রের সাহায্যে এক বা একাধিক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর উপর নিজেদের 'ডিক্টেটরশিপ' বহাল রাখে। কাজেই 'ডিক্টেটরশিপ' শ্রেণী-শাসন মাত্রেই রয়েছে ; প্রশ্ন হল, "কোন্ শ্রেণী অন্য কোন্ শ্রেণীর উপর নিজের শাসন অব্যাহত রেখেছে ?" 'ফ্যাশিস্ট ডিক্টেটরশিপ' ও 'সাম্যবাদী ডিক্টেটরশিপ', তাই 'ডিক্টেটরশিপে'র দিক থেকে সদৃশ ; কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্যটা মৌলিক, সাদৃশ্যটাই অবান্তর। কারণ, (১) ফ্যাশিস্ট ডিক্টেটরশিপ হল মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের "ডিক্টেটরশিপ" অগণিত জনতার উপর, আর প্রলেটারিয়ান ডিক্টেটরশিপ-নির্বিত্ত শ্রেণীর 'ডিক্টেটরশিপ' মুষ্টিমেয় ধনিক-বণিকদের ওপর। (২) ফ্যাশিস্ট ডিক্টেটরশিপ বিভিন্ন বিরোধী-শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়; শোষক-শোষিত, ধনী-নির্ধন, এদের পরমায়ুকে অক্ষয়

করবার জন্যেই, নির্বিত্ত জনতার মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যেই, এর রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক সব ব্যবস্থা। অন্যদিকে সাম্যবাদী ডিক্টেটরশিপ হল মেহনতী জনতার ডিক্টেটরশিপ, সমষ্টিকল্যাণে ধনোৎপাদন, শিক্ষা-সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ, যেখানকার বৈশিষ্ট্য। (৩) অর্থনীতির দিক থেকে ফ্যাশিস্ট ডিক্টেটরশিপ হল ফিনান্স ক্যাপিটালের, সব চাইতে দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের ডিক্টেটরশিপ, উৎপাদন উপকরণের মালিকদের উন্মুক্ত হিংস্র একনায়কত্ব। এর রূপ হল রাজনৈতিক গুণ্ডামি, শ্রমিক-কৃষক, পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের উপর অকথ্য অত্যাচার। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্রমিকপ্রসারের জায়গায় এ ব্যবস্থায় দেখা যায় শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্রমিক সংকোচন, জাতিবৈরীর উন্মুক্ত সমর্থন, বিজ্ঞানে অনাস্থা, পশু-মানুষের আরাধনা, আরও কত কি। সাম্যবাদী ডিক্টেটরশিপে, বিত্তবানদের শোষণ নিঃশেষিত হওয়া ও উৎপাদন-উপকরণের মালিকানা সমষ্টির। কাজেই ক্রমপ্রসারী, সুপরিকল্পিত অর্থনীতির বনিয়াদের উপর এখানে শিক্ষা-সংস্কৃতির অবাধ উন্মুক্ত বিস্তার, সামাজিক সহযোগিতার পথে ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত বিকাশ জ্ঞানে, কর্মে, আনন্দে। (৪) অনেক বুদ্ধিজীবীদের ধারণা আছে যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে ধনতান্ত্রিক লিবারালিজমে 'স্বাধীনতা' আছে, 'সাম্যবাদী ডিক্টেটরশিপে' এই স্বাধীনতার প্রত্যাহরণ। কিন্তু এ ধারণা সৎ বুদ্ধিজীবীদের থাকবার কথা নয়। 'স্বাধীনতা', 'গণতন্ত্র' এ সব অবাস্তব প্রত্যয়মাত্র নয়, বাস্তব সামাজিক পরিবেশের সঙ্গেই এদের সম্বন্ধ এবং বাস্তব সামাজিক জীবনযাত্রা-পদ্ধতির প্রয়োজনের সঙ্গেই এদের স্বরূপ জড়িত। ফিউডাল অভিজাত সমাজের তুলনায় তাই ধনতান্ত্রিক লিবারালিজমে 'স্বাধীনতা' 'গণতন্ত্র' বেশি ; অধিকারসাম্য এ সমাজে খানিকটা প্রতিষ্ঠিত। "আইনের চোখে সবাই সমান" এ নীতি ফিউডাল অচলায়তন সমাজের তুলনায় এক বিরাট পদক্ষেপ। কিন্তু আজ যখন পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ ভূমিতে সমাজতান্ত্রিক, নয়া-গণতান্ত্রিক সমাজের অভ্যুদয় ঘটেছে 'বুর্জোয়া লিবারালিজমে'র অধ্যায় অতিক্রম করে সমাজ এগিয়ে গেছে আর এক ধাপ, তখন সমাজের ফেলে-আসা অধ্যায়ের জন্যে বিলাপ, অদ্ভুত নয় কি ? তাছাড়া, 'ধনতান্ত্রিক লিবারালিজমে'র তো মৃত্যু ঘটেছে অনেকদিন। ধনতন্ত্র আজ প্রবেশ করেছে একচেটিয়া পুঁজির যুগে—সাম্রাজ্যবাদের যুগে ; এই মুমূর্ষু সাম্রাজ্যে "লিবারালিজম" আবিষ্কার করা বুদ্ধিবিলাসীদের পক্ষেই সম্ভব সচেতন, অন্তবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে সম্ভব নয়।

○

আর ধনতান্ত্রিক লিবারালিজমের দেশ তো নিশ্চয়ই ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা। আজ কি এটা তর্কের বিষয় যে এ সব দেশে বিত্তবানদের হাতে, মূলধনীদের হাতেই সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ? আর্থিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাই যদি না রইল, তবে প্রকৃত রাজনৈতিক বা অন্য কোন রকমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাই যে সম্ভব নয় এ তত্ত্ব কি 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা' স্বীকার করেন না ? অভুক্ত মানুষ, বেকার মানুষ, জীবিকা অর্জনের জন্যেই যে মানুষের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তাদের "ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত বিকাশে"র বাস্তব সুযোগ এ সব সমাজে রয়েছে কি ? অবশ্য তিন বছর ও পাঁচ বছর পর পর ভোট দেবার অধিকারই যদি 'গণতন্ত্র', 'স্বাধীনতা'র মূল কথা হয়, তাহলে প্রশ্নটা স্বতন্ত্র। অথচ, ধনতান্ত্রিক লিবারালিজমের (১) আইনের চোখে সবাই সমান (২) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার (৩) নারী-পুরুষ সমানাধিকার সোভিয়েট দেশে তো আছেই, উপরন্তু সোভিয়েট প্রলেটারিয়ান গণতন্ত্রে 'স্বাধীনতা' ও 'গণতন্ত্র' কেতাবী তত্ত্ব অতিক্রম করে, বাস্তব ও মূর্ত হয়ে উঠেছে, প্রত্যেকটি নাগরিকের জীবনে। গণতান্ত্রিক জীবনধারার যে ব্যাপকতম বিকাশ সোভিয়েটে ঘটেছে, রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে, জনসাধারণ যে-রকম সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে, তা দেখে, অ-সাম্যবাদী মানবপ্রেমিক চিন্তানায়কেরাও মুগ্ধ হয়েছেন। স্ত্রী-পুরুষ, জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক সোভিয়েট নাগরিক নিয়মতন্ত্র অনুসারে এবং বাস্তবে কাজের অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, চিৎপ্রকর্ষের বাস্তব সুযোগ ও পরিবেশ, আর্থিক নিরাপত্তার অধিকার পেয়েছে এবং এর দৌলতে জ্ঞানে, কর্মে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, শৌর্যে, বীর্যে, ব্যক্তিত্বের অবাধ বিকাশের পরিবেশসৃষ্টিতে সোভিয়েট ভূমি আজ সারা দুনিয়ার তীর্থভূমি, মানবপ্রগতির একমাত্র দীপশিখা।

প্রশ্ন হবে, মানুষের সৃজনীশক্তিকে উন্মুক্ত করাই যদি সোভিয়েটের ভূমিকা হয়, সর্বাঙ্গীন মুক্তির ধারা ঠিক খাতে বইয়ে দেওয়াই যদি এর কাজ, তাহলে সোভিয়েটে প্রলেটারিয়ান 'ডিক্টেটরশিপ' চালু আছে কেন ? 'ডিক্টেটরশিপ' মাত্রেই তো মানবপ্রগতির পক্ষে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক। আর ডিক্টেটরশিপ একটা দ্রুত বিলীয়মান অবস্থায় নয়, সোভিয়েটের ইতিহাস যার সাক্ষী। এ প্রশ্ন অবশ্য পুরনো ও একেবারেই কেতাবী এবং মার্কসবাদী নেতারা বহুদিন ধরে এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। মার্কসবাদ ইতিহাস ঘেঁটে দেখিয়েছে যে

বিপ্লবীযুগে রাষ্ট্র ও গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজন আছে; বিশেষভাবে মূলধনী বিত্তবানের সমাজ থেকে সমাজবাদ প্রবর্তিত করতে হলে নৈরাজ্যবাদীদের মত 'রাষ্ট্র চাই না' এ আওয়াজ তোলা চলে না। 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদী' প্লেখানভ, কাউটস্কি প্রভৃতির সঙ্গে মতবাদগত লড়াইয়ে লেনিনও এ তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘ, বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। মূলধনী সমাজ থেকে সমাজবাদে যেতে হলে 'রাষ্ট্র' প্রয়োজন, তবে এ উৎক্রান্তির অধ্যায়ে সাধারণ, বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী রিপাবলিক হলে চলবে না; এ অধ্যায়ে প্রয়োজন হল এক নতুন রাষ্ট্রের, পারী কমিউনে যার প্রথম পরিচয় মিলেছিল।

বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী শাসন, গণতান্ত্রিক লিবারালিজমের আপেক্ষিক প্রগতিশীলতা কোন মার্কসবাদীই অস্বীকার করেননি। ফিউডাল অভিজাত সমাজের তুলনায় বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী শাসন, বুর্জোয়া গণতন্ত্র নিশ্চয়ই প্রগতিশীল ছিল। কিন্তু মার্কসবাদী এর ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা এবং আপেক্ষিক মূল্য সম্পর্কে বরাবরই সচেতন। মার্কস 'পারী কমিউন'-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন যে বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র শোষণের উপরই প্রতিষ্ঠিত; বুর্জোয়া গণতন্ত্র আসলে "নিষ্পেষিত জনতার গণতন্ত্র"; জনসাধারণের দিক থেকে বাস্তবে যা ডিক্টেটরশিপের সামিল। মার্কস তাই দেখিয়েছিলেন যে বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির মানে হল, কয়েক বছর পর পর জনসাধারণ "স্বাধীনভাবে" ঠিক করবে বিত্তবান শ্রেণীদের কারা আগামী কয়েক বছর তাদের "প্রতিনিধিত্ব করবে, তাদের ওপর শোষণ অব্যাহত রাখবে।" কাজে কাজেই, গণতন্ত্র, বিশুদ্ধ গণতন্ত্র হতে পারে না; গণতন্ত্রের সঙ্গে শ্রেণীশাসনেব প্রশ্ন বিজড়িত এবং সেজন্যে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এ সবকে বুঝতে গেলে এদের বাস্তব মূর্ত করে তুলতে হবে, সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে, বুঝতে হবে "কাদের গণতন্ত্র", কাদের উপরেই বা "ডিক্টেটরশিপ"। মার্কস তাই দেখিয়েছিলেম যে পারী কমিউনে গড়ে উঠেছিল "এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র প্রলেটারিয়ান রাষ্ট্র", যে রাষ্ট্রের কাজ হল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধ করা বিত্তবান শ্রেণীদের প্রতিরোধ ধ্বংস করে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রতিরোধ করে গড়ে তোলা প্রলেটারিয়ান "গণতন্ত্র", শ্রমজীবী জনসাধারণেব "গণতন্ত্র"। কাজেই প্রলেটারিয়ান ডিক্টেটরশিপ বুর্জোয়া গণতন্ত্র নয়, এ হচ্ছে ডিক্টেটরশিপ, বুর্জোয়াদের উপর একনায়কত্ব; আবার অন্যদিক থেকে এ রাষ্ট্র

হল মেহনতী জনতার 'গণতন্ত্র' (democracy for the toilers)। অক্টোবর বিপ্লবে রুশ শ্রমিক শ্রেণী, ধনতন্ত্রের ক্ষয় এবং সমাজবাদী সমাজের অভ্যুদয়ের কালে, বাস্তব অবস্থার উপযোগী রাষ্ট্ররূপ খাড়া করেছিল। এ রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে নতুন সমাজের যে সমস্ত উপাদান পুরনো সমাজের চাপে নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল, তাদের 'মুক্তি' ঘটল, বুর্জোয়াদের শোষণ এবং শাসনযন্ত্র বিধ্বস্ত করে স্থাপিত হল শ্রমজীবী জনতার স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি, মানব মুক্তি একধাপ এগিয়ে গেল; বুর্জোয়া একনায়কত্ব উচ্ছেদের রাস্তায় স্থাপিত হল 'প্রলেটারিয়ান ডিক্টেটরশিপ' যার অন্য নাম হল প্রলেটারিয়ান গণতন্ত্র এবং যার মর্মবাণী হল জনতার স্বাধিকার লাভ, মেহনতী জনতার 'গণতন্ত্র'।

"গণতান্ত্রিক সমাজবাদী" নেতারা যদি সত্যিই মানবপ্রগতি চাইবেন, ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত বিকাশে বিশ্বাসী হবেন, তবে বুর্জোয়া ডিক্টেটরশিপের উপর 'লিবারালিজমে'র প্রলেপ লাগিয়ে এর কদর্য-কুৎসিত দিকটা ঢেকে রাখছেন কেন? আজকের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিবেশে 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র'-এর যুগ শেষ হয়েছে, প্রলেটারিয়ান গণতন্ত্রের যুগ হয়েছে আরম্ভ। নির্বিত্ত জনতা যে পূর্ণতর গণতন্ত্র গড়ে তুলছে, মানবমুক্তির পথ নির্মাণ করছে, সে পথকে জ্ঞানে, প্রেরণায় আলোকিত করে তোলাটা কি সৎ সাহিত্যিকদের কাজ নয়?

অবশ্য কথা উঠবে "ডিক্টেটরশিপ দ্রুত বিলীয়মান অবস্থা নয়", কাজেই ডিক্টেটরশিপ থাকতে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র কায়েম হচ্ছে না। কিন্তু ইতিহাস যে আমাদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা ধরে নিচ্ছেন কেন? প্রলেটারিয়ান ডিক্টেটরশিপের আয়ুকাল কতদিন হবে এ সম্পর্কে মার্কসবাদ কোন সময় নির্দেশ করেনি। কাজেই সোভিয়েটে ডিক্টেটরশিপ বিলীন হচ্ছে না কেন কথাটা অবাস্তব। ডিক্টেটরশিপ বিলীন হবার বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, অথচ ঐ ব্যবস্থা বিলীন হচ্ছে না এটা গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা দেখাননি। তাঁরা চান 'ডিক্টেটরশিপ' সত্ত্ব সত্ত্ব বিলুপ্ত হোক; মার্কবাদীরাও তাই চান। কিন্তু মার্কসবাদীরা বলেন যে প্রলেটারিয়ান ডিক্টেটরশিপের যা ঐতিহাসিক দায়িত্ব, বুর্জোয়াদের নির্মূল করা, সে ঐতিহাসিক দায়িত্বসম্পন্ন হবার আগে, এই ডিক্টেটরশিপ বিলীন হবে কেমন করে? সোভিয়েট দেশে দেশী বুর্জোয়ারা, বিত্তবানশ্রেণীরা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়েছে; কিন্তু সোভিয়েটের চারদিকে এখনও রয়েছে আন্তর্জাতিক মূলধনী মহাপ্রভুরা। আন্তর্জাতিক মূলধনী সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ুক, বুর্জোয়া

আক্রমণের সম্ভাবনা তিরোহিত হোক, তখনও যদি সোভিয়েটে ডিক্টেটরশিপ বিলীন না হয় তবে মার্কসবাদীরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের সঙ্গে নিশ্চয়ই মিলিত হবে 'গণতন্ত্র' রক্ষার জন্যে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় যখন আন্তর্জাতিক মূলধনীরা সোভিয়েট ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে সাবাড় করবার চেষ্টায় এ্যাটম-বোমা, বীজাণু-বোমার পাহাড় বানাচ্ছে, তখন সোভিয়েট কেন প্রলেটারিয়ান রাষ্ট্রযন্ত্র বহাল রাখছে, এ প্রশ্ন তোলা ছেলেমানুষি নয় কি ?

তাছাড়া গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা যখন "বুর্জোয়া লিবারালিজম" (এক-নায়কত্ব) অতিবৃদ্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার ভিতর সৌন্দর্য খুঁজে পাচ্ছেন তখন প্রলেটারিয়ান একনায়কত্বের যৌবনকালেই এর মৃত্যু কামনা করছেন কেন ? এ পক্ষপাত কেন ? ইংলণ্ডের বুর্জোয়া-একনায়কত্ব কয়েক শ' বছর ধরে চালু রয়েছে ; এর বিলীন হবার কোন লক্ষণই নেই। ফ্রান্সেও বুর্জোয়া একনায়কত্বের বয়স দেড়শ'র উপর হল। আমেরিরিকার রাষ্ট্ররূপও বেশ প্রাচীন। এ সব রাষ্ট্ররূপে জরা এসেছে অনেকদিন, এরা আজ মৃত্যুপথযাত্রী। তবুও 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা' চান এরা আরও কিছুদিন পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাক। আর প্রলেটারিয়ান ডিক্টেটরশিপের এখন সবেমাত্র যৌবন, তার ঐতিহাসিক কাজ এখনও সম্পন্ন হতে বাকি ; অথচ এ ব্যবস্থা পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে না কেন এ প্রশ্ন নিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা বড়ই বিব্রত। এর কারণটা কি ?

কারণটা হল 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা' 'বুর্জোয়া-একনায়কত্বকেই' (লিবারালিজম্) শাশ্বত বলে ধরে নিয়েছেন, সমাজ বিবর্তনের ধারাপথে যে এর আবির্ভাব আবার সমাজ বিবর্তনের ডায়ালেকটিকসই যে একে বিনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে, সমাজের যে আজ আবার নতুন ভঙ্গিতে উৎক্রান্তির দিন এসেছে, শ্রেণীহীন সমাজ গড়বার জন্যে প্রাথমিক কাজ যে বুর্জোয়াদের শাসনযন্ত্র, শোষণের হাতিয়ার বিধ্বস্ত করা, প্রলেটারিয়ান গণতন্ত্র যে পূর্ণতর গণতন্ত্র এ সব কথা গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা বোঝেন না, অন্তত না বোঝার ভান করেন। তাই বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে তাঁরা অনাদি, অনন্ত বলে চালাতে চান (অবশ্য গণতান্ত্রিক সমাজবাদের নামে); বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটলে 'গণতন্ত্রের মৃত্যু' ঘটল বলে আর্তক্রন্দন জুড়ে দেন ; সৎ সাহিত্যিক, গণতন্ত্রকামী সংস্কৃতিকর্মীদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেন। ফলে, তাঁরা

ভাবী সম্ভাবনার পথরোধ করে দাঁড়ান। সমাজের বাস্তব দাবির দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন। বিলীয়মান অতীতের প্রেতাত্মা তাদের ঘাড় থেকে আর নামে না। এই হচ্ছে "গণতান্ত্রিক সমাজবাদী"দের রাজনীতির স্বরূপ।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা নিশ্চয়ই জানেন যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরাও ইতিহাসের এক অধ্যায়ে রাজারাজড়াদের সিংহাসনচ্যুত করেছিল। তখনকার গণতন্ত্রীরা রিপাবলিকান ও মনার্কিস্টদের অধিকারসাম্য নিয়ে ঘামাননি। অথচ আজকের দিনের গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা বুর্জোয়াদের অধিকার বিচ্যুতির সম্ভাবনা দেখলেই আতংকিত হয়ে ওঠেন, প্রলেটারিয়ানদের সঙ্গে বুর্জোয়াদের অধিকারসাম্য না থাকলে ডিক্টেটরশিপের ভূত দেখতে থাকেন। অথচ বুর্জোয়াদের স্বাধীনতা ধ্বংস না করতে পারলে নিরিত্তজনতার 'স্বাধীনতা' সম্ভবই নয়। আইয়ুব সাহেব প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ জানেন যে বুর্জোয়াদের নিয়মতন্ত্র অনুযায়ী জনসাধারণের "সভা করবার অধিকার" স্বীকৃত। কিন্তু যে সমাজে বাড়িঘর, হলঘর সবই বুর্জোয়াদের অধিকারে সেখানে বাস্তবে এ স্বাধীনতার অর্থ কি? সোভিয়েট বিপ্লবে তাই বিত্তবানদের প্রাসাদ বাজেয়াপ্ত করে জনসাধারণের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তারা এভাবে সভাসমিতি করবার বাস্তব অধিকার পায়। এভাবে মালিক-মহাজনদের অনেক স্বাধীনতা খর্ব করেই যে সোভিয়েট গণতন্ত্র গড়ে উঠেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এজন্যে কি গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা বিচলিত? 'গণতন্ত্র', 'স্বাধীনতা' যদি শুধু কেতাবী তত্ত্ব না হয়, গণতন্ত্র বলতে যদি কোটি কোটি জনতার 'অধিকারসাম্য' ও 'গণতন্ত্র'কে বোঝায়, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ যদি গণতন্ত্রের আবশ্যিক শর্ত হয়, তাহলে প্রলেটারিয়ান গণতন্ত্রের চাইতে ব্যাপকতর গণতন্ত্র দুনিয়ার কোন দেশে আর নেই।

'গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা' অবশ্য প্রশ্ন তুলবেন, 'ডিক্টেটরশিপ', 'পীড়ন', এসব উপায় হিসেবে খারাপ।' সাম্যবাদের 'উদ্দেশ্য' না হয় সৎ হল কিন্তু 'উপায়' যদি অসৎ হয়, তাহলে সৎ উদ্দেশ্যও কলঙ্কমলিন হতে বাধ্য। কিন্তু কথাটা হল এই যে সৎ, অসৎ, উচিত-অনুচিতের ধারণা স্বয়ম্ভূ নয় এবং নিরঙ্কুশ তর্কের সাহায্যে কতকগুলি চিরন্তন বিধি-বিধান আবিষ্কার করাও অসম্ভব। ভালমন্দ, সৎ-অসৎ, বিচারের জন্যে ভাববাদী নীতিবাগীশেরা অবশ্য এ ধরণের কতকগুলো সনাতন বিধিবিধান আবিষ্কার করেন; কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজ-

বাদীরাও যে এ পথ ধরলেন এটাই আশ্চর্য। সমাজবাদীদের অন্তত জানা উচিত যে 'সৎ' ও 'অসৎ' এর ধারণা বাস্তব জীবনযাত্রা পদ্ধতির দাবির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনের দাবিকে কেন্দ্র করেই এদের উত্থানপতন ও পরিণতি। কোন্ ব্যবস্থা 'সৎ', কোন উপায়ইবা 'অসৎ' এ প্রশ্ন বিচার করতে হলে "বাস্তব জীবনযাত্রা পদ্ধতির দাবি কি? সামাজিক প্রগতির জন্যে প্রয়োজনীয় কি?" এসবের জবাব দিতে হবে। হিংসা ভাল না অহিংসা ভাল, এ প্রশ্নের জবাব তাই নীতিশাস্ত্র ঘেঁটে দেওয়া সম্ভব নয়, বাস্তব অবস্থার প্রয়োজন ও দাবি, উদ্দেশ্যের উপযোগিতা, এসব দেখে তবেই এসব বিষয়ে রায় দেওয়া যাবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ভারতের দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীরা 'গণতান্ত্রিক' হলেও সাম্যবাদীদের উপর পীড়নের উৎসাহী সমর্থক। উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদীদের হিংসানীতি ঘৃণ্য কিন্তু জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের হিংসানীতি (১৯৪২এর আন্দোলনে) যদি বাস্তব সামাজিক দাবির সঙ্গে সঙ্গত হয় তবে তা যে শ্রদ্ধেয় হতে পারে এ কথা সমাজবাদীরাও স্বীকার করবেন। রক্তপাত, আঘাত এসব থাকলেই যে উপায়টা হল অসৎ এ তত্ত্ব গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরাও অনেক সময় স্বীকার করেন না। তাই যদি হয়, তবে আজকের দিনের ধনিক-বণিকের প্রচণ্ড হিংসানীতিকে স্তব্ধ করে দিয়ে সামাজিক প্রগতির জন্যে উৎপাদনী শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে, যদি 'ডিক্টেটারশিপে'র প্রয়োজন হয়, তবে তো তা হবে সমাজবাস্তবের দাবিসম্মত সৎ উপায়। ব্যক্তিদেহের যক্ষারোগ নির্মূল করবার জন্যে, রোগীকে নিরাময় করবার জন্যে যদি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা স্বীকার করেন, নিউমোথোরাক্সকে স্বাভাবিক সৎ উপায় বলে স্বীকার করে নেন, তাহলে সমাজদেহের রোগমুক্তির জন্যে, সুস্থ সবল সমাজদেহ গড়বার জন্যে, জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে, বলপ্রয়োগে পীড়নে তাঁদের এত আপত্তি কেন?

অবশ্য মার্কসবাদীরা হিংসা ও পীড়নের ভক্ত মোটেই নয়। গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা যাকে বলবেন সৎ উপায় যেমন "অহিংস পার্লামেন্টারী পদ্ধতি" "পরস্পর-আলোচনা", 'সুস্থ রাজনীতি', মার্কসবাদীদের তত্ত্বকথায় এসবের স্থান আছে। যদি সুস্থ গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী প্রথায় প্রবন্ধ লিখে ইতিহাসের নবজাতক সমাজবাদের অভ্যুদয় সম্ভব হত তবে, মার্কসবাদীদের

চাইতে কেউই বেশি সুখী হত না। কিন্তু কথা হল বুর্জোয়া শ্রেণী স্বেচ্ছায় ইতিহাসের পাতা থেকে বিদায় নেবে না এবং যতদিন এ জীবিত থাকবে ততদিন এর বাস্তব হিংসানীতির দৌরাত্ম্যে জনতার জীবনে "স্বাধীনতা", "সুখ" ও "শান্তি" আসা অসম্ভব। সমাজে আজ তাই বুর্জোয়া শাসন ও ক্রমপ্রসারী জনতার শক্তির মধ্যে বিরোধী সংঘর্ষ চলেছে; এ সংঘর্ষের রাস্তায় নতুন সমাগম সমন্বয় প্রকাশ পাচ্ছে। এ সমন্বয় যখন বিরোধহীন সমন্বয়ের একটানা পথ নয়, তখন বিরোধ, সংঘর্ষ, ডিক্টেটরশিপ যদি সমাজের ক্রমবর্ধমান অগ্রণী শক্তিগুলির সহায়ক হয়, সমাজের প্রকৃতির পথ প্রশস্ত করে তোলে, সামাজিক কর্তব্যসিদ্ধিকে সাহায্য করে, তাহলে এসব উপায়ের দারুণ সংগঠক, সংহতি-কারক ও রূপান্তরকারী অবদান যে আছে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা ভাবস্রোতে হয়ত ডুবে আছেন; তাই তাঁরা সমাজের বাস্তব জীবনের সম্পর্কচ্যুত "বিশুদ্ধ" "নিরালম্ব" "সৎ উপায়" ও কর্মপন্থা খাড়া করেছেন, নির্বিত্ত জনতার একনায়কত্বকে নীতিবাগীশদের মত 'অসৎ উপায়' বলে বাতিল করেছেন। অথচ নতুন সমাজবাদী সমাজের অভ্যুদয় নবজন্মের মত; বিপ্লবের পথে এর প্রকাশ। মায়ের অশেষ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কল্যাণময় শিশুর আবির্ভাব পৃথিবীর বুকে। ইতিহাসের নবজাতক 'সমাজ-বাদী' সমাজের জন্মও ঠিক তেমনি সহজ ছন্দে ঘটে না; সংঘর্ষ, বিরোধ, বেদনার মধ্য দিয়েই ঘটে। বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে প্রগতিকামীরা এগুলিকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নেন, 'সৎ' 'অসৎ' এর কেতাবী তর্ক তোলেন না। গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের তাই বোঝা উচিত যে আজকের দিনের মূলধনী সাম্রাজ্যের আবশ্যক নীতিকে নির্মূল করে, সামাজিক প্রগতির জন্যে, উৎপাদনী শক্তিকে অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে, বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে; নির্বিত্ত শ্রেণীর "একনায়কত্ব" একমাত্র উপায়। এ উপায় সামাজিক প্রগতির, বর্তমান অধ্যায়ে মানবপ্রগতির বাস্তব দাবিসম্মত; কাজেই 'সৎ' উপায়।

তাছাড়া, উদ্দেশ্যই হল মূল বিষয়। পরিবর্তনের উদ্দেশ্যটি আয়ত্ত করতে পারলে বিপরীতধর্মী উপায় দিয়েও উদ্দেশ্য সফল করা যায়। নীতিবাগীশদের মত যদি ধরে নেওয়াও যায় যে বলপ্রয়োগ, ডিক্টেটরশিপ অবাঞ্ছনীয়, অসৎ উপায়, তাহলেও মার্ক্সবাদী সূত্র অনুযায়ী এই উপায় প্রয়োগ করে সাম্য-বাদের 'সৎ উদ্দেশ্য' নিশ্চিত জনতার মুক্তি অর্জন করা সম্ভব। আসলে

মার্কসবাদীরা উদ্দেশ্য ও উপায়কে পরস্পর নির্ভর বলে মনে করেন ; তাঁদের মতে উদ্দেশ্য ও উপায় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কাজেই ন্যায়বিলাসী (apriori) তর্কের সাহায্যে তাঁরা 'সৎ উপায়' নির্ধারণ করেন না, সৎ উদ্দেশ্যের উপযোগিতা দিয়েই এর নির্ণয় করেন। "সৎ উপযোগী উদ্দেশ্যের উপায়"ই তাঁদের মতে সৎ—তাছাড়া সৎ উপায়ের তাঁদের কাছে আর কোন মানে নেই। মার্কসবাদীরা যে কোন উপায়ের সমর্থক, একথা বলা ভুল। যে উপায় সৎ উদ্দেশ্যের উপযোগী, সামাজিক বাস্তবের দাবিসম্মত, মানবপ্রগতির পথে যে উপায় অবারিত করছে, সে উপায় তাঁরা গ্রহণ করেন "সৎ" উপায় হিসেবে।

আসল কথাটাই হল গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা 'সাম্যবাদী একনায়কত্বের' উদ্দেশ্য সৎ, এটাই স্বীকার করেন না। "উদ্দেশ্য" ও "উপায়" নিয়ে সেজন্যই তাঁদের নানারকমের তর্ক তুলতে হয়। "সাম্যবাদী একনায়কত্বের" উদ্দেশ্য সৎ এটা যদি তাঁরা বাস্তবিকই স্বীকার করতেন, তাহলে এর 'উপায়' যে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী উপায়" এটাও স্বীকার করতেন। এটা স্বীকার করতেন, যে ঐ উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে, মজুরিদাসত্ব, মুনাফাবাজি তুলে দিতে হবে, শোষকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে বলপ্রয়োগ করে। পুরনো সমাজের গর্ভ থেকে যখন নতুন সমাজের জন্ম আসন্ন, বলপ্রয়োগই যখন সেই জন্মসময়ের একমাত্র ধাত্রী, তখন সেই ধাত্রীর কাজকে তাঁরা 'অসৎ উপায়' বলে নীতিবাগীশসুলভ রায় দিতেন না তা হলে।

আইয়ুব সাহেব প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের "রাজনীতি" বিশ্লেষণ করা হল। দেখা যাবে যে এ "রাজনীতি" স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল নয়। ইওরোপের দক্ষিণপন্থী "সমাজতন্ত্রী" ও আমাদের দেশের জয়প্রকাশী "সমাজতন্ত্রী"দের কাছ থেকে এঁদের "মধ্যপন্থা"র তত্ত্ব ধার করা; 'মধ্যপন্থা'র রাজনীতি আজ সারা দুনিয়ার প্রগতিশীল মানুষের কাছে অত্যন্ত রকম পরিচিত। এর মর্মবাণী হল সুন্দরকথার আড়ালে, সোভিয়েট-বিরোধী, মার্কসবাদ-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-অনুমোদিত তত্ত্ব প্রতিপন্ন করা। আইয়ুব সাহেব প্রভৃতিরা 'বর্ম'-এর পাতায় তাই করেছেন।

আইয়ুব সাহেব প্রভৃতি নেতারা সমকালীন সাহিত্য-নীতি নিয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নি, শুধু মার্কসবাদের মূল হস্তাবলেপ পরিহার করে "সাহিত্যিকের স্বরাজ" অর্জন করতে হবে এই তত্ত্বোটুকু ঘোষণা

করেছেন। মার্কসবাদী সাহিত্যনীতিটা আসলে কি? মার্কসবাদী নীতির উপপাদ্য হল এই যে (১) নিবিত্ত জনতার সামনে আজ নতুন জগৎ গড়ে তোলার দায়িত্ব এসে পড়েছে, যে দায়িত্ব পালন করতে না পারলে সাম্যবাদী সমাজ বা নয়া গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ অসম্ভব। (২) এ দায়িত্ব পালন করতে গেলে নতুন আদর্শ, নতুন জীবন দর্শন, মার্কসবাদী চেতনার সাংগঠনিক শক্তির সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। (৩) এ সব ভাবাদর্শ, মানবসম্পদ, শ্রেণী-নিরপেক্ষ হতে পারে না। কারণ সমাজে এখন বিরোধীসংঘর্ষ চলছে—পুরাতন বিলীন হচ্ছে এবং ভাবী সম্ভাবনা ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে। জীবন ও মৃত্যু, অতীত ও ভাবী সম্ভাবনা, এ দুই বিরোধীশক্তির মধ্যে "নিরপেক্ষ" থাকা সম্ভব নয়। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ আর ইতিহাসের নবজাতক 'সোভিয়েট ও নয়াগণতান্ত্রিক সমাজ',—এ দু'য়ের ভিতর একপক্ষ বেছে নিতেই হবে। (৪) কাজেকাজেই, বিশুদ্ধ সনাতন 'সত্য', 'সৌন্দর্য', এসবের নামে পুরনো ধ্যানধারণা, ভাবাদর্শ—এসবের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া সম্ভব নয়। (৫) এসব কথা মতাদর্শের সব বিভাগেই খাটবে, রাজনীতির বেলায় খাটবে আর দর্শন, নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যের বেলায় খাটবে না এমন নয়।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদী নীতি অনুসারে আইয়ুব সাহেবরা 'অর্থনীতির ক্ষেত্র' ও 'শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্র'-এর মাঝখানে চীনের প্রাচীর খাড়া করেছেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিকী "পরিকল্পনায়" বোধ হয় তাঁদের বিশেষ আপত্তি নেই—অবশ্য বিকেন্দ্রণ সহ (বার্নহাম না গান্ধীজির মতানুযায়ী?) তবে মনোজাগতিক ব্যাপারে পরিকল্পনা চলবে না, সেখানে চাই শিল্পীসাহিত্যিকের "স্বরাজ"। আইয়ুব সাহেবরা স্বীকার করেন যে আজ উৎপাদন সম্পর্কগুলি উৎপাদনশক্তির বিকাশের অন্তরায় হয়ে উঠেছে, আজকের দিনের বাস্তব জীবনের স্ববিরোধিতা নতুনের আবির্ভাব আসন্ন করে তুলছে, সমাজে আজ নতুন সমস্যা ও কর্তব্য এসে উপস্থিত হয়েছে—যে সমস্যা সমাধানের জন্যে কর্তব্যপালনের জন্যে তাঁরা আমদানি করেছেন "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ"। সমাজে যদি নতুন সমস্যা ও কর্তব্য আজ উপস্থিত না হত, তাহলে আইয়ুব সাহেবরাও "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ" প্রতিপন্ন করতে বসতেন না, ধনতান্ত্রিক লিবারালিজমের তত্ত্বই প্রতিপন্ন করতেন। কাজেই নতুন ধারণা, নতুন মতবাদ, নতুন 'স্বস্থ' রাজনৈতিক চিন্তা—এ সবের দারুণ সংহতিকারক, রূপান্তরকারী অবদান তাঁরাও মেনে নিয়েছেন।

তাই যদি হয়, জীবনযাত্রা-ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে আজ যদি সমাজে নতুন সমস্যা ও কর্তব্য এসে উপস্থিত হয়ে থাকে, তাহলে সমাজজীবনের তাগিদেই মার্কসবাদী সামাজিক ধারণা, মার্কসবাদী সাহিত্যনীতির ধারণার আবির্ভাব এবং প্রসার। এবং এ মতবাদকে "এক বিশেষ রাজনীতি" বলে বিব্রত হওয়া নিরর্থক।

আইয়ুব সাহেব প্রভৃতি নেতারা যদি সত্যিই সামাজিক অগ্রগতি চাইতেন, বাস্তবে সমাজবাদী হতেন, তাহলে ক্ষয়িষ্ণু শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে জনগণকে সংগঠিত করা যে অতি প্রয়োজনীয় একথা স্বীকার করতেন। যে সব শক্তি সমাজের বাস্তব প্রগতির পথে বাধা, যেসব শক্তিকে পরাভূত করবার জন্যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ভাব-সম্পদ, শিল্প-সাহিত্য, নীতি, সব ক্ষেত্রেই পুরনো,স্থিতিশীল, ক্ষয়িষ্ণু শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনতাকে ডাক দিতেন।

আজ মার্কসবাদই শুধু জনগণের মনকে উদ্বুদ্ধ করছে; মার্কসবাদের রূপান্তরকারী শক্তির সাহায্যে নতুন পৃথিবী গড়ে উঠছে, ক্ষয়িষ্ণু শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে মার্কসবাদই জনগণকে সংগঠিত করছে। মার্কসবাদ তাই আজ শুধু মুষ্টিমেয় বুদ্ধিবিলাসীর মনঃকল্পিত ধারণা নয়, মার্কসবাদ আজ বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এটাই কি আইয়ুব সাহেবদের দুর্ভাবনার কারণ?

আইয়ুব সাহেবদের কথাটা অনেকটা এ রকম: রাজনীতির ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে চূর্ণ করার জন্যে না হয় যুদ্ধ-বাহিনী চাই; কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতি তো নিরালম্ব মানসসম্পদ—এ ক্ষেত্রে যুদ্ধবাহিনী কেন? অর্থনীতির ক্ষেত্রে না হয় "সামষ্টিক ব্যবস্থা" হল, তাই বলে শিল্প-সাহিত্যের বেলায় "সামষ্টিক ব্যবস্থা" কেন? অর্থাৎ রাজনীতি ও অর্থনীতিতে না হয় মার্কসবাদ অনেকখানি মানাই গেল, কিন্তু শিল্প-সাহিত্যে চাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ—আর্ট ফর আর্টস্ সেক।

অথচ যে 'ব্যক্তি'টিকে নিয়ে এত আড়ম্বর, সে 'ব্যক্তি'টির কোন বাস্তব সত্তাই নেই। মার্কসবাদ দেখিয়েছে যে শিল্পী সাহিত্যিক যে 'স্বাধীনতা'র জন্যে দুর্ভাবনাগ্রস্ত, সেটা অবশ্যই বড় জিনিস। কিন্তু বুর্জোয়াসমাজে শিল্পী-সাহিত্যিকের সে 'স্বাধীনতা' নিঃশেষ হয়েছে অনেকদিন। বুর্জোয়া-সমাজে বৈশিষ্ট্যই হল এই যে এখানকার বন্ধন, বেতন-দাসত্ব যদিও একান্ত বাস্তব তবুও উৎপাদন-সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যের জন্যে এ সমাজে রয়েছে

একরকমের অলীক স্বাধীনতা, কল্পিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। মার্কস অনেকদিন আগেই দেখিয়েছিলেন যে বুর্জোয়াসমাজে পুঁজিই একমাত্র মূলসত্তা, এরই একমাত্র স্বাতন্ত্র্য সম্ভব; রক্তমাংসের মানুষ এ সমাজে পরাধীন, তার ব্যক্তি-সত্তার স্বাতন্ত্র্য এখানে কিছুই নেই।

ইংলণ্ড ও অন্যান্য পুঁজিবাদী সমাজে তবুও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন নিয়ে ভাবনার বাস্তব পরিবেশ আছে। কারণ এসব দেশে অবাধ বাণিজ্যের সঙ্গে, বুর্জোয়াবিকাশের আমলে "ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত বিকাশ চাই" এ আওয়াজ উঠেছিল। আজ একচেটিয়া পুঁজিবাদী-যুগে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে অগ্রসর দেশ-গুলিতেও এ আওয়াজের আর বাস্তব পরিবেশ নেই। ভারতের বেলায় তো এ ধরনের আওয়াজ একান্তই কেতাবী। ভারতের মত অনুন্নত শোষিত সমাজে, যেখানে জনতা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান থেকে বঞ্চিত, পশুজীবনের উর্ধ্বে ওঠবার বাস্তব-পরিবেশ যে সমাজের অধিকাংশ মানুষের নেই, সে সমাজের বুদ্ধিজীবীরা যখন বাস্তব গণতান্ত্রিক কর্তব্যের কথা না বলে, "জনগণের জন্যে সাহিত্য-শিল্প চাই" এ আওয়াজ না তুলে, রসসর্বস্ব, 'আর্ট আর আর্টস্ সেক'-এর আওয়াজ তোলেন তখন এঁদের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসি সংবরণ করাই কঠিন হয়ে পড়ে।

আইয়ুব সাহেবরা যে "সাহিত্যিকের স্বরাজ" খাড়া করেছেন, 'সাহিত্যের নির্মল সত্তা' "মার্কসবাদী দলীয় রাজনীতির প্রবেশে আবিল হচ্ছে" বলে উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন, এটা কি শুধু সাহিত্যের প্রতি দরদের জন্যে?

সাহিত্য যদি নিরালম্ব, সমাজ-অতিক্রমী না হয়, সমাজের বাস্তবজীবনযাত্রা-পদ্ধতির সঙ্গে যদি এর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকে, তাহলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে সাহিত্য-শিল্প শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হবে এটাই তো স্বাভাবিক। সমাজ-জীবন থেকে সাহিত্যের উৎপত্তি এবং সামাজিক জীবনযাত্রা-পদ্ধতির উপর এর প্রভাব। মার্কসবাদীরা এ তত্ত্ব বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। কাজেই সমাজ-অতিক্রমী 'বিশুদ্ধ' সাহিত্য হতে পারে না, এবং সমাজও শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে, বিশেষভাবে পুঁজিবাদী সমাজে, শিল্পী-সাহিত্যিক "জ্ঞান-গুণী"র একজন, জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের আত্যন্তিক বিচ্ছেদ। এই বাস্তব পরিবেশে, শিল্পী-সাহিত্যিকের উপলব্ধিতে এই বিচ্ছেদটাই বড় হয়ে দেখা দেয়; 'বিশুদ্ধ সাহিত্য'-এর নামে তাঁরা তাঁদের এই বিচ্ছিন্নতাকেই চরম বলে মনে করেন; "শিল্পী-সাহিত্যিক

কোন অধিনায়কের নির্দেশ নেবেন না", 'তাঁরা নিজেদের প্রতিভারই অনুগামী' এ সব অহংসর্বস্ব বিচারকে সনাতন বলে দাবি করেন।

মার্কসবাদী সাহিত্যনীতির মূল কথা হল, সৃজনশীল সাহিত্যের প্রভাব জনচিত্তে প্রতিফলিত হবেই, এবং কাজেকাজেই তাদের সামাজিক কর্ম-প্রচেষ্টাও এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে। সাহিত্যিক মতবাদ, নন্দনতত্ব যখন শুধু অবসর বিনোদনের বিষয় নয়। সমাজব্যবস্থার উপর যখন এদের প্রভাব বিস্তৃত, সমাজের অগ্রগতি ও উন্নতির বেগ দ্রুততর বা মন্দীভূত হওয়া যখন বিভিন্ন মতবাদ ও চিন্তাধারার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল, তখন সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের তাঁদের শিল্প ও সাহিত্যের মাধ্যমে জীবনযাত্রা-ব্যবস্থার অগ্রগতির দাবিকে রূপ দিতে হবে, জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম ও অগ্রগতিকে শিল্পকর্ম-সমন্বিত রূপ দিতে হবে, ভাবী সম্ভাবনাকে জানাতে হবে স্বাগত। মার্কসবাদের সাফল্যের অন্যতম কারণই হল এই যে এ মতবাদ সামাজিক জীবনযাত্রা-ব্যবস্থার প্রগতির দাবিকে সঠিকভাবে নির্দেশ করেছে এবং চিন্তাধারা, মতবাদ, শিল্প-সাহিত্য—এ সবের সংগঠন ও সৃজন-শক্তির প্রতিটি বিন্দুকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক প্রগতির পথ অবারিত করেছে।

মার্কসবাদীরা জানেন সমাজ-রূপান্তরের মহাযজ্ঞশালায় শিল্প-সাহিত্যেরও অবদান আছে—শিল্প-সাহিত্য, সামাজিক প্রগতি, বিপ্লবী আন্দোলনের অপরিহার্য অংশ। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে বলতে হয়, শিল্প-সাহিত্য যদি না থাকত, তবে বিপ্লবী আন্দোলন চালানো আরও শক্ত হোত, জনজীবনে অনুপ্রেরণা, তীব্র অনুভূতি জাগানো হত আরও শক্ত।

সামাজিক প্রগতির কথা যদি আইয়ুব সাহেবরা মেনে নেন, যদি তাঁরা স্বীকার করেন মানবের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি কাম্য, তাহলে এ মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে, সমাজের প্রধান এক শক্তির সাহায্য তাঁদের নিতে হবে, এক বিপ্লবী শ্রেণীর উপর মূলত দাঁড়াতে হবে। সে শ্রেণী হল সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী এবং তার সহযোগীরা। তাছাড়া, এই মূল শক্তির সহায়ক হিসেবে তাঁদের গড়ে তুলতে হবে আরও একটা শক্তি,—দল, শ্রমিক শ্রেণীর দল, যে দলে বুদ্ধিজীবী-দের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানেরাও থাকবেন।

আইয়ুব সাহেবদের এটা জানা দরকার যে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতায় সবেই বুদ্ধিজীবীরা, সাহিত্যিকেরা, শিল্পীরা, শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শ্রমিক

শ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করলে শেষ পর্যন্ত তাঁরা পরিণত হবেন অতি তুচ্ছ শক্তিতে এবং ইতিহাসের রথচক্র তাঁদের পিছনে ফেলেই অগ্রসর হবে।

এ ছাড়াও, সমাজ-প্রগতির জন্তে প্রয়োজন হল রাজনৈতিক ক্ষমতার, যে ক্ষমতা আয়ত্ত-না হলে নতুন ব্যবস্থা, নতুন বিধিবিধান, বিপ্লবী সমাজব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না—এদের ঘটবে অকালমৃত্যু।

তাই, মার্কসবাদীরা শিল্প-সাহিত্যকে, নৈর্ব্যক্তিক, শুদ্ধ ন্যায়বিলাসী যুক্তি দিয়ে বিচার না করে, এই বাস্তব পরিবেশ, এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার করেন। মার্কসবাদীরা তাই বলেন যে বিশুদ্ধ অরাজনৈতিক শিল্প-সাহিত্য কখনও হতে পারে না। শিল্প-সাহিত্য হয় জনতার রাজনীতিসম্মত হবে, না হয় তার বিরুদ্ধ হবে ; হয় সামাজিক প্রগতির দাবিসম্মত হবে, না হয় সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বাহন হবে ; হয় বিপ্লবী না হয় প্রতিবিপ্লবী হবে, প্রগতির স্বাক্ষর তাতে সুস্পষ্ট অথবা প্রতিক্রিয়ার জড়তা তাতে প্রধান।

সাহিত্যিক ও শিল্পী 'নিজের প্রতিভারই অনুগামী', একদিক থেকে একথা ঠিক। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যখন পার্থক্য রয়েছে, তখন তাদের সৃজনশীল কর্মপ্রচেষ্টার পার্থক্য থাকবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু আইয়ুব সাহেব যে অর্থে ঐ তত্ত্বটি খাড়া করেছেন—সে অর্থে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। সৌন্দর্যের সাধনা সাহিত্যিক অবশ্যই করবেন। কিন্তু সৌন্দর্যের উপলব্ধি শুধু প্রাকৃত-জনের প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল নয়, সমাজজীবনের সঙ্গে, সামাজিক কর্ম-প্রচেষ্টার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সমাজজীবনের কর্মপ্রচেষ্টা অতিক্রম করে, সামাজিক অগ্রগতির দাবিসম্মত না হয়ে হয়ত প্লেটোনিক অনৈতিহাসিক সৌন্দর্যের তত্ত্ব খাড়া করা চলে কিন্তু "গণতান্ত্রিক সমাজবাদী" আইয়ুব সাহেব যে ভাববাদীদের মত অনৈতিহাসিক সনাতন সৌন্দর্যের পূজারী সাজলেন, এটাই আশ্চর্য। সাহিত্যিক যে সৌন্দর্যের তপস্যা করবেন সে সৌন্দর্য শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য নয় ; মানুষ যখন সাহিত্য সৃষ্টি করে তখন সমাজের বাস্তব জীবনযাত্রা-পদ্ধতির কাছ থেকেই উপাদান আহরণ করে—সেই উপাদানকে, সাহিত্যিক নিজের প্রতিভার সাহায্যে যত বেশি সুসংবদ্ধ, একমুখী, বৈশিষ্ট্যময়, ভাবপ্রধান, বিশ্বজনীন করে তোলেন ততই তার সার্থকতা আর সৌন্দর্য। এ কাজ করতে গেলে তাই সাহিত্যিককে শুধু নিজ প্রতিভার অনুগামী হলে হবে না, অগণিত জনতার মধ্যে যে সাহিত্য-পিপাসু, সৌন্দর্য-পিপাসুটি রয়েছে, তার প্রতিবিম্বিত করতে হবে। এবং এ প্রতিবিম্বিত করা

মানেই মার্কসবাদী চেতনার সাহায্য নেওয়া, শ্রমিক শ্রেণীর অধিনায়কত্ব মেনে নেওয়া, অহংসর্বস্বতার স্থানে শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব দলের 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা' মেনে নিয়ে এর স্বপক্ষে, রসসর্বস্বতাবাদ, আত্মসমর্পনবাদ, অতিবামপন্থী সংকীর্ণতাবাদ, গোষ্ঠীমনোবৃত্তি ও আরও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে সাহিত্যিক লড়াই চালান। শ্রমিক শ্রেণী যে নতুন সভ্যতার রাজপথ নির্মাণ করে চলেছে, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী যদি সেই পথ নির্মাণে সাহায্য না করেন শিল্পকর্মের ভিতর দিয়ে, মননশীলতা নিয়ে সেই রাজপথ আলোকিত না করেন, অন্যদিকে মার্কসবাদী রাজনীতির সংস্পর্শ বাঁচিয়ে "বিশুদ্ধ" সাহিত্য রচনার অবাস্তব দাবি তোলেন, তবে সে সাহিত্য-শিল্প হবে বন্ধ্যা, তাৎপর্যহীন।

মার্কসবাদ দাবি করে যে শিল্প-সাহিত্য রাজনীতির বহির্ভূত নয়, কাজেই 'শিল্পের জন্যেই শিল্প', 'বিশুদ্ধ সাহিত্য', এদের কোন অস্তিত্ব নেই। শ্রেণী আর পার্টি বিভক্ত সমাজে শিল্প-সাহিত্য সব সময় শ্রেণী আর পার্টির অধীন, শ্রেণী আর পার্টির বিপ্লবী কর্তব্য পালনের অধীন। তাই যদি না হবে, তবে আমাদের দেশে 'কংগ্রেস-সাহিত্য', দক্ষিণপন্থী সমাজবাদী 'সন্ত্রকালীন সাহিত্যই' বা গজিয়ে উঠবে কেন? কাজেই প্রশ্ন হল: শিল্প-সাহিত্য কোন্ শ্রেণীর, কোন্ পার্টির অধীন হবে? তার উত্তর সোজা। আজ শ্রমিক শ্রেণী ইতিহাসের মহাযজ্ঞশালার হোতা, সামাজিক অগ্রগতির সঞ্চালক-শক্তি। শ্রমিক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব দল আজ পর্যন্ত সামাজিক জীবনযাত্রা-ব্যবস্থার প্রগতির দাবিকে সঠিক রূপ দিয়ে এসেছে, জনসাধারণকে সক্রিয় করে তুলেছে; রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি সব বিষয়ে হাজার হাজার সংগ্রামীদের চিন্তাধারণাগুলিকে কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত করেছে, জনতার কাছ থেকে শিখেছে, কাজেই সঙ্গত কারণেই এদের উপর নেতৃত্ব এসে পড়েছে। এতে আইয়ুব সাহেবদের দুঃখিত বা দুর্ভাবনাগ্রস্ত হবার কি আছে?

সাহিত্যিকের স্বাধীনতা? ইঙ্গ-মার্কিন সমাজে, ভারতের সমাজে তো বটেই, সে 'স্বাধীনতা' কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। যে সমাজে মুদ্রণযন্ত্রের মালিকানা সমাজের নয়, মুষ্টিমেয় মালিকের, প্রকাশকের অভিরুচি না হলে যেখানে পুস্তক প্রকাশিত হবার রাস্তা নেই, টাকা রোজগারের জন্যে সাহিত্যিককে যে সমাজে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী গল্প, কবিতা লিখতে হয় সে সমাজে সাহিত্যিকের তো অপমৃত্যু ঘটেছে অনেকদিন। সাহিত্যিকের

স্বরাজ' যদি থাকবেই তবে নিজ 'প্রতিভার অনুগামী' হয়ে সাহিত্য চর্চা না করে সাহিত্যিকেরা সিনেমার গল্প লিখছেন কেন? সাহিত্যিকের পেশা ছেড়ে সিনেমা ডিরেক্টরী করছেন কেন?

সাহিত্যিকের স্বাধীনতার বিলুপ্তি ঘটেছে সেদিন যেদিন থেকে সাহিত্য হয়ে উঠেছে রুজিরোজগারের রাস্তা—জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহের উপায়।

মার্কসবাদী সাহিত্যনীতির দৌলতে সাহিত্যিক বরঞ্চ স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেয়েছেন। জীবিকার্জনের দুর্ভাবনামুক্ত, জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত সাহিত্যিক মার্কসবাদী সমাজেই শুধু আত্মার স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছেন।

অন্যদিকে ইংলণ্ড, আমেরিকায়, ভারতে সাহিত্যিক বাস্তবে প্রচারযন্ত্র, সংবাদপত্র, মাসিকপত্র-মালিকদের বেতনদাস। এ সব সমাজে লেখকের শাস্তি অপ্রত্যক্ষ হলেও, অপরিসীম। কারণ, লেখকের লেখনীর উপর তত্ত্বাবধান-ব্যবস্থা এখানে বিত্তবানদের, হোক না তারা গোমূর্খ, অসাহিত্যিক। মার্কসবাদী সমাজে লেখকের লেখনীর উপর তত্ত্বাবধানব্যবস্থা লেখক সংঘের, পার্টির, পাঠকসাধারণের। অথচ আইয়ুব সাহেবরা দ্বিতীয়টি সম্পর্কেই দুর্ভাবনাগ্রস্ত, প্রথমটি সম্পর্কে নয়।

তাই আইয়ুব সহেবরা শিল্পসংস্কৃতি, ও মানবতার যা প্রধানতম শত্রু, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ সে সম্পর্কে উদাসীন, আর যে মার্কসবাদী সমাজে শিক্ষাসংস্কৃতির অভূতপূর্ব বিস্তার, তার ঘোরতর বিরোধী। আইয়ুব সাহেবরা সোভিয়েটে, নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে, মহাচীনে, মার্কসবাদী সাহিত্যনীতির প্রয়োগে যে বিরাট সংস্কৃতি-আন্দোলন গড়ে উঠেছে—যুগান্তরের পথ রচিত হচ্ছে, এ সব কথা হয়ত বা জানেন। কিন্তু তাঁদের বিশেষ 'দলীয় রাজনীতির স্বার্থে' এ সব কথা গোপন রেখে মার্কসবাদের কল্পিত রূঢ় আঘাত নিয়েই তাঁরা হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, তাঁদের অশ্রুজলে 'কলম'-এর পাতা সিক্ত হয়ে উঠেছে।

আইয়ুব সাহেবরা 'শিল্পী-সাহিত্যিকের স্বাধীনতা', 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' 'সাহিত্যিকের স্বরাজ' এ ধরনের যে সব আওয়াজ তুলেছেন, এক সময় তাদের আপেক্ষিক প্রগতিশীলতা ছিল। ফিউডাল অভিজাত সমাজের বন্ধন ভেঙে চিৎপ্রকর্ষের উচ্ছল প্রবাহের জন্যে সত্যিই তা প্রয়োজনীয় ছিল। রবীন্দ্রনাথও প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে 'শিল্পের জন্যে শিল্প' এ আওয়াজ তুলেছিলেন। কিন্তু আজকের দিনের পরিবর্তিত পরিবেশে 'শিল্পের জন্যেই শিল্প' এ আওয়াজ

হয়ে উঠেছে একান্তভাবেই প্রতিক্রিয়ার বাহন। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের আগে, উপনিবেশে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের লড়াইটা ছিল বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সঙ্গে ফিউডাল পুরনো সংস্কৃতির লড়াই; কাজেই প্রাক্‌-সোভিয়েট যুগে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রগতির পথ অনেকখানি অবারিত করেছিল। ১৯১৭ সালের পর থেকে, পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিবেশে, কলোনির বিপ্লব বুর্জোয়া বিশ্ব-বিপ্লবের আবর্ত ছেড়ে, বিশ্ব সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের পরিধিভুক্ত হয়েছে; এক নতুন সাংস্কৃতিক শক্তির জন্ম হয়েছে তখন থেকে। আজ যখন ভারতের অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লব নতুন যুগে পা দিয়েছে, বড় বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, নতুন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতির সৃষ্টি হচ্ছে নির্বিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে—আজ যখন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া ভাবধারার বিরুদ্ধে, নতুন প্রলেটারিয়ান ভাবধারায় সজ্জিত হয়ে সংস্কৃতির লড়াই চালানোটা সংস্কৃতি-কর্মীদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, তখন গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা কেউ বা সজ্ঞানে আর কেউ বা বিভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে বুর্জোয়া স্বেচ্ছাতন্ত্রের তরফে কলম ধরেছেন।

আইয়ুব সাহেবরা স্বীকার করেছেন যে সাহিত্যিকের 'সমাজচেতনা' চাই। সামাজিক দৃষ্টি অসম্পূর্ণ এবং অপরিচ্ছন্ন থাকলে সাহিত্য-রচনা যে মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ে, মার্কসবাদী সাহিত্যনীতির এ সূত্র তাঁরা গ্রহণ করেছেন। অবশ্য আজকের দিনে এটুকু স্বীকার না করে আর উপায় নেই। কিন্তু আসল কথাটা হল, সাহিত্যিক ও শিল্পরচয়িতা যে জীবনসত্যকে ফুটিয়ে তুলছেন সেটা কি সত্য না সত্যের বিকৃতি? তিনি কি সমাজ-বাস্তবের অগ্রগতির দাবিকে শিল্পকর্ম-সমন্বিত রূপ দিচ্ছেন, না বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জিগির তুলে সমাজ-চেতনাকে হীনবল করে প্রতিক্রিয়ার বাহন হিসেবে কাজ করছেন?

সংস্কৃতিক্ষেত্রে যে সংগ্রাম আজ চলেছে সেটা শ্রেণী-সংগ্রামেরই একটা বিশিষ্ট রূপ। সেই সংগ্রামে আইয়ুব সাহেবরা প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি-কর্মীদের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে, নতুন ভারত নির্মাণে সহায়তা না করে, "জনতার জন্যে শিল্পসাহিত্য" এ আওয়াজ না তুলে, সজ্ঞানে বা না জেনে বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শিবিরেই আশ্রয় নিয়েছেন, রস-সর্বস্বতার নামে সাহিত্য শিল্পের সংহতি-কারক যুগান্তকারী অবদানকে অস্বীকার করছেন, প্রগতি-কর্মীদের করে তুলছেন বিভ্রান্ত ও নিষ্ক্রিয়।

আজ ভারতের নির্বিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে প্রগতিশীল জনতার যে সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগীদের সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে, সেই সংগ্রামে সাহিত্যিকদের ও শিল্পীদের করণীয় রয়েছে অনেক কিছুই। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংস্কৃতির রূপায়ণে সমাজসচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকদের, 'বুর্জোয়া স্বেচ্ছাতন্ত্র' পরিহার করে, জনগণের শিল্পসাহিত্য সৃষ্টিকে নিরলসভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এ শিল্পসাহিত্য হবে বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় সমৃদ্ধ, ধর্মমোহ প্রভৃতি থেকে মুক্ত। জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে এ রূপ দেবে, জনতাকে করে তুলবে সাহিত্যভাক্ত; জনতার জীবনের বিচিত্র ধারা, তার সংগ্রামমুখর জীবনের আলেখ্য শিল্পকর্ম-সমন্বিত রূপ পাবে এদের মাধ্যমে। এ শিল্পসাহিত্য পুরনোর ধ্বংসাবশেষের উপর শুধু গড়ে উঠবে না; পুরনো সংস্কৃতির গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দিকটুকু গ্রহণ করে, নতুন প্রলেটারিয়ান জীবনবেদের আলোকে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ সংস্কৃতি সাহিত্যিকের ব্যক্তিমানস থেকে সৃষ্টি হলেও, নিরালম্ব বায়বীয় পদার্থ হবে না। এ সংস্কৃতির আলোকে বিপ্লবী জনগণের পথরেখা আলোকিত হবে, সাহিত্য জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন না থেকে হয়ে উঠবে জনগণের সম্পত্তি।

অন্যদিকে, আইয়ুব সাহেবরা সমকালীন সাহিত্যের যে পথ নির্দেশ করেছেন, সে পথ হচ্ছে বুর্জোয়া স্বেচ্ছাতন্ত্রের পথ। জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন প্রতিভাবান দু'চারজন সাহিত্যিককে ঐ পথের পথিক তাঁরা করলেও করতে পারেন, কিন্তু ইতিহাস তাঁদের বিরুদ্ধে। ইতিহাসের মহানায়ক জনতাকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের গীতাঞ্জলি তাঁরা রচনা করুন; ইতিহাস আপন নিয়মে এগিয়ে যাবে; তাঁরা পিছনেই পড়ে থাকবেন।

গণতন্ত্রের কবি রবীন্দ্রনাথ

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ আমাদের লক্ষ্য নতুন গণতান্ত্রিক সাহিত্যসৃষ্টি। কিন্তু এই নতুন গণতান্ত্রিক সাহিত্যের জন্ম তো একটা বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নয়, এর একটা ঐতিহাসিক ক্রমান্বয়ের রূপ আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা করার আজ প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে কাব্যবিচারের ভিত্তি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। মার্ক্স বলেছেন :

"বাস্তব জীবনের উৎপাদন পদ্ধতি সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনীতিক ও চিন্তাজীবনের গতিপথ নির্দেশ করে। চেতনা দ্বারা মানুষের বাস্তবজীবন নির্ধারিত হয় না, বরং সামাজিক বাস্তব জীবন দ্বারাই চেতনা নির্ধারিত হয়।" (ক্রিটিক অব পলিটিকাল ইকনমি)

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্যালোচনা করতে গেলে লেখকের ঐতিহাসিক পটভূমির আলোচনা দরকার। সেই যুগের মূলগত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি কী? তখনকার শ্রেণী-সংগ্রামের ও শ্রেণী-সম্পর্কের কতটা পরিচয় কবি তাঁর লেখার ভিতরে বাস্তব ও নির্দিষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন?

লেনিন বলেছেন : "আমরা যদি সত্যিই এক মহান্ শিল্পীর দেখা পাই, তবে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে বিপ্লবের অন্তত কয়েকটি অত্যাবশ্যক দিক প্রতিফলিত হতে বাধ্য।"

(লেনিন, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১১শ খণ্ড, ৬৮১ পৃঃ)

লেনিনের এই উক্তির ভিত্তিতেই বিচার্য রবীন্দ্রনাথ মহান্ শিল্পী ছিলেন কিনা, সেই যুগে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার বাহক ছিলেন কি না, ও তাঁর লেখায় শোষিত জনগণের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল

কিনা। কারণ গণতন্ত্রের কবির অবিচ্ছেদ্য গুণ হল তাঁর অচঞ্চল মানবতাবোধ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের সমাজে তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেল। প্রথম, উৎপাদন শক্তির স্তর ও শ্রমের সমাজীকরণের সংকীর্ণতা। দ্বিতীয়, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের শ্বাসরোধী প্রভুত্ব। তৃতীয়, ভারতবাসীর একটা বিরাট অংশের অবলম্বন কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনশক্তি, সামন্ততন্ত্রের শক্তিশালী অবশিষ্টাংশ ও প্রাক্-পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের দ্বারা ভারাক্রান্ত।

তাই, ভারতবর্ষ এক অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক দেশরূপে দেখা দিল। অর্থাৎ ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি হল ঔপনিবেশিক ও অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক। আজও পর্যন্ত ভারতের এই অবস্থার কোন মূলগত পরিবর্তন ঘটেনি। ধনতন্ত্রসৃষ্ট কয়েকটি নতুন শ্রেণী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, বহু সামাজিক দ্বন্দ্ব আরও ঘনীভূত হয়েছে, কিন্তু মূল অর্থনীতি রয়ে গেছে ঔপনিবেশিক ও অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক। ভারতের শ্রেণীসংগ্রামের চরিত্র তখন থেকেই সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী।

সংস্কৃতিক্ষেত্রে, এই সংগ্রাম প্রতিফলিত হয়েছে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক মতবাদের শক্তিশালী অবশিষ্টাংশ ও অপরদিকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ও তারও পরে নতুন গণতান্ত্রিক মতাদর্শের মধ্যে সংগ্রামের রূপ নিয়ে। পরবর্তী যুগে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর ধনী অংশের অধিকতর ঘনিষ্ঠ সংযোগের দরুণ তার মতবাদের প্রতিনিধিরা আধুনিক ছাঁচে ঢালা সামন্ততান্ত্রিক মতাদর্শের দ্বারা অধিকতর প্রভাবান্বিত হয়েছে। তাদের পিছনে আছে সাম্রাজ্যবাদী ভারত-তত্ত্ববিদ্‌গণের উৎসাহ ও সমর্থন। বুর্জোয়া শ্রেণীর অপর সম্প্রদায় তখন থেকেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক মতবাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত অগ্রগামী সাহিত্যের মধ্যেই এই আত্ম-বিরোধিতা প্রকট হয়ে উঠেছে। অক্টোবর বিপ্লবের পর, যখন ভারতে মুক্তি আন্দোলন ও বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্বের শ্রমিক বিপ্লবের সঙ্গে এক হয়ে গেল, এবং বিশেষ করে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভারতীয় মজুর শ্রেণী ও তার পার্টি দেশের এক প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দেখা দেওয়ার পর, শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শ মতবাদের সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল।

ভারতের শ্রেণীসংগ্রামের আর একটা বিশেষত্ব এই যে তার বুর্জোয়াশ্রেণীর সবচেয়ে ধনী অংশ কখনও পুরোপুরি বিপ্লবের শিবিরে যোগ দেয়নি। এর কারণ, এদেশে বুর্জোয়াশ্রেণী যতদিনে একটা রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠল, ততদিনে সারা পৃথিবীতে একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ জন্মগ্রহণ করেছে ও পুঁজিবাদ অবনতির শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েট ইউনিয়নের জন্ম উপনিবেশের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে একটা নতুন রূপ দান করল। কারণ বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে তখন বিপ্লবের নেতৃত্ব করা ও জয়লাভের পর নিজের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হল। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এখন শুধু জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবই হতে পারে। ভারতবর্ষে তাই ১৯১৫-৮ সালের দুর্বল প্রতিবাদের পরে ও ১৯২০ সালে মজুর, চাষী ও বিপ্লবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনের গতি দেখে, বুর্জোয়া শ্রেণীর ধনী অংশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মোটামুটি একটা বোঝাপড়া করে। ১৯২০ সালে লেনিন ও ১৯২৫ সালে স্টালিন সেটা পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অতএব সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক জনগণের বিপ্লবের অংশীদার হল বিপ্লবী মজুর, চাষী ও সহরের মধ্যবিত্তশ্রেণী।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব জনগণের উপরে, বিশেষ করে বিপ্লবের অগ্রগামীশক্তি কৃষকের ও বিপ্লবের নেতা মজুরের উপরে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব। এর পিছনে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণ আছে, যার বিশদ আলোচনার এখানে প্রয়োজন নেই।

ভারতবর্ষের শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশকে এইসব বৈশিষ্ট্যই প্রভাবান্বিত করেছে ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পূর্ণ স্ফুরণে বাধাসৃষ্টি করেছে। এর প্রতিফলন সমসাময়িক সাহিত্যেও দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের নবসৃষ্ট এক অভিজাত জমিদার পরিবারে। অন্যান্য জমিদারদের মত ঠাকুর-পরিবারও ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন কৈশোরে উপনীত হলেন তার আগেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভৃতির সূত্রপাত কৃষক অভ্যুত্থান-গুলিকে ধূলিসাৎ করা হয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণী তখনই নিজেদের সংগঠিত করতে আরম্ভ করেছে। বাংলাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর নবজন্মের আনন্দবিহ্বল দিনগুলি—তার সাংস্কৃতিক রূপ প্রকাশিত হয়েছে, দীনবন্ধু, মধুসূদন প্রভৃতির

লেখায়, তখন শেষ হয়ে গেছে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের বিমাতাসুলভ ব্যবহারে ও অন্যদিকে কর-জর্জরিত কৃষক শ্রেণীর কাছ থেকে লুন্ঠিত ধনের বিনিয়োগ ক্ষেত্রের অভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় অংশটি সাম্রাজ্যবাদের উপরে কিছুটা বিমুখ হয়ে উঠেছে। তার উপরে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মতবাদে পুষ্ট হয়ে এই নূতন বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রেণী হিসেবেই নিজেদের স্বার্থে শুধু সামন্ত-তন্ত্রেরই বিরোধিতা করেনি, সাম্রাজ্যবাদেরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। মতাদর্শের ক্ষেত্রে তখন চেষ্টা চলেছে প্রাচীন হিন্দু দর্শনকে আধুনিক যুক্তিবাদ দিয়ে পশ্চিমের বুর্জোয়া মতাদর্শের শ্রেণীভুক্ত করে নেবার। তারই এক রূপ হল ব্রাহ্মধর্ম।

এই আবহাওয়াতেই রবীন্দ্রনাথ বড় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর শিক্ষার বস্তুর্ভুক্ত ছিল ভারতবর্ষ ও ইওরোপের প্রাচীন সাহিত্যে ও ইংলণ্ডের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সাহিত্য—সেক্সপিয়র, শেলী ও বায়রন, বেন্থাম, মিল ও কোঁতে, ব্রাইট ও কব্‌ডেন। নিজের উপরে ইওরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব স্মরণ করে "জীবনস্মৃতি"তে তিনি বলেছেন :

"ইওরোপীয় সমাজের সেই হোলিখেলার মাতামাতির সুর আমাদের এই অত্যন্ত শিষ্ট সমাজে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আমাদিগকে ঘুম ভাঙাইয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। হৃদয় যেখানে কেবলই আচারের ঢাকার মধ্যে চাপা থাকিয়া আপনার পূর্ণ পরিচয় দিবার অবকাশ পায় না, সেখানে স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধলীলার দীপক রাগিনীতে আমাদের চমক লাগিয়া গিয়াছিল।"

শিশুকাল থেকেই সামন্তবাদ-বিরোধী ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মতবাদের আবহাওয়ায় তিনি বড় হয়েছিলেন। তারপর ইংলণ্ডে বাস করে ইংলণ্ডের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি সেই মতবাদ আকণ্ঠ পান করেছিলেন। তাই স্বভাবতই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতিরূপ হিসাবে বৃটিশ সভ্যতার প্রতি তাঁর এক অন্ধ অনুরাগ জন্মেছিল। তারই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক সমাজসম্পর্কের অবশিষ্টাংশ ভারতবর্ষের প্রগতির পথে যে কতখানি বাধা সৃষ্টি করে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি পেয়েছিলেন তাঁর নিজের জমিদারবাড়ীর সংকীর্ণ গণ্ডীর অভিজ্ঞতায়। এর ফলে, তাঁর মনে যে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয়েছিল তার সঙ্গে বৃটিশ সভ্যতার প্রতি তাঁর অনুরক্তির বার বার সংঘাত ঘটেছে। অবশেষে তাঁর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক

মতাদর্শদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির জন্য গ্রামাঞ্চলের সর্বনাশী প্রাক্‌-পুঁজিবাদী অবস্থার উপরে বিশ্ববাজার (world market) ও পণ্য উৎপাদন প্রথার নিয়ন্ত্রণ কি গভীর অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করে, তা তিনি বুঝতে পারেন নি। এই জন্যই বার বার তিনি আমাদের পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক যৌথজীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাভাবিক অর্থনীতির যুগে ফিরে যেতে চেয়েছেন। কারণ সে সময় কৃষক অন্তত খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশের ও সমাজ-বিপ্লবের সমস্ত দুর্বলতা ও অন্তর্বিরোধ কি ভাবে ও কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করলে বোঝা যাবে যে তিনি বিপ্লবের কয়েকটি অত্যাবশ্যক দিক তাঁর লেখার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন কি না।

রবীন্দ্রনাথের শ্রেণী উৎপত্তি, ঐতিহাসিক পটভূমি, তৎকালীন মতাদর্শ এবং তাঁর নিজের জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনাদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভারতবর্ষের বিপ্লবের কোন্ কোন্ দিক তাঁর লেখায় প্রতিফলিত দেখবার প্রত্যাশা আমরা করতে পারি? তাঁর মধ্যে খুঁজব আমরা সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভাবধারা এবং বিশুদ্ধ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন।

কিন্তু তার আগে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। কথাটা হচ্ছে এই যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই লেখকের জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর সৃষ্ট শিল্পের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট অন্তর্বিরোধ থাকে। যে দেশের অর্থনীতি ঔপনিবেশিক ও অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক সেই দেশের লেখকের মধ্যে স্বভাবতই সেই অন্তর্বিরোধ আরও তীব্র হয়ে উঠতে বাধ্য। তার কারণ হল সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের অন্তর্বিরোধের উপরে পুঁজিবাদের ভার চেপে বসায় সমস্ত অন্তর্বিরোধগুলি অত্যন্ত বর্ধিত ও সর্বনাশী আকারে দেখা দেয়। এ অবস্থার সত্যতা আরও প্রমাণিত হয় মুমূর্ষু পুঁজিতন্ত্রের যুগে, যখন স্থায়ী সংকট ও ক্রমবর্ধমান অন্তর্বিরোধ তাকে ক্রমাগত আঘাতে জর্জরিত করে। মার্কসবাদী সমালোচকের কর্তব্য এই অন্তর্বিরোধকে পরিস্ফুট করে তোলা। যেমন মার্কস, এঙ্গেল্‌স ও লেনিন অতীতের বড় বড় সাহিত্যরথী—গ্যেটে, বালজাক, গোগোল, লিও টলস্টয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে করেছেন। এঙ্গেল্‌স বলেছেন:

"লেখকের নিজস্ব মত যত প্রচ্ছন্ন থাকে, শিল্পের পক্ষে ততই ভাল।

যে বাস্তবতার কথা উল্লেখ করেছি, সেটা লেখকের নিজস্ব মত সত্ত্বেও প্রকাশিত হতে পারে।" (মার্কস্ এণ্ড এঙ্গেলস্ অন লিটারেচার এণ্ড আর্টস—৩৪ পৃঃ) এখন আমাদের দেখতে হবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেটা কতখানি প্রযোজ্য।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, তাঁর কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। অনেক সময় তাঁর অগোচরেই ঘটেছে। তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এই পরিবর্তন এমন স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে যে সেটা তাঁর অগোচরে হওয়াই ছিল স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। রবীন্দ্রনাথের এ কথা অতি সত্য। এ জগতে কোন জিনিসই স্থাণু নয়, প্রত্যেক জিনিসই অবিরত গতিশীল। মানবসমাজ এগিয়ে চলে, কিন্তু সোজা রাস্তা ধরে নয়; কখনও বঙ্কিম, কখনও বা উঁচুনিচু তার পথ, কিন্তু সে এগিয়েই চলে। মানুষের সম্বন্ধে ও তার চেতনা সম্বন্ধে এই কথাই খাটে। কারণ সামাজিক বাস্তব জীবন দ্বারাই তার চেতনা নির্ধারিত হয়। মানুষের ধ্যানধারণাই তাই ক্রমাগত বিকশিত ও পরিণত হতে থাকে। সেখানে কত ভাবধারা এসে মেশে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে ধারাটি প্রবল থাকে, তারই জয় হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকেও এই ক্রমবিকাশের ধারায় ব্যক্তিগত বিকাশের প্রতিচ্ছায়া হিসাবে বিচার করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর প্রথম জীবনের (১৮৮১-৮৬) কবিতাগুলিকে অত্যন্ত দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এখানেও তাঁর ভাবধারার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যা তাঁর পরবর্তী জীবনে, বিশেষ করে শেষ জীবনে প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে এক অপূর্ব কাব্যে স্ফূর্ত হয়ে ওঠে। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতাগুলি নিম্নলিখিত বইগুলিতে সংকলিত হয়:

"ভানুসিংহের পদাবলী", "সন্ধ্যা-সঙ্গীত", "প্রভাত-সঙ্গীত", "ছবি ও গান" এবং "কড়ি ও কোমল"-এর রবীন্দ্রনাথ কুড়ি বাইশ বৎসরের যুবক। আয়েসী সমাজের তরুণের দৃষ্টিতে তিনি পৃথিবীকে দেখেছিলেন। তখন সবই তাঁর সুন্দর মনে হত। একটা সজীব, আবেগ-বহুল কল্পনাপ্রিয়তা, তাঁর অম্লান তরুণ হৃদয়ের পূর্ণতাকে উজাড় করে প্রকাশ করবার অসহ আগ্রহ, ও মৃত অভ্যস্ত জীবনের বন্ধন ভেঙে সৃষ্টির আনন্দের মধ্যে নিজেকে লুপ্ত করার বাসনা, এইগুলিই ছিল তাঁর এই সময়ের কবিতার বৈশিষ্ট্য। যুগপৎ জীবনের অজানা দুঃসাহসিক দিনগুলির সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার প্রচণ্ড

ইচ্ছায় যে তিনি যা কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তাকে পরিত্যাগ করে বর্তমান তারুণ্য ও নতুনকে সাদর আহ্বান জানিয়েছিলেন, তেমনি তিনি রোম্যানটিসিজমের মুমূর্ষু যুগের গজদন্তমিনারের স্বাতন্ত্র্যকেও পরিত্যাগ করেছিলেন। সেইজন্যেই তাঁর আবেগোচ্ছল প্রেমের কবিতার পাশাপাশি দেখতে পাই সমস্ত মানবজাতির সঙ্গে একাত্ম হবার, মানুষের আনন্দ বেদনা হাসি অশ্রু দিয়ে কথার মালা গাঁথবার সেইরকম আবেগপূর্ণ বাসনা। এমন কি তাঁর প্রেমের আনন্দও তিনি সমস্ত মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চেয়েছিলেন। বিস্তীর্ণ পৃথিবীর উন্মত্ত বাহুর আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ সাড়া দিয়েছেন "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-এ। তাঁর আত্মহারা যৌবনের সমস্ত রূপকে তিনি পাহাড়ী নদীর উদ্দাম, উচ্ছল স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছেন :

"ভাঙ্‌ রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের 'পরে আঘাত কর্‌।"

কেন ?

"এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে, প্রাণ হয়ে আছে ভোর।"

"প্রাণ"-এর মধ্যে তিনি বলেছেন :

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,"

"কড়ি ও কোমল"-এ কবি প্রথম চুম্বনের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন, যখন "অধরের কোনে যেন অধরের ভাষা"; যখন "গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধরসঙ্গমে"। কিন্তু প্রেমের আলিঙ্গন যে তাঁর একেবারে বন্দী করে ফেলবে তা তিনি চান নি; তাই "মরীচিকা"-তে কবি বলেছেন :

"এসো, ছেড়ে এসো, সখি, কুসুমশয়ন,
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।...
চল গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখে দুখে যেথা সবে গাঁথিছে আলয়..."

"মানসী"-র রচনাগুলির সঙ্গে কবি তাঁর শিক্ষানবিশী ছেড়ে সত্যকার কাব্য-

জগতে প্রবেশ করলেন। যৌবনের ভাবোচ্ছ্বাস বাস্তব বিষয়বস্তুকে অনেকখানি স্থান ছেড়ে দিল। অতীতকে বর্জন করার আরও বাস্তব পরিচয় পাওয়া গেল সামন্ততন্ত্রকে বিদ্রূপ করে লেখা কবিতায়, নারীর সমানাধিকারের দাবিতে ও তার সকরুণ বীরত্ব গাথায়। মানবজাতির সঙ্গে এক হবার, মানুষের হাসি-অশ্রু দিয়ে গান বাঁধার আগ্রহ এখন কৃষকের দুর্দশায় তীব্রপ্রতিবাদে প্রকাশিত হল। নতুনের প্রতি সাদর আহ্বান রূপ নিল স্বাধীনতা, সাম্য, সুবিচার ও মানুষের অধিকারের গৌরবকীর্তনে। তিনি তখন অভিজাত-সম্প্রদায়সুলভ গজদন্তমিনারের নিরাপত্তা ও আরাম ছেড়ে পরিষ্কার বেরিয়ে এলেন ও শোষিত কৃষক সমাজের মঙ্গলসাধনের চেষ্টায় মনোনিবেশ করার প্রবৃত্তি ব্যক্ত করলেন। এই সময়ে, স্বদেশী গান ও মধ্যযুগে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জয়কীর্তন করে লেখা গাঁথার মধ্যে তাঁর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা স্ফূর্ত হল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে কবির তখনই যথেষ্ট পরিচয় হওয়ায় পুঁজিতন্ত্রের সমালোচনা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তাঁর মনের এই বিকাশ অতি স্বাভাবিক। এই সময়েই সমস্ত গ্রামাঞ্চলে আবার কর-জর্জরিত, জমিচ্যুত, নিপীড়িত কৃষক-সমাজের অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। এমন কি, নবসৃষ্ট বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেও প্রতিবাদের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। অবশ্য বুঝে সাম্রাজ্যবাদ তখনই সুকৌশলে কম্প্রাডোর বুর্জোয়া শ্রেণী ও উদার জমিদারবর্গের একাংশকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বেঁধে দিল। তার পরবর্তীকালে যে আবেদন নিবেদনের রাজনীতি শুরু হল রবীন্দ্রনাথের সেটা অসহ্য লেগেছিল। তাঁর কবিতায় তাই তিনি নির্ভীক, আপসহীন সংগ্রামের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন। সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল না। তাঁর দৃষ্টি ছিল জনগণের প্রতি, অত্যাচারিত ও লুণ্ঠিত কৃষক সমাজের প্রতি।

তাঁর গভীর মানবতাবোধ ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অত্যাচারিত নারীর গৌরবকীর্তন ফুটে উঠেছে তাঁর "সিন্ধুতরঙ্গ" কবিতায়। "বধূ" কবিতায় একেবারে অপরিচিত শ্বশুরালয়ের রূঢ় আলোচনাক্লিষ্ট বালিকাবধূর প্রতি সকরুণ মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। "বিদায় অভিশাপ" গীতিনাট্যে প্রতারিত দেবযানীর মুখে তিনি হৃদয়হীন সংকুচিত্ত পুরুষের বিরুদ্ধে জ্বালাময় তিরস্কার উদ্গীরণ করেছেন। দেবযানী শুধু পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার প্রতিপন্ন করেন নি, নিজের শ্রেষ্ঠতাও প্রমাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে দিয়েই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবিকে ব্যক্ত করেছেন।

তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। কিন্তু সেই ধ্রুবতারা তাঁকে কোন্ পথের নির্দেশ দেবে তা তাঁর জানা নেই। তিনি শুধু জানেন যে সত্যকেই অবলম্বন করে মানবযাত্রী চলেছে যুগ হতে যুগান্তপানে, অজানার সন্ধানে। তারই আহ্বানে সে সমস্ত সংকটের আবর্তের মাঝে নির্ভীক হৃদয়ে ছুটে চলেছে, বুক পেতে গ্রহণ করেছে সমস্ত নির্যাতন, সমাজের সমস্ত উৎপীড়ন, প্রিয়জনের সমস্ত অবজ্ঞা। তারপর কবি মনোনিবেশ করছেন নিপীড়িত জনগণের সেবার কাজে। তাঁর কামনা শুধু সকলকে সুখী করা। কারণ তাহলে:

"হয়তো ঘুচিবে দুঃখ নিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা।"

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বিরোধ এখানে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। প্রথমে তিনি উদীপ্ত ভাষায় অর্ধ-ভূমিদাস কৃষক সমাজের দুঃখ যন্ত্রণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন; এমন কি তাদের কার্যক্ষেত্রে নামবার জন্যে ডাক দিয়েছেন। শেষ দিকে কিন্তু শুধু সেবাধর্মের মধ্যেই তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। পলায়ন করলেন ঈশ্বর ভক্তির আড়ালে। কিন্তু এ জন্যে কি তাঁকে দোষ দেওয়া সঙ্গত হবে? যে যুগে দেশের শ্রমিক শ্রেণী তখনও একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে নি, যখন বুর্জোয়া শ্রেণী শুধু আবেদন নিবেদনের পালাকীর্তনে মত্ত, সে যুগের কবির কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী আমরা কী আশা করতে পারি? তিনি যে দেশের লোককে জনগণের প্রতি দৃষ্টি ফেরাবার আহ্বান দিয়েছিলেন, সেই যুগের অবস্থায় সেইটেই যথেষ্ট প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক ছিল।

কৃষকের দুর্দশার ছবি আরও পরিষ্কার ভাবে ফুটেছে "দুই বিঘা জমিতে'। 'নগর সংগীতে' কবি পুঁজিতান্ত্রিক বাজার ও সহরের নাগপাশ বন্ধনের বিরুদ্ধে কৃষকের বিরূপতা ও প্রতিবাদের রূপ দিয়েছেন:

"ওই যে নগরী জনতারণ্য, শত রাজপথ, গৃহ অগণ্য,
কতই বিপণি, কতই পণ্য কত কোলাহল কাকলি।...
করুণ রোদন, কঠিন হাস্য, প্রভুত দম্ভ, বিনীত দাস্য,
ব্যাকুল প্রয়াশ, নিঠুর ভাষ্য, চলিছে কাতারে কাতারে।...
এ যেন বিপুল যজ্ঞকুণ্ড, আকাশে আলোড়ি শিখার শুণ্ড,
হোমের অগ্নি মেলিছে তুণ্ড ক্ষুধার দহন জ্বালিয়া।...
চারিদিকে ঘিরি যতেক ভক্ত, সুর্ণবরণ মরণাশক্ত,
দিতেছে অস্থি, দিতেছে রক্ত, সকল শক্তি সাধনা।"

কৃষকের দৃষ্টিতে পুঁজিতন্ত্রের যে রূপ দেখা দেয় তার একটি পরিষ্কার ছবি কবি তুলে ধরেছেন। তাই তিনি বলেছেন :

"আমি নির্মম, আমি নৃশংস, সবেতে বসাব নিজের অংশ
পরমুখ হ'তে করিয়া ভ্রংশ তুলিব আপন কবলে।
মনেতে জানিব সকল পৃথ্বী আমারি চরণ-আসন-ভিত্তি,
রাজার রাজ্য, দস্যুবৃত্তি, কোনও ভেদ নাহি উভয়ে।"

এই কি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ছবি নয় ?

পূজারিণীতে শ্রীমতীর আত্মদানকে গৌরবমণ্ডিত করে তিনি চিন্তা ও কর্মের গণতান্ত্রিক আদর্শকে সমর্থন করেছেন। এই সময়ে লিখিত সামন্ত রাজা ও জমিদারকে বিদ্রূপ করে আরও একটি কৌতুক কবিতা উল্লেখযোগ্য। জুতা আবিষ্কার হবুচন্দ্র-গবুচন্দ্রেরই আরও একটি উপাখ্যান। সরল বৃদ্ধ চর্মকার কুলপতিকে কবি নিপুণ শিল্পীর মত কত সহজে রাজা, মন্ত্রী ও জ্ঞানী পাত্র-মিত্রদের ঊর্ধে তুলে ধরেছেন, তা সত্যি বিস্ময়কর। রাজমন্ত্রীর হীন মিথ্যা দম্ভও তিনি তুলে ধরতে ভোলেন নি।

রবীন্দ্রনাথের গভীর দেশপ্রেম ও জাতীয় মুক্তির জন্য প্রবল আকাঙ্খা ইতিমধ্যেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত কতকগুলি কবিতার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। দুটি ছোট কবিতায় তিনি স্নেহার্ত বঙ্গমাতার সন্তানদের গৃহক্রোড় হতে মুক্তি দিতে বলেছেন। বঙ্গমাতাকে তিরস্কার করে তিনি বলেছেন :

"সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।"

এই দেশপ্রেমই আরও সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলিতে। কবিতার পর কবিতায় তিনি মধ্যযুগের বিদেশী শত্রু আক্রমণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের গৌরব গাথা গেয়েছেন। বহু অন্ধ সমালোচক এই কবিতাগুলির মধ্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা প্রচার দেখতে পেয়েছেন; যেহেতু অধিকাংশ কবিতাই রাজপুত ও মোগলের বা শিখ ও পাঠানের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে লেখা। কিন্তু এই কবিতাগুলি মুসলমান বা পাঠানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উজ্জীবিত করে না, সমস্ত অত্যাচারী শাসকশ্রেণী ও বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধেই ঘৃণার উদ্রেক করে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে এই কবিতাগুলি জনসাধারণের মনে

ঠিক এই অনুভূতিই জাগিয়ে তুলেছিল। বিশেষ করে সেই যুগে এর সত্যতা আরও প্রমাণিত হয়েছিল এই কারণেই, যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জনসাধারণের মনে তখন সবে সাড়া জাগিয়েছে। শুধু তাই কেন, ছেলেবেলায় আমাদের অনেকেরই কি জাতীয়তাবাদের হাতে খড়ি হয়নি রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' থেকে?

অবশ্য "পণরক্ষা" বা "নকল গড়ের" মত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সামন্ততান্ত্রিক ইজ্জতের উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন একথা ঠিক। তবু তার প্রগতিশীল গণতান্ত্রিকতার রূপ ক্ষুণ্ণ হয়নি, কারণ এ কবিতাগুলির মধ্যে কোথাও অহিংসা, বা অন্যায়কে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবার দর্শনের স্থান নেই; বরং এর মধ্য দিয়ে তিনি দেশের নওজোয়ানদের স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির জন্যে সংগ্রামে নামার ডাক দিয়েছেন। এ কিন্তু নিছক মৃত অতীত যুগের পুনরুজ্জীবন নয়। এর উদ্দেশ্য শুধু স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনীর দ্বারা মানুষের জাতীয় চেতনাকে অনুপ্রাণিত করা।

এ কবিতাগুলির একটা বৃহৎ দুর্বলতা এই যে, রবীন্দ্রনাথ নিজের দেশ পূর্ববঙ্গের মুসলমান কৃষকের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কোন ছবিও আঁকেননি। যে জনগণ কত শতাব্দী ধরে বার বার অটল সংকল্পের সঙ্গে স্বাধীন সত্তার জন্য আর্য আক্রমণের যুগ থেকে সংগ্রাম করে এল তাদের চোখের সামনে দেখেও শুধু তাদের দুঃখ দুর্দশার দিকটাই তিনি দেখতে পেয়েছেন।

এই সময়ে, এই আবেগময় উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতার পাশাপাশি কবি অন্য কবিতায় ফুটিয়েছেন ছোট ভাইয়ের প্রতি বোনের ভালবাসা, পোষা কুকুরের সঙ্গে ক্রীড়া রত বালকের আনন্দ, শিশুর প্রতি মায়ের স্নেহ প্রভৃতি মানব মনের অতি সাধারণ, বিচিত্র অনুভূতি। তাঁর গভীর মানবতাবোধ আরও ব্যক্ত হয়েছে 'ব্রাহ্মণ' কবিতায় জবালার জারজ সন্তানের প্রতি মহর্ষি গৌতমের শিষ্যদের সংকীর্ণচেতা ঘৃণার প্রতি কঠোর ধিক্কারে।

এই সময়ে লিখিত গীতি-নাট্য "গান্ধারীর আবেদন" বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে তাঁর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ প্রকাশ পেয়েছে তার প্রথম যৌবনের পবিত্রতায়, তার অকলঙ্ক গৌরবমণ্ডিত মহিমায়। দুর্যোধনের ভ্রাতৃদ্রোহ ও বিবেকহীন ঈর্ষার বিরুদ্ধে অনুযোগ জানিয়ে ধৃতরাষ্ট্র বলছেন যে, দুর্যোধনের হাতে ধর্ম পরাজিত। তার উত্তরে দুর্যোধনের মুখে কবি সামন্ততন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। যেখানে সুবিচার

নেই, সাম্য নেই, গণতন্ত্র নেই, শুধু আছে বিজয়োদ্ধত রাজার একচ্ছত্র শাসন ও স্বেচ্ছাচারিতা।

"লোকধর্ম, রাজধর্ম এক নহে পিতঃ।
লোকসমাজের মাঝে সমকক্ষ জন
সহায় সুহৃদ রূপে নির্ভর বন্ধন।
কিন্তু রাজা একেশ্বর..."

ধৃতরাষ্ট্র যখন বলছেন যে দুর্যোধনের নিন্দা আজ "পরিপূর্ণ করিয়াছে অম্বর অবনী", দুর্যোধন তার উত্তর দিচ্ছেন:

"নিন্দা, আর নাহি ডরি,
নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি।
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী
স্পর্ধিত রসনা তার দৃঢ়বলে চাপি
মোর পাদপীঠতলে।"

ধৃতরাষ্ট্রের মতে দমননীতি নিন্দাকে বন্ধ করতে পারে না, তাকে কেবল নির্বাসিত করতে পারে "অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে"। উত্তরে দুর্যোধন বলছেন:

"অব্যক্ত নিন্দায়
কোন ক্ষতি নাহি করে রাজ-মর্যাদায়,
ভ্রূক্ষেপ না করি তাহে। প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি, কিন্তু স্পর্ধা নাহি চাই
মহারাজ। প্রীতিদান স্বেচ্ছার অধীন,
প্রীতিভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন,
সে প্রীতি বিলাক তারা পালিত মার্জারে,
দ্বারের কুকুরে, আর পাণ্ডব ভ্রাতারে,
তাহে মোর নাহি কাজ। আমি চাহি ভয়,
সেই মোর রাজপ্রাপ্য, আমি চাহি জয়
দর্পিতের দর্প নাশি।"

জনগণ সম্পর্কে যে উদ্ধত ঘৃণা এখানে ফুটে উঠেছে এ শুধু সামন্ততান্ত্রিক শাসনেরই রূপ নয়, এ সাম্রাজ্যবাদী শাসনেরও রূপ, যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রধান সামাজিক ভিত্তি হল সামন্ততান্ত্রিক রাজন্যবর্গ। আজ একই ছবি

আমরা দেখতে পাচ্ছি সাম্রাজ্যবাদের হাতে পড়া অশোকচক্রে নিষ্পেষিত আমাদের এই "স্বাধীন" রাজত্বে।

এই রাজধর্মের বিরুদ্ধে লোকধর্মের প্রতিনিধিরূপে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন গান্ধারীকে। সুবিচারের জন্যে, সাম্যের জন্যে, গণতন্ত্রের জন্যে গান্ধারীর আবেদন। "ত্যাগ কর পুত্র দুর্যোধনে।" দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মত অধম দুষ্কৃতির প্রতিবাদে সমস্ত নারীর হয়ে গান্ধারী বিচার প্রার্থনা করেছেন।[৮] প্রতিকারের দাবি জানিয়ে তিনি বলছেন :

"........কুরুরাজগণ
পৌরুষ কোথায় গেছে ছাড়িয়া ভারত
তোমরা, হে মহারথী জড়মূর্তিবৎ
বসিয়া রহিলে সেথা চাহি মুখে মুখে
কেহ বা হাসিলে, কেহ বা করিলে কৌতুকে
কানাকানি। কোষমাঝে নিশ্চল কৃপাণ
বজ্র-নিঃশেষিত লুপ্ত বিদ্যুৎ সমান
নিদ্রাগত। মহারাজ, শোন মহারাজ—
এ মিনতি। দূর কর জননীর লাজ,
বীরধর্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত
ন্যায়ধর্ম করহ সম্মান, ত্যাগ করো
দুর্যোধনে।"

অত্যাচার ও উৎপীড়নের সশস্ত্র প্রতিকারের জন্য এ এক উদাত্ত আহ্বান। ভারতের পৌরুষের প্রতি আজও কি এইরূপ আবেদন করা চলে না? আর সে যুগে দেশের জনসাধারণ যখন ১৮৫৭-র পরে ক্লান্ত নিদ্রা থেকে তখনও জাগেনি, তখন কি গান্ধারীর আবেদন আমাদের যুবশক্তিকে একটুও অনুপ্রাণিত করেনি, তাদের মনে কি জেগে ওঠেনি বৈপ্লবিক চেতনা?

ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ পুত্রস্নেহের কাছে গান্ধারীর আবেদন ব্যর্থ হল। তিনি প্রতীক্ষা করে রইলেন সেই দিনের জন্যে যে দিন মহাকাল নিজেকে সংশোধন করবে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর কাছে মহাকালের সংশোধনের পথ প্রশস্ত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি কেবল তাঁর অশান্ত হৃদয়কে স্থির হয়ে প্রতীক্ষা করতে বললেন মহাকালের জাগরণের জন্য। সুদীর্ঘ রাত্রির

শেষে মহাকালের জাগরণ আনবে দারুণ দুঃখদিন। ইতিহাসের রুদ্র রথচক্রের নিষ্পেষণে আকাশে বাতাসে যে হাহাকার ধ্বনি উঠবে তাকে গান্ধারী প্রণাম করছেন। মহাকাল যে শাস্তি আনবে রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর মতে সে শাস্তি নির্মম, যে নিষ্কৃতি আসবে, সে নিষ্কৃতি শ্মশানের ভস্ম মাখা। সর্বশেষে তাই দ্রৌপদীকে তিনি আশীর্বাদ করছেন দুঃখের অপমান পেয়ে ও ন্যায়ধর্মের নিশ্চিত জয়ের আশ্বাস দিয়ে।

যদিও "গান্ধারীর আবেদনে" ধর্মোপদেশ, দুঃখের উত্তাপে আত্মশুদ্ধি ও ভাগ্যের উপরে অসহায় নির্ভরতা ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণার পরিষ্কার ছাপ আছে, তবু তার মূল বিষয়বস্তু যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ন্যায় ও সমানাধিকারের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মতবাদের প্রতিরূপ এতে কোনও সন্দেহ নেই। একজন নারীর মুখে এই উক্তিগুলি দেওয়ারও একটা সার্থকতা আছে। অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদধ্বনি সেই কারণেই এই গীতি-নাট্যটিকে এত মুখর করে তুলেছে।

নতুন শতাব্দী দেখা দিল নতুন প্রাণস্পন্দন নিয়ে। ধনিক শ্রেণী, নবজাত শিল্পপতি বুর্জোয়া শ্রেণী এবং জমিদার ও ধনী বুদ্ধিজীবীর প্রগতিশীল অংশের প্রতিনিধিত্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আন্দোলন তখন নতুন রূপ নেবার চেষ্টা করছে। সাম্রাজ্যবাদ নির্বাচিত পথ ও সেই পথে বিশ্বাসী কংগ্রেসের নেতাদের বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষ ঘনিয়ে উঠল। তারই সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব হল। তিলক, বিপিন পাল, লাজপৎ রায়ের ডাকে তখন সারা দেশ সাড়া দিয়ে উঠল। এই নতুন নেতারা নরমপন্থীদের নিষ্ফল আপসকারী রাজনীতি ছেড়ে কিছুটা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হতে চাইলেন। কিন্তু তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকায় পুরাতন রাজনীতির প্রগতিশীল দিকটাকে সকল অনিষ্টের মূল বলে তাঁরা ত্যাগ করতে চাইলেন। এইভাবে রাজনৈতিক উগ্রপন্থার সাথে মিলন হল সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতার। যার ফলে হিন্দু গোঁড়ামি উঠে দাঁড়াল পাশ্চাত্য heresy-র বিরোধিতা করে।

এ সময় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনা কিছুটা পরিণত উঠেছে। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদের অভিন্ন সম্পর্কেও তিনি কিছুটা সচেতন হতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর কাছে থেকে উগ্র জাতীয়তাবাদ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের চাপে তাঁর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আদর্শবাদ যে ভেঙে

টুকরো টুকরো হয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাশিবাদের নবকলেবর ধারণ করছে তার আভাস তিনি তখনই কতকটা পেয়েছেন। এই সময়ে লেখা "নৈবেদ্যের" বহু কবিতায় তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও তার যুদ্ধলোলুপতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন কিন্তু সমস্যার কোনও সমাধান খুঁজে না পেয়ে ঈশ্বরের প্রতি অসীম নির্ভরতা ও পাপের প্রতি নিবিরোধের অন্তরালে আত্মগোপন করলেন। 'নৈবেদ্যে' কয়েকটি উৎকৃষ্ট দেশপ্রেমের কবিতাও আছে। এই কবিতাগুলিতে ঈশ্বরভক্তি ও দেশপ্রেম অনেক জায়গায় এক হয়ে গেছে। এগুলি যে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচায়ক সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ জাতীয় রাজনীতির নতুন পথের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু তার অন্তর্বিরোধ তাঁর চোখে পড়েছিল। যদিও এই সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরোধিতা তিনি করেন, তবু সঠিক পথের সন্ধান না পাওয়ায় ব্যর্থতার আতিশয্যে তিনি ঈশ্বরভক্তির কোলে আশ্রয় নেন।

'নৈবেদ্য'কে যাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল কবিতার সংকলন বলে সমালোচনা করে থাকেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে 'ত্রাণ' কবিতাটিতে কবি মঙ্গলময়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন :

"দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
……ভগ্ন নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ত তলে বারংবার
মনুষ্য মর্যাদা গর্ব—চিরপরিহার
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো।"

এই সংকলনেরই "ন্যায়দণ্ড" কবিতায় কবি লিখেছেন :

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে।……
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।"

"প্রার্থনা" (নৈবেদ্য—৭২) কবিতাটিতে যে ছবি ফুটে উঠেছে তাকে সমাজতন্ত্রী সমাজের ছবি বললে কি ভুল হবে? অবশ্য একথা সত্যি যে রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে সমাজতন্ত্রের কথা বলেননি। তিনি শুধু বেদান্ত দর্শনের ভাষায় গ্রামাঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তবুও যে আদর্শ কবি এখানে তুলে ধরেছেন তা আজ অর্জিত হতে পারে কেবল সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে: একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নেই আজ এই ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯০৪ সালে তিলক শিবাজী উৎসবের আহ্বান জানান। রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে সে আহ্বানে সাড়া দেন। "শিবাজী উৎসব" কবিতাতে তিনি শিবাজীকে অভিনন্দিত করেন। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্মরাজ্যে বেঁধে দেবার শিবাজীর যে লক্ষ্য ছিল তাকে তিনি ভারতের জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। ধর্মরাজ্য বলতে রবীন্দ্রনাথ উচ্চ নৈতিক মানের ভিত্তিতে গঠিত এক রাষ্ট্রের কথা বুঝিয়েছেন। গান্ধারীও ধর্ম অর্থে ন্যায় ও সাম্য, এবং অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। কাজেই এখানে রবীন্দ্রনাথ যে কেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথাই বলতে চেয়েছেন তা মনে করলে হয়তো ভুল হবে না।

তারপর ১৯০৫ সালে জাপানের কাছে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার পরাজয় ও প্রথম রুশ বিপ্লবের পটভূমিকায় ভারতের স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম হল। তার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই এই আন্দোলনের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তিনি ঘোষণা করেন যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই আঘাতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে দৃঢ়সংকল্প।

এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপরে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গের দিন ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে রাখীবন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ ও আস্তাবলে ঢুকে সেদিন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক রাখী তিনি দীন-দরিদ্র মুসলমানদের হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন।

আন্দোলনের ঢেউ যত বাড়তে লাগল দেশ তত স্বদেশী গানে ভরে উঠল। রবীন্দ্রনাথ এখন স্বদেশী আন্দোলনের চারণ ও দীক্ষাগুরুর স্থান নিলেন। প্রত্যেকটি সভা ও শোভাযাত্রা মুখরিত হয়ে উঠল তাঁরই লেখা স্বদেশী গানে।

সেই সব গানের মধ্যে অনন্ত দেশপ্রেম ও সংগ্রামের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে ; কিন্তু তারই পাশাপাশি কিছু কিছু স্বদেশী গানের মধ্যে মায়াবাদের সুর অতি পরিষ্কার ধরা যায়। সেখানে ফুটেছে ঈশ্বরের প্রতি অসীম নির্ভরতা। এ প্রসঙ্গে 'আমাদের যাত্রা হল শুরু' গানটি উল্লেখযোগ্য।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জড়িত হয়ে অরবিন্দ ঘোষ যখন গ্রেপ্তার হন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উদ্দেশ করে একটি কবিতা লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করতেন না ও পরবর্তী যুগে তাঁর 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত বীর বিপ্লবীদের তিনি হেয় করেছেন। কিন্তু একথাও সত্য যে তিনি তাঁদের আদর্শ ও বীরত্বের মর্যাদা দিয়েছিলেন। অরবিন্দের দুঃখবরণকে অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আজ জাগি পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন।" কী সেই 'সর্ববাধাহীন পরিপূর্ণতা' ?

"যার লাগি নর-দেব চির রাত্রিদিন
তপোমগ্ন ; যার লাগি কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়েছেন সংকট-যাত্রায় ; যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে ;
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয় ; সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার—
চেয়েছ দেশের হ'যে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরবদীপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।"

"আপনার পূর্ণ অধিকার"—এই দাবি একদিন প্রস্ফুটিত হয়েছিল ইওরোপের শিল্পীদের তুলিতে। ধ্বনিত হয়েছিল কাব্যে ও গানে, পথে পথে সাধারণ মানুষের হাজার কণ্ঠে। ইওরোপের সহরে সহরে তখন সংগ্রামের দামামা বেজে উঠেছে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান্ সংগ্রাম। যে বীর বিপ্লবী এই মহান্ দাবি নিয়ে সংগ্রামে নেমেছেন, তাঁর কাছে রাজরোষ ও শাস্তির ভীতি নিতান্ত তুচ্ছ। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

"...শাস্তি ? শাস্তি তারি তরে
যে পারে না শাস্তি ভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর,

কপট বেষ্টন ; যে নপুংসক কোনদিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায় ; আপনার
মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত নিত্য অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে ; দুর্গতির করে অহঙ্কার ;
দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায় ;
সেই ভীরু নতশির, চির শাস্তি তারে
রাজকারা বাহিরেতে নিত্য কারাগারে ।"

এই নিদারুণ অভিযোগ আজকের দিনেও আমাদের কাছে চরম সত্য। দেশের দুর্দশা নিয়ে যারা ব্যবসা করে সেই নপুংসকের দল এখনও আমাদের স্কন্ধে চেপে বসে আছে। কবিতাটি কিন্তু শেষ হয়েছে সেই চির পুরাতন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতায়।

"গীতাঞ্জলি"ও ঐ সময়েরই রচনা। প্রধানত প্রেম, ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়বাদে এর প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিপাদ্য বিষয় হলেও এর মধ্যে কবির প্রগাঢ় দেশপ্রেম ও নিপীড়িত শোষিত জনগণের প্রতি সহানুভূতিসূচক কবিতাও আছে। অতীন্দ্রিয়বাদের ধোঁয়াটে অর্থহীন ছন্দের মালার মধ্যে এই কবিতাগুলি অত্যন্ত স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দেয়। "ভারত-তীর্থে" তিনি সমস্ত ভারতবাসীকে পশ্চিম সভ্যতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের উপযুক্ত এক বিরাট পুনরভ্যুদয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে সমস্ত ভারতবাসীর প্রতি একতার আহ্বান। "দীনের সঙ্গীতে" দেবতা আছেন সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে ; কবির দুঃখ সেখানে তিনি পৌছতে পারেন না। এই বিষয়বস্তুই "ধূলা মন্দির" আরও বেশি করে ফুটে উঠেছে। সেখানে তিনি রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণে ভগবানকে খোঁজেননি, তাঁর ভগবান আছেন "যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারোমাস।" গণতান্ত্রিক ভক্তিবাদী সাহিত্যের ঐতিহ্য এখানে উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয়েছে।

"জনগণমন" গানটি এই সময়ে লেখা। উগ্র হিন্দুপন্থীরা এই গানটি সম্পর্কে বার বার যে অপবাদের প্রচার করেছেন, এই জায়গায় তাকে খণ্ডন

করার প্রয়োজন দেখছি না। বহু গান, ধর্মসংগীত ও প্রেমের কবিতা অথবা বৈষ্ণব কাব্যের ধরনে দুইয়ের সমন্বয় এই যুগকে সমৃদ্ধ করেছে। একই সময়ে লিখিত "শিশু"র মধ্যে মা ও শিশুর স্নেহমধুর সম্বন্ধ, এত কোমলতা ও মাধুর্যের সঙ্গে ফুটে উঠেছে যে মনে হয় রেনেসাঁর শিল্পীগণ তুলি দিয়ে ক্যানভাসে ম্যাডোনার যে মাতৃমূর্তি ফুটিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের লেখনী মুখে সেই ছবিই ফুটেছে। এই ধরনের কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যেও বিরল।

১৯১৪ সালে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। "লড়াইয়ের মূল" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধকে চিনতে পেরেছিলেন বিশ্ববাজার পুনর্বণ্টনের জন্য দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধ বলে। তিনি লিখলেন:

"সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ববিবাহ ঘটিয়া গিয়াছে।" সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের গান্ধর্ব-বিবাহ ?— সাম্রাজ্যবাদের এত সঠিক ধারণা কোন অমার্ক্সীয় লেখকের পক্ষে দেওয়া সহজ কি ? বাস্তবের সঙ্গে এত সহজে পরিচয়ের ক্ষমতাই রবীন্দ্রনাথকে অসামান্য করে তুলেছে।

যুদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে আবার অধ্যাত্মবাদের ক্রোড়ে ঠেলে দিল। তাঁর চোখের সামনে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আদর্শ ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে; ১৯০৫ সালের আন্দোলনের পঙ্গু গতি ও আংশিক সাফল্য তাঁকে নৈরাশ্যে ভরিয়ে দিল; বৃটিশ প্রস্তাবিত সংস্কারে কংগ্রেস নেতাদের মত তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। এই সময়ে ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদের পক্ষপুটে তিনি পলায়ন করলেন। যুদ্ধের কয়েক বৎসর ও যুদ্ধ পরবর্তীকালে তৃতীয় দশক পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রায় কোন প্রগতিশীল বা রাজনৈতিক কবিতা প্রকাশিত হয়নি। স্বাধীনতা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অধ্যাত্মিক প্রশ্ন নিয়ে ও প্রতিক্রিয়াশীল অধ্যাত্মবাদকে বড় করে তিনি কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে এই যুগটাকে সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়াশীল বলা চলে। এই লেখাগুলি প্রতিফলিত করেছে সমসাময়িক গণআন্দোলন থেকে রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছিন্নতা।

কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি এই সময় প্রকৃতির সৌন্দর্য, ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়বাদ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর ভাবসমৃদ্ধ প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাগুলিতে কিন্তু অতীন্দ্রিয়বাদের পাশাপাশি পুরাতনকে পরিহার ও নতুনকে আহ্বানের নীতি

বরাবর অনুসৃত হয়েছে, যেমন "বলাকা"য়, বিশেষ করে "সবুজের অভিযান" কবিতাটিতে। এ ছাড়া, আখ্যানমূলক (narrative) কবিতায় তিনি নতুন আঙ্গিকের ব্যবহার শুরু করলেন, যেমন "পলাতকা"র কবিতা। এই ধরনের কবিতাগুলিতে তিনি বারবার নারীর প্রতি সমস্ত অবিচার ও শ্রেণীসমাজের শোষণের প্রতিবাদ করেছেন, পুরুষের সঙ্গে তার সমানাধিকার দাবি করেছেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'মুক্তি' 'নিষ্কৃতি' ও 'সবলা'র মত কবিতা। এই সময়ের দুটি বিখ্যাত রাজনৈতিক কবিতা হল 'দেশ দেশ নন্দিত করি' ও 'ভারতের প্রার্থনা'। 'নৈবেদ্যের' কয়েকটি কবিতার ভাব একত্র করে ইংরেজি ভাষায় ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য 'ভারতের প্রার্থনা' রচিত হয়। এতে যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ উল্লেখ রয়েছে। ধর্মভাব ও অতীন্দ্রিয়তায় পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এর একটি সুস্পষ্ট সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সুর আছে।

এই যুগের রাজনৈতিক প্রবন্ধের বিষয়বস্তুও ঠিক এ-ই। আত্মার মুক্তিই যে প্রকৃত স্বাধীনতা, এত প্রত্যয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এর আগে বা পরেও কখনও বলেননি। বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর সমস্ত স্বপ্ন রূঢ় আঘাত পেয়েছিল। অথচ তখনও পর্যন্ত তিনি ক্ষয়িষ্ণু মতবাদের চোরাবালি থেকে বেরোবার পথ খুঁজে পাননি। সেই জন্যেই ধর্মের কাছে, রাজনীতি ও সমাজের নৈতিক মানের কাছে, আত্মার মুক্তির কাছে তাঁর এই নিষ্ফল আবেদন। এ শুধু মৃত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মতবাদকে তাঁর যুক্তিবাদে মোড়া প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের বড়ি খাইয়ে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা।

১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপান ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। সেখানে তাঁর বক্তৃতায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিমত প্রকাশ করেন। সাম্রাজ্যবাদ তাঁর কাছে তখনও শুধু উগ্র জাতীয়তাবাদ। এই উগ্র জাতীয়তাবাদই যে একদিন ভীষণাকার ধারণ করতে পারে এ আশঙ্কা তখনই রবীন্দ্রনাথের মনে উদিত হয়েছিল। কিন্তু ফ্যাশিবাদের উৎপত্তি ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আদর্শের মৃত্যুর অর্থনৈতিক ভিত্তিকে তিনি চিনতে পারেননি। তাই তিনি শুধু আন্তর্জাতিকতা ও মানবের ভ্রাতৃত্ববোধ প্রচার করেছেন।

১৯১৯-২২ সালে মহান অক্টোবর বিপ্লবের দামামাধ্বনিতে সাড়া দিয়ে এক বিরাট গণঅভ্যুত্থান ভারতে বৃটিশ প্রভুত্বের আসন কাঁপিয়ে দিল। সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে এল ভারতের শ্রমিক শ্রেণী। কিন্তু

তখনও তার শক্তি সংহত নয়। জেগে উঠল কৃষকসমাজ, বুর্জোয়া শ্রেণী এগিয়ে এল নেতৃত্ব গ্রহণ করতে। সারা দেশব্যাপী এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব স্থানে বসল ধনিক শ্রেণীর ধনী অংশ, সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর সঙ্গে আপস করে সেই বিপ্লবের গতিরুদ্ধ করা হল তার কাজ। জালিয়ানওলাবাগে সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ হত্যাকাণ্ড রবীন্দ্রনাথকে যেন কষাঘাত করল। বৃটিশ সরকারের দেওয়া সম্মান ছুঁড়ে ফেলে তিনি জনগণের সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ ঘোষণা করলেন।

রবীন্দ্রনাথ জনগণের পাশে এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে পারলেন না। অসহযোগ আন্দোলন থেকে তিনি দূরে সরে রইলেন। ঔপনিবেশিক বৃটিশ বুর্জোয়ার উপর ("ছোট ইংরেজ") তিনি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন, কিন্তু "বড় ইংরেজের" প্রতিনিধিত্বে বৃটিশ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একদিন জয় হবেই এ বিশ্বাস তাঁর তখনও ছিল। এই বিশ্বাসই তাঁকে বিপ্লবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগে বাধা দিয়েছিল। তাছাড়া অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। বিপ্লব থেকে দূরে সরে তিনি ইওরোপ ভ্রমণে গেলেন। আশা ছিল সেখানে এমন একটা কিছুর সাক্ষাৎ পাবেন যা তাঁর ভগ্নপ্রায় আদর্শে নতুন প্রাণসঞ্চার করবে। তিনি জানতে চেয়েছিলেন যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর উগ্র জাতীয়তাবাদের উন্মত্ত লোলুপতা—যাকে 'ন্যাশানালিজম' বইয়ে "self-love of nations" বলা হয়েছে—কিছুটা প্রশমিত হয়েছে কিনা। কিন্তু যা দেখলেন তাতে তাঁর প্রতীতি জন্মাল যে ভার্সাই চুক্তি আর একটা মহাযুদ্ধের প্রস্তুতিমাত্র।

তৃতীয় দশকে ভারতে গণ-আন্দোলনের নতুন ঢেউ উঠল। সাম্রাজ্যবাদ তার নিজের আর্থিক সংকটের বোঝা ভারতের শোষিত জনগণের উপরে চাপাতে চেষ্টা করল। আর একবার জনগণের কণ্ঠ প্রতিবাদ-ধ্বনিতে মুখরিত হল। গ্রামাঞ্চলে কৃষি বিপ্লবের সূচনা দেখা দিল। শ্রমিক শ্রেণী পূর্বের চেয়ে সংগঠিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব নেবার জন্য অগ্রসর হল। কিন্তু ধনিক শ্রেণীর কবল থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেবার শক্তি শ্রমিক শ্রেণীর ও কমিউনিস্ট পার্টির তখনও হয়নি। তাই ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বের পক্ষে আন্দোলনের রাশ টেনে বিপ্লব থেকে সরিয়ে রেখে সাম্রাজ্যবাদের সুবিধা করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

আন্দোলনের গতি রবীন্দ্রনাথকে আবার রাজনীতি ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে এল।

৬৯ বৎসরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের ১৯০৫ সালের সে শক্তি আর ছিল না। তাই প্রত্যক্ষভাবে এ আন্দোলনে যোগ দেওয়া তাঁর সম্ভব হল না। কিন্তু তাঁর লেখনী মুখে অগ্নিস্রোত বইল। হিজলীর হত্যাকাণ্ডের পরে কলকাতার অক্টোরলোনী মনুমেন্টের নীচে এক বিরাট জনসভায় সাম্রাজ্যবাদী নরঘাতকদের এই বীভৎস হত্যালীলার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। 'প্রশ্ন' কবিতাটি এই সময়েরই রচনা। আজও সারাদেশব্যাপী বহু হিজলীর প্রতিবাদে কবিকণ্ঠে "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এবার নতুন সুর দেখা দিল। ভারতের বুকে আন্তর্জাতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত রবীন্দ্রনাথকে ক্রমশ আরও বেশি করে প্রভাবিত করল। তিনি আবার ইওরোপে গেলেন এবং জার্মানি, ইতালি ও সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিভ্রমণ করলেন। তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও রমাঁ রলাঁর সঙ্গে গভীর যোগাযোগ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাশিবাদের নৃশংস বর্বরতা তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরে। তিনি এবার লেখনী নিয়োজিত করলেন মনুষ্যত্বের ও শোষিত, নিপীড়িত জনসাধারণের সেবায়, ফ্যাশিবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র ও শান্তির পক্ষে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে' প্রকাশিত একটি পত্রে ফ্যাশিবাদের কঠোর সমালোচনা করেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নে এসে রবীন্দ্রনাথ এক নতুন সমাজ ও নতুন মানুষকে গড়ে উঠতে দেখলেন। সমাজতন্ত্রী পুনর্গঠনের কাজে সোভিয়েট জনগণের অসম্ভব সাহস দেখে তিনি বলেছিলেন যে এখানে না এলে "এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।" পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে নতুন সোভিয়েট সভ্যতাকে তিনি গ্রহণ করতে পারলেন শত দ্বিধা শত ভুল বোঝা সত্ত্বেও। নতুন সমাজব্যবস্থার যে রূপ তিনি দেখলেন তাতে তাঁর জীবনের স্বপ্নের মূর্ত ছবি খুঁজে পেলেন। কিন্তু এই নতুন সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তিকে পরিষ্কার বুঝতে পারলেন না। তা সত্ত্বেও ধনবাদী সমাজ ও সোভিয়েট সমাজের মূল পার্থক্যকে অতি সহজেই চিনতে পারলেন ও অনেক প্রশ্নের উত্তর পেলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই বলি :

"যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোন দেশের মতই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকে এরা সমান করে জাগিয়ে তুলচে।

"চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের

সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত।...তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

"আমি অনেকদিন এদের কথা ভেবেচি, মনে হয়েচে এর কোন উপায় নেই। একদল তলায় না থাকলে আর-একদল উপরে থাকতে পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে।...যাই হোক আমি ভাল করে কিছুই ভেবে পাইনি—অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে তবেই সভ্যতা অত্যুচ্চ থাকবে একথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে।

"রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁসে এই সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা চলচে।"　　　(রাশিয়ার চিঠি, ১-৪ পৃ:)

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের মানুষ শ্রেণী-বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়। শুধু তাই নয়, অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েট ইউনিয়নের অস্তিত্ব পৃথিবীর শোষিত ও নিপীড়িত জনসাধারণের উপর কী প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন :

"দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্চে, এইটে মস্ত কথা। আগেকার দিনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দেখেচে বলেই কোনমতে নিজের শক্তিরূপ দেখতে পায়নি—অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে সব সহ্য করেচে। আজ অত্যন্ত নিরুপায়ও অন্তত সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা করতে পারচে যে-রাজ্যে পীড়িতের পীড়া যায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে। এই কারণেই সমস্ত পৃথিবীতে আজ দুঃখজীবীরা নড়ে উঠেচে।"

(রাশিয়ার চিঠি, ১৭ পৃ:)

এই চেতনা ছিল বলেই সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজবাদের গঠনমূলক কাজকে পৃথিবীর "সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান" বলে বর্ণনা করতে পেরেছেন। সোভিয়েট গণতন্ত্রের সঙ্গে নিজেকে এক করে তিনি বলেছেন :

"ওরা শক্তিশালীর শক্তিকে, ধনশালীর ধনকে বিপর্যস্ত করে দিতে চায়, তাতে আমরা ভয় করব কিসের, রাগই বা করব কেন? আমাদের শক্তিই বা কী, ধনই বা কত? আমরা তো জগতের নিরন্ন, নিঃসহায়দের দলের।"

(রাশিয়ার চিঠি, ২০ পৃ:)

'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরেজি অনুবাদ যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রকাশ করতে দেয়নি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জনসাধারণের শত্রুর কাছ থেকে আর কী আশা করা যেতে পারে? কারণ অক্টোবর বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন :

"যে বাঁধনে দেশকে জড়িয়েছে টান মেরে মেরে সেটা ছিঁড়তে হয়। প্রত্যেক টানে চোখের তারা উলটে যায়, কিন্তু এ ছাড়া বন্ধন-মুক্তির অন্য উপায় নেই।...ভীষণের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ভয় করি, সেই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে, কিন্তু কাপুরুষের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি। বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণার দ্বারা ধিক্কৃত। এই ঘৃণাই আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতব।" (রাশিয়ার চিঠি, ১৩৩-১৩৪ পৃঃ)

গান্ধীবাদী অহিংস নীতির ভিতরে শত্রুর প্রতি ঘৃণার কোন স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথ শত্রুর প্রতি এই পবিত্র ঘৃণাকেই আমাদের শক্তি বলে প্রচার করেছেন।

ইওরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর কাব্যের আবার "ঋতু পরিবর্তন" ঘটল। গণতন্ত্র ও প্রগতির যে রুদ্ধ বাণী তাঁর কাব্যে আত্মপ্রকাশের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল, এইবার সরল ভাষা ও সহজ উপমার মধ্যে দুর্বার জলস্রোতের মত সে বেরিয়ে এল। প্রথম যৌবনের বিশ্বাস ও উচ্ছ্বাস পরিণত জ্ঞানের অভিজ্ঞতায় আরও গভীরতা নিয়ে দেখা দিল। 'নবজাতকে'র কবিতাগুলি এই চরিত্রের। এই পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক। মরণোন্মুখ বুর্জোয়া সভ্যতার বীভৎসরূপ ফ্যাশিবাদের বিভীষিকা ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম অগ্নিশিখা রবীন্দ্রনাথকে গণতন্ত্রের, শান্তি ও প্রগতির শিবিরের আরও কাছাকাছি নিয়ে এল। এই সময়ে রচিত বিখ্যাত কয়েকটি ফ্যাশিবিরোধী কবিতা জগতের কাছে প্রমাণ করে দিল রবীন্দ্রনাথ এখনও তরুণ, বাস্তব-জগতের আকস্মিক ওঠাপড়ায় এখনও তিনি সাড়া দেন, এখনও তাঁর "রসনায় ...সত্যবাক্য বলি উঠে খর খড়্গসম...।"

১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী"র 'নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্বের' অবসানের জন্যে বুদ্ধের অমৃতবাণীকে আহ্বান করেছিলেন। ১৯৩৫-৩৬ সালে তাঁর প্রতিবাদ আরও বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করল। এই সময়ে তাঁর অচঞ্চল অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। নারীজাতি ও তার অধিকার সম্পর্কে লিখিত কবিতাতেও শ্রমজীবী জনগণের কাছে পৌঁছবার একটা নতুন প্রচেষ্টা ও

অতীতের অনির্দিষ্ট ভাববাদের পরিবর্তে নির্দিষ্ট বাস্তববাদের সুর দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ "সাঁওতাল মেয়ে" কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ইতিহাস এখন অনবদ্যের প্রতি মানুষের দুঃসাহসিক অভিযানের বিকাশ, সম্মুখের পানে মানুষের অনন্তযাত্রা। "চিরযাত্রী"তে যে যোদ্ধ্ মানুষ চিরাচরিত প্রথার বন্ধন গুঁড়িয়ে দিয়ে ইতিহাস রচনা করে চলেছে, রবীন্দ্রনাথ তারই বন্দনা গেয়েছেন।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কশাঘাত আরও তীব্র হয়ে উঠেছে "আফ্রিকা" কবিতায়। আফ্রিকার মানুষের অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সেখানে শুধু ঈশ্বর বা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নীতির কাছে আবেদন জানাননি। যে সভ্যতা একদিন তাঁর আদর্শ ছিল, তার অন্তিমকালের ঘোষণা করেছেন অতি কঠোর ভাষায়। সে সভ্যতার মৃত্যুতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন নি, শুধু তার চরিত্রের ভয়াবহ বীভৎসতা ফুটিয়ে তুলেছেন কবিতাটির ছত্রে ছত্রে।

১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ সাংঘাতিক পীড়া থেকে আরোগ্য লাভ করে যেন এক নতুন দৃষ্টির সন্ধান পেলেন। সারা পৃথিবী তখন দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে মহাযুদ্ধের দিকে উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের নবলব্ধ দৃষ্টি তাঁকে দ্বিধাহীন চিত্তে শান্তি ও গণতন্ত্রের শিবিরে নিয়ে এল। চীনে ও স্পেনে যুদ্ধ তখন শুরু হয়ে গেছে। পীড়িত অবস্থায় প্রথম জ্ঞানলাভ করেই তিনি যে কবিতা রচনা করলেন সেটা তাঁর সাহিত্যিক জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। তাঁর ভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়াশীল ধর্ম, ঈশ্বরপ্রেম ও অতীন্দ্রিয়বাদপূর্ণ কবিতার উপরে প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক বিষয়বস্তু এবার চূড়ান্ত জয়লাভ করল। পৃথিবীতে মানুষের চূড়ান্ত অপমান দেখে তিনি বলে উঠলেন :

"মহাকাল সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী, নারীঘাতী,
কুৎসিত বীভৎসা 'পরে ধিক্কার হানিতে পারে যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।" (প্রান্তিক)

বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ তখন শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। এখন আর তিনি ভগবানের কাছে শত্রুকে ভালবাসা সম্পর্কে

"প্রশ্ন" তুলছেন না, আত্মার মুক্তির কথাও বলছেন না। এখন তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে বুর্জোয়া সভ্যতাকে ঘৃণা করছেন। কবিতার পর কবিতায় বিশ্ব-প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর বজ্রকণ্ঠ-প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। নোগুচির কাছে লিখিত পত্রে তিনি চীনের উপরে জাপানের আক্রমণকে নিন্দা করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর "বুদ্ধভক্তি" কবিতার মধ্য দিয়ে ক্ষুব্ধ ক্রোধের কশাঘাত হেনেছেন।

আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় নাৎসি জার্মানি ও ইঙ্গ-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদী-দের মিউনিক চুক্তির পর স্বভাবতই তিনি ক্রোধোদ্দীপ্ত প্রতিবাদ জানিয়ে-ছিলেন তাঁর "প্রায়শ্চিত্ত" কবিতায়। এই কবিতায় ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রকৃতি ও প্রধান অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কবি অত্যন্ত সচেতন। তাই "সভ্যনাশিক পাতালে যেথায় জমেছে লুটের ধন", সেখানে তিনি দেখেছেন "ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাত।" এ সংঘাতকে তিনি ভয় করেননি। এর নিষ্ফল অবসান কামনা করেননি। তিনি চেয়েছিলেন এই সংগ্রামে ক্ষুধাতুর জনসাধারণের চূড়ান্ত বিজয়। তাই কবিতাটির শেষে তিনি বলেছেন:

"ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে,
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।"

এর থেকেই বোঝা যায় "গান্ধারীর আবেদন"-র দিনগুলিকে কবি কত পিছনে ফেলে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে গণতন্ত্রের শিবিরকে সমর্থন জানিয়েছিলেন তা নয়। জগতে শান্তিরক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাকও তিনি দিয়েছিলেন। সংগ্রামী জনসাধারণকে অভিনন্দন করে তিনি লিখেছিলেন:

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

(প্রান্তিক)

জীবনের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ শ্রমজীবী জনসাধারণের দৈনন্দিন সংগ্রামকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ও "শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে" এই "বিপুল জনতার" জীবনে মহামন্ত্র-ধ্বনি মন্ত্রিত করে তুলেছেন "ওরা কাজ করে" কবিতায়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছোটদের ছড়া, ধনতান্ত্রিক সমাজের তীক্ষ্ণ সমালোচনামূলক ও সাধারণ মানুষের অনুভূতি নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। বুর্জোয়া সমাজের আদালতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে একটি ব্যঙ্গ-কবিতা এইরূপ সমালোচনামূলক কবিতার একটি ভাল উদাহরণ। জার্মানি গির্জার সাহেবালি আর জনাবালি মির্জা, দুই ভাইয়ের কাবুলি বেড়াল নিয়ে আইন-আদালতের ঝগড়ার যে সরস কাহিনী রবীন্দ্রনাথ লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা অপূর্ব।

রবীন্দ্রকাব্যের যে ইতিহাস আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি সেটা সম্পূর্ণতা লাভ করেছে ১৯৪১ সালে লিখিত "ঐক্যতান" কবিতায়। এখানে কবি তাঁর কাব্যের অসম্পূর্ণতার সমালোচনা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে এই বিপুলা পৃথিবীর অনেকখানিই তাঁর অগোচরে রয়ে গেছে। তাঁর স্বর-সাধনায় বহুতর ডাক পৌঁছতে পারেনি। মানুষের অন্তরের সত্যিকারের পরিচয় তিনি পাননি। কারণ তার প্রবেশদ্বারে বাধা হয়েছিল কবির জীবনযাত্রার বেড়াগুলি। তাই তিনি সেই কবিকে আহ্বান করেছেন—"কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন···যে আছে মাটির কাছাকাছি।"

"এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিও উদ্ধার
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসপূর্ণ করি দাও তুমি।···
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।"

রবীন্দ্রকাব্যের ঐতিহাসিক ধারার যে পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি, তা থেকে এ কথা নিশ্চয় প্রমাণিত হয় যে বিপ্লবের কয়েকটি অত্যাবশ্যক দিক তিনি তাঁর কবিতায় অবশ্যই ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর লেখায় একটা পরিষ্কার সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সুর পাওয়া যায়।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের দিকটা স্বভাবতই সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করেছে। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাশিবাদরূপী ধনতন্ত্রের অবধারিত অন্তর্বিরোধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর মানবতাবোধ ও শ্রমজীবী জনগণের প্রতি সমবেদনা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল।

প্রথম থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দুটো বিরোধী সুরের সংঘাত দেখা যায়। তাঁর সামন্ততান্ত্রিক ও কম্‌প্রাডোর বুর্জোয়া সমাজের মিশ্র শিক্ষাদীক্ষা তাঁকে ভাববাদে বিশ্বাসী করেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইওরোপের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ। এ থেকেই জন্ম নিয়েছিল তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের বৈশিষ্ট্য। ভারতের শাসকবর্গ হিসাবে ইংরেজের তিনি বিরোধিতা করেন, কিন্তু তাদের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভাবাদর্শের প্রতি তাঁর বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ছিল বহুদিন পর্যন্ত। এই বিরোধকে তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর "ন্যাশনালিজম" বইয়ে, "A conflict between the spirit of the West and the Nation of the West."

ক্রমবর্ধমান জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির বিরোধী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, বিপ্লবী মধ্যবিত্ত ও বিশেষ করে কৃষক শ্রেণীর গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষাই মূর্ত হয়েছে তাঁর কাব্যে। এরই সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতীয় বিপ্লবের সমস্ত দুর্বলতাকে প্রতিফলিত করেছেন। একদিকে আংশিক বিরোধী ধনিক শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতী নেতৃত্বের ভূমিকা, আর অন্যদিকে সেই নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেবার পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর যথেষ্ট শক্তিশালী সংগঠনের অভাব। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এর প্রকাশ হয়েছে নৈরাশ্যের বেদনায়, গঠনমূলক কাজে, অন্যায়ের সঙ্গে নির্বিরোধ, গণ-সংগঠন ও আত্মার মুক্তি-সাধনায় গজদন্ত মিনারের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে।

অপর দিকে তাঁর প্রগাঢ় মানবতাবোধ তাঁকে বার বার ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বৈত সম্পর্কে সচেতন করে প্রতিবাদ ঘোষণা করতে বাধ্য করেছে। সাম্রাজ্যবাদ যখন আপন অন্তর্বিরোধের আঘাতে জর্জরিত হয়ে যুদ্ধ ও গণ-বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মরণের পথে ছুটে চলেছে, রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ ও প্রাচীন (ক্লাসিক্যাল) বুর্জোয়া গণতন্ত্রে গভীর বিশ্বাস তাঁকে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে নিদারুণ বিরুদ্ধ সমালোচক করে তুলেছে। অবশেষে সোভিয়েট ইউনিয়নের উত্তরোত্তর বিকাশ বুর্জোয়া ভাবাদর্শে মূল বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে মানুষের বিকাশের পথ খুলে দিল। জনগণের প্রতি তাঁর শেষ বাণী "সভ্যতার সংকট"-এ আশি বছরের বৃদ্ধ কবি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই অবশেষে সোভিয়েট ইউনিয়নকে মেনে নিলেন একান্ত আপন বলে।

এর থেকেই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ যে শুধু আমাদের বিপ্লবের কয়েকটি অত্যাবশ্যক দিক প্রতিফলিত করেছেন তা নয়, তাঁর বহু প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা থাকা সত্ত্বেও আমাদের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্ত অন্তর্বিরোধ ও সমস্ত দুর্বলতা নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত করেছেন। লেনিনের অতি গভীর অর্থে না হলেও রবীন্দ্রনাথকেও বোধহয় ভারতীয় বিপ্লবের "দর্পণ" বলে বর্ণনা করা চলে। রাশিয়ায় টলস্টয়ের যে স্থান, ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথেরও প্রায় সেই স্থান।

রবীন্দ্রনাথ অকৃত্রিম ও মহান শিল্পী ছিলেন বলেই তাঁর এইরূপ বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। কাব্যের সত্যদৃষ্টি থেকে তিনি কদাচিৎ ভ্রষ্ট হয়েছেন। এই সত্যদৃষ্টিই তাঁকে তাঁর নিজের সমাজগত সংকীর্ণ সংস্কার সত্ত্বেও বৃহত্তম জন-সমাজের কাছে ঠেলে দিয়েছিল। বাস্তব জীবনকে সক্রিয় ও প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই বাস্তব সত্য তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল, তাঁর ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছিল এবং তাঁর মধ্য দিয়েই মুক্তি-সংগ্রামরত আমাদের পরাধীন, ঔপনিবেশিক দেশের ঐতিহাসিক সত্তা প্রতিফলিত হয়েছিল। অবশেষে, রবীন্দ্র-কাব্যের গণতান্ত্রিক ধারা তার সমস্ত মহিমা নিয়ে নিজেকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করল। কারণ এই ভাবধারা শুধু কবির দৃষ্টিকে নয়, তাঁর সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল, তাঁর বুকের রক্তে বাসা বেঁধেছিল।

পুরাতন আদর্শের অন্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধার করল তাঁর অচল অটল মানবতাবোধ—সাধারণ মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। যে পৃথিবীকে, যে আদর্শকে তিনি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন, তাকে চোখের সামনে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যেতে দেখেও, মথিত মনুষ্যত্বের রক্তাক্ত রূপকে প্রত্যক্ষ করেও তাঁর মতাদর্শের সম্পূর্ণ দেউলিয়াপনা উপলব্ধি করে মৃত্যুশয্যায় শুয়েও তিনি হতাশায় অশ্রু বর্ষণ করেননি। বরং মানবেতিহাসের সঙ্গে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিলেন অবমানিত মানবের জয়ের আশায়, অবশেষে তিনিই অপূর্ব প্রতীতির সঙ্গে বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন:

"কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন, প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।" (সভ্যতার সংকট)

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি কি ম্যাক্সিম গোর্কির বিখ্যাত কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় না, "Man—how true it rings"? রবীন্দ্রনাথের মানুষ অবাস্তব বা শ্রেণী-চরিত্রহীন ধারণা মাত্র নয়। উপেনের মত জমিহারা চাষী, পাথর ভেঙে পথ কাটে যে মজুর, মানুষের অধিকারচ্যুত ধনিকের উচ্ছিষ্টভোজী শ্রমিক যারা সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের মধ্যেও কাজ করে যায়—এরাই রবীন্দ্রনাথের মানুষ। ব্যক্তি-স্বাধীনতার পুণ্য বেদীতে আত্মদান করল যে শ্রীমতী, মুক্তি-যুদ্ধের শহীদ বন্দী, প্রতারিত অবমানিত নারী, সীমানা-ভাঙার দল, ইতিহাসের স্রষ্টা, এই নিপীড়িত শোষণক্লিষ্ট জনসাধারণই রবীন্দ্রনাথের মানুষ। ভারতের অস্পৃশ্য, আমেরিকার নিগ্রো, ফ্যাশিস্ট জার্মানির ইহুদী, চীনের কুলি, সর্বদেশের, সর্বজাতির সর্বধর্মের অত্যাচারিতরাই রবীন্দ্রনাথের মানুষ। সেইজন্যেই আজকের দিনে আমাদের দেশের প্রত্যেক বিপ্লবী গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের মূল্য এত বেশি। সেইজন্যেই রবীন্দ্রনাথের স্থান প্রগতির শিবিরে। সেইজন্যেই রবীন্দ্রনাথের নামে কৃষক-কবি নিবারণ পণ্ডিতের মুখে শিশুর কলধ্বনির মত মধুর কাব্য ঝরে। সেইজন্যেই নতুন যুগের স্রষ্টা যে, তার কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্য এক অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্রসাহিত্য শাসকবর্গের সম্পদ নয়, জনগণের সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথ বিগত দিনের কবি নন; তিনি আজকের দিনেরও কবি। তাঁর স্বপ্ন এখনও সফল হয়নি। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের ধনিক অনুচরবর্গের বিরুদ্ধে, বিরাট সমাজবিপ্লবের ও নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য আমাদের সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি। শ্রমজীবী জনতাকে তার প্রাপ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম, গণতন্ত্র ও শান্তির সংগ্রামকে এখনও অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। সে মহান জয় আর বেশি দূর নয়। তাই কবির মৃত্যুশয্যায় রচিত অবমানিত মানবের শেষ বিজয়ের জয়ধ্বনির

সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমাদের জনগণও গণতন্ত্রের, সমাজবাদ ও শান্তির অরুণোদয়কে আহ্বান করতে পারে :

"ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক,
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।" *

* আমাদের দেশের ক্লাসিক্যাল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সাহিত্যের, বিশেষ করে এর প্রতিনিধিস্থানীয় রবীন্দ্র-সাহিত্যের মার্কসবাদ-সম্মত বিচার-বিশ্লেষণের কোন মান এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়নি; সে বিশ্লেষণ প্রায়শই হয় অতি-বামপন্থী আর নয়ত দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির দোষদুষ্ট হয়েছে। পূর্ব নির্দিষ্ট এইরকম কোন সর্বজনস্বীকৃত মানের অভাবে শ্রীযুক্ত সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই আলোচনা সম্পর্কেও নানা মতান্তরের অবকাশ থাকা খুবই সম্ভব। এবং এইজন্যেই এটিকে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে একমাত্র বা শেষ আলোচনা হিসেবে গ্রহণ না করে এ-সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত হিসেবেই গ্রহণ করা সঙ্গত।

—সম্পাদক

স্কেচ 　　　　　　　　　　　　শিল্পী : প্রভাস সেন

কবিতাগুচ্ছ

আমার শান্তি

বিমলচন্দ্র ঘোষ

আমার শান্তি বুদ্ধ খ্রীষ্ট চৈতন্যের নয়
আমার শান্তি বিনয়ী অব্যয়
এমন শক্তি ত্রিভুবনে নেই আঘাতে আমার ঘর
আমার শান্তি অজেয় প্রহরী দুরন্ত দুর্জয়।
আমার ঘরের আঙিনায় যদি দস্যুরা দেয় হানা
আমার আকাশে নর-শকুনেরা উড়ে আসে মেলি ডানা
তখনি আমার গ্রামে জনপদে
শান্ত নিরীহ প্রাণ সম্পদে
অযুত বাহুর মশালে মশালে আমার শান্তি-শিখা
তখনি আলায় ভীম দাবানল কেঁপে উঠে মৃত্তিকা।

আমার শান্তি-সাধনামর্গে মানুষের স্তবগান
আধি-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু বিজয়ী সুরে,
অমিত বীর্যে আমার শান্তি সহেনাকো অপমান
কত শৃঙ্খল কত কারাগার ভেঙেছে দৈত্যপুরে।
একদা আমার শান্তি-সাধনা মুক্তির হোমানলে
জ্বেলেছিল শিখা নভেম্বরের রক্ত কমলদলে
স্ফুলিঙ্গ তার সাম্য সুরভিমাখা,
অযুত প্রাণের শান্তি-সাধনে
সর্বহারার নয়নে নয়নে
বিশ্ব-বিজয়ী মানব প্রেমের শোণিতাক্ত আঁকা।

মহাপৃথিবীর একাংশ জুড়ে আমার শান্তি-তীর্থে
প্রবালবর্ণ পতাকাশোভিত প্রবল প্রাণের বিত্তে
আমার সাধনা ক্রেমলিনে নিঃশঙ্ক
স্বর্গবিজয়ী নির্ধূম শিখা জাগ্রত নিস্তব্ধ
আমার এ প্রেম মূর্তিমন্ত
শান্তি-সাধক, চিরবসন্ত
বিরাট প্রাণের বীথিকায় যাঁর রক্ত-কুসুম দলে
অপার শান্তি অযুত শিখায় জলে।

আমার শান্তি-পারাবত ওড়ে বিশ্বের মহাকাশে
রোমাঞ্চকর রজতশুভ্র পাখা
অবাধ অজেয় গতিবেগ তার মানুষের বিশ্বাসে
প্রেম চঞ্চল রাঙা দুই চোখে সোনালি চাঁদের রাকা।
আমার কপোত ভল্গার জলে মুক্তি-সিনান সারি',
রাঙা ঠোঁটে বহি' শান্তিজলের বারি
ডানা ঝাপটিয়া সিঞ্চন করে বিংশ শতাব্দীরে
রাইন ডান্যুব টাইবার সীন নদনদী তীরে তীরে।
ইয়াক-ঘণ্টা নিনাদিত চীনা কৃষকের কৃষিভূমি
সম্রাবীন ক্ষেত মুক্ত ধানের মঞ্জরী শিখা চুমি
রুক্ষ তুষারগিরি-বলয়িত মাঞ্চুরিয়ার পথে
আমার শান্তি-পারাবত ওড়ে পিকিঙের জয়রথে।
নব চেতনায় দীক্ষিত মহাচীনে
চল্লিশ কোটি বিজয়ী বাহুর ক্ষুরধার সঙ্গীনে
ঝকমক করে শিব-সুন্দর-শান্তির বরাভয়
ঘোষণামুখর বিদেশী বণিক-দস্যুর পরাজয়।
প্রশান্ত মহাসাগরের কল্লোলে
শান্তিঘাতীর মৃত্যু-ঘোষণা গর্জিছে ভীম রোলে।

লোভী দানবের মহাসামরিক কলুষ দাহনে দগ্ধ
মূক যাতনায় বিপুলা পৃথ্বী অসহ ব্যথায় স্তব্ধ

কত সংসার মুছে গেছে ধরাতলে
সে করুণ স্মৃতি মর্মে মর্মে দিবসরাত্রি জলে।
চতুর বণিক নির্জীব আজ রিক্ত পণ্যশালা
গঞ্জে বাজারে বন্দরে তার রক্ত-প্রদীপ জ্বালা
দিকে দিকে তবু নিষ্ফল ক্রোধে
হৃত-রাজ্যের পণ-প্রতিরোধে
শুধু বজ্রের আস্ফালনের ঘন ঘন হাঁক ছাড়ে
'যুদ্ধং দেহি' 'যুদ্ধং দেহি', রাক্তের স্ফূর্তি কাড়ে।

আমার শান্তি কেড়ে নেয় ওরা মালয়ে রবার বনে
ব্রহ্মে ইন্দোচীনের জমিতে শোণিত প্রস্রবণে
জমায় কোটি নারায়ণী সেনা জয়ের দুঃসাহসে
শ্বেত-বণিকের সাম্রাজ্যের শিথিল শিকড় খসে
আমার শান্তি দেশদ্রোহীর ভিত্তিতে দেয় নাড়া
লোভী দানবের ভেঙে যায় শিরদাঁড়া।

তবুও মৃণ্য বণিকের দল
শান্তির নামে ভীত চঞ্চল
কোরিয়ার নীল আকাশে ক্ষিপ্ত শকুনের মত ওড়ে
মাটির উষ্ণ বাষ্পের তাপে যান্ত্রিক ডানা পোড়ে।
তবু ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে নির্লজ্জ
অসহায় নরনারীর মাংস নর-শকুনের ভোজ্য
বাঁকা ঠোঁটে লালা ঝরে
বিশ্বের নিরাপত্তার নামে ডাকে কর্কশ স্বরে।

আমার শান্তি হেসে ওঠে শুনি নিরাপত্তার কথা
ক্রূর বণিকের প্রচণ্ড রসিকতা!
লোলুপ রাজ্যলোভের মহিমা
লঙ্ঘন করে স্বদেশের সীমা
প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে

ম্যাকার্থারের বাজে-পৌড়া নেড়া নিষ্প্রাণ তরুশাখে।
পিছু পিছু আসে কাক চিল ফিঙে
ঘুঘু হরিয়াল গঙ্গা-ফড়িঙে
পার্থনী নাচিয়ে নাকাতে নাকাতে এ চৌতোজী হুয়াচায়
ডলারের ফাঁদে ঠ্যাং-বাঁধা কদাকার।

আমার শান্তি ওয়াশিংটনের কংক্রিটে-গাঁথা ভিত্তি নাড়ে
স্তব্ধ আপীন, করমোজা কাঁপে
মার্কিনী জলদস্যুর পাপে
চিয়াঙের মড়া দানো পেয়ে চাপে ম্যাকার্থারের দুই ঘাড়ে।
আমার শান্তি রাজনীতির বিশ্বাসঘাতী কণ্ঠে ফুঁড়ে
হারপুনে গেঁথা হাঙরের মত
আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত
ডোবায় সাগরে। আমার শান্তি-শঙ্খনিনাদ এশিয়া জুড়ে।

দেব না দেব না মরতে দেব না
সুখস্বপ্নের মায়াজাল বোনা
নিরীহ শান্ত অযুত প্রাণের দুর্জয় রক্ষণে
আমার শান্তি-পারাবত ওড়ে দীপ্ত কঠোর পণে।
হিরোসিমা নাগাসাকির লক্ষ মড়া-পোড়া দুর্গন্ধে
নিঃশ্বাসরোধী বেদনায় মন বিক্ষোভে নিরানন্দে
আমার শান্তিকপোতের আবেদনে
স্বাক্ষর দেয় কোটি কোটি প্রাণ ব্যথিত ক্ষুব্ধ মনে।

আমার অযুত শান্তি-সাধক চাহেনি কখনো যুদ্ধ
তবু নয় তারা খ্রীষ্ট কিংবা শ্রীচৈতন্য বুদ্ধ
সুখে থাকবার বেঁচে থাকবার
সবাইকে নিয়ে দিন কাটাবার
স্বপ্নের মহাসমুদ্রতীরে কী যে সুগভীর মায়া
বুকে বুকে তার নন্দন বনে স্নিগ্ধ সবুজ ছায়া।

কপোতকূজনে মুখরিত শ্যাম পল্লবঘন শাখে
আমার শান্তি দ্বিপ্রাহরিক স্বর্ণ-কিরণে ডাকে
নদ-নদী-গিরি সমুদ্র-মরু ব্যপি',
মহাভূগোলের নানা জাতি নানা দেশবাসী তার সঙ্গী,
আমার শান্তি দু'শ কোটি ঘরে ঘরে
দানবের সাথে শেষ সংগ্রামে অমেয় শক্তি ধরে।

শান্তি পাব

মণীন্দ্র রায়

এ বড় মজার খেলা
সর্বদা এ সাজো-সাজো রব,
উদ্‌ভ্রান্ত ব্যতিব্যস্ত, ছোটবড় হাজার গুজব—
যদি দেশে হানা দেয়, শিশুরাষ্ট্র, সেনাদল চাই,
অস্ত্র চাই, বোমা চাই, বোমারু হাওয়াই, রণতরী,
অর্থ চাই, শিশুরাষ্ট্র, উৎপাদন রপ্তানিও চাই,
কে জানে কে হানা দেয়, যুদ্ধব্যয় চতুর্গুণ করি,
এশিয়ার নেতা দেশ, জাপানের পরিত্যক্ত গদি
এ দেশেরই হাতে এল! বিপদের নেতা
ন্যায়ের পূজারী দেশ, অস্ত্রবল চাই—
সাজো সাজো—নিরপেক্ষ অহিংসার দেশ,
আদি-অকৃত্রিম এই স্বাধীন স্বরাট
একচ্ছত্র প্রজাতন্ত্র এ ডোমিনিয়ন!
ভেদাভেদ মানে না এ, বলে সব দেশই মিত্র তার,
তবু শত্রু, তবু যুদ্ধব্যয় কাড়ে বাজেটের অর্ধেকের বেশি,
(টাকা দেবে ত্রিশ কোটি গৌরীসেন উদ্বৃত্ত স্বদেশী!)
উৎপাদন বাড়াও বেহুঁস,
জাতীয়করণে দশ-পুরুষ,
জমিদারী উচ্ছেদের খেসারত চাই,
খাদ্যের বরাদ্দ কমে শহরে (আপেল দুধ খাও!)

গাঁয়ের সহিষ্ণু লোক—ওরা তো ভালই থাকে ক্ষুধা,
(যক্ষ্মা ? না না, দিয়েছি বি, সি, জি !)
তাছাড়া, এ রাজকর্ম—ছেলেখেলা নয় !
কত কি ভাবতে হয়—উবাচ সঞ্জয়—
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, স্বাধীনতা,
কোথায় কতটা ভাল, রোগী মরে মরুক, রোগের
প্রকৃতি ও তত্ত্ব চাই। আলোচনা, তদন্ত, বিবৃতি,
হাওয়াই সফর, বাগ্মী, কমিশন, প্ল্যানিং—এবং
টাকা নেই ; পরে হবে।
তবু কেন অশান্তি ঘটানো
কমিটি, মিশন আর রিপোর্ট, বিশেষ মন্ত্রী আর
কত চেষ্টা, কত ব্যয়, বাড়তি বাজেট—
এত কোটি, এত লক্ষ, এতটি হাজার টাকা নোট—
দপ্তরে, ফাইলে, নোটে, মুখর দিনের
প্রস্তাবে, ছাঁটাই বিলে, হিজিবিজি কাগজে কালিতে
সংশোধনী, উপদেষ্টা, সে জোড়াতালিতে
অবশেষে ছেদ নামে।
জানা যায়, হবে—এখনও হয়নি—হবে
রামরাজ্য হবে,
কৃষকে ফসল পাবে, শ্রমিকে মজুরি
কেরানি মাইনে পাবে, শিল্পী অবসর,—
এখন পাবে না, দেশ বিপন্ন যে !
(কি সে ?)
বেশ কথা, রাজনীতি বোঝো না কিছুই !
আজ শুধু খেটেখুটে শক্ত কর ঘর,
তোমাদেরই দেশ, আহা, মৃত্যুকালে ভুলো না এ কথা—
শান্তিভঙ্গ বিসদৃশ, আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা !

২

তোমরা পেয়েছ, জানি। তাই ছোঁড় বেপরোয়া গুলি !
তোমরা স্বাধীন, তাই নির্লজ্জ শোষণে নেই বাধা।

আমরা অধীন, যদি মাথা ওঠে, তাতে তাই খুলি !
সে লাঠি-বুলেট জানি কিনে দেয় আমাদেরই চাঁদা।

কেড়েছ ক্ষুধার অন্ন, লজ্জার কাপড়, ভিটে মাটি,
মগ্ন সভ্যতার নীতি ভেঙেছে সমাজ পরিবার ;
আপনার বাসভূমে বস্তিহীন পরবাসী হাঁটি।
লোভের থাবায় তাতে সুরুচির স্বর্ণ ভণ্ডার।
এ শ্মশানে শান্তি কোথা ! শবভুক শৃগাল কি জানে
কত প্রেম ছাই হল, কত প্রাণ ধূলিতে লুটায় !
শান্তি পাব—যদি চষি লাঙলের ইস্পাতের টানে
এ বন্ধ্যা মাটিকে, যদি বীজ বুনি কঠিন মুঠায়।

আজ শুধু শান্তি খুঁজি এ শ্মশানে পায়ে হাড় বেঁধে।
শান্তি পাব মৃতমাঠে শ্যামশীর্ষ প্রাণের উদ্ভেদে।

শান্তির আবেদনে সই দাও

অমলেন্দু গুহ

সারা দুনিয়ায় শান্তিসেনার হাতে হাত রেখে আজকে
হালাল করব কোণঠাসা যত দালাল লড়াইবাজকে।
অ্যাটমের সাথে পাল্লা ধরেছি জিতবই জানি আমরা
দেব না কিছুতে বরসাতে আর শিশুর গায়ের চামড়া।
মিছিলে মিটিঙে বাসরে আসরে একটি শপথ বঙ্কার
আনবিক বোমা বেআইনী হোক মানবিক ঘৃণা হস্কার।
নিকানো উঠোন জরুগরু আর বালবাচ্চার ওয়াস্তে
হাজারে হাজারে সই গেঁথে যায় শান্তির দরখাস্তে।
সই দায় মসজিদের মোল্লা মন্দির থেকে পাণ্ডা
মজুর কেরানি সই দায় যার মাথায় ছাটাই-ডাণ্ডা।
সই দিয়ে যায় পাঠশালা থেকে শিক্ষক আর ছাত্র
সই দায় যারা কাপড় কিনতে না পেরে ঢাকে না গাত্র।

সই দিয়ে যায় ফুলের মতন হ-মেসে শিশুর বাপটা
সই দেয় যায় নীড় ভেঙেছিল গত যুদ্ধের ঝাপ্ টা।
জোয়ান চাষীরা সাফ সই দায়, রসদ হবে না যুদ্ধে,
সই দায় যায় ভক্তি অটুট এখনো খ্রীষ্টে বুদ্ধে।
সই দিতে আসে মায়েরা বোনেরা মাথায় ঘোমটা-বুরখা
টিপসই দায় মালয়-কেরৎ জোয়ান মরদ গুরখা।
পুঁইএর মাচা বা খানকয় বই, বৌটাকে ভালবাসতে
হাজারে হাজারে সই ঝরে পড়ে শান্তির দরখাস্তে।
ঘুঘুর ডানায় শান্তি ঘনায় নীলাকাশে জনারণ্যে
শান্তি ঘনায় দোল্‌নায়-দোলা খুকুর ঘুমের জন্যে।
গমশিষ-ঠোঁটে ঘুঘু উড়ে চলে ডেকে বলে জনগণকে
যদি ভাই-ভাই হও একঠাঁই পরোয়া কি দুশমনকে।
চল্লিশ লাখ বেকারের দাপে কাঁপে মার্কিন দেশটা
যুদ্ধ বাধিয়ে কোনমতে তাই শেষরক্ষার চেষ্টা।
মার্শালী চালে উল্লুক বনে ইওরোপ কেনে অস্ত্র।
উধাও শিল্প, রুটিরুজি নেই, পরণে মেলেনা বস্ত্র।
তামাম মানুষ তাই রুখে ওঠে সংহত হয় লক্ষ্যে
অস্ত্রের বোঝা হারাম হয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর চক্ষে।
জাহাজের ডেকে ডকে রেলপথে পেলে অস্ত্রের গন্ধ
ভুখা মজদুর লাগায় না হাত কালা কামকাজ বন্ধ।
আঙুর-খেতের ফরাসি কৃষাণ ডেকে বলে হো-চি-মিন্‌কে
তোমার আমার লড়াই সে এক—ফেরাব শান্ত দিনকে।
শান্তি-পিয়াসী বৃটিশ মায়ের দুরুদুরু কাঁপা মনটা
শান্তি-তিয়াসী গেরিলার গানে মালয়ে বনান্তরটা।
শান্তি আসুক মার্কিন দেশে বেকারির সাথে লড়তে
শান্তি থাকুক সোভিয়েট ঘর, চীনে রেলপথ গড়তে।
ঘুঘুর ডানায় শান্তি ঘনায় দেশে দেশে জনারণ্যে
শান্তি ঘনাক চুম্বনঘন ভীরু প্রণয়ের জন্যে।
সই দিতে যারা গররাজি, যার সই দিতে হাত কাঁপবে,
খড়্গের মত আমাদের ক্রোধ তাদের স্কন্ধে নাববে।

সাতসমুদ্র তেরনদী পারে দেশে দেশে সাত ভাই রে
কচি শিশুদের বাহুতে জড়িয়ে শান্তির জয় গাইরে।
নিকানো উঠোন, জরুগরু আর বালবাচ্চার ওয়াস্তে
হাজারে হাজারে সই ঝরে পড়ে শান্তির দরখাস্তে।

শ প থ

সলিল চৌধুরী

পাষাণী অহল্যা ওগো সেই রাজপথ,
কান পেতে কি আমার আগমনী শোন।
আমিও তো কান পাতি
আঘাতবিদীর্ণ সিক্ত শক্ত ক্ষতমুখে—
কোথায় সমুদ্র গর্জে তরঙ্গে উত্তাল
কোথায় কোরিয়া আর অন্ধ্র, কাকদ্বীপ,
রক্তে আঁকা মানচিত্র নব পৃথিবীর।
পায়ে পায়ে সেই পথে চলি—
আমার এ অন্তরাগ মিছিলের পায়ে-ওড়া ধূলি
আমার এ কর্মকার মন—
ক্রমাগত শ্বাস টেনে হাপরের মত
জ্বেলে রাখে চেতনা-আগুন,
হৃদয়-পিণ্ডের ঘায়
তপ্ত লাল ইস্পাতের শপথ শানায়।
তবু ওগো অহল্যা আমার !
কোথায় কোথায় বল তুমি ফিরে এলে ,
আমার কুটিরে আর জ্বলে নাকো আলো
ভাঙা ছাদ চলোমলো বৃষ্টি এসে পড়ে।
স্তূপাকার ভগ্ন আশা আবর্জনারাশি
পরগাছা সরীসৃপ উন্মাদ কুটিল
বাসা বেঁধে আজ, যেথা একদিন ছিল
প্রিয়ার চোখের মায়া শিশুদের হাসি।

অহল্যা আমার শোন !
আমারও তো শান্তি নেই—
আমার বুকের দুর্গে করে আক্রমণ
ফ্যাশিস্ট দস্যুর মত বন্যা-বীজ এসে।
তবু আমি প্রাণপণে টেনে যাই শ্বাস,
আমার বিশ্বাস—জানি রক্ত-কণিকারা
লাল ফৌজের মত জয় সুনিশ্চিত
আবার দখল নিয়ে দেবে প্রত্যাঘাত—
অমর স্তালিনগ্রাদ
আবার আমারই বুকে ফিরে-পাব আমি।

২

মিছিলে মিলেছি কেননা বুকের
কলজের সাথে হাড়-পাঁজরেরা
মিছিলে গিয়েছে কবে একদিন
জীবনের সন্ধানে।
কেননা আমার শান্তির নীড়
হাসি আর গান ভালবাসা দিয়ে
গড়তে চেয়েছি কর্মমুখর
জীবনের মাঝখানে।
মিছিলে মিলেছি কেননা আমরা
স্তন্য না পেয়ে মায়েদের কোলে
বোবা শিশুদের আর্তনাদের
বাঙ্ময় ভাষা শুনেছি।
কেননা আমরা ফিরে পেতে চাই
আমাদের যত হৃতযৌবন—
যে-স্বপ্ন নিয়ে চোলাই করে-
যন্ত্রের বিলাসিতা।
কেননা দেশের যত ঘরবাড়ি
কল-কারখানা ধানের খামার

মাঠ ঘাট পথ ফিরে পেতে চায়
তাদের জন্মদাতা।

কালপুরুষের হাত থেকে তাই
জিজ্ঞাসা ছিঁড়ে এনে
প্রত্যেক মুখে জবাব লিখেছি
ঘোষণার অক্ষরে :

"—এদেশ আমার—
আমাদের মাটি
এদেশে যেখানে
যত কিছু ঘাঁটি—
আমাদের কল-
কারখানা আর
আমাদের নদী
খনি ও পাহাড়
আমাদেরি ভরা
সোনায় খামার
আমাদের ভাই
আমাদের বোন
আমরাই যারা খাটি—
আমাদেরই বুকে
গড়েছি এবার
শেষ যুদ্ধের ঘাঁটি।"

৩

এ দেশের প্রতি মায়ের চক্ষে
আমারই বেদনা ঝরে
এ দেশের প্রতি শিশুর বক্ষে
আমারই স্বপ্ন মরে।
আমারই রক্ত ঝরে কাকদ্বীপে
ডোঙাজোড়া মালদহে

তরুণজের হৃদয়-পিণ্ডে
আমারই ধমনী বহে।
তাই
দেশে দেশে যত প্রতিরোধ
তারি মাঝে তুলি রক্তের শোধ—
নানকিং আর প্যারীর যুদ্ধে
আমরাই সাথে আছি,
কাকদ্বীপে মরে আমরা আবার
তেলেঙ্গানায় বাঁচি।

৪

কাকদ্বীপ!
শোন কাকদ্বীপ—সেই চন্দনপিঁড়ি শ্মশানে
যেদিন আমরা অহল্যা মাকে
চিতা-শয্যায় তুললাম
(আহা!) গগন আগুনে দাউদাউ জলা
পাঁজরের চিতা-শয্যায়
কলজে জ্বালিয়ে ফেললাম।

কত ভাষা ছিল প্রাণের ছন্দে
জীবনের গীতিকাতে
কত আশা ছিল ভ্রূণের স্বপ্নে
শিশুদের কলহাস্তে
একটুকু ক্ষেত ছোট বেড়া ঘেরা
গণ্ডীর বাধাহারা
একটুকু ঘর সকল ঘরের
আনন্দ দিয়ে ভরা
সকলের ভরা-খামারে নিজের
আশা খুঁজে পাওয়া
সকল মায়ের চোখে দিয়ে নিজ
বাছাটির প্রাণ চাওয়া।

(হায় !) সেদিন আমরা হুহু করে কেঁদে
চোখের নৌকো ভাসিয়ে
হতাশার চরে আছড়ে পড়েছি
কেঁদে শুধিয়েছি—মাগো,
এমনি করে কি জীবনের যত
মূল্যের বিনিময়ে
বারবার কালো মৃত্যুকে হবে কেনা ?
মৃত্যুর দামে কবে শোধ দেব
জীবনের যত দেনা ?

৫

সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে
হরতাল হয়েছিল।
সেদিন আকাশে জলভরা মেঘ
বৃষ্টির বেদনাকে
বুকে চেপে ধরে থমকে দাঁড়িয়েছিল।
এই পৃথিবীর আলো বাতাসের
অধিকার পেয়ে পায়নি যে শিশু
জন্মের ছাড়পত্র—
তারি দাবি নিয়ে সারা কাকদ্বীপে
কোন গাছে কোন কুঁড়িরা ফোটেনি,
কোন অঙ্কুর মাথাও তোলেনি
প্রজাপতি যত আরো একদিন
গুটিপোকা হয়ে ছিল,
সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে
হরতাল হয়েছিল।

তাই—
গ্রাম-নগর
মাঠ-পাথার

বন্দরে
তৈরি হও।
কার ঘরে
জ্বলেনি দীপ
চির আঁধার
তৈরি হও।
কার বাছার
জোটেনি দুধ
শুক্‌নো মুখ
তৈরি হও।
ঘরে ঘরে
ডাক পাঠাই—
তৈরি হও
জোট বাঁধো।
মাঠে কিষাণ
কলে মজুর
নওজোয়ান—
জোট বাঁধো—
এই মিছিল
সবহারার
সব-পাওয়ার
এই মিছিল
প্রতিজ্ঞা আর
যশোদা মার
রক্তবীজ
এই মিছিল
স্বামীহারার
অনাথিনীর
চোখের জল—
এই মিছিল।

শিশুহারা
মাতাপিতার
অভিশাপের
এই মিছিল—
এই মিছিল
সবহারার
সব-পাওয়ার
এই মিছিল
হও সামিল।

আমার বুকে এল যখন কোটি প্রাণের স্বপ্ন
কোটি আশার বরফ-জমা অগাধ সম্ভাবনা,
কোটি মনের ঘৃণার জ্বালা অগ্নিগিরির বুকে
কোটি শপথ পাথর-জমা গোনে শেষের লগ্ন।
তবে আমার বজ্রনাদে শোন্ রে ঘোষণা
কোটি দেহের সমষ্টি এই আমিই হিমালয়
আমি তোদের আকাশ ছিঁড়ে সূর্য পরি ভালে
তুচ্ছ করি কুজ্ঝটিকা মেঘের ভ্রুকুটিও—
জানাই তবে কারা আছিস্ ঘৃণ্য পরগাছা
কোটি বুকের কলজে ছিঁড়ে রক্ত করিস পান
বুকে শ্বাপদ মুখে তোদের অহিংসা আছিলা
এবার তবে করবি তো আর আমার মোকাবিলা।

কোন এক রবীন্দ্র-অনুরাগীর বক্তব্য

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

ধলেশ্বরী নদীর ওপারে
বাদামে বেতসে আর দেবদারু পাতায় নিবিড়,
কালো হরিণের মত চোখ যার, সেই কালো মেয়ে
কাশফুলে সুশোভিত বেণুবন কোঁচ্টি ছলিয়ে,

ঘুম-ভাকা নবান্নের দুপুরে, সন্ধ্যায়
নতুন ধানের গন্ধে পায়ে পায়ে ঢেঁকিটি নাচিয়ে
নিরুদ্বিগ্ন জীবনেরে জানাত আহ্বান :
এখনো ভুলিনি তার নাম—
গত চৈত্রে ছেড়ে-আসা প্রিয়তমা আমার সে গ্রাম।

পাঠশালা-পলাতক
অনেক দুর্লভ-দিন ধলেশ্বরী নদীর কিনারে
তোমার খ্যাপার মত খুঁজে খুঁজে মরেছে জান কি
কল্পনার পরশ-পাথর !
সন্ধ্যায় হয়েছে মনে ধলেশ্বরী নদীটা বিলম,
ওপারের কাশবনে উড়ে যাওয়া বলাকার পক্ষ-বিধূননে
বারে বারে অচেতন আমারো মনের
পর্বত চেয়েছে হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ !
মাটির কলসি কাঁখে
গোধূলির ছায়াপথ দুরুদুরু দুপায়ে মাড়িয়ে
এপারে গাঁয়ের বৌ জল নিতে আসত যখন—
চকিতে দেখেছি ওর চোখ দুটো যে ডাকে চঞ্চল
অধীর মনের ডাক,
সে ডাক মুক্তির ডাক—
বেলা পড়ে এলে চল্ জলকে চল্ মন।

নাগকেশরের ফুলে কাগজের নৌকোটা সাজিয়ে
নহরের জলে ভাসাতাম,
ভাবতাম, জীবনও এমনি
অনুকূল বাতাসের সূত্র ধরে দুলে দুলে চলা।
ভাবতাম, মরণও এমনি
নৌকোটার কানে-কানে নোঙর-তোলার কথা চুপিচুপি বলা
কারণ তখন :
আমার চেতনা-রঙে পৃথিবীটা আশ্চর্য সবুজ।

আমার মানস-তীর্থে
পাষাণ-ভ্রূকুটি ভেঙে স্বপ্নভঙ্গ হল নির্ঝরের।
পৃথিবী তখনো বিস্ময়।
রূপ, রস, গন্ধভরা প্রতিদিন প্রতিরাত্রি আসে
আমার মনের দ্বারে
লীলা সঙ্গীনিরা যেন কঙ্কণ-ঝংকারে বারে-বারে
অপরূপ উপস্থিতি জানায়েছে মনের দুয়ারে।
চির জিজ্ঞাসার বেদী-সম্মুখে সেদিন
বারে বারে আবিষ্কার করেছি আমাকে,
নিরুত্তর, নির্বাক আমাকে।
চেয়ে চেয়ে শুধু দেখা,
শুধু শোনা এ বিশ্বের গতির, সৃষ্টির ঐক্যতান
তানপুরায় আমার মনের।
সেদিন মনের কোণে রৌদ্রস্নাত পঁচিশে বৈশাখে
ছাতিম গাছের তলে
আলো-আঁধারের রঙে বুনিবোনা প্রশান্ত ছায়ায়
তোমার আসন পাতা ছিল

ঈশানের পুঞ্জ মেঘে ভর করে অকস্মাৎ
ঝড় এল বর্ষশেষ ঘোষণার সুরে
আঁধারের কালো হাতে পড়ল তোমার মুখ ঢাকা
ছাতিম গাছের শাখা ভেঙে ভেঙে ছড়াল মাটিতে।
ফুলদল, ঝরাপাতা কোথায় ছড়াল
বজ্রমুষ্টি আঘাতের নির্মম শাসনে।
মনে হল, এও হল ভাল—
পুরনোর গতিভাঙা জীবনের প্রশস্ত অঙ্গনে
হে সন্ন্যাসী! বিলাসের শুষ্কপত্র জড়ো করে করে
নির্দয় ফুৎকারে আজ বেদনার হোমবহ্নি জ্বাল!

এখানে সহরতলী, জীর্ণ বস্তি, ফুটো করোগেট,
ছিঁড়-খাওয়া জাহাজেরা, ছেঁড়া পাল, হালভাঙা দেহ

ধুঁকে ধুঁকে টেনে-চলা অভাবের ভারবাহী দিন।
বৃন্দাবন মুদীর দোকানে
ষাট টাকায় খাতা লিখে লিখে
অলক্ষিতে কোন দিন ধলেশ্বরী তীরের কিশোর
নির্বিবাদে হরিপদ-কেরানি বনেছে।
এখন রবীন্দ্র-সংখ্যা খবরের কাগজের পাতা দেখে দেখে
মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়
গ্রাম-হারা তরুণের স্মৃতিভরা দুঃসহ চেহারা :
মনে হয় আশা নেই আর
লাজ-নম্র কোন এই তরুণীর নিঃশব্দে আসার
আমার এ ভাঙা ঘরে, জীর্ণ অতি জীর্ণ যে এ বাসা।
ঘরেতে এল না, তবু, মনে তার নিত্য যাওয়া আসা।

তবু মনে আশা জাগে, আশা জাগে রবে না এদিন।
আমাদের জীবনের প্রতি ঘর থেকে
যারা কেড়ে নিল আলো, যারা আজও ধ্বংসের দামামা
বাজায় আকাশ ঘিরে—
আমাদের বঞ্চিত আকাশ
আমাদের ছুটির আকাশ—
যারা আজ কেড়ে নিল সম্ভাবনা-ভরা দিনগুলো
ষাট টাকার তুচ্ছ বিনিময়ে—
যাদের বিষাক্ত শ্বাসে লোভাতুর কুৎসিত দৃষ্টিতে
ধানক্ষেত রিক্ত হল
মরে গেল সবুজ গ্রামটা
দাঙ্গায়, মড়কে আর অনাহারে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে।—

—তারা কি বাঁচবে চিরকাল?
পৃথিবীর সৌন্দর্যকে, কৌমার্যকে কেড়ে নেবে
বারে বারে লালসা-মুষ্টিতে?

এ প্রশ্নের জবাব মিলেছে,
আশাবাদী তোমার জবাব—
বলেছ তো, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রথিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।
এ পঁচিশে বৈশাখে তাইতো
বুক বেঁধে নতুন আশায়
এশিয়ার কোণে কোণে চোখ মেলি দৃঢ় প্রত্যাশায়।
আজ এ প্রভাতে তাই শতখণ্ড, লক্ষখণ্ড করে
আমাকে ছড়াই আমি এশিয়ার প্রান্তরে প্রান্তরে।
মালয়ের বনে জাগি, জাগি ইন্দোচীনে ও বর্মায়
জাগি মালাবার কূলে, কমলাপুরের কোণে কোণে।
সতর্ক দৃষ্টিতে আজ মানুষের শত্রুকে চিনেছি—
দানবের সাথে শেষ সংগ্রামের তরে
আমরা প্রস্তুত ঘরে ঘরে।

তারপর, আরও এক পঁচিশে বৈশাখে
শত্রুকে নির্মূল করা আরও এক উজ্জ্বল বৈশাখে
তুমি এস ধলেশ্বরী নদীটা পেরিয়ে
আমাদের পুরনো এ গ্রামে।
সেদিন শোনাব, শুনো আমাদের নবান্নের গান,
আমরা, যাদের তুমি ডেকে গেছ বিগত শ্রাবণে
অখ্যাত জনের কবি যারা
কবি যারা নির্বাক মনের
আজ তারা নিমন্ত্রণ জানাল তোমাকে—
এস তুমি নতুনের,
জীবনের,
সেদিনের পঁচিশে বৈশাখে।

ভাবীকাল

আবদুর রশীদ খান

এখন জীবন হেথা সমাকীর্ণ সূঁচলো কাঁটায়
বিষমাখা ক্ষুরধার কটাক্ষের সুতীক্ষ্ণ ঝলকে।
এখানে সবুজ যত পীতবর্ণ গৈরিক ব্যথায়,
হেথায় কীটের বাস মনোহর কুসুমকোরকে।
এখানে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি চলে দিনরাত,
হেথায় ব্যথীর ব্যথা পায় বিড়ম্বিত উপহাস;
নির্মম আঘাত যাতে হানিতে না পারে প্রতিঘাত
ওদের কৌশল তাই দুঃসহ দৈন্যের নাগপাশ।
এরি মাঝে তবু দেখি উঁকি মারে নিশ্চিত ইঙ্গিত—
অনাগত ভাবীকাল, শুনি আমি তারি পদধ্বনি,
নব সুরে বাজে যেন সুমধুর জীবনসঙ্গীত
প্রতি মীড়ে মীড়ে তার সঞ্চারিত মৃত-সঞ্জীবনী।
সাম্য-মৈত্রী-প্রীতি-প্রেম আছে সেই ভাবীকাল মাঝে,
হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-ঘৃণা মিশিবে মাটিতে তীব্র লাজে।

শিল্পী-সৈনিকদের প্রতি

ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি

গতানুগতিক লক্ষ্যের কথা আজো
বৃদ্ধের দল উচ্ছ্বাসভরে বলে,
কমরেড,
এসো সারি বাঁধো পরিখাতে,
এসো পরিখাতে, হৃদয় মনের দলে।

সাম্যবাদী তো সেই, যে পোড়ায়
পিছু হটবার অসহ সেতুটিকে;

ভবিষ্যবাদী ।
ধীরে হাঁটা ছাড়,
ঝাঁপ দাও মহা-ভবিষ্যতের দিকে ।

একদিন, সেতো সহজেই গড়া যায়,
ঠেলে দাও, সেটা চলবে আপন মনে ,
কিন্তু তোমার গানকে বোমার মত
ছুঁড়ে দাও—ওই
রেলওয়ে ডিপোটি ভেঙে দেবে গর্জনে ।

শব্দের পরে শব্দকে জমা কর,
এগোও,
একটি হুইসিল, গান নিয়ে ;
ব্যঞ্জনাময় শব্দের উত্তাল
তরঙ্গদল গর্জন করে যাক,
তোমার—
দৃপ্ত জিহ্বার তল দিয়ে ।

পাজামার ভাঁজ পালকের মত মিহি,
এই তো সহজ অফিসারদের প্রায় ;
গোটা সোভিয়েটে একটিও সেনানী যে
লড়বে না, যদি গায়ক না গান গায় ।

পিয়ানোগুলিকে রাজপথে টেনে আন,
ড্রামের আওয়াজ বাতাসকে ছিঁড়ে দিক ;
যা কিছু বাজুক, ড্রাম বা পিয়ানো,
ঝঞ্ঝা নামুক,
যজ্ঞকে হাঁক দিক !

কি হবে দোকানে ক্রীতদাস হয়ে থেকে ?
কি হবে এ মুখ মিছে বিবর্ণ করে ?

কেন অপরের সুখ দেখে দুই চোখ
পেচকের মত ওঠ পিটপিট করে ?

অনেক বিজ্ঞ বচন তো শোনা গেল।
কে আছ সাহসী মন থেকে মোছ দেখি
প্রাচীনত্বের দুঃসহ জঞ্জাল,
রাজপথ আজ তুলি হবে আমাদের,
রংদানী হবে স্বপ্নারের মায়াজাল।

হাজার পাতার সময়ের পুঁথিটিতে
লেখা হবে এই মহা-বিপ্লব গান,
ভবিষ্যবাদী কবি ও গায়ক !
এই রাজপথে শুরু কর অভিযান।

অনুবাদ : সতীন্দ্র মৈত্র

মাদ্রিদে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের প্রবেশ উপলক্ষে

পাব্লো নেরুদা

শীতার্ত মাসের এক সকালবেলা,
কাদায় ধোঁয়ায় ক্লেদাক্ত, মৃত্যুযন্ত্রণায় জর্জর মাসে,
হাঁটু ভেঙে-যাওয়া মাসে, শত্রুর অবরোধে আর দুর্ভাগ্যে করুণ এক মাসে,
যখন আমার বাড়ির জানালার ভিজে শার্সির কাচের বাধা ডিঙিয়ে শোনা যেত
আফ্রিকার শিয়ালের হল্লা—
ওদের রাইফেলের চিৎকার, ওদের রক্তমাখা দন্তের চিৎকার,
তখন,
গোলাবারুদ পাওয়া যখন আমাদের স্বপ্ন বলতে স্বপ্ন, আশা বলতে আশা,
যখন আমরা ভাবতাম
সারা দুনিয়াটায় বুঝি নরখাদক রাক্ষস আর উন্মত্ত ক্রোধ ছাড়া কেউ নেই,
কিছু নেই,

সেই সময়ে—
মাদ্রিদের সেই শীতার্ত মাসের তুষার-অবরোধ ছিন্ন করে
ভোরবেলার সেই কুয়াশায় আব্ছা-আব্ছা
আমি দেখলাম, আমার এই দুটো চোখ দিয়েই আমি দেখলাম,
যে হৃদয় আমার মুক্তদৃষ্টি, সেই হৃদয় মেলেই আমি দেখলাম,
দেখলাম দৃঢ়চিত্ত মানুষেরা এল, দেখলাম উন্নতশির সৈনিকেরা এল,
পাথরের মত মজবুত, ধারাল আর কঠিন, পরিণত আর উৎসাহী
এক ব্রিগেড সৈনিক।

এটা সেই মনস্তাপে দগ্ধ সময়, যখন মেয়েরা
অসহনীয় জলন্ত-অঙ্গারের মত বয়ে বেড়াত তাদের বিরহের বোঝা,
আর অন্য যে-কোন দেশের যে-কোন মৃত্যুর চেয়ে তীব্রতর,
আরও বেশি জ্বালা-ধরানো স্পেনদেশীয় মৃত্যু
একদা-নন্দিত গমের খেতে দিক থেকে দিগন্তে
ছড়িয়ে রাখত তার ডানার কালো অন্ধকার।

রাস্তায় রাস্তায় তখন মানুষের রক্তের বাঁধাভাঙা বন্যা এসে মিশত
চূর্ণ-চূর্ণ ঘরবাড়ির বুকফাটা জলের স্রোতে,
আর ছিন্নভিন্ন শিশুদেহের হাড়,
শোক-উদ্‌যাপনে রত মায়েদের মর্মান্তিক নৈঃশব্দ্য,
আত্মরক্ষায় অক্ষম অসহায়ের চিরতরে মুদ্রিত চোখ—
দেখতাম, আর মনে হত এ যে মূর্তিমান সর্বনাশ, মূর্ত কারুণ্য,
মত্ত-হস্তীর পায়ের নিচে দলিত কমলকুঞ্জ এ-ই,
চিরকালের মত কার নখে টুকরো টুকরো ছিন্নভিন্ন মানুষের বিশ্বাস এ-ই।

কমরেড্‌স,
ঠিক তখনই
আমি দেখলাম তোমাদের,
আর আমার চোখ এখনও সেই গর্বে-গৌরবে উদ্ভাসিত,
কারণ আমি যে তোমাদের আসতে দেখেছিলাম
　　　　　　　　কাস্তিল্-এর পবিত্র হৃদয়ের লক্ষ্যে,

কুয়াশা-ঢাকা সকাল পেরিয়ে
নিঃশব্দে, দৃঢ়পদক্ষেপে :
ভোরবেলার আগমনী ঘন্টাধ্বনির মত
পবিত্র গাম্ভীর্য নিয়ে, দূর-দূরান্ত থেকে স্বপ্নালু নীল চোখ মেলে,
কত কত গৃহকোণ ছেড়ে, দূর দূর তোমাদের নাম-না-জানা দেশ থেকে,
মনের জ্বালা-পোড়ায় ভরা, হাতে বন্দুক ধরতে চাওয়ার সুদূর স্বপ্নশয্যা ছেড়ে
রক্ষা করতে স্পেনের এই শহরকে—মানুষের কোণঠাসা স্বাধীনতা যেখানে
জানোয়ারের ধারালো দাঁতে ক্ষতবিক্ষত, পতনোন্মুখ, মুমূর্ষু।

ভাই সব, এখন থেকে
তোমাদের অমলিন হৃদয়ের তোমাদের শক্তির কাহিনী,
তোমাদের এই মহৎ ইতিহাস
ঘরে ঘরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে গেঁথে থাক,
জীবনে যারা আশা হারিয়েছে তাদের কানে পৌঁছোক এ-খবর,
গন্ধকের ধোঁয়ায় কুরে-কুরে-খাওয়া পাতালের গর্ভে
এ-খবর ছড়িয়ে পড়ুক,
এ-খবর ভেসে যাক ক্রীতদাসের অমানুষিক একাকীত্বের মিনারে,
যেন আকাশের সমস্ত তারা, যেন কাস্তিল্-এর, পৃথিবীর সমস্ত গমের শিষ
বুকে বয়ে বেড়ায় তোমাদের নাম, তোমাদের মর্মান্তিক সংগ্রাম,
লিখে রাখে তোমাদের জয়গাথা
তোমাদের আশ্চর্য শক্তির পরিচয়—
লালচে এল্‌ম গাছটার মতই যে শক্তি মাটির কাছাকাছি।

কারণ, তোমাদের আত্মত্যাগে তোমরা পুনরুজ্জীবিত করেছ
বিলুপ্ত বিশ্বাসকে, বিনষ্ট আত্মাকে, পৃথিবীর উপর আস্থাকে ;
আর তোমাদের প্রাণ-প্রাচুর্য, তোমাদের মহত্ব, তোমাদের শহীদ-সঙ্গীরা
জমাট-বাঁধা পাথুরে রক্তের এই পাহাড়ি উপত্যকায়
যেন অনন্ত প্রশান্ত এক নদী
আশার ইস্পাতদৃঢ় কপোতের কূজনে মুখর।

অনুবাদ : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

গল্প

উপায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা সহরের একেবারে চোখের সামনে তখনও উপায়হীন নিরাশ্রয় মানুষগুলি এই ষ্টেশনের আশ্রয়টুকুতে গরু-ছাগলের মত গাদাগাদি করে দিনরাত্রি কাটাচ্ছিল—অল্প কিছুদিন আগেও।

একখানা চাটাই যতটা যায়গা জুড়তে পারে ঠিক ততটাই ছিল মল্লিকাদের ঠাঁই। মল্লিকা, তার স্বামী ভূষণ, আড়াই বছরের ছেলে খোকন ও বিধবা ননদ আশা। টিনের তোরঙ্গ, কাঁথা-বালিশের পুঁটলি আর ঘটিবাটি কটার স্থানও তারই মধ্যে।

আরও একটি সকাল হয়েছে। সূর্যের বোধ হয় উপায় নেই উদয় হয়ে রাত ভোর না করে—নইলে কেন যে এই কুৎসিৎ নিষ্ঠুর পৃথিবীতে রাত পোহায়। আজ তাদের মুখে দেবারও কিছুই নেই। ভোর থেকে ছেলেটা কান্না শুরু করেছে। বেলা বাড়তে বাড়তে এখন গেছে ঝিমিয়ে। থেকে থেকে উঁ উঁ করে কান্নার সুর টানে, আবার থেমে যায়।

রামলোচনকে সঙ্গে নিয়ে মানব-কল্যাণ ও জনসেবা মহাসমিতির প্রমথকে তাদের চাটাই-রাজ্যের কাছে এসে দাঁড়াতে দেখে মল্লিকা চোখ তুলে তাকায়। আশা মাথার কাপড় তুলে কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দেয়। এখন ভূষণের জ্বর কম। ভাঁজ করা একখানা কাপড় গায়ে জড়িয়ে বসে বসে সে যেমন ঝিমোচ্ছিল তেমনি ঝিমোতে থাকে। প্রমথের আবির্ভাবকে সে যেন গ্রাহ্যও করে না।

অমন কত মানুষ এসেছে—গিয়েছে। সংঘ থেকে, সমিতি থেকে, সভা থেকে, খবরের কাগজের আপিস থেকে। এতটুকু এদিক-ওদিক হয়নি তার অবস্থার। সরকারের ভরসা আর বিশেষ রাখে না, এদের ভরসা খানিক

ছিল। কিন্তু স্টেশনের এই নরক গুলজার করেই তাদের দিন কাটছে। শোনা যাচ্ছে, শীগগির নাকি স্টেশনের এই আশ্রয় থেকেও তাদের তাগিয়ে দেওয়া হবে।

জ্বর কেমন?

প্রমথের প্রশ্নের জবাব মল্লিকাই দেয়: অখন কমছে। আবার আইবো কাঁপাইয়া।

বেশভূষা ও কথাবার্তা-চালচলনে প্রমথ সম্ভ্রান্ত ঘরের প্রৌঢ়বয়সী সংসারী পিতার মত। সেইজন্যই এটা আরও বেশি রকম খাপছাড়া ও কৌতুকজনক মনে হয় যে, এই নিয়ে মানুষটা চারবার খবরাখবর জানতে এবং সহানুভূতি জানাতে এল অথচ কোনদিক দিয়ে এতটুকু উপকার তাদের হল না। আজ তারা একেবারে উপোস দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছেছে।

মল্লিকা আজ কথা বাড়ায় না, সোজাসুজি বলে, কই, আমাগো লেইগা কিছু তো করলেন না? আপনাগো ভরসায় আছি।

প্রমথ বলে, আমরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। ক'জনের জন্ত ব্যবস্থা করব? আপনারা নিজেরা যদি একটু গা-ঝাড়া না দিয়ে ওঠেন, সচেষ্ট না হন—

মল্লিকা বলে, গা-ঝাড়া দিমু? চেষ্টা করুম? ফল যদি ভাল হয় অখন খাড়াইয়া উলঙ্গ হইয়া গা-ঝাড়া দিতেছি। নাইচা কুঁইদা হাত-পা ছুইড়া চেষ্টা করতেছি। আর কি করনের আছে কন?

কথায় যত ঝাঁঝ থাক খোঁচা থাক, দিশেহারা আর্তনাদের আওয়াজ নেই, মুখে নেই ক্রোধ আর ক্ষোভের বিকৃতি। নিরুপায় মানুষের এই ভাবটা প্রমথর কাছে বড় ভয়ংকর ঠেকে। এতো আর কিছু নয়, দরদভরা ভাল কথার জবাবে অবজ্ঞার সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া যে উপদেশ ঝেড়ো না, কি উপায় আছে কি করার আছে বল, উপদেশ ঝেড়ো না।

বাস্তব বুদ্ধি টনটনে প্রমথের—এতবেশি টনটনে যে মাঝে মাঝে বুদ্ধি করতে করতে অকারণে অর্থহীনভাবে বুকের শিরা মাথার শিরা তার আতংকে টনটন করে।

একটু বিনয় দিয়ে মল্লিকাকে ঠাণ্ডা ও গরম করতে চেয়ে সে বলে, কি আর বলব! আপনারা বন্তার মত আসছেন, সরকার-বাহাদুর সামলাতে পারছেন না, আমরা কজনের জন্ত ব্যবস্থা করব বলুন? বন্তা ভূমিকম্পের মত এও হল ভগবানের মার। ভগবানই অবশ্য আমাদের মত দীনহীন

ব্যক্তিকে দিয়ে যতটুকু প্রতিকার করাতে চান করিয়ে নেন। নইলে আপনাদের মত মেয়েরা এত কষ্ট পাচ্ছেন এটা আমায় এত ব্যাকুল করবে কেন, ঘর থেকে টেনে বার করবে কেন!

মুখপোড়া ভগবানের কথা কওনের কাম কি?

প্রমথ সামলে নেয়।

ফাঁকা কথা ছেড়ে চট করে সে কাজের কথায় আসে। বলে, দেখুন, অবস্থার ওপরে তো আমাদের কোন হাত নেই। আপনি যদি করতে চান, আপনাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারি। রোজগার ভালই হবে।

মল্লিকা বলে, ওনারে একটা কাজ দেন না? ম্যালেরিয়া জ্বর, কাইল ছাইড়া যাইবো। পরশু দিনটা বিশ্রাম কইরা পরের দিন কাজে লাগবেন।

ভূষণ এবার রক্তবর্ণ চোখ তুলে তাকায়।

প্রমথ জিভের আওয়াজে আপসোস জানিয়ে বলে, ব্যাটাছেলের কাজ? ব্যাটাছেলেরা কাজ থেকে ছাটাই হচ্ছে। মেয়েদের কিছু কিছু কাজ জুটিয়ে দেওয়া যায়।

আমার ওই ননদরেও কাজ দিবেন? দুইজনে খাইটা রোজগার করুম।

দুটি শিকার পাবার আশায় প্রমথ খুশি হয়ে বলে, তা দিতে পারি।

মল্লিকা চোখ নামিয়ে কঙ্কালসার ছেলেটার দিকে তাকায়। খসা ঘোমটা মাথায় তুলে ভূষণের দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বলে, তুমি কি কও? আর তো কোন উপায় দেখি না।

ভূষণ কিছুই বলে না। হাতের আঙুলগুলি সে শুধু ঘন ঘন মুঠ করে আর খোলে।

মল্লিকা বলে, ভগবান! কপালে এও লিখছিলা?

অভ্যাসবশে ভগবানকে ডাকে কিন্তু নালিশের মত শোনায় না তার কথা। এভাবে শেষবারের মত ডেকে সে যেন চিরতরে বাতিল করে দিতে চায় ভগবানকে।

বেশ, কাম করুম। যে কাম জুটাইয়া দিবেন তাই করুম। উলঙ্গ হইয়া নাচার কাম চান, উলঙ্গ হইয়া নাচুম। কিন্তু মাথা গুইজা থাকনের লেইগা একখান ঘর দিবেন তো আগে? একখান ঘিরা ঘর আর এট্টু দুধ না পাইলে পোলাটা মইরা যাইব গা।

প্রমথ মনে মনে হিসাব কষে বলে, ঘর পাবে, দুধও পাবে। মাইনের

কিছু টাকা আগাম নাও, তাই থেকে ঘরের ভাড়া, দুধের দাম দেবে। একটা রসিদ দিয়ে কয়েকটা টাকা বরং এখুনি নিয়ে নাও। ও-বেলা সকলকে ঘরে নিয়ে যাব।

হাসিখুশি মুখে প্রমথ একটা সিগারেট ধরায়, মুখে পান নেই এটা তার বিষম রকম বিশ্রী লাগে। তবু ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, রামলোচন, পোয়াটেক দুধ কিনে এনে দাও। তুমি এইখানেই থাক, এদের দেখাশোনা করতে। কত বজ্জাত হারামজাদা যে এদের ঘাড় ভাঙার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে তার কি ঠিক ঠিকানা আছে কিছু। একটু সামলে-সুমলে রেখ।

মল্লিকা হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে প্রমথের চকচকে পালিশ করা জুতো-পরা পা দুটি চেপে ধরে চাপা আর্তনাদের সুরে বলে, আপনে মানুষ না, দেবতা?

প্রমথ বিদায় হবার পর কুড়ি বাইশ বছরের একটি ছেলে এবং প্রায় তার সমবয়সী একটি মেয়ে তাদের কাছে এগিয়ে আসে। কোন কলেজের ছাত্র এবং ছাত্রীই হবে সম্ভবত।

আপনাদের কাজ দেবে বলেছে?

হুঁ।

লোকটা ভীষণ বদমাস। কি কাজ দেবে জানেন?

ছেলেটি এবং মেয়েটি দু'জনে প্রায় দশ মিনিট ধরে প্রমথ মল্লিকাকে কিভাবে কি রকম কাজ দেবে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে।

তাদের কথার মধ্যে রামলোচন একপোয়া গরম দুধ মল্লিকাকে এনে দেয়। ফুঁয়ে ফুঁয়ে দুধ জুড়িয়ে পাতা কাঁথার তল থেকে একটা ঝিনুক বার করে সন্তর্পণে ছেলেটাকে কোলে তুলে মল্লিকা তাকে দুধ খাওয়াতে থাকে। বলে, এমন পাজি নাকি লোকটা? আপনারা দেখি সব জানেন, পুলিশে ধরাইয়া দেন না ক্যান?

ছেলেটি বলে, পুলিশ ওকে ধরবে না।

মেয়েটি উৎসাহের সঙ্গে বলে, আপনি যদি নালিশ করেন তা হলে অবশ্য—

বড় দুঃখে মল্লিকার মুখে হাসি ফোটে।

নালিশ? নালিশ করুম? বইন তুমি সংসার চিনলা না। কি নিয়া নালিশ করুম? আমারে কাম দিবার চায়, আমার ভাল করবার চায়?

এখন তো নালিশের কিছু নাই। নালিশের কারণ যখন ঘটব তখন আমার নালিশ কি, কিসের কি!

ছেলেটাকে কোল থেকে নামিয়ে ঠেলে একটু তফাতে সরিয়ে দেয়। ছেলেটার উপরেই যেন তার রাগ আর বিতৃষ্ণা। তার চোখ দুটি চকচক করে।

বজ্জাতি বুঝি না? কেডা সাধু কেডা শয়তান ঠাহর পাই না? সাধু সাইজা আইছে, চোখের নজর ঢাকব কিসে? আমরা ঠেকছি দায়ে—আমাগো দায়টাই আসল। না তো লাথি মাইরা এইসব মানুষের মুখ ভাইঙা দিতে আমরাই পারি। করুম কি, উপায় নাই।

ছেলে আর মেয়েটি চুপ করে থাকে।

রামলোচন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের লক্ষ্য করছিল—কখন সরে গিয়ে সে একজন পুলিস অফিসারকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

কি মতলব?

ছেলেটি বলে, আমরা ছাত্র ভলান্টিয়ার।

খানিক জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের দু'জনের নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে মল্লিকাদের সতর্ক করে দিয়ে অফিসারটি চলে যায়, বলে, আজে-বাজে লোকের কথায় ভুলবেন না। সাবধান থাকবেন।

কোনখানে সাবধান থাকুম, কি খাইয়া সাবধান থাকুম?

কিন্তু মল্লিকার প্রশ্ন তার কানে যায় না।

ছেলে আর মেয়েটি চলে গেছে। দেখা যায়, খানিক দূরে রামলোচন বসে আছে। বোধ হয় তাদের পাহারা দিতে, আর কেউ না বাগিয়ে নেয়!

মল্লিকা আশাকে বলে, ঠাকুরঝি, তোমার নি শুধু পরকাল। তুমিই কামে যাও—আমাগো বাঁচাও।

আশা শিউরে উঠে বলে, আমি পারুম না—মইরা গেলেও পারুম না।

মল্লিকা আঁচল দিয়ে চোখ মোছে, শান্ত সুরে বলে, মরণের কথা না—আমি নি মরণরে ডরাই? মইরা যদি পোলাটারে বাঁচান যাইত, এখনি মরতাম।

ভুবনের বাঁচা মরার কথা সে বলে না। সে একরকম স্পষ্টই বলে দেয় যে স্বামীকে বাঁচাবার জন্য সে মরতেও রাজি নয়, প্রমথের ফাঁদে ধরা দিতেও

রাজি নয়। ছেলের জন্ত দুয়েই সে রাজি। তবে প্রথমটা হবে নিষ্ফল, সে মরলে ছেলেটার বাঁচারউপায় হবে না, তাই দ্বিতীয়টা বেছে নিয়েছে।

সে আবার মিনতি করে বলে, বুইঝ্যা ভাখো ঠাকুরঝি। আমাগো তিনটা প্রাণীরে বাঁচাইবা—তোমার কোন কলঙ্ক নাই, পাপ নাই। সুদিন আইলে তোমারে ঘিন্না করুম না— পূজা করুম।

আমারে কইও না। আমি পারুম না।

ভুবন এতক্ষণ মুখ খোলেনি। এবার সে হঠাৎ ঝেঁঝে বলে, কারও অমন কামে গিয়া কাম নাই।

বলে আবার সে ঝিমিয়ে যায়। তার মাথার মধ্যে জীবন আর জগৎটা কেমন খাপছাড়া উদ্ভট হয়ে গেছে—দূরে সরে গেছে। মল্লিকা, আশা, খোকন নিরাশ্রয় মানুষের ভিড়, দুর্গন্ধ সব কেমন ওলটপালট হয়ে গেছে, অকারণ হয়ে গেছে।

মল্লিকার প্রথম শর্ত ছিল মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই, সকলের জন্ত। দুপুরে প্রমথের গাড়ি এসে তাদের সহরের একপ্রান্তে ছোট একটি দোতলা বাড়িতে নিয়ে যায়। বোঝা যায়, বাড়িটা ভদ্র পাড়াতেই। নিচের তলায় একখানা ঘর তারা পায়। সদরে যে দারোয়ান বসেছিল সে তালা খুলে দেয় ঘরের।

এ বাড়িতে আগে এক মুসলমান ভাড়াটে ছিল। প্রমথের উদ্যোগে পাড়ায় যখন হাঙ্গামারসৃষ্টি হয় তখন তারা পালিয়ে যায়—এ কাহিনী মল্লিকাকে শোনায় রামলোচন। প্রমথকে বাড়াবার জন্ত তো বটেই, মল্লিকাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতা জাগাবার উদ্দেশ্যেও। তাদের হয়ে প্রমথ খানিকটা প্রতিশোধ নিয়েছে।

বাড়ির আরও চারটি ঘরে আরও চারটি পরিবারকে প্রমথ আশ্রয় দিয়েছে। চারটি পরিবারের মেয়ে-পুরুষ নিস্পৃহ ভোঁতা দৃষ্টিতে মল্লিকাদের আবির্ভাব লক্ষ্য করে।

কারো যেন কিছু বলার নেই, জানার নেই, শোনার নেই।

মল্লিকাদের নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভারও নামে। মল্লিকারা ঢোকে তাদের ঘরে, ড্রাইভার ঢোকে পাশের ঘরে।

মল্লিকা মেয়েলি গলা শোনে : এত দেরি কইরা আলেন। আমি অখন গিয়া কখন ফিরুম?

ড্রাইভারের গলা শোনা যায় : কি করব বলুন, আমি তো গাড়ির মালিক নই।

ভাড়াটা তো ঠিক মত নিব আপনার গাড়ির মালিক!

সেটা তো আর আপনি দেবেন না।

ড্রাইভার গাড়িতে ফিরে যায়। খানিক পরে একটি বৌ, মল্লিকার চেয়ে সে কয়েক বছরের বয়সে বড় হবে, ভাল একখানা শাড়ি পরে ধীরে ধীরে গিয়ে গাড়িতে ওঠে—একা। তার বিষণ্ণতায় কঠিন মুখখানা মল্লিকা নজর করে চেয়ে ভাখে।

মল্লিকা জানে, বৌটি কোথায় যাচ্ছে। ষ্টেশনের গাদাগাদি ভিড়ে যে দিনরাত্রিগুলি কেটেছে তার মধ্যেই এ সব জানা হয়ে গেছে তার। তাদের বাঁচাবার অসীম আগ্রহ সম্বল করে সেই ছেলে আর মেয়েটিও বিশেষভাবে প্রমথের অনেক রকম ব্যবস্থার কথা খুলে বলেছিল। একেবারে আত্মসমর্পণ করতে পারে নি এমন দু' একটি মেয়ে বৌকে সে নিজেই এমনি ভাবে একা চলে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরে আসতে দেখেছে—দু' পাঁচটা টাকা নিয়ে।

খারাপ-পাড়ায় ঘণ্টা হিসাবে চড়া ভাড়ায় প্রমথই হয়তো বাসর ঘর ঠিক করে রেখেছে। বৌটির আজ যে নতুন বর হবে সে ঘরের ভাড়া দেবে, গাড়ির ভাড়া দেবে—সব যাবে প্রমথর পকেটে। বৌটির দেহেরও যে ভাড়া দেবে নতুন বরটি—তা থেকেও কমিশন পাবে প্রমথ। ঘরের ভাড়া, দেহের ভাড়া কত হয়, কত কমিশন দিতে-হয়, এসব মল্লিকা খুঁটিয়ে জানবার চেষ্টা করেনি।

এবার হয়তো কিছুই আর অজানা থাকবে না।

ঘর গুছোবার ব্যাপার সামান্ত—কীইবা সম্বল আছে গুছোবার। এতদিন ভাল করে হাত পা ছড়িয়ে শোবারও জায়গা মেলেনি। ভুবণ আর খোকনের শোয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে এমন ভাবে হাত পা ছেড়ে দিয়ে সে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে পড়ে যে তৈলহীন রুক্ষ চুলের খোঁপা না থাকলে মাথাটা বোধ হয় তার ফেটে যেত।

ভাবতে গিয়ে তার সর্বাঙ্গ ঘেমে গেছে। একটা লোক একসঙ্গে গাড়ি, ঘর আর মেয়েছেলের দেহের ব্যবসা চালাচ্ছে প্রকাণ্ড ভাবে। একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িয়ে।

কানে শুনে অতটা ধারণা করতে পারেনি। চোখে দেখে তার মাথা ঘুরে গেছে।

খোলা দরজা। কলতলায় দু-তিনটি মেয়েবৌ বাসন মাজছে। ওদিকের কোন ঘর থেকে ভূষণের সমবয়সী একজন বাইরের দিকে যেতে যেতে ডাক শুনে দাঁড়ায়।

দাদা, কথা শুইনা যাও।

পায়ের জুতো থেকে ধুতি পাঞ্জাবী মাথার চুলে মলিনতা ঠেকিয়ে একটু ভদ্র ও মানুষের মত হয়ে রাস্তায় বার হবার প্রাণপণ চেষ্টা এত স্পষ্ট মানুষটার।

কলতলা থেকে একটি মেয়ে উঠে আসে। একটু কালো, ছিপছিপে গড়ন; সাধারণ হিসাবে বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে।

খোলা দরজার সামনে থেকে একটু আড়ালে সরে যায় দুজনে।

—আবার কই যাও?

—কই আর যামু, কাজের খোঁজে যাই।

—বৌদির লেইগা ওষুধ আনবা। কি কষ্ট পায় ভাখ না? ওষুধ-না পার, বিষ আইনো খানিকটা।

—তুই আমারে পাইছস কি? অ্যাঁ, কি পাইছস আমারে?

মানুষটার চড়া গলা নয়, বোনের গালে চড় বসিয়ে দেবার আওয়াজটা মল্লিকার কানে বেঁধে।

কয়েক মিনিট চুপচাপ। মেয়েটি কলতলায় ফিরে গেছে। দারোয়ানের সঙ্গে প্রৌঢ়-বয়সী সৌখিন চেহারা ও বেশভূষার একজন উঠানে এসে দাঁড়ায়।

কলতলা থেকে মেয়েটি বলে, দাদা বাইরে গেছে।

নবাগত লোকটি বলে, হ্যাঁ, রাস্তায় দেখা হল। একটু শুনে যাও।

মেয়েটি উঠে আসে। —আবার ক্যান আইছেন? লোকটি বলে, তোমার দাদা বলল, দু'চার দিনের মধ্যে ঘর ভাড়া না দিলে প্রমথবাবু ঘাড় ধরে রাস্তায় বার করে দেবেন।

—আমি কি করুম? দিলে দিব।

—আজ চল না একটু বেড়িয়ে আসি? দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়।

—না। আমার বেড়ানের সখ নাই।

আমার সঙ্গে যাবে তোমার ভয় কি ?

না, না, না ! আমি কারো সগে যামুনা ! মেয়েটি কলতলায় ফিরে যায়।

মল্লিকা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তার দু'চোখ জ্বালা করে। মনে মনে বলে, হারামজাদি তর বিয়া হয় নাই, তর সোয়ামী নাই, পোলা নাই, কেউ নাই, তাই না তর এত তেজ!

সেইদিনই ডাক এল প্রমথের। তার সবুর সইছিল না।

প্রমথর গাড়ি আসেনি। ট্যাক্সি নিয়ে রামলোচন এসেছে। সঙ্গে এসেছে কিছু চাল, ডাল, মাছ, তরকারি।

আজই যাওন লাগব ? অখন ?

বাবু শুধু একটু ডেকেছেন। একটু আলাপটালাপ করে চলে আসবেন।

ভূবনের যথাসময়ে জ্বর এসেছে। শুয়ে শুয়ে সে কোঁকায়। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে।

এ বাড়ীতে আসার পর থেকে আশার মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখা যাচ্ছিল। ভীরু নিরীহ মানুষ মোটানায় পড়ে যেমন ছটফট করে। আশা হঠাৎ বলে, বৌ, তুই দুগা ভাত রাঁধ, আমি যাই।

মল্লিকা তার হাত চেপে ধরে বলে, তুমি যাইবা ঠাকুরঝি ? তুমি কাম করবা ? নিরুপায় আমাগো প্রাণ দিবা—আমি তোমারে পূজা করুম।

রামলোচন জানায়, না, আশা গেলে হবে না। প্রমথ মল্লিকাকেই যেতে বলেছে।

তবে আর কথা কি ? যেতে যখন বলেছে, যেতে হবে। যে পথেই হোক টানের চোটে চলার জন্ম নাকে যখন দড়ি পড়েছেই, থামার উপায় কি !

সহরতলীতে ছোটখাট বাগানযুক্ত ছোট একটি আধুনিক ধরনের সুন্দর বাড়ি। এটা প্রমথর একা থাকার জন্ম।

প্রমথ মল্লিকাকে হাসিমুখে ঘরে ডেকে বসায়। বলে, একটু আলাপ-আলোচনা পরামর্শ করার জন্ম ডেকেছি। ভাব যখন হল আমাদের, ভাব আরেকটু জমুক।

তা জমুক, মল্লিকার আপত্তি নেই। ঠিক কি রকম কাজে তাকে লাগতে হবে, পাশের ঘরের ওই বৌটির মত অথবা অন্তরকম, খোলাখুলি জানা গেলে বরং ভালই হয়।

সুন্দর সাজানো ঘরে রঙিন সোফায় মল্লিকার ময়লা কাপড়, রুক্ষ চুল, মাটিতে মলিন চামড়া বড়ই বেমানান দেখাচ্ছিল। প্রমথ যেন বাড়ির ঝিকে ডেকে সোফায় বসিয়েছে আদর করে।

কিন্তু তাহলে কি হবে। মল্লিকা একটু নড়লে চড়লে প্রমথের মনে হয় উপোস দিয়ে দিয়ে রোগা একটা বাঘিনী যেন মেয়েমানুষের রূপ ধরেছে। মাথা তুলে স্থির দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকাবার ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, বাঘিনীর মতই ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁতে নখে তাকে ছিঁড়ে ফেলবার মতলব আঁটছে। সে ভঙ্গি যখন ঝিমিয়ে শান্ত ও নত হয়ে আসে, একটা বাঘিনীকে বশ করার আনন্দ হয় প্রমথের।

সে বলে, আমিই তোমাদের সব দায়িত্ব নিলাম। তোমার কোন ভাবনা নেই আর। তোমাকে দিয়ে এমন কাজ করাব না যাতে তোমার স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করার কোন ক্ষতি হয়।

মল্লিকা ভাবে, ও বাবা, এত দরদ তো ভাল নয়।

প্রমথ বলে, তুমি আমারি কাছে কাজ করবে।

মল্লিকা বুঝতে পারে না। ভুরু কুঁচকে বলে, আপনার কাম ? আপনার কি কাম ?

প্রমথ হেসে বলে, আমার কি একটা কাজ ? চারিদিকে দশরকম কাজে জড়িয়ে আছি। যাক, একটু চা-টা খাও। তার আগে এক কাজ কর, শাড়ি ব্লাউজ এনে রেখেছি, বাথরুম থেকে চান করে কাপড় বদলে এসো। তাকে সাবান আছে।

আইজ না।

প্রমথ আদরের সুরে বলে, লক্ষীটি কথা শোন, যাও।

মল্লিকা ঘাড় উঁচু করে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

প্রমথ আবার বলে, এই বেশে তোমাকে এখানে দেখলে লোকে বলবে কি ?

সেটা অবশ্য আলাদা কথা। প্রমথ নিজে তাকে বাথরুম দেখিয়ে দেয়। সেই সুগন্ধমথিত আলোয় উজ্জ্বল বাথরুমে সাবান মেখে স্নান করতে করতে কয়েকবার মল্লিকার গা ঝিমঝিম করে। সেটা বোধহয় সারাদিন কিছু না খাওয়ার জন্য। কিন্তু উল্টেপাল্টে হাসি-কান্না ঠেলে আসে কেন মল্লিকা বুঝতে পারে না।

নতুন শাড়ি জামা পরে ফিরে এলে তাকে দেখে প্রমথ খুশি হয়ে বলে, বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে !

চাকর মল্লিকাকে চা আর খাবার দিয়ে যায়। প্রমথকে দিয়ে যায় মদের বোতল, সোডা আর গ্লাস।

মল্লিকা মাতাল দেখেছে, জীবনে আজ প্রথম এত কাছে মুখোমুখি ভরা বোতল থেকে গ্লাসে ঢেলে মানুষকে মদ খেতে ছাখে।

মল্লিকার চা খাওয়া হলে গ্লাসে একটা বড় চুমুক দিয়ে প্রমথ তার পাশে এসে বসে। এক হাতে তাকে জড়িয়ে কাছে টেনে আদরভরা স্বরে বলে, এমনিভাবে আসবে, কিছুক্ষণ থেকে চলে যাবে—এই শুধু তোমার কাজ !

মল্লিকার মাথায় হঠাৎ আগুন ধরে যায়। প্রমথ তাকে দিয়ে ব্যবসা করাবে এটা সে মেনেই নিয়েছে কিন্তু গোড়ায় প্রমথ নিজে তাকে কিছুদিন ভোগ করে নিয়ে তারপর ব্যবসায়ে নামাবে এ অপমান তার অসহ্য লাগে। হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে মদের বোতলটা তুলে সে প্রাণপণে প্রমথর মাথায় বসিয়ে দেয়।

বোতলটা ভেঙে যায়। প্রমথ অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ে।

দু'চোখে আগুন-মেশানো অসীম বিস্ময় নিয়ে মল্লিকা তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বন্ধ দরজার বাইরে থেকে চাকর বলে, বাবু ডেকেছেন ?

মল্লিকা বলে, না। তুমি যাও।

সে ঘরের চারিদিকে তাকায়। শুধু অজ্ঞান হয়ে গেছে, ওটাকে শেষ করা যায় কি করে ! একটা বন্দুক আছে ঘরে। কিন্তু সে বন্দুক ছুঁড়তে জানে না।

বন্দুক দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে মাথাটা ভেঙে চুরমার করে দেবে, না গলায় আঁচল জড়িয়ে মারবে ?

একটু ভেবে প্রমথের কিনে দেওয়া নতুন শাড়ীর আঁচলটা পাকিয়ে প্রমথের গলায় ফাঁস বাঁধে—সোডার বোতলের মুখটা তাতে ঢুকিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে যতটা ক্ষমতায় কুলায় শক্ত করে এঁটে দেয় ফাঁসটা।

তবু সহজে কি মরে প্রমথ। প্রায় পনের মিনিট ফাঁসটা নিয়ে, মল্লিকাকে ধস্তাধস্তি করতে হয়।

তারপর ফাঁস খুলে কাপড় ঠিক করে নিয়ে প্রমথের বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোটের তাড়া বার করে নেয়। সবগুলি না হোক, দুটো চারটে নোট তাকে দেবার জন্যই তো লোকটা তাড়াটা পকেটে রেখেছিল ?

সবগুলো সে দেবে না কেন! নিজের ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলিটা তুলে নিয়ে মল্লিকা ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা ভেজিয়ে দেয়।

চাকরকে বলে, ঘরে যাইও না। বাবু ডাকলে যাইবা।

চাকর একটু মুচকে হেসে বলে, আচ্ছা।

রামলোচন চলে গেছে। আজ রাত্রে মল্লিকাকে ফিরিয়ে নেবার কথা ছিল না। বাইরে দু'জন দারোয়ান, সশস্ত্র। প্রমথর ছিল বড়ই প্রাণের ভয়—অকারণে নয় অবশ্য।

মল্লিকা ট্যাক্সিতে এসেছিল স্মরণ করে একজন দারোয়ান বলে, ট্যাক্সি বোলা দেগা?

মল্লিকা বলে, না।

মল্লিকার মূর্তি দেখে আশা ভয় পেয়ে বলে, বৌ!

মল্লিকা একগাল হাসে। —উপায় পাইছি ঠাকুরঝি, খাসা উপায় খুঁইজা পাইছি!

আশা আরও ভয় পেয়ে বলে, তুই ক্ষেইপা গেছস বৌ!

মল্লিকা বড় বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলে, ক্ষেপছি তো হইছে কি, উপায় তো খুঁইজা পাইছি। আমারে কিনা নিয়া বেচাকেনা করব সহইরা ডাকাইত? পাইছে কি আমারে! মাইয়ালোক বইলা কি গায়ে আমার জোর নাই?

বস বৌ, বস। পায়ে ধরি তর, বইয়া ঠাণ্ডা হ।

মল্লিকা বসে বলে, ভাত রাঁধছ ঠাকুরঝি? তোমরা খাইছ? আমারে দাও—ভাতের খিদায় নাড়ি জ্বলে।

বলে সে একগাল হাসে, ভাতের কষ্ট পামু না আর। পোলারে চাইরবেলা দুধ খাওয়ামু। ময়লা কাপড়খান পইরা আবার যামু ইস্টিশানে, আবার ডাকাইতরা আমারে কিনতে আইবো।

গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলে, এইবার ছোঁরা নিয়া যামু লুকাইয়া। বুঝছস ঠাকুরঝি, লুকাইয়া একখান ছোরা নিয়া যামু।

জ্বর

নবেন্দু ঘোষ

হারিকেনের শিখাটা একটু বাড়িয়ে দিল লোচন দাস, তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকাল মাধবের দিকে। যেন সে যাচাই করতে চাইল মাধবের অবস্থাটা। কতটা খারাপ মাধবের অবস্থা ? কতটা খারাপ হলে কতটা মোচড় দেবে তাও যেন হিসেব করে ঠিক করতে চাইল সে।

মিথ্যে নয়। মাধবের শীর্ণ, রসহীন মুখে, তার নিষ্প্রভ চোখের বড় বড় তারায় একটা অসহায় আকুতি। লোকটা সত্যি বিপাকে পড়েছে।

হুঁ ! লোচন দাস টাকের উপর হাত বুলোল একবার, প্রশ্ন করল, কি এনেছিস ?

এজ্ঞে ?

আরে ব্যাটা বন্ধক দিবি কি ?

মাধবের অন্ধকার মুখটা আরও অন্ধকার হয়ে গেল, ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সে শুষ্ককণ্ঠে বলল, এজ্ঞে···বন্ধক···

লোচন দাসের গলাটা মুহূর্তে কর্কশ হয়ে উঠল, বাধা দিয়ে সে বলল, বুঝেছি। হবে না যা।

এজ্ঞে মহাজন···

লোচন দাস চোখ পাকাল, আমি দান খয়রাত করি না, বুঝলি, আমি ব্যবসা করি।

মরীয়ার মত মাধব এক পা এগিয়ে গেল, হাতজোড় করে বলল, আমি শোধ দেব মহাজন, বিশ্বাস করেন—

খিক্‌খিক্‌ করে হেসে উঠল লোচন দাস, বলল, বিশ্বাস ! ওকথা তো আগেও কতবার বলেছিস।

কিন্তু আপনি তো ঠকেননি মহাজন—টাকা দিতে পারিনি, জমি নেছেন, গয়না নেছেন।

ঠিক বলেছিস। কিন্তু এবার? এবার যখন টাকা দিতে পারবি না, তখন? বাসনকোসন আছে?

মাধব মাথা নিচু করল, এজ্ঞে না—মাটির বাসন।

তাহলে বাড়ি যা।

তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মাধব। এতক্ষণ ধরে কথা বলেও যে হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারল না, তা যেন সে এবার নৈঃশব্দ্য দিয়েই জয় করতে চাইল।

লোচন দাসের মেদসমৃদ্ধ দেহটা নড়ে উঠল, কি? এখনো দাঁড়িয়ে আছিস যে!

এজ্ঞে আপনার এখানে খেটে টাকা শোধ দেব।

লোচন দাস আবার খিক্‌খিক্ করে হাসল, খাটবি মানে? ধানের চারা জলে ডুবে গেছে—এখন খাটবি কোথায়? যদি ধান বাঁচে, পাকে, তবে গিয়ে তোর সেই তিন মাস বাদে একমাস দরকার পড়বে। তার জন্যে পাঁচজনের পেট চালাব নাকি আমি? বাপ্!

আগের মতই নিরুত্তর রইল মাধব।

লোচন দাস ভুরু কুঁচকে খেঁকিয়ে উঠল, যা না বাপু, কিছু হবে না—জানিস তো আমি এক কথার মানুষ।

যাচ্ছি মহাজন—চাপা গলায় বলল মাধব, তারপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এক ঘণ্টা পরে বাড়ি ফিরল মাধব।

তার ক্লান্ত, অসহায় ভঙ্গি থেকে সুবর্ণ সব বুঝল। বুঝেও সে চুপ করে রইল।

কাছে এসে মাধব প্রশ্ন করল, রান্না চাপিয়েছ নাকি?

সুবর্ণ বিমর্ষভাবে হাসল, কি দিয়ে চাপাব?

হুঁ। কোঁচড় খুলে মাধব বলল, মকুন্দর ওখান থেকে খুদের চাল বলে কয়ে নিয়ে এলাম, নাও।

চাল দেখে সুবর্ণ চঞ্চল হয়ে উঠল, ছুটে গিয়ে একটা হাঁড়ি নিয়ে এল, খুঁটে খুঁটে প্রত্যেকটি চালের কণা তুলে নিল। সাড়া পেয়ে ভিতর থেকে

বেরিয়ে এল পচা আর কেষ্ট। তাদের শীর্ণ, পিলে-ওঠা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, ড্যাবডেবে চোখে তাদের কেরোসিনের ডিবেটার ক্ষীণ আলোকে ম্লান করে দিয়ে যেন আর একটা আলো জ্বলে উঠল। এমন কি, ঘরের ভিতরে কাঁথা-চাপা দেওয়া এক বছরের বাচ্চাটাও যেন ব্যাপারটার আঁচ পেয়ে তার কান্নার ভাষায় কথা বলে উঠল।

সুবর্ণ বলল, হাত মুখ ধুয়ে জিরোও তুমি—আমি এক্ষুনি ফ্যান-ভাত নামিয়ে দিচ্ছি।

দাও।

হাত মুখ ধুয়ে অন্ধকার দাওয়াতেই বসে রইল মাধব। সুবর্ণ গিয়ে উনুন ধরাতে বসল। পচা আর কেষ্ট গিয়ে মায়ের পিছনে চুপ করে বসে রইল। অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার ঘটছে এখন। চাল এসেছে, একটু বাদেই আগুন আর জলের সহায়তায় একটা ইন্দ্রজাল ঘটবে, চাল হয়ে উঠবে ভাত। ঘরের ভিতর এক বছরের বাচ্চা ছেলেটা ক্ষীণকণ্ঠে দু'একবার কাঁদবার চেষ্টা করে আবার আঙুল চুষতে চুষতে ঘুমিয়ে পড়ল। তালুকদার বাড়ির পিছনকার জঙ্গল থেকে ভেসে এল শেয়ালের প্রহর-ঘোষণা।

চুপ করে বসে রইল মাধব। দিন কুড়ি যাবৎ সে অসুস্থ। নিত্যকার মত আজো সন্ধ্যের পর জরজর মনে হচ্ছে, শরীর ভাল নয়। বাইরে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার গাছের পাতায় বাসা বেঁধেছে। মনের ভিতরেও অন্ধকার। বাইরের ঝিঁঝিঁর ডাকের মত ক্লান্ত, বিভ্রান্ত, বুভুক্ষু চেতনার মধ্যেও যেন একটা ঝিঁঝিঁর ডাক উঠছে। একটা আর্ত কোলাহল। এবার? এরপর? জমিজমা ছিল, গেছে। বাসনকোসন আর গয়নাপত্তর—তাও গেছে। জনমজুর খেটে কাজ করার পথ বন্ধ। কে কাজ দেবে? কেন দেবে? ধানক্ষেত ডুবে গেছে সবার, তা না হলেও এখন কাজ জুটত না। ধান পাকলে পর কাজের দিন আসবে। অন্য কোন কাজ নেই গাঁয়ে। তাহলে? কেউ ধার দেবে না, সবার অবস্থাই এক। চড়া বাজার, অভাব, দুর্দিন। যাদের আছে তারাও এমনি এমনি ধার দেবে না। তাহলে? এখন?

উনুন ধরেছে। হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। বাতাসে মৃদু একটি সুঘ্রাণ। টগবগ শব্দ হচ্ছে। কিন্তু মাধবের কানে আসে না তা। তার কানে আর একটা শব্দ এল। যেন সব ভেঙে যাচ্ছে। মাটির নিচে একটা গুমগুম শব্দ,

বাতাসে দীর্ঘশ্বাস, অন্ধকারে হিংস্রতার হায়েনা-দৃষ্টি। এবার? এরপর? মাধব ভাবতে চেষ্টা করল। চোখ বুজে, দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে, পুঞ্জ পুঞ্জ মনের অন্ধকারে নিজেকে তলিয়ে দিয়ে সে ভাবতে লাগল। কিন্তু না, কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারল না, সেই অন্ধকারে এতটুকুও আলোর রেশ সে দেখতে পেল না।

খেতে এসো, ওগো।

হুঁ।

মাধব গিয়ে বসল। ভাত থেকে বাষ্প উঠছে। কেরোসিনের লালচে আলোতেও সেই প্রাণ-বাষ্প দেখা যায়। পচা আর কেষ্টও বসেছে একপাশে। নিঃশব্দে। ভক্তিনম্র চাউনি তাদের। মাধব অবাক হয়। কতই বা বয়েস ওদের, আট বছর আর ছ'বছর। কিন্তু এই তিন চার মাসে ওরা বদলে গেছে, ওদের বয়েস যেন আশি আর ষাট হয়েছে। চেঁচায় না, হাসে না, দৌড়োয় না। কেবল ভয়ে ভয়ে আছে।

প্রথম গ্রাস তুলতে গিয়েই থেমে গেল মাধব। হঠাৎ কাশি এল তার। একটানা।

কি হল? সুবর্ণ ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করল।

মাধব মাথা নেড়ে কাশতে লাগল। তারপরে এক সময়ে থামল, সুবর্ণের দিকে তাকাল, বলল, কিছু না।

শরীর খারাপ?

সে তো পুরোন কথা।

আজো জরজর ঠেকছে?

হুঁ। হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল মাধব, পচা আর কেষ্টর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, খেতে গিয়ে কাশি উঠবে না? দেখছ না তোমার ছেলেদের চাউনি? রাক্ষস, রাক্ষসের মত তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

সুবর্ণ ছেলেদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বলল, এই তোরা ভিতরে যা—।

পচা আর কেষ্ট সভয়ে একবার মায়ের দিকে তাকাল, তারপর মাথা নিচু করে উঠে গেল।

সুবর্ণ বলল, খাও—

মাধব খেতে আরম্ভ করল। দিনের বেলা খাওয়া হয়নি আজ। খুদকণা যা ঘরে ছিল তাই দিয়ে বাচ্চাদের একমুঠ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সে আর সুবর্ণ শুধু কচুর ডাঁটা সেদ্ধ করে খেয়েছিল। সারাদিন পরে এখন মাধব ভাত খাচ্ছে। শুকনো জিভে রস সঞ্চারিত হয়। তবু কেমনে যেন কষ্ট হয়, পাথরের মত ভারি হয়ে প্রতিটি গ্রাস যেন গলা দিয়ে নামতে থাকে। আজ খেল, কাল সকালেও হয়ত খাবে। কিন্তু তারপর? কেঁদে, মাথা খুঁড়ে কাউকে বললেও আর কিছু পাবে না সে। কে দেবে? সমদুঃখীদেরও তো সমান অবস্থা।

ক্ষুধার তীব্রতাটা একটু কমতেই তার চোখে জল এল, সে থামল।

সুবর্ণ বলল, থামলে যে?

মাধব ধরাগলায় বলল, পচা আর কেষ্টকে ডাক—

সুবর্ণকে ডাকতে হল না, বাপের কথা শুনে পচা আর কেষ্ট নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারা যেন এরি জন্য অপেক্ষা করছিল, তৈরি হয়ে ছিল। বেরিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে তারা বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল।

মাধব বলল, খেয়ে নে তোরা বাবা—বোস—ভয় নেই, আমি আর বকব না এখন—

সবাই শুয়েছে।

কেরোসিনের ডিবেটা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরটা অন্ধকার। বাইরে ঝুপ্ ঝাপ্ বৃষ্টি নেমেছে। চাল ভেদ করে বৃষ্টির জল টুপটাপ করে ঘরের বাঁ কোণে পড়ছে। বাইরে গাছপালার মর্মর-ধ্বনি। ব্যাঙের ডাক। বহুদূর থেকে একটা কুকুরের ডাক ভেসে এল। রাত ঘনাচ্ছে। অন্ধকার রাত। অন্ধকার মন। এবার? এরপর? আর কতদিন? জন্মাবার পর থেকে একইভাবে কেটেছে দিন। অভাব আর দুঃখ, দুঃখ আর অভাব। গত পাঁচ বছর থেকে আরো বেশি। যেন রাহুর দশা চলছে। কিন্তু এই রাহুর গ্রাস থেকে মুক্তি পাবার সম্ভাবনা নেই। এই রাহুর জঠর আছে। জমি গেছে, গরু গেছে। অলঙ্কার আর বাসন গেছে। আত্মীয় নেই, বান্ধবদেরও এক অবস্থা। চাইবার কেউ নেই, দেবার কেউ নেই। কিন্তু নেওয়ার জন্য অনেকে আছে। প্রতিটি নিঃশ্বাসের জন্য দাম দিতে হয়, খাজনা দিতে হয়। অন্ধকার। পৃথিবীতে নিরাপত্তা নেই। অন্তত মাধবের নেই। ভয় পেল

সে, শিউরে উঠল। অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবীকে যেন বহুদূরবর্তী কুগ্রহ বলে মনে হল। পায়ের তলায় মাটি নেই, আশ্রয় নেই, আশ্বাস নেই।

মাধব উঠে বসল।

সাড়া পেয়ে সুবর্ণ বলল, কি হল? ঘুমোওনি?

না—

কেন?

ঘুম আসছে না।

কি হল, শরীর খারাপ লাগছে?

মাধব জবাব দিল না, কি যেন ভাবতে লাগল সে। অন্ধকারে তার মাথার মধ্যে যেন অনেক কিছু ঘটে গেল, যেন অনেক গাছ উপড়ে পড়ল।

ঘরের মধ্যে নিঃশব্দতা। পচা আর কেষ্টর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়, শোনা যায় এক বছরের বাচ্চাটার চুকচুক স্তন্যপানের শব্দ।

মাধব ডাকল, সুবর্ণ—

কি?

গাঁয়ে থাকলে মারা যাবো এবার।

সুবর্ণ এককথায় জবাব দিল না, একটু থেমে ভাববার চেষ্টা করে বলল, তুমিই তো একা নও গাঁয়ে—

সবারই এক অবস্থা।

তাহলে সবাই একসঙ্গে মরব।

মাধব জ্বলে উঠল, মরব! কেন, মরব কেন?

তাহলে কি করবে?

কালই চলে যাব গাঁ ছেড়ে।

সুবর্ণ বাচ্চাকে শুইয়ে রেখে স্বামীর পা ঘেঁষে প্রশ্ন করল, কোথায় যাবে?

কলকেতা।

কি বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি—অন্ধকারে দৃঢ় শোনাল মাধবের গলা, তারিক্কি বলে মনে হল, মাথা নেড়ে সে বলল, ভেবেচিন্তেই বলছি আমি।

কিন্তু কলকেতায় কে আছে তোমার? কোথায় গিয়ে উঠবে তুমি?

মাধব বলল, আমার এক মামা আছে সেখানে—

তুমি ঠিকানা জান? সুবর্ণের কণ্ঠে অবিশ্বাস ধ্বনিত হল, কৈ? আজ পর্যন্ত কোনদিন তো বলনি সেই মামার কথা?

মাধব ক্ষেপে গেল, ভাখ্ বৌ, তোর সবতাতেই বাড়াবাড়ি। তবে কি আমি শালা মিছে কথা কইছি।

সুবর্ণ ঘুরে সরে গেল, আহতকণ্ঠে বলল, মাঝরাতে গাল পাড়ছ কেন? আমার দোষটা কি? কোনদিন শুনিনি তোমার মামার কথা—তাই—

শুনবি কোত্থেকে? বললে তো? আর কেন বলিনি? মামার সঙ্গে ঝগড়া ছিল বলে।

তা সেই ঝগড়া কি মিটে গেছে?

না মিটলেই বা—মামা তো? মায়ের সহোদর—এক রক্ত বইছে না আমাদের শরীলে?

মাধবের কণ্ঠে উত্তেজনা। কিন্তু কথাগুলো যেন মিথ্যে নয়।

মাধব বলে চলল, মামার কাঠের দোকান আছে—শেয়ালদার কাছে, দিব্যি চলে সে দোকান। হোক না ঝগড়া, সেখানে গিয়ে উঠলে কি মামা আমাদের ফেলে দিতে পারবে? লোকটা অত খারাপ না।

মাধব চুপ করল। সুবর্ণ সাড়া দিল না।

কি? যাবি?—মাধব প্রশ্ন করল।

সুবর্ণ মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, না।

না।—মাধব যেন লাফিয়ে উঠতে গেল, কেন? তুই বুঝি খাওয়াবি তাহলে?

মাধবের কথার মধ্যে যেন একটা প্রচ্ছন্ন অশ্লীলতা ছিল, সুবর্ণ রেগে উঠে বসল, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, মাঝরাতে চেঁচামেচি করো না—ভাল লাগছে না—

মাধব পাগলের মত মাথা ঝাঁকাল, না লাগুক ভাল—আমি চেঁচাব, একশ' বার চেঁচাব—

ছেলেরা জেগে উঠবে।

জাগুকগে, চুলোয় যাকগে।

তোমার হল কি বলত?

চুপ কর্ বৌ।

শোন—

না।

তবু সুবর্ণ বলল, শুনতেই হবে তোমাকে। আমি কি বুঝি? কতটুকু জানি? সংসার চালাও তুমি—তুমি যদি মনে কর যে কলকেতায় গেলে ভাল হবে তবে তাই চল—

এক মুহূর্তে নিভে গেল মাধব, গলা নামিয়ে বলল, রাজি? বেশ—বেশ—বেশ—

নিঃশব্দতা। বাইরে বৃষ্টির শব্দ, গাছপালার মর্মরধ্বনি। ঘরের ভিতর ভাঙা চাল বেয়ে জল পড়ার আওয়াজ।

বৌ—

কি?

মাত্র তিন মাসের জন্য—ধান পাকলেই আবার গাঁয়ে ফিরে আসব।

সুবর্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল।

মাধব বলল, তাছাড়া ছেলেগুলোর কথাও ভেবে দেখো—একটা তো গেছে—আবার—

কথাটা শেষ করল না সে। সুবর্ণ শিউরে কেঁপে উঠল। তার দশ বছরের বড় ছেলে পটল। ছ' মাস আগে মারা গেছে সে। জ্বরে। খুব মারাত্মক রকমের জ্বর নয়, তবু মারা গেছে পটল। বিনা ওষুধে, বিনা পথ্যে। টাকার অভাবে। না না, সে কলকাতা যেতে রাজি আছে। কলকাতা কেন, নরকেও যেতে রাজি আছে সে। শুধু শত্রুরের মুখে ছাই দিয়ে সবাই বেঁচে থাকুক। দু'চোখ বেয়ে তার দরদর ধারায় জল নামল। আবার স্বামীর কাছে গেল সে, চোখের জল মুছে তার গায়ে হাত দিয়ে একটা কথা বলতে গিয়েই সে চমকে উঠল, বলল, এ কি গো!

কি?

তোমার গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে!

মাধব হাসল, অন্ধকারে অদ্ভুত শোনাল তার গলাটা। উত্তেজিত, অস্বাভাবিক। সে বলল, ও কিছু না বৌ—কিছু না—

তবু—

কিছু ভেবো না—কলকেতা গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

তাই যেন হয়। সুবর্ণ মনে মনে মাথা নাড়ল, প্রার্থনা করল। তাই যেন হয়। কলকাতায় মা কালী থাকেন, তাঁর যেন তেমনি কৃপা হয়। তাই যেন হয় মা।

রাত বাড়ল। বৃষ্টির বেগ এক সময়ে মন্দীভূত হয়ে এল। পচা আর কেষ্টর ঘুমন্ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে সুবর্ণ ও বাচ্চাটার নিঃশ্বাস একতালে পড়তে লাগল। কিন্তু মাধবের ঘুম এল না। জ্বরটা যেন বাড়ছে। শুধু দেহে নয়। রক্তে, চেতনায়, স্নায়ুকোষেও যেন একটা জ্বরের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে, সব কিছু পুড়িয়ে দিচ্ছে, তিল তিল করে তাকে চিতাভস্মে পরিণত করছে।

ভোরবেলায় উঠে সুবর্ণ অবাক হয়ে গেল। মাধবের চোখ লাল। জবা-ফুলের মত।

কি হল তোমার?

কিছু না—

জ্বর বেড়েছে?

না। এখন কম।

ঘুমোওনি বুঝি রাতে?

ঘুম আসেনি।

তোমার মাথায় ছিট আছে। কলকতায় যখন যাবার তখন যাওয়া যাবে—অত ভাবনার কি আছে?

মাধব বিচিত্র দৃষ্টি মেলে তাকাল, বলল, আছে। আজই যেতে হবে—সন্ধ্যের গাড়ীতে—তাই ভাড়ার কথা ভাবছি।

সুবর্ণ হাসল, মিছে ভাবনা—না হয় বিনে ভাড়ায় যাব'খন।

মাধব সোজা হয়ে দাঁড়াল, ঠোঁটটা বেঁকিয়ে বলল, বটে! রেলকোম্পানি বুঝি তোমার ইয়ে?

সুবর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল, তার পাণ্ডুর মুখটা মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল। পরক্ষণেই সে বলল, ছি ছি—তুমি কি—

সুবর্ণ কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই মাধব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কোথায় যাচ্ছ?

পেছু ডাকিসনে—

মাধব চলে গেল। সুবর্ণের চোখে জল এল। মানুষটা কেমন যেন হয়ে গেছে। অতবড় জোয়ান মানুষটা যেমন রোগা তেমনি খিটখিটে হয়ে

গেছে। হয় কি সাধে? কত দুঃখ, কত বেদনা—উদ্‌গত অশ্রু সামলে সুবর্ণ ধর কাঁট দিতে লাগল। থাক, কি হবে ভেবে?

কেষ্ট এসে মায়ের আঁচল চেপে ধরল, বলল, মা—

সুবর্ণ থামল, মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি—দেখি কি করা যায়।

পচা বড়। তাই সে দূর থেকে, নিঃশব্দে জানাল তার দাবিকে।

একমুঠো ভাত। সোনাদানা নয়, হীরেজহরৎ নয়, রসগোল্লা সন্দেশ নয়, শুধু একমুঠো ভাত। সেই ভাত দিতেই রক্ত শুকিয়ে যায়, সেই ভাত জোগাড় করার প্রাণান্তকর প্রয়াসেই যৌবন পালিয়ে যায়, অকালবার্ধক্যের জীর্ণতায় দেহ মৃত্যুমুখী হয়।

দুপুর নাগাদ ফিরে এল মাধব।

বলল, নাও—চার টাকা বারো আনা পেয়েছি।

সুবর্ণ হাসল, কোথায় পেলে? কে দিল?

মাধব অন্যদিকে মুখ ফেরাল, বলল, পরাণ, মুকুন্দ আর ভোলা।

সুবর্ণ স্বামীর দিকে তাকাল। চোখ মুখ বসে গেছে মাধবের, লাল চোখ তার আরো লাল হয়েছে। মাথার উপরে ভাদ্রের সূর্য—তার প্রখর আলোতে পুড়ে, ঝলসে বাড়ি ফিরেছে মাধব।

ইস্‌, ঘেমে নেয়ে উঠেছ দেখছি। জিরোও, মাথা ধোও—

মাধব মাথা নাড়ল, না। চান করব।

জ্বর ছিল যে!

এখন নেই—জ্বর ঘাম হয়ে পালিয়েছে।

কর তাহলে চান—

তাই করল মাধব। পিছনের পুকুরটা বর্ষার জলে ভরে গেছে—তাতেই একটা ডুব দিয়ে এল সে। আঃ। দেহটা ঠাণ্ডা হল। এমনি ঠাণ্ডা যদি মাথাব ভিতরটা হত! বুকের ভিতরটা হত! ভগবান—শুধু সে জানে, শুধু সে। ঐ চার টাকা বারো আনা যোগাড় করার জন্য সে আজ কী না করেছে! অনুনয়, বিনয়, কান্না, পা-ধরা। সব। ভগবান!

খাওয়ার পালা শেষ হয়। ভাত, পাটশাক সেদ্ধ আর নুন। অমৃত।

বাড়ির মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। ধীরে ধীরে।

পচা চুপ, কেষ্ট চুপ, এমন কি এক বছরের বাচ্চাটাও চুপ। কলকাতায় যাবে তারা। রূপকথার দেশ কলকাতা। সেখানে পেটভরে রোজ খেতে পাবে। আঃ!

মাধব তাড়া দেয়, গুছিয়ে ফেল—তাড়াতাড়ি। খাল পেরিয়ে এক কোশ হাঁটতে হবে যে—

স্বর্ণ গুছোয়, বলে, এই হল—।

দুপুর গড়িয়ে চলে। ভাদ্রের আকাশে চোখ-ঝলসানো সূর্য। অসহ্য গুমোট। নিঝুম গ্রাম। শুধু দূর থেকে এক-আধটা হাঁক, এক আধটা ছেলেমেয়ের চিৎকার। হাঁস আর মুরগী, কাক আর ঘুঘু'র ডাক। প্রতিদিনকার মত, আগেকার মতই সেই মায়াময় পরিবেশ। মনটা হুহু করে। এই পরিবেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। বহু পুরুষের এই গ্রাম ছেড়ে!

বেলা গড়িয়ে চলে।

মাধব তদারক করতে আসে, বলে, দেখি কি কি গোছালে? একি, এত কেন? তুমি কি গোটা বাড়িটাকে নিয়ে যাবে? তক্তাপোষ, বিছানা হাঁড়ি পাতিল স-ব?

স্বর্ণ লজ্জিতভাবে হাসে, কিন্তু সবই যে দরকারি—

মাধব মাথা নাড়ে, কিছু না, কিছু না। কাপড়চোপড়, বাচ্চাদের কাঁথা কয়েকটা, এক পোঁট্‌লায় আধসের চিঁড়ে, নুন, ভাঙা গেলাস, কড়াই আর পাটিটা—ব্যস্‌—

ব্যস্‌! স্বর্ণ ব্যথিতকণ্ঠে বলে।

হ্যাঁ—উত্তেজিত ও দ্রুতকণ্ঠে বলে, হ্যাঁ। আর কিছু না—আরে তোমার সংসার তো রইলই—আবার তিনমাস বাদে আসবে না?

আসব বৈকি।

ব্যস্‌, তবে গুছোও। যা বল্লাম ঠিক তাই। বাকি সব তালাবন্ধ করে রেখে যাব।

আচ্ছা।

মাধব বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। ভঙ্গি দেখে খ্যাপা বলে মনে হয় তাকে।

আবার নতুন করে গুছোতে শুরু করে স্বর্ণ। ছেলে দুটো সাহায্য করে। যা গুছিয়েছিল তা রেখে দেয় সে, মাধব যা বলেছে তাই নেয়। কিন্তু নিতে

গিয়ে সব কিছুর উপরই একবার হাত বুলোয় সে। চোখের সামনেটা তার বারবার ঝাপসা হয়ে ওঠে। আশ্চর্য, কলকাতায় যাবার কথায় তার একটুও আনন্দ হচ্ছে না। একটুও না। বুক ঠেলে শুধু কান্নাই আসতে চাইছে।

স্নান শেষ হয়ে যায়। বেলা পড়ে আসে। কোলের বাচ্চাটা দুধের জন্ম কাঁদে।

হঠাৎ এক সময়ে মাধব ফিরে আসে। তার হাতে একটা কাগজের ঠোঙায় আখসের চিঁড়ে। জলজলে চোখ মেলে চাপা গলায় সে প্রশ্ন করে, তৈরি হয়েছ বৌ? এঁ্যা?

সুবর্ণ কথা বলে না, নিঃশব্দে শুধু মাথা নেড়ে জানায়, হঁ্যা।

আর এক ঘণ্টা পরে, বুঝলে? আর এক ঘণ্টা পরে—

মাধবের গলায় যেন প্রচ্ছন্ন উল্লাস, তার দু'চোখে যেন আসন্ন মুক্তির ছায়া। অস্থির একটা উন্মাদনায় সে যেন কাঁপছে।

যাবার কিছুক্ষণ আগে এল পরেশের মা, মুকুন্দের বৌ। এল বুড়ো হরিদাস। চুপ করে বসে রইল তারা কিছুক্ষণ, দু'একটা কথা বলল। তারপর আবার সব চুপচাপ।

হরিদাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, ফোক্লা দাঁত মেলে হাসল, বলল, তুই তো তবু ভাগ্যিমান মাধব—

কেন জ্যাঠা?

তা নয়তো কি? তোর মত আমাদের এক-আধটা মামাও যদি থাকত—কথাটা শেষ না করে বুড়ো নিঃশব্দে হাসতে লাগল, তারপর হঠাৎ কি ভেবে গম্ভীর হয়ে গেল। পরেশের মা চোখ মুছল, পচা-কেষ্টকে আদর করল, বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে মুকুন্দের বৌ চুমু খেল।

চেয়ে চেয়ে দেখল মাধব। নিঃশব্দে। গোপালপুরের এই অতি-পরিচিত পরিবেশ, গাছপালা, রাস্তার বাঁক, এই মানুষগুলো—সব কিছুর সঙ্গে জড়িত তার জীবন আজ এতদিনে পৃথক হতে চলেছে। এতদিনে। অথচ সে কি তা চেয়েছিল?

সে বলল, ঘরদোর একটু দেখো জ্যাঠা, বুঝলে?

হরিদাস মাথা নাড়ল, দেখব বইকি—নিশ্চয় দেখব বাবা—

এবার আমরা এগোই তবে?

আয় বাবা—আয়—দুর্গা শ্রীহরি—

রওনা হল ওরা। আগে মাধব। পিছনে পচা ও কেষ্ট। তারা তিনজনে বইছে পোঁটলাগুলোকে। বড় দুটো মাধব, ছোটগুলো ছেলেরা। সবার পিছনে স্বর্ণ, তার কোলে বাচ্চাটা। দু'পাশে আম-জাম আর বাঁশের ঝোপ। হাওয়ায় শব্দ উঠছে বাঁশঝোপ থেকে। যেন মিহিসুরে কেউ কাঁদছে। অনেক দূরে কাক-শালিকেরা ডাকছে। অপরাহ্নের মলিন আলোতে কেমন যেন বিয়োগান্ত মনে হয় ব্যাপারটা। কোথায় যাচ্ছে তারা? কেন? কেন এই ভয়? মানুষ কি মানুষের কেউ নয়?

পিছনে পড়ে রইল সব কিছু, সবাই। পরেশের মা, মুকুন্দের বৌ, বুড়ো হরিদাস আর বাড়িটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। পায়েচলা পথটা একটা সাদা অজগরের মত এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে।

পচা ডাকল, বাবা—

উঁ?

মা পেছিয়ে পড়েছে।

মাধব তাকাল পিছন ফিরে।

স্বর্ণ প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে। থমকে দাঁড়িয়েছে সে, দূরে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছে।

তোমার আবার কি হল গো? টেরেন ফেল করবে নাকি?

স্বর্ণ চমকে ঘুরে দাঁড়াল, অপরাধীর মত একটু হেসে দ্রুত কাছে এগিয়ে এল।

মাধবের চোখ মুখ কেমন যেন হয়ে উঠল। কেন যেন তার চোখে একটা হিংস্রতার ছায়া ঘনাল, কর্কশকণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, কি দেখছিলে বৌ? বাড়ি? মাধব হেসে উঠল। অস্বাভাবিক সেই হাসি। হাসতে হাসতে সে আবার বলল, মিছে মায়া করছ। যা ফেলে এসেছ তার জন্য ভেব না, পেছনের দিকে না তাকানোই ভালো।

স্বর্ণ স্বামীর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চোখের জল মুছল। মাধবের হাসি বন্ধ হয়ে গেল; সেই চোখের জল দেখে কিন্তু তার চোখের হিংস্রতা একটুও কমল না।

আবার চলতে লাগল তারা। গ্রামটা পিছনে সরে গেল। খালটাকে দূরে দেখা গেল। খালের ওপারকার গাছপালার মাথায় অস্তোন্মুখ শরৎ-কালীন সূর্যের সোনামাখা আলো। কতবার দেখেছে তারা। পুরনো, তবু

যেন নতুন বনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে বিস্ময়কর। আর পাখিরা। কতরকমের কত বর্ণের, কত বিচিত্র তাদের ডাক।

ওগো—

কি?

চালটা মেরামত করে রওনা দিলে পারতে—

হুঁ।

আচ্ছা, জিনিসপত্তরগুলো যদি চুরি যায়—কেউ যদি তালাটি ভেঙে ফেলে—

হুঁ—

সুবর্ণ অবাক হয়ে তাকালি মাধবের দিকে, কি হল তোমার? জবাব দিচ্ছ না যে?

মাধব ঘুরে দাঁড়াল, ভুরু কুঁচকে তিক্তকণ্ঠে বলল, কিছু হয়নি আমার—কিছু না। আর কি জবাব দেব তোকে? কিই-বা আছে জবাব দেবার?

বাঃ। তুমি…

হ্যাঁ আমি—ঠিক বলছি। আছে তো ঘোড়ার ডিম, তার আবার ভাবনা। বলি বকবক করবি না তাড়াতাড়ি এগোবি?—মাধব গর্জাল।

হন্‌হন্‌ করে চলতে আরম্ভ করল সে। সুবর্ণ আর কথা বলল না। পচা আর কেষ্ট সভয়ে সন্তর্পণে অনুসরণ করল বাপকে, শুধু পিছন ফিরে একবার মাকেও তারা দ্রুত পা চালাতে বলল।

ঘাট এল।

ফেরি নৌকোর মাঝি মাধবকে চেনে, একগাল হেসে সে প্রশ্ন করল, কোথায় চল্‌লা হে? আণ্ডাবাচ্চা সব নিয়ে?

গম্ভীরমুখে মাথা ঝাঁকিয়ে মাধব বলল, কলকেতা শহরে—আমার মামা থাকে সেখানে।

হাঁ? তা ভালই করলা। ইদিকে তো এখন বাঁচাই দায়—

মাধব জবাব দিল না। নিঃশব্দে নৌকোয় চড়ল তারা।

মাঝি লগি ঠেলে বিড়বিড় করে বলে চলল, হাঁ, বাঁচাই দায়—শালার দিনরাত শুধু পানি আর পানি—ক্ষিতি রসাতলে যাবে—হাঁ—

তবু জবাব দিল না মাধব। বুনো ঘোড়ার মত ঘাড় বেঁকিয়ে সে জলের দিকে তাকিয়ে রইল। জলের উপর তার ছায়া। সেই ছায়ার উপর যেন

অনেক ছবি। পুরনো দিনের। শুধু দুঃখ, শুধু বেদনা, শুধু অভাবের ছবি। উঃ! মাথাটা টিপটিপ করছে তার, ধরেছে, মৃদু একটা বেদনায় রগের শিরাগুলো লাফাচ্ছে। জ্বর আসছে। দেহের ভিতরে কোথায় যেন একটা উনুন আছে, সেখানে বসে কে যেন আগুন ধরাচ্ছে। সেই আগুনের আঁচে একটা ধাতব পাত্রের মত ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে তার দেহটা।

কোলের ছেলেটা কেঁদে উঠল। তাকে দুধ দিতে দিতে চারদিকে তাকাল স্বর্ণ। তাদের গ্রাম গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই গ্রামে বারো বছর ধরে ঘর-করছে সে। একযুগ আগে পালকি চড়ে এসেছিল। সঙ্গে দুটো ঢোলের সঙ্গে সানাই ছিল। এই খালের ধার দিয়েই এসেছিল। এমনি ফেরি নৌকো চড়ে পার হয়েছিল এই খালটা। তারপর আরো তিনবার সে এই খালটা পার হয়েছে। মায়ের অসুখের খবর পেয়ে একবার, একবার নন্দনপুরে মেলা দেখার জন্য, আর একবার মেহেরপুরের জমিদার বাড়িতে কৃষ্ণযাত্রা শোনার জন্য। আবার আজ যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে সে? সত্যিই কি জীবনের আশ্বাস আছে কলকাতায়?

আবার গাছপালার তলা দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ।

পাখির ডাক ভেসে আসে।

ভেসে আসে বাঁশঝোপ থেকে ঝিঁঝিঁর কান্নার মত শব্দ।

হঠাৎ পোঁটলা দুটো নামিয়ে এক জায়গায় বসে পড়ল মাধব।

কি হল? কষ্ট হচ্ছে? স্বর্ণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

উঁহু, একটু জিরোই—চড়া গলায় বলল মাধব।

লোকটার মেজাজ চড়ে আছে। স্বর্ণ চুপ করে রইল। কেন হবে না? পুরুষ মানুষ, তাই বোঝা যাচ্ছে না, নইলে ওর কি কম কষ্ট হচ্ছে? বাড়িঘর ছেড়ে আসতে কি কারো ভালো লাগে?

পচা আস্তে আস্তে বলল, আমরাও একটু জিরই মা—এ্যাঁ?

স্বর্ণ মাথা নেড়ে নিজেও বসল। ভালই হল, একটু জিরিয়েই নেওয়া যাক।

মাধব তাকাল তাদের দিকে। তার জ্বর বাড়ছে। ধীরে ধীরে। জোয়ারের জলের মত। মাথায় বেদনা, দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অবসন্নতা, কণ্ঠে তৃষ্ণা। অপরিচিতের দৃষ্টি মেলে সে বারবার সবার দিকে তাকাতে

লাগল। পচা আর কেষ্ট বড় বড় চোখ মেলে সভয়ে বাপকে লক্ষ্য করতে লাগল, সুবর্ণ মাথা নিচু করে আকাশপাতাল ভাবতে লাগল।

হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠল মাধব, পোটলা দুটোকে তুলে নিয়ে সে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, বলি আর কতক্ষণ জিরোবি তোরা? এঁ্যা? ওঠ্, ওঠ্ বলছি—

ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল সবাই, মাধবের পেছু নিল।

আবার সেই আঁকাবাঁকা পথ।

সোনামাখা সূর্যের আলো ক্রমে লাল হয়ে এল, ফিকে হয়ে এল, কালো হয়ে এল, তারপর সূর্য অস্ত গেল। আকাশের বুকে রাতের অন্ধকার নিয়ে বাদুড়েরা উড়ে এল।

স্টেশনে পৌঁছোতে পৌঁছোতে অন্ধকার হয়ে গেল সব।

ছোট্ট, গ্রাম্য স্টেশনটা। বাইরে টিম্‌টিম্ করে জ্বলছে দুটো ল্যাম্প-পোস্টের আলো। ল্যাম্পের কাচের গায়ে লেখা—হাঁসখালি। স্টেশন মাস্টারের ঘরে দুটো রেলওয়ে লণ্ঠন। ঘরের একদিকে টিকিটের জানালা। স্টেশন মাস্টারের সহকারী টিকিটের আলমারির কাছে বসে বিড়ি টানছে। বুড়ো স্টেশনমাস্টার চশমা পরে কি যেন লিখছে ঝুঁকে পড়ে। বাইরে দুটো কুলি। তাদের মধ্যে একজন মোটা চামড়ার নাগ্‌রা জুতো পায়ে দূরবর্তী সিগ্‌ন্যালটার দিকে মস্‌মস্ করে চলে গেল।

ইতিমধ্যেই কয়েকজন যাত্রী জড় হয়েছে। মেয়েপুরুষ মিলিয়ে জন দশেক। তাদের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। নতুন একজন এসেই টিকিট কাটতে গেল।

কোথায়?

কলকাতা—একটা—

টাকাপয়সার ঝনৎকার।

মাধব বলল, তোরা এখেনে বোস, আমি টিকিট কাটিগে—

এগিয়ে গেল সে।

পচা বাপের অনুসরণ করতে গেল।

সুবর্ণ পেছু ডাকল, কোথায় যাচ্ছিস্ রে পচা?

পচা হাসল, দেখিগে, ক্যামন করে টিকিট দেয়—এঁ্যা?

—না, সুবর্ণ মাথা নাড়ল, বাসনি। তোর বাপের মেজাজটা আজ খারাপ—

কেষ্ট সায় দিল, ভীরুকণ্ঠে বলল, হ্যাঁ রে দাদা, বাসনি—

পচা ফিরে এল।

নিঃশব্দে বসে রইল সবাই।

কোলের বাচ্চাটা দেহের উত্তপ্ত আশ্রয়ে নিঃসাড় হয়ে আছে।

মাধব ফিরে এল, ঝুপ করে বসে পড়ল একপাশে। কাশতে লাগল। খুকখুক কাশি।

সুবর্ণ তাকাল, মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, টিকিট কাটলে?

কাশি থামলে মাধব কটমট করে বৌয়ের দিকে তাকাল, বলল, টিকিট কাটব না তো মাগ্না যাব নাকি?

না, তাই শুধোচ্ছি।

থাক্, অত শুধিয়ে দরকার নেই।

আচ্ছা বাপু, আমায় মাপ কর। কিন্তু দোহাই তোমার, রাগ কর না তুমি।

থাক্ থাক্ মাগী! তারি তো—বিড়বিড় করে মাধব মুখটা ফিরিয়ে নিল।

সুবর্ণ ভাবতে লাগল। কি হয়েছে লোকটার? এমন তেড়ে তেড়ে বেঁকিয়ে উঠছে কেন? দুঃখ? কিন্তু তার কি দুঃখ হচ্ছে না? বাড়ি ছেড়ে অকূলে তরী ভাসাতে কি সুবর্ণের বুকটাও ফেটে যাচ্ছে না? থাকগে, যা ইচ্ছে বকুকগে। চিন্তায়, ভাবনায়, অসুখেই মানুষটা অমন হয়েছে। আহা—

ঢং—ঢং-ং-ং-ং-ং-ং—

ঘণ্টা বাজল।

ট্রেন আসার সময় হয়ে এসেছে।

মাধব যেন চমকে উঠল। তার স্বপ্নগ্রস্ত চেতনা যেন হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল। ফিরে তাকাল সে। বাইরে একটা ল্যাম্পের আলো এসে সুবর্ণদের আলোকিত করেছে। সবাইকে দেখল সে। সাতাশ-আটাশ বছরের সুবর্ণ। কোথায় তার সেই ঢলঢল যৌবন? উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ তার কালো হয়ে গেছে, রোগা হয়ে গেছে সে। পরণে একটা ছেঁড়া শাড়ি। কি ছিল আর কী হয়েছে সুবর্ণ! শুধু তার চোখ দুটিতে এখনো যৌবনের রহস্য আছে, আছে কামনার ক্ষীণ আলো। পচা আর কেষ্ট ঝিকমিক করছে।

মাংসহীন, অকালপক্ক চেহারা তাদের। হাফপ্যান্ট আর ছেঁড়া হাফসার্ট পরনে। ভয়ে আর অসুস্থতায় বড় বড় দুটো চোখ মেলে তারা নিঃশব্দে তাকে দেখছে। আর এক বছরের চ্যাংড়াটা? যেন চামচিকের বাচ্চা। তাদের আশা নেই, সুখ নেই, স্বপ্ন নেই। তাদের শুধু একটি দীন প্রার্থনা—বাঁচতে দাও। কিন্তু বড়যন্ত্র চলছে। মানুষের প্রাণ নিয়ে কারা যেন জুয়ো খেলছে। অনাহার, দারিদ্র্য আর মৃত্যুর চাল দিয়ে কারা যেন বাজিমাৎ করে চলেছে। সুবর্ণ, পচা, কেষ্ট, বাচ্চাটা—তাদের সবার সঙ্গে মিশে আছে মাধব, সবাই তার সঙ্গে মিশে আছে, তাদের সবাইকে নিয়েই তার জীবন। তার হাসি, কান্না, ভালবাসা, আলিঙ্গন, চুম্বন, ঝগড়া, মারামারি, জীবন-সংগ্রাম তো তাদেরি জন্য। কিন্তু আজ—

কি ভেবে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল সে, উঠে দাঁড়াল, পায়চারি করতে শুরু করল। একটা অজ্ঞাত জ্বালায় সে যেন জ্বলতে লাগল, টলতে লাগল, ছটফট করতে লাগল। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে সে সবাইকে দেখতে লাগল। সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন একপাল অবোধ জন্তু রাখালের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন এক গুচ্ছ সূর্যমুখী সূর্যের দিকে মুখ তুলে আছে।

হঠাৎ শব্দ শোনা গেল। দূরে—

গুম্ গুম্ বক্ বক্—গুম্ গুম্ বক্ বক্—

একটা তীক্ষ্ণ বংশীধ্বনি।

মাধব চমকে উঠল, পশ্চিমের দিকে তাকাল। একটা দৈত্যের আগুনের চোখ ক্রমেই বড় হয়ে এগিয়ে আসছে। সেই শব্দটা বাড়ছে।

যাত্রীরা চঞ্চল হয়ে উঠল।

ওরে অর্জুন রে—অ'বাবা—

কুথায় গেলা গো—গাড়ি যে এল।

অন্ধকার রাত। পশ্চিম দিকের অন্ধকার চিরে একটা লৌহদানব ছুটে আসছে। তার অগ্নিচক্ষুর আলোতে রেললাইন দুটো একজোড়া অজগরের মত চক্‌চক্‌ করে উঠল। মাটি কাঁপল, বুক কাঁপল। গুম্ গুম্ গুম্—বক্ বক্ বক্।

পচা ডাকল, মা—ওঠ—

কেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠল, রেল এয়েছে মা—রেল—

কোলের বাচ্চাটা ট্রেণের শব্দে কেঁদে উঠল।

ট্রেণ এসে থামল।

মাধব তাকাল, চিৎকার করে বলল, সঙের মত দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? পোঁটলা হাতে নিয়ে চল্ দেখি শিগ্‌গির—

কোলাহল। ইঞ্জিনের একটানা কোঁস কোঁস শব্দ।

বুড়ো স্টেশনমাস্টার ঠুকঠুক করে গার্ডের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল মাধব।

শিগ্‌গির আয় হারামজাদারা—ইদিকে আয়—

মাধবের পিছন পিছন দৌড়ল সবাই।

এ কাম্‌রা, সে কাম্‌রা। অবশেষে একটা কাম্‌রা।

পোঁটলাগুলোকে তুলে ফেলল মাধব, ছেলেদের ও বৌকে তুলে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল, বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যেন সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে দেখতে লাগল। তার মাথায় বেদনা, চোখের সামনে অন্ধকার। জ্বর। জ্বর বাড়ছে। দেহ ছাপিয়ে সেই জ্বর যেন তার রক্ত, মেদ, মজ্জা, অস্থি আর বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করছে! যন্ত্রণা। তার পায়ের নিচে সব কিছু যেন দুলছে। সে তাকাল। সুবর্ণ, পচা, কেষ্ট আর বাচ্চা। তার জীবনের টুকরো এক একটা। তাদের সামনে অন্ধকার।

হঠাৎ গার্ডের হুইস্‌ল্ শোনা গেল। শোনা গেল যাত্রীদের ব্যস্ত কথাবার্তা। স্টেশনের ঘণ্টা বাজল। ইঞ্জিনের বাঁশি বাজল, ট্রেনটা দুলে উঠল, ক্যাঁচ্ কোঁচ্ শব্দে চাকা ঘুরল, মাটি কাঁপল।

মাধবও কেঁপে উঠল। সুবর্ণ, পচা, কেষ্ট আর বাচ্চাটা। তার প্রাণের সঙ্গে জড়িত চারটি প্রাণ। সে তাদের পৃথিবী, সে তাদের সূর্য। তাদের অসহায় মুখ, ভীরু চাউনি। তারা দুর্বল, অক্ষম, ভীরু। নিষ্ঠুর পৃথিবীর কূটবুদ্ধির কাছে পরাজিত, অবনত। কোথায় যাচ্ছে তারা? এই সব ম্লানমুখ মূকেরা তো বেশি কিছু চায় না। শুধু চায় বাঁচতে, কোনমতে বাঁচতে আর ভালবাসতে।

ঝক্—। ঝক্—। ট্রেনটা অতি মন্থরগতিতে চলতে শুরু করল।

হঠাৎ কি যেন হল মাধবের। মুহূর্তে মুখে-চোখে তার ক্ষিপ্রতা নেমে এল, পোঁটলাগুলোকে সে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল প্ল্যাটফর্মের উপর।

সুবর্ণ চেঁচাল, বাঃ! কি—কি করছ তুমি?

কোন কথা কানে গেল না মাধবের, হিড় হিড় করে পচা আর কেষ্টকে সে নিচে নামিয়ে দিল। চিৎকার করে সে বলল, নেমে পড়্ বৌ—নেমে পড়্—নেমে পড়্ বলছি—

সময় নেই। মুহূর্তে সব ঘটল। বাচ্চা সমেত সুবর্ণকেও প্রায় শূন্যে তুলে নামিয়ে দিল মাধব, তারপর নিজেও নামল।

পচা আর কেষ্ট ভয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল, মা বাপকে নামতে দেখে তারা এবার পোঁটলা গুলো টেনে জড় করতে লাগল।

জয়। জয় যেন বাড়ছে। সব কিছু যেন কাঁপছে চারদিকে।

ট্রেনটা চলছে। ঝক্ ঝক্—ঝক্ ঝক্—ক্রমেই গতিবেগ বাড়ছে তার। রাতের আকাশ কাঁপিয়ে ট্রেনের বাঁশিটা আরো দু'বার বাজল, অন্ধকারেও একরাশ ধোঁয়া আর স্ফুলিঙ্গকে দেখা গেল। ঝক্ ঝক্, ঝক্ ঝক্—ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্—

বিস্ময়ের ঘোরটা একটু কমতেই সুবর্ণ জিজ্ঞেস করল, কি হল? নামলে যে?

মাধব কাঁপছে তখনো, লাল টকটকে চোখ দুটো মেলে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, হ্যাঁ। নাবলাম। যাব না কলকেতা।

কিন্তু কেন?

ঝকঝকে দাঁত মেলে মাধব হিংস্রভাবে বলল, নেই—কলকাতায় কেউ নেই।

মামা?

কেউ নেই—সব মিছে কথা—

সুবর্ণের চোখ বড় হয়ে উঠল, তাহলে? কেন যাচ্ছিলে? কোথায় যাচ্ছিলে?

সুবর্ণের দিকে তাকাল মাধব। দু'চোখ ছোট করে টেনে টেনে বলল, চুলোয় যাচ্ছিলাম বৌ, চুলোয়। ভেবেছিলাম ট্রেন চলবে, তারপরে মাঝরাতে তোরা যখন ঢুলতে থাকবি তখন চুপচাপ কোন ইস্টিশানে নেমে যাব—

কি বলছ তুমি! সুবর্ণ যেন পাথর হয়ে গেল।

মাধব পাগলের মত হাসল, মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, আমার মাথার ঠিক নেই, আমি আর মানুষ নেই বৌ। কেন থাকব? কি করে থাকব? পঞ্চাশ টাকা

মণ চালের দর হলে কি মানুষ মানুষ থাকে, পিথিমী পিথিমী থাকে ? তখন এমনি হয় বৌ, নিজের মাংস নিজে খায় মানুষ, মাগ-ছেলেকে পর পর লাগে তখন—আর—আর—

যেন দম ফুরিয়ে আসছে মাধবের। সে থামল, বসে পড়ল, হাঁ করে করে বাতাস টানতে লাগল। সমস্ত চৈতন্যকে ডুবিয়ে দিয়ে একটা বিচিত্র উত্তপ্ত অনুভূতি। জরোত্তপ্ত দেহের পেশীতে একটা উন্মত্ত আক্রোশ। দাঁত আর নখের ডগায় একটা উদগ্র কামনা। সব পুড়িয়ে ছাই করতে ইচ্ছে হয়, ভেঙে চুরমার করতে ইচ্ছে হয়। সব কিছু পুড়ে যাচ্ছে, ছাই হয়ে যাচ্ছে। মাধব চোখ বুজল। পচা আর কেষ্ট সভয়ে কাছে এসে দাঁড়াল, বাচ্চাটা কেঁদে উঠল।

সুবর্ণের চোখ জ্বলে উঠল, কাছে এসে মাধবের একখানা হাত চেপে ধরে সে কান্নায় বিকৃত কণ্ঠে গর্জে উঠল, আমাদের ভাসিয়ে দিতে চাইছিলে তুমি! পালাতে চাইছিলে! তুমি এমন সব্বনাশা লোক! বটে! বটে!

সুবর্ণের মাংসহীন হাতটা যেন একটা লোহার সাঁড়াশির মত মাধবের মণিবন্ধ চেপে ধরল, মাংস কেটে তা যেন মাধবের হাড়ে গিয়ে পৌঁছোতে চাইল। চোখ মেলে স্ত্রীর দিকে তাকাল সে, জরাচ্ছন্ন আরক্ত দৃষ্টি মেলে সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, হ্যাঁ, আরো জোরে হাতটা চেপে ধর্ বৌ, ছাড়িস্ না—যদি মরতে হয় তো একসঙ্গেই মরব, মানুষের মত মরব—।

বাইচ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দুখানা চলেছিল পাশাপাশি; তীরের বেগে এগিয়ে যাচ্ছিল। জলটা যেন বাতাসের মতো লঘু হয়ে গেছে। জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়েও আজ বাইচের নৌকোগুলো তাদের পিছনে ফেলে যেতে পারে।

নদীর দুধারে কাতারে কাতারে লোক। বিজলী বাতির আলোয় ঝলমল করছে জল। পটকা ফুটছে। আগুনের আঁকাবাঁকা রেখা এসে আকাশে উঠছে হাউই, ফেটে পড়ছে একরাশ জলন্ত ফুল ছড়িয়ে। এপারে মেলা বসেছে, মানুষের হট্টগোল উঠছে তাল-মাপা দাঁড়ের আওয়াজকে চাপা দিয়ে।

এমন আনন্দের দিন কখনো আর আসেনি। আগে যখন দুর্গা পুজো হত—হত সরস্বতীর ভাসান, তখনো আশেপাশের গাঁ থেকে বাইচের নৌকো নিযে আসত মানুষ, বকশিস পেত বাবুদের কাছ থেকে। কিন্তু তার সঙ্গে এর তুলনা! সে ছিল ওদের উৎসব। কিন্তু আজকের দিন আমাদের। আমার, তোমার, সকলের। এ হল আজাদীর দিন—মুক্তির দিন। আজকের নদীর এই খোলা জলের দিকে তাকাও, আর কারো নৌকো বুক ফুলিয়ে এর উপর দিয়ে ভেসে যাবে না; প্রাণ ভরে টেনে নাও আজকের বাতাস—আর কারো নিঃশ্বাস একে আবিল করে দেয়নি; মাথার উপর যত তারা দেখছ ওরা সব তোমার: এই দিনটিতে একান্তভাবে ওরা তোমারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

হালের মাঝি কয়েকবার সজোরে পা ঠুকল নৌকোর গলুইয়ে। ডুমডুম করে দ্বিগুণ বেজে উঠল ডঙ্কার আওয়াজ। দোলা খেয়ে গেল রক্ত।

সাবাস্ জোয়ান, হেঁইয়ো—

আগ্ বাড়ো ভাই, আগ্ বাড়ো—

পাশাপাশি দুখানা নৌকো। প্রতিযোগিতা চলছে এদেরই মধ্যে। বাকি যারা পিছিয়ে পড়েছে, তারা আর ধরতে পারবে না। সুতরাং জীবন-মরণ পণ চলছে এই দুখানার ভিতর।

বাইশ বাইশ করে চুয়াল্লিশ খানা দাঁড় দুই নৌকোয়। প্রত্যেকটি খেপের সঙ্গে প্রতি মাল্লার বাহু থেকে বুক পর্যন্ত পেশীতে পেশীতে ঢেউ খেলছে। ক্লান্তি নয়, অবসাদ নয়। হাতের শিরাগুলো ঢিলে হয়ে আসতে চাইলেই হালের মাঝি গলুইয়ে পা ঠুকে চেঁচিয়ে উঠছে বিকট গলায়। ডঙ্কার শব্দে কেটে যাচ্ছে ঘোর। : আগ্ বাড়ো ভাই, আগ্ বাড়ো—

সামনের ওই বাঁক ঘুরে এক পাক। আরো এক পাক তারপরে। তারও পরে ওই বাঁধা ঘাটে ভিড়তে পারলেই জিত। ইনাম, বক্‌শিস।

সমানে দুখানা চলছে গায়ে গায়ে। কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যেতে পারছে না। সমানে সমানে!

এই, তোমার হৈল কী? গাঙ খাইয়া টান মারো নাকি?

গলুইয়ের মাঝি এ নৌকোর তিন নম্বর দাঁড়ের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল।

তিন নম্বর ভাসা ভাসা চোখে তাকাল। কপালে টলটলে ঘাম। বাহু দুটো যেন ছিঁড়ে পড়ছে তার। পিছন থেকে কেউ যেন একটা আসুরিক চাপ দিয়ে তার পিঠ পাঁজর ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে।

ওই বাঁকের পর আরো এক পাক! তারও পরে ওই বাঁধাঘাট! তিন নম্বরের সমস্ত চিন্তাগুলো গুলিয়ে যাচ্ছে একাকার হয়ে। সব ঝাপসা সব অস্পষ্ট। কোন অর্থ নেই চারপাশের ওই আকাশ-ফাটান চীৎ-কারের; আলোগুলো সব লেপটে যাচ্ছে একসঙ্গে; উড়ন্ত হাউইয়ের জ্বালা চোখের মণিতে এসে বিঁধছে একরাশ কাঁটার মত।

তবু প্রাণপণে সে দাঁড়ে টান মারল। টান মারল যন্ত্রের মত। জিততেই হবে যেমন করে হোক। বক্‌শিস মিলবে, ইনাম মিলবে। আর মিলবে খাবার। তা ছাড়া শহরে কোথায় যেন বিনা পয়সায় খেতে দিচ্ছে আজ। আনন্দের দিন। বাজি পুড়ছে, হাউই উড়ছে। আলগা হয়ে গেছে বড়লোকদের শক্ত মুঠো; দরাজ হয়ে গেছে দিল।

ডুম্-ডুম্-ডুম্

ডঙ্কার আওয়াজ। আরো জোরে টান মার জোয়ান—আরো জোরে।

পাশাপাশি চলেছে দুখানা। প্রতিযোগিতা চলেছে সমানে সমানে। জিততেই হবে। দুধার থেকে চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে অগুন্তি লোক।

আগ বাড়ো, আগ বাড়ো—

এরই মধ্যে এক ফাঁকে বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে ফেলল তিন নম্বর।

চারিদিকে আলো, উৎসবের সমারোহ। এত তারা, এত বাতাস সব তোমার। খোদা মেহেরবান। কিন্তু ওই গ্রামে তো একথা মনে হয় না কখনো।

সেখানে এখন বাঁশ-ঝাড়ের উপর রাত নামল। রাত—মহিষের পচা চামড়ার মত দুর্গন্ধে ভরা কালো রাত। খালের জল জাগ-দেওয়া পাটের গন্ধে আবিল। বাতাসে মশার গুঞ্জন। ভাগাড়ের হাড় নিয়ে টানাটানি করতে করতে তারার ছাওয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মড়া কান্না কেঁদে উঠছে কুকুর।

নারকেল বনের ছায়ার পিছনে তিন নম্বরের ঘর। পচে কালো হয়ে যাওয়া শনের ছাউনির ভিতর দিয়ে অজস্র জল পড়েছে এবারের বর্ষায়। টুপটুপ করে ঘরের ভিতর পড়েছে সাদা সাদা এক রকম শুঁয়ো পোকা, পচা শনের মধ্যে ওরা জন্মায়। বাঁশের খুঁটিগুলো একেবারে ফোঁপরা, ফুটো দিয়ে কাঁচপোকা উড়ে যায়। খুঁটির গায়ে কান পাতলে শোনা যায় ঘুর ঘুর করে পোকার ডাক।

এবারের ধান পেলে হয়তো সুরাহা হবে কিছু। খড়ও মিলবে দু-চার কাহন। কিন্তু তারপর?

ছটো মাস—বড় জোর দুটো মাস। গত বছর পর্যন্ত গরুটা ছিল, দুধোল গাই। ধার করে খড় খাওয়াতে হয়েছে। এবার আর গরুটা নেই কিন্তু ধার রয়ে গেছে। ওই খড় সে ধার শোধ করতেই যাবে। যা বাকি থাকবে তাতে আর চাল ছাওয়া চলবে না।

দুটো মাস চলবে ধানে—ধার শোধ করে ওর পরে আর কিছু থাকবে না। তারপর আবার যে কে সেই। মাইন্দার খাটতে হবে—ধার করতে হবে, জঙ্গলে জঙ্গলে খুঁজতে হবে ভিত্, পোয়োল আর বুনো-কচুর মুখী।

খালের কাদাভরা জলে নেমে খোড়লে খোড়লে হাত পুরে দিয়ে খুঁজতে হবে শোল আর বান মাছ—ঢোঁড়া সাপের কামড় উপেক্ষা করেই।

এত আলো এখানে—এত লোক! তবু কী অদ্ভুতভাবে খাঁ খাঁ করে গ্রাম। মনে হয়: মানুষ নেই কোথাও—সব ছায়া হয়ে লুকিয়ে গেছে বাঁশবনে—হারিয়ে গেছে নারকেল গাছের অন্ধকারে। ওদের ছাড়া-ভিটে-গুলোতে আগে পাল-পার্বণে তবু কিছু লোকজন আসত, গ্যাসের লম্বা লম্বা নলে আলো জলত, পুজো হত, কলের গান বাজত। কিন্তু এখন এক কোমর জঙ্গল গজিয়েছে সে সব জায়গায়। শেয়াল ঘোরে, ভিটের কোণে কোণে গজিয়ে ওঠা থানকুনি পাতার বনে কুণ্ডলি পাকায় চন্দ্রবোড়া। সকাল-সন্ধ্যে-মাঝরাত্তির—যখন তখন আঁত্‌কে আঁত্‌কে ডেকে ওঠে তক্ষক।

মরুক গে। যারা গেছে তারা যাক। কিন্তু যারা আছে?

মাতব্বরেরা মুখে হাত চাপা দেন। শাসায় কেউ কেউ। দারোগা যখন আসেন—তখন আর একবার মনে করিয়ে দিয়ে যান—সব ঠিক হয়ে যাবে, দুদিন সবুর করুন। বড় বড় সাহেবেরা কখনো কখনো পাশের গঞ্জে এসে সভা করেন: হবে, হবে—সব হবে—

মুহূর্তের ভাবনার মধ্যে এতগুলো কথা ভেসে গেল। উড়ে গেল বাইচের নৌকোর মত।

ডঙ্কার শব্দ। চিৎকার। হালের মাঝির ভৎর্সনা।

কোন্‌হান থিকা এইভাবে আনল রে? সমানে ঝিমাইতে আছে। টানো টানো—

তিন নম্বর আবার চোখের দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ মেলে ধরতে চাইল। তাকেই বলছে। বলবেই তো। সে তো নিজেও জানে দাঁড়ের প্রত্যেকটি টানের সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের শিরাগুলো ছিঁড়ে যাবার উপক্রম করছে। সে তো বুঝতে পারছে তার পিঠের উপর যেন একটা তিন্‌মণী বোঝার চাপ—সমস্ত হাড় পাঁজরা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তার।

সাগু খাও—সাগু খাও নাকি?

আবার ধিক্কার। কিন্তু সাগু! নিজের অজ্ঞাতেই এক টুকরো হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণায়। আজ পাঁচ বছরের ভিতরে সাগুদানা চোখে দেখেছে নাকি তিন নম্বর? শুনেছে শহরে নাকি পাওয়া যায়—আট টাকা করে সের!

সাবাস জোয়ান, হেঁইয়ো—

পাশাপাশি চলছে দুখানা। সমানে সমানে। এক ঝাঁকি দিয়ে ওদের গলুই দু'হাত এগিয়ে যায়, ওরা আর এক দমকে তিন হাত বেরিয়ে যায়। টানো টানো—প্রাণপণে টানো। ইনাম, বক্‌শিস্—খাবার। দু'ধারের লোকগুলো আরো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে—আরো একাকার হয়ে যাচ্ছে আলোগুলো। হাওয়ার উদ্দাম গতি ছুরির ধারের মতো কাটছে চোখ দুটো। অর্থহীন শব্দের গর্জন কানের মধ্যে ভেঙে পড়ছে জোয়ারের জলের মত।

বাঁক আর দূরে নেই। এলাম বলে। তারপরে আর এক পাক। আরো এক পাক। ওরা সমানে সঙ্গে চলছে। আশ্চর্যভাবে শক্তির সমতা ঘটে গেছে একটা।

কিন্তু—

গরুটা। দুধোল্ গাই। কালচে বাদামী রং—শুধু মাথার উপরে শিংয়ের তলায় খানিকটা শাদা। নাম ছিল চাঁদ-কপালী।

থাকবার মত ওটাই ছিল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ভাঙা কপালে আর সইল না চাঁদ-কপালী। মাত্র ত্রিশটা টাকার জন্যে বেচে দিতে হল।

তিন সের দুধ দিত দুবেলায়। ঘন মিষ্টি দুধ—পাত্রের উপর ধরলে আঠার মত লেগে থাকত। সেই গরু বিক্রি করতে হল। যেতে চায়নি। শিং নেড়ে আপত্তি করেছিল প্রথমে—বসে পড়েছিল চার পা ভেঙে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একরকম হিঁচড়েই নিয়ে গেল লোকগুলো। যাবার আগে একবার গভীর কালো দৃষ্টি মেলে চেয়েছিল তিন নম্বরের মুখের দিকে। অবলা জীবের সে দৃষ্টি আজও সে ভুলতে পারেনি, মনে পড়লে এখনো কলজের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে।

যাক। সবই গেছে—ওটাও যাক। শুধু লুটিয়ে লুটিয়ে কেঁদেছিল মেয়েটা। এখনো ছেলেমানুষ, এখনো কাঁদে। কিন্তু—

তিন নম্বর কলের মত দাঁড় ফেলতে লাগল। রোগা মেয়েটা। পাশের বাড়ির মাতব্বরের বৌয়ের জিম্মায় রেখে এসেছে। দরদ আছে মাতব্বরের বৌয়ের—মেয়েটাকে একটু ভালোও বাসে। কিন্তু হাজার হলেও পর—পর। কতখানি সে করতে পারবে?

এত আলো—এত লোক—এত আনন্দ। সব ভুলে যেতে হয়। বাঁশবন

নয়—পোকা খাওয়া পচে যাওয়া চালের শন নয়—পাট-জাগানো খালের রাঙা জল থেকে নাড়িতে মোচড়-দেওয়া দুর্গন্ধ নয়; তারা-ছাওয়া আকাশের তলায় ভাগাড়ের হাড় নিয়ে কুকুরের মড়া-কান্নাও নয়। মেলা বসেছে। বাজনার শব্দ উঠছে। নানা রঙের পোশাকের ঝিলিক। বিজলী বাতির আলোয় ঝলমলে নদীর জল।

এ সব তোমার। আর কেউ নেই। অধিকার নেই আর কারো। বুক ভরে নিঃশ্বাস নাও। আনন্দে কানায় কানায় ভরে ওঠ। টান দাও বাইচের নৌকোর দাঁড়ে।

মেয়েটা! আট বছর বয়েস। ওই এক বন্ধন। ওটা হওয়ার এক বছর পরে আকালে ওর মা গেল—বড় ভাই দুটো গেল। ওকে বুকে করে শহরে এসে—এ ঘাটায় ও ঘাটায় ঘুরে কী করে যে বেঁচে রইল তিন নম্বর, তাই আশ্চর্য!

তারপর দিন বদলাল। শোনা যায় দুনিয়াও পালটাল। সব তোমার—আমার—সকলের। চারদিক থেকে তারই জয়ধ্বনি। কিন্তু—

আকালে মরল না, আজ যেন বাঁচবার রাস্তা কোথাও পাচ্ছে না! উৎসব—আনন্দ। ওদিকে সাতদিন জ্বরে ভোগবার পরে কাল দুটি ভাত পাবে মেয়েটা। অথচ কোথায় ভাত? পরশু পর্যন্ত পান্তা-ভাতের জল ছিল নিজের। আজ সকালে বিনা নুনে খেয়ে এসেছে সেদ্ধ কচুর গোড়া। এতক্ষণে—এতক্ষণে টের পেল তিন নম্বর। অসহ্য ক্ষুধা। তাই চোখে ঝাপসা দেখছে, ম্লান হয়ে আসছে আলোগুলো, কানের কাছে ঝিঁঝিঁর ডাক। হাতের শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে—ভেঙে যাচ্ছে পিঠের পাঁজর।

শাঁ—

বেগে একটা মোড় ঘুরল বাইচের নৌকো, ঘুরে গেল চক্রাকারে। আবার ফিরে যেতে হবে এই তিন মাইল পথ—ফিরতে হবে এখানে; তারপরে ওই বাঁধা ঘাটে। আনন্দের দিন—আমাদের দিন। দু'পার থেকে উৎসাহ দিচ্ছে লোকে—হাততালি দিচ্ছে। কিন্তু কিছুই কানে যাচ্ছে না যেন তিন নম্বরের। দাঁড় টানছে—টেনে যেতেই হবে। সেদ্ধ কচুর পোড়াগুলো কখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে পেটের মধ্যে। খাবার চাই—চাই চাল।

সাতদিন পরে ভাত খাবে মেয়েটা। শুকনো শীর্ণ মুখখানা ভাসছে চোখের সামনে। নিজের জন্যে সে আর ভাবে না—অনেককাল আগেই চুকিয়ে

দিয়েছে সে-সব। আকালে যাকে বুক দিয়ে বাঁচিয়েছিল—আজকের নতুন মাটিতে, নতুন হাওয়ায় তাকে সে কিছুতেই মরতে দেবে না।

আগ্ বাড়ো—আগ্ বাড়ো জোয়ান—

হালের মাঝি পা ঠুকছে অস্থিরভাবে। একবার ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল তিন নম্বর। মাথায় গামছা বাঁধা—বাবরি চুলগুলো উড়ছে হাওয়ায়। টকটকে লাল দুটো চোখ—যেন নেশা করেছে। খুন চেপেছে ওর মাথায়—আগুন ঝরছে দৃষ্টিতে।

সে ছাড়া আরো একুশ জন দাঁড় ফেলছে। দাঁড় ফেলছে তালে তালে। গায়ে চকচক করছে ঘাম। হাত থেকে বুক পর্যন্ত পেশী দুলছে টানে টানে। দাঁড়ের ঘায়ে ঘায়ে ছিঁড়ে-যাওয়া কচুরির গন্ধ ছাপিয়ে উঠছে মানুষের ঘামের গন্ধ।

না, কচু সেদ্ধ খেয়ে আজ সে বাইচ খেলতে আসত না। ফেলে আসত না মা-মরা অসুস্থ মেয়েটাকে। পিছন থেকে এখনো যেন কান্না আসছে: শহরে আমিও যামু—আমারে ফেইল্যা যাইয়ো না বা-জান···

অনেক দূর···অনেক দূর পর্যন্ত তার কানে ভেসে এসেছে সেই কান্নার শব্দ। নারকেল বন পেরিয়ে, বাঁশবন ছাড়িয়ে···একেবারে খালের ঘাট পর্যন্ত। অস্পষ্ট থেকে আরো অস্পষ্ট। তারপর মিলিয়ে গেছে। একেবারেই কি মিলিয়ে গেছে? না···না। তিন নম্বরের হাত অবশ হয়ে এল। দু-পারের সমস্ত হট্টগোল ছাপিয়ে এখনো কানের ভিতর বাজছে শীর্ণ গলার সেই টানা সুরের আর্তি: যাইয়ো না বা-জান, আমারে ফেইল্যা যাইয়ো না···

কিন্তু খাবার চাই—চাই চাল। শহরে উৎসব। বাইচের প্রতিযোগিতা। কত রঙ বে-রঙের পোশাকপরা মানুষ—খুশিতে আলো হয়ে-যাওয়া মুখ। দিনের সেরা দিন। ধনীর প্রাণ আজ দরাজ হয়ে গেছে। চাল বিতরণ হচ্ছে—খাবার বিতরণ হচ্ছে।

সে তো আজকের জন্য। একটা দিনের জন্য খিদে মিটল। তারপর কাল? পরশু? দিনের পর দিন? কোথায় আলো—কোথায় কে! শুধু পচা মোষের চামড়ার গন্ধ উঠবে অন্ধকারে—মড়কের আভাস তুলে কেঁদে কেঁদে বেড়াবে কুকুর। আকাল এসেছিল; একটা দমকা হাওয়ায় ঝরা পাতার মতো উড়িয়ে দিয়েছিল সব। কিন্তু এখন ঘুণ। বাঁশ কাটছে;

কাটছে দাওয়ার খুঁটি। সেই খুঁটির ওপর কান পাতলে ভিতরে ঘুর ঘুর করে তাদের ডাক শুনতে পাওয়া যায়!

আরো জোরে দাঁড়···আরো জোরে···

এতক্ষণে—এতক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকোটা একটু পিছিয়ে পড়েছে। সাবাস জোয়ান! জিতব আমরা; আমরাই নেব ইনাম-বক্‌শিস। সাবাস্!

কেউ কথা বলছে না। কথা বলবার সময় নেই কারো। দাঁতে দাঁত চেপে সমানে টেনে চলেছে। ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্—ঝপ্ ঝপাস্। নৌকোর তলা দিয়ে খড়্গের মতো ছুটে যাচ্ছে জল। ফেনা ফুটছে—ঝিকিয়ে উঠছে বিজলীর আলোয়।

এই হারামি সুমুন্দির হাত লড়ে না ক্যান? এই হালার লইগ্যাই আমরা হারুম!

রক্ত-ঝরা চোখে তার দিকে তাকাল হালের মাঝি। কটু গালটা বর্ষণ করল তিক্ততম ভাষায়।

তিন নম্বর পিঠ চাড়া দিয়ে উঠে বসল। হারামি! ইচ্ছে করল লোকটার গলা টিপে ধরে গাঙের মধ্যে ফেলে দেয়।

কিন্তু না···চাল চাই তার, চাই খাবার, চাই ইনাম। মেয়েটার কান্না কানে বাজছে: বা-জান···বা-জান! দু-পার থেকে হাততালি দিচ্ছে লোকে। জিততেই হবে···জিততেই হবে! অসুরের মতো দাঁড়ে একটা টান দিলে তিন নম্বর।

···বাহারে জোয়ান—এই তো চাই!

এমন দিন আর কী হয়? আমার···তোমার···সকলের! আজাদীর দিন! জেলার হাকিমের লঞ্চ থেকে হাত তুলে উৎসাহ দিলেন হাকিম স্বয়ং। চোখের উপর ছুরির ধার বুলিয়ে আর একটা হাউই উড়ল আকাশে।

আবার আপ্রাণ চেষ্টায় দাঁড়ে ঝাঁকি মারল তিন নম্বর।

কিন্তু কতক্ষণ আর জোর বইবে পান্তা-ভাতের জল···আলুনি কচু সেদ্ধ। চড়াৎ করে বুকের মধ্যে কী ছিঁড়ে গেল একরাশ—মুখ দিয়ে গলগল করে নামল নোনা রক্ত। তারপর মিলিয়ে গেল সব আলো···সমস্ত কোলাহল, এমন কি রোগা মেয়েটার কান্না পর্যন্ত। টুপ করে একটা পাকা ফলের মত নৌকো থেকে খসে পড়ল তিন নম্বর···মিলিয়ে গেল উৎসবের বিজলী-ঝলমলে জলের মধ্যে।

নিমাইয়ের দেশত্যাগ

সমরেশ বসু

এ যেন সেই বন্যার জলে ভেসে-যাওয়া খড়কুটোর মত। কোথায় ঠেকে, কোথায় পড়ে, হেজে পচে যায় তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

গাঁ ছেড়ে, ভিটে ছেড়ে সবাই যায়। নিমাইও যায়। থাকবে কার কাছে। জ্ঞান হয়ে শুনেছে মা মরে গেছে তার। বাপের কাছে মায়ের গল্প শুনত নিমাই। লোকে আবার তার বাপকে ভাল বলত না। বাপ নাকি তার মনিষ্যি নয়। ভিটে নেই, মাটি নেই। গোষ্ঠ কামারদের হাপর-ঘরের পাশে খড়ের ছাউনি দিয়ে নিমাইকে নিয়ে তার বাপ থাকত। বেতের ধামা, সাজি এ সব বুনত, গড়ত। সেই বেচেই দিন চালাত। তাও কি সে পয়সাতে বাপ-ব্যাটার দুজনার চলতে পারে? পারে না। সময়ে অসময়ে নিমাইকে তাই হাপরে কাজ করতে হত, কামারদের ফাই-ফরমায়েস খেটে ছোট্টবেলাটি থেকে পেটের ধান্দায় থাকতে হয়েছে নিমাইকে।

তারপরে সেই বাপই একদিন উধাও হল। দাঙ্গা-হাঙ্গামার দিন, কাটাকাটি খুনোখুনি, লুটপাট। কে কোথায় যায়, ঠিক নেই তার কিছু। বেজেরহাটির বাজার যেদিন লুট হয়ে গেল, নিমগাঁয়ের কাকপক্ষীও সেদিন পালাতে লাগল। বাপ তার পালিয়ে গেল। সবাই পালাচ্ছে। নিমাইকে ডেকেও কেউ জিজ্ঞেস করে না কিছু। যে ছেলেকে বাপই দুটো কথা বলল না, তাকে ডেকে কথা বলবে লোকে!

সবার আড়ালে গিয়ে নিমাই খুব খানিক কাঁদল, আর তার পায়ের কাছে বসে হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কামারবাড়ির কুকুর ভোলা। ওর-ও কেউ নেই যে!

কেউ আসাম, কেউ কুচবিহার, কেউ কইলকাত্তা।

কামাররা হাপর হাতুড়ি নিয়ে ঘর ছাড়ল। নিমাই আর ভোলা উঠোনে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বিদায় দিল। কিন্তু নিমাইকে খেতে দেবে কে? নিমর্দী আর তাদের দেশ নয়, দেশ নাকি কইলকাত্তা। ইস্, কইলকাত্তাই নিজের দেশ! কয় কি!

কামারবাড়ির বুড়ো কর্তা আর বুড়ি গিন্নি ঘর আগলে পড়ে রইল। নিমাই বাঁধল তার ছোট্ট পুঁটলি। জামা একখানা, পাঁচ হাত ধুতি একখানা, একটা লাল-নীল পেন্সিল, নিব, কয়েকটা শিশি, ভক্ত-প্রহ্লাদ বই, এমনি সব নানানখানা।

পুঁটলি বেঁধে তার উপর মুখ রেখে নিমাই কেঁদে উঠল। কোথায় যাবে সে! কইলকাত্তা! এ দেশ আর তাদের নয়। পুঁটলি বগলে বুড়ো কামারের কাছে এসে দাঁড়াল।—কর্তা, আমি যাইগা।

কর্তারও তো বড় সাধ নয় অমন করে দুধের শিশু গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু কোন উপায় তো নেই। দু'মুঠো ভাত আজ আর ঘরে নেই কর্তার। তা ছাড়া, ওই ছেলেকে যদি ডাকাতরা কেটেই ফেলে, তার জবাবদিহি করবে কে? এ দেশকে যে আর বিশ্বাস করা যায় না। জিজ্ঞেস করল: কই যাইবা গো?

কইলকাত্তা।

কইলকাত্তা? খাইবা কি বাসী সেই শহরে বিদ্যাশে?

এত লোক যায়, খায় কি?

হঠাৎ কিছু জবাব দিতে পারল না কর্তা। সত্যি, এত লোক যায়, খায় কি? আর সে দেশ সম্পর্কে বুড়ো কিছু জানেও না। নিজের মহকুমাটি ছেড়ে তো সে তার জীবনে কোথাও বেরোয়নি। বলল: তবে আস গিয়া।

বলতে বলতে বুড়ো কর্তার চোখে জল এল। মা-মরা, হতভাগা বাপের ছেলেটা যে তারই ভিটেয় থেকে এতবড়টি হয়েছে। দেশের মাটি যাকে রাখল না, তার কি ক্ষমতা আছে নিমাইকে রাখে।

সবাই ছাড়ে, ভোলা তো ছাড়ে না নিমাইকে। পথ আগলে দাঁড়ায় আর লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে কোলের উপর। শেষটায় ভোলার গলা জড়িয়ে ধরে নিমাই বলল: মিছা কথা ভোলা, কইলকাত্তা আমাগো দেশ না। নিমর্দীও আমাগো দেশ। হারামা যাউক, ফিরে আমুম। তোর লেইগ্যা একখান চামড়ার বেল্টু লইয়া আমুম, হ।

কিন্তু তাতে এ দু'বন্ধুর চোখের জল বাধা মানল না।

নীরব গ্রাম। হতাশায়, বেদনায় সব যেন চাপা কান্নায় কেমন ঝিম্ ধরে আছে। বুঝি গ্রামে মানুষ নেই। ভাল মানুষ শরাফৎ শেখ, পরের মাঠে লাঙল চালিয়ে খায়। নিমাইকে পুঁটলি নিয়ে যেতে দেখে হন্তোশে ছুটে আসে মাঠ থেকে পথে। জিজ্ঞেস করে: কই যাও বাপজান্, তুমি কই যাও?

উহু, এমন মানুষ যদি সবাই হত! এই শরাফৎ শেখের মত। বাপের মত পরমাত্মীয় শেখ, নিমাইকে বড় ভালবাসে। চোখ মুছে নিমাই বলল: কইলকাত্তা।

হ! এতবড় হয়ে ওঠে শেখের চোখ। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। সে তো রাখতে পারবে না নিমাইকে।

বড় বিলের ধার দিয়ে কয়েকটি পরিবার লটবহর নিয়ে চলেছে। শিশু, বৃদ্ধ, মেয়ে, পুরুষ। গ্রাম-ছাড়া, ভিটে-ছাড়ার দল।

শেখ বলে নিমাইয়ের গাল টিপে: আমার ব্যাটা, তোমার দোস্ত, মন্নুর লগে দেখা করবা না বাপ?

শেখের আদর পেয়ে বুকটার মধ্যে মুচড়ে ওঠে নিমাইয়ের। এই শেখ, বুড়ো কর্তা, মন্নু, রোশনারা, আন্না—এদের সবাইকে ছেড়ে কোথায় চলেছে সে! কোথায়! সে দেশ কেমন। ভয় হয়, কান্না পায়।

বিলধারের দলটার পড়ি-মরি-করে ছোটা দেখে মন্নু বলে ওঠে: যাইগা শরাফৎ কাকা!

শেখ নিমাইয়ের চিবুকটি ধরে গুণগুণ করে গেয়ে ওঠে:

মা গো কহিতে পরাণ যায়
মুখে নাহি বাহিরায়,
সোনার ম'দে আঁধার করে
নিমাইচান্দ চলে যায়।

হ, তুমি আমাগো নিমাই!

হাহাকার করে ওঠে নিমাইয়ের বুকটার মধ্যে। মা, মা গো!

শেখের দিকে পিছন ফিরে তাড়াতাড়ি চলতে আরম্ভ করে সে। চোখের জলে বাপ মা গ্রামখানি তর্তর্ করে কাঁপতে লাগল তার চোখের সামনে। মা, মা গো! চোখে না-দেখা মায়ের জন্য মন পাগল হয়ে ওঠে নিমাইয়ের। গাঁয়ের ধারে মনী সাহার গোলাবাড়ি শূন্য পড়ে আছে। তাঁরা নেই। এর

পুব-ভিটের ঘরখানিই ছিল নিমাইয়ের ভিটে। সেই ঘরেই জন্মেছিল সে। আম-কাঁঠালের ছায়াঘেরা বেড়া-ভাঙা ঘর।

ভাঙা বেড়ায় হাত রেখে নিমাই ডাকল, মা, মা!

মায়ের নিঃশ্বাসের মত বাতাস ঝরে পড়ে নিমাইয়ের মাথায়। ছাতা-পড়া, মাকড়সার জালে ভরা তল্‌তা বাঁশের বেড়ায় চোখের জল পড়ে। নিমাই বলল: আমি দেশান্তরী অইলাম, দুঃখু কইরো না মা!

তারপর, সে এক যুদ্ধ। পথে পথে, ঘাটে, রেলে, স্টিমারে পুলিশের লোক, আনসার-দল, টিকিটবাবু। সে এক এলাহি কাণ্ড। এর বাক্স ধরে টান দেয়, ওর প্যাট্‌রা ধরে। এর হাত ধরে তো ওর ঘাড় ধরে।

দেশের মানুষ যায়, তার সঙ্গে দেশের সম্পদও তো যায়। যুদ্ধ করে রাস্তায় রাস্তায়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। গরীব মানুষের হাঁড়িকুড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কি আপদ! আইন বড় দড়। নিমাইয়ের পুঁটলিটাও খুলে ছড়িয়ে আনসার-দল দেখল।

রাত আর পোহায় না। গাড়িও চলেছে তো চলেইছে। নিমাই কেবলই একে ওকে জিজ্ঞেস করে, কইলকাত্তা আইল?

শুনে শুনে সবার ব্যাজার লাগে। বলে, থাম্‌রে বাপু। কইলকাত্তা কি হাতের কাছে?

কিন্তু নিমাই তো আর অতশত জানে না। তার ভয়, কলকাতা বুঝি পেরিয়ে যাবে গাড়ি।

এক জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড়াতে অনেক লোককে নামতে দেখে নিমাইয়ের তর্‌ সইল না। সেও নেমে পড়ল। তখন সবে সূর্য দেখা দিয়েছে পুব আকাশে।

এইটা কইলকাত্তা? সবাইকে জিজ্ঞেস করে সে। যে যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। জবাব দেবে কে?

একজন বলল: আরে দূ-র বোকা। এইটা তো নৈহাটী।

কোনকালেও এমন নাম শোনেনি সে। নৈহাটী! এখানে কার কাছে কোথায় যাবে সে? প্ল্যাটফর্মের উপর হাঁড়িকুড়ি, বিছানাপত্র ছড়িয়ে-বসা লোকগুলো দেখলেই সে চিনতে পারে এরা তার দেশেরই লোক। কিন্তু ডেকে কেউ কথাটিও বলে না।...সে-ই সবার কাছে যায়, ফিস্‌-ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে।

কেউ বলে, কাম খোঁজ। বাড়ির চাকর, দোকানের চাকর। না হয়ত ভিক্ষা।

ভিক্ষা! ক্যান্? বড় মুষড়ে পড়ে নিমাই। কই, এ দেশ যে এত খারাপ, তাতো তারে কেউ বলেনি। সে শুধু শুনেছে, এ দেশে এলে বিপদ কাটবে, এখানে এলেই সব বাঁচবে। কিন্তু কেমন করে?

পথে পথে ঘোরে নিমাই। যাকে-তাকে ধরে জিজ্ঞেস করে: চাকর নিবেন কর্তা, আমারে নেন।

পথচারী মানুষ অবাক হয়, বিরক্ত হয়, হাসে। বলে, না রে বাপু, নিজেরাই খেতে পাই না!

হ, কয় কি? নিমাইও অবাক মানে। সম্বল কয়েকটি পয়সা একটি দিনেই শেষ হয়ে গেল।

স্টেশনের সামনে ঝকঝকে হাওয়া-গাড়িতে সুন্দর সুন্দর মানুষ দেখে নিমাই এগিয়ে যায়—চাকর নিবেন বাবু? মা গো, চাকর নেন আমারে। বাসন মাজুম, কাপড় ধুমু, ছোট ছাওয়াল কোলে রাখুম।

ড্রাইভার গাল দিয়ে ওঠে, নিকালো শুয়ার।

শুয়ার! হতবাক নিমাই। গালি দেয় কেন?

দোকানে দোকানে ঘোরে সে। নিজের কথা বলে, খাটতে পারি, যে কাম কইবেন, স—ব রকম। ফাঁকি দিমু না। দুই মুঠা খাইতে দিবেন।

সবাই হাত নেড়ে মাথা নেড়ে ফিরিয়ে দেয়।

দক্ষিণের বড় সড়ক ধরে এগিয়ে চলে নিমাই। পথের ধারে বড় বড় কারখানা। লোকে বলে, চটকল।

পুঁটলি বগলে ভয়ে ভয়ে কারখানার গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় নিমাই। মস্তবড় পাকানো গোঁফ ফুলে চোখ পাকিয়ে তাকায় দারোয়ান। কোন রকমে নিমাই জিজ্ঞেস করে ফেলে: দেখেন, আপনে গো এইখানে একটা কাম দিতে পারেন?

কেয়া বোল্তা? নিমাই অবাক হয়ে দেখল অমন গোঁফ আর চোখ নিয়ে ও মানুষটা হাসতে পারে। দুনিয়ামে কাম নেহি হ্যায়। হাত নেড়ে বলে দিল দারোয়ান। ভাগ্ যাও।

হঁ, দুনিয়ায় নাকি কাম নাই? দক্ষিণে এগিয়ে চলে নিমাই। খিদে পায়। খাবে কি? কে খেতে দেবে?

দিন যায়, রাত্রি আসে। পথের ধারে শুয়ে রাত্রি কাটে নিমাইয়ের।

সকালবেলা নিমাই ভাবে, এ দেশে কি ছাই কামারের দোকানও নেই একটা।

আছে। জঙ্গল ছাড়িয়ে, নতুন রাস্তায় পেরিয়ে এক কামারের দোকানের দেখা পেল সে। পাশে বিচুলি কাটার মেশিন-ঘর।

মস্তবড় টিকিওয়ালা হিন্দুস্থানী কামারের কাছে এগিয়ে যায় সে: কর্তা একটা কাম দিবেন? হাপর টানতে পারি, ছোটখাটো মাল বানাইতে পারি, ঘরের আর সব কামই করুম।

কামার তার কথা সব বুঝতেই পারল না। জবাব দিল: কুছ নেই মিলেগা।

তবে যে আমার কোন গতি হয় না কর্তা? বলতে বলতে বুঝি বা কান্না ফোটে নিমাইয়ের গলায়।

খিদেয় পেট জ্বলে। মুখ শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে গেছে।

কামার হাত দেখিয়ে বলল: আগে দেখো।

নিমাই এগোয়। আগে কোথায় দেখবে? সবাই একই কথা বলে, পথ দেখিয়ে দেয়।

পথ, পথ আর পথ। পথের তো শেষ নেই। এদিকে পায়ে কাঁপুনি ধরে, পেটে খিঁচ্ লাগে। মাথাটা ঘোরে ভন্‌ভন্ করে।

মাকে তো মনে পড়ে না। মনে পড়ে রোশনারার মা'কে, কামারবাড়ির বড় বউকে। বাপের কাছে গেলে মায়ের দুঃখ ঘুচত তার। বাপের কথা মনে পড়তেই অভিমানে বেদনায় ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে নিমাই। ছেলে ফেলে উধাও হল বাপ। বাপ তো! আর তার নিমাই ছেলে লায়েক হয়েও ওঠেনি।

জগৎ বড় কঠিন। নিমাইয়ের দু'ফোঁটা চোখের জলে কি তা ভিজবে!

রাত ঘনায়। নিমাই আর পারে না। পথের ধারে দাঁড়িয়ে ধোঁকে। এমনি উপোস নিমগাঁয়ে থাকলেও হত বা। কিন্তু সে তো গাঁয়ের মাটিতে, এমন নিদারুণ কষ্ট হত কি? নিমগাঁ…নিমগাঁ! সে দেশ নাকি আর তাদের নয়! কইলকাত্তা হল দেশ! ইস্! কয় কি।

অন্ধকারে একটা পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে নিমাই দাঁড়ায়, পুঁটলিটা

চেপে ধরে বুকে। বেচবার মতও তো কিছু নেই তার। আর এ সংসারে একটা চাকরেরও কারো দরকার নেই।

এই ভাখো, এক ছোঁড়া এখানে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। একটা লোক আপন মনেই কথাটা বলে একটা আনি নিমাইয়ের হাতে গুঁজে দিল। নেয়ে নে। তোদের জালায় তো আর পথ চলা যায় না।

ভিক্ষা! ভিক্ষা কি চেয়েছে নিমাই? তার ক্ষুধাক্লান্ত মাথাটায় যেন আগুন লাগল। আনিটা হাতে চটকে চটকে ছুঁড়ে ফেলে দিল অন্ধকারে। পাচিল ধরে ধরে এগোয় আর দাঁতে দাঁত চেপে বকবক করে নিমাই।

ভিক্ষা দেয়! দেশ নাই, তার দেশ? কইলকাত্তা দেশ!

ইস্! আমার দেশ কই?

চলমান জগৎ

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে অজস্র ছাত্র ফেল করার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা চলছিল। বৃদ্ধ মণিবাবু রাগের মাথায় বলে ফেললেন, করবে না ফেল, ছেলেগুলো কি পড়াশুনো করে মশাই! শুধু মেয়ে-গুলোর সঙ্গে ইয়ার্কি মারে। আর মেয়েগুলোও হয়েছে বেহায়া। আশুতোষ বিল্ডিং-এ গিয়েছেন কোনদিন? কাণ্ড দেখলে চোখ কপালে উঠবে।

মণিবাবু বয়সে আমার চেয়েও কিছু বড়, ষাট পেরিয়েছেন বলেই বলেন, কেশে প্রচুর পাক ধরেছে। সারাটা জীবন দেখে এসেছেন মেয়েরা ঘোমটা দিয়ে আলতা-পরা পা সসংকোচে ফেলে রান্নাঘর-পুজোর ঘর করে।

নাতনীটিকেও বিয়ে দিয়েছেন চোদ্দয় পা দিতে না দিতেই—ঘৃতকুম্ভকে আগুনের ধারে রাখা কোনমতেই তিনি নিরাপদ মনে করেননি। বলেন, এটা কি বিলেত মশাই? গরম দেশ, এটাকে বিলেত করে তুলতে চাইলেই তো হয় না।

আমি মণিবাবুর চেয়ে কিছুটা ছোট হলেও বৃদ্ধ তো বটেই। ষাট না হোক, বাকিও বেশি নেই। বনে যাবার বয়স পেরিয়েছে অনেকদিন। বনে না গিয়ে মণিবাবুর যে জ্বালা তা দেখে প্রাচীন শাস্ত্রকারদের বিধানের যৌক্তিকতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ জ্বালা একা মণিবাবুর নয়, এ জ্বালা বর্ধমান বয়সের। নবজীবনের অংশ গ্রহণ করবার সম্ভাবনা যেই আমাদের পার হয়ে যায়, অমনি আমরা নতুন কিছু দেখলে রেগে উঠি। ফ্রয়েড হয়ত বলবেন, এর মূলে আছে ঈর্ষা। নতুনের সঙ্গে পদে পদে কলহ করে দুনিয়া রসাতলে যাচ্ছে, এই বোধ নিয়ে সংসারে বাস করার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই বোধ হয় 'পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ'-এর বিধান।

পঞ্চাশ বছর ধরে যা-কিছু ধারণা, যা-কিছু মূল্যবোধ মনের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছে, তাকে উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়। কিন্তু তার চেয়েও অসম্ভব, তার চেয়েও গ্লানিকর এমন পরিবেশে বেঁচে থাকা যেখানে আমাদের সমস্ত ধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। রসাতলগামী সমাজে চুপ করে নির্বিকার হয়ে থাকাও মানুষের পক্ষে নরকজ্বালা। অথচ সমাজ যে রসাতলে যায় না, আপন নিয়মে বিকশিত হয়, একথা আমরা—বৃদ্ধরা—কিছুতেই স্বীকার করি না।

আজকের সমাজে ছোটলোকের যে দাপট তা দেখে আমার অনেক সমবয়সী বন্ধু পদে পদে আক্ষেপ করেন, এর মধ্যে কি আর মানসম্ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব ভাই। কিন্তু তাঁদের বাঁচা সম্ভব না হলেও ছোটলোকদের দাপট দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না এবং সে বৃদ্ধি ঠেকানও যাবে না। নিরুপায় হয়ে অপমানবোধকে হজম করা ছাড়া উপায় নেই। বনে যাওয়ার প্রথা উঠে গিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সে সমস্যার দাহ পুরোপুরি আমরা পঞ্চাশোর্ধে্বর দলই ভোগ করছি। তরুণের দল যে একটু-আধটু অসুবিধায় পড়ছে না, তা নয়। কিন্তু সংঘাতে জয় শেষ পর্যন্ত তাদেরই হচ্ছে।

টুট্-এন-খামেনের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সব সময়েই সমাজে পরিবর্তন এসেছে আপনাআপনি, ইতিহাসের চাকা চলছে মহাকালের অমোঘ নিয়মে। কখনও কোন মহাযুদ্ধ, কোন সামাজিক বিপর্যয়ের ফলে সে চাকার গতি হয়েছে দ্রুততর। দ্রুততর করায় সহায়তা কোন ব্যক্তি বা সংঘের দ্বারা সম্ভব হলেও বিবর্তনকে ঠেকানো কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি—এই সহজ কথাটি বুঝতে পেরেছি বলেই আমি নির্বিকার।

দূর সম্পর্কের যে ভাইপো-টি আমাকে অভিভাবক বলে মেনেছে চিরদিন, সেও যেদিন তার বোনের জন্য আচার-বহির্ভূত বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করে এসে জানালে, মন খুলে সায় দিয়েছিলাম বা আশীর্বাদ করেছিলাম এমন কথা বললে একেবারেই মিথ্যে বলা হবে। শুধু এইটুকু বুঝেছিলাম যে, জাত এবং শ্রেণীভেদ অস্বীকৃত হওয়ায় আমার সংস্কারে যত আঘাতই লাগুক না কেন, বাধা দিতে গেলে যে লড়াই বাধবে তাতে আমাকেই হঠতে হবে, তাই বলেছিলাম, 'তাল'।

স্থানীয় পল্লী-সমাজের যে সমস্ত বিচ্ছিন্ন সংস্কারকে আজও আমরা প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে চাই। শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের সমাজে তার মূল্য

যে এতটুকুও নেই, একথা বুঝেই আমার মনের অনেকখানি গ্লানি কেটে যায়।

বোমারু বিমান আসার সঙ্কেতধ্বনিতে অনেকগুলি অপরিচিতের সঙ্গে এক আশ্রয়ে দু'ঘণ্টা থাকতে হয়েছিল একটি বধূর, সঙ্গে অবশ্য তার স্বামীও ছিলেন। তবু এতটুকু অল্পপরিসর স্থানে অনেকগুলি অপরিচিত পুরুষের সান্নিধ্যে সে ঘেমে উঠেছিল। ঘর থেকে উঠোনে বেরুতে যে মেয়ে একগলা ঘোমটা দিয়েও লজ্জায় কুঁকড়ে যেত, আজকে যে সে শিয়ালদা স্টেশনে সবার দৃষ্টির সামনেই মাথার কাপড় ফেলে সন্তানকে স্তন দিচ্ছে, স্নান করছে খোলা কলতলায়, তাতে আজ আর সে শিউরে ওঠে না, অথচ আমরা বৃদ্ধের দল ক্ষেপে উঠি।

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী রায়বাহাদুর একদিন যেভাবে ঘৃণা করেছেন কংগ্রেসকে, আজ তেমনিভাবে ঘৃণা করছেন তাঁরা বামপন্থী মতবাদকে। অথচ তাঁদের মনের ঘৃণা এবং সক্রিয় বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতের ইতিহাসে কংগ্রেস তার ভূমিকা অভিনয় করেছে। এই সহজ কথাটুকু ভুলেই তাঁদের যত জ্বালা।

আমার মনে আছে ১৯০৫ সালের কথা। তরুণদের উদ্দীপনায় মনে কিছু চাঞ্চল্য বোধ করার বয়স তখন আমার হয়েছে। ত্রিশে আশ্বিন রাখীবন্ধন ও অরন্ধন করবার জন্যে বাড়িতে আবদার ধরেছি, কিন্তু সে আবদার রক্ষিত হয়নি। দু'দিনের এ পাগলামি কেটে যাবে, আমার পিতৃদেবের সে ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যর্থতা তিনি নিজেই দেখে গেছেন। ক্ষুদিরামের ফাঁসির ফলে তরুণদের মনে যে বিপ্লবের মোহ জেগেছিল, বৃদ্ধেরা তা নিয়েও কম বিরক্তি দেখান নি। তরুণেরা বৃদ্ধদের বিরোধিতা করে আবার নিজেরা বৃদ্ধ হয়ে পরবর্তী ধাপে এগোনোর চেষ্টাকে গাল দেয়—এ সব ত নিত্যকার ঘটনা।

ইংরেজি শিক্ষার ম্লেচ্ছকারিণী অবিদ্যাকে পরিহার করে খাঁটি টুলো শিক্ষা ও সেই ধরনের জীবনযাত্রাকে নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিজের ছেলেদের ইংরেজি পড়িয়েছেন। দেরিতে ইংরেজি শিখতে এসে চাকরি-বাকরিতে পিছিয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু লাভই তাঁদের হয়নি। প্রাচীন জীবনাদর্শ তার স্বাভাবিক মৃত্যু অর্জন করেছে, অথচ ইংরেজি পড়েও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সন্তানদের মধ্যে অনেকে টিকি ও চটিকে আজও আঁকড়ে আছেন প্রাচীনতার প্রতীক হিসাবে, জীবনযুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন সুফলই যে তাতে হচ্ছে না, ঠেকেও তাঁরা একথা শেখেন না।

একটি বন্ধুর বয়স্থা মেযে ঘরে দায় হয়ে আছে, সহজে বিয়ে হবার মত রূপ বা আধুনিক গুণ কিছুই মেয়ের নেই, টাকা খরচ করে এগুলির ত্রুটি কাটাবার মত সঙ্গতিও নেই বন্ধুটির। অথচ মেয়েটির সঙ্গে কোন একটি অসবর্ণ যুবকেব ভাব হয়েছে, তারা পরস্পব বিবাহেচ্ছু। অতি-রক্ষণশীল বন্ধুটি একদিন নিজের মেয়ের তথা আধুনিক যুগের বিরুদ্ধে আমাকে সরোষ-নালিশ জানালেন। আমি বিবাহে সম্মতি দেবার পরামর্শ দেওয়াতেই বন্ধু ক্ষেপে আমায় গাল দিলেন, আমি নাকি ওদের পক্ষে দালালি করছি। বলা বাহুল্য, ছেলেটি দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর অগত্যা অন্যত্র বিবাহ করেছে, আর মেয়েটি আজও দায় হয়ে ঘরে আছে। অসবর্ণ বিবাহে আমারও সম্মতি নেই, কারণ আমি প্রাচীন সংস্কারে মানুষ, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত সম্মতি-অসম্মতির মুখ চেযে তো সমাজ বসে থাকবে না, দেশ-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে নতুন সমাজ গড়ে উঠবেই। এই সত্যটুকু বুঝতে পেরেই আমি বেঁচে গেছি। অনৈক জমিদারেব রক্ষিতাব কন্যাকে বিবাহ করবার জন্যে এক তরুণ বন্ধু বাড়ি থেকে বিতাড়িত হন। এ বিবাহে আমারও মোটেই সায় ছিল না। প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ না জানানো সত্ত্বেও বন্ধুটি বোঝালেন সমাজসম্মতভাবে বিবাহ না করলেও মেয়ের বাপ মা সম্পূর্ণ সুষ্ঠু জীবন যাপন করেছেন, অবশ্য স্বিপত্নীকেব মত। রক্ষিতা না হয়ে বারবনিতা হলেও তার কন্যা যে অপাংক্তেয় থাকবে না, একথা বুঝতে আমায কষ্ট হল না। মানুষকে মানুষ হিসাবে বিচার করার যে দৃষ্টিভঙ্গি তার বিরোধিতা করে আজ আর পার পাওয়া সম্ভব নয়।

আমার তেরো বছরের মেয়েকে বিয়ে না দেওযায় যাঁরা পরোক্ষে আমাকে শ্লেষ করেছিলেন তাঁদের নাতনীরা আজ অফিসে চাকরি করছে। অফিসের পবে কাফেতে সহকর্মীদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। দাদুরা চেঁচামেচি যে করছেন না তা নয, কিন্তু ফল হচ্ছে কি কোন? ঘৃতকুম্ভ ও আগুন পাশাপাশি চলছে, মিস্‌রা মিস্‌ই থাকছেন, হয়ত বা by courtsey, কিন্তু সমাজ তাতে উচ্ছন্নে যায়নি, বরং বিপর্যস্ত হচ্ছে তারা যারা পদে পদে পরিবর্তনকে অস্বীকারের চেষ্টা করছে।

সংসারের অনিবার্য দুঃখ-দুর্দশায ব্যাকুল হয়ে বুদ্ধদেব জন্মের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে মোক্ষের সাধনা করেছিলেন। যন্ত্র-সভ্যতার অনেক কিছু কদর্যতা দেখে গান্ধীজী যন্ত্র-সভ্যতাকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে চেয়েছেন।

মানুষ কিন্তু মোক্ষের সাধনাকে গ্রহণ করেনি, দুঃখ-দুর্দশা দূর করে সংসারকে সুখময় করার সাধনা করেছে, দুঃখ-দুর্দশা অনিবার্য হলে তা সমেতই জীবনকে স্বীকার করেছে। যন্ত্রসভ্যতার সমস্ত কদর্যতা দূর করে রুশ দেশে সুখী যন্ত্রনির্ভর জীবন গড়ে উঠেছে। পাপ করাই যদি মানুষের স্বভাব হয় তবে তাকে বেঁধে রেখে মানুষের সমাজ মুক্তি পাবে না। মানুষকে সব দিকের স্বাধীনতা ভোগ করতে দিলে যেটুকু গ্লানি সমাজে বাড়বে, সমাজ আপনা থেকেই তা হজম করে নেবে, স্বাস্থ্যকর খাদ্যের মধ্যেকার অস্বাস্থ্যকর অংশটুকুর মত, অথচ সমাজের বিকাশও হবে সহজ।

আমি তো বরং ভাবি, কাজের দিকে আমরা যতটা এগিয়েছি, মনের দড়িতে পিছন থেকে রাশ ধরে সেটুকু নষ্ট করে দিচ্ছি। মেয়েরা ও ছেলেরা একসঙ্গে কলেজে পড়া ও অফিসে কাজ করার পরেও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হবে না এতে আমাদের দেহমনের পঙ্গুতাই ধরা পড়ে, আর পঙ্গুতা যে অস্বাস্থ্য তাতে কোন সন্দেহ আছে কি? বয়সের সঙ্গে মেয়ের শরীর না বাড়লে কন্যাদায়ের যুগে দায়গ্রস্তরা খুশি হতেন, কিন্তু মেয়ের স্বাস্থ্য হত বাপ মায়ের বিপদ, তবু শেষ পর্যন্ত সুদে আসলে শোধ তুলতই।

সমাজের বিবর্তন হচ্ছে, আমাদের প্রবীণদের বাদ দিয়েই। বুড়োরা চাই যে সমাজের বয়স বাড়লেও সমাজ যেন না বাড়ে, বয়স অনুযায়ী সর্বাঙ্গীণ বিকাশ না হয় তার। সেকেলে চীনে মেয়েদের লোহার-জুতো-আঁটা-পায়ের মত কুঁকড়ে ছোট হয়ে থাকে। আমরা চাইলেও বিকাশ রুদ্ধ থাকেনি, যেখানে জোর করে রাখা হয়েছে সেখানে ফল হয়েছে বিপরীত।

মণিবাবু বলেছিলেন, এটা বিলেত নয়, গরম দেশ। কিন্তু বিলেতের মত ঠাণ্ডা দেশেও আধুনিক বিলেতিআনার বিবর্তনে বুড়োরা কম বাধা দেয়নি। তবু সমাজ এগিয়েছে সব বাধা নিষেধ সত্ত্বেও, যারা পথ জুড়ে বড়াই করেছিল তাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে।

সমাজের পরিবর্তনে ষাটের কাছাকাছি বৃদ্ধ আমি, আমার লাভ নেই কিছুই, কিন্তু পরিবর্তন স্বীকার না করলে মনে যে অশান্তি ভোগ করব— তাতে কষ্ট পাব নিজেই, কারো কিছু যাবে আসবে না। বিশ শতকের গোড়া থেকে খোলা চোখ-কান-মন নিয়ে সব পরিবর্তনগুলি চাক্ষুষ করেছি। বুঝেছি যে, সমাজ ও দুনিয়া কারো মূল্যবোধ নিয়ে বসে থাকে নি,

থাকবেও না, ব্যক্তিগত ভালমন্দ-বোধ ইতিহাসের অনিবার্য ধারায় নিখিল বিশ্বের মর্মস্রোতের বন্যায় কোথায় ভেসে গেছে, চিরদিনই ভেসে যাবে।

এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছি সব বয়সের তরুণতরদের সহৃদয় সাহচর্যের ফলে, আর এই সত্য উপলব্ধি করেছি বলেই সব বয়সের তরুণদের সঙ্গে আমি তাদেরই একজন হয়ে আজও মিশে যেতে পারি। তোমরা যখন যাতে থাক, তাতেই আমি আছি, অবশ্য পেছনে যেতে নয়, এগিয়ে চলার পথে। তবু কেউ যেন সন্দেহ করো না, অস্বীকারও করো না পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় পককেশ বৃদ্ধ।

রঙ্গমঞ্চ
ও
চলচ্চিত্র

সিনেমা-আঙ্গিক ও ডায়ালেকটিক্‌স্‌

মৃণাল সেন

In the realm of art the dialectic principle of dynamics embodied in CONFLICT as the fundamental principle for the existence of every art and every art-form

—*Eisenstein in 'Film Form'*.

Dialectics may be briefly defined as the theory of the unity of opposites.

—*Lenin in 'Philosophical* Note *Books'*.

The division of the One and the knowledge of its contradictory parts is the essence of dialectics.

—*Lenin in 'On Dialectics'*.

মূল বিষয়টি আলোচনা করার আগে একটু ভূমিকার প্রয়োজন আছে।

খুব ছেলেবেলায় গোপাল আর রাখালের কথা পড়েছি প্রথম ভাগে। গোপাল পড়ার সময় পড়ে, খেলার সময় খেলে, সঙ্গীদের সঙ্গে ঝগড়া করে না। আর রাখালের পড়ার দিকে মন নেই ছিটেফোঁটাও, সমস্ত দিন শুধু খেলাধুলো নিয়েই থাকে আর কেবল ঝগড়া করে সঙ্গীদের সঙ্গে। কোন ঘটনা নেই, শুধু ঐ কথাই—গোপাল যা করে, রাখাল তা করে না। গোপাল ভালো, আদর্শ ছেলে—রাখাল মন্দ, গোপালের ঠিক উল্টো। কিছু বড় হয়ে পড়লাম ছেলেদের রামায়ণ। সেখানেও দেখলাম কেউ ভালো, কেউ বা মন্দ। বিচিত্র ঘটনাবলী। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলাম প্রতিটি ঘটনা। বুঝলাম রাম ভালো, রাবণ ভালো নয়। রাম আদর্শপুরুষ—রাবণ নীচ, ঘৃণ্য। আরো বড়

হয়ে সেই রামায়ণেরই গল্প পড়লাম মাইকেলের কাব্যে। সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিটাই গেল বদলে। প্রথম ভাগের গোপাল ও রাখালকে আর রামায়ণের চরিত্র-গুলোকে যে চোখে দেখেছিলাম, যত সহজ করে তাদের ভাগ করতে পেরেছিলাম—কাউকে ভালোর ছাপ মেরে, কাউকে বা মন্দের লেবেল এঁটে —মাইকেলের কাব্যে তা একেবারেই সম্ভব হল না। সেই একই ঘটনাবলী, অথচ রামকে যত ভালো লাগা উচিত ছিল তত ভালো তাকে লাগল না—ঘৃণ্য, নীচ রাবণের প্রতি কেবলই সহানুভূতিতে মন ভরে উঠতে লাগল। দেবতাদের ক্ষমতালিপ্সা ও তাদের অন্যায় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে রাবণের উদ্ধত প্রতিবাদের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেলাম মাইকেলের কাব্যে। সীতাকে চুরি করে রাবণ নীচতার পরিচয় দিয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বৈরাচারী দেবতাদের বিরুদ্ধে তার প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে সে যখন রুখে দাঁড়িয়েছিল তখন সেই বিপ্লবীকে সমস্ত বুক দিয়ে মেনে নিতে পেরেছিলাম। লক্ষ্মণ কর্তব্যপরায়ণ, স্বার্থত্যাগী একথা সত্যি, কিন্তু ইন্দ্রজিৎকে যে জঘন্য চক্রান্ত করে হত্যা করা হল সেজন্যে মাইকেলের পাঠক তাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না। অর্থাৎ ভালোয়-মন্দয় জড়িয়ে এখানে চরিত্রগুলো হয়ে উঠল জটিল। ভালোর ছাপ মারা গোপাল সময় সময় ভালোর গণ্ডি পেরিয়ে রাখালের আওতায় গিয়ে পড়ল, আর রাখাল হয়ে গেল গোপাল। দিনের বেলার ডাঃ জেকিল হয়ে উঠল গভীর রাতের মিঃ হাইড।

সাদায় কালোয় জড়িয়ে চরিত্রগুলো জটিল হল অবশ্য, কিন্তু তালগোল পাকালো না, চরিত্রের জটিলতা পাঠকের মনকে বিভ্রান্ত করল না। বরং সব মিলে অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে তারা পাঠকের চোখে ধরা দিল। গোপাল, রাখাল অথবা আগেকার রাম-রাবণের চাইতে ঢের বেশি ভাল লাগল মাইকেলের কাব্যের চরিত্রগুলোকে। অনেক বেশি জীবন্ত, বাস্তব, অনেক বেশি আপনার বলে মনে হল তাদের। আর্ট হিসেবে মাইকেলের কাব্য সার্থক সৃষ্টি বলে স্বীকৃত হল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সাদায়-কালোয় জড়িয়ে জটিলতা সৃষ্টি করাই কি আর্টের ধর্ম? কথাটা আংশিক সত্যি, কিন্তু আরও স্পষ্ট করে বলা দরকার।

শিল্পীর সৃষ্টি তখনই সার্থক হয়ে ওঠে যখন চরিত্র ও পারিপার্শ্বিক চিত্রণে থাকে বাস্তবজীবনের স্পন্দন, বইয়ের পাতা থেকে চরিত্রগুলো যখন পাঠকের চোখের সামনে রক্তমাংস নিয়ে উঠে আসে, জীবনের উত্তাপ যখন পাঠক তার

সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারে—ঠিক যেমন করে অনুভব করেন শিল্পী নিজে এবং এই কথাই গোর্কি ফেডিনের কাছে তাঁর এক চিঠিতে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন : "আপনারা বলে থাকেন যে, 'কেমন করে লিখি' এই সমস্যায় আপনারা অত্যন্ত বিব্রত। কিন্তু আমার কাছে প্রশ্নটি এ রকম : এমন ভাবে আমি একটি মানুষের কথা লিখব, সে যেই হোক না কেন, আমি তাকে যেমনটি দেখেছি ও অনুভব করেছি ঠিক তার সেই শারীরিক উপস্থিতির সমস্ত স্পষ্টতা নিয়ে, সেই অর্ধ-কাল্পনিক অথচ অকাট্য বাস্তবতা নিয়ে সে যেন তাকে নিয়ে লেখা কাহিনীর পৃষ্ঠা থেকে উঠে আসে। ব্যাপারটি এই ভাবেই বুঝেছি আমি—আর এই হচ্ছে এর গুঢ়তত্ত্ব।"

পাঠকের মনে এই ধরণের অনুভূতি জাগাতে পেরেছিল বলেই মাইকেলের কাব্য উন্নততর আর্টের মর্যাদা পেয়েছে এবং এই অনুভূতির মূলে রয়েছে বিপরীতের দ্বন্দ্ব, রয়েছে বিপরীতের বিরোধ। ছেলেবেলাকার রামায়ণে ঘটনার বিরোধ অবশ্যই ছিল। ঘটনার পর ঘটনা জুড়ে, ঘটনার মালা গেঁথে। অর্থাৎ, ঘটনার linkage-এ কোন গল্প হয় না, রামায়ণেও তা হয়নি। গল্প হয়েছে ঘটনার সঙ্গে ঘটনার বিরোধের ফলেই, conflict-এর ফলেই। কিন্তু সেখানে যে জিনিসের অভাব ছিল তা হচ্ছে চরিত্রের অন্তর্বিরোধ এবং তা ছিল না বলেই চরিত্রগুলোকে মনে হয়েছিল কলের পুতুলের মত, যেন ভালো আর মন্দের লেবেল এঁটে দম দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মাইকেলের কাব্যে তা হয়নি। ঘটনার বিরোধ তো রয়েছেই, উপরন্তু একই চরিত্রের ভিতরে বিরুদ্ধ ইমোশনের সংঘর্ষ চলেছে আগাগোড়া। পাঠকের মনেও একই সঙ্গে বিপরীতের দ্বন্দ্ব চলেছে, কিন্তু পাঠক দিশেহারা হয়ে যায়নি। ঠিক যেমন ঘটনার বিরোধ থেকে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে, এখানে বিরুদ্ধ ইমোশনের সংঘর্ষের ফলে নতুন এক আইডিয়া জন্ম নিয়েছে পাঠকের মনে এবং এই আইডিয়াই কবির বক্তব্য।

মাইকেলের কাব্যের মত সমস্ত শিল্পসৃষ্টির মূলেই রয়েছে বিরোধ। শুধু কন্‌টেন্টের দিক থেকেই নয়, আঙ্গিকের অস্তিত্বের গোড়ার কথাও ঐ একই—বিরোধ, দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ কন্‌টেন্ট তো নিশ্চয়ই, শিল্পের আঙ্গিকও ডায়ালেকটিক্‌স্‌-এর নিয়ম মেনে চলছে। সাহিত্য, সঙ্গীত, পেন্টিং সব কিছুরই মূলে—কি বিষয়-বস্তুতে, কি আঙ্গিকে রয়েছে ডায়ালেকটিক্‌স্‌। কবিতার ছন্দে ডায়ালেকটিক্‌স্‌, সঙ্গীতের counterpoint-এও তাই, আর

পেন্টিং-এর রৈখিক বা linear এবং রংয়ের বা tone-এর বৈচিত্র্যের মাঝেও ঐটিই ফুটে উঠছে।

বর্তমান যুগে সিনেমা হচ্ছে এক বলিষ্ঠ আর্টকর্ম। সিনেমার আঙ্গিকের ভিতর ডায়ালেকটিক্স্ যে কতভাবে রূপায়িত হচ্ছে সেই আলোচনাই এখানে করব।

গোড়া থেকে শুরু করা যাক। আমরা ছবিকে নড়তে দেখি কেন? এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি?

আসলে ছবি কিন্তু আদৌ নড়ে না, দর্শকের মনে নড়ার একটা আইডিয়া তৈরি হয় মাত্র। অসংখ্য স্থির-চিত্র অর্থাৎ Still frame নিয়েই সিনেমা।

আমাদের চোখের একটা ভারি মজার ব্যাপার আছে। কোন জিনিস আমাদের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আমাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায় না, ১/১৬ সেকেণ্ড পর্যন্ত মনে হয় যেন জিনিসটি আমাদের চোখের সামনেই ভাসছে। তারপর সেটা মিলিয়ে যায়। অবশ্য ঐ সময়ের মধ্যে অন্য কোন জিনিস আমাদের দৃষ্টিগোচর হলে আগেকার জিনিসটি দেখতে পাওয়া যাবে না। এই মজার ব্যাপারটিকে বলা হয় persistence of vision, এবং এইটি হয় বলেই আমরা ছবিকে নড়তে দেখি, নয়তো সিনেমা বলে কিছুই থাকত না।

সিনেমায় সেকেণ্ডে ২৪খানা স্থির-ছবি পর্দায় ভেসে ওঠে, এবং একটা ছবি চলে গিয়ে পরের ছবি আসার মাঝখানের সময়টুকু পর্দাটাকে অন্ধকার করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সেকেণ্ডে ২৩বার পর্দা অন্ধকার হয়ে থাকে। Persistence of vision এর ফলে একটা ছবি চলে যাওয়ার পর যখন পর্দা অন্ধকার থাকে তখন অন্ধকার না দেখে আমরা দেখতে পাই আগেকার ছবিটিই। তারপরই আসছে পরের ছবি, পর্দা তখন আর অন্ধকার থাকে না। হযতো পর্দায় দেখানোর কথা একটা ঘোড়া দৌড়চ্ছে। প্রথম ছবিটায় আমরা দেখি একটা ঘোড়ার স্থির-ছবি। পর্দা অন্ধকার হয়ে যায়, কিন্তু অন্ধকার দেখি না—ছবিটি তখনো চোখের সামনে ভাসে। পরক্ষণেই অন্ধকার সরে যেতেই দেখতে পাই সেই ঘোড়া, তবে তার স্থান যায় বদলে, পা চারখানা আগেকার জায়গায় আর নেই, একটু এগিয়ে গেছে—তা সে যত সামান্যই হোক। সমস্ত শরীরটাও হযতো খানিকটা এগিয়েছে। অবশ্য, এটাও স্থির-চিত্র। পরপর এই ছুটো গতিহীন ছবির ভিতরে সংঘর্ষের

ফলেই আমাদের মনে সঙ্গে সঙ্গে গতির আইডিয়া তৈরি হয়েছে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ছবিতে ছবিতে সংঘর্ষ (confliet) না হয়ে ছবির পর ছবি জুড়ে দেওয়ার (linkage) ফলেও তো গতির আইডিয়া তৈরি হতে পারে! কিন্তু জুড়ে দেওয়ার ফলে যে তা হতে পারে না তার একটি সহজ প্রমাণ আমরা হামেশাই পেয়ে থাকি। যে গতিতে নির্জন রাস্তা দিয়ে আমরা হেঁটে থাকি ঠিক সেই গতিতেই যখন পার্কের রেলিং ঘেঁসে হাঁটি তখন রেলিঙের দিকে তাকাতেই মনে হয় যেন গতি অনেক বেড়ে গেছে। এই অতিরিক্ত গতির আইডিয়া কি করে মাথায় আসে? যখন আমরা রেলিঙের দিকে তাকাই তখন আমাদের দৃষ্টিপথ শিকগুলোর গা ঘেঁসে নিচু থেকে উপরে ওঠে অথবা উপর থেকে নিচে নামে। অথচ আমরা হাটছি উপর থেকে নিচেও নয়, নিচে থেকে উপরেও নয়—আমরা হাঁটি সোজাসুজি, শিকগুলোর আড়াআড়ি। দুটো গতিপথের সংঘাতের ফলেই অতিরিক্ত গতির একটা আইডিয়া আমাদের মনে তৈরি হয়ে থাকে।

অতএব, এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় স্থির-ছবি জুড়ে নয় অর্থাৎ linkage নয়, তাদের conflict-এর ফলেই গতির আইডিয়া দর্শকের মনে তৈরি হয়। এবং এই conflict-এর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে সিনেমার বিজ্ঞান। সিনেমার বিজ্ঞানের মূলে রয়েছে ডায়ালেকটিক্‌স্।

বক্তব্যকে প্রকাশ করতে আঙ্গিকের মারফত কিভাবে ডায়ালেকটিক্‌স্ এসে পড়ে সেই আলোচনা করতে গিয়ে মনে পড়ছে কয়েকদিন আগেকার একটা ঘটনার কথা।

এক নাটকের মহলায় উপস্থিত ছিলাম। গ্রাম-বাংলার চাঁদনী রাত, স্বামী-স্ত্রী বসে আছে কাছাকাছি। মহলা বলেই আমি তাদের কাছাকাছি ছিলাম, তাদের সামান্যতম movement-ও আমার দৃষ্টি এড়াচ্ছিল না। কথায় ও পরিবেশে একটা অদ্ভুত রোমান্টিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। অন্ধ স্বামী আপনমনে গান গাইছিল, স্ত্রী শুনছিল বিভোর হয়ে। গান থামিয়ে স্বামী জিজ্ঞেস করে,—কেমন লাগছে?

স্ত্রী। (ছলছলে চোখে) কি বলব, গায়েগতোবে কাঁটা দিয়ে ওটছে।

স্বামী। গোলাপের কাঁটা!

স্ত্রী। শেয়াকুলির কাঁটাও তো হতি পারে।

আবেগভরে স্বামী যেই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে মন্তব্য করল,—

'গোলাপের কাঁটা'···অমনি স্ত্রীটি যেন কেমন হয়ে উঠল, রীতিমত চমকে উঠল, নিজের ভিতর গুটিয়ে গিয়ে বলল পরের কথাগুলো। গোটা মুখখানা মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। স্বামীর অজান্তে স্ত্রী অতীতে অনেক পাপ করেছিল, তাদের দুঃসময়ে লম্পট সমাজপতিদের বেয়াদপির প্রশ্রয় দিয়েছিল; তাই আজ এই রোমান্টিক মুহূর্তেও তার অপরাধী মন চমকে উঠেছিল। তাই সে স্বামীর ভালবাসার উত্তাপ (যা তার কথাদুটোর মধ্যে পরিষ্কার ধরা পড়েছে) সে সইতে পারল না, সমস্ত শরীরটাকে পিছনের দিকে গুটিয়ে নিয়ে বলল,—'শেয়াকুলির কাঁটাও তো হতি পারে।'

স্বামীর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কথা বলা ও স্ত্রীর পিছনের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে যাওয়া—বিরাট মঞ্চের মধ্যে হয়তো এর কোন দাম নেই, অথবা দাম থাকলেও মঞ্চের ব্যাপ্তির মধ্যে এদের এই সূক্ষ্ম movement দর্শকের কাছে অর্থপূর্ণ নাও হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বক্তব্যের তাগিদে নিজের অজান্তেই তাদের এই যে ঝুঁকে-পড়া ও পিছিয়ে-যাওয়া—তা, সে যত সামান্যই হোক—সিনেমা-শিল্পীর কাছে এর দাম কম নয়। সচেতন সিনেমা-শিল্পী জেনেশুনেই পর পর দুটো ক্লোজ-আপে স্বামীর ক্যামেরার দিকে ঝুঁকে-পড়া ও স্ত্রীর গুটিয়ে-যাওয়া অর্থাৎ ক্যামেরা থেকে শরীরের উপরের দিকটা পিছিয়ে দেওয়া—এই দুটো movement ব্যবহার করে একটা অর্থপূর্ণ ছন্দের আমেজ সৃষ্টি করতে নিশ্চয়ই পারবেন।

এ সব না করে শুধু নিখুঁত expression দিয়েও কথাদুটো বলা অবশ্যই যেতে পারে, কিন্তু বক্তব্যের তাগিদে নিজেদের অজান্তেই যে দুটো বিরুদ্ধ movement স্বামী-স্ত্রী করেছে, দুটো শটের (shot) মারফত সেই movement-এর বিরোধকে আরো স্পষ্ট অথচ এতটুকু স্থূল না করে দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারলে দর্শকের মনে একটা বাড়তি ইমোশনের সৃষ্টি হবেই। এবং তাতে বক্তব্যটি আরো সুন্দর, আরো জোরালো হয়ে উঠবে। এখানে মনে রাখা দরকার যে movement-এর বিরোধের ফলেই এই বাড়তি ইমোশন তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ, ডায়ালেকটিক্‌স্।

'নতুন সাহিত্য'-এর বৈশাখ সংখ্যায় ছবির ভাষার কথা বলতে গিয়ে আমি পুলিশের খানাতল্লাশের একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম। পুলিশের মনের অবস্থা হিংস্রতার ছবি দর্শকের সামনে তুলে ধরার জন্তে কি করা দরকার তা বলতে গিয়ে লিখেছিলাম: 'পর্দা জুড়ে শুধু পুলিশের থাবা আর বালিসটাকে

দেখানো মোটেই কঠিন নয়।' অর্থাৎ দেখানো হচ্ছে পুলিশের দুটো হাত আর হাতের মধ্যে একখানা বালিস—ক্লোজ-আপ। বালিসখানা পুলিশ ছিঁড়ছে, ওটার ভিতর কিছু লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা দেখতে। 'বালিসটা ছিঁড়তেই তুলোর গাদা বেরিয়ে আসবে, মোটা আঙুলগুলোর গায়ে, লোমে তা ছড়িয়ে পড়বে।' কিন্তু এইটুকু ছবির কথা ভেবে নিশ্চিন্ত হতে পারিনি, তাই foot-note-এ লিখলাম, 'বালিস ছেঁড়া ও তুলো বেরিয়ে পড়ার মাঝখানে আপনার ভীত, চকিত মুখের ছবি (ক্লোজ আপ) ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে, নইলে ছবির তাল কাটবে।' মজার কথা হচ্ছে এই যে, সেদিন আমি ডায়ালেকটিক্‌স্‌-এর কথা এতটুকু ভাবিনি। কিন্তু আমার অজান্তেই তা এসে পড়েছে আমার চিন্তাধারায়, তাই লিখেছিলাম—'ছবির তাল কাটবে।' বালিস ছেঁড়ার সময় হাত দুটো সামনের দিকে একটু এগিয়ে আসবেই এবং ক্লোজ আপে তা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়বে। পরক্ষণেই আসবে পিছিয়ে যাওয়া এক ভীত, সন্ত্রস্ত মুখ। তারপরেই তুলোর গাদা ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসবে। Action ও reaction-এর ছবি। আর movement-এর বিরোধ। রৈখিক বা linear movement-এর linkage-এ নয়, তাদের বিরোধের ফলেই ছবির ছন্দ এবং বক্তব্য প্রকাশে তার প্রয়োজন আছে।

'নতুন সাহিত্য'-এর সেই প্রবন্ধেই আর এক জায়গায় এক রাজনৈতিক নেতার জেল থেকে বেরিয়ে আসার সময়কার কয়েকটা ছবির উল্লেখ করেছিলাম। শহর ঢেঁকে ছেলে-বুড়ো ভিড় করেছে জেল-গেটে, তাদের নেতাকে তারা মিছিল করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। জনতা জেলের বাইরে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, সামনের একটা গাছে এক ঝাঁক পাখি। নেতা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জনতার ভিতরে যে আলোড়ন দেখা দিল তা-ই আমার বক্তব্য। কয়েকটা শটের মারফত সেই বক্তব্যকেই প্রকাশ করেছিলাম :

১। নেতা জেল থেকে বেরিয়ে এসে গেটের সামনে দাঁড়ালেন।

২। ছড়িয়ে-থাকা জনতা ও তাদের জয়ধ্বনি : নেতাজী কি—

৩। জেলের পাশের গাছ থেকে এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল—ছড়িয়ে পড়ল। পর্দার বাইরে থেকে শোনা গেল জনতার চিৎকার : জয়! (শব্দের প্রচণ্ডতায় পাখি উড়ে গিয়েছিল।)

৪। চারিদিকে ছড়িয়ে-থাকা জনতা ছুটে এল জেলগেটের দিকে।

৩নং ও ৪নং শটের উল্লেখ করে লিখেছিলাম : 'কবিতায় যেমন ছন্দ,

এখানেও তেমনি পাখিদের ছড়িয়ে-পড়া ও ছড়িয়ে-থাকা জনতার জোলগেটে জড়ো হওয়া—পর পর দুটো ছবির ভিতরে যেন একটা অর্থপূর্ণ ছন্দের আমেজ আছে। মূল বক্তব্যের সঙ্গে পাখি উড়ে-যাওয়া জুড়ে দিয়ে ভিতরকার একটা বক্তব্য (জনতার মনের ছবি) তৈরি হয়েছে। সে বক্তব্য চোখে দেখা যায় না—তা অনুভব করা যায়। দর্শক তাই অনুভব করবেন, জনতার মনের খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়াবেন।' গোর্কির সেই 'শারীরিক উপস্থিতির স্পষ্টতা'র কথা।

আগেকার দৃষ্টান্তটির মত এখানেও কিন্তু ডায়ালেকটিক্স্-এর কথা তখন ভাবিনি। ছন্দের আমেজ বোধ করেছিলাম মাত্র, যে আমেজ থেকে জনতার সঙ্গে দর্শকের একটা আত্মীয়তা স্থাপিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু ছবি দুটো একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে এই ইমোশন সৃষ্টির মূলেও রয়েছে বিরোধ, দ্বন্দ্ব। প্রথমত, পাখিগুলোকে দেখানো হচ্ছে ক্যামেরাকে, গাছের নিচে থেকে উপরের দিকে তুলে দিয়ে। ঠিক পরের ছবিতে জনতাকে দর্শক দেখছে উপর থেকে। ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ বিপরীতমুখী। দ্বিতীয়ত, পাখিগুলো ছড়িয়ে গেল, আর ছড়িয়ে-যাওয়া জনতা জেলগেটে জড়ো হল—linear দ্বন্দ্ব। সব মিলে দর্শকের মনে বাঞ্ছিত ইমোশনের সৃষ্টি হল—ডায়ালেকটিক্স্-এর একটি পরিষ্কার দৃষ্টান্ত।

বন্যা, ঝড, যুদ্ধ অথবা ঐ রকম কোন ব্যাপক এবং চূড়ান্ত action-পূর্ণ দৃশ্যে প্রায়ই দেখতে পাই ছোটখাট খুঁটিনাটি দৃশ্যের পরেই আসে দিগন্তজোড়া ছবি—কতকগুলো ক্লোজ-শটের পরেই বিরাট লং-শট। বানের জলে সব ভেসে যাচ্ছে—মা তার শিশুটিকে বুকে চেপে ধরেছে (ক্লোজ আপ), ঘরের চালাখানা খসে পড়ছে (ক্লোজ আপ), বানের জল কেঁপে উঠছে (ক্লোজ আপ), এক বুড়ো বেড়া বেয়ে চালে ওঠার চেষ্টা করছে (ক্লোজ আপ) এবং আরো অনেক ছোটখাট ছবি একটার পর একটা দেখানোর পরেই হঠাৎ আসে গোটা গ্রামের ছবি—বানের জলে গ্রামখানা হয়ে গেছে সমুদ্র; যতদূর চোখ যায় শুধু জল, জল আর জল। ক্লোজ-শট ও লং-শটের বিরোধের ফলে ধ্বংসের একটা ছবি ভেসে ওঠে মনের পর্দায়—ধরা-ছোঁয়ার বাইরেকার এক ছবি।

আইজেনস্টাইনের Battleship Potemkin-এ এই ধরনের বিরোধের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে। ওডেসার তীরে মেয়ে-পুরুষের ভিড় জমেছে।

বক্তা আলাময়ী ভাষায় বলে চলেছে : জনসাধারণ উপরওয়ালার অত্যাচার আর সহ্য করবে না, এই অবিচার তারা বরদাস্ত করবে না। সমস্ত জনসাধারণ এক হয়ে এক সুরে জঙ্গী আওয়াজ তুলছে—অত্যাচারের খতম হোক। বক্তা বলছে, আর সমস্ত রাগ ক্ষোভ বুকে চেপে ধরে সবাই শুনছে। দৃশ্যটির এক বিশেষ মুহূর্তে দেখানো হচ্ছে একজনের একটা হাতের ক্লোজ আপ। হাতের মুঠো খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে, পেশীগুলো শক্ত হচ্ছে শিরাগুলো ফুলছে। হঠাৎ বক্তা স্লোগান তোলে—আকাশভেদী স্লোগান। হাতখানা উপরে তুলে নেওয়া হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখানো হয় একটা বিরাট লং-শট—ওডেসার তীরে মেয়ে-পুরুষের ভিড়, জঙ্গী জনতা হাত তুলে শপথ নিচ্ছে—এ অত্যাচারকে খতম করব! ক্লোজ-শট ও লং-শটের বিরোধের ফলে এক অদ্ভুত ইমোশনের সৃষ্টি হয় দর্শকের মনে।

সাদা-কালোর অর্থাৎ আলো-ছায়ার চাতুরী আমরা সিনেমায় প্রচুর দেখতে পাই, আমাদের দেশের পরিচালকরাও তা ব্যবহার করে থাকেন এবং তা থেকে বাঞ্ছিত mood সৃষ্টি করতে তাঁরা সমর্থ হন না এমন নয়। কিন্তু সচেতন শিল্পীর কাছে এই tonal conflict যে বক্তব্য প্রকাশের দিক থেকে কত বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে তার নজির আমাদের দেশী ছবিতে বিশেষ দেখতে পাই না। আইজেনস্টাইনের Ivan the Terrible, Part I এদিক থেকে একটি আদর্শস্থানীয় ছবি। দৃষ্টান্তের অভাব নেই; বিশেষ একটি জায়গার কথা এখানে উল্লেখ করছি। কুর্‌ব্‌স্কিকে বোয়ারদের একজন নেতা কুমন্ত্রণা দিচ্ছে—জার বোয়ারদের শত্রু, তাঁকে ঐ মসনদ থেকে নামিয়ে আনতে হবে, যেমন করে হোক তাঁকে সরিয়ে দিতেই হবে। দৃশ্যটির শেষে বোয়ার-নেতা ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে, তার আলখাল্লার পিছনদিকটা মাটিতে লুটোচ্ছে। সাদা মেঝে, তার উপরে কালো আলখাল্লার বেশ একটা লম্বা অংশ সাপের মত এঁকে বেঁকে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। প্রথমত লম্বা সিঁড়ির আড়াআড়ি আলখাল্লার লম্বা অংশটি উঠছে—linear conflict, তার উপর সাদা মেঝেতে কালো আলখাল্লার ঐ অংশটি চলার ফলে যে tonal বিরোধের সৃষ্টি হল তার ভিতর থেকে পরিষ্কার ফুটে বেরুচ্ছে চরিত্রটির মনের কুৎসিত ছবি।

আমাদের দেশে এই জাতীয় একখানা ছবি দেখেছিলাম যার ভিতর tonal conflict অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে। ছবিখানা

চেতন আনন্দ-এর পরিচালনায় তোলা হয়েছে—নীচানগর। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিষয়বস্তুর দুর্বলতার জন্তে দর্শকের কাছে ছবিটির আঙ্গিক যথেষ্ট হৃদয়-গ্রাহী হয়ে উঠতে পারেনি।

ডায়ালেকটিক দৃষ্টি অনুযায়ী দুনিয়ার কোন কিছুই স্থানুধর্মী নয়। প্রত্যেক জিনিসই গতিশীল ও পরিবর্তনশীল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া, পরিবর্তনের ধারার বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারা যায় যে দুনিয়ার কোন জিনিসেরই অস্তিত্ব একেবারে স্বাধীন ও অন্ত-নিরপেক্ষ নয়। প্রত্যেক বস্তুই অপর অনেক বস্তুর উপর নির্ভরশীল। বাস্তব সত্তার পরিবর্তনশীলতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দরুণ দুনিয়ার কোন কিছুই শাশ্বত ও চিরন্তন নয়। এক অবস্থায় যা সত্যি, অন্ত অবস্থায় তা সত্যি নাও হতে পারে। অবস্থার পরিবর্তনের ফলে বাস্তব সত্তার মূল ধারণাটাই বদলে যেতে পারে—ডায়ালেকটিক্‌স্-এর এ এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জলের উত্তাপ বাড়ালে তা বাষ্পে পরিণত হওয়া আর উত্তাপ কমালে বরফ হয়ে যাওয়া এই বৈশিষ্ট্যের একটি অত্যন্ত ঘরোয়া দৃষ্টান্ত।

অথবা ধরুন, একটি কিশোর ঘেমে নেয়ে দৌড়ে এসেছে আপনার কাছে, পুলিশ তাকে তাড়া করেছে। আপনি তাকে আশ্রয় দিলেন। কয়েক মিনিট পরেই বন্দুক উঁচিয়ে পুলিশ আপনার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'একটি ছেলেকে এখান দিয়ে যেতে দেখেছেন?' আপনি একটুও ইতস্তত না করে সঙ্গে সঙ্গে উল্টো রাস্তা দেখিয়ে দিলেন, পুলিশ দৌড়ে সেদিকে চলে গেল। এখানে কি হল? আপনি জানেন, মিথ্যে কথা বলা অন্যায়, মানুষকে ছোট করে দেয়—এটাই সাধারণভাবে বাস্তব ধারণা। কিন্তু এখানে পুলিশের কাছে মিথ্যে বলাতে অন্যায় তো হলই না বরং মানুষ হিসেবে তা আপনাকে মহৎ করে তুলল। অর্থাৎ বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনের ফলে মিথ্যে সম্বন্ধে মূল ধারণাটাই গেল বদলে।

ডায়ালেকটিক্‌স্-এর এই বৈশিষ্ট্য সিনেমাতে অতি নিখুঁত ভাবে রূপায়িত হয়েছে আইজেনস্টাইনের Battleship Potemkin-এ। উপরওয়ালারা জাহাজের অবাধ্য নাবিকদের ডেকের উপর জড়ো করেছে তাদের গুলি করে মারবে বলে। পচা মাংস তারা খেতে রাজি নয় বলেই তাদের এই মৃত্যুদণ্ড। একখানা সাদা ত্রিপল দিয়ে নাবিকদের আগাগোড়া ঢেকে রাখা হয়েছে। এই দৃশ্য দেখানোর জন্তে ভীতু নাবিকদেব ডেকের একপাশে দাঁড়

করিয়ে রাখা হয়েছে, ভবিষ্যতে যাতে তারা বেয়াদপি না করে। বন্দুক উঁচিয়ে এক সার সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে ত্রিপলে-যোড়া নাবিকদের মুখোমুখি। অনেকগুলো শটের মাঝে মাঝে এই নাবিকদের দেখানো হচ্ছে। অবশ্য পা ছাড়া তাদের আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না, সাদা ত্রিপলটাই সব কিছু ঢেকে রেখেছে।...কিছুক্ষণ কেটে গেল। ভীতুদের ভিতর থেকে হঠাৎ একজন লাফিয়ে উঠল। হাওয়া গেল বদলে। সৈন্যরা গুলি করতে রাজি হল না, বন্দুক নামিয়ে ফেলল।...ত্রিপল ঠেলে বেরিয়ে এল অবাধ্য নাবিকের দল, তারা বিদ্রোহ করল। দেখতে দেখতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত জাহাজে; ...গুলি চলল, লাঠি চলল, চলল ধস্তাধস্তি। আর তারই মধ্যে লং-শটে কয়েকবার দেখানো হল সাদা ত্রিপলখানা ডেকের উপর হাওয়ায় উড়ছে। বিদ্রোহীরা জাহাজটাকে দখল করল।

এখানে ডায়ালেকটিক্‌স্ ঘটছে সাদা ত্রিপলটাকে কেন্দ্র করে। বিদ্রোহের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সাদা ত্রিপলটাকে দেখে ভয় করেছে, গা শিউরে উঠেছে। ওরই সঙ্গে যেন জড়িয়ে রয়েছে উপরওয়ালাদের অত্যাচার, তাদের অবিচার, তাদের নগ্ন হিংস্রতা। কিন্তু বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে যখনই ত্রিপলটাকে দেখেছি ডেকের উপর হাওয়ায় উড়ছে, মনে আনন্দে নেচে উঠছে। ত্রিপলের রূপান্তর ঘটেছে, বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে দর্শকের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। ঘটনার পরিবর্তনের ফলে বর্বরতার প্রতীক দেখা দিচ্ছে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে, জয়ের প্রতীক হয়ে।

আইজেনস্টাইনের তখন মাত্র ২৭ বছর বয়স, এবং যতদূর জানি তিনি তখন ডায়ালেকটিক্‌স্ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাচ্ছিলেন না। পরবর্তী জীবনে তিনি উপরোক্ত দৃশ্যের ডায়ালেকটিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু জানাই হোক আর অজানাই হোক দৃশ্যটিতে ডায়ালেকটিক্‌স্ এসে পড়েছে।

এমনিই আসে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির সময় বিষয়বস্তুর বা আঙ্গিকের কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে না, অথবা থাকলেও শিল্পীর কাছে তা পরিষ্কার নয়। বিখ্যাত জার্মান সুরকার রিচার্ড ভাগ্‌নার যখন সঙ্গীত-সাধনায় ডুবে আছেন এবং তাঁর সেরা কম্পোজিশনগুলো তৈরি করছেন তখন তাঁকে কোন একটি বিশিষ্ট পত্রিকায় সঙ্গীতের থিয়োরি সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়।

কিন্তু ভাগ্নার তখন তা দেখেন নি, সোজাসুজি বলে দিয়েছিলেন,—When you create, you do not explain. উপরের আলোচনার ভিতরেও আমরা দেখেছি শিল্পীর অজান্তে অনেক সময় সিনেমার আঙ্গিকে ডায়ালেকটিক্‌স্‌-এর প্রভাব এসে পড়েছে। এ থেকে মনে হতে পারে যে অজান্তেই যখন সব হচ্ছে, তবে তা-ই হোক, বক্তব্যের তাগিদে যতটুকু আসে আসুক, 'এ্যাকস্ট্রাক্ট' থিয়োরি নিয়ে আগে থেকে কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই ধারণা মারাত্মক রকমের ভুল। আলোচনা আমরা নিশ্চয়ই করব, সিনেমার থিয়োরিকে যতটা শক্তিশালী করতে পারা যায় করব এবং বক্তব্যকে সুন্দর ও পরিষ্কার করে প্রকাশ করতে সেই থিয়োরিকে কাজে লাগাব। সঙ্গে সঙ্গে একথা ভুললে চলবে না যে আঙ্গিককে অকারণ প্রাধান্য কিছুতেই দেব না, ফর্মকে কখনো ফর্মুলায় পর্যবসিত করব না। বিষয়বস্তুই প্রধান এবং তাকে প্রকাশ করতে বলিষ্ঠ ফর্ম অপরিহার্য। এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করাই হচ্ছে শিল্পীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব,—এবং আইজেনস্টাইন তাঁর শেষ জীবনে সেই যোগসূত্র রক্ষা করতে পারেননি বলেই যে কয়েকটি মহল থেকে তাঁর শেষ ছবির (Ivan the Terrible—Part II) জন্যে তিনি ফর্মালিস্ট বলে অভিযুক্ত হয়েছিলেন একথা আজ আর কারো অজানা নেই।

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক কলা প্রেস, ৩ ডেকার্স লেন থেকে
মুদ্রিত ও ৩০১, বহুবাজার স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত।

বিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : কার্তিক ১৩৫৭

লেনিন ও সোভিয়েট সাহিত্যের জন্ম

ভি. আইভানভ

বলশেভিক পার্টি ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের মহান প্রতিষ্ঠাতা ভি. আই. লেনিন সাহিত্যের উপর সবিশেষ তাৎপর্য আরোপ করেছেন ও গণশিক্ষার উপায় হিসাবে সাহিত্যের বিরাট গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।

মহান অক্টোবর সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের বহু পূর্বেই তিনি সংস্কৃতি ও নন্দন-তত্ত্বের মূল সমস্যাগুলোকে এবং শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মূল নীতি-গুলোকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন।

এই বিষয়ে লেনিনের পথনির্দেশক প্রবন্ধ হচ্ছে 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য'। এই প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যে বলশেভিক কর্মসূচীর মৌলিক নীতিগুলোকে উপস্থিত করেছেন। ১৯০৫ সালের বিপ্লব যখন পুরো দমে চলছে সেই সময়ে এই প্রবন্ধ লেখা এবং এই ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় বৈপ্লবিক আন্দোলনে সাহিত্যের ভূমিকাকে তিনি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।

শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পার্টির কর্মসূচী এই প্রবন্ধটিতে পরিস্ফুট হয়েছিল এবং আজও এই প্রবন্ধটির তাৎপর্য অক্ষুণ্ণ আছে।

এই প্রবন্ধে যে মূল নীতিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা হচ্ছে সাহিত্যে পার্টি-চৈতন্যের নীতি। অর্থাৎ, শ্রমিক শ্রেণী তথা সকল শ্রমজীবী জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে সাহিত্যের যোগসূত্র স্থাপন করার অত্যাবশ্যকতার নীতি।

লেনিনের কথার সারমর্ম হচ্ছে এই—"সর্বহারা শ্রেণীর যে সামগ্রিক স্বার্থ তারই অংশবিশেষ হোক সাহিত্য..."

স্মরণ থাকতে পারে যে অক্টোবর সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের পরে প্রথম কয়েক বছর নবজাত সোভিয়েট রিপাব্লিকের প্রধান কর্তব্য ছিল শ্বেতরক্ষী ও হস্তক্ষেপকারীদের পরাজিত করা। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েট জনসাধারণ যেমন যুদ্ধ করেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই একই সময়ে অর্থনৈতিক সংগঠনও সাংস্কৃতিক বিকাশের দিক থেকে বড় রকমের কাজও অবশ্য পরিচালনা করেছে।

১৯১৯ সালে লেনিন লিখেছেন—"এটা খুবই স্বাভাবিক ও অপরিহার্য যে সর্বহারা বিপ্লবের পরে প্রথম যুগে আমাদের প্রধানত ব্যস্ত থাকতে হবে মুখ্য ও মৌলিক কাজে—বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ পরাস্ত করা, শোষণকারীদের নিশ্চিহ্ন করা, তাদের বড়যন্ত্র গুঁড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে এবং যতই সময় যেতে থাকে, আর একটি কাজও সামনে এসে হাজির হয় এবং সমান অপরিহার্য ও আরও বেশি জরুরি হয়ে ওঠে। এই অত্যাবশ্যক কাজটি হচ্ছে বাস্তব সাম্যবাদী গঠনকার্য...।"

এই বাস্তব সাম্যবাদী গঠনকার্যে সংস্কৃতি-গঠনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ আর সাহিত্য হচ্ছে এই সংস্কৃতি-গঠনেরই অংশবিশেষ।

নতুন সোশ্যালিস্ট সংস্কৃতি গঠনের পথ নির্ধারিত করবার সময় অতীতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল।

বিভিন্ন মতাবলম্বী "কালাপাহাড়ীরা" (iconoclasts) চেয়েছিল সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে অগ্রাহ্য করতে। বিপ্লবের ঠিক পরের যুগে তারা যতটা উচ্চকণ্ঠ হয়েছিল তেমন আর কখনো হয়নি। এই লোকগুলো যদিও বিপ্লবের ধারে কাছে ছিল না, এমন কি তার বিরোধিতা করেছিল—তারাই এমন একটা ভাব করতে লাগল যেন তারা পাকাপোক্ত বিপ্লবী।

পুরনো সংস্কৃতি, বিশেষ করে বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের উত্তরদানকে অগ্রাহ্য করবার এই সব প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লেনিন অক্টোবর বিপ্লবের আগে থেকেই শক্ত হাতে সংগ্রাম করে এসেছেন। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পরে যে কয়েক বছর প্রতিক্রিয়ার যুগ চলেছিল সেই সময়ে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার প্রশ্নটির উপর অনমনীয় সংগ্রাম চলে।

সেই সময়ে বলশেভিকবাদের শত্রুদের মধ্যে বিশেষভাবে মারাত্মক হয়ে উঠেছিল মাশ্‌পন্থীরা (Machians)। এরা মার্কসবাদের ভোল এঁটে নিজেদের চালাবার চেষ্টা করত। মাশ্‌পন্থীদের তত্ত্বজ্ঞানী বোগ্‌দানভ ও তার অনুগামীরা পূর্ববর্তী সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে। বোগদানভের "মতবাদ" ছিল এই যে সর্বহারাসংস্কৃতিকে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে, পুরনো সাংস্কৃতিক সম্পদ বাতিল—কারণ তার সঙ্গে সর্বহারার কোন সম্পর্ক নেই।

"মেটিরিয়ালিজ্‌ম্ এণ্ড এম্‌পিরিও ক্রিটিসিজ্‌ম্" (১৯০৯) বইয়ে লেনিন মাশাপন্থী দর্শনকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিলেন। এই দর্শনই ছিল বোগ্‌দানভ ও তার অনুগামীদের মতাদর্শগত পটভূমি।

সোশ্যালিস্ট সংস্কৃতিকে বিকশিত করার পথ সম্পর্কে খাঁটি বৈজ্ঞানিক থিওরিকে লেনিন বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এই মতবাদ প্রচার করেন যে সংস্কৃতিকে আরও বিকশিত করতে হলে অতীতের উত্তরাধিকারকে শুরু হিসাবে ধরতে হবে।

ক্লারা জেট্‌কিনের সঙ্গে কথোপকথনে লেনিন বলেছেন—"যা সত্যিকারের সুন্দর তা থেকে কেন আমরা মুখ ফিরিয়ে নেব? কেন সেখান থেকেই শুরু করে আরও বিকশিত করে তুলব না—কারণ তা 'পুরনো' এইজন্যেই কি?"

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অতীতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে বিচার করতে গিয়ে লেনিন অবশ্য একথাও বলেছেন যে প্রত্যেক জাতির মধ্যে দুটি সংস্কৃতি আছে—শাসক শ্রেণীর সংস্কৃতি ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক স্তরের সংস্কৃতি। রুশদেশে এই শেষোক্ত সংস্কৃতির প্রতিভূ চের্নিশেভস্কি ও প্লেখানভ। লেনিন জোর দিয়ে একথা বলেছেন যে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিপোষক সর্বহারা শ্রেণী।

১৯৪৬ সালে এ. জ্‌দানভ বলেছেন—"রুশ দেশের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক মহৎ লেখক ও সমালোচক বেলিন্‌স্কি, দোব্রোলিউবভ, চের্নিশেভস্কি, সাল্‌তীকভ-স্চেদ্রিন ও প্লেখানভ—সাহিত্য ক্ষেত্রে এঁদের তাৎপর্য আমাদের পার্টি লেনিন ও স্টালিনের জবানিতে বারবার স্বীকার করেছে।"

সংস্কৃতির নানা প্রশ্নের উপর লেনিনের মতামত অনুধাবন করলে কোন সন্দেহই থাকে না যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতিনিধিরাই অতীতের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। লেনিন বলেছেন যে অভিজাত ও বুর্জোয়া-শ্রেণী থেকে যে-সব সেরা শিল্পী এসেছেন তাঁদের শিল্পকর্মের "বিশ্বজনীন তাৎপর্য"

আছে এবং তা এইজন্তেই যে এই শিল্পকর্ম বাস্তবকে নিখুঁত ভাবে রূপায়িত করে জনসাধারণের মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করেছে।

অপর পক্ষে লেনিন একথার উপরও জোর দিয়েছেন যে অতীতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে আত্মস্থ করবার সময় বিচার-বিবেচনা করতে হবে; এ সম্পর্কে দাসসুলভ ও কৈফিয়ৎদায়ী মনোভাবকে তিনি নিন্দা করেছেন।

অতীতের সংস্কৃতি সম্পর্কে লেনিনের মনোভাবের আদর্শ উদাহরণ হচ্ছে লিও টলস্টয় সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধাবলী। তিনি এই মহৎ লেখকের রচনাবলীর জোরালো দিকটাই শুধু আলোচনা করেননি, দুর্বলতাও দেখিয়েছেন। ভূস্বামী-স্বৈরশাসিত সমাজের নিষ্করুণ সমালোচক এবং অনন্যসাধারণ শিল্পী হিসাবে টলস্টয় হচ্ছেন মানুষের শিল্পগত বিকাশের একটি অগ্রসর পদক্ষেপ— লেনিন একথা যেমন উল্লেখ করেছেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নীতিগত বিচারের দিক থেকে একথার উপরেও জোর দিয়েছেন যে অন্য দিকে টলস্টয়ের দার্শনিক মতবাদ সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকারক। টলস্টয়ের বলিষ্ঠ নির্ভীক বাস্তবতা এবং শোষণ ব্যবস্থার অবিচার ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদকে সর্বহারা শ্রেণী ভালবাসে ও যথোচিত মূল্য দেয় কিন্তু তাঁর ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়াশীল ইউটোপিয়ান দর্শনকে অগ্রাহ্য করে।

রুশ সাহিত্যের অন্যান্য ক্লাসিক সম্পর্কেও লেনিন অনুরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্য নির্ধারণ করেছেন।

প্রাচীন সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা, যে ধারাবাহিকতা নিষ্ক্রিয় নয় সৃষ্টিশীল, তার প্রশ্ন এবং সর্বহারার স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই ঐতিহ্যকে নতুন এক স্তরে বিকশিত করে তোলবার প্রশ্ন এইভাবে লেনিন উত্থাপন করেছেন। বিপ্লব-বিরোধী বুদ্ধিজীবীদের দাবির পাল্টা লেনিন দেখিয়েছিলেন যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অক্টোবর বিপ্লবের বিরাট তাৎপর্য ঠিক এইখানেই যে অক্টোবর বিপ্লব সাংস্কৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করেনি বরং পুঁজিবাদের আওতায় সংস্কৃতির অবধারিত ধ্বংস থেকে সংস্কৃতিকে বাঁচায়। এ ছাড়া আর একটি ঘটনায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপ্লবের তাৎপর্য লেনিন দেখিয়েছিলেন; তা হচ্ছে এই যে বিপ্লবের ফলে "আঙ্গিকের দিক থেকে যা কিছু আশ্চর্য রকমের চমৎকার, এবং সংস্কৃতির যা কিছু অবদান সমস্তই জনসাধারণের সম্পত্তি হয়ে ওঠে।"

নিরলস ভাবে লেনিন বারবার একথা বলেছেন যে এই সমস্ত অবদানকে

আয়ত্ত করতে হবে। 'সোভিয়েট শক্তির সাফল্য ও বাধাবিপত্তি' প্রবন্ধে লেনিন লিখেছেন, "পুঁজিবাদের কাছ থেকে যা কিছু সংস্কৃতি আমরা পেয়েছি তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং তা থেকেই সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে। সমস্ত বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, সমস্ত জ্ঞান, শিল্পকে গ্রহণ করতে হবে।"

১৯২০ সালের ২রা অক্টোবর রুশ দেশের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের তৃতীয় কংগ্রেসে লেনিন যে বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই বক্তৃতায় তিনি বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছিলেন অধ্যয়ন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এবং মানুষের সমাজের যা কিছু সব চেয়ে চমৎকার সৃষ্টি তাকে বিচারবিশ্লেষণ করে আয়ত্ত করা সম্পর্কে। সোভিয়েট সংস্কৃতির বিকাশে এই ঐতিহাসিক বক্তৃতাটির বিরাট ভূমিকা আছে। এই বক্তৃতায় লেনিন অত্যন্ত জোরের সঙ্গে একথা বলেছেন যে অতীতের সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করেই সোশ্যালিস্ট সংস্কৃতির বিকাশ হতে পারে এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রকে যাঁরা গড়ে তুলছেন সেই সব ভবিষ্যৎ বংশধররা এই বক্তৃতাটিকে আশ্রয় করেই বড় হয়েছেন।

লেনিন বলেছেন, "যতক্ষণ না আমরা একথা পরিষ্কার ভাবে বুঝি যে সমগ্র ভাবে মানবিক বিকাশ যে-সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান এবং সেই সংস্কৃতির পুনর্গঠনের দ্বারাই সর্বহারা সংস্কৃতি সৃষ্টি করা সম্ভব, যতক্ষণ না এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয়, আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারব না। সর্বহারা সংস্কৃতি এমন কিছু নয় যা কোথা থেকে গজিয়ে উঠবে কেউ জানে না, বা যারা নিজেদের সর্বহারা-সংস্কৃতিবিশারদ বলে পরিচয় দেয় তাদের আবিষ্কারও নয়। এ সমস্তই অর্থহীন কথা। পুঁজিবাদী সমাজ, জায়গীরদারী সমাজ ও আমলাতান্ত্রিক সমাজের নাগপাশে আবদ্ধ থেকেও মানুষ যে জ্ঞানের ভাণ্ডার সঞ্চয় করেছে তার স্বাভাবিক বিকাশের পরিণতিই হবে সর্বহারা সংস্কৃতি।"

লেনিনের এই সমস্ত নির্দেশ কাজে পরিণত করবার জন্তে প্রচুর খাটতে হয়েছে। প্রাচীন সম্পদের মধ্যে যা কিছু মূল্যবান, শ্রমজীবী মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও বৃদ্ধিকে যা কিছু সহায়তা করে তা সংগৃহীত করা হয়েছে। এই কাজেরই অন্তর্ভুক্ত দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্পের ক্ষেত্রে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের নামে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ, রুশ ক্লাসিকসমূহ প্রকাশ, পুস্তক সঞ্চয়নাগার, বৈজ্ঞানিকদের প্রতি অভিনিবেশ এবং আরও বহু সিদ্ধান্ত। সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রথম বছরে এবং লেনিনের উদ্যমে এই সিদ্ধান্তগুলি সরকারী ভাবে গৃহীত হয়।

অনেক আগেই, ১৮৯৭ সালে 'কোন্ ঐতিহ্যকে আমরা বর্জন করব' প্রবন্ধে লেনিন বলেছেন, "কোন একটি ঐতিহ্য সংরক্ষণের অর্থ এই নয় যে সেই ঐতিহ্যের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে।" আর সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পরে তো বিশেষ করে প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকা চলতেই পারে না। সোশ্যালিস্ট সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার কাজে এই ঐতিহ্যকে শুরু হিসাবে ধরতে হবে এই ছিল লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তিনি মনে করতেন যে মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে সর্বহারার স্বার্থে নতুন ভিত্তির উপরে একটি নতুন সংস্কৃতি ও নতুন শিল্প-সাহিত্য বিকশিত করা। বিপ্লবের সূচনায় একেবারে গোড়ার দিকেই "সর্বহারা যখন নিজেরাই নিজেদের জীবনকে রূপায়িত করছে তখন সর্বহারার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন পুরনো সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার দায়িত্ব লেনিন তুলে ধরেছিলেন।"

নতুন সোশ্যালিস্ট সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজ ভয়ানক দুঃসাধ্য মনে হয়েছিল, তার প্রধান কারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত লোকের অভাব। লেনিন এই বলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে যদি না "বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষিত কুশলীদের একটি বিরাট কর্মীবাহিনী থাকে···তবে সোশ্যালিজম প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।" আর এটাও প্রত্যক্ষ বাস্তব যে সর্বহারার ভিতর এই ধরনের বিশেষজ্ঞ-বাহিনী ছিল না। তাদের শিক্ষা দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ। এই কারণেই ১৯১৮ সালের বসন্তকালে লেনিন 'সোভিয়েট গভর্নমেন্টের আশু কর্তব্য' প্রবন্ধে এই প্রশ্ন তুললেন যে পুরনো বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগাতে হবে।

পরে, ১৯১৯ সালে লেনিন লিখেছেন, "পুঁজিবাদী শিক্ষায় যারা আমাদের বিরুদ্ধচারী হয়েছিল তাদের জয় করে আমাদের কাজে লাগানো—এই হচ্ছে বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের কাজ।"

স্পষ্টই বোঝা যায় প্রশ্নটা হচ্ছে সেই সব বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে যারা মতাদর্শের দিক থেকে বিপ্লবের মধ্যে এসে পড়েছে এবং কোন না কোন দিক থেকে বিপ্লবকে গ্রহণ করেছে।

বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা "টাকার থলি"কে সেবা করেছে আর তাদের মধ্যে যে সত্যিকারের শিক্ষিত স্তরটি নিষ্ঠার সঙ্গে বিপ্লবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে—এই দু-দলের মধ্যে লেনিন পার্থক্য টেনেছেন।

লেনিন লিখেছেন, "শিক্ষিত লোকেরা ইতিমধ্যেই জনসাধারণের পক্ষে ও শ্রমজীবীদের পক্ষে চলে আসছে এবং পুঁজির প্রতিরোধ ভেঙে ফেলতে সাহায্য করছে।"

এই ধরনের লোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছিল। প্রাক্-বিপ্লব বুর্জোয়া অভিজাত সাহিত্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বহু দিক্‌পাল ছিলেন—যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রখ্যাত কবি আলেক্‌জান্দার ব্লোক ও ভালেরি ব্রিউসভ্‌-এর মত ব্যক্তি। ব্লোক ও ব্রিউসভ যে তাঁদের ভূতপূর্ব "বন্ধুদের" গালাগালি-বর্ষণ সত্ত্বেও অক্টোবর বিপ্লবের একেবারে গোড়ার দিকেই বিপ্লবের শিবিরে চলে এলেন এবং বিপ্লবের উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রতিভাকে নিয়োজিত করলেন তা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বা লেনিনের উক্তিকে যথার্থ প্রমাণ করবার জন্যেই যে তাঁরা এ কাজ করেছিলেন তাও ঠিক নয়। বিপ্লবই ব্লোককে তাঁর বিখ্যাত "দি টুয়েল্‌ভ্‌" লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে সোভিয়েটের বিশেষজ্ঞদের শিক্ষিত করে তোলাটাই বোধ হয় সবচেয়ে শক্ত কাজ ছিল। নতুন লেখক বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল একমাত্র জনসাধারণের ভিতর থেকে—জনসাধারণই হচ্ছে প্রতিভার অফুরন্ত উৎস-মুখ। লেনিন বলেছিলেন যে একমাত্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেই শ্রমজীবী জনসাধারণ "...তাদের যোগ্যতা দেখাতে পারে, কর্মক্ষমতা বিকশিত করে তুলতে পারে, প্রতিভার লক্ষণ দেখাতে পারে। এই গুণগুলি জনসাধারণের মধ্যে অনিষ্কাশিত ফল্গু ধারার মত বর্তমান আছে এবং পুঁজিবাদ একে পিষে ফেলেছে, দমিয়ে রেখেছে, হাজার হাজার, লাখ লাখ লোকের মধ্যে একে রুদ্ধশ্বাস করে রেখেছে।"

শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে প্রতিভা খুঁজে বার করা এবং শিল্প ও জ্ঞানবিজ্ঞান সমেত সকল প্রকার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তাদের কুশলী করে তোলা—এই ছিল একটি মুখ্য দায়িত্ব। এই বিষয়ে প্রলেট্‌কাল্‌ট্‌* হস্তক্ষেপ করবার চেষ্টা করে। এই সংগঠনটির নামের ভিতরেই এর উদ্দেশ্য ঘোষিত হচ্ছে—সর্বহারা সংস্কৃতির প্রসার করা। অবশ্য এই উদ্দেশ্য সফল হয়নি এবং সফল হওয়া সম্ভবও ছিল না—কারণ এর দর্শনগত ও সংগঠনগত কাঠামোটাই

*প্রলেট্‌কাল্‌ট্‌ হচ্ছে একটি সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান; ১৯১৭ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত এর অস্তিত্ব ছিল।

ছিল ভ্রান্ত, এবং অত্যন্ত ভয়ানক রকমের রাজনৈতিক ভুলে ও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

প্রলেট্‌কাল্‌ট্‌-এর সব চেয়ে বড় ভুল হয়েছিল এই যে এরা অতীতের সংস্কৃতিকে বর্জন করে, অর্থাৎ লেনিন যে কথা বলেছিলেন যে এই সংস্কৃতিকে বিচার বিশ্লেষণ করে আত্মস্থ করা—ঠিক তার উল্টোটি এরা করে।

প্রলেট্‌কাল্‌ট-এর আরও একটি ভুল হচ্ছে এই যে এরা ল্যাবরেটরিতে বসেই নতুন সর্বহারা সংস্কৃতি "সৃষ্টি" করবার চেষ্টা করে।

প্রলেট্‌কাল্‌ট-এর "তত্ত্বজ্ঞানীদের" মতে নতুন সমাজ গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে বা বুর্জোয়া মতাদর্শগত প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সোশ্যালিস্ট সংস্কৃতি গড়ে ওঠে না—সোশ্যালিস্ট সংস্কৃতি সৃষ্টি হয় কতকগুলি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে, জীবন ও সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি স্টুডিওতে। নতুন সাহিত্য ও নতুন শিল্পের "নির্মাণকারীরা" এখানেই জন্ম নেবে এবং এগুলো হবে তাদের পালনাগার। শ্রমজীবী জনসাধারণেরও যে এই বিষয়ে অবদান আছে সেকথা এই বিচারভঙ্গিতে অস্বীকৃত হয়েছে। এর আসল কথাটা হচ্ছে এই যে "কয়েকজন বিশেষজ্ঞ" একটি "সর্বহারা সংস্কৃতি" তৈরি অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর কাছে পরিবেশণ করবে এবং এই সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে নেওয়ার দায়িত্ব শ্রমিক শ্রেণীর।

প্রলেট্‌কাল্‌ট-এর আর একটি মূলগত ভুল হচ্ছে এই যে এদের ঝোঁক ছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখা—উদ্দেশ্য, নিজেদের "স্বাধীনতা" ও সংস্কৃতি ব্যাপারে নিজেদের "একচেটিয়া অধিকার" বজায় রাখা।

এই সমস্ত কারণে প্রলেট্‌কাল্‌ট জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যে প্রলেট্‌কাল্‌ট কোন রকম সাড়া জাগাতে পারেনি। শ্রমিক শ্রেণীর কবি ও শিল্পীরা এই সব স্টুডিওতে এসে নিজেদের শ্রেণী থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। কোন নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই একথা প্রমাণ হয়েছিল। বুর্জোয়া কবিতার মোহে তাঁরা আচ্ছন্ন ছিলেন, মাঝে মাঝে পেটি-বুর্জোয়া যথেচ্ছাচার (বোহেমিয়ানিজ্‌ম্‌)-এ পদস্খলন হয়েছিল।

যে আদিম প্রক্রিয়ায় প্রলেট্‌কাল্‌ট "সর্বহারা সংস্কৃতির আবাদ" করবার চেষ্টা করছিল তাকে লেনিন তীব্রভাবে বিদ্রূপ করেছেন। বারবার

তিনি বলেছেন যে সমগ্র শ্রমজীবী জনসাধারণের সাংস্কৃতিক মান উন্নত করতে হবে, উচ্চতর শিক্ষা সমেত গণশিক্ষার ব্যাপক প্রসার করতে হবে। নতুন সোশ্যালিস্ট অগ্রগতির জন্যে যে জনসাধারণ প্রয়োজন তাকে গড়ে তুলবার এই হচ্ছে উপায়, একথা লেনিন বুঝেছিলেন।

লেনিন মনে করতেন যে সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক প্রয়োজন সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটানো। গৃহযুদ্ধের পরে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচী আশু করণীয় হিসাবে গৃহীত হল।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা বলতে গিয়ে লেনিন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদীদের একটি মূল গোঁড়ামিকে খণ্ডন করেছিলেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদীরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে একথা বলত যে সর্বহারা বিপ্লবের আগে দরকার সর্বহারা শ্রেণীর একদল সাংস্কৃতিক ও দেশ-শাসনপটু কর্মীবাহিনীকে পুঁজিবাদী অবস্থার মধ্যে শিক্ষিত করে নেওয়া। এই কাজটি শেষ হলে তবেই বিত্তহীনরা ক্ষমতা হস্তগত করতে পারে। প্রলেটকাল্ট-এর "নেতা" বোগদানভ সমেত রুশদেশের মেনশেভিকদেরও এই গোঁড়ামি ছিল। পেটি-বুর্জোয়া ডেমোক্রাটদের এই ধরনের কাপুরুষোচিত বুক্তিজাল-বিস্তারকে লেনিন প্রচণ্ড আঘাতে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন।

"সোশ্যালিজম সৃষ্টির জন্যে যদি সংস্কৃতির একটি বিশেষ মানের প্রয়োজন হয় (যদিও কেউ বলতে পারে না এই সংস্কৃতির বিশেষ মানটি কি), তবে কেন আমরা এইভাবে কাজ শুরু করতে পারি না যে প্রথমে সংস্কৃতির এই বিশেষ মানের জন্যে প্রাথমিক প্রয়োজন যেটুকু তা বৈপ্লবিক উপায়ে সৃষ্টি করব এবং তারপর শ্রমিক-চাষী গভর্নমেন্ট ও সোভিয়েট ব্যবস্থার সহায়তায় অন্যান্য জাতিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাব ?"

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা বলতে গিয়ে কি ভাবে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে কার্যকরী করা যায় তার বাস্তব পথ ও উপায়ের ছক কেটে দিয়েছেন লেনিন—সোভিয়েট ব্যবস্থার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক শক্তিগুলো শিক্ষিত করে তোলার মধ্যে দিয়ে।

শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলের এবং সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তবর্তী জাতিগুলির শ্রমজীবী জনসাধারণের সাংস্কৃতিক মান উন্নত করে তোলবার জন্যে লেনিন ও স্টালিন পর্যায়ক্রমে কতকগুলি ব্যবস্থার ছক কেটে দিয়েছেন।

সোভিয়েট সাহিত্যের বিকাশের পরবর্তী সময়ে—যখন জনসাধারণ

সংস্কৃতির আস্বাদ পেয়েছে এবং সোভিয়েট লেখকদের প্রধান অংশ বেরিয়ে আসছে জনসাধারণের ভিতর থেকে—সে সময়ে এই ব্যবস্থাগুলি বিরাট একটি ভূমিকা নিয়েছে। এইভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটা ছিল এক ধরনের দীর্ঘ-মেয়াদী নীতি।

সোভিয়েট গভর্নমেন্ট ও কমিউনিস্ট পার্টি স্বভাবতই নিজেদের শুধুমাত্র ভবিষ্যত প্রত্যাশার মধ্যে নিবদ্ধ রাখতে পারেননি। সোভিয়েট রিপাবলিককে রক্ষা করা ও সোশ্যালিজম গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করে এমন একটি সাহিত্য জনসাধারণের পক্ষে তখনই দরকার হয়েছিল। বস্তুত, বিপ্লবের সূত্রপাত থেকেই এমন একটি সাহিত্যের অস্তিত্বও ছিল।

'১৫,০০,০০,০০০ মিস্ট্রি-ব্যুফ্' ইত্যাদি ধরনের প্রধান প্রধান রচনা ছাড়াও প্রখ্যাত কবি ভ্লাদিমির মায়াকভ্স্কি এমন কতকগুলি কবিতা লিখেছিলেন যার মধ্যে বৈপ্লবিক আবেগ অনুরণিত হয়েছিল।

এই সময়ে কবি তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয় করতেন কবিতায় প্রচারপত্রের শিরোনামা লেখার কাজে। রুশদেশের সংবাদ-প্রতিষ্ঠান 'রস্তা'র জন্যে এই প্রচারপত্র লেখা হত।

দেমিয়ান বেদ্নির কবিতা সব চেয়ে পরিণতি লাভ করে গৃহযুদ্ধের সমরকার বছরগুলিতে। যুদ্ধক্ষেত্রে লালফৌজের সৈন্যদের মধ্যে এবং যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনে শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে তাঁর অনেকগুলি কবিতা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

গৃহযুদ্ধের অল্প কিছুকাল পরেই সেরাফিমোভিচের 'লৌহবন্যা', ফুর্মানভের 'চাপায়েভ্', গ্লাদ্কভের 'সিমেন্ট' এবং সোভিয়েট সাহিত্যের অন্যান্য বহু সেরা রচনা প্রকাশিত হয়। এই সময়ে—শুধু এই সময়ে কেন, তাঁর সারা জীবনেই—ম্যাক্সিম গোর্কির ভূমিকা বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মহৎ সর্বহারা লেখক ও সমাজবাদী বাস্তবতার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শিক্ষক ও উপদেষ্টা—শুধু পুরনো যুগের সোভিয়েট লেখকদের নয়, সমগ্রভাবে সোভিয়েট শিল্প-সাহিত্যের।

সোভিয়েট ব্যবস্থার বছরগুলিতে গোর্কি যে শুধু নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্যে বিরাট সাংগঠনিক কাজ করেছেন তা নয়, তাঁর কতগুলি সেরা বইও এই সময়ে তিনি লিখেছেন—যেমন, 'আমার বিশ্ববিদ্যালয়', 'আর্তামনোভ্ কাহিনী', 'ক্লিম সাম্গিনের জীবনী', ইত্যাদি।

এই সমস্ত বিখ্যাত লেখকদের পাশাপাশি ছিলেন বৈপ্লবিক উদ্দীপনায় ভরপুর বহু অল্পখ্যাত তরুণ কবি ও গল্পলেখক। এঁরা পরে সোভিয়েট সাহিত্যে স্বনামখ্যাত হয়েছেন।

এই লেখকরা সোভিয়েট গভর্নমেন্টের নিরন্তর সমর্থন ও অভিনিবেশ লাভ করেছে। সোভিয়েট শাসনের প্রথম কয়েক বছরে যুদ্ধ ও জটিল অর্থ-নৈতিক সমস্যা নিয়ে লেনিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সংস্কৃতি বিষয়ক প্রশ্নে, বিশেষ করে সাহিত্য সম্পর্কে, অনেকখানি মনোযোগ দিয়ে এসেছেন। ইতিমধ্যেই সেই সময়ে সোভিয়েট লেখকরা মূল্যবান উপদেশ পেয়েছিলেন যা তাঁদের নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছিল। ১৯২০ সালের শেষ দিকে গৃহযুদ্ধের প্রধান প্রধান ফ্রন্টে সংঘর্ষ শেষ হবার পর, রুশদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি একটি বিশেষ পত্র প্রকাশ করে। এই পত্রটি লেনিনের উদ্যমে গৃহীত হয়; পত্রটির বিষয়বস্তু শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রশ্ন এবং পত্রে প্রলেট্‌কাল্‌ট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

অন্যান্য সময়ের মত তখনো সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট যে নীতি অনুসরণ করেছিল তার মূল লক্ষণ ছিল শিল্পে পার্টি-চৈতন্যের জন্যে সংগ্রাম, শিল্প ও কমিউনিস্ট পার্টির নীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগস্থাপন, শ্রমিক শ্রেণী ও ব্যাপকতম জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা। ১৯০৫ সালে লেনিন 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' প্রবন্ধে যে মহান্ নীতি ব্যাখ্যা করেছিলেন তা কাজে পরিণত করা হল।

বুর্জোয়া লেখকদের ভুয়া "স্বাধীনতা"র মুখোশ খুলে দিয়ে লেনিন এই প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "সমাজে বাস করে সমাজ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়। বুর্জোয়া লেখক, শিল্পী বা অভিনেত্রীর স্বাধীনতা আত্মপ্রবঞ্চনা (বা ভাঁওতা দিয়ে লোক ঠকানো) ছাড়া আর কিছুই নয়, আসলে এরা সবাই টাকার থলি, ঘুষ বা মুরুব্বির মুখাপেক্ষীই।"

যে সূত্র ধরে লেনিন অগ্রসর হয়েছেন তা এই—সর্বহারা সাহিত্য রাজনীতি নিরপেক্ষ হতে পারে না, সর্বহারা সাহিত্য "শিল্পের জন্যেই শিল্প" হতে পারে না, সর্বহারা সাহিত্যকে গণজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রগতিশীল ভূমিকা নিতে হবে। অক্টোবর বিপ্লবের পরেও লেনিন এই নীতির জন্যে নিরলসভাবে সংগ্রাম করেছেন।

সোভিয়েট ব্যবস্থার গোড়ার দিকে এই সংগ্রাম পরিচালনা আরও বেশি

প্রয়োজন হয়েছিল এইজন্যে যে বুর্জোয়া লেখকেরা সেই সময়ে বিশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে "বিশুদ্ধ শিল্প"-এর নীতি প্রচার করে চলেছিলেন। এই নীতির প্রয়োগ হলে, যে বৈপ্লবিক বাস্তবতাকে তাঁরা এত ঘৃণা করেন তা থেকে পালিয়ে বাঁচবার একটা আশ্রয় হয়ে উঠতে পারত কাব্য। বিপ্লবের প্রতি স্পষ্টভাবেই শত্রু-মনোভাবাপন্ন এই শক্তিগুলির প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল এমন কতকগুলি সাহিত্য-গোষ্ঠীর উপর যারা সর্বহারাবাদের প্রতিনিধিত্বের দাবি করত। উদাহরণ হিসাবে বলা চলে, আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, প্রলেট্‌কাল্‌ট-এর মূলনীতি ছিল নিজেদের "আত্মকর্তৃত্ব" বজায় রাখার জন্যে পার্টি থেকে "স্বাধীন" অবস্থায় থাকার প্রচেষ্টা।

"নিরপেক্ষতা" সম্পর্কে এই সমস্ত এলোমেলো কথার স্বরূপ লেনিন ও স্টালিন অত্যন্ত নিষ্করুণভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এই সমস্ত এলোমেলো কথা যারা বলে তাদের "অদলিয়তা"র মুখোশ তাঁরা খুলে ফেলেছেন এবং দেখিয়েছেন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই মুখোশের আড়ালে বিপ্লবের ও সোভিয়েট জনসাধারণের চিরশত্রুরা আত্মগোপন করে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রলেট্‌কাল্‌ট সম্পর্কিত পত্রে জোর দিয়ে বলা হয়েছে—পার্টি ও সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট থেকে "স্বাধীন" ভাবে থাকার জন্যে ওকালতি, সংকীর্ণতাবাদের প্রসার, জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নতা, ঠিক এই কারণগুলি ঘটেছিল বলেই প্রলেট্‌কাল্‌ট হয়ে উঠেছিল শ্রমিক শ্রেণীর উপরে বুর্জোয়া প্রভাবের হাতিয়ার, আর এই "স্বাধীন" অস্তিত্ব বুর্জোয়া স্বার্থকেই রক্ষা করছিল।

" 'সর্বহারা সংস্কৃতির' ছদ্মবেশে শ্রমিক শ্রেণীকে বুর্জোয়া দার্শনিক মতামত (মাশ্‌বাদ) পরিবেশন করা হচ্ছে। শিল্পের ক্ষেত্রে অসঙ্গত বিকৃত রুচি (ফিউচারিজম্‌) শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

এই পত্রটি একটি সত্যিকারের ঐতিহাসিক দলিল। লেনিন সাহিত্যের সমস্যাকে কত তীক্ষ্ণভাবে অনুধাবন করতেন এই পত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য সম্পর্কে লেনিনের নীতি—পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে সাহিত্য হবে সর্বহারা শ্রেণী ও সমগ্র জনসাধারণের সামগ্রিক স্বার্থের অংশ-বিশেষ—কেন্দ্রীয় কমিটির পত্রে এই নীতির উপরেই পুনরায় জোর দেওয়া হল। "কথায় নয় কাজে", "একটি সত্যিকারের খাঁটি সর্বহারা সংস্কৃতি" সৃষ্টি করবার আহ্বান এই পত্রে জানানো হয়। অর্থাৎ, এমন সংস্কৃতি ও সাহিত্য যার

মধ্যে পার্টি-চৈতন্য ফুটে উঠবে এবং শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী চাষীর স্বার্থ রক্ষিত হবে।

পত্রে লেখা হয়—"প্রলেট্‌কাল্‌ট-এ শ্রমিক শ্রেণীর যে সব সেরা সন্তান আছেন তাঁরা সম্পূর্ণভাবে বুঝবেন আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কোন্‌ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হয়েছে।"

"...কেন্দ্রীয় কমিটি চায়, এদের (শ্রমিক বুদ্ধিজীবী—জি, আই) জন্যে সুস্থতর স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হোক এবং এরা শিল্প-প্রচেষ্টার সমস্ত ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে যোগদান করবার সুযোগ পাক।"

সুস্থতর স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির অর্থ হচ্ছে তরুণ সর্বহারা লেখকদের পরিচালনা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের হাত থেকে নিয়ে নেওয়া। এই বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত এবং জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন।

সঙ্গে সঙ্গে, কেন্দ্রীয় কমিটি ও পার্টি দাবি জানিয়েছে যে লেখকদের উপর "পাটোয়ারী অভিভাবকত্ব" হওয়া উচিত নয়। এইভাবে, পরবর্তীকালে যে নতুন ঐতিহাসিক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে সেই অবস্থায় লেনিনের 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' প্রবন্ধে বিবৃত নীতিকে প্রয়োগ করা হল। লেনিনের প্রবন্ধে ঘোষণা আছে, "যান্ত্রিকভাবে সমতা বজায় রাখার, সব কিছুকে পিষে সমান করার স্থান সাহিত্যে সব চেয়ে কম", আর তাছাড়া "সাহিত্যে ব্যক্তিগত উদ্যম এবং বিশিষ্ট রুচির ব্যাপারে, চিন্তা এবং কল্পনাশক্তির ব্যাপারে, বক্তব্য এবং প্রকাশভঙ্গির ব্যাপারে লাগাম সবচেয়ে ঢিলে করতে হবে, এ-সব কথায় কোন তর্কের অবকাশ নেই।"

সাহিত্যের শিক্ষাবিষয়ক মূল্য যে কি বিরাট সে সম্পর্কে লেনিন উল্লেখ করেছেন যে সাহিত্যের শক্তি বাস্তবতার সত্যনিষ্ঠ প্রতিফলনে, গড়ে-ওঠা নতুন জীবনের সুস্পষ্ট আলেখ্য চিত্রণে।"...জীবন থেকে সংগৃহীত ও জীবনের দ্বারা পরীক্ষিত কমিউনিস্ট গঠনকার্যের সহজতম ও সজীব ঘটনাগুলোর প্রতি আরও বেশি মনোযোগ—এই হবে আমাদের শ্লোগান; আমাদের প্রত্যেককে—আমাদের লেখক, আন্দোলনকারী, প্রচারক, সংগঠক ইত্যাদি সকলকে এই কথাগুলো অবিশ্রান্তভাবে পুনরাবৃত্তি করতে হবে।"

প্রধানত লেখকদের কাছে এই দাবি উপস্থিত করে লেনিন এইভাবে লেখকদের দিক্‌নির্দেশ করেছেন, তাদের কাজ কোন পথে অগ্রসর হবে।

অবশ্য, একমাত্র সেই লেখকই সুস্পষ্ট বাস্তব ও সোশ্যালিজম্-এর গঠনকার্যে শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবন্ত অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন যিনি এই বাস্তবতার সঙ্গে ও জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সাহিত্য-চর্চাকারীদের লেনিন উপদেশ দিয়েছেন জীবনের নিবিড়তম প্রদেশে প্রবেশ করতে ও জন-সাধারণের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রাখতে। দৃষ্টান্ত হিসেবে, সেই সময়ে ম্যাকসিম গোর্কির কাছে লেখা এক চিঠিতে এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে দেখতে পাই।

জীবনের ঘটনাবলীর নিষ্ক্রিয় বিশ্লেষণের মধ্যেই লেখকের কর্তব্য সীমাবদ্ধ একথা লেনিন কখনো বলেননি। বৈপ্লবিক বিকাশের পরম্পরায় বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, এই তিনি চেয়েছেন। চেয়েছেন, নতুনের অঙ্কুর ও পুরাতনের উপর নতুনের জয়লাভের সংগ্রাম চিত্রিত হোক। এইভাবে, সেই সময়ের মধ্যেই লেনিন সমাজবাদী বাস্তবতার মূল নীতিগুলোকে ছক্ কেটে দিয়েছেন—পরে স্টালিন একে পরিবর্ধিত করেন ও স্পষ্ট একটা রূপ দেন।

'সোভিয়েট গভর্নমেন্টের আশু কর্তব্য' প্রবন্ধে লেনিন লিখেছেন :

"বড় বড় উৎক্রমণের যুগে দেখা যায় যে পুরাতনের খণ্ডিতাবশেষ প্রচুর পরিমাণে ছড়ানো এবং মাঝে মাঝে এই খণ্ডিতাবশেষগুলো নতুনের অঙ্কুরের (যা সব সময়ে সঙ্গে সঙ্গে চেনা যায় না) চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত পুঞ্জীভূত হয়; এই হচ্ছে এই যুগের সত্যিকারের বৈশিষ্ট্য, সুতরাং ক্রমবিকাশের রেখায় বা গ্রন্থিতে কোনটা সব চেয়ে জরুরি তা চিনে নেবার ক্ষমতা আমাদের অর্জন করতে হবে। এমন কতকগুলি ঐতিহাসিক মুহূর্ত আসে যখন সব চেয়ে জরুরি কাজ হয় বিপ্লবের সাফল্যের জন্যে যত বেশি পরিমাণে সম্ভব খণ্ডিতাবশেষ জড়ো করা—অর্থাৎ, পুরনো প্রতিষ্ঠান-গুলোকে যত বেশি সম্ভব গুঁড়িয়ে দেওয়া। আবার এমন মুহূর্তও আসে যখন গুঁড়িয়ে দেওয়ার কাজটা যথেষ্ট হয়েছে, এবার পরবর্তী দায়িত্বপালন করতে হবে—তা হচ্ছে খণ্ডিতাবশেষগুলোকে সাফ করবার 'গদ্যময়' (পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবীদের কাছে, 'বিরক্তিকর') কাজ। আবার এমন মুহূর্তও আসে যখন সব চেয়ে জরুরি কাজ হচ্ছে নতুন ব্যবস্থার অঙ্কুরগুলিকে সযত্নে লালনপালন করা—ভগ্নাবশেষের ভিতর থেকে এই অঙ্কুরগুলো এমন একটা জমিতে গজিয়ে উঠছে যেখান থেকে জঞ্জালগুলো তখন পর্যন্ত ভালভাবে সাফ করা হয়নি।"

লেনিনের এই অনন্যসাধারণ উক্তি সাহিত্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন দৃশ্যপটের অবতারণা করেছে।

সমালোচনামূলক বাস্তবতার ক্লাসিকাল সাহিত্যের প্রধান গুণ ছিল যে পুরনো বাস্তবতাকে তা নিশ্চিহ্ন করেছে, কিন্তু তরুণ সোভিয়েট সাহিত্যের মুখ্য কর্তব্য সমাজবাদী বাস্তবতা ও তার শাখাপ্রশাখার প্রতি অঙ্গীকার।

লেনিন লেখকদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে যদি নতুনের অঙ্কুর প্রথমদিকে মাঝে মাঝে পুরাতনের চেয়ে দুর্বলতর হয় তবে তাঁরা যেন হতাশ না হন—কারণ, যাই হোক না কেন, ভবিষ্যত তাঁদেরই।

নতুনকে রূপ দিতে হবে এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট সাহিত্যের নব রূপান্তরের সমস্যা ওঠে। অবশ্য বুর্জোয়া শিল্পীদের কাছে নব রূপান্তরের অর্থ হচ্ছে বিচিত্র আঙ্গিকগত সমাবর্তন—যার মধ্যে শিল্পের বিষয়বস্তুর গুরুত্বকে স্পষ্টত অস্বীকারই করা হয়। কিন্তু বলশেভিক পার্টি আমাদের শিক্ষা দেয় যে সোভিয়েট সাহিত্যের নব রূপান্তর নিরূপিত হবে প্রধানত বিষয়বস্তুর দ্বারা। নতুন ধ্যানধারণা, নতুন নায়ক, নতুন নৈতিক মান ইত্যাদি—এইগুলিই সোভিয়েট শিল্প ও সাহিত্যে নতুন আঙ্গিকের আবির্ভাবের পূর্ব-সূচনা। সোভিয়েট কবিতায় নব রূপান্তরের মহান প্রবর্তনকারী মায়াকভ্স্কি এক সময়ে বলেছিলেন—"নতুন অঙ্গিকের দাবি ওঠায় এমনি সব নতুন ও বিরাট শক্তিবিশিষ্ট ধ্যানধারণা সৃষ্টি করেছে একমাত্র অক্টোবর বিপ্লব।" মায়াকভ্স্কির এই কথাগুলো আকস্মিক নয়।

নতুনের যা কিছু প্রকাশ তার প্রতি খুব বেশি রকমের মনোযোগ লেনিন দিয়েছেন কিন্তু এই প্রকাশগুলি সত্যিকারের বিপ্লবী বা কমিউনিস্টপন্থী কিনা তা যাচাই করে নেওয়া তিনি অত্যাবশ্যক মনে করতেন।

স্মরণ থাকতে পারে, সেই সময়ে ফিউচারিস্ট, ইমাজিনিস্ট (imaginists) ও অন্যান্য ডেকাডেন্ট গোষ্ঠীগুলো আপন আপন পসরাকে কমিউনিস্ট শিল্পের শেষ কথা বলে চালাবার চেষ্টা করছিল। এই ধরনের ভুয়ো নব-রূপান্তরকে লেনিন ভয়ানকভাবে সমালোচনা করেছেন। ক্লারা জেট্কিনের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি বলেছেন:

"যা কিছু নতুন তাকেই দেবতা বলে পুজো করতে হবে এমন কি কথা আছে?…'জিনিসটা নতুন'—শুধু এইজন্যেই কি? বাজে, একেবারে বাজে! এর অনেকটাই ভণ্ডামি, আর পশ্চিমী শিল্পে যা কিছু ফ্যাশন চালু হয় তার

প্রতি অচেতন শ্রদ্ধাও অবশ্য এর মধ্যে কিছুটা আছে…এক্সপ্রেসনিজম, ফিউচারিজম, কিউবিজম এবং আরও যে-সব 'ইজম্' (ism) আছে সেগুলো যে শিল্পগত প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তা মনে করতে আমি অসমর্থ।…ও-থেকে আমি আনন্দ পাই না।"

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে লেনিন এখানে যে শুধু এই ধরনের 'নব রূপান্তরের' ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারকে প্রকাশ করে দিয়েছেন তা নয়, তার উৎসও দেখিয়েছেন—পশ্চিমী বুর্জোয়ার হীন অনুবর্তিতা।

সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের প্রত্যেকটি সত্যিকারের নতুন অবস্থা সম্পর্কে লেনিনের মনোযোগ ও অভিনিবেশ ছিল— বিদেশী সাহিত্যও বাদ দিতেন না। অঁরি বারবুস্-এর 'Le Feu' ও 'Clarte' ইত্যাদি রচনাবলীকে তিনি উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

লেনিনের নির্দেশাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের সমস্যাটি সম্পূর্ণ নতুন ভাবে দেখা দিল।

বিপ্লবের ঠিক পরেই লেনিন উল্লেখ করলেন এবং পরে বিশেষ জোর দিয়ে বললেন যে, "লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জনসাধারণ এখন স্বাধীনভাবে ইতিহাস রচনা করে চলেছে" এবং জনসাধারণ হয়ে উঠেছে ইতিহাসের সত্যিকারের কর্তা। সোভিয়েট লেখকরা জনসাধারণের চিন্তাধারার অংশীদার হবেন এবং জনসাধারণকে তাদের দাসত্বমুক্তির সংগ্রামে সাহায্য করবেন—শুধু এইটুকুই যথেষ্ট নয়, অতীতের সেরা লেখকদের মধ্যেও যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল না তা নয়। সোভিয়েট লেখককে আরও অনেক কিছু করতে হবে; শ্রমজীবী জনসাধারণ, শ্রমিক ও চাষীকে গ্রহণ করতে হবে ইতিহাসের কর্তা এবং নতুন জীবনের রচয়িতা হিসেবে। গৃহযুদ্ধের পরে প্রথম কয়েকটি বছরেই সোভিয়েট লেখকদের রচনাবলীতে সোভিয়েট জনসাধারণের বিরাটত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। সেরাফিমোভিচের 'লৌহবন্যা' ফুর্মানেভের 'চাপাএভ্', গ্লাদ্কোভের 'সিমেন্ট'—এই ধরনের কয়েকটি রচনার উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

সাহিত্যের লোকবৈশিষ্ট্যের সমস্যার লেনিন যে সমাধান করেছেন সেই সমাধানে জনসাধারণের সম্পর্কে লেখার কথাই শুধু নেই, জনসাধারণের জন্যে লেখার কথাও আছে।

ক্লারা জেট্‌কিনকে লেনিন বলেছেন, "…শ্রমিক ও চাষীকে সব সময়ে

আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে রাখতে হবে। তাদের জন্মেই আমাদের শিখতে হবে কি ভাবে কোন জিনিসকে চালাতে হয়। একথা শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও প্রযোজ্য।" তারপর তিনি আরও বলেছেন, "শিল্প জনসাধারণের সম্পত্তি। শ্রমজীবী জনগণের জীবনের মধ্যে গভীরতম মূল বিস্তার করতে হবে শিল্পকে। শিল্প এমন হবে যেন এই জনগণ তা বুঝতে পারে ও তাকে ভালবাসে। জনগণের অনুভূতি, চিন্তা ও ইচ্ছাকে ব্যক্ত করবে এই শিল্প, উন্নত করে তুলবে তাদের।"

সাহিত্য এমন হবে যেন জনসাধারণ সেখানে প্রবেশ করতে পারে, লেনিনের এই দাবি যে নীতি থেকে উদ্ভূত তা হচ্ছে এই যে, লেখককে জনসাধারণের জন্মে কাজ করতে হবে। প্রাঞ্জল ও সহজভাবে লেখা, সম্পূর্ণভাবে জনগণের জন্মে ও সাধারণের জন্মে লেখা—এই প্রয়োজনীয়তার কথা লেনিন বারবার উল্লেখ করেছেন।

শ্রমিক ও চাষীদের সম্পর্কে চিন্তা করা, এমন সহজভাবে কথা বলা যেন তারা বুঝতে পারে—লেনিনের এই অনুজ্ঞার সঙ্গে বুর্জোয়া কম্নিফু সাহিত্যের রীতিনীতির মূলগত পার্থক্য আছে। বুর্জোয়া ডেকাডেণ্ট সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ঠিক এর বিপরীত—ইচ্ছাকৃত ভাষার অলংকার, আঙ্গিক ও গঠনপ্রণালীর জটিলতা, একটি সংকীর্ণ সৌন্দর্যতাত্ত্বিক ও উঁচ্‌কপালে গোষ্ঠীর জন্মে লেখা।

এইজন্মেই যে-সব বইয়ের ভাষা সহজ ও বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী এবং যা শ্রমজীবী জনসাধারণের বোধগম্য হবে ও ভাল লাগবে—সেই সব বইকে লেনিন অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কিন্তু লেনিন যেমন দাবি করেছেন যে সাহিত্য এমন হবে যেন শ্রমজীবী জনসাধারণ সেখানে প্রবেশ করতে পারে তেমনি এই শিক্ষাও দিয়েছেন যে, "সাহিত্য যেন খেলো না হয়, অপরিণত পাঠকের পর্যায়ে যেন নেমে না আসে, সাহিত্যকে স্থিরভাবে…পাঠকের বিকাশকে উন্নত করে তুলতে হবে।" সুতরাং লেখকের কোন অধিকার নেই জনপ্রিয়তার জন্য পাঠকের পিছু পিছু চলা, বরং পাঠকের আগে আগে পথ দেখিয়ে চলতে হবে তাঁকে।

অবশেষে আর একটি সমস্যার উল্লেখ করা দরকার। এই সমস্যাটির উপরে লেনিন সেই গোড়ার দিকেই অত্যন্ত বেশি রকমের জোর দিয়েছিলেন। সমস্যাটি হচ্ছে—সাহিত্যে সত্যনিষ্ঠার সমস্যা।

সত্যনিষ্ঠার প্রতি লেনিন অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি মনে করতেন যে প্রচারকার্যের প্রধান শক্তিই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা। সোভিয়েটের অষ্টম সারা-রুশ কংগ্রেসে লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে আমাদের প্রচারকার্যে আমরা "বিশ্বজনীন সাফল্য অর্জন করেছি কারণ আমাদের প্রচারকার্য সারা পৃথিবীর শ্রমিক ও চাষীকে সত্য কথা বলেছে এবং বলছে। আর অন্য সমস্ত প্রচারকার্যই তাদের কাছে মিথ্যা বলে।"

সাহিত্য সম্পর্কে লেনিন মনে করতেন যে কোন শিল্পকর্মের শিল্পগত দীপ্তির সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হচ্ছে সেই শিল্পকর্ম সত্যনিষ্ঠ কি সত্যনিষ্ঠ নয়। তিনি দাবি করেছেন যে লেখক যে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দেবেন বা যে সমস্ত বিষয়কে উল্লেখ করবেন সেগুলো লেখককে জানতে হবে। উপর-উপর জানা নয়, পুঙ্খনাপুঙ্খ ও বিস্তৃতভাবে। আর এই ধরনের জ্ঞান লেখক একমাত্র তখনই অর্জন করতে পারেন যখন তিনি সক্রিয়ভাবে জনসাধারণের জীবনে ও সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

সোভিয়েট শাসনের গোড়ার দিকে লেনিন যে সমস্ত লেখা লিখেছেন সেখানে সাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে খসড়া দিয়েছেন তার মোটামুটি ছক হচ্ছে এই। পরে নতুন ঐতিহাসিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই কর্মসূচীকে আরও বিকশিত ও পরিবর্ধিত করেছিলেন লেনিনের ঘনিষ্ঠতম শিষ্য ও উত্তরসাধক স্টালিন।

বর্তমানে সোভিয়েট সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্যে যে জোয়ার এসেছে তার উৎস হচ্ছে লেনিনের এই মৃত্যুঞ্জয় মতাদর্শ।

অনুবাদ: অমল দাশগুপ্ত

কবিতাগুচ্ছ

কয়েকটি রুবাই

পরভেজ শহীদী

[পরভেজ শহীদী আধুনিক উর্হ্‌ সাহিত্যের একজন স্বনামধন্য কবি। বহুদিন ধরে তিনি জেলখানায় আটক আছেন। বর্তমানে তিনি অসুস্থ অবস্থায় সুদূর বক্সা দুর্গে নির্বাসিত। বক্সায় লেখা তাঁর কয়েকটি রুবাইয়াতের গদ্য অনুবাদ নিচে দেওয়া হল।]

(১)

নীরবতার বুক থেকে বাণী হয়ে আমি নেমে আসব
সঙ্গীতের মত ধ্বনিত হব আমি প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস থেকে
বোকার দল! যাও দুনিয়াটা ভরে দাও তোমরা চোখের জলে
হাসিতে পরিণত হব আমি, ঝাঁপিয়ে পড়ব তোমাদের ঘৃণা করে।

(২)

আজও তোমরা শুনতে পাবে আমার গান
আজও এই কারাগারে উদ্দীপ্ত তার আত্মা
কোটি কোটি ওষ্ঠপুট প্রাণ দিয়েছে আমার সঙ্গীতকে
আমার মৃত্যুঞ্জয় হাসি কেড়ে নিতে পারবে না কেউ,
কেড়ে নিতে পারবে না।

(৩)

হে বিষাদঘন রাত্রি, তোমাকে বদলাতে হবে রঙ
নতুন প্রত্যুষের ছাঁচে ঢালতে হবে নিজেকে
আমি নেতা, আমি দিশারী নতুন যুগের
আমার সাহসিক যাত্রায় পায়ে পায়ে তোমাকে
আমার সঙ্গী হতে হবে।

(৪)

আমাদের শরীরে ঘামের গন্ধ, লোহার আঘ্রাণ
ইস্পাতকঠিন শাখায় শাখায় দুলছি যেন অনন্ত আবেশে
অগ্রগতির দৃপ্ত সংকল্পকে শৃঙ্খলে কখনও বাঁধা যায় না
যে ফুল ফুটবেই—
কারাপ্রাচীরের মধ্যেও সে বসন্ত-উৎসবে জেগে উঠবে।

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

জেলের চিঠি

জগন্নাথ চক্রবর্তী

অন্ধকার পাহারা দেয়
কালো সেলের দরজায়,
ইঁটের লাল দেওয়ালটার
মধ্যে প্রাণ গর্জায়।

জল্লাদের ভ্রূকুটি ভয়
কে করে তার পরোয়া—
তারার আলো তোমার চোখ
কয়েদও হয় ঘরোয়া।

ভোরাই তারা নেভে যখন
মৃদু হাওয়ার দমকায়,
আমার ঘুম ভাঙে তখন
তোমায় ঘুম চমকায়।

অনেকে এসে তোমার কাছে
মিথ্যে করে রটনা
অমুক মাসে অত তারিখ—
জেনো তা নয় ঘটনা।

সম্পাদক কাগজে লেখে
মানুষ ছিল শক্তই
তখনও জেনো রয়েছি আমি
তোমার অনুরক্তই।

লাঠি-গুলির ঝড়ো হাওয়ায
গুজবে কান দিও না,
খবর যদি না দিতে পারি
তবুও দোষ নিও না।

তোমাকে রোজ পত্র লিখি
মনের নীল কালিতে—
অনেক কথা, ধরে না সব
কাগজের এই ফালিতে।

যদিও বহু অত্যাচার
পীড়ন নানা দুঃসহ
তোমায় চিঠি লেখায় পাই
মুক্তিস্বাদ প্রত্যহ।

হয়ত চিঠি পৌঁছবে না
কখনো কোন দিনও আর
বইতে হবে দুজনকেই
দুজনার এই মনোভার।

হয়ত ফের দেয়ালটার
মধ্যে গুলি চলবে,
বন্দীদের হাজার প্রাণ
আগুন হয়ে জ্বলবে।

সেদিনও তুমি এমনি করে
সামনে এসে দাঁড়িয়ো
আগুনে ঝাঁপ দেব যখন
অলীক ভয় তাড়িয়ো।

যতই দেরি হোক না কেন
সে দেরি তুমি সইবেই—
তুমিও জান আমিও জানি,
প্রতিশ্রুতি রইবেই।

পাহাড় বন সমুদ্রের
অনেক বড় কাঁটাতার
ডিঙিয়ে আসা সহজ নয়
জান তো বহু বাধা তার।

তবু সে বাধা ডিঙিয়ে দেখো
একদা আমি ফিরবই
গল্পে গানে ভালবাসায়
তোমার ও প্রাণ ঘিরবই।

আঘাতে ভূমিকম্পে ও
দারুণ ঝড়ঝাপটায়
যে এসে ব্যথা ভুলিয়ে দেয়
দেহটা মোর জাপটায়

এখনো যায় অন্তহীন
অপরিসীম সখ্যে,
সঙ্গ পাই নির্জনেও
সাহস পাই বক্ষে

তাহার কাছে প্রশ্ন মোর
　　এখনই বুঝি ক্লান্তি?
প্রতীক্ষা কি দুঃখ শুধু
　　শুধুই পরিশ্রান্তি?

লাঠি-গুলির ঝড়ের মাঝে
　　গুজবে কান দিও না,
খবর যদি না পাও তবু
　　চরম ভেবে নিও না।

আমার বুনো বসন্তের
　　গান তো শেষ হবে না,
মরেও ফিরে আসব যখন
　　ঝড়ের দাগ রবে না।

সেদিনও দেখো আকাশ জুড়ে
　　রইবে এই অনন্ত
গানের রেশ, তোমার আমার
　　মধ্যেকার বসন্ত।

মুক্তপ্রাণ কৃষাণকে

পূর্ণেন্দু পত্রী

তুমি বাঁচো।
পরিমুক্ত প্রাণময়তায় বাঁচো।
প্রাণহন্তার সমাধিকে শস্যভূমিতে প্রসন্ন কর।

জন্মে চেয়েছিলে এ অবারিত মাঠ প্রান্তরকে আত্মীয়ের মত আপন করে।
আজন্ম যন্ত্রণার স্বরে তাকে ডাক পাঠালে ভাটিয়ালীর সুরে

কাস্তে লাঙলের ঝল্‌সানো শানে
আর ঝড় বন্যা রোদ বৃষ্টির বিষকাঁটায়।
কত উপোসরাতের কর্কশ জালায় চৌচির হৃদয়ের ফাটলে
যখন অজগরের বিষ ঝরে—
তখন তারই নিচে তোমার কর্মঠ যৌবনের কণ্ঠস্বর :
শিকারী মৃত্যুর মাঠে মাঠে মুঠো মুঠো সোনালি ফসলের জয়ধ্বনি।

তারপর ছিন্নপ্রাণ স্বদেশ কখন যম-যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠেছে দুর্ভিক্ষে দাঙ্গায়
কখন দগ্ধ বাতাসের শিরা-উপশিরায় গর্জে উঠেছে
গুণ্ডাঘাতক অত্যাচারীদের নির্লজ্জ উল্লাস।
মিশমিশে অন্ধকারের রাতে কখন দুশ্‌মনশাহীর রক্ততৃষায়
দেশজোড়া থৈ থৈ কান্নার ঢেউ ঘৃণার বন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে।
তখন দেখি গর্ভবতী মাটির শিয়রে পক্ক শালের মত
তেজস্বী তোমার চোখের তারায় তীরন্দাজের নির্ভয় হাসি।

দেবদারু বন আর শিরিষের শিরশিরে হাওয়ায় নিঝঝুম গ্রামকে গ্রাম
কখন লাঠিয়ালের মত বুক বেঁধে দাঁড়ায়।
ঘাড়গোঁজা কোটি কোটি পাথর-মন কখন
টনটন রক্ত কণায় বিক্ষোভের প্রহর জাগে।
অভাবের ক্ষোভের আর নির্যাতনের লেলিহান শিখা যতদূর এগোয়
ততদূরের মাটিতে অহরহ একটি জ্বালামুখী চেতনার ঝংকার।
মেঘরৌদ্রের ঝলমল আকাশ থেকে ধূসরচূড়া পাহাড় জুড়ে
সেই তো প্রাণস্পন্দনের আন্দোলন।
শিশুহৃদয়ের অন্তিম কান্নার সমাধিভূমি থেকে শোকাহত মায়ের
ধারালো ক্রোধের অবকাশ চিরে
সেই তো আত্মোৎসর্গের আহ্বান।
সেই তোমার গান।

তোমাকে নন্দিত করি।
গোখুরার বিষ উগরানো বাতাসের ঝাপটায়
নবান্নের মত ফুঙ্কিতে সাঁঝ-দীপ্‌ জেলেছ ভাঙা ভিটেয়।

ইন্দ্রাণী ঘরের বৌ কখন ডাগর-পাড় শাড়ির আঁচলে
সিঁদুর সিঁথীতে সুন্দরী।
বর্ষার সেতারে কখন মেঘমল্লার গম্ভীর
তখন পেশীবহুল প্রতিবেশীদের সঙ্গে মাঠের যৌবন জাগাও তুমি
মায়ের মত অগাধ স্নেহে—মেঘের আলোয় আলোয়।
এবার মহাশ্মশান দেশদেশান্তরের হৃদয়ের ফাটলে
যখন অজগরের বিষ ঝরে—
তখন তারই নিচে তোমার প্রজ্জ্বলন্ত ঘোষণা :
যুদ্ধদর্পী অন্ধকারের সীমান্তে এক ঝাঁক শান্তিবাহিনী—
কপোতের পাখশাট।

আহা! এখন এই দিগ্বিজয়ী মাঠ—
এই মাঠপারের নক্ষত্রে নক্ষত্রে অতুলন আকাশ,
এই আকাশ-ছোঁয়া মৃত্যুঞ্জয় দেশ তোমার।
এই তোমার সিংহাসন।

তুমি বাঁচো।
পরিপূর্ণ শান্তি সমৃদ্ধিতে বাঁচো।
অত্যাচারের মাটিকে অন্নদানের ঔরসে প্রবুদ্ধ কর।

২

নবজন্ম

মনোরঞ্জন ঘোষ

ধুয়ে মুছে যাক অলস দিনের স্বপ্নের দাগগুলি
জীবনের গাঙে আসুক প্রবল জোয়ার
পড়ে থাক কোণে চিত্র আঁকার রঙিন সূক্ষ্ম তুলি
অবসর নেই দ্রুত চল ঘোড়সওয়ার।

কণ্ঠে আমার থেমে গেছে আজ সুর-বিস্তারী গান
বিদ্রোহী প্রাণ-স্পন্দনে বাজে পরুষ রুদ্রতান
স্বপ্ন-সৌধ নব চেতনায় ভেঙে চুরে খান্‌খান্‌
শিল্পীর চোখে নতুন স্বপ্নে দীপ্ত আগামীকাল।

সত্যম্‌-শিব-সুন্দরমের মেকি সাধনার সাজ
জন-দেউলে পরিণত আজ ধ্যানভাঙা চিৎকারে
বিপ্লবী গণ-মানবের ডাকে পরেছি যুদ্ধ-সাজ
শিল্পীর তুলি ঝকঝক করে সুতীক্ষ্ণ তলোয়ারে।

ধোঁয়াটে মনের কুয়াশা কেটেছে বচনের ছলাকলা
জেগেছে সহজ সরল মনের প্রাণ-ছন্দের কবি
সর্বহারার নির্দেশে আজ শুরু হল পথ চলা
গণ-সংগ্রামে শিল্পী এবার সৈনিক-বিপ্লবী।

লাঠিয়াল

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

দেড়হাত উঁচু ধানগাছের সার। ঘোর সবুজ রঙের পাতা, হলুদবরন নিটোল পরিপুষ্ট ধানের গোছা। মাঝখান দিয়ে শক্ত আল। মানুষের পায়ের চাপে চাপে মাটি ধ্বসে পড়েছে এদিকে ওদিকে। কাদা জবজব করছে। চিতি কাঁকড়ার দল চলেছে সার বেঁধে। একটু অসাবধান হলেই পা পিছলে একেবারে খেতের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি! কাঁকন বিলে যাবার এর চেয়ে সোজা পথ আর নেই। ঘুর-পথে হাটের পাশ দিয়ে করিম সাহেবের আম বাগানের ভিতর দিয়ে খালের ধার দিয়ে যেতে হলে পাক্কা আড়াই ঘণ্টার মামলা। মানে দুপুরে বের হলে পৌঁছতেই বিকেল গড়িয়ে পড়বে। কতটুকুই বা আর শীতকালের বেলা। তারপর ছিপ নিয়ে বসতে বসতেই অন্ধকার নামবে, জোনাকির আলো জ্বলবে কেয়া আর রাংচিতার ঝোপে ঝোপে।

তার চেয়ে এই ঢের ভাল। পরনের কাপড়টা হাঁটুর উপর গুটিয়ে নিয়ে নন্দ ছিপটা বেশ করে বাগিয়ে ধরল তারপর পিছন দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলল, কিরে তোদের বুঝি আর আসার ইচ্ছে নেই আজকে, তবে থাক তোরা, আমি এগোলাম।

পিছনে নন্দর বাছা বাছা তিনটি সাকরেদ, ফটিক, আবেদ আর যোসেদের শিবু। পিপড়ের ডিম খুঁজতে একটু পিছিয়ে পড়েছিল, ওস্তাদের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, ঠিক আছি আমরা। তুমি এগোও।

দুহাতে ধানগাছের গোছা সরিয়ে তবে এগোতে হয়। হাওয়া লেগে শির শির করে ওঠে গাছগুলো। এলোপাথাড়ি ঢেউ চলে একটার পর একটা।

ধান খেতের পরেই বদনতলার মাঠ। এপার ওপার দেখা যায় না, মাঠ তো নয় ভরা বর্ষায় ছোটখাটো একটা বিলই হয়ে দাঁড়ায়। সবাই মিলে হাত ধরাধরি করে ছুটে পার হয় মাঠটা—নন্দ, ফটিক, আবেদ আর শিবু। তারপরেই কাঁকন বিল। পাকুড় গাছটার তলায় সারি সারি বসে যায়

চারজনে। টুঁ শব্দটি নয়, নিঃশ্বাসের আওয়াজ না হলেও যেন ছিল ভাল। একটু শব্দ হলেই আর ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না কাঁকন বিলের মাছ। চারের আশপাশে বুড়বুড়ি কাটবে কিন্তু ভুলেও ঠোকরাবে না কক্ষনো।

মিনিট পাঁচেকের বেশি নয়, কিন্তু বেশ মনে হল নন্দর, থর থর করে কাঁপছে ফাৎনাটা, ঠিক এইবার ডুবিয়ে নিয়ে যাবে, হুইল শুদ্ধ তলিয়ে নিয়ে যাবে একেবারে। প্রাণপণে নন্দ হ্যাঁচকা টান মারল ছিপে। এসপার নয় ওসপার। গতবারে ঢিল দিতে গিয়ে অত ভারি ওজনের কালবোসটা বেমালুম হাত-ছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

টানের চোটে নন্দ চিৎপাত হয়ে পড়ল মাটির উপরে। পড়েই কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেল। বর্ষার ভিজে জবজবে মাটি তো নয়, এ যে পাথরের মতন শক্ত। গাঁয়ের মাটি এমন নিরেট আর শুকনো তো ছিল না কোনদিন। টন টন করছে কনুইয়ের কাছটা। মনে হল যেন বেশ ফুলেই উঠেছে। আলগোছে হাত বুলোতে গিয়েই নন্দর ঘুমটা ভেঙে গেল। প্রথমে অস্পষ্ট সব কিছু, তারপর একটু একটু করে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে এল। ধানের খেত আর বদনতলার মাঠ, বোসেদের শিবু আর কাঁকন বিলের স্বপ্ন কোথায় মিলিয়ে গেল।

সাবধানে শেয়ালদার ফুটপাথের পাথরের উপর নন্দ হাত বুলোতে লাগল। সত্যি, কি শক্ত পাথরগুলো। কি ক্ষতি হত আর একটু নরম গাঁথুনি দিতে, আর যদি এমন উঁচু নিচু না হয়ে সমান হত সবটা। মানুষের পায়ে পায়ে পাথরের চাকলা উঠে উঠে এবড়োখেবড়ো হয়ে গেছে। লোকজনের এত অসুবিধা হয় শুতে। তাও তো নন্দ মাদুরের উপর বহু কষ্টে জোগাড় করা দুটো চটের থলি পেতে দিয়েছে, তবুও এপাশ ওপাশ করতে গেলেই পাঁজরে এমন লাগে পাথরের টুকরোগুলো, ভোরে উঠে অনেকক্ষণ ধরে হাত বুলোতে হয়। যেন মরতে চায় না ব্যথাটা।

দুহাত দিয়ে চোখ মুছে নন্দ উঠে বসল। হাতটা বোধ হয় ফুলেই উঠেছে। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর হচ্ছে না। গ্যাসের বাতির কাছে গিয়ে দেখলে হত। উঠি উঠি করেও আর উঠল না। ঘুমে চোখের পাতা দুটো জড়িয়ে আসছে। হাতটা ফুলে উঠলেই বা করছে কি? ছুটে সদরের নবীন কবিরাজের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে, না রাঙামাসীর উঠোন থেকে হাড়ভাঙা লতা ছিঁড়ে আনবে চুপি চুপি। এ খাস শহর। ফুটপাথের পাথরের চেয়েও

আরও শক্ত মানুষের মন। এক হাতে পয়সা আর এক হাতে দয়া-দাক্ষিণ্য, সেবা আর সহানুভূতি। মাগ্না কিছু হয় না এখানে।

কিছুক্ষণ বসে থেকে আবার শুয়ে পড়ল নন্দ। পাশে শোয়া পরেশ-কাকার দিকে চেয়ে দেখল একবার। ছেঁড়া কাঁথাটা আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়েছেন। আজ বলে নয়, কি শীত কি গ্রীষ্ম ঐ এক স্বভাব। আশ্চর্য, এত বড় শহরে এসেও কাকার স্বভাব একটু বদলালো না! এতগুলো ঘা খাওয়ার পরও নয়।

শুয়ে কিন্তু ঘুম আসল না নন্দর। এ এক দারুণ অস্বস্তি। বসে থাকলেই ঘুমের ভারে চোখ মেলতে পারে না কিন্তু শুলেই এমন আবোল তাবোল সব কথা মনে আসে। প্রাণপণে চোখ দুটো বুজেও রেহাই পাওয়া যায় না। সমস্ত ঘটনাগুলো বুঝি চোখের পাতার উপশিরায় আর স্নায়ুতে জড়িয়ে গেছে। এভাবার কোন উপায় নেই।

কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল। আশ্চর্য, গোটা একটা দেশ কলমের খোঁচায় চড় চড় করে দুভাগ হয়ে গেল। মাটি, জল, খাল, বিল শুধুই নয়, এতদিন ধরে পাশাপাশি থাকা মানুষের মনগুলোও ফেটে গেল চিড় খেয়ে। আলাদা দেশ শুধু নয়, আলাদা জাত, আলাদা ধর্ম। ধর্ম না হয় আলাদা হল, তা বলে জাতও কি আলাদা। আমেদ আর শিবু সম্পূর্ণ দুটো আলাদা জাতের মানুষ! পাশাপাশি তাদের বসতেই যে শুধু অসুবিধা তাই নয়, এমনি করে মুখোমুখি দাঁড়াবে দুজনে লাঠি, শড়কি আর রামদা' হাতে করে?

সে রাতে মশালের উজ্জ্বল আলোয় চিনতে নন্দর একটুও অসুবিধা হয়নি। আমেদ ছিল সেই দলে। সামনের দিকে ছিল না, কিন্তু ভীড়ের মধ্যে মিশে মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথম সারির লোকগুলো যখন শাবলের খোঁচায় সদর দরজাটা ভাঙবার চেষ্টা করছিল, তখন আমেদ পিছন দিক থেকে চীৎকার করছিল দলের অন্য লোকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে। বাড়ীর মেয়েদের পিছন দিকের ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখে পুরুষরা দুতলার বারান্দায় সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সবাই। পরেশকাকার আট বছরের ছোট ছেলে নন্ত পর্যন্ত। কোথা থেকে ছোট একটা বাঁশের টুকরোও জোগাড় করেছিল।

শালকাঠের পুরু পাল্লার দরজাও কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অত আঘাতে ঠিক থাকতে পারে কখনও! এক সময়ে ঝন ঝন করে দু ফাঁক হয়ে গেল।

তারপরের কথাগুলো ভাল করে আর মনে পড়ে না নন্দর। বিশ্রী হৈ চৈ চিৎকার। তচনচ হয়ে গেল সব কিছু। টেবিল, পালঙ্ক ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, লেপ তোষকের তুলোগুলো উড়তে লাগল এদিক ওদিক। সেই হট্টগোলের মধ্যেও নন্দ নিচু হয়ে হয়ে আমেদকে খুঁজছিল। ইচ্ছে ছিল মুখোমুখি দাঁড়াবে সাকরেদের সামনে। দা, কাটারি, শড়কি নয়, নিজের তেল মাখানো পাকা বাঁশের লাঠিটা তুলে দেবে তার হাতে। বলবে, "ওরা নয়, ওদের আমি চিনি না, যা করতে হয়, তুমিই কর।" কিন্তু অনেক খুঁজেও আমেদের পাত্তা পায়নি। সে বোধ হয় ঢোকেইনি ঘরে। দরজা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে গিয়েছিল বাইরে। কিন্তু সে ভিতরে ঢুকলেই ভাল করত। এ বাড়ীর গলিঘুঁজি, পথঘাট, সমস্ত তার নখদর্পণে, দলের লোকগুলোকে এত হায়রান হতে হত না।

নন্দ কিন্তু মরীয়া হয়ে গিয়েছিল। বাঁশের লাঠিটা সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরে ঠাকুর ঘরের চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়েছিল টান হয়ে। এসপার নয় ওসপার। হাতে লাঠি থাকলে দা, শড়কি তো ছার, বন্দুকের গুলিকেও ভয় পায় না নন্দ। গনি মিয়ার সেরা সাকরেদ। জান থাকতে মান কোনদিন দেবে না। বেঁচে থাক তামার পাত জড়ানো পাকা বাঁশের লাঠি।

হঠাৎ পিছন থেকে জাপটে ধরতেই ক্ষেপে উঠেছিল নন্দ। "খবরদার, মরদ হও তো এসো সামনাসামনি।" হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে লাঠিটা ঘুরিয়ে মারতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সর্বনাশ দুশমন তো নয়, এ যে পরেশকাকা। ওদেরই মশালের আলোয় ভয়ে বিবর্ণ মুখখানা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

—শিগ্‌গির পালিয়ে আয় খিড়কির দরজা দিয়ে, পরেশকাকার জড়ানো গলার আওয়াজ এত গোলমালে কোথায় ডুবে গেল। কিন্তু তাঁর ইঙ্গিতটুকু বুঝতে নন্দর অসুবিধা হয়নি। পালিয়ে যেতে বলছেন পরেশকাকা। ঘরবাড়ী আসবাবপত্তর হয়ত বা মান-মর্যাদা সব এদের হেফাজতে ফেলে পালিয়ে যেতে বলছেন দূরে কোথাও। কিন্তু তা কি হয়? নিজের দেশের মাটি ফেলে কোথায় পালাবে নন্দ! ম্যাপে একটা খেয়ালখুশির আঁচড় টানা হয়েছে বলেই কি এ দেশের মাটিতে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়া বাপ-পিতামহের রক্তও গেছে শুকিয়ে? মাটির রঙ আর রূপ সব গেছে বদলে? এক হাত দিয়ে পরেশকাকাকে সজোরে সরিয়ে দিতেই তিনি কেঁদে ফেললেন ভেউ ভেউ করে। নন্দর দুটো হাত জাপটে ধরে বললেন, তোর জন্ত ভিটিতে মেয়ে-

ছেলেরা সব বসে আছে। তুই না এলে তো মা, কাকিমা কেউ নড়বে না একটি পা। সর্বনাশ হবে নন্দ। শিগ্‌গির চলে আয়।

খুব দ্রুত কিন্তু অস্পষ্ট নয়, সমস্ত ঘটনাটা নন্দর মনের সামনে পাক খেয়ে গেল। আঠারো বছরের নন্দর অর্ধ-পরিণত মনের সামনে ব্যাপারটার কুশ্রী ভয়াবহতা ফুটে উঠল। তার মা আর কাকিমা। আজ এরা যেমন করে শড়কি আর দায়ের ঘায়ে ভেঙে চুরমার করছে সাজানো একটা গৃহস্থালী, জিনিসপত্তর ফেলে ছড়িয়ে একাকার করছে তেমনি তো করবে বাড়ীর মেয়েদের নিয়েও। নন্দ পরেশকাকার হাত ধরে জানলা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে পড়েছিল—হাতের লাঠি কিন্তু ছাড়েনি।

তারপর কচুরিপানা ঠেলে ঠেলে রাতের অন্ধকারে অনির্দেশ যাত্রা। মা আর কাকীমার গুমরে গুমরে কান্না মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে উঠেছিল নন্দর। হাতের লাঠিটা আঁকড়ে ধরে পিছনের মিলিয়ে যাওয়া পারের দিকে চেয়ে বিড় বিড় করে বলছিল, আবার আসব আমরা, এই বলে গেলাম আবার ফিরে আসব।

হঠাৎ কানে ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ লাগতেই নন্দ ধড়মড় করে উঠে পড়ল। আর একদিনও ঠিক এই ব্যাপার হয়েছিল। বেওয়ারিশ ষাঁড় একটা সারা দিনরাত পথে পথে চরে বেড়ায়। তা বেড়াক, তাতে আপত্তির কি থাকতে পারে নন্দর, আর নন্দর আপত্তি শুনছেই বা কে? কিন্তু তা বলে জিভ দিয়ে এমনি করে মানুষের কান চাটবে আচমকা। হাতের লাঠিটা দিয়ে শিঙে সবেগে আঘাত করতেই ষাঁড়টা হুড়মুড় করে পিছিয়ে গেল। ঘুমন্ত পরেশ-কাকার শরীরের উপর দিয়ে রাস্তার ওপারে চলে গেল। আশ্চর্য, এততেও ঘুম ভাঙল না পরেশকাকার। ভারি ঘুমকাতুরে লোক, কিছুতেই যেন ঘুম আর ভাঙতে চায় না। হাজার নাড়া দিলেও নয়, লোকে মাড়িয়ে গেলেও নয়।

শিকারপুর রিলিফ ক্যাম্প। বেশ মনে আছে নন্দর কোথা থেকে স্টিমারে করে বুঝি মুরগী চালান এসেছিল। বেতের ছোট ছোট খাঁচায় মুরগীর পাল—গাদাগাদি করে ঠাসা। ঠিক তেমনি অবস্থা। এক ইস্কুল বাড়ীর কম্পাউণ্ডে তাঁবু ফেলে একশ ফ্যামিলির থাকবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। মানুষ আর নেই, চামড়া ঢাকা কঙ্কালের সার কেবল। ক্ষুধার্ত চোখ আর মুখের ভাব হাড়িকাঠে ফেলার আগেকার অবস্থা। আবদুল মোমিন সায়ের

তদারক করতেন। আশ্বাস দিতেন আশ্রয়হীনদের। সব ঠিক হয়ে যাবে। স্তিমিত হয়ে আসবে সাময়িক উত্তেজনা। তাই তাই আবার আস্তানা গড়বে পাশাপাশি। মুখে এ সব কথা বলতেন বটে মোমিন সায়েব, কিন্তু তাঁর দুটি চোখের তারায় চকিত স্পন্দনে অন্য রূপ নিত সব কিছু, চাপা গলায় আওয়াজে অন্য সুর ভেসে উঠত।

ঠিক একদিন স্পষ্ট করে সেই সুরই ধরলেন মোমিন সায়েব। এখান থেকে সরে যাওয়াই ভাল। গাঁয়ের লোকেরা নাকি এদের ভাল চোখে দেখছে না। কাজেই আবার গাদাগাদি করে খাঁচায় পোরা হল মুরগীর পাল। কেরায়া নৌকাজাত করা হল। রাতের অন্ধকারে দাঁড়ের ছপছপ আওয়াজে খালের জল মুখর হযে উঠল। এবার আর ছোটখাটো জায়গায় নৌকা বাঁধা নয়, একেবারে বড় বন্দরে গিয়ে ওঠাই ভাল। এদের সীমানা পেরিয়ে না গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়বে না কারও।

শেষে হলও ঠিক তাই। স্টিমারে করে চালান হয়ে এল আর এক স্টেশনে তারপর শেয়ালদা স্টেশনে পা দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই। কিন্তু এতদিন গতির মুখে যে কথাটা একবারের জন্যও মনে উঁকি দেয়নি, সেই রূঢ় প্রশ্নটা সব কিছু ঠেলে মানুষের মুখোমুখি দাঁড়াল। প্রাণ তো বাঁচল, হয়ত মানও বাঁচল, কিন্তু তারপর। নন্দ পরেশকাকার দিকে ফিরে চেয়েছিল, পরেশকাকা চেয়েছিলেন কলের ধোঁয়া আর ধুলোয় মলিন পাংশুটে রঙের কলকাতার আকাশের দিকে। বিছানার উপর মা আর কাকিমা শুধু হাপুসনয়নে কেঁদেছিলেন। এ ছাড়া অবশ্য কীইবা করতে পারতেন তাঁরা?

প্রথম কয়েকদিন ছুটোছুটি উদ্বাস্তু সাহায্য কেন্দ্রে আর সরকারী দপ্তরখানায়। আশা-আশ্বাস, নেতাদের ভুবন-ভোলানো হাসি আর অকাতরে পিঠ চাপড়ানো। সহজ সত্যটা একদিন বলেই ফেলেছিল নন্দ, এ সবে কিছু হবে না পরেশকাকা, কেবল হায়রানিই সার। বাবুরা কেবল কথার তুবড়ি। তার চেয়ে আমায় কিছু দাও দিকিন, ব্যবসাই শুরু করে দেই। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর চেষ্টা অবশ্য সব চেয়ে ভাল, কোন সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু ব্যবসা করবে কি নন্দ, ও জানে কি ব্যবসার! যে কটা টাকা পেট কাপড়ে বেঁধে আনতে পেরেছিলেন লুকিয়ে চুরিয়ে সে কটা এবার

শেষ হয়ে যাবে। নন্দ কিন্তু নাছোড়বান্দা। পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে আর মোটেই সে রাজি নয়।

প্রথম প্রথম ফুটপাতে কাগজ পেতে মোমবাতি জ্বালিয়ে সুতো, ছুঁচ, ঝিনুকের বোতাম এই সব নিয়ে বসেছিল। মূলধন পাঁচ টাকা। ছলে ছলে নানান ভঙ্গি করে চেঁচাত নন্দ। শস্তার মাল, জিনিসও ভাল এ সব বোঝাতে চাইত খদ্দেরকে। বরাত বলতে হবে নন্দর, চারদিনে মাল শেষ হয়ে গেল, লাভ একটাকা ছ'আনা। এবারে সব টাকাটা আবার ব্যবসায় ঢেলেছিল, সঙ্গে কিছু বাড়তি জিনিস—সাপখালিন আর ইস্কুলের ছেলেদের অঙ্ক খাতা। প্রথম প্রথম লজ্জা আর সংকোচের যে আবরণটুকু ছিল সেটা ক্রমেই সরিয়ে ফেলল নন্দ। চুরি-চামারি তো আর করছে না, নিজের টাকায় নিজে ব্যবসা ফেঁদেছে। তাতে কার কি বলবার থাকতে পারে? কিন্তু যার বলবার কিছু থাকতে পারে সে ঠিক মোড়ের পানওয়ালার দোকানের পাশ থেকে পা টিপে টিপে এসে একদিন হাজির হল। ফুটপাতে দোকান শুরু করেছে, দস্তুরি কই তার? নন্দর বেঁকে দাঁড়াবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পরেশকাকাই মানা করেছিলেন। কি দরকার ঝঞ্ঝাট বাধাবার? পুলিস পাহারাওয়ালাকে খুশি রাখতে হবে বৈ কি? সব দেশে সব কালেই এই নিয়ম। উঠতি ব্যবসার মুখে নন্দ আর গোলমাল বাধাতে চায়নি। কাগজের তলা থেকে খুচরো পয়সা নিয়ে লোকটার হাতে তুলে দিয়েছিল।

মাস দুই-তিনের মধ্যেই পরেশকাকাও হাত মেলালেন নন্দর সঙ্গে। মন্দ তো নয়, রিফিউজি অফিস আর স্পেশিয়াল অফিসার বাবুদের কাছে ঘোরাঘুরি করার চেয়ে এ ঢের ভাল। স্বাধীন ব্যবসা, কারো তাঁবেদার নয়। এবারে ব্যবসা শুরু হয়েছিল একটু বড় ঢঙে। খান আষ্টেক ইঁটের উপর পাতলা কাঠের তক্তা পেতে তার উপর গেঞ্জি, গামছা, মোজা, নানা রঙের ছিটের কাপড় জড়ো করে বসত দুজনে—নন্দ আর পরেশকাকা। পরেশকাকা শুধু পয়সা গুণে রাখতেন থলির মধ্যে, দরদস্তুর, চেঁচামেচি, কেনাবেচা সব কিছু নন্দই করত। শুধু তারা নয়, দেখাদেখি আশেপাশে আরো লোক বসে গেল। সবাই কি আর উদ্বাস্তু! সুবিধে বুঝে দু একজন করে খোট্টাও জুটে গেল এসে। নাই বা হল উদ্বাস্তু, এদের হাত চেপে ধরে বলল, 'ভাই ভাই, গান্ধীজীর রাজ্যে সব সমান।' কথাতেই কথা বাড়ে, তাই এদের দু'একজন গুজগুজ করলেও, এ নিয়ে হৈ চৈ করেনি কোনও। একটা বড় সুবিধা ছিল,

ক্রেতার দল এদিকেই ঝুঁকত বেশি। আহা, সর্বস্ব খুইয়ে এসেছে বেচারিরা কিনতে হয় তো ওদের কাছেই কেনা উচিত! অবশ্য দয়া দাক্ষিণ্য সবই ছিল কিন্তু তা বলে দর কবতেও কেউ কসুর করতেন না। যা দাম জিনিসের তার অর্ধেক বলতেন, ওঠানামা চলত তারপর মাঝামাঝি একটা কিছুতে আপস। এই করেই এরা খায় যখন, একটু দেখতে হবে বৈ কি এদের দিকে।

দুজন করে ভাগে একটা পাম্প্ লাইটও কিনেছে। নইলে ভারি অসুবিধা। মিটমিটে মোমবাতির আলোয় বাহার খোলে না ছিটের, গেঞ্জি মোজার জেল্লা হয় না। চিকণ সুতোর নিরেট বুনন দেখানো যায় না ক্রেতাদের।

এই দোকানের জিনিসগুলোর জন্যই কাছাকাছি শুতে হয় সবাইকে। রাত্রে দোকান তুলে ত্রিপলের উপর ইঁট চাপিয়ে দিতে হয়। নয়ত বৃষ্টির দিনে জিনিসের আর পদার্থই থাকবে না। দোকান আর দোকানীকে কাছাকাছিই থাকতে হয়।

আশ্চর্য, কি যে হয়েছে নন্দর। একেবারে ঘুম আসছে না। দূরে একটা গির্জায় ঢং করে একটা বেজে গেল। নিশুতি রাত। কিন্তু নন্দ এপাশ ওপাশ করতে লাগল। বাগান থেকে উপড়ে এনে গাছকে ধরে বসালে যেমন হয়, পাতাগুলো পেকে পেকে ঝরে যায়, শুকিয়ে আসে ডালপালার রস, ঠিক আগের মতন করে কিছুতেই আর মাটি আঁকড়াতে পারে না শিকড়গুলো! অবিকল তেমনি অবস্থা হয়েছিল মা আর কাকীমার। ওয়েটিং রুমে শোয়া আর তার পাশে ইঁট জড় করে মাটির হাঁড়িতে রান্না চাপানো। ধোঁয়াতে চোখ দুটো লাল হয়ে উঠত দুজনের। ছেঁড়া আঁচলে মুছে মুছে কাপড়ের সুতোই যেত আলগা হয়ে, চোখের জল কমত না। একটু যদি ফাঁক থাকত ধোঁয়া বেরিয়ে যাবার, তা হলে এমন দম আটকানোর অবস্থা হত না।

দুজনেই গেলেন দিন সাতেকের আড়াআড়িতে। প্রথমে কাকীমা তারপর মা। অবশ্য লোকজন ডাকবার কোন দরকারই ছিল না। চামড়া ঢাকা কখানা হাড়—কিই বা তার ওজন। নন্দ পাঁজাকোলা করে একলাই শুইয়ে দিয়ে আসতে পারত শ্মশানে। কিন্তু লোকেরা শুনল না। খাটিয়া আনল, দড়ি আনল, তারা ফুলের তোড়াও যেন এনেছিল।

একরকম ভালোই হল। দিব্যি নির্ঝঞ্ঝাট। পিছনে চাইবার দরকার রইল না। ওদের হাতের খয়ে-যাওয়া সামান্য সোনাদানাগুলো বেচে নন্দ

দোকানে ঢালল। যেমন করেই হোক, দাঁড়াতে হবে আবার। দোকানে ভর দিয়ে না হয় দাঁড়ালই কিন্তু কি করে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে আগেকার সোনালি দিনগুলো। গাঁয়ের বিস্মৃতপ্রায় সৌন্দর্য রাত হলেই নতুন রঙে রেখায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নন্দর চোখের সামনে। কিছুতেই ভুলতে পারে না। ভুলতে পারে না বলেই বুঝি কেবল ছটফট করে বিছানায়।

সব কিছু পিছনে রেখে পালিয়ে এসেছে বলে দুঃখ তত্টা হয় না। নন্দর, ওর কেবল চোখের সামনে ভেসে ওঠে সড়কি আর বল্লম হাতে করে আমেদ, রসুল, ইসমাইল আর ইয়াকুবদের দাঁড়িয়ে থাকার দৃঢ় ভঙ্গি। বদনতলার মেলায় এরা কেউ দাঁড়াতে পারেনি নন্দর সামনে। দশ মিনিটের মধ্যে লাঠির ঘায়ে এদের হাতের লাঠি দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। আমেদ তো নিজের ভাঙা লাঠির টুকরো নন্দর পায়ের কাছে রেখে বলেছিল, 'সালাম ওস্তাদ।' কতদিনের আর কথা। কিন্তু বছর চার পাঁচের মধ্যে কি এমন হল? কোথা থেকে এরা জোর পেল এমন সোজা হবে দাঁড়াবার? কে যোগাল মাজার এতখানি শক্তি। সেইখানেই নন্দর আপসোস। পরেশকাকার কথা না শুনলেই হত। পাকা বাঁশের লাঠি হাতে ছিটকে গিয়ে দাঁড়ালেই হত ওদের সামনে। একেবারে মুখোমুখি। বদনতলার মেলার খেলা আর একবার দেখিয়ে দেওয়া যেত। লাঠি হাতে থাকতে ওস্তাদ পালাল জানলা দিয়ে রাতের অন্ধকারে মুখ ঢেকে! এ লজ্জা রাখবার ওর ঠাঁই নেই।

একটু তন্দ্রার মত এসেছিল হঠাৎ অনেকগুলো লোকের হৈ চৈ চিৎকারে ঘোর কেটে গেল। ভোর হয়েছে বোধ হয়। শেয়ালদা স্টেশনে কুলিরা জেগে উঠেছে। দিনের কাজ শুরু করবে এইবার। জীবিকা অর্জনের সংগ্রাম।

কিন্তু ধড়মড় করে উঠেই নন্দর ভুল ভেঙে গেল। না, পাণ্ডুর চাঁদের আলো, এখনও বেশ জমাট অন্ধকার গলির কোণে কোণে। তাছাড়া রাস্তায় জলের আছড়ানির শব্দ কই? ভোর রাত থাকতেই তো রাস্তা ধোয়ার পালা শুরু হয়। রসিকতা করে লোকটা আবার মাঝে মাঝে পাইপের মুখটা ফুটপাতে শোওয়া লোকগুলোর দিকে ঘুরিয়ে দেয়।

কিন্তু আওয়াজ একটা আসছে। দু'একজন লোকের ফিসফাস নয়, অনেকগুলো লোকের গুলতানি। লরির শব্দও শোনা গেল। ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে।

মিছিল নাকি কোন? অভাব-অভিযোগ জানাবার জন্য মাঝে মাঝে এক দল লোক এগিয়ে যায় রাস্তা দিয়ে, তারপর কাঁদুনে গ্যাসের চোটে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। গলির কোণে কোণে জমাট বেঁধে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ, তারপর কোথায় মিশিয়ে যায় আর খুঁজেই পাওয়া যায় না অনেকদিন ধরে। সেই রকম কিছু একটা নাকি? কিন্তু এই মাঝরাতে? কে শুনবে ওদের অভিযোগ আর অভাবের নালিশ? ঘুমন্ত মানুষের কাছে পৌঁছবে কি করে ওদের বুক ফাটানো চিৎকার। বলে, জেগে থাকা মানুষই আমল দেয় না, পাশ কাটিয়ে সরে যায়। না, মিছিল নয়।

আওয়াজ আরও জোর হতেই নন্দ জাগিয়ে দিল পরেশকাকাকে। দুহাতে সবেগে ধাক্কা দিল, চিৎকার করল, পরেশকাকা, ও পরেশকাকা!

কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে পরেশকাকা উঠে পড়লেন, কিরে কি ব্যাপার?

কিসের একটা হৈ চৈ যেন শুরু হয়েছে। আওয়াজটা ক্রমে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

হৈ চৈ, আবার হৈ চৈ। গোলমাল চিৎকারের বুঝি আর শেষ নেই। মানুষের শান্তি একেবারে ঘুচে গেছে।

পরেশকাকা চুপ করে কান পেতে শুনলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, হ্যাঁ, একটা গোলমাল হচ্ছেই তো বটে।

আশেপাশের অনেকগুলো লোক উঠে পড়ল। এত চিৎকারে কখনও নির্বিঘ্নে ঘুমোতে পারে মানুষ।

অনেকগুলো মানুষের সম্মিলিত কলরবে রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরগুলো পর্যন্ত একটানা চিৎকার করে উঠল। নন্দ পাকানো বাঁশের লাঠিটা শক্ত করে হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। গোলমাল একটা আরম্ভ হয়েছে। মানুষের তৈরি থাকাই তো ভাল।

মিনিট পাঁচেক। তার বেশি নয়। তারপরেই সমস্ত ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠল। শুধু লরি নয় সঙ্গে জিপও রয়েছে একটা। বোঝাই লোক। আধো অন্ধকারে ভাল করে তাদের দেখা গেল না কিন্তু আবছা দেখা গেল তাদের হাতের দীর্ঘ বাঁশের লাঠিগুলো। বর্শা বলেই মনে হল। ঝপাঝপ গাড়ি থেকে নেমে পড়েই এলোপাথাড়ি লাঠি চালাতে শুরু করল—মানুষের উপর নয়। তাদের উপর বুঝি কোন আক্রোশ নেই। লাঠি চালাতে লাগল

তেরচা করে বাঁধা বাঁশের কাঠামোগুলোর উপর, যাতে ত্রিপল খাটিয়ে নিচে বসে দোকানীরা, তারপর লাঠি চালাল পাকলাইট, কাঠের পাটাতন আর সীমানার জন্য রাখা ইঁটগুলোর উপর। লাঠির খোঁচা দিয়ে দিয়ে ত্রিপল-গুলো খুলে ছুঁড়ে সরিয়ে দিল, তারপর জামা, গেঞ্জি, ছিটের কাপড়, খাতা, সুতোর বাণ্ডিল সব তচনচ করে দিল। ছত্রাকার করে দিল রাস্তা আর ফুটপাতের উপর।

জিনিসগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার করে দিল, কিন্তু সন্তর্পণে বাঁচিয়ে গেল মানুষদের। ছুঁলোও না একটু। কিন্তু এর চেয়ে মানুষগুলোকে মারল না কেন এলোপাথাড়ি, খোঁচা দিয়ে দিয়ে চামড়া ছিঁড়ে রক্তের ফিনিক ছুটিয়ে দিলেও তো পারত।

আধো অন্ধকারে, ওদের হাতের জ্বলে-ওঠা টর্চের স্বল্প আলোয়, লাঠির কটাকট শব্দে আর ছড়িয়ে পড়া জিনিসপত্রের পটভূমিকায় নন্দর পায়ের তলায় শিয়ালদার কঠিন কঠোর ফুটপাত বদলে পায়ে আবার গাঁয়ের মাটির রূপ নিল —ভিজে নরম মাটি নয়, আর এক রাতের শক্ত কঠিন জমি—যে রাতে অনেক লাঠিয়াল আর শড়কি, বল্লম হাতে আর একটা জাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। অবিকল এই ভঙ্গি, এই ঢং, এমনি সমারোহ করে মানুষের সহজ সরল জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার চেষ্টা।

অর্থহীন একটা চিৎকার করে লাঠিটা আঁকড়ে ধরে নন্দ এগিয়ে গেল। হলই বা শহর, বদনতলার মেলার মত লোকও তো কম জড়ো হয়নি এখানে। নন্দর হাতের লাঠি বেইমানি কখনও করবে না, অন্তত এ পর্যন্ত তো করেনি।

এগোবার মুখেই বাধা পেল নন্দ। সে রাতের মতন পিছন থেকে ঝাপটে ধরা নয়, সবেগে লাঠিশুদ্ধ ওর একটা হাত চেপে ধরল—সেই একই লোক।

এক ঝটকা মারল নন্দ, আঃ, ছেড়ে দাও পরেশকাকা।

পরেশকাকা ছাড়লেন না, পাগল নাকি তুই! কার সঙ্গে লড়তে যাচ্ছিস লাঠি নিয়ে? দেখছিস না পোশাক আর মাথার পাগড়ি?

দু'এক মিনিট। একটু দমে গেল নন্দ। ওদেরই টর্চের আলোয় ওদের দু'একজনের চেহারা দেখে নিল। এত স্বল্প আলো, সেদিনের মশালের আলো কিন্তু এর চেয়ে অনেক জোর ছিল। পোশাক দেখা গেল না, কিন্তু দেখা গেল কঠিন নির্মম মুখের রেখাগুলো আর মাথার জড়ান পাগড়ি।

না, ভুল হয়নি নন্দর। পরেশকাকারই ভুল হয়েছিল। সেই এক মুখ। কোন তফাৎ নেই। সেই আমেদ, রসুল, ইসমাইল আর ইয়াকুব,-পিছন দিকে ভিন্ গাঁ থেকে সার বেঁধে দাঁড়ানো ওদের দলের লোক। পাগড়ি তো বাঁধবেই মাথায়, নন্দর হাতের লাঠি থেকে মাথা বাঁচাতে গেলে, ওছাড়া আর উপায়ই বা কি!

প্রাণপণ শক্তিতে নন্দ পরেশকাকার কবল থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। পরেশকাকার কথা আর নয়। ওঁর কথায় আর এক রাতে বাঁশের লাঠি বগলে নিয়ে আনল। দিয়ে লাফিয়ে পিছিয়ে পালাতে হয়েছিল—রাতের অন্ধকারে মুখ ঢেকে। নিজের বলতে যা কিছু সব ফেলে রেখে পিছিয়ে পড়া আর নয়, মাথা নিচু করে পালানোও নয় আর।

এবার এগিয়ে চলা। মুখোমুখি দাঁড়ানো ওদের সামনে। হাতে লাঠি থাকতে মরদের আবার ভয়!

পরনের কাপড়টা আঁট করে বেঁধে নিয়ে বাঁশের লাঠিটা শক্ত মুঠোয় ধরে নন্দ ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনের দিকে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচারের নিরিখ

অসিত সেন

'মার্কসবাদী'তে প্রকাশ রায়-রবীন্দ্র গুপ্ত থেকে শুরু করে 'পরিচয়'-এ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বহু আলোচক এবং সমালোচক রবীন্দ্রনাথের উপর অধুনা-প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ লিখবার চেষ্টা করেছেন।

সুব্রতবাবুর প্রবন্ধের নিচে 'পরিচয়'-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাকেও বলতে হচ্ছে এঁদের অধিকাংশই কোন না কোন বিচ্যুতির দোষে দুষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিক্রিয়াশীল অথবা প্রগতিশীল, বিপ্লবী অথবা প্রতিবিপ্লবী, এমনি কোন পরিণতির দিকে তাঁকে এনে ফেলবার তাগিদে প্রবন্ধ-লেখকেরা যে যার সুবিধামত রবীন্দ্রনাথ থেকে সসমারোহে উদ্ধৃতি দাখিল করেছেন।

একমাত্র 'পরিচয়'-এ অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আলোচনা তুলনামূলক বিচারে বহুলাংশে সংযত নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট কাব্য-প্রতিভা থেকে স্বপক্ষ বা বিপক্ষ মত খাড়া করবার জন্যে বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতির সাহায্য নিতে পারা খুবই সহজ। ঠিক এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের দু'এক ছত্র বা এমন কি দু'একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যের উল্লেখেও রবীন্দ্রনাথকে সঠিক বুঝতে পারা সহজ নয়। সামন্ত-প্রতিক্রিয়ার নাগপাশ থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া-প্রগতির পথে তাকে পরিচালিত করেছিলেন কিনা এবং রবীন্দ্রনাথের সময়ে এই পর্বটির প্রয়োজন ছিল কিনা—মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে এমনি কোন বিশ্লেষণেও রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারা দুঃসাধ্য। বস্তুত, তাঁকে উপলব্ধি করতে হলে চাই সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ এবং ভিন্ন বিচারবুদ্ধি।

রবীন্দ্রনাথ কবি। প্রকৃতির কবি, সৌন্দর্যের কবি, বৈচিত্র্যের কবি। রবীন্দ্রনাথ মানুষ। তাই তিনি মানুষেরই কবি। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের সার্থকতা, তাঁর পরিণতি বুঝতে গেলে চাই সমগ্রভাবে রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহের সুষ্ঠু এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন। তিনি নাট্যকার, কথাকার, প্রবন্ধ এবং পত্র-

রচয়িতা, সংগীত-রচয়িতা এবং সুরকার আবার অভিনেতা এবং চিত্রকলাবিদও। এক কথায় বহুমুখী প্রতিভার পরিপূর্ণ আধার রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ আলোচনা করতে গেলে প্রয়োজন এই রবীন্দ্র-প্রতিভার সূক্ষ্ম পর্যালোচনা।

সৃজনশীল প্রতিভাকে বুঝতে হলে তার বিকাশের গতিপথটিকে চিনতে পারা চাই—এই গতিপথটির আরম্ভ কোথায়? এর আরম্ভ মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং সামাজিক পরিবেশে আর এই পরিবেষ্টিত অবস্থান সম্পর্কে তার সচেতন চিন্তা-বিন্যাসে। অর্থাৎ, জীবন এবং জীবনদর্শনই প্রতিভার পথ-প্রদর্শক, তার গতি-নিয়ন্ত্রক।

অতএব রবীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীন আলোচনাকালে তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারার উপর গুরুত্ব আরোপ অপরিহার্য।

সমসাময়িক যে সমাজে রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং যে বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ বিবর্তিত সেখানে সীমার মধ্যে অসীমের নিরন্তর অন্বেষণ অন্ধকারে পথ খুঁজে মরারই সামিল। অথচ রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক দৃষ্টি এই সীমার মাঝে অসীমের অন্বেষণেই সদাজাগ্রত। বস্তুবাদী দর্শনের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা, এবং বহির্বাস্তবে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার সার্থক প্রয়োগান্তে ভাববাদী দর্শনের মায়াজাল বোনা নিঃসন্দেহেই প্রতিক্রিয়াশীল।

কিন্তু মূলত প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বহন করেও সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথ কি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিলেন?—না। বরং প্রগতির পথে তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সুগভীর চিহ্ন সুস্পষ্ট। তার কারণ কি?

কারণ, রবীন্দ্রনাথের উদার মানবতাবোধ। একদিকে রবীন্দ্রনাথের মূল দার্শনিক দৃষ্টি যেমন প্রতিক্রিয়াশীল, অপরদিকে তেমনি তাঁর উদার মানবতা-বোধ বলিষ্ঠ প্রগতিশীল চরিত্রের পরিচায়ক।

ভাববাদী দর্শনের বাহক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বস্তুবাদী মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথের তীব্র সংঘাত তাই অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী এবং অনস্বীকার্য।

ঠিক এই কারণেই তাঁর সমগ্র কাব্য-প্রবাহের মধ্যে এই সংঘাতের মূর্ত প্রকাশ বিশেষভাবে পরিলক্ষ্যণীয়।

প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মধ্যে এই সংঘাত, এই দ্বন্দ্ব বিরল তো নয়ই বরং বহুলমাত্রিক। কিন্তু এই একই অন্তর্দ্বন্দ্ব রোমাঁকে যেমন ধীরে ধীরে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সার্থক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁকে গুণগতভাবে

পরিবর্তিত করে ফেলেছিল, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তেমন পারেনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও রবীন্দ্রনাথকে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের আঘাতে জর্জরিত হতে হয়েছে। অন্তর্দ্বন্দ্বের তাড়নে রোলাঁ যেখানে দুঃসহ আত্মযন্ত্রণার ভিতর দিয়ে দ্বন্দ্বহীন স্থির লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ খুঁজে ফিরেছেন এবং পরিশেষে "I will not rest"-এ এসে পরিণতি লাভ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে এই দ্বন্দ্বটিকে উপলব্ধি করবার জন্য সচেষ্ট না হয়ে একে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পাশ কাটিয়ে এড়াবার চেষ্টা করলেই তো দ্বন্দ্বকে দূর করা যায় না। তাই পলায়নবাদীর মত শান্তিনিকেতনের ছায়ায় বসে শান্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ কালেই বারে বারে সে নিঃশ্বাস তাঁর ভরে উঠেছে অশান্তির বিষবাষ্পে। মায়াবাদ-দুঃখবাদের সংবেদনশীল লেখনী অশান্ত-আবেগে তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে বাস্তববাদের প্রাণবন্ত গাথায়। আবার পরক্ষণেই হয়ত কঠিন বাস্তবের সঙ্গে সমস্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সে কমনীয় আবেগে রচনা করে চলেছে অলীক কল্পনার বিচিত্র ইন্দ্রজাল।

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দ্বন্দ্বের এই মূল সুরটি উপলব্ধি করতে পারলে তাঁকে গ্রহণ-বর্জনের সমস্যার সমাধান করা হয়ে উঠবে নিতান্তই সহজ। তাঁর ভিতরে এই সংঘাতে সমাবিষ্ট দুটো বিরোধী ধারাই এত জোরালো, এত প্রাণবন্ত যে এক কথায় রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াশীল বা প্রগতিশীল আখ্যা দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে দেবার চেষ্টা সহজ নয়, কাজেই এই চেষ্টা করতে গিয়ে বুদ্ধির লড়াই চালাতে যাওয়াও নিরর্থক। লড়াই যদি চালাতেই হয় তো ভাববাদী দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বস্তুবাদী মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথের লড়াইকে সম্যক্ গুরুত্ব দিয়েই তা চালাতে হবে। কিন্তু তেমন গুরুত্ব আরোপে লড়াইয়ের প্রয়োজনই হয়ত থাকবে না কোন। অর্থাৎ লড়াইটা তখন রবীন্দ্রনাথ প্রতিক্রিয়াশীল না প্রগতিবাদী, এ নিয়ে চুল-চেরা বিতর্কের পর্যায় ছেড়ে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য বহনকারী প্রগতিবাদের লড়াইয়ের স্তরে এসে পৌঁছবে।

এ কি সম্ভব? রবীন্দ্রনাথকে প্রগতিবাদের এক শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার রূপে গ্রহণ করা সম্ভব, না বর্জন করে তাঁকে প্রতিক্রিয়ার হাতের পুতুলে পরিণত হতে দেওয়া অবশ্যম্ভাবী—সাচ্চা মার্কসবাদীর মনে এ ধরনের প্রশ্ন ওঠাই অস্বাভাবিক এবং অনুচিত। কারণ সীমার মধ্যে অসীমের কল্পাবর্তে ঘুরপাক খাওয়া নিশ্চিতভাবে প্রগতির পরিপন্থী, আবার বাস্তব মানবতাবোধ বলিষ্ঠ

প্রগতির ধারা বাহক—এবং পূর্বেই বলা হল যে, এই দুটো ধারাই রবীন্দ্রনাথের ভিতর সমমাত্রায় প্রবল। বাস্তববাদী রবীন্দ্রনাথ রূপনারাণের কূলে জেগে উঠে এ জগৎ স্বপ্ন নয় জানবার পরে পরেই সত্তার আবির্ভাবকে ডুবিয়ে দেন মিস্টিসিজ্‌ম্‌-এর বন্যায়। তাঁর ক্ষেত্রে তাই গ্রহণ এবং বর্জন একে অপরের বিকল্প হিসাবে দাঁড়াতে পারে না, পরন্তু, এই দুয়ের ভিতর এক সুষ্ঠু সমন্বয় প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই সমন্বয় সাধন করতে হলে সুস্থ এবং উদার মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য বিচারে অবতীর্ণ হওয়া চাই। কিন্তু এই ঐতিহ্য বিচারে মার্কস্‌, এঙ্গেল্‌স্‌, লেনিন থেকে অজস্র উদ্ধৃতির সাহায্য না নিয়ে, তাঁরা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের পথে কি ভাবে পূর্বগামীদের ঐতিহ্য-বিচারে এবং বহনে ব্রতী হয়েছিলেন সেটুকু স্মরণ করলেই অধিকতর ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয়।

মার্কসের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী। হেগেল ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক। কিন্তু এই ভাববাদী তত্ত্বে পৌঁছবার পদ্ধতিটা ছিল তাঁর দ্বন্দ্বমূলক (Dialectical) এবং বৈজ্ঞানিক। তবু অবৈজ্ঞানিক ভাববাদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্ববাদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। তাই হেগেলীয় দর্শন সামগ্রিক বিচারে স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। হেগেলকে বিচার করতে গিয়ে মার্কস্‌ তাঁর ভিতরকার এই স্ববিরোধিতাকে সাগ্রহে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন। ফলে, সমগ্রভাবে হেগেলকে বর্জন বা গ্রহণের প্রশ্ন মার্কসের মনে ঠাঁই পায়নি। পরন্তু, তিনি হেগেলের এই স্ববিরোধিতার মূল উদ্‌ঘাটন করে তাতে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন এবং একই সঙ্গে তাঁর বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্ববাদটুকুকে সাদরে এবং সশ্রদ্ধায় গ্রহণ করে তাকে একটা পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক রূপ দিয়েছেন। একই ভাবে ফয়ারবাকের বস্তুবাদকে অবৈজ্ঞানিক যান্ত্রিকতার সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে উদ্ধার করে তারই ভিত্তিতে মার্কস্‌ তাঁর বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদকে বিকশিত করেছেন। মার্কসের মন শুধু বৈজ্ঞানিকই ছিল না, সুস্থ এবং প্রশস্ত মনেরও অধিকারী ছিলেন তিনি, তাই হেগেল-ফয়ারবাকের দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাঁদের চিন্তাধারার বলিষ্ঠ দিকটা তাঁর নজর এড়ায়নি। তাই তাঁদের দোষ বা ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তীব্রতম আক্রমণের আঘাতে উড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কস্‌ তাঁদের বলিষ্ঠতাটুকুকে সশ্রদ্ধ মূল্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব মতবাদের গোড়াপত্তনের কাজে তা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করেন।

এইভাবে ভাববাদী হেগেলকে যতটা সম্মান বা শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন

বস্তুবাদী মার্কস, হেগেলীয় মতবাদের একনিষ্ঠ ধারক এবং বাহকেরাও ততটা পারেননি। প্রতিক্রিয়া'র শক্তিগুলো যে হেগেলকে দলে টেনে প্রগতির বিরুদ্ধে লড়বার স্বপ্ন দেখছিল, সেই হেগেলকে মার্কস কাজে লাগালেন প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতিবাদ এবং বিপ্লববাদের হাতিয়ার রূপে।

এমনিভাবে, বহুমুখী প্রতিভার আধার রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল বাস্তব মানবতাবোধের ঐতিহ্যকে সসম্মানে এবং সশ্রদ্ধায় বহন করব আমরা। অন্যায় অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর আমরণ মানবিক সংগ্রামকে আমরা তুলে নেব প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতিবাদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে। একই সঙ্গে আমরা তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদের মূল উদ্ঘাটন করে তারও বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাব।

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের পিতৃভূমি সোভিয়েট রাশিয়াকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে রবীন্দ্রনাথের যে সুস্থ মানবতাবোধ, আমরা হব তারই ধারক এবং বাহক; রবীন্দ্রনাথের যে ভাববাদী চিন্তাধারার আতিশয্য সোভিয়েট সমাজ-বাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের আশ্রম প্রতিষ্ঠাকে সমান্তরাল করে দেখতে চেয়েছে তা শুধু বর্জনীয়ই নয়, আক্রমণযোগ্যও বটে। যে রবীন্দ্রনাথ নিজের ত্রুটি স্বীকার করেও সর্বত্রগামী হননি, দূর থেকে বারংবার নমস্কার জানাতে চেয়েছেন মানুষের কবিকে, তিনি আমাদের কাম্য নন। যে রবীন্দ্রনাথ র‍্যাথবোর্নের কাছে খোলাচিঠিতে কোটি মানুষের মনের কথাকে ভাষা দিয়েছেন, যে রবীন্দ্রনাথের কাছে নাগিনীদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস শান্তির ললিত বাণীকে ব্যর্থ পরিহাসে ভরে তুলেছে—তিনি আমাদের চির-কাম্য চির-শ্রদ্ধেয় চির-আপন।

বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের মূর্তিমান জ্যোতিষ্ক সোভিয়েট রাশিয়া রবীন্দ্রনাথের এই মানবতাবোধের কাছেই কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে, সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ বা বর্জনের প্রশ্ন সে-দেশের মনে ঠাঁই পায়নি।*

---

*রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচারের মার্কসবাদী নিরিখ নির্ণয় সম্পর্কে মতান্তরের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে এটি প্রকাশিত হল। আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্যে আমরা পাঠক-সাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছি। —সম্পাদক

পুস্তক পরিচয়

চীনের মুক্তি-সংগ্রাম: সুপ্রকাশ রায়; নিউ সেঞ্চুরী পাবলিশার্স; ইন্টালী মার্কেট, কলিকাতা-১৪; প্রথম সংস্করণ; দাম: এক টাকা বার আনা; পৃ: ১৭৭।

নয়া চীন, নয়া দুনিয়া: অশোক গুহ; ভারতী লাইব্রেরী, ১৪৫ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬; মূল্য পাঁচ সিকা; পৃ: ৮২।

লাল চীন: বিশ্ব বিশ্বাস; বিশ্বাস পাবলিশিং কোং, ৩নং রেস্তারেণ্ড কালী ব্যানার্জি রো, কলিকাতা-৬; মূল্য তিন টাকা; পৃ: ১৬০।

চীন সম্বন্ধে আজ ভারতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে জনগণের বিরাট স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্য। সকল দলের ও মতের লোক, সকল চিন্তাশীল মানুষ, সকল সজ্জন ও মানবদরদীই সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী কুকুর চিয়াং কাই-সেকের পরাজয়ে ও চীন গণ-রিপাব্লিকের প্রতিষ্ঠায় উল্লসিত। চীন সম্বন্ধে ভারতীয় জনগণের এই বিরাট ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের সকল স্তরে সমান রাজনৈতিক চেতনা নিশ্চয়ই নেই, বহু ভুল ধারণা, ভুল দৃষ্টিভঙ্গি, বহু বিভ্রান্তি, অজ্ঞতা, অসঙ্গতা স্পষ্টতই বিদ্যমান। তথাপি এই ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট একটা অতি বড় বাস্তব সত্য। এতদূর সত্য যে সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে আজ যাঁরা নাম লিখিয়েছেন তাঁদেরও বাধ্য হয়ে চীনের গণ-রিপাব্লিককে স্বীকার করতে হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সমর্থন করতে হয়েছে। এমনি করে এশিয়ার ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের বিরাট অগ্রগতি সাম্রাজ্যবাদী শিবিরেও ফাটল ধরিয়েছে, সেখানে নতুন অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে ও যে সকল অন্তর্দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল সেগুলিকে প্রখরতর করেছে। অবশ্য নেহরু সরকার বলে থাকেন, চীনে যা ঘটেছে তা ইওরোপের বিরুদ্ধে এশিয়ার, প্রতীচ্যের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের 'জাতীয়তাবাদী' আন্দোলনের পর্যায়ভুক্ত এবং চীনের গণরাষ্ট্র পণ্ডিত নেহরুর চোখে 'কমিউনিস্ট' সরকার নয়, 'জাতীয়' সরকার। যেন কমিউনিস্ট হলেই 'বিজাতীয়' হতে পারে! নেহরু-বাণীর

রত্নপেটিকার অন্যান্য রত্নের মতই এও দেবতাদের উপভোগ্য। কেননা আমার মত সামান্য লোকের চোখে মাও সে-তুং ও চু-তে যেমন অতি বড় চীনা, লেনিন-স্টালিনও তেমনই অতি বড় রাশিয়ান—তাঁরা জার্মান বা আমেরিকানও নন্ বা মঙ্গলগ্রহ থেকেও অবতীর্ণ হননি। এমন কি ভারতের হতভাগ্য কমিউনিস্টরাও খাঁটি ভারতীয়ের মতই খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ পরা, বাকবিতণ্ডা ইত্যাদি তো করে থাকেনই, উপরন্তু তাঁরা ভারতের চাষী, মজুর,মধ্যবিত্ত ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের হাতেই—জমিজমা, বড় বড় কলকারখানা ও দেশের শাসনভার তুলে দিতে চান। এবং তাঁদের এই অত্যন্ত 'ভারতীয়' ও অত্যন্ত 'জাতীয়' রাজনৈতিক মতবাদের জন্যই তাঁরা নেহরু সরকারের আইনে দণ্ডনীয়। এটাও অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কোরিয়ার নেতা কিম ইল-সুংও কোরিয়াবাসীর জন্য কোরিয়ান 'জাতীয়' সরকার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই লড়ছেন এবং ইন্দোনেশিয়ার মুশা-সরিফউদ্দিনও ইন্দোনেশিয়ান জাতীয় সরকারের জন্য লড়ছিলেন। সুতরাং কেনই বা তাঁরা পণ্ডিতজীর 'জাতীয়' স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হলেন? পিকিংয়ে যে জিনিসটা 'জাতীয়', যোগিয়া-কর্তায় বা তেলেঙ্গানায় তা 'বিজাতীয়' হয়ে উঠল কেন? বোধ হয় সুবিধা-বাদের স্বর্গে সবই সম্ভব। কিন্তু চীন সম্বন্ধে নেহরু সরকারের মুখোশ ইতিমধ্যেই অকেজো হয়ে উঠেছে কেননা জনগণকে প্রতারণা করা আজকের দিনে সহজও নয়, সম্ভবও নয়।

সম্ভব নয় এইজন্য যে সত্যকে বেশিদিন গোপন রাখতে সাম্রাজ্যবাদীরা পারেনি ও পারবে না। সত্য গোপন করার ও সত্যকে বিকৃত করার শত চেষ্টা সত্ত্বেও চীন সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য চীনের প্রথম গৃহযুদ্ধের সময় থেকেই প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়েছে। এডগার স্নো, অ্যানা লুইজ স্ট্রং, অ্যাগ্‌নেস স্মেডলি,এপ্‌স্টাইন, হ্যারিসন ফোরম্যান, গান্থার স্টাইন, জ্যাকোবি ও হোয়াইট ইত্যাদির লেখা চীনের মুক্তি-সংগ্রাম ও তার নেতাদের সম্বন্ধে বহু সত্য তথ্য প্রচারিত হয়েছে। এঁদের কারও কারও দৃষ্টিভঙ্গি দুষ্ট, বিকৃত বা ভ্রমাত্মক হওয়া সত্ত্বেও এঁরা সকলেই ভারতে চীন সম্বন্ধে অজ্ঞতা দূর করার কাজে সহায়তা করেছেন। চীন সম্বন্ধে সকলের চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া গিয়েছে অবশ্য 'চায়না ডাইজেস্ট' ও 'পিপ্‌ল্‌স চায়না', এই দুটি পত্রিকা মারফত। কিন্তু চীনকে ও চীনের মুক্তি-সংগ্রামকে বুঝতে সব চেয়ে বেশি সাহায্য করেছে এই দুটি পত্রিকা মারফত ও অন্যান্যভাবে মাও সে-তুং, লিউ

শাও-চি প্রভৃতি চীনের অবিসংবাদিত নেতাদের যে দু'একটি প্রবন্ধ ও বক্তৃতা ভারতে প্রচারিত হয়েছে, সেই রচনাগুলি।

ভারতের দক্ষিণপন্থী মহল আজ কোন নতুন চিন্তা বা নতুন ভাব গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এই মহলের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লেখার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় শুধু সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচারের ইতর অনুকরণ, যা কিছু নতুন ও প্রগতিশীল তার সম্বন্ধে অতলস্পর্শী অজ্ঞতা ও ক্ষমাহীন অসহিষ্ণুতা, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে দ্বেষ ও ঘৃণা, নিজেদের বুদ্ধিগত দেউলিয়াপনায় তাল ঠুকে ঠুকে উচ্চৈঃস্বরে দম্ভপ্রকাশ, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য প্রগতিশীল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের নব নব ভঙ্গি ও ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অষ্টপ্রহর মিথ্যাভাষণ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে দক্ষিণপন্থী মহলের মস্তিষ্ক আজ সম্পূর্ণরূপে জুতাবিষ্ট। এটা হতেই হবে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, ভারতের বামপন্থী মহলের মনোজগতেও সবলতা, সজীবতা, গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তির অভাব দেখা যাচ্ছে। এখানেও দেখতে পাই চর্বিতচর্বণের মনোবৃত্তি, পুঁথিগত মুখস্থ বিদ্যার আড়ম্বর এবং দেশের ও বিদেশের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীন ও সৃষ্টিশীল চিন্তার একান্ত অভাব। এটা উদ্বেগের বিষয়। পঙ্গু মন নিয়ে সমাজে কোনরূপ বিপ্লব সাধিত করা সম্ভব নয়। পুরাতনকে ভাঙার কাজ ও নতুনকে গড়ার কাজে সাংস্কৃতিক ও মানবচারিত্রিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি।

নতুন চীনকে বোঝার ও বোঝানোর কাজে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী মহলের কোন স্বাধীন দান নেই। চীন সম্বন্ধে বিদেশ থেকে যে সকল লেখা পাওয়া গেছে তাকেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে ও সুসংবদ্ধ করে কোন লেখা বেরয়নি। চীন সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে তা পড়ে খুশি হতে পারা যায় না বা উৎসাহ জাগে না। প্রথমত বইগুলিতে থাকে অসংখ্য ছাপার ভুল। তারপর বইগুলি নিতান্তই পরিকল্পনাহীন ও প্রাথমিক পাঠের মত। উদ্ধৃতি যেখানে থাকে সেখানে পুস্তকের নাম ও পৃষ্ঠাপরিচয় থাকে না। কোন্ তথ্য কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, কোথায় পাওয়া যায়, এ বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না। আজকের দিনের ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে বইগুলির সম্পর্ক ক্ষীণ ও অস্পষ্ট এবং বইগুলিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ও বিশ্লেষণের একান্ত অভাব।

আলোচ্য পুস্তকগুলি সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর এই সকল মন্তব্য প্রযোজ্য।

ভারতের বামপন্থী সাহিত্য কি চিরদিন 'শিশুশিল্পের' পর্যায় থাকবে? তথাপি একথা বলা দরকার যে নতুন চীনের প্রাথমিক পরিচয় হিসেবে লোকশিক্ষার দিক থেকে সুপ্রকাশ রায়ের ও অশোক গুহের বইদুটি প্রশংসার যোগ্য। সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন চীনের প্রথম গৃহযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ গৃহযুদ্ধের সাফল্য পর্যন্ত চীনের মুক্তি-সংগ্রামের সরল ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বিবরণটি সুপাঠ্য ও মোটের উপর নির্ভুল হয়েছে। বলা যেতে পারে যে, এই প্রথম চীনের মুক্তি-সংগ্রাম সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ বাংলা ভাষায় পেলাম। অশোক বাবুর বইটির প্রধান লক্ষ্য চীন বিপ্লবকে ও নতুন চীনের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে সংক্ষেপে ও সরসভাবে ব্যাখ্যা করা। অশোক বাবুর ভাষা উপভোগ্য এবং তাঁর দরদ ও সত্যনিষ্ঠা প্রশংসনীয়। এমন সুন্দর বইটি কিন্তু অসংখ্য বানানভুলে ও ছাপার ভুলে অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। বামপন্থী হলে কি শুদ্ধ বানান লিখতে বা ছাপতে নেই।

'লাল চীন' বইটির লেখক বিশ্ব বিশ্বাস নতুন চীনের প্রতি সহানুভূতিশীল কিন্তু আলোচ্য বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার ও বিস্তারের অনুপাতে বইটির আয়তন ক্ষুদ্র। তাই প্রত্যেকটি বিষয়কেই ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে এবং কোন বিষয়েরই অন্তরে প্রবেশ করা হয়নি। বইটি চীনের ইতিহাস, ভূগোল, বিপ্লব ও নতুন চীনের কর্মসূচী সম্বন্ধে নানা বিষয়ে টুকিটাকি মন্তব্যের সমষ্টি। দাম বড় বেশি হয়েছে।

অনিমেষ রায়

Sin & Science: Dyson Carter—First Indian Edition: Current Books, Bombay: Price Rs. 2/8

শ্রীযুক্ত কার্টার কয়েকটি নিষিদ্ধ বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন: গণিকাবৃত্তি, ভ্রূণ হত্যা, রতিজ রোগ, মাতলামি, শৈশবের ব্যবহার-বিকৃতি, ইত্যাদি। পাপ বলতে, দুর্নীতি বলতে, আমরা সাধারণত এইগুলিকেই বুঝে থাকি। যুগ যুগ ধরে এইগুলিকে দূর করবার সমস্যাই সভ্যতার প্রাথমিক সমস্যা বলে স্বীকৃত এবং এগুলির প্রতি আমাদের বিদ্বেষ এত তীব্র যে এ নিয়ে আলোচনা করাটাই আমাদের ধারণায়, সুরুচির সঙ্গে খাপ খায় না। শ্রীযুক্ত কার্টার বলতে চান, যদি তাই হয়—

এইগুলিই যদি মানব-সভ্যতার পরাজয়ের মাপকাঠি হয়—তাহলে কোন্ সভ্যতা ভাল আর কোন্ সভ্যতা মন্দ তা বোঝবার একটা উপায় হবে, কোন্ সভ্যতার মধ্যে এগুলির জায়গা কতখানি বেশি আর কোন্ সভ্যতা থেকে এগুলিকে কতখানি দূর করা সম্ভব হয়েছে তাই বিচার করলে। পৃথিবী আজকের দিনে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে, একটি ভাগের নেতৃত্বে মার্কিন সভ্যতা আর একটি ভাগের নেতৃত্বে সোভিয়েট সভ্যতা। শ্রীযুক্ত কার্টারও মোটামুটি এই দুটি সভ্যতারই তুলনা করেছেন এবং তুলনার মাপকাঠি হিসেবে ধরেছেন পাপ বলতে আমরা চলতি কথায় যা বুঝি তাই: কোন সভ্যতায় পাপের বোঝা কতখানি। ফলে একদিক থেকে বলা যায় শ্রীযুক্ত কার্টারের এই গ্রন্থ মূলতই নীতি-বিজ্ঞানের গ্রন্থ। কিন্তু নীতি-বিজ্ঞান বলতে সাধারণত যে রকম আলোচনায় আমরা অভ্যস্ত, এ সে রকম আলোচনা মোটেই নয়। নীতি-বিজ্ঞানের আলোচনাটা সাধারণত হরেক রকম রঙচঙে যুক্তিতর্ক আর শব্দসম্ভার নিয়েই হয়; কিন্তু কার্টারের কাছে আলোচনার একমাত্র ভিত্তি হল বাস্তব ঘটনা (fact)। নিছক বাস্তব ঘটনার দিক থেকে দুটি সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা এবং এই facts-এরই ভিত্তিতে তিনি দেখিয়েছেন মার্কিনদের সভ্যতা যখন "পাপে"র ভারে প্রায় ভরাডুবি তখন সোভিয়েট সভ্যতা কিরকম "পাপে"র বোঝা পিছনে ফেলে বিজ্ঞানের পাল খাটিয়ে শান্তি, প্রগতি আর প্রাচুর্যের মহাসাগরে পাড়ি দিয়েছে!

অমূল্য গ্রন্থ এই "পাপ ও বিজ্ঞান"। সোভিয়েট-বিরোধী ভাড়াটে প্রচারকরা যে অন্ধকারের আবরণে সত্যকে আবৃত রাখতে চায় এই গ্রন্থ আলোর বর্শার মত সেই অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে মানুষকে দেখায় এগিয়ে চলবার পথ।

অনেক আগে বইটির মার্কিন সংস্করণ হাতে পেয়েছিলাম। তখনই "পরিচয়ে" দীর্ঘ সমালোচনা করেছিলাম। এতদিন পরে ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। একই পত্রিকায় একই গ্রন্থের সমালোচনা দুবার করে করা সম্ভব নয়; অথচ এই জাতীয় মূল্যবান গ্রন্থের কম-দামী ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে প্রকাশকরা পাঠক-সাধারণের কতখানি কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন সে কথা উল্লেখ না করাও সম্ভব নয়।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র

'বিদ্যাসাগর'-এর চিত্ররূপ

বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্পে আধুনাতন ঝোঁক হল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী-মালাকে চিত্রে রূপ দেওয়া। 'স্বামীজী', 'মাইকেল', 'যুগাবতার', 'বিদ্যাসাগর' আত্মপ্রকাশ করার পরও অন্যান্য জীবনীচিত্র প্রস্তুতির পথে অথবা উদ্যোগপথে রয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। বর্তমানে কলকাতার ও মফঃস্বলের প্রেক্ষাগৃহে সশ্রদ্ধ জনপ্রিয়তা বহন করে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত 'বিদ্যাসাগর' প্রদর্শিত হচ্ছে।

বর্তমান বাংলা গড়ে তুলতে উনবিংশ শতাব্দীর যে সমস্ত মনীষীর অবদান অমূল্য ঐতিহ্য হিসাবে পরিগণিত, তাঁদের মধ্যে বহুব্যাপ্ত কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্তব্যনিষ্ঠার দিক দিয়ে বিদ্যাসাগর ছিলেন অনন্য। এই মহৎ চরিত্রকে যথাযথ চিত্ররূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। চিত্র-পরিচালক দরদ দিয়ে এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পরিশ্রম করেছেন দেখে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে জন্ম নিয়ে সেই ব্যবস্থাকে আঘাত করে করেই গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও প্রভাবের উন্মেষ ও তার ক্রমবিকাশই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস। দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অগ্রগতির এই পথে যাঁরা দেশাত্মবোধের (সময় বিশেষে খানিকটা অযৌক্তিকভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেও) প্রেরণা অবিচল রেখে বিদেশী শাসকদের অনিচ্ছাকৃত সৃষ্ট সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সামন্তযুগীয় ভাবধারা ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁদের পুরোধা।

চিত্র-পরিচালক বিদ্যাসাগরের এই সংগ্রামের কতগুলি কাহিনী দর্শকদের সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন : যেমন কর্মজীবনের প্রারম্ভেই বিদ্যাশিক্ষণ, বিদ্যালয়ের ও শিক্ষকদের পুরাতনপন্থী রীতিনীতি, শৃঙ্খলাবোধের ও কর্তব্য-

বোধের অভাব প্রভৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে তাঁর শ্রদ্ধেয় ভূতপূর্ব শিক্ষকদেরও অসন্তুষ্ট করা ; বিধবাবিবাহের পক্ষে ও নানা প্রচলিত অযৌক্তিক লোকাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে পণ্ডিতপ্রবরগণ, পণ্ডিতপ্রবরগণের সমর্থক সামন্ত-চিন্তাধারার সমাজনেতা, এবং সামন্তপ্রভুর প্ররোচিত গুণ্ডাবাজি, কুৎসা রটনা কোন কিছুই গ্রাহ্য না করা ; দেশের শিক্ষার প্রসারের জন্য পুস্তকাদি রচনা থেকে শুরু করে গভর্নরের অসহযোগিতা সত্ত্বেও আপ্রাণ চেষ্টায় বেসরকারী শিক্ষার প্রথম ভিত্তিস্থাপন ; বিধবা-বিবাহ আইন পাশের জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ; সমাজে নারীর অপমানে বিচলিত হয়ে তাদের শিক্ষা, তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য আকুল প্রচেষ্টা ও গভীর অনুভূতির অভিব্যক্তি ইত্যাদি।

জাতিগঠনকারী ব্যক্তিবিশেষদের জীবনীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য হল এই যে, ঐ জীবনী-আলেখ্যই তৎকালীন ঐতিহাসিক অগ্রগতির দ্বন্দ্বমূলক ক্রমবিকাশের আলেখ্য। বিগত কালের কোন ঐতিহাসিক চরিত্রের চিত্ররূপ দিতে গিয়ে তাই সেই সময়ের জাতীয়জীবনের পটভূমিকা যদি সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের সবলতা-দুর্বলতার দিক থেকে ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে ফুটে না ওঠে তবে মূলত সেই জীবনীর তাৎপর্য ও সমাজের উপর তার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের কারণ উপলব্ধি করা যায় না এবং ফলে সেই জীবনী-চিত্রণ ফাঁকা বা abstract আদর্শবাদের চিত্রণ হয়ে দাঁড়ায়, তার কার্যকারিতা অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যায়। 'বিদ্যাসাগর'-এর চিত্ররূপের বেলায়ও এ অভিযোগ অনেকাংশে প্রযোজ্য।

এদেশে ঔপনিবেশিক দাসত্বের ফলে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের এই সংগ্রাম কখনই তার স্বাভাবিক পরিণতি পেতে পারেনি। বিদ্যাসাগর চরিত্রের অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে এই মূল সত্যটিকে মনে রাখা দরকার। বিদ্যাসাগর ছিলেন অনলস সমাজ-সংস্কারক, অনুভূতিপ্রবণ মানব-দরদী ; কিন্তু তাই বলে তিনি যে এই তৎকালীন ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনেরও পক্ষপাতী ছিলেন, তা নয়। জাতির, সমাজের দৈন্য, অভাব, কুসংস্কার তিনি দেখেছেন, তার কুফলে বিচলিত হয়েছেন, আন্তরিক আবেগ নিয়ে সংস্কারের পথে এগিয়েছেন, হয়ত কোন একক ঘটনা বা কর্মের সামগ্রিকভাবে সুরাহা করেছেন ; কিন্তু জাতির বা সমাজের অগ্রগতির পথে প্রকৃত কোন্ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাধা

রয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ শক্তির বৈপ্লবিক সম্ভাবনা রয়েছে তার কোনও সুস্পষ্ট ধারণা বিদ্যাসাগরের ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে একথাও স্মরণীয় যে, তাঁর কর্মজীবনের প্রধান প্রচেষ্টা নারীজাতির উন্নতিসাধন ও বিধবা-বিবাহ প্রচলন আজও সফল হয়নি, দেশের শিক্ষার হার আজও নগণ্য। বিদেশী শাসকদের মধ্যে কারো কারো ব্যক্তিগত অল্পস্বল্প সদিচ্ছার তিনি দিয়েছিলেন যান্ত্রাধিক মূল্য, তেমনি কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর ছিল শুধুই ক্ষোভ। পুরাতন শাস্ত্রীয় নীতিই ঠিক, তা কলুষিত হয়েছে দেশাচারে—এই চিন্তাধারা ছিল তাঁর অধিকাংশ সমাজ-সংস্কারের তত্ত্বগত ভিত্তি, কিন্তু ধারাবাহিক বাস্তব সমাজ-চেতনা, তৎকালীন সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তাৎপর্য, ভবিষ্যতের বাস্তব ইঙ্গিত তাঁর সংগ্রামের পাথেয় ছিল না। সুতরাং তাঁর সংগ্রামের বাহ্যরূপ ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আবেগবহুল; তবু তিনি, কিছুটা অচেতনভাবে হলেও, মূলত ছিলেন তৎকালীন প্রগতিশীল সমাজচেতনার প্রতিভূ। চিত্র-পরিচালক প্রধানত বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এই ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে প্রাধান্য না দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী-মালাকেই প্রধান উপজীব্য করে বিদ্যাসাগরের চিত্ররূপ অতিমানবতা, বীরপূজার মনোভাব ও শূন্যগর্ভ আদর্শবাদের দোষে দুষ্ট করেছেন।

'বিদ্যাসাগর'-এর চিত্ররূপকে এই মৌলিক সামাজিক দিকের অনুপস্থিতি অথচ পরিচালকের আন্তরিক প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। স্মৃতিবার্ষিকীর দৃশ্যের অবতারণা করে ছবির আরম্ভের ও সমাপ্তির যে আঙ্গিকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে বিষয়বস্তুর দিক থেকে তা নতুনত্বের দাবি করলেও, মামুলি, বাজার-চলতি এবং উদ্যোগী ও কর্মকর্তাদের আত্মপ্রচারমূলক মেঠো ধরনের স্মৃতি-উৎসবের দৃশ্য চিত্ররূপকে মোটেই সমৃদ্ধ করেনি। সামঞ্জস্যের অভাব সত্ত্বেও পোশাক-পরিচ্ছদ, কোন কোন দৃশ্য-সজ্জা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে জীবনী-কালের বাংলার রূপ ফোটাবার ক্ষীণ প্রয়াস আছে, কিন্তু মূলত এই প্রচেষ্টাও সফল হয়েছে বলে বলা চলে না, অথচ এর কত সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তাই না ছিল। ছবির প্রথম দিকে যদি প্রধানত বহির্দৃশ্য ও গ্রামবাসীদের বসবাসের দৃশ্য মারফত ঊনবিংশতির গ্রাম্যবাংলা ফুটিয়ে তোলা হত, তবে দর্শকসমাজ নিজেদের অজ্ঞাতসারেই চলে যেতেন সেই যুগে। বিদ্যাসাগরের পিতামাতার কথাবার্তা,

বিদ্যাসাগরে দীর্ঘ বক্তৃতারাশি, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কৃত্রিমতা বোঝায় এমন স্টুডিও-নির্মিত গৃহদ্বার প্রভৃতির দ্বারা এই চেষ্টা সাধারণভাবে হয়েছে। বিদ্যাসাগরের কর্মস্থান ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার পরিবেশ সৃষ্টিতেও এ দুর্বলতা মূলত রয়েছে ; তবু বিধবা-বিবাহের প্রচেষ্টামূলক দৃশ্যগুলি, সামন্তকর্তার আসরে শাস্ত্রযুদ্ধ এবং অন্যান্য কয়েকটি অন্তর্দৃশ্য বেশ ভালই চিত্রিত হয়েছে। বালক ঈশ্বরচন্দ্র পায়ে হেঁটে পিতার সঙ্গে কলকাতা এলেন—এর মধ্যে ইংরেজি অঙ্ক শেখার প্রচলিত কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নেই। অথচ ঐতিহাসিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিলে এই যাত্রাপথে ফুটিয়ে তোলা যেত তৎকালীন বাংলাদেশের এক প্রধান সড়কের পার্শ্বস্থ বাংলার রূপ, ঐ সড়কবাহী যাত্রীদের, তৎকালীন যানবাহন ও বৈজ্ঞানিক অনগ্রসরতার চেহারা—অথচ এর জন্য ছবির দৈর্ঘ তেমন কিছুই বাড়ত না। এমনিভাবে প্রত্যেকটি প্রচলিত কাহিনীর সামাজিক পটভূমিকা ফুটিয়ে তোলা যেত সমগ্র চিত্র জুড়ে। তাতে অভিনয়াংশে সংলাপের মাত্রাতিরিক্ততা কম হত। এ বিষয়ে বিধবা-বিবাহের কাহিনী ফোটাবার প্রচেষ্টাই আংশিক সাফল্যমণ্ডিত। ক্ষুব্ধ দামোদরের সঙ্গে সংগ্রামের চিত্রগ্রহণ হয়েছে অসম্ভব খেলো রকমের। অভিনেতা বিদ্যাসাগরের স্টুডিও-সৃষ্ট নদীতে সাঁতার প্রভৃতি চিত্রগুলি কোন রেখাপাতই করতে পারে না যুবক বিদ্যাসাগরের পৌরুষ সম্বন্ধে। পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে অধ্যয়ন-তপস্যার পরিশ্রম দেখাবার প্রয়াস খুবই ভাল ; কিন্তু অনেক ছোটখাট ত্রুটি এ বিষয়ে অনেক ক্ষতি করেছে ; পুস্তকাদির আধুনিক বাঁধাই, আধুনিক কাগজের উপর অধুনাতন হরফের চকচকে লেখা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না।

ঐতিহাসিক জীবনীকে রূপ দিতে গিয়ে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রামাণিক জিনিসপত্র সংগ্রহ করার একটা প্রচেষ্টা থাকা উচিত ; বীরসিংহ গ্রাম, মেদিনীপুর এবং বিদ্যাসাগরের সহিত জড়িত কলকাতার বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবার ও প্রতিষ্ঠান বিদ্যাসাগরের পরবর্তী বংশধরগণ ইত্যাদির সাহায্য নিলে কিছু না কিছু জিনিস উদ্ধার করা যেত, যার ফলে চিত্রের গৌরব অনেক বৃদ্ধি পেত। চিত্রে পরিচালনার ব্যাপারে সু-সমালোচিত ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাব ও অংশত সুষ্ঠু সম্পাদনা না হবার জন্য ছবির গতিতে শ্লথ-দ্রুতভাব ও অস্পষ্টতা-দোষ রয়েছে এবং সমাপ্তি ঘটেছে যেন হঠাৎ। মনে হয় ছবির দৈর্ঘ বারো হাজার ফিট হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে যেন শেষ করতে হয়েছে। যে-সব জিনিস

সুষ্ঠুভাবে অন্ত উপায়ে পরিবেশন করা যেত সেই সব দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে সংলাপ মারফত। এর ফলে সংলাপের দৈর্ঘ অনেক চরিত্রকে বুঝতে সাহায্য করেনি, বরং চরিত্রের তাৎপর্যের হানি করেছে। বিশেষ করে বিদ্যাসাগর-চরিত্র সম্বন্ধে এই অভিযোগ করা চলে। সংলাপ-বক্তৃতার মধ্যে শান্ত-সমাহিত-গম্ভীর বিদ্যাসাগর যেন হারিয়ে গেছেন। ছবিতে আর একটা ঝোঁক দেখা গেছে যে, তৎকালীন বাঙালী সমাজের নাম করা লোকদের কোন না কোন প্রকারে একবার চিত্রে আনতেই হবে। তাছাড়া ১৮৫৭ সালের এ-পাশের ও-পাশের ইতিহাস সম্বন্ধে এতটুকু আঁচ না থাকায় তৎকালীন বিদ্যাসাগরের মানসিক দ্বন্দ্ব এতটুকুও ফোটেনি—যার ফলে এ দেশে বৃটিশ শাসনের সবচেয়ে জবরদস্ত রূপটির পরিচয় চিত্রে কোথাও নেই।

নাম-ভূমিকায় শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যাল ভাল অভিনয় করেছেন; কিন্তু শারীরিক গঠন প্রভৃতির দিক দিয়ে ও তাঁর রূপসজ্জা মোটেই মানায় নি। ভগবতী দেবীর ভূমিকায় মলিনা দেবীর অভিনয় খুবই ভাল হয়েছে, কিন্তু রূপসজ্জায় মানায়নি। বিশেষ করে বালক-বিদ্যাসাগরের পিতামাতা আর পিতা-বিদ্যাগরের পিতামাতার রূপসজ্জায় একই চেহারা ও বয়সের ছাপ বিশেষ দৃষ্টিকটু। অন্যান্য পার্শ্ব-চরিত্রের অভিনয় মোটামুটি ভাল। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য শ্রীশ বিদ্যারত্নের ভূমিকায় গুভেন মুখার্জির অভিনয়।

বর্তমান বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের দৈন্যের বিবেচনায় এই জাতীয় চিত্রের সমাদর একান্তই কাম্য। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবন্ধে আলোচিত এই জাতীয় ছবির মূলগত ত্রুটিও যে কম মারাত্মক ও বিভ্রান্তিকর নয়—সে-বিষয়ে চিত্র-পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মনোরঞ্জন বড়াল

সংস্কৃতি সংবাদ

কলকাতা তরুণ লেখক সম্মেলন

সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় নয়, কলকাতা থেকে কয়েক মাইল দূরে শহরতলী বরাহনগরে গত ১৩ই অক্টোবর শতাধিক প্রতিনিধিসহ কলকাতার প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। যুব সংস্কৃতি-বিদদের এই সম্মেলনে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে আজকের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করতে হলে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, হঠাৎ যুব সংস্কৃতি-বিদদের এই সম্মেলন কেন? এর উত্তর প্রতিনিধি সম্মেলনে উত্থাপিত ঘোষণাপত্র ও নরহরি কবিরাজের দীর্ঘ আলোচনা থেকে শুরু করে সম্মেলনে উপস্থিত তরুণ সাহিত্যিকদের এবং প্রতিনিধি সম্মেলনের সভাপতি কবি রাম বসুর অভিভাষণে ব্যক্ত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে।

বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি আজ এক গুরুতর সংকটের সম্মুখীন। এক দিকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চিরসাথী দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি এ দেশের জাতীয় জীবনকে কণ্টকিত করে তুলেছে, অন্য দিকে বাঁচার দাবি আজ বেয়নেটের ডগায় ছিন্নভিন্ন, বুটের তলায় নিষ্পেষিত আজ ভুখা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা। মজুর-কৃষক-মধ্যবিত্তের স্বপ্ন-সাধ আজ রক্ত-নিমজ্জিত, লাঞ্ছিত। বিশেষ করে তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সংবেদনশীল মনে জনতার এই ব্যথা, মনুষ্যত্বের এই অবমাননা বিক্ষোভের ঝড় তুলছে প্রতিনিয়ত। বাংলার তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের শতকরা নব্বই ভাগ ইতিহাসের এই গতিকে নীরব দর্শক হিসেবে গ্রহণ করছেন না, তাঁদের লেখনীর মুখে, তুলির টানে, সভা-সমিতির-অনুষ্ঠানে তাঁরা নির্যাতিত মানুষের পক্ষে আজ ঘোষণা করছেন তাঁদের সমর্থন—সে সমর্থন কোথাও স্পষ্ট, কোথাও

অস্পষ্ট, সংশয়াচ্ছন্ন। সাহিত্যক্ষেত্রে এই সব সামাজিক সমস্যার সার্থক রূপায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে এই তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে অনেকেরই স্পষ্ট কোন ধারণা না থাকায়, এই সব সামাজিক সমস্যার সঠিক মর্মকথা উপলব্ধির জন্যেই কোন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা না থাকায় সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আজ অনেকেই বিভ্রান্ত। এই সম্মেলন সেই বিভ্রান্তি দূর করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

সম্মেলনের সূচনায় খসড়া ঘোষণাপত্রে স্পষ্টই ব্যক্ত হল—(১) আমরা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি যে, লেখক অথবা শিল্পী স্বয়ম্ভূ বা নিরালম্ব নন। সমস্ত যুগ-জীবন, সমাজপ্রগতির রূপ তাঁদের সৃষ্টিকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে—তার উপর সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' বলে একদল সাহিত্যিক যে যন্ত্রণাজনক যৌন-আবিল আর নৈরাশ্যপূর্ণ গল্পোপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি প্রচার করেন, তাঁদের সেই 'স্বাধীনতা'য় আমরা বিশ্বাস করি না। শিল্পীর দায়িত্ব আছে সমাজের কাছে—সমাজের নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষের কাছে। কেননা তাঁর সৃষ্টি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক পটভূমি আর তৎকালীন সমাজ-জীবনের ছাপই বহন করে না, অপরপক্ষে সমাজগতির ধারাকে পরিবর্তিত করবারও একটা বিরাট কর্তব্য রয়েছে তার। এ যুগের কোন সৎ আর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্যিক তাঁর এই মহৎ দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না; (২) আমাদের বর্তমান জীবন ঠিক আগের মতই সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণে জর্জরিত, অনশন-অনাহার আমাদের নিত্যসঙ্গী, বেকারী আর ছাঁটাইয়ের বিভীষিকা জীবনের সব কিছু আশা-আনন্দকে গ্রাস করছে আজ। তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের সবল কণ্ঠ তুলবেন; (৩) আমরা নিজেদের শান্তিকামী বলে ঘোষণা করতে চাই। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নিজেদের স্বার্থে ধর্মের উস্কানি দিয়ে যে দাঙ্গা বাঁধায়, সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী বাঁচবার শেষ আশায় যে আণবিক যুদ্ধের হুঙ্কার ছাড়ে আমরা তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব। আমরা সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মারণাস্ত্র আণবিক বোমাকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবার বিরুদ্ধে দৃঢ়মত ঘোষণা করছি; (৪) সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার কূপমণ্ডুকতা আজ আমাদের মানস-বিকাশকে রুদ্ধ করে রেখেছে, পুরনো দিনের ধর্মোন্মাদনা, বংশ-কৌলিন্যের মর্যাদা, প্রভুবাদ, নারীর দাসত্ব, মনুষ্যত্বের অস্বীকৃতি এখনও আমাদের জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছে। তরুণ লেখকদের প্রাণবন্ত প্রচেষ্টা

সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবে—এ আশাও আমরা দৃঢ়ভাবে করি ; (৫) আজকে কয়িষ্ণু বুর্জোয়া-সাহিত্যের প্রতিক্রিয়াশীল ধারা (যেমন, মতবাদের ক্ষেত্রে গান্ধীবাদী ভাবধারা ও 'বিশুদ্ধ শিল্পের' রণধ্বনি প্রভৃতি এবং শিল্প-আঙ্গিকের ক্ষেত্রে আঙ্গিককে প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি) বাংলা সাহিত্যের গতিপথকে কলুষিত করছে, সাংস্কৃতিক জীবনকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে। তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকেরা এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন ; (৬) সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় আপসকামী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতায় হিন্দু-মুসলিম মিলিত সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বাংলা আজ দ্বিধা-বিভক্ত। শাসকচক্র আজ উভয় বাংলায় বাংলা ভাষাকে বিকৃত করে, একটি ভাষাকে অন্য একটি ভাষাভাষী অধিবাসীদের উপর চাপিয়ে দিয়ে এ দেশের সৃষ্টিশীল শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির পথ রুদ্ধ করে দিতে চাইছে। তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক উভয় বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্য চান, তাঁরা কায়েমী স্বার্থের এই ঘৃণ্য চক্রান্তকে ব্যর্থ করে বাংলার বুকে গড়ে তুলতে চান নতুন ঐক্যবদ্ধ গণ-সংস্কৃতি ; (৭) নাট্যকলাকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা করি। সাধারণ মানুষের কাছে আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্মকে পৌঁছে দেবার জন্যে বিভিন্ন প্রগতিশীল নাট্য-সংঘের সঙ্গে অবশ্যই সহযোগিতা করব। মাইকেল-দীনবন্ধুর ঐতিহ্য বহনকারী আমরা—এ দায়িত্ব পালন করে আমাদের নাট্য-আন্দোলনকে আরও বলিষ্ঠ করে গড়ে তুলব ; (৮) এ দেশের সমৃদ্ধ লোক-সংস্কৃতিকে আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে অনুধাবন করে এবং এই উদ্দেশ্যে নির্যাতিত মানুষের আত্মীয়তা অর্জন করে যে ধারা এ দেশের নির্যাতিত চাষী-মজুর-মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষার গানে মুখর, তার ভিতর আমরা নতুন প্রাণরস সঞ্চার করে তাকে আরও সমৃদ্ধিশালী লোক-সংস্কৃতিতে পরিণত করব ; (৯) আমরা সাহিত্যকে শুধু স্লোগানের পর্যায়ে নামিয়ে দিতে চাই না। আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর অঙ্গাঙ্গী উৎকর্ষতাকে আমরা উন্নততর করে আমাদের সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্যকে সার্থকতর করতে চাই। সহজ-সরল-উদ্দীপনাশীল কলা-কৌশলের প্রয়োগ-নিপুণতাকে আমরা গ্রহণ করব, আঙ্গিক-সর্বস্বতা বা বস্তুনিষ্ঠার নামে শুধুমাত্র স্লোগান-আমদানীকারক সাহিত্যকে আমরা নিকৃষ্ট বলে চিহ্নিত করব ; আমরা জানি আবহাওয়া আজ আমাদের অনুকূলে। আমরা এই অনুকূল আবহাওয়াকে গ্রহণ করব—সমস্ত প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী আমরা একটি মিলিত ফ্রন্টে সামিল হব। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

ঘোষণাপত্রের উপর আলোচনা করতে উঠে নরহরি কবিরাজ বললেন : সাহিত্যে আজ সংকট দেখা দিয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যিকরাও স্বীকার করছেন যে, সাহিত্যে সংকট আজ সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁরা এর সমাধানের কোন পথ না বাতলে বলছেন যে 'এই সংকটই সত্য'। এই সাহিত্যিকরা শ্রেণী-সংগ্রামকে অস্বীকার করে অহিংস, আপসপন্থী সরকারের প্রচারক সাহিত্য-প্রয়াসকে আজকের সাহিত্য বলে চালাতে চাইছেন। আর একদল সাহিত্যিক প্রচার করছেন পলায়নী-মনোবৃত্তির। এঁরাই 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যের উদ্গাতা। অবশ্য শেষোক্ত ধরনের সাহিত্যিকদের মধ্যে কিছু বিভ্রান্ত সৎ সাহিত্যিকও আছেন। আমাদের কাজ হবে এই সব বিভ্রান্ত সাহিত্যিককে সত্য পথে নিয়ে এসে তাঁদের রচনাকে জনগণমুখী করে তোলা।

এরপর নরহরিবাবু গত এক বছরে প্রগতিশীল সাহিত্য-বিচারের নামে যে অনাচার চলেছে তার সমালোচনা করে বলেন : কিছুদিন পূর্বে প্রচার চলেছিল যে, আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্য বিশেষ কিছু নেই। সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ঘৃণাভাবাপন্ন হয়েও অনেক সৎ সাহিত্যিক তখন স্লোগানসর্বস্ব যান্ত্রিক সাহিত্য-সৃষ্টিকে প্রত্যাখ্যান করে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ আমাদের নতুন ভাবে সব কিছু আবার বিচার করতে হবে। সৎ লেখকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে বাংলার সজীব ও সুন্দর সংস্কৃতিকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলবার দায়িত্ব আমাদের। নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতের শহরে-গ্রামে মজুর-কৃষক-মধ্যবিত্তের যে নতুন গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়েছে আমাদের নতুন বিষয়বস্তু হবে সেই ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারায় উদ্ভূত ভাব ও কল্পনার স্পষ্ট প্রকাশ। শুধু বিষয়বস্তুর দিকে নজর দিলেই চলবে না, আমাদের আঙ্গিকগত কলা-কৌশলকেও আয়ত্ত করতে হবে।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ ঐতিহ্য-বিচার প্রসঙ্গে বলেন : মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে যেমন আমরা পাই সমাজের প্রতিফলন, তেমনি তাঁদের সাহিত্যেই আবার মিশে আছে হতাশাবাদ। তাই ঐতিহ্য-বিচারে পুরনো দিনের সব কিছু নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে থেকে সত্য, সুন্দর, প্রাণবন্ত উপাদান সংগ্রহই হচ্ছে আজ প্রগতি সাহিত্যিকের কাজ। আগামী দিনের সাহিত্যে শ্রমিক শ্রেণীই হবে সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতীক।

রাজনীতি ও সাহিত্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে নরহরিবাবু স্পষ্ট ভাষায় বলেন :

রাজনীতি ও সাহিত্যের মধ্যে কোন চীনের প্রাচীর নেই। কিন্তু তাই বলে রাজনীতি ও সাহিত্য এক জিনিস নয়। রাজনৈতিক স্লোগানই সাহিত্য নয়, কিন্তু রাজনীতিকে বাদ দিয়েও কোন সাহিত্য নেই। সমাজ বিবর্তনের আইনই মহৎ সাহিত্যে রসাভাসে স্পষ্ট। আমাদের কাজ হবে রাজনীতি ও সাহিত্যের সমন্বয়-সাধন।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণাপত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন যে, সাহিত্যে স্লোগান-সর্বস্বতা পরিত্যাগ করে শিল্পবস্তু ও আঙ্গিকের সমীকরণ করা একান্ত প্রয়োজন। এবং এজন্তে প্রথমেই প্রয়োজন শুধুমাত্র পুঁথিগত রাজনীতি ও শিল্পনীতি আয়ত্ত করা নয়, বহুবিস্তৃত জীবনধারার সঙ্গে সাহিত্যিকের জীবনও যোগ করা। আমাদের প্রগতি সাহিত্যিকদের পক্ষে এইটি একটি প্রাথমিক সমস্যা এবং এইটিই মূল সমস্যা। সভাপতি রাম বসু তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিককে জীবনধর্মী হতে আহ্বান জানান। আত্মকেন্দ্রিকতা পরিত্যাগ করে জনজীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে একাত্মতার কথা ঘোষণা করেন তিনি। চিত্ত পাল, সুশীল গুপ্ত, সত্যব্রত ঘোষ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিনিধিও আলোচনায় যোগদান করেন।

প্রকাশ্য সম্মেলনেও এই একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল সভাপতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। সম্মেলনের উদ্বোধন করতে উঠে 'দি নেশন'-এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত মোহিত মৈত্র আহ্বান জানালেন তরুণদের বিপ্লবে সামিল হতে, নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে, ব্যাপক ও বলিষ্ঠ গণ-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ জোরের সঙ্গেই বললেন: আমরা যদি এগিয়ে যেতে চাই নতুন পথে তবে সাহিত্যিকের ধর্ম আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে। সাহিত্যের নামে ভেজাল আর চলবে না। জীবনের গান গাইতে হলে জীবনের শরিক হতে হবে সর্বপ্রথম।

তরুণ সাহিত্যিকের এই সম্মেলন নানা দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ। যে সংকট থেকে উদ্ধারের আশায় শুধু তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকই নন বহু প্রবীণ সংস্কৃতি-বিদ্‌ও আজ চিন্তাকুল, বরাহনগরে এই তরুণ সাহিত্যিক সম্মেলনে সেই সংকটের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি নিয়েই যে আলোচনা হয়েছে শুধু তাই নয়, সংকটের মূল উৎসমুখ সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে এবং তার সমাধানের পথ সম্পর্কেও চিন্তা-বিনিময়ের এই প্রথম সূত্রপাত হল। আমাদের এই ঔপনিবেশিক,

আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সাহিত্যের যে মূল দুর্বলতা—জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের ক্ষীণ যোগাযোগের দিক—সাম্রাজ্যবাদী, সামন্ততন্ত্রী ও ক্ষয়িষ্ণু পুরনো গণতান্ত্রিক ভাবধারার যুগপৎ আক্রমণে সাহিত্যের সেই দুর্বলতাই আজ এক দুস্তর সংকটের কারণে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশের প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা, বিশেষ করে তরুণ লেখকেরা, যাঁরা আমাদের দেশের সাহিত্যের সংকটের এই উৎসমুখ সম্পর্কে একমত, নীতিগতভাবে সাহিত্যের বিকাশের জন্যে তাকে জনজীবনমুখী হতে হবে বলে যাঁরা মনে করেন, এই সম্মেলনে তাঁরা অন্তত এই এক বিষয়ে সকলেই একমত হন যে, এই সংকট সমাধান করতে হলে আমাদের সকলকে শারীরিকভাবেই শ্রমজীবী জনগণের "জীবনে জীবন যোগ" করতে হবে ; জনসাধারণের সঙ্গে থেকে তাঁদের জীবনের শরিক হয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে হবে, তবেই সাহিত্যিকের পক্ষে জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব, তাঁদের আত্মীয় হওয়া সম্ভব।

আশা করা যায়, সম্মেলনের আলোচনায় এই ফলাফল অতঃপর আমাদের তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার বিষয় হবে।

ধনঞ্জয় দাশ

বিয়োগপঞ্জী

জর্জ বার্নার্ড শ'

দেখা গেল জর্জ বার্নার্ড শ'ও অমর নন, এমন কি মাথুসেলার মত আয়ুও তিনি আয়ত্ত করতে পারলেন না। মাত্র ৯৪ বৎসর বয়সে মারা গেলেন সে লোক, যে লোকের মতে ৯৪ বৎসর তো মানুষের প্রথম যৌবন—শ তিনেক বৎসর যখন তার পরমায়ু। কিন্তু মানুষের ইতিহাসটা এখনও সেই শ্রেণীর যুগে উত্তীর্ণ হয়নি। এই প্রাক্-শ্রেণীর যুগে তাই বার্নার্ড শ'কে বিদায় নিতে হয়েছে অকালে—একশ বৎসরও তাঁর পূর্ণ হয়নি।

এই 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের' শখানেক বৎসরে বার্নার্ড শ' 'ঐতিহাসিক যুগের' দিকে কতটা অগ্রসর হতে পেরেছিলেন, আর অগ্রসর করে দিয়ে গিয়েছেন মানুষ নামক প্রাণ-শক্তির (লাইফ ফোর্সের) এই বাহকটিকে ?—এই মাপকাঠিতেই জর্জ বার্নার্ড শ'র বিচার। আর এ মাপকাঠি ছাড়া অন্য মাপকাঠিতে তাঁর নিজেরও বিশেষ আস্থা ছিল না।

শ' নাট্যকার ছিলেন ; সাহিত্যিকদের ভাষায় তাই তিনি ছিলেন শিল্পী। কিন্তু নাটক জিনিসটার তাঁর মতে আর কোন উদ্দেশ্য নেই—তার উদ্দেশ্য হল (ইব্‌সেনের নাটকের মত) মানুষের সামনে সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে ধরে তাকে বিচলিত করা। অবশ্য এই বিচলিত করাটুকুই যথেষ্ট, চালিত করার দায়িত্ব তার নেই। কারণ, এক দিকে শ' ভাবতেন প্রাণশক্তি অপরাজেয়, অঘটন-ঘটন পটিয়সী ; আপনার নিয়মে সে আপনি চলে আর এত অঘটন সে ঘটায় যে, তাকে চালনা করাটাই অসম্ভব। কিন্তু মানুষ হৃদয়াবেগ নামক দুশ্চিকিৎস্য একটা রোগে ভুগছে ; তাই প্রাণশক্তির এই মানব-ক্ষেত্রটা বারে বারে কেঁচে যায়। অন্য দিকে শ' মনে করতেন, এই হৃদয়-রোগের ওষুধ হল বুদ্ধির ব্রেন্ টনিক্—আর কিছু নয় ; হাত-পা চালনার প্রয়োজন নেই, কর্ম নামক ব্যস্ততা নিরর্থক। একটা বিশুদ্ধ ব্রেন্ টনিকে মানুষের মাথা সাফ হলেই স্নায়ু-বিকার উপশমিত হবে। হৃদয়ের গোলযোগ বাধাতে পারবে না ; সুস্থ দেহ তখন স্বস্থ হবে। আর তাহলে প্রাণশক্তি আপনার নিয়মেই অগ্রসর হবে, গোপনে-গোপনে আপনার জয় সুস্থির করে নেবে ;—সমাজ-সংস্কারের আবেষ্টনীকে ধীরে ধীরে ভেঙেচুরে, খোল-নলচে বদলে বদলে এনে দেবে ইউটোপিয়া—শ তিনেক বছর বসে বসে মানুষ তখন চিদানন্দে থাকবে বিভোর। অর্থাৎ, 'ফ্যাবিয়ান্' কৌশলটা হল এই—ধীরে ধীরে অথচ চাতুর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করলেই প্রগতির জয় হবে অলক্ষিতে অথচ অনিবার্যভাবে।

কৌশলটার নাম যাই হোক, এ নীতিটা সনাতন। কিন্তু কালটা সনাতন নয়। তাই ১৯১৭ সালে অকস্মাৎ এমনি নভেম্বর দিনে আরম্ভ হল ইতিহাসের উপদ্রব। তার পর চলছে সেই নতুন অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের মত সর্ব-সমন্বয়-বাদী মানুষও বুঝলেন ইতিহাস আকস্মিকের মালা-গাঁথা, তার গতিটা চলে ঝাঁপতালের তালে। নিচের তলার মানুষ যখন উপরের তলায় উঠে আসে তখন সে উঠে আসে সিঁড়ি ভেঙে, কিন্তু সিঁড়ি ভাঙে সে টপ্‌কে টপ্‌কে —চুপেচাপে আর অলক্ষিতে নয়। অতি গুরুপাক এই সত্যটা—কাউট্‌স্কির

মত মানুষেরাও তার বাস্তব রূপ দেখে পিছিয়ে গিয়েছিলেন; শ'র মত বুদ্ধিজীবীরা নিচের তলার মানুষের প্রতি আস্থাই প্রায় রাখতেন না তখনো—তাঁরা আস্থা রাখতেন বুদ্ধিবাদী সিজারে। এই কর্মকাণ্ডে মূঢ়তারই আর একটি দিক তাঁদের পক্ষে দেখবার কথা। হয়ত তিনিও বার্টাণ্ড রাসেলের মত তা দেখতেন। কিন্তু ইতিহাস ইতিমধ্যে শ'-এর সঙ্গে আরও বিদ্রূপ করতে শুরু করল, ফ্যাবিয়ান কৌশল জয়ী হল ইংলণ্ডে, 'ক্রমবর্দ্ধমানতার অনিবার্যতায়' বেয়ারহার্ডির পার্টি ম্যাকডোনাল্ড্-বেভিন্-এ্যাটলির পার্টিতে ক্রমপরিণতি লাভ করেছে; শ'-এর ফ্যাবিয়ান সোশ্যালিজম্ রূপায়িত হয়েছে 'হিতকারী রাষ্ট্রে'। এদিকে ইতিহাসে শ'-পন্থী ডিক্টেটরও জন্মাল—তার নাম মুসোলিনী। সে ফাঁপা বেলুন আবার ফটাস করে ফেটেও গেল। ভাগ্যক্রমে ইতিহাসের এই সব বিদ্রূপ বুঝবার মত রসবোধ ছিল বার্নার্ড শ'র—আর ইতিহাসের এ তথ্যটা বুঝবার মত জ্ঞানবুদ্ধি ছিল ফ্যাবিয়ান্ নীতির অন্য ব্যাখ্যাত্রী বিয়েট্রিস ওয়েব ও তাঁর সহধর্মী সিড্নি ওয়েবের। ফলে, যে বার্নার্ড শ' ১৯১৭ পর্যন্ত বড জোর বুদ্ধিজীবীদের খুঁচিয়ে হাসিয়ে জাগিয়ে তুলছিলেন, ১৯১৭-এর পরে তিনি লেনিনবাদ-স্টালিনবাদকে বরবাদ করবার জন্য আর আগ্রহ বোধ করলেন না। মৃত্যুকালেও তার গৃহে ছিল স্টালিনের ছবি।

সমাজতন্ত্র যখন বাস্তবে গড়ে উঠল তখন তাকে অস্বীকার করবার মত দুর্বুদ্ধি পেয়ে বসল না শ'কে—যখন তার প্রাক্ ১৯১৭-এর সামাজিক সমস্যা প্রায় 'জলো' হয়ে গিয়েছে আর ফ্যাবিয়ান্ কৌশল হয়ে গিয়েছে ম্যাক্ডো-নাল্ডিজম্। তাহলে শ'র নাটকের মূল্য আজ কি? বিষয়-মাহাত্ম্যে আজ তার মূল্য সামান্য, চরিত্র-চিত্রণে বা নাটকীয় বিন্যাসেও তার কৃতিত্ব বেশি নেই। কিন্তু অসাসান্য তা শ'র বাচনভঙ্গিতে, কথার তুবড়িতে, তর্ক-বিতর্কের ফুলঝুরিতে, আপাত-বিরোধী বচনের (প্যারাডক্সের) পটকায়। আর উল্লেখযোগ্য তাঁর 'কুইপ্স্' বা ঘটনার ছুঁচোবাজি ও বিদ্রূপ ইয়ার্কির এ্যাসিড বাল্ব। হয়ত এসব গুণই ছিল ভোল্তেয়ারের—যিনি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বিদূষক। বার্নার্ড শ' অবশ্য নাট্যকলার বলে সে আসন সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ, তাঁর ফ্যাবিয়ান্ সংস্কার-বুদ্ধিই তাঁর নাট্যকলাকে ও বাস্তব-চেতনাকে বারে বারে পঙ্গু করেছে; শুধু বাচনভঙ্গিতে আর বিদ্রূপে সে ক্ষতি পূরণ হয় না। তাই শেষ পর্যন্ত শ'র সম্বন্ধে এই সত্যই মানতে হয়—

A good playwright was lost to Shavianism. কারণ, "a goo man was fallen among the Fabians." একে অকাল মৃত্যু না বলে উপায় কি ?

গোপাল হালদার

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলা দেশ নিঃসন্দেহেই একজন মহৎ শিল্পীকে হারাল। তাঁর আবির্ভাবের দিনে বাংলা সাহিত্যে তখনও নবসৃষ্টির জোয়ার চলেছে; শরৎচন্দ্র তখন রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী রসতত্ত্বের সবল বিরোধিতায় লিখে চলেছেন সমস্যামূলক উপন্যাসের পর উপন্যাস; 'বিচিত্রা'য় আসছে চমকের পর চমক; রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস, অবনীন্দ্রনাথের পাহাড়িয়া ছন্দ, প্রবাসীর পাতায় 'শেষের কবিতা'র নতুন শাণিতোজ্জ্বল ভাষা, সুধীন্দ্র দত্তের 'পরিচয়ে'র ঈষৎ উন্নাসিক বিদগ্ধ বিশ্বসাহিত্য-বিহার। তবুও সে সময়ে 'পথের পাঁচালী'র নূতনত্বে সমস্ত বাংলা দেশে সাড়া জেগেছিল। তাঁর আকস্মিক আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বিভূতিভূষণ সর্বশ্রেণীর পাঠকচিত্ত অধিকার করে নিয়েছিলেন তাঁর স্নিগ্ধ ভাষার মাধুর্যে, তাঁর সুকুমার নিকলুষ রসবিহ্বলতায়। নিরুপায় ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে, বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটে আকণ্ঠনিমজ্জিত বাঙালী মধ্যবিত্ত তাঁর রচনায় পেল শান্তির আশ্রম, শ্যামল বাংলার শান্ত নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রার কল্পচিত্র। বাঙালীর জীর্ণ, ক্ষয়িষ্ণু সংসারকে তিনি এক অপরূপ আত্মরসে মণ্ডিত করলেন। দরিদ্র মানুষের আন্তরিক নির্লোভিতা, তার ব্যথা বেদনা, বঙ্গপল্লীর করুণ ক্ষীয়মান সৌন্দর্য, পার্বত্যবিহারী অরণ্যের প্রাণোচ্ছলতা তাঁর রচনায় স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তবু বিভূতিভূষণের অম্লান কাব্যকৃতির মধ্যে বাঙালী মধ্যবিত্তমনের ধ্রুব আশ্রয় নেই। তিনি ঘুম পাড়াতে চেয়েছিলেন তার উদ্‌ভ্রান্ত আকাঙ্ক্ষাকে কবিত্ব দিয়ে, স্মৃতির স্বপ্নকুয়াশা দিয়ে, ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় প্রকৃতি-তত্ত্বের স্তিমিত

মোহ দিয়ে। তাই শেষ পর্যন্ত তিনিও পলাতকই থেকে গিয়েছেন; ঘুরে বেড়িয়েছেন আত্মস্মৃতি-মন্থনের আবর্তে, পরমাত্মিক রসতত্ত্বের গহন গভীরে।

এই পলায়নে একদিক দিয়ে তাঁর চরিত্রের একটি মহৎ দিকও ধরা পড়ে। সেটি তাঁর নির্বিরোধ মানবিক হৃদয়বত্তা। ধান্দু, বিষয়ী, সুবিধাবাদী সাহিত্য-গোষ্ঠীতে (যেখানে আজ দেশের স্বৈরশাসনের তালে তালে অহিংসার প্রশস্তি এবং বিশ্বযুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী প্রচার করে দরিদ্রের শান্তি-সংগ্রামকে উৎখাত করে দেবার প্রস্তুতি চলেছে) তাঁর যাতায়াত ছিল; তবু প্রবল দণ্ডধরেরা তাঁকে দিয়ে তাদের প্রচারের ঢাক বহন করাতে পারেনি। সৎ এবং বিবেকবান শিল্পীর মত তিনি যা সত্য বলে জেনেছিলেন আমরণ তাকেই অনুসরণ করেছেন। যুদ্ধবাজদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে যে স্টকহোম শান্তি আবেদনে আজ পৃথিবীর ৫০ কোটি মানুষ স্বাক্ষর দিয়েছে, এই মানবপ্রেমিক অমর শিল্পীও তাতে স্বাক্ষর দিয়ে মানবতার প্রতি তাঁর শেষ আস্থা জানিয়ে গেছেন।

আলোচনা

পরিচয়ের পথ

"...যে সব কংগ্রেসী লেখকের কলম দিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ আর জালালাবাদের স্মৃতি রক্ত ঝরিয়েছে,...একদিন যাঁরা ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের চরম শত্রু, আজ তাঁরা হলেন পরম ভক্ত।" কারণ, "...যে শ্রেণীর স্বার্থ-সচেতনতা, যার ভাব-ভাবনা, কংগ্রেসী সাহিত্যের ছিল মূল উপজীব্য, সেই শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকার আজ (অর্থাৎ, বড়-বুর্জোয়ার চরম ও নগ্ন আত্মসমর্পণের পর—লেখক) অবসান হয়েছে। তাই কংগ্রেসী সাহিত্যে আজ সাম্রাজ্যবাদের এই স্তবস্তুতি।

"অবশ্য একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে, একদিন এই কংগ্রেসী সাহিত্যই ছিল পুরোপুরি জাতীয় সাহিত্য, এমন কি জনগণের সাহিত্য।"...ভারতীয় ধনবাদের প্রগতিশীল অধ্যায়ে, "কংগ্রেসী আন্দোলনের তথা জাতীয় সংগ্রামের" উপর বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বের যুগে "ধনবাদী সাহিত্যে জাতির এই আত্মনির্ভরতার আবেগ প্রতিধ্বনিত হয় প্রতিটি ছত্রে।...রবীন্দ্রনাথ হলেন এই ধনবাদী সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক।"

"পরিচয়ের পথ"-এর খসড়া (এর পর থেকে শুধু 'খসড়া') থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কথাগুলি উদ্ধৃত করা হল। ভারতে বৃটিশ শাসন-শোষণের দুটি বিরাট অধ্যায় জুড়ে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনা পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি স্পষ্ট সূত্রাকারে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে (প্রথম-যুদ্ধোত্তর-কালে দুনিয়াব্যাপী পুঁজিবাদী সংকট ও দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালে ভারতীয় বড় বুর্জোয়ার চরম ও নগ্ন আত্মসমর্পণ দিয়ে এই তিন অধ্যায় ভাগ 'খসড়া'তেই আছে—শ্রাবণ সংখ্যা 'পরিচয়ে' যথাক্রমে ৯১ ও ৯০ পৃষ্ঠায়)।

'খসড়ায় আরও বলা হয়েছে যে, "১৫ই অগস্টের পর থেকে টাটা-বিড়লার পৃষ্ঠপোষিত কংগ্রেসী সাহিত্য পুরনো প্রগতিশীল জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে

সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত হয়েছে।" আবার, "আজকের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্রেণীগুলির সংস্কৃতি আন্দোলনের" বর্তমান শক্তি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃঢ় আশা ঘোষণাপ্রসঙ্গে 'খসড়া'য় একবার উল্লেখ (উল্লেখ-মাত্র) আছে যে, "...এক নতুনতর বলিষ্ঠ সংস্কৃতিও রূপ গ্রহণ করছে ধনবাদের সংকটের দিন থেকেই" (ঐ—২১ পৃঃ)।

এইভাবে 'খসড়া'য় বলা হয়েছে যে, কংগ্রেস সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে যে সাহিত্য "আঘাত হেনেছে সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার বুকে", সে-ই "ছিল পুরোপুরি জাতীয় সাহিত্য, এমন কি জনগণের সাহিত্য"; সে-ই হল "ধনবাদী সাহিত্য"ও এবং তাকেই আবার বলা হয়েছে "কংগ্রেসী সাহিত্য"।

'খসড়া'-রচয়িতা কেবল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাহিত্যের কথাই আলোচনা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী সংস্কৃতি-সাহিত্য সম্পর্কে কোন কথা এই 'খসড়া'য় তোলা হয়নি।

"নতুনতর বলিষ্ঠ সংস্কৃতি" সম্পর্কেও ঐ একবার উল্লেখমাত্র আছে। বর্তমান কর্তব্য আলোচনা-প্রসঙ্গেও এই সংস্কৃতির অতীত ইতিহাস সম্পর্কে কোন কথা 'খসড়া'য় নেই।

এই পটভূমিতেই 'খসড়া'-রচয়িতা 'পরিচয়'-এর বর্তমান লক্ষ্য ও কর্তব্য বিবৃত করতে অগ্রসর হয়েছেন।

প্রথমেই বলা দরকার যে, ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে বুর্জোয়ার একচ্ছত্র নেতৃত্বের আমলেই ঐ সংগ্রামের প্রভাবে যে সংস্কৃতি-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তাকে "ধনবাদী" বলাটা সঠিক সংজ্ঞা নয়। ঔপনিবেশিক দেশের বিশিষ্ট আর্থনীতিক-সামাজিক-রাজনীতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে নতুন গণতান্ত্রিক চীনের সভাপতি মাও সে-তুঙ তাকে বলেছেন "...মূলত বুর্জোয়ার প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞান [আমরা এখানে বলছি "মূলত", কারণ তখনও তাদের মধ্যে ছিল সামন্ততন্ত্রের বিষের অবশিষ্টাংশ]" ("চীনের নয়া গণতন্ত্র")। তাই, সভাপতি মাও চীনে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের পরের যুগে তিন রকমের সংস্কৃতির অস্তিত্বের কথা বলেছেন—(ক) সাম্রাজ্যবাদী, (খ) সামন্ততন্ত্রী ও (গ) নতুন সংস্কৃতি (ঐ, ২৯ পৃষ্ঠা) বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া ও সর্বহারার অস্তিত্বই এই নতুন সংস্কৃতি সম্ভব করেছে। কিন্তু, '৪ঠা মে আন্দোলনের' আগের "আশি বছরে চীনের বুর্জোয়া-গণতন্ত্রী বিপ্লব ছিল পুরনো ধরনের,

এবং গত বিশ বছরে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রী বিপ্লব হল নতুন ধরনের। এইভাবে আমরা পাই পুরনো গণতন্ত্র—প্রথম আশি বছরের বৈশিষ্ট্য, এবং নতুন গণতন্ত্র—গত বিশ বছরের বৈশিষ্ট্য। এই পার্থক্য রাজনীতির মত সংস্কৃতিক্ষেত্রেও সত্য" (ঐ, ৩৩ পৃষ্ঠা)।

এইভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সামন্ততন্ত্র-বিরোধী নতুন সংস্কৃতি আবার দু'ভাগ হল : পুরনো গণতন্ত্রী ও নতুন গণতন্ত্রী (রাজনীতিক্ষেত্রে যার জুড়ি হল পুরনো ধরনের বুর্জোয়া-গণতন্ত্রী বিপ্লব আর নতুন ধরনের বুর্জোয়া-গণতন্ত্রী বিপ্লব)। এই কারণে, "মূলত" বুর্জোয়া হলেও, বুর্জোয়া নেতৃত্বে সৃষ্ট সংস্কৃতি-সাহিত্যকে "ধনবাদী" না বলে চেয়ারম্যান মাও তাকে বলেছেন "পুরনো গণতন্ত্রী"।

উপনিবেশে বুর্জোয়া-গণতন্ত্রী বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তিধর্মী প্রকৃতির কথা মনে রেখে এবং স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশ ও উপনিবেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর পার্থক্য থেকেই এই পার্থক্য এসেছে সংস্কৃতিক্ষেত্রেও। কিন্তু, 'খসড়া'য় যে এই পার্থক্য দেখাবার তেমন কোন চেষ্টা না করে বুর্জোয়া নেতৃত্বের আমলের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাহিত্যকে সরাসরি "ধনবাদী" বলা হয়েছে, সে কিছু আকস্মিক নয়।

দ্বিতীয়ত, "কংগ্রেসী সাহিত্য" বলে কিছু এ দেশে কোনদিন ছিল না (যদিও বড়-বুর্জোয়ার আত্মসমর্পণের পালার শেষ অঙ্কে—বিয়াল্লিশ সালে ক্রীপ্‌স-দৌত্যে যার সূচনা—অমন একটা বিকৃতি দেখা দিয়েছে বটে। এবং তখন—'খসড়া'-রচয়িতা ঠিকই বলেছেন—"টাটা-বিড়লার পৃষ্ঠপোষিত কংগ্রেসী সাহিত্য…সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত হয়েছে")। (ভারতে বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে আপসপন্থী হওয়া সত্ত্বেও, বড়-বুর্জোয়ার আত্মসমর্পণ ক্রমেই অধিকতর প্রকট হয়ে ওঠা সত্ত্বেও) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব যুগে, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব যুগে পর্যন্ত, এমন কি সরাসরি ও সম্পূর্ণত ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ও তাদের প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসেরই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে সাহিত্যের, তাকেও "কংগ্রেসী সাহিত্য" বলা যায় না, "ধনবাদী সাহিত্য"ও না। কেননা, নেতৃত্ব বুর্জোয়াই হোক, আর কংগ্রেসীই হোক, সংগ্রামের প্রকৃতি তখনও ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, জাতীয় মুক্তিধর্মী, এবং এই প্রকৃতিই ছিল সেই সাহিত্যেরও প্রাণ।

এবং ঠিক অনুরূপ কারণেই, ঔপনিবেশিক ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি ও

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সৃষ্ট সাহিত্যকে সমাজতন্ত্রী সাহিত্য বা কমিউনিস্ট পার্টির সাহিত্য বা শ্রমিক শ্রেণীর সাহিত্য বলা যায় না। কারণ, এই উভয় ক্ষেত্রেই সাহিত্যের মূল প্রকৃতি হল জাতীয় মুক্তিধর্মী। নেতৃত্ব ভেদে তার গুণগত পরিবর্তন ঘটলেও। বুর্জোয়া-নেতৃত্বেও তা সম্পূর্ণত ধনবাদী হয়ে ওঠেনি—হয়েছে ("মূলত" ধনবাদী হলেও) পুরনো গণতন্ত্রী এবং শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে (দুনিয়াব্যাপী সমাজতন্ত্রী সংস্কৃতির অংশবিশেষ হওয়া সত্ত্বেও) সমাজতন্ত্রী সাহিত্য বা কমিউনিস্ট পার্টি সাহিত্য বা শ্রমিক-সাহিত্য নয়—নতুন গণতন্ত্রী সাহিত্য।

কিন্তু, 'খসড়া'য় তাকে যে সরাসরি "কংগ্রেসী সাহিত্য" বলা হয়েছে সেও কিছু আকস্মিক নয়।

দেখা যাচ্ছে—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাহিত্যের উপর বুর্জোয়া ও বড় বুর্জোয়ার প্রভাবকে 'খসড়া'য় সর্বশক্তিমান সর্বগ্রাসী হিসেবে দেখা হয়েছে; এবং উপরোক্তদের দুর্বল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও সংগ্রামের জাতীয় মুক্তিধর্মী প্রকৃতিই যে আলোচ্য সাহিত্যের প্রধান নির্ধারণী শক্তি—সে সম্পর্কে 'খসড়া'য় উপযুক্ত চেতনার অভাব আছে। অর্থাৎ, জাতীয় মুক্তিধর্মী প্রভাবের শক্তিকে খাটো করে বুর্জোয়ার প্রভাবকেই সর্বশক্তিমান বলে মনে করা হয়েছে: বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাব সংক্রামিত হয়েছে 'খসড়া'য়। তাই "ধনবাদী সাহিত্য", "কংগ্রেসী সাহিত্য" প্রভৃতি নামকরণ আকস্মিক নয়, এই-ই তার অন্যতম প্রধান কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হল, 'খসড়া'র যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। সাহিত্যক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ও মৌলিক নিয়ামক শক্তি হল আর্থনীতিক ভিত্তি—এই মৌলিক মার্কসবাদী পদ্ধতিটিকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করবার ফলে কংগ্রেসী ধনবাদী নেতৃত্বে সৃষ্ট সাহিত্যকে সরাসরি "ধনবাদী" ও "কংগ্রেসী" সাহিত্য বলা হয়েছে (অবশ্য, ঔপনিবেশিক বুর্জোয়ার বিশিষ্ট প্রকৃতি সম্পর্কে সভাপতি মাও-এর শিক্ষাকে সম্পূর্ণত ও সঠিকভাবে প্রয়োগ না করবার কারণটিও এই যান্ত্রিকতায় সাহায্য করেছে)।

"যে শ্রেণীর স্বার্থ-সচেতনতা, যার ভাব-ভাবনা কংগ্রেসী সাহিত্যের ছিল মূল উপজীব্য, সেই শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকার আজ অবসান হয়েছে। তাই কংগ্রেসী সাহিত্যে আজ সাম্রাজ্যবাদের এই স্তবস্তুতি"—এই কথাটি হল ঐ যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির নিখুঁত প্রয়োগ। এখানে

প্রথমত, কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রভাবে সৃষ্ট সাহিত্যের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তিধর্মী প্রকৃতিকে গণ্য করা হয়নি —সে সাহিত্যের "মূল উপজীব্য" সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা না দেখিয়ে দেখানো হয়েছে ধনবাদী ভাব-ভাবনাকে; দ্বিতীয়ত, ধনবাদী নেতৃত্বকে বড়-বুর্জোয়ার নেতৃত্বের সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে (যা হল ভারতীয় মার্কসবাদীদের অতীত সর্বনাশা ভুলের একটি অঙ্গ); তৃতীয়ত, সাহিত্যের আদর্শকে মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্বের সঙ্গে ছায়ার মত অনুগামী হিসেবে দেখানো হয়েছে, এবং এইভাবে, "সংস্কৃতিক্ষেত্রে ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মুখপত্রের" পথের 'খসড়া' একটি সম্ভাব্য মিত্রকে (হোক সে অস্থায়ী অস্থিরমতি মিত্র) দুশমন বলে ঘোষণা করেছেন। এই সংকীর্ণতা ভারতীয় মার্কসবাদীদের সাম্প্রতিক সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এইভাবে, পুরনো গণতন্ত্রী সাহিত্যের পূর্ণ মর্যাদা দিতে অস্বীকার করা হয়েছে; সংস্কৃতিক্ষেত্রে গণতন্ত্রী ফ্রন্টের ব্যাপকতাকে সংকীর্ণ করা হয়েছে।

উপনিবেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাহিত্য যদি পুরোপুরি ধনবাদীও নয়, আবার সমাজতন্ত্রীও নয়—তবে কি তা শ্রেণী-নিরপেক্ষ? না। তা হয় না। তবে, এ প্রশ্নের বিশদ জবাবের আগে আরও একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হচ্ছে: উপনিবেশের মুক্তি সংগ্রাম ও তার পরিণতি জন-গণতন্ত্রী রাষ্ট্র কি শ্রেণী-নিরপেক্ষ? না। তাও শ্রেণী-নিরপেক্ষ নয়।

বুর্জোয়া নেতৃত্বের আমলেও এই মুক্তি-সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী ক্রমেই অধিকতর স্বাধীন শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত নেতৃত্বের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা দিয়েছে। পেটি-বুর্জোয়া—কৃষক ও শহরের মধ্যবিত্ত—ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে ঐ নতুন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শক্তির প্রতি আত্মীয়তাবোধে সজীব হয়ে উঠেছে (এবং মনে রাখতে হবে, লেখক হলেন প্রধানত এই শহরের মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ)। এই প্রক্রিয়াটিকে সাহায্য করেছে ১৯১৭ সালের গৌরবময় নভেম্বর-বিপ্লব, ১৯১৮-১৯ সালের ব্যাপক শ্রমিক-কৃষক জাগরণ, ১৯২৫ সালের 'ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস্ পার্টি' ও তারপরের ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, ১৯২৯ সালের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, এমনি সময়ে গর্কির 'মাদার' বইখানির বাংলা অনুবাদ, ১৯৩৩ সালে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, ১৯৩৫ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির

সম্মিলিত ফ্রন্ট-নীতি, ইত্যাদি ঘটনা ও পরিস্থিতি। এবং এইভাবে জাতীয়-মুক্তিধর্মী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাহিত্যে ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় শ্রমিক শ্রেণীর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—ঐ বুর্জোয়া নেতৃত্ব সত্ত্বেও। ১৯৩৮ সালে প্রগতি লেখক সংঘের স্থাপনাকে বলা যায় সংস্কৃতিক্ষেত্রে ঐ প্রক্রিয়াটিরই একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ফল। সেই বোধহয় প্রথম আমাদের দেশে প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীরা প্রকাশ্যে ও সংগঠনগতভাবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে এগিয়ে এলেন। এবং এই প্রক্রিয়াটি আজও সম্পূর্ণ হয়নি আজও তা এগিয়ে চলেছে ক্রমেই অধিকতর বেগে। এবং 'খসড়া' রচয়িতা ঠিক বলেছেন যে, নতুন নেতৃত্বে সংস্কৃতিক্ষেত্রে যে নতুন জোয়ার আসছে, তাকে রোখে এমন সাধ্য নেই কারও।

এই মুক্তি-সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী ক্রমেই বুর্জোয়া শ্রেণীকে নেতৃত্বের আসন থেকে হটিয়ে দিচ্ছে এবং শ্রমিক-নেতৃত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করবার ভিতর দিয়ে আসবে জন-গণতন্ত্রী রাষ্ট্র। তার শ্রেণীচরিত্র নয় তার নেতার শ্রেণীচরিত্র। একাধিক শ্রেণীর সমাবেশে তা মিশ্র (নেতৃত্বের শ্রেণী-চরিত্র সত্ত্বেও)। তেমনি সংস্কৃতিক্ষেত্রেও। মাতৃজঠরে ভ্রূণের মত। তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। আবার পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত রূপে দেখতে গেলে তাকে পাওয়া যায় না। তবুও তার অস্তিত্ব সত্য; এবং সে সত্য ক্রমেই আরও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে এবং দেখা দিচ্ছে।

কিন্তু, 'খসড়া'র বর্তমানের ও ভবিষ্যতের আশা ঘোষণার সময় নিতান্তই প্রসঙ্গত যে বলা হয়েছে, "নতুনতর বলিষ্ঠ সংস্কৃতিও রূপ গ্রহণ করছে ধনবাদের সংকটের দিন থেকেই," তার কোন দৃষ্টান্ত দেবার বা সে সম্পর্কে আলোচনা করবার কোন চেষ্টাও নেই। একেবারে অন্যত্র, অন্য প্রসঙ্গে, বলা হয়েছে যে, "সেই (সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী) আবেগেই সুকান্তর কলমে আগুন ঝরে আরও পরে, আর আজ ঝরে আরও অনেকের," তা এই নতুন গণতন্ত্রী সাহিত্যের গৌরবময় অস্তিত্ব ও বিকাশের ধারার যথেষ্ট স্বীকৃতি নয়। দু'বার এই বিচ্ছিন্ন উল্লেখমাত্র। তাই, মনে হয় 'খসড়া' রচয়িতা বুর্জোয়ার প্রভাবকে এমন সর্বগ্রাসী রূপে দেখেছেন যে, তাঁর কল্পিত "কংগ্রেসী" সাহিত্যের আবর্তে ঐ নতুনের অস্তিত্ব ও বিকাশ যেন সঠিকভাবে দেখতে পাননি। বড়-বুর্জোয়ার নগ্ন আত্মসমর্পণের আগেকার যুগের কথা বলতে গিয়ে তিনি ভরসা করে ঘোষণা করতে পারেননি—এই সেই নতুন; এই তার বিকাশের ধারা।

তাই, 'খসড়া'র নতুন গণতন্ত্রী সাহিত্যের ভাণ্ডার বড়ই দরিদ্র; সবই যেন শুরু হচ্ছে আজ—এই প্রথম।

বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী প্রভাব 'খসড়া'-রচয়িতার নতুন গণতন্ত্রী দৃষ্টি-ভঙ্গিকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। প্রত্যেকটি জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে যে নতুন সংস্কৃতি ও আদর্শের ভ্রূণ দেখা দেয়, তা তিনি দেখতে পাননি। সংস্কৃতি-সাহিত্যক্ষেত্রে ট্রট্স্কির ('লিটারেচার এ্যাণ্ড রিভলিউশন') সুবিধাজনক ও পরাজিতের মনোভাব যে ভাবে পূর্ণাঙ্গ কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার আগে বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না, 'খসড়া'র বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী প্রভাব বহুলাংশে তাই করেছে।

'পরিচয়'কে "সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মুখপত্র হিসাবে" গড়ে তোলবার ঘোষণা খুবই সময়োপযোগী। এই উদ্দেশ্যে 'পরিচয়' যে-সব কাজ করবে বলে 'খসড়া'য় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তাও সবাই অনুমোদন করবেন। কিন্তু এই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের গঠন ও কাজ সম্পর্কে 'খসড়া'য় কতকগুলি যে গুরুতর ত্রুটি দেখা যাচ্ছে, তা 'খসড়া'টিকে অত্যন্ত দুর্বল করে দিয়েছে।

'খসড়া'য় আছে—"নতুন নেতৃত্বে সংস্কৃতির মরা গাঙে আবার জোয়ার আসছে" (গাঙ অত মরা কিনা, সে-সম্পর্কে অবশ্য আলোচনার অবকাশ আছে); আছে "সংস্কৃতি-বিপ্লবের" কথা; "মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য" দেবার কথাও একবার আছে। কিন্তু এ-সব মিলেও ফ্রন্টের নেতৃত্বের প্রশ্নটি একরকম বাদই পড়ে গেছে।

সভাপতি মাও-এর প্রদর্শিত পথে কুও মো-জো শিল্প-সাহিত্যে সম্মিলিত ফ্রন্টে নেতৃত্বের প্রশ্নটিকে কি ভাবে তুলে ধরেছেন দেখা যাক:

"গত শ' খানেক বছরে চীন সমাজের প্রকৃতির দ্বারাই চীন বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ত-বিরোধী কর্তব্য আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে আছে। আফিং-যুদ্ধের থেকে সমস্ত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্য-বিষয়ক ও শিল্পক্ষেত্রে আন্দোলনই বিভিন্ন পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ত-বিরোধী হয়ে এসেছে। অতএব, চেয়ারম্যান মাও নতুন গণতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে-কাঠামো দিয়েছেন—অর্থাৎ, 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ত-বিরোধী, জনগণের ব্যাপক অংশের, সর্বহারার নেতৃত্বে পরিচালিত হবার

যে বৈশিষ্ট্য—তার মধ্যে শেষেরটি, অর্থাৎ **'সর্বহারার নেতৃত্বে পরিচালিত' নামে বৈশিষ্ট্যটিই, সর্বাধিক মূলগত।** সর্বাধিক বিপ্লবী শ্রেণী সর্বহারার নেতৃত্ব ব্যতিরেকে এবং সর্বাধিক বিজ্ঞানসম্মত সর্বহারা-চিন্তা ব্যতিরেকে, বিপ্লবের সঠিক দিক ও নীতিসমূহ উপস্থিত করা অসম্ভব। এ-সব জিনিস ব্যতিরেকে ব্যাপকতম জনগণের শক্তিকে সম্পূর্ণ বিকশিত করাও কিংবা চীন বিপ্লবে জয়লাভ করাও অসম্ভব।

"রাজনীতি বিপ্লবেই শুধু নয়,—সাংস্কৃতিক, সাহিত্য-বিষয়ক ও শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লবের বেলায়ও তাই।"

৯৩ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ পড়লে মনে হয় 'খসড়া'-রচয়িতা কুও মো-জোর প্রবন্ধটি পড়েননি এমন নয়। তবুও, কেন শিল্প-সাহিত্যে যুক্তফ্রন্টের ঐ "সর্বাধিক মূলগত", চূড়ান্ত নির্ধারণী প্রশ্নটিকে উত্থাপন করা হল না?

নতুন সংস্কৃতি-বিপ্লবের প্রকৃত নেতৃত্বের প্রশ্নটি সম্পর্কে 'খসড়া'-রচয়িতার নীরবতাই কিন্তু তাঁর প্রস্তাবিত "সংস্কৃতি-বিপ্লবে" পুরনো বুর্জোয়া-গণতন্ত্রী ভাবধারার নেতৃত্ব, অর্থাৎ বুর্জোয়া-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। এবং 'খসড়া'য় তা ঘটেছে নেতৃত্ব সম্পর্কে নীরবতা থেকেই শুধু নয়—আরও কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোথাও নীরবতা, কোথাও ভিন্ন ব্যাখ্যা থেকেও বটে।

যেমন—(১) সমগ্র 'খসড়া'য় "শ্রমিক" ও "কৃষক" এই কথা দুটি মাত্র একবার কি দু'বার আছে। এ কিছু আকস্মিক নয়। 'খসড়া' পড়লে মনে হয় যেন নতুন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও তার নতুন নায়করা বর্তমান ও প্রস্তুত —এবার জনগণকে তা পড়াতে-শুনাতে হবে; আর "জনতা"র থেকে কিছু লেখক-শিল্পী তৈরি করাটা বাকি, আর আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হবে। কিন্তু সংস্কৃতি-সংগ্রামের এই আদর্শ, শিল্প-সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও রূপ, সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র উৎস যে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণ, তা দেখতে পাওয়া যায় না কোথাও। অতীতের কোন্ সংস্কৃতির ঐতিহ্য গ্রহণ করতে হবে সে-সম্পর্কে ও বিদেশী সংস্কৃতি থেকে কী গ্রহণ করতে হবে সে-সম্পর্কে ভাষ্য আলোচনাই আছে। কিন্তু চেয়ারম্যান মাও-এর ভাষায়—"বিনাশর্তে সর্বান্তঃকরণে এবং সুদীর্ঘকালের জন্য মনস্থির করে সেই অনন্ত সংগ্রামের মধ্যে, প্রেরণার সেই একমাত্র অফুরন্ত উৎসমুখে গিয়ে" দাঁড়াবার যে প্রয়োজন, সে

সম্পর্কে, সেই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র উৎসমুখ সম্পর্কে কোন কথা নেই 'খসড়া'য়। জনগণকে পড়াবার-শুনাবার এবং "শিক্ষিত করে তোলবার মহৎ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করব"—এই শুভেচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে ; কিন্তু জনগণের কাছে আগে শিখে তবেই-যে তাদের শেখানো সম্ভব, সে উপলব্ধি ও আনুগত্য 'খসড়া'য় দেখতে পাওয়া যায় না (অথচ, লক্ষ্য করবার বিষয়—কুও মো-জো'র লেখাটির একটি বিরাট অংশ জুড়ে এই কথাটিই আলোচনা করা হয়েছে)।

(২) অসংখ্য প্রতিক্রিয়াশীল লেখকের বিকৃত ব্যাখ্যায় জর্জরিত "সত্য" ও "মানবতা" শব্দ দুটিকে 'খসড়া'য় এমন নিরবলম্বভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যে, 'খসড়া'র উপর বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী প্রভাবের মধ্যে তাকে বিপ্লবী সত্য ও মানবতা বলে চিনতে ভুল হবার অবকাশ রয়ে গেছে।

(৩) 'খসড়া'য় আছে : "প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীরা আজ ভারতের নতুন ইতিহাসের রচয়িতা, প্রসিদ্ধ ফরাসী চিন্তাবীর বল্‌জাকের ভাষায় তারা হল আজ Secretary of history." কিন্তু ইতিহাস রচনা করে বা সৃষ্টি করে তো জনগণ এবং লেখক-শিল্পী, লেখক-শিল্পী হন সেই ইতিহাসকে প্রতিফলিত করে এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। বল্‌জাক তো ইতিহাসের রচয়িতা অর্থে লেখককে Secretary of history বলেননি ! "বলজাক হাজার বার ঠিক যখন তিনি মানুষের প্রগতি ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে লেখককে বলেছেন Secretary of history" (ভক্স বুলেটিন —'৪৮ সাল, নং ৫৩, পৃষ্ঠা ৩১)। এখানেও বল্‌জাকের এই প্রসিদ্ধ কথাটিকে এক কথায় এমনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যাতে ভুল বোঝবার অবকাশ আছে।

(৪) 'খসড়া'য় আদর্শগত সংগ্রামের পরিকল্পনাও নিতান্ত নির্মূর্ত ও অসম্পূর্ণ এবং মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই এই অসম্পূর্ণতা বলে এই পরিকল্পনা দ্বারা পরিচালিত "আদর্শগত সংগ্রাম" ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাবার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবিরোধী ও প্রাদেশিকতাবাদী নীতি এবং সাম্প্রদায়িকতা ও শিল্পের জন্যে শিল্প-তত্ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর কথা বলেই 'খসড়া'র আদর্শগত সংগ্রামের পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেছে। এখানে যে চার দফা উল্লেখ করা হয়েছে, তা সবাই সমর্থন করবেন। কিন্তু গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা না করে এ-দেশে সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার কথা কথাতেই সীমাবদ্ধ থেকে যেতে বাধ্য। ভারতীয় মার্কসবাদীরা

এই ভুল করেছেন বলেই তাঁদের সম্মিলিত ফ্রন্ট-নীতি উপযুক্ত সাফল্যলাভ করেনি।

আবার, খুব সুনির্দিষ্টভাবে বলা দরকার ছিল যে, নতুন গণতন্ত্রী সাহিত্যিক যাঁরা এই ফ্রন্টের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে চলেছেন তাঁদের উপর বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাব সম্পর্কেও বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার (তা যে দরকার, এই 'খসড়া'ই তার প্রমাণ)। কিন্তু তাও করা হয়নি (কুও মো-জো কিন্তু তা ভোলেননি)। এখানেও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেয়েছে।

(৫) ৯২ পৃষ্ঠায় "ভাষার ক্ষেত্রে এই সাম্রাজ্যবাদী-নীতির বিরুদ্ধে লড়াই" চালানোর ঘোষণাপ্রসঙ্গে একবার ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভারতে বিভিন্ন জাতি ও তাদের বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি আছে, কিন্তু খসড়াটিকে সমগ্রভাবে দেখলে মনে হবে যেন একটি কাল্পনিক "ভারতীয় সংস্কৃতি"র কথাই বলা হচ্ছে এবং সেই পরিমাণে সেখানে ট্যাণ্ডনের তথা সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক আক্রমণকেই শক্তিশালী করা হচ্ছে। আবার বাঙালী জাতি বা বাঙালী সংস্কৃতির কথা 'খসড়া'-রচয়িতার কলমে আসেনি—যদিও প্রকারান্তরে এক কাল্পনিক সারা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারণা উপস্থিত করা হয়েছে, অথচ ঐতিহ্য-নির্বাচনের প্রশ্নে বাঙালীর কয়েকজন মনীষী ছাড়া আর কারও নাম করবার অক্ষমতা এই 'খসড়া'কে বাঙালী শভিনিজ্‌ম্ দোষে দুষ্ট করে তুলেছে (সারা ভারতে কি আর কেউ ছিলেন না যাঁরা ভারতের বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন?)।

(৬) সবশেষে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, 'খসড়া'য় "শান্তি" শব্দটিই অনুপস্থিত (সবশেষে উল্লেখ করা হলেও, এর গুরুত্ব কিছু কমবে না)। দুনিয়ার সমস্ত দেশে সমস্ত পর্যায়ে প্রত্যেকটি বিপ্লবী সংগ্রামের রণনীতির অন্যতম, এমনকি প্রধানতম, ভিত্তি হল আজ শান্তির জন্মে লড়াই। আজ আশু কর্তব্য কমিউনিস্ট সমাজ গঠনই হোক (সোভিয়েট ইউনিয়ন), সমাজতন্ত্র গড়াই হোক (জন-গণতন্ত্রের দেশগুলি), আর নতুন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই হোক (উপনিবেশগুলি), তার সঙ্গে এক হয়ে গেছে শান্তির জন্মে লড়াই। সেই শান্তির লড়াইয়েরই অঙ্গীকার-বর্জিত এই 'খসড়া'টি। এতে করে 'খসড়া'র রাজনীতিক দেউলিয়াপনাই প্রকট হয়েছে—বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদ থেকে ট্রট্স্কিপন্থায় উৎক্রমণের এক শোচনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। যেমন রাজনীতিক্ষেত্রে তেমনি সংস্কৃতিক্ষেত্রেও আজ শান্তির জন্মে লড়াইকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি-

আন্দোলনের কথা সংস্কৃতি-আন্দোলনকে সাহায্য-তো করবেই না বরঞ্চ বিপথগামী করবে।

এইভাবে 'খসড়া'টিকে বিচার করলে দেখা যাচ্ছে যে, বুর্জোয়া-জাতীয়তা-বাদী প্রভাব বারবার 'খসড়া'র রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক বিচার-বিশ্লেষণকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। 'খসড়া'-রচয়িতার যথেষ্ট শুভেচ্ছা সত্ত্বেও সেই বুর্জোয়া-জাতীয়বাদী প্রভাব 'খসড়া'র সুবিধাবাদ ও পরাজিতের মনোভাব সংক্রামিত করেছে। তারই ফলে পুরনো গণতন্ত্রী সাহিত্য-বিচারে বামপন্থী সংকীর্ণতা, আর নেতৃত্বের প্রশ্নে এবং নতুন গণতন্ত্রী সাহিত্যের সূচনা ও বিকাশের ধারা সম্পর্কে ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ এসে পড়েছে।

"পরিচয়ের পথের" এই খসড়া তার প্রস্তাবিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

সৈয়দ আবদুর রশীদ

শান্তির স্বপক্ষে

হিরোশিমায় আমি ছিলাম

উনিশশ' পঁয়তাল্লিশের ৭ই অগস্ট আণবিক বোমার বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল হিরোশিমা। সে সময়ে সেখানে বাস করছে ৩১২,০০০ নরনারী। এক সেকেণ্ডের মধ্যে সেই জনসংখ্যা দাঁড়াল তার এক তৃতীয়াংশের কিছু উপরে—বেঁচে রইল ১৩৬,০০০ লোক। শতকরা নব্বইটি ঘরবাড়ি চুরমার হল, ৭৬,০০০ বাড়ির মধ্যে খাড়া রইল মাত্র ৮,৪০০। ওতা নদী আর তার কয়দ নদীগুলোর উপরে যে বিয়াল্লিশটা পুল ছিল তার অর্ধেকেরও বেশি বিধ্বস্ত হল।

আণবিক বোমা-বর্ষণের ফলাফল যে কতদূর ভয়াবহ তা বুঝতে আজ আর আণবিক গবেষণায় বিশেষজ্ঞ হবার দরকার হয় না। তবে এই বোমা-বর্ষণের ফলে যে নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় তার সম্পূর্ণ বর্ণনা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই দিতে পারেন।

শ্রীমতী য়োকা ওতা একজন লেখিকা। হিরোশিমায় যখন বোমা পড়ে তখন তিনি সেখানে ছিলেন। নিচে আমরা তাঁরই উক্তি উদ্ধৃত করছি :

"...রাস্তায় দেখি, পুরুষ নারী আর ছেলেমেয়েরা হিরোশিমার নরক থেকে পালাচ্ছে হাজারে হাজারে। প্রত্যেকেরই সর্বাঙ্গে ভয়াবহ ক্ষত। ভুরুর চুল সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে, মুখ আর হাতের চামড়া পুড়ে গিয়ে ফালি হয়ে ঝুলছে। যন্ত্রণাটা সহনীয় এবং লাঘব করবার জন্য তাদের অনেকেই হাত দুটো আকাশের দিকে তুলে হাঁটছে। কেউ কেউ চলতে চলতে বমি করছে। অধিকাংশেরই কাপড়-চোপড় বলতে কিছু নেই; বাকি সকলের পরনে ন্যাকড়া। পুরুষদের পাজামার বন্ধনীগুলো যেন তাদের মাংসের উপর খোদাই করে আঁকা হয়েছে; মেয়েদের গায়ের উপর তাদের জামার নক্শা-গুলো ছাপার মত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

"...তাদের অধিকাংশেরই কোমরের উপরে আর কোনো জামা নেই, ছেঁড়া ন্যাকড়ায় পর্যবসিত হয়েছে পাৎলুনগুলো। বাকি সবার পরনে

শুধু আণ্ডিয়া। বহুক্ষণ জলে ডোবা মানুষের মত হতভাগ্যদের সর্বশরীর ফুলে উঠেছে। চোখের পাতা এমন ফুলেছে যে চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। তার চারিপাশে মুখের চামড়া হয়ে উঠেছে দগ্‌দগে লাল। তারা হাত উঁচু করে হাঁটছে; সে হাত দেখে মনে পড়বে মোচা-চিংড়ির দাঁড়ার কথা, আর তা থেকে ফালি ফালি পাঁশুটে রঙের মাংস ঝুলছে। মাথার মাঝখানটায় ভাতের বাটির আকারে ছোট্ট একটু জায়গায় অল্প অল্প চুল অবশিষ্ট রয়েছে, বাকি জায়গাটা যেন কামানো। সর্বাঙ্গে এই রকম নিদারুণ ক্ষত নিয়ে বোমা বর্ষণের এই পরম করুণাস্পদ শিকারগুলি সমুদ্রতীরের গরম বালির উপর গিয়ে শুয়ে পড়তে লাগল। তাদের কারোই আর দৃষ্টিশক্তি নেই।

"...মাটির উপর একটা মেয়েকে দেখলাম। তার মাথার খুলিটা আড়া-আড়ি হয়ে খুলে পড়েছে; মাথার ভিতরদিকটা তরমুজের মত লাল; এই বীভৎস ক্ষত সত্ত্বেও সে মরেনি; রক্তের একটা দীর্ঘ রেখা এঁকে সে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে।

"...মাটিতে একটা মড়া পড়েছিল পথের উপরে। আমি সেটাকে একপাশে সরিয়ে ফেলবার জন্য যেই তার হাঁটু ধরে টেনেছি, অমনি তার চামড়াটা আমার হাতে আটকে গেল, চামড়াটা হাঁটুর কাছ থেকে নিচে পর্যন্ত ছাড়িয়ে বেরিয়ে এল, আর তলাকার দগ্‌দগে মাংস পড়ল বেরিয়ে।

"...মেয়েদের পরনে কাপড় নেই; মহিলাদের মাথায় একটা চুলও নেই; তাঁদের সঙ্গে হেঁটে চলেছেন এক বৃদ্ধা; তাঁর দু'খানা হাতই সন্ধিচ্যুত হয়ে দু পাশে নড়্‌নড়্‌ করে ঝুলছে। হাড় থেকে খুলে খুলে পড়তে চায় মাংস, যেন উনুনে পাকানো; রক্ত পড়ছে অঝোরে; চর্বির মত একটা হল্‌দে তরল বস্তু তার সঙ্গে মেশানো।

"...অক্ষত ছিল না একজনও। কিছুকাল ধরে মানুষের জননেন্দ্রিয়গুলি পঙ্গু হয়ে রইল। মেয়েদের গর্ভ নষ্ট হয়ে যেতে লাগল; বহু ক্ষেত্রে রজঃস্রাব বন্ধ হয়ে গেল অকালে।

"...হিরোশিমার আণবিক বোমা বিস্ফোরণের সময়ে যাঁরা বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁদের রক্তে শ্বেতকণিকার দ্রুত হ্রাস হতে থাকল। ঐ দারুণ উৎপাতের পক্ষকাল পরেও দেখা গেল, একটি মেয়ের হাতে শাদা শাদা দাগ বেরিয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে মেয়েটি মারা গেল।"

('ইন ডিফেন্স অব পীস' থেকে)

সারা ভারত শান্তি কন্‌ভেন্‌শন

ওয়ারশ'তে (শেফিল্ডের পরিবর্তে) দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার পূর্বাহ্নে ভারতবর্ষের জাতীয় ক্ষেত্রে এই কংগ্রেসের প্রস্তুতি হিসেবে এবং বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধি প্রখ্যাত কবি পাবলো নেরুদার ভারতবর্ষে উপস্থিতির সমসময়ে গত ২৮শে ও ২৯শে অক্টোবর বোম্বাই শহরে সারা ভারত শান্তি কন্‌ভেন্‌শন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সারা ভারত প্রথম শান্তি সম্মেলনের সংকীর্ণ দলগত নীতি ও সাংগঠনিক স্বতঃস্ফূর্ততার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা হিসেবে এই কন্‌ভেন্‌শনের মূল আহ্বান ছিল, "শান্তির শিবিরকে আরও ব্যাপ্ত কর, শান্তির সংগ্রামকে আরও জোরদার কর।" আসাম ও পাঞ্জাব বাদে ভারতের সমস্ত প্রদেশের শান্তির সৈনিকরা প্রতিনিধি হিসেবে এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়ে কনভেন্‌শনে যোগ দেন।

প্রথম দিনের অধিবেশনে সারা ভারত শান্তি কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিষ্ণুদাস শিরালি আন্দোলন-পরিচালনায় এই কমিটির ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিয়ে জানালেন যে, অত্যন্ত সম্প্রতি জায়গায় জায়গায় যে শান্তি আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করেছে সেটা প্রধানত ছাত্রদের অংশ গ্রহণের ফলেই সম্ভব হয়েছে। সভাপতি ডাঃ অটল বললেন যে, শান্তির আন্দোলন এমনই যে এই আন্দোলনে সমস্ত মানুষ দল, মত ও ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্কের পর প্রথম শান্তি-কংগ্রেসের ঘোষণাপত্র বাতিল করে তার জায়গায় জনসাধারণের কাছে একটি আবেদনপত্র কন্‌ভেন্‌শনের মূল প্রস্তাব হিসেবে গৃহীত হয়। এই মূল প্রস্তাবটির বক্তব্য প্রধানত নিম্নরূপ—(১) শান্তির সৈনিকরা আণবিক বোমা বে-আইনী করার দাবি জানাচ্ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকার অস্ত্রের উৎপাদন-হার কমানোর দাবি জানাচ্ছেন, (২) সর্বপ্রকার বিদেশী আক্রমণ ও অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এবং বর্তমানে যে-সমস্ত আক্রমণকারী অন্য দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে, অবিলম্বে তাদের কাছে আক্রমণ বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছেন, (৩) কোরিয়ার ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত যতরকম শান্তির প্রচেষ্টা দেখা গেছে, এই কন্‌ভেন্‌শন সে-সমস্ত

প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে কোরীয় জনগণের উপর বোমা-বর্ষণের তীব্র নিন্দা করছে, (৪) স্বস্তি-পরিষদে পাঁচটি বৃহৎ শক্তির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার দাবি জানাচ্ছে এবং (৫) যুদ্ধের পক্ষে যে কোন দেশে যে কোন রকমের প্রচার এই মুহূর্তে বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছে।

এই মূল প্রস্তাবের পর কোরিয়া সম্পর্কে, ভারত গভর্নমেণ্টকে শান্তি আন্দোলনে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানিয়ে, বাঙলা ও অন্ধ্রে শান্তির স্বপক্ষে প্রচারের উপর সরকারী আক্রমণের প্রতিবাদে এবং দ্বিতীয় বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে আরও কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অধিবেশনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দাঙ্গে বলেন যে, শান্তির শিবিরে কি ধনী কি দরিদ্র সব দল ও মতের সমস্ত শান্তিকামী মানুষই এসে একত্রিত হতে পারেন। যে কোন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের শান্তিকামী সৎ মানুষের জন্যে শান্তির শিবিরের দরজা সব সময়েই খোলা থাকবে। তিনি আরও বলেন যে, কেউ যেন ট্রেড ইউনিয়ন অথবা অন্য কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে শান্তির আন্দোলনকে গুলিয়ে না ফেলেন। যে কোন ধর্মঘট-আন্দোলন মানেই শান্তি আন্দোলন নয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, মানুষের জীবন-সংগ্রামের নানা দিকের সঙ্গে শান্তি-আন্দোলনের যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে না।

এছাড়া অধিবেশনে খাজা আহ্‌মদ আব্বাস, যোগলেকর, শীল, মুল্‌করাজ আনন্দ, সুলতান নেওয়াজি, চতুর্বেদী, সুব্বারাও, সুব্রহ্মনিয়ম ও কৃষণ চন্দর প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

নিচে বিখ্যাত উর্দু লেখক কৃষণ চন্দর-এর উপরোক্ত বক্তৃতা প্রকাশিত হল।

মানুষই যদি না থাকল, দুনিয়ায় আর রইল কে?

বন্ধুগণ,

এ-পর্যন্ত যে-সমস্ত কার্যবিবরণী দাখিল করা হল এবং বক্তৃতা দেওয়া হল তার মধ্যে কিছু কিছু বিবরণী ও বক্তৃতা শুনে আমার মনে হচ্ছে যে, স্টকহোম-আবেদনের আসল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের কোন কোন বন্ধুর বেশ গুরুতর রকমের ভ্রান্ত ধারণা আছে। কোন কোন বন্ধু বিশ্বাস করেন যে,

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা এবং এই শেষোক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথমোক্ত ব্যবস্থাকে শক্তি জোগানোই এই উপরোক্ত আবেদন প্রচারের উদ্দেশ্য। আবার কোন কোন বন্ধু এও মনে করেন যে, অন্ন-বস্ত্র-জমি ও সুলভ শিক্ষার দাবিতে, শিল্প-ধর্মঘটে বা পুস্তক-প্রকাশকের সঙ্গে বিরোধের ক্ষেত্রে তাঁদের দৈনন্দিন আংশিক সংগ্রাম সংগঠিত করার পক্ষে, পুলিস-জুলুমের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার, কংগ্রেসী দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার পক্ষে স্টকহোম-আবেদনটি একটি সুবিধামাফিক আক্র মাত্র।

আবার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ এ-রকম ধারণাও পোষণ করেন যে, স্টকহোম-আবেদন এবং আমাদের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম বা অন্যান্য সমস্ত ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম একই অভিন্ন বিষয়ের এপিঠ আর ওপিঠ এবং তাঁরা আরও মনে করেন যে স্টকহোম আবেদনের আসল লক্ষ্য বা খাঁটি উদ্দেশ্য এই-ই।

এখন কথা হচ্ছে যে, আমি যে আমার এই সমস্ত বন্ধুদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী, তা মোটেই নয়। যেখানেই পুলিস-জুলুমের মত ঘটনা ঘটুক না কেন, আমি যে সেই পুলিস-জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার পক্ষপাতী নই, তা নয়। নিজে গ্রন্থকার বলে তো বটেই, তাছাড়া পুস্তক-প্রকাশকদের দ্বারা বহুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি বলেও, তাদের সঙ্গে কোন একটি বিশেষ বিরোধের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতেও আমি গররাজি নই। কংগ্রেসী দুর্নীতির প্রতিবাদে মিছিল বের করার ব্যাপারেও আমার অমত নেই। ধর্মঘট সংগঠনের স্বপক্ষে ভোট নেওয়ারও আমি বিরোধী নই; কেউ এ-রকম ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা করলে আমি আপত্তিও করব না।

কিন্তু কথা তা নয়। কথা হচ্ছে যে, এই সমস্ত বিষয় স্টকহোম-আবেদনের মুখ্য বা এমন কি গৌণ উদ্দেশ্যেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। একথা কিছুতেই ভুললে চলবে না যে, এই আলোচ্য আবেদনপত্রটি আমাদের স্বকীয় ও বিশিষ্ট জাতীয় বা সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের উপায় হিসেবে প্রচার করা হয়নি। অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে আমি বলছি, স্টকহোম-আবেদন একটি নিরালম্ব বায়ুভূত ব্যাপার। এক বিশিষ্ট ঘটনা-পরম্পরা এর উৎসমুখ, সেই ঘটনা-পরম্পরার এক বিশেষ পর্যায়ে এর উৎপত্তি এবং স্তরে স্তরে ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এটি এমন আর একটি বিশিষ্ট ঘটনা-পরম্পরার সৃষ্টি করবে—

আমাদের জাতীয় ও দৈনন্দিন সমস্যাগুলির উপর যে ঘটনা-পরম্পরার গুরুতর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব পড়া অপরিহার্য। আমাদের জাতীয় ও দৈনন্দিন সমস্যাগুলির উপর ঘটনা-পরম্পরার এই প্রভাব সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করছি। কিন্তু এখনই, এই মুহূর্তে যে বিষয়টির উপর আমি গুরুত্ব আরোপ করতে চাই তা হচ্ছে এই যে, এ-সমস্ত সত্ত্বেও স্টকহোম-আবেদনের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও পূর্বাপর অবস্থার পটভূমি বিশ্লেষণ করলে বলতেই হবে যে আমাদের নিজস্ব জাতীয় ও আশু দৈনন্দিন সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে বা সেগুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যেই এই আবেদনটি প্রচার করা হয়নি। কাজেই আমরা যেন এই দুটি বিভিন্ন সমস্যাকে এক করে না দেখি, গুলিয়ে না ফেলি।

আবেদন প্রচারের আসল উদ্দেশ্য

আবেদনপত্রে এই আবেদন প্রচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে কথাটি বলা হচ্ছে, স্টকহোম-আবেদনের আসল উদ্দেশ্য ঠিক তাই-ই; তার চেয়ে বেশিও নয়, তার চেয়ে কমও নয়। আমরা যেন আবেদনপত্রের বাক্য বা বাক্যাংশগুলির গূঢ়ার্থ আবিষ্কারের চেষ্টা না করি, আবেদনপত্রটিকে বিকৃত না করি কিংবা আমাদের নিজস্ব বিশিষ্ট সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার বা আমাদের নিজস্ব জাতীয় ও দৈনন্দিন কার্যক্রমের লক্ষ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টায় ওটিকে পরিবর্তিত না করি।

শ্রীযুক্ত তোগ্লিয়াত্তির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, "যাঁরা আণবিক বোমার ধ্বংসলীলার হাত থেকে মানবসমাজকে রক্ষা করতে ইচ্ছুক, সেই সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সুগভীর মানব-হিতৈষণার ফলেই" আবেদন-পত্রটি রচিত হয়েছে।

এবং এই-ই হচ্ছে এই আবেদন-প্রচারের আসল উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, মানুষের বিরুদ্ধে আণবিক বোমা ব্যবহার করা যাতে সম্ভব না হয় তার জন্যে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করা,...যুদ্ধ এবং যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সংগঠিত করা,...সারা দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা।

দেখা যাচ্ছে, উদ্দেশ্যটি স্পষ্টতই সীমাবদ্ধ: সর্বব্যাপী চূড়ান্ত অবলুপ্তির হাত থেকে মানবসমাজকে বাঁচাতে হবে।—কোন সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ার মত রোমান্টিক মনে হচ্ছে না এই উদ্দেশ্যটিকে, নয় কি? অথচ ব্যাপারটিকে

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সশস্ত্র লড়াইয়ের মত খুব বেশি বিপ্লবীও মনে হচ্ছে না, এমন কি পুলিস-জুলুমের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার মত বীরত্বব্যঞ্জক বলেও মনে হচ্ছে না ব্যাপারটিকে। এই আলোচ্য উদ্দেশ্যটি খুবই সাধারণ একটি উদ্দেশ্য মাত্র। এতে রোমান্স নেই, কাব্য নেই, বীরত্বের নামগন্ধ নেই এতে। আপনাকে এবং আমাকে শুধুমাত্র সর্বব্যাপী আণবিক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোই এই উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যটি এতই ভয়াবহ রকমের সহজ সরল যে অধিকাংশ লোক এবং আমাদের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই এটিকে কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না।

তাঁদের ধারণা, এর পিছনে আরও কিছু গূঢ় তত্ত্ব আছে। সেইজন্যেই তাঁরা আলুর খোসা ছাড়িয়ে তার ভিতরটা দেখার মত করে এরও ভিতরেও সত্যি কোন্ জিনিসটা আছে তা দেখার জন্যে এরও খোসা ছাড়াবার চেষ্টা করছেন, একেও উল্টেপাল্টে দেখছেন। ভিতরে এর কী আছে তা আমিই বলছি, শুনুন। এর ভিতরে আছে শান্তি, এর বাইরেও আছে শান্তি, এর পিছনে আছে শান্তি, এর অন্তরালেও আছে শান্তি। এবং এই-ই এর শেষ কথা। ধনিকদের ফাঁদে ফেলার মত কোন গুপ্ত কমিউনিস্ট-চক্রান্ত নেই এর পিছনে; এর মধ্যে না আছে উত্তর-প্রদেশের কৃষি-সংস্কার সাধন কার্যকরী করার জন্যে লুকনো সমাজতন্ত্রী কৃষকবাহিনী, না আছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে জলসেচ-ব্যবস্থার ভাগাভাগির সমস্যার কোন সমাধান; সোমালিল্যাণ্ড ইথিওপিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবে, না বৃটিশ হওুরাসের অন্তর্ভুক্ত হবে তারও কোন হদিস নেই এর মধ্যে। আসলে এ-প্রচেষ্টাই হাস্যকর। যা এর মধ্যে নেই, যা এর মধ্যে থাকার কথাও নয়, সেই সমস্ত অর্থ এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে, মনমত রঙ্ চড়িয়ে এতে আপন মনের মাধুরী মেশাবার হাস্যকর প্রচেষ্টা আমাদের।

কাজেই, সোজা কথা, পৃথিবীতে মানুষের জীবন রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়েই একমাত্র শান্তির এই আবেদন রচিত হয়েছে। এটা যে খুব একটা কিছু রোমান্টিক উদ্দেশ্য, তা নয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা একটা অত্যন্ত আশু প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য। বর্তমানে যুদ্ধ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে—এই ঘটনাটিই এই 'অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনীয়তা'র তাগিদ। পুরাকালে দ্বন্দ্বযুদ্ধে একজন বা দুজন মানুষ মারা পড়ত। পরবর্তী যুগের যুদ্ধে দশ-বিশজন বা শ'য়ে শ'য়ে মানুষ মারা পড়ত। আর আজকের

দিনে একটিমাত্র বোমায়, এক মিনিটে, এক তুড়িতে দশ-বিশ লক্ষ বা দশ-বিশ কোটি মানুষ মারা যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রথম নিক্ষিপ্ত আণবিক বোমার সার্বিক মৃত্যু-পরিধি ছিল কেন্দ্রবিন্দু থেকে দু'মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ; দ্বিতীয়বার নিক্ষিপ্ত আণবিক বোমার মৃত্যু-পরিধি ছিল পাঁচ মাইলের মধ্যে। আর এখন শোনা যাচ্ছে যে, সর্বাধুনিক আণবিক বোমার মৃত্যু-পরিধি নাকি কেন্দ্র থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ব্যাপ্ত, এছাড়া দু'শ মাইলব্যাপী মৃত্যু-পরিধিওয়ালা উন্নত ধরণের হাইড্রোজেন বোমাও নাকি তৈরি হয়েছে।

পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অঙ্কশাস্ত্র, রকেট-পরিচালনবিদ্যা ও এরোনটিক্স্-এর ক্ষেত্রে যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অগ্রগতি ঘটেছে তার ভিত্তিতে একথা অনুমান করা চলে যে, বর্তমানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিক থেকে কয়েক শো কোটি পাউণ্ড খরচ করে এমন একটা হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করায় বাধা নেই—যে-বোমায় পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই সঙ্গে বিনষ্ট হবে। সমস্ত মানুষ! প্রত্যেকটি প্রাণী। ধনিকরা, কমিউনিস্টরা! হ্যাঁ, এমন কি সোশ্যাল ডেমক্রাটরা পর্যন্ত সদলে বিনষ্ট হবে। আমার কোন কোন সমাজতন্ত্রী বন্ধু স্টকহোম-আবেদনকে সমর্থন জানাতে অস্বীকার করেছেন। সম্ভবত তাঁরা মনে করেন যে, আণবিক বোমা যখন আমাদের ঘাড়ে পড়বে, তখন তাতে মরবে শুধু কমিউনিস্টরাই, সমাজতন্ত্রীরা যে-কোন রকমে হোক বেঁচে যাবে। তা কিন্তু মোটেই নয়। মানুষের মননশীলতাই আণবিক বোমার জন্ম দিয়েছে বটে, আণবিক বোমার কিন্তু তাই বলে মানুষোচিত চিন্তাশক্তি নেই। আণবিক বোমা ধনিক আর সমাজতন্ত্রী আর কমিউনিস্টদের মধ্যে বাছবিচারের তোয়াক্কা রাখে না! হিন্দু মহাসভাপন্থী আর মুসলিম লীগপন্থী, শ্রমিক আর মিল-মালিক, গরীব লোকের কুঁড়ে আর রাজপ্রাসাদ, বই আর শিশুর হাসি—এ-সবের মধ্যে বাছবিচারের কোন ধারই ধারে না আণবিক বোমা।

সবাইকে। সবাইকে পুড়িয়ে মারবে ও। ওর গন্‌গনে আগুনের গর্তে সমস্ত খেয়াল-খুশি আর চিন্তা-ভাবনা, ভালবাসা আর ঘৃণা, সুসভ্য ও বর্বর চিন্তাসমেত এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই আপনাদের সবাইকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে আণবিক বোমা। ভয়াবহ ধ্বংসের হাত থেকে কাউকে রেহাই দেবে না ও; নাগাসাকি আর হিরোশিমার লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের শোচনীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এই সত্যই উপলব্ধি করেছেন। আণবিক বোমা কথাটার অর্থই হচ্ছে—মানুষের যৌথ

সামগ্রিক মৃত্যু। আর মানুষই যদি না থাকল, তাহলে দুনিয়ায় আর রইল কে?

মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলেই স্বাধীনতা, রুটি আর সমাজতন্ত্রের এই সমস্ত প্রশ্ন সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে আমাদের কাছে। আর তাই মানুষই যদি এই স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র বা রুটি ভোগ করার জন্যে বেঁচে না রইল, তাহলে কারই বা এ-সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন হবে, কী-ই বা মূল্য থাকবে এদের? মানুষ না থাকলে কিছুমাত্র মূল্য থাকবে না এদের। তাই স্বাধীনতা উপভোগ করতে হলে, রুটির স্বাদ গ্রহণ করতে হলে, সমাজতন্ত্র আর ধনতন্ত্র বা এ্যানার্কো-সিণ্ডিক্যালিজম্-এর মধ্যে তারতম্য করতে হলে প্রথমেই মানুষের নিছক অস্তিত্ব বজায় থাকা প্রয়োজন। কিন্তু যদি জনমানবহীন মাঠের পর মাঠ জমি পড়ে থাকে, যদি পুঁথিপত্র স্তূপীকৃত হয়ে থাকে আর তাদের কোন পাঠক না থাকে, তাহলে সেই জমি কার ক্ষুধাই-বা মেটাবে, সেই বই জ্ঞানলাভের আনন্দই-বা বিলোবে কাকে? কাজেই মানুষের সামগ্রিক ধ্বংসের উপায় হিসেবে ধ্বংসাত্মক যন্ত্রপাতি যখন আবিষ্কৃত হয়েছে, তখন সমগ্র মানব-সমাজের পক্ষে, শ'য়ে শ'য়ে বা হাজারে হাজারে নয়, কোটায় কোটায় কীণধারায় নয়, লাখে লাখে কোটিতে কোটিতে দুনিয়ায় তাদের এই নিছক মৌল অস্তিত্ব বজায় রাখার সমর্থনে এগিয়ে আসতে হবে; এ মানুষের প্রাথমিক কর্তব্য। এবং আজকের দিনে শান্তির তাৎপর্যই হচ্ছে এই। এ শান্তি মানুষেরই স্বপক্ষে!

নিছক অস্তিত্বই বিপন্ন

আর মানুষ যদি বাঁচতে পায়, সে সুমুখের দিকে এগোবেই—এই আমার বিশ্বাস। এক মহৎ সমৃদ্ধির যুগের দিকে, শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের পথে সে অগ্রসর হবেই—এও আমার বিশ্বাস। কিন্তু আমার এই ধারণা আমি জোর করে আর কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারি না। কারো মত বা আমার মতের সঙ্গে মিলতে পারে, আরও অনেকের সঙ্গে আমার মতান্তরও ঘটতে পারে; শান্তির এই মঞ্চ নিশ্চয়ই এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে ঝগড়া করার মত জায়গা নয়। এখানে আমরা নিতান্তই মানুষের নিছক অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রশ্নের সম্মুখীন। কারণ সমগ্র মানবসমাজই যে আজ আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা-বর্ষণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, দাঁড়িয়েছে তার সামগ্রিক চূড়ান্ত অবলুপ্তির

মুখোমুখি, কারণ আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা শুধু পৃথিবীর একটিমাত্র দেশে নয়, কয়েকটি দেশেই আজ দ্রুত স্তূপীকৃত হচ্ছে।

কাজেই আসুন, আমরা গোড়ার কাজ গোড়ায় সারি। আণবিক বোমা ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করি। আপনার রাজনৈতিক মতামত যাই হোক না কেন আসুন, প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর দিন, মানুষের অস্তিত্ব, তার মহৎ উত্তরাধিকার, তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে কাজে নেমে পড়ুন। এই দু'পেয়ে প্রাণীটিকে বেঁচে থাকার আর একবার সুযোগ করে দিন না, অতীতে সে বারবার তাক লাগিয়ে দিয়েছে আমাদের. দেখবেন ভবিষ্যতেও তার সম্পর্কে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। আসুন, শান্তির আবেদনে স্বাক্ষর দিন। আপনি শ্রমিকই হোন আর শিল্পপতি ধনিকই হোন, কিছু যায় আসে না। যদিও আপনাদের একজন আরেকজনকে শোষণ করেন, দৈনন্দিন জীবনে একজন আরেকজনের প্রতি নিষ্ঠুর, একজনের জীবনে গুরুতর দুঃখকষ্টের কারণ আরেকজন—তবু আজ আপনারা দু'জনেই যে চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন, একই কাগজে, একই আবেদনপত্রে আজ দু'জনেই আপনারা সই দিতে পারেন।

হ্যাঁ, আপনারা দু'জনেই এখানে একই কাগজে সই দিতে পারেন। শ্রমিকদের ধর্মঘটের স্বপক্ষে ভোট নেওয়ার ব্যাপারে শিল্পপতি তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না, কিন্তু আমাদের এই মহৎ শান্তির স্বপক্ষে ভোট নেওয়ার সময় তিনি তাতে অনায়াসেই অংশ নিতে পারেন। যদিও বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়ার আর্থিক স্বার্থ একেবারে মূলতই পরস্পরবিরোধী, তা সত্ত্বেও তাঁরা এখানে একই আবেদনে সই দিতে পারেন। ঠিক ঐ একই কারণে একজন কংগ্রেসী মন্ত্রী ও একজন কমিউনিস্ট নেতা একই শান্তির আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিতে পারেন, যদিও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁরা একে অপরের মারাত্মক শত্রু। একজন সোভিয়েটের সমর্থক এবং আরেকজন যিনি তা নন এঁরা দু'জনেই আমাদের এই স্টকহোম-আবেদনে সই দিতে সক্ষম। যিনি নিষ্ক্রিয় শান্তিবাদী, যিনি অহিংসার পথেই সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর বিশ্বাসী, এমন কি তাঁরও এই শান্তির আবেদনে সই দেবার অধিকার আছে। একমাত্র যুদ্ধবাদী ছাড়া আর কারো এ ব্যাপারে সই দিতে কোন বাধা নেই। এটাই আমাদের এই শান্তির মঞ্চের বহু-বিস্তৃতির ও গভীরতার প্রমাণ। এবং এর কারণ হচ্ছে একটিমাত্র বে-আব্রু নিষ্ঠুর সত্য, একটিমাত্র ভয়াবহ সম্ভাবনা :

কে বলতে পারে যে আগামীকালই যুদ্ধনিপ্সুদের একটিমাত্র ইঙ্গিতে এক মিনিটের মধ্যেই কোটি কোটি মানুষ মারা পড়বে না ? আর তাই, দুনিয়ার মানুষের নিছক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যেই, সেই কোটি কোটি মানুষের এই শান্তির আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার।

আর তাছাড়া মানুষকে বাঁচাতে পারা তো সামান্য কথা নয়। কারণ, আপনি মানুষকে বাঁচাচ্ছেন মানেই জীবনকে দুনিয়ার বুকে বাঁচিয়ে রাখছেন তার মানে, আপনি তাকে আরেকবারের মত সুযোগ দিচ্ছেন গান গাওয়ার, প্রেমে পড়ার, ফসল ফলানোর, শাড়ি বোনার, গ্রন্থ রচনা করার, প্রিয়জনের কানে কানে আরেকবারের মত কবিতা আবৃত্তি করার। তার মানে, আপনি তাকে প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আরও মহত্তর জয়লাভের জন্যে বাঁচিয়ে রাখছেন। আপনি বাঁচাচ্ছেন তাকে সমাজতন্ত্রের জন্যে, আমাদের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম সংগঠনের জন্যে। কিন্তু প্রথমে মানুষকে বাঁচাতে হবে তো! তবেই আমাদের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম অগ্রসর হতে পারবে কাজেই শান্তির এই আবেদন প্রচার করাই হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য, আমাদের আশু কর্তব্য। যে মানুষ আজ শান্তির জন্যে কাজ করছে, সে-ই আমাদের রুটি আর স্বাধীনতা অর্জনের জন্যেও কাজ করছে। সাম্রাজ্যবাদকে চিরতরে ধ্বংস করায় ব্রতী হয়েছে সে-ই।

স্বাক্ষর দেওয়ার অর্থ

শান্তির এই আবেদনে একেকটি স্বাক্ষর পাওয়ার অর্থ শুধু একটিমাত্র সই পাওয়া বা কোন এক গেঁয়ো চাষীর টিপসহি পাওয়া মাত্র নয়! এই স্বাক্ষরের সঙ্গে সেই স্বাক্ষরকারীর জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত। এই স্বাক্ষরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রইল তাঁর শিশুদের হাসি, তাঁর স্ত্রীর গুন্‌গুন গান, লাঙলের ফালে উৎসারিত তাঁর জীবনকাব্যের সুরধুনী। এই স্বাক্ষর ভিজে রইল তাঁর পরিশ্রমের ঘামের কোঁটায়, এই স্বাক্ষর জলজল করতে থাকল তাঁর ক্ষুধার যন্ত্রণায়, উন্নততর জীবনের জন্যে তাঁর অক্লান্ত কঠিন সংগ্রামের আগুনে। স্বাক্ষর দেওয়ার পক্ষে তাঁর নিজের নানা যুক্তি থাকতে পারে, অনেক সময় সে-সব যুক্তি এলোমেলো ও বিভ্রান্তিকর বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু এ-সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণা যাই হোক না কেন, এ স্বাক্ষর নিশ্চিতরূপে তাঁর স্থির আত্মপ্রত্যয়ের ফল, তাঁর বাঁচবার, নিজের জন্যে

উন্নততর জীবনযাত্রা সৃষ্টির প্রেরণার নিদর্শন। কাজেই, বন্ধুগণ, যখনই কোন স্ত্রী, পুরুষ বা শিশু শান্তির এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিচ্ছেন, তখনই সেটিকে আর সাধারণভাবে সমর্থনজ্ঞাপন বা মামুলি একটি সই হিসেবে গণ্য করা চলবে না। কারণ, এই স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়েই যে তিনি জীবনের প্রতি, নিজের প্রতি, সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর আস্থা জানাচ্ছেন।

আর আপনাকে তিনি বলছেন, "আমি আছি তোমার সঙ্গে।" আর এই-ভাবে যুদ্ধলিপ্সু ও তাদের মৃত্যু আর ধ্বংসসূচক ব্যবস্থাকে তিনি আরও একটু বিচ্ছিন্ন আর কোণঠাসা করে দিলেন। সর্বাঙ্গীন রাজনৈতিক শিক্ষার পথে এই হল তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। এইবার তিনি শত্রু আর বন্ধুর মধ্যে তারতম্য করতে পারছেন। এই প্রথম তিনি ভাবতে শুরু করলেন, এটাই বা কেন? এটাই বা নয় কেন? তাঁর লাঙল, তাঁর তাঁত, তাঁর দৈনন্দিন শ্রম থেকে মাথা তুলে জীবনে এই প্রথম তিনি প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনার ব্যাপক আন্তর্জাতিক যোগসূত্র সম্পর্কে সচেতন হলেন। তাঁর স্বাক্ষর দান কি শুধুই একটি সই মাত্র? তাঁর চেতনার স্তর থেকে এটি যে একটি বিরাট গুণগত অগ্রসর পদক্ষেপ! আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে প্রথম পাঠ আজ তিনি নিলেন। একদিন তাঁকে পৌঁছতে হবে বিশ্ব মানব-মহাসভায়! এই-ই হচ্ছে আমাদের এই শান্তির মহৎ তাৎপর্য!

কৃষণ চন্দর

পশ্চিমবঙ্গ শান্তি কন্‌ভেন্‌শনের আগে ও পরে

১৯৫০ সালের মার্চ মাসে বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের স্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির স্টকহোম-অধিবেশন থেকে আণবিক বোমা বে-আইনী ঘোষণা করার এবং এই বে-আইনী ঘোষণার কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একটি কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করার দাবির ভিত্তিতে পৃথিবীর সমস্ত সৎ ও শান্তিকামী মানুষের উদ্দেশ্যে একটি আবেদনপত্র প্রচারিত হয়। এই আবেদনপত্রটি স্টকহোম-আবেদন নামে প্রখ্যাত। পৃথিবীতে শান্তি রক্ষা করতে হলে আণবিক বোমাকে, আক্রমণাত্মক যুদ্ধাস্ত্রের এই চূড়ান্ত নিদর্শন-টিকে বে-আইনী করে দেওয়াটাই হচ্ছে একটি প্রাথমিক ও অন্যতম মূলগত কর্তব্য। এবং এই দিক থেকে স্টকহোম-সম্মেলন এই উপরোক্ত দাবির

ভিত্তিতে জনমত সংগঠন করার আহ্বান জানিয়ে দেশে দেশে শান্তিকামী মানুষের কাছে ও বিশেষ করে বিভিন্ন দেশের জাতীয় শান্তি-আন্দোলনের কাছে দুটি মূলগত, অথচ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, কর্তব্য সম্পন্ন করার জন্যে উপস্থিত করে। এই দুটি কর্তব্য হচ্ছে—একদিকে প্রত্যেকটি দেশে বহুবিস্তৃত, প্রাণপ্রাচুর্যে উদ্দীপ্ত শান্তি-আন্দোলন গড়ে তোলা; দল, মত, ধর্ম, সম্প্রদায় ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সেই দেশের প্রত্যেকটি শান্তিকামী মানুষকে সক্রিয় শান্তির সৈনিকে পরিণত করা, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধলিপ্সুদের ও তাদের ঘনিষ্ঠ ও সক্রিয় চেলাচামুণ্ডাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা, তাদের কোণঠাসা করা।

এই দুটি কর্তব্যের স্বরূপ ঠিকমত বোঝা, তার দায়িত্বভার গ্রহণ করা ও কর্তব্য দুটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে আমরা, শান্তিকামী সাধারণ মানুষেরা, কতটা অগ্রসর হয়েছি—এই মৌল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের জাতীয় (ভারতীয় এবং এক্ষেত্রে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার) শান্তি-আন্দোলন ও তার ফলাফলকে বিচার করতে হবে।

দেখা যাচ্ছে, এই নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে স্টকহোম-আবেদনপত্রে সংগৃহীত স্বাক্ষরের সংখ্যা দু'লক্ষ তিন হাজারের কিছু বেশি (ঐ সময়ে সমস্ত ভারতীয় ইউনিয়নে সংগৃহীত স্বাক্ষরের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ)। ঐ একই সময়ে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে শান্তি-আন্দোলনের সংগঠনী কেন্দ্র বা শান্তি কমিটি ও স্বাক্ষর সংগ্রাহক কমিটির মোট সংখ্যা ৭৫টি। পশ্চিম-বঙ্গের প্রত্যেকটি শান্তিকামী মানুষকে শান্তির সক্রিয় সৈনিকে পরিণত করা দূরে থাক, আবেদনপত্রে সংগৃহীত স্বাক্ষরের এই উপরোক্ত সংখ্যা থেকে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে এ-পর্যন্ত এ-দেশের প্রতি দু'শো জনে প্রায় এক জনের স্বাক্ষর মাত্র সংগ্রহ করা হয়েছে; এছাড়া শান্তি কমিটির এই প্রায় অনুল্লেখযোগ্য সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে শান্তি-আন্দোলনের চরম সাংগঠনিক দুর্বলতা ও আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততারই পরিচায়ক।

পশ্চিমবঙ্গে শান্তি-আন্দোলনের এই মারাত্মক সীমাবদ্ধতা, সংকীর্ণতা ও আন্দোলনের সাংগঠনিক দুর্বলতার মূল কারণ কোথায়? কেন আমরা, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ শান্তিকামী মানুষেরা এবং আমাদের শান্তি-আন্দোলন স্টকহোম-সম্মেলন কর্তৃক নির্ধারিত উপরোক্ত প্রথম কর্তব্যকাজটি মূলত সম্পন্ন করতে পারলাম না?

এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে সমগ্র ভারতের জাতীয় শান্তি-আন্দোলনের পূর্বাপর ইতিহাসে। এই ইতিহাসের সূচনা গত ১৯৪৯ সালে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত প্রথম শান্তি সম্মেলনে। সেই সম্মেলনে অনুষ্ঠিত আলাপ-আলোচনার বিবরণী ও সম্মেলনের ঘোষণাপত্র ও স্লোগান প্রভৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের মর্মকথা, তার সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারা, শান্তি-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে নানারকম সংকীর্ণ দলগত ধারণা পোষণ করা—প্রথম সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের এই মৌল তত্ত্বগত বিভ্রান্তিই ভারতের (তথা পশ্চিমবঙ্গের) জাতীয় শান্তি-আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। সেই সম্মেলনমঞ্চ থেকে আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামকেই একমাত্র শান্তির জন্যে সংগ্রাম বলে কার্যত ঘোষণা করা হল এবং শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন ও আংশিক গণতান্ত্রিক লড়াই ও সেই লড়াইয়ের সংগঠনকেই শান্তির জন্যে আংশিক সংগ্রাম ও তার সংগঠন হিসেবে ধরে নেওয়া হল। এইভাবে শান্তি-আন্দোলন পরিচালনার জন্যে পৃথক গণসংগঠন গড়ে তোলার কর্তব্যও ও এমন কি তার দায়িত্বকেও কার্যত অস্বীকার করা হল। সংকীর্ণ তত্ত্বগত ভিত্তি থেকেই জন্ম নিল সাংগঠনিক স্বতঃস্ফূর্ততার নীতি।

অবশ্য খুব জাঁকজমকের সঙ্গেই সারা ভারত প্রথম শান্তি সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। আনুষ্ঠানিকভাবেই বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের নীতির প্রতি আনুগত্যও ঘোষিত হল। শুধু বর্জন করা হল বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের আসল তাৎপর্যকে—তথাকথিত "জাতীয়" মনের সংকীর্ণ ও আংশিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধুরী মেশানো ব্যাখ্যার সাহায্যে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বর্জিত হল, এই বিশিষ্ট আন্দোলন গড়ে তোলার উপযোগী সংগঠন গড়ার দায়িত্ব। পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সম্মেলন হব-হব করেও শেষ পর্যন্ত আর হয়ে উঠল না; কোন প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সংগঠন জন্মই নিল না পশ্চিমবঙ্গে!

অতঃপর এল স্টকহোম-আবেদন। আর খুব স্বাভাবিকভাবেই তার পরের তিন-চার মাস ধরে কেউই বিশেষ কিছু গুরুত্ব দিলাম না আবেদন-পত্রটিকে। যদিও গত জুন মাস থেকে কিছুটা সংঘবদ্ধভাবে স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান শুরু হল ও একটি প্রাদেশিক স্বাক্ষর সংগ্রাহক কমিটি গঠিত হল, তা সত্ত্বেও স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান প্রধানত অত্যন্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজন উৎসাহী

কর্মীর স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যমে সীমাবদ্ধ রইল। বিভিন্ন কারখানায় বা বিভিন্ন জেলায় ও অঞ্চলে কারখানা শান্তি কমিটি বা আঞ্চলিক ও স্থানীয় শান্তি-কমিটি ও স্বাক্ষর সংগ্রাহক কমিটি গঠনের কাজও পূর্বাপর মাত্র কয়েকজনের প্রচেষ্টার বিষয় হয়ে রইল।

এরও পর এল বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব সংঘের হুঁশিয়ারী চিঠিটি। ফলে সেই প্রথম ছাত্রসমাজ কিছুটা ব্যাপকভাবে শান্তি-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। এবং আন্দোলনে মৌল তত্ত্বগত সংকীর্ণতা ও অন্যান্য ছোটবড় বিভ্রান্তি এবং সংগঠনের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততার নীতির জের কমবেশি চলতে থাকা সত্ত্বেও একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, প্রধানত ছাত্রদের সক্রিয়তার ফলেই পশ্চিমবঙ্গে শান্তি-আন্দোলন গত দু'তিন মাসে অন্তত কিছু পরিমাণেও গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। এ পর্যন্ত, নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শুধু মাত্র ছাত্রদের মধ্যে থেকেই ২৭,৭৯১টি স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়; তাছাড়া কেরানি ও ছোট ব্যবসায়ী প্রভৃতি মধ্যবিত্ত, অধ্যাপক ও স্কুলশিক্ষক, লেখক ও সাংবাদিক, শিল্পী, বিজ্ঞানকর্মী, চিকিৎসক প্রভৃতি অন্যান্য বৃত্তিজীবী মানুষেরও মধ্যে থেকে প্রায় ৬০,০০০ স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন ছাত্র ও যুব-সংগঠনগুলি। এছাড়া মোট দু'লক্ষ তিন হাজার সংগৃহীত স্বাক্ষরের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ স্বাক্ষরই মাত্র অক্টোবর মাস ও নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে এবং উপরোক্ত ৭৫টি শান্তি কমিটির অধিকাংশই গঠিত গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের মধ্যে।

বিশেষ করে গত অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গে শান্তি-আন্দোলনে যে জোয়ারের সাড়া দেখা দেয় তার একটি প্রধান তত্ত্বগত ভিত্তি হচ্ছে, এই নভেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেস অনুষ্ঠানের জন্যে স্থায়ী বিশ্ব শান্তি কমিটির বিগত প্রাগ্-অধিবেশন থেকে প্রস্তুতির আহ্বান।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের প্রস্তুতির জন্যে এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার যথোচিত সাধ আমাদের দেখা গেলেও পুরোপুরি তা সাধ্য ছিল না আমাদের পক্ষে। কারণ শান্তি-আন্দোলনের সংকীর্ণ তত্ত্বগত ভিত্তি ও সাংগঠনিক স্বতঃস্ফূর্ততার নীতির শোচনীয় ফলাফলস্বরূপ স্টকহোম-আবেদন প্রচারের পরবর্তী সাত মাসের মধ্যেও আমরা পশ্চিমবঙ্গে (এবং সারা ভারতেও) স্টকহোম-অধিবেশন কর্তৃক নির্ধারিত পূর্বোক্ত দুই দফা মৌল কর্তব্যের একটিও পুরোপুরি এবং যথোচিতভাবে পালন করতে পারিনি। শান্তি-

আন্দোলনকে বহুবিস্তৃত একটি শক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত করার কাজের একটি সামান্যতম, প্রায় অনুল্লেখযোগ্য, অংশ মাত্র আমরা এপর্যন্ত নিষ্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছি ; এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি শান্তিকামী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে আণবিক বোমা বে-আইনী করার দাবির সমর্থনে শান্তি-আন্দোলনের অংশ-ভাক করতে মূলত অসমর্থ হওয়ায় স্টকহোম-অধিবেশন কর্তৃক নির্ধারিত দ্বিতীয় কর্তব্যটি, অর্থাৎ এদেশে আন্তর্জাতিক যুদ্ধলিপ্সুদের সক্রিয় সমর্থকদের খুঁজে বের করা ও লোকচক্ষুর সামনে তাদের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের কাজটি, সম্পন্ন করতেও মারাত্মকরকম ব্যর্থ হয়েছি। কারণ, শান্তি-আন্দোলনের সংগঠকরা যতক্ষণ না নিজেদের ভ্রান্ত নীতি আমূল বর্জন করে যাঁরা এখনও শান্তির আবেদনে স্বাক্ষর দেননি এমনি অগণিত শান্তিকামী মানুষের কাছে পৌঁছতে পারছেন, আমাদের এবং তাঁদের নিজেদের নানা রকম বিভ্রান্তির জন্যে যে-সমস্ত সৎ ও শান্তিকামী মানুষ এখনও পর্যন্ত শান্তি-আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করছেন তাঁদের সকলের সমর্থন অর্জন করতে পারছেন এবং শান্তি-আন্দোলনের প্রত্যেকটি সমর্থককে, স্টকহোম-আবেদনপত্রের প্রত্যেকটি স্বাক্ষরকারীকে শান্তি-আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীতে পরিণত করতে পারছেন—অর্থাৎ এক কথায়, যতক্ষণ না তাঁরা এদেশের সমস্ত শান্তিকামী মানুষকে জনসংখ্যার একেবারে সামান্যতম অবশিষ্টাংশ থেকে একেবারে স্পষ্ট ও নিশ্চিতভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সমর্থ হচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁদের পক্ষে জনসংখ্যার এই অবশিষ্টাংশকে নির্ভুল-ভাবে সক্রিয় যুদ্ধলিপ্সু বা যুদ্ধলিপ্সুদের সহযোগী বলে লোকচক্ষুর সামনে চিহ্নিত করে দেওয়া সম্ভব নয়। স্টকহোম-অধিবেশন কর্তৃক নির্ধারিত প্রথম কর্তব্যকাজটি পুরোপুরি ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না করতে পারলে, দ্বিতীয় কর্তব্যটিও যথাযথভাবে পালন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ঠিক যে-সময় আণবিক বোমা বে-আইনী করার দাবির ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে শান্তি-আন্দোলন দীর্ঘকালের গোষ্ঠীগত সংকীর্ণ প্রচেষ্টার গণ্ডি ডিঙিয়ে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের পর্যায়ভুক্ত হতে চলেছে, সেই সময়েই এল স্থায়ী বিশ্বশান্তি কমিটির প্রাগ্-অধিবেশন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের প্রস্তুতির বা আণবিক বোমা বে-আইনী করার দাবির প্রাথমিক স্তর থেকে শান্তি-আন্দোলনকে আরও উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ করার আহ্বান। স্টকহোম-আবেদন প্রচারের দীর্ঘ ছ'সাত মাস পরে আমরা যখন সবেমাত্র এই প্রাথমিক

স্তরের করণীয় কাজগুলিকে গুরুত্ব দিতে আরম্ভ করেছি, সেই সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক শান্তি-আন্দোলন সেই প্রাথমিক স্তরের পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে আরও উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হবার অবস্থায় এল। সেই সময়ের মধ্যেই আণবিক বোমা বে-আইনী ঘোষণা করার আন্তর্জাতিক অভি-যানে মোট পঞ্চাশ কোটি মানুষের স্বাক্ষর সংগৃহীত হল; সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, হাঙ্গেরি প্রভৃতি অনেকগুলি দেশের সমস্তই বা প্রায় সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী স্টকহোম-আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে যারা আক্রমণাত্মক আণবিক অস্ত্রপ্রয়োগের স্বপ্ন দেখছে তাদের বিরুদ্ধে অমোঘ সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। "স্টকহোম আবেদনপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান ইতিমধ্যেই" বিভিন্ন দেশে শান্তি-আন্দোলনকে ব্যাপকতম জনসাধারণের মধ্যে "যথেষ্ট দৃঢ়মূল ও প্রতিষ্ঠিত" করেছিল এবং "সর্বপ্রকার যুদ্ধ এবং যুদ্ধের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী অভিযান শুরু করার উপযোগী বৃহত্তম ঐক্যের ইমারতের ভিত্তি স্থাপনা"-ও করেছিল। তাছাড়া অত্যন্ত সম্প্রতি যেহেতু জায়গায় জায়গায় "নতুন নতুন যুদ্ধ শুরু হচ্ছে এবং সেই সব যুদ্ধ ক্রমশই নতুন করে একটা বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষের বিপদ ডেকে আনছে," "এই সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র, এই সমস্ত নতুন নতুন বিপজ্জনক এলাকাগুলি, অস্ত্রসজ্জার বৃদ্ধির দ্রুততা, জার্মান জঙ্গীবাদকে পুনরুজ্জীবিত করার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্যতা ও তার প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে উন্মত্ত প্রচার" যেহেতু স্পষ্টতই মারাত্মক বিপদের সংকেতসূচক—তাই বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের পক্ষে যুদ্ধলিপ্সুদের এই সমস্ত উদ্ধত প্রতিবন্ধের মুখোমুখি সোজাসুজি ও অবিলম্বে দাঁড়ানো ছাড়া, আন্দোলনের কর্মক্ষেত্রকে আরও ব্যাপক, আরও উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ করার উদ্দেশ্যে একটি আশু কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানানো ছাড়া আর উপায়ান্তরও রইল না। আন্তর্জাতিক বিশ্বশান্তি সংগঠন তাই ঘোষণা করলেন, "আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র আণবিক বোমা বে-আইনী করে দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ নেই।···উদ্দেশ্য আমাদের আরও সুদূরপ্রসারী; এক কথায়, শান্তিরক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ-উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব। কিন্তু তা সফল করে তুলতে হলে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় এবং কার্যকরী প্রাথমিক কর্তব্য নিষ্পন্ন হওয়া দরকার, যথা—(১) সর্বপ্রকার আণবিক অস্ত্রশস্ত্র বে-আইনী করা, (২) সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করা ও তার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করা, (৩) যে-কোন দেশেই হোক

না কেন, যুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচারকে বে-আইনী ঘোষণা করা, (৪) যে-কোন বিদেশী আক্রমণকে এবং অন্য যে-কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশের সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে নিন্দা করা, এবং (৫) কোরিয়ায় সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রাথমিক উপায় হিসেবে সম্মিলিত রাষ্ট্র-পরিষদকে আবার তার সর্বজনস্বীকৃত পরিচালনা-পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা।—এই কর্তব্যগুলি নিষ্পন্ন করতে হলে একটি সর্বজনগ্রাহ্য কর্মসূচি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের ও রাজনৈতিক দল-মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একত্রিত করা দরকার।"*

দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের জন্যে প্রস্তুতির এই আহ্বান পশ্চিমবঙ্গে স্টকহোম-আবেদনপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযানকে ব্যাপক গণআন্দোলনের পর্যায়ভুক্ত করতে যে মূলগতভাবে সাহায্য করেছে (মাত্র অক্টোবর মাসের মধ্যে সংগৃহীত স্বাক্ষরের ও সংগঠিত শান্তিকমিটির সংখ্যা দেখেই বলা যায় যে) তা নিঃসন্দেহ। এবং এই দিক থেকেই আমাদের কাছে প্রাগ্ থেকে প্রচারিত প্রস্তাব ছিল সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনার দ্যোতক যে আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলি, সেই আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এবং তার "উদ্ভূত প্রতিফল" গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলন বিশ্ব শান্তি রক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে আণবিক বোমা বে-আইনী ঘোষণার দাবি ছাড়াও আরও চার দফা যে-দাবি উত্থাপন করেছেন, সেই একই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ভারতের (তথা পশ্চিমবঙ্গের) জাতীয় শান্তি-আন্দোলনের কাছে সেই দাবিগুলি ভবিষ্যত আন্দোলন সংগঠনের পক্ষে ছিল অমূল্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নিদর্শন। এবং এই দিক থেকেও প্রাগ থেকে প্রচারিত প্রস্তাব আমাদের কাছে ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা ভারত শান্তি কন্‌ভেন্‌শনের ঠিক অব্যবহিত পরে ও দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের পূর্বাহ্নে অনুষ্ঠিত বিগত পশ্চিমবঙ্গ শান্তি কন্‌ভেনশনের পক্ষে এই উপরোক্ত প্রস্তাবের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করা ও তাকে কার্যকরী করা পুরোপুরি সম্ভব-

*১৭শ সংখ্যা In defence of Peace পত্রিকার "সময় আমাদের জন্যে বসে থাকবে না" শীর্ষক সম্পাদকীয় থেকে উপরোক্ত সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি আহৃত।

ছিল না; সম্ভব ছিল না তার পক্ষে আমাদের জাতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের প্রস্তুতির পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানত কাজ করা।

এর কারণ ছিল দু'টি। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গ শান্তি-আন্দোলনের চরম পশ্চাদ্‌পদতা—তত্ত্ব ও সংগঠন এই উভয় ক্ষেত্রেই তার চূড়ান্ত শৈশবাবস্থা; দ্বিতীয়ত, এই প্রথম কারণটিকে জড়িয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্যে নির্দিষ্ট সময় ও প্রাগ্‌ থেকে প্রচারিত প্রস্তাব আমাদের হস্তগত হওয়ার মধ্যে সময়ের গুরুতর সংক্ষিপ্ততা। এর মধ্যে প্রথম কারণটিই হচ্ছে মূলগত। এক্ষেত্রে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, শুধুমাত্র দ্রুত পরিবর্তনশীল বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েই যে বিশ্ব শান্তি আন্দোলন এই উপরোক্ত পাঁচ দফা করণীয় কাজের খসড়া প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছে তা নয়। যদি তা-ই শুধু হত, তাহলে এই পাঁচ দফা কর্তব্যকে আর "কর্তব্য" হিসেবে ঘোষণা করা সম্ভব হত না, "কর্তব্য" তখন রূপ নিত কতকগুলি সৎ মানুষের কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্যহীন অসহায় শুভ ইচ্ছার। কিন্তু বিশ্ব শান্তি আন্দোলন এই পাঁচ দফা প্রস্তাবকে "কর্তব্য" হিসেবেই উপস্থিত করতে এবং এই কর্তব্য নিষ্পন্ন করার জন্যে সর্বজনসম্মত কর্মসূচি নির্ধারণের প্রস্তাব উত্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে মূলত এই কারণেই যে, আন্তর্জাতিক শান্তি-আন্দোলন আজ তার প্রাথমিক স্তর পরিক্রমণ করে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হওয়ার অপেক্ষায় রুদ্ধশ্বাস, "স্টকহোম-আবেদনপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান ইতিমধ্যেই" আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে "যথেষ্ট দৃঢ়মূল ও প্রতিষ্ঠিত" এবং এই অভিযান আজ "সর্বপ্রকার যুদ্ধ ও যুদ্ধের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী অভিযান শুরু করার উপযোগী বৃহত্তম ঐক্যের ইমারতের ভিত্তি স্থাপনা" করেছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ শান্তি-আন্দোলন সেই একই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও শান্তি-আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরের কর্তব্যটুটিই সে এখনও পর্যন্ত মূলত সম্পন্ন করে উঠতে পারেনি। ফলে প্রাগ্‌ থেকে প্রচারিত এই পাঁচ দফা দাবি আমাদের জাতীয় শান্তি-আন্দোলনের ভিত্তিমূল থেকে স্বতোৎসারিত ও অপরিহার্য সর্বজনীন দাবিরই প্রতিফলন ও বাস্তব রূপ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ শান্তি কন্‌ভেন্‌শনের সামনে উপস্থিত হল না, উপস্থিত হল আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলনের ও নেতৃত্বের অগ্রসর চেতনা থেকে উৎসারিত নির্দেশ হিসেবে। অথচ আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের অগ্রসর চেতনা থেকে উৎসারিত এই নির্দেশকে

আশ্রয় করে তাকে জাতীয় চেতনায় অঙ্গীভূত করে নেওয়ার অপর একটি পথ যা খোলা ছিল (এবং প্রাগ্ থেকে প্রচারিত প্রস্তাবে বিশেষ করে যে পথটির উপর মূলগতভাবে নির্ভর করার জন্যে পৌনঃপুনিক আবেদন করা হয়েছিল)—আন্দোলনের মূল ভিত্তি থেকে, নিম্নতম সংগঠন থেকে, স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জেলা সম্মেলনগুলি সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে প্রাগ্ থেকে প্রচারিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক শুরু করা এবং অবশেষে প্রাদেশিক সম্মেলনে সেই সমস্ত আলাপ-আলোচনার সর্বনিম্ন যোগফলস্বরূপ একটি সর্বজনস্বীকৃত জাতীয় দাবিসম্বলিত প্রস্তাব ও কর্মসূচি উপস্থিত করা—অত্যন্ত সময় সংক্ষিপ্ততার ও সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যে সে পথে অগ্রসর হওয়াও সম্ভব হল না। ফলে প্রাগ্ থেকে প্রচারিত পাঁচ দফা দাবিকে আন্তর্জাতিক শান্তি-আন্দোলনের নেতৃত্বের অবশ্যপালনীয় নির্দেশ হিসেবেই আমরা গ্রহণ করলাম; দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের পূর্বাহ্নে ও মূলত আনুষ্ঠানিকভাবে তার প্রস্তুতি হিসেবেই অত্যন্ত তাড়াহুড়োর মধ্যে প্রাদেশিক কন্ভেন্শনের অনুষ্ঠান করতে হল আমাদের। এবং আনুষ্ঠানিকভাবে করতে হল বলেই, মূলত আমাদের আন্দোলনগত দুর্বলতার জন্যে এবং খানিকটা উপযুক্ত সময়াভাবেও বটে, জাতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের প্রস্তুতির পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ শান্তি কন্ভেন্শনের অনুষ্ঠান সফল হল না।

গত ১০ই, ১১ই ও ১২ই নভেম্বর কলকাতায় যে পশ্চিমবঙ্গ শান্তি কন্ভেন্শন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, তার মূল দুর্বলতা ছিল এইটিই। এছাড়া এবং এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আমাদের শান্তি-আন্দোলনের ভিত্তিমূলের অন্যান্য গুরুতর দুর্বলতাগুলি, নীতি ও সংগঠনের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার জের তো পূর্বাপর কমবেশি ছিলই। এবং এই সমস্ত ত্রুটিগুলিই পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছে এবারের কন্ভেন্শনে।—তা প্রতিফলিত হয়েছে কন্ভেন্শনের প্রতিনিধিদের সংকীর্ণতায়, বক্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতায়, প্রস্তুতি-কমিটির নানা ত্রুটি-বিচ্যুতিতে। শান্তির দাবিতে সর্বজনীন আন্দোলন এখনও পর্যন্ত গড়ে না ওঠায়, ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে সক্রিয় উৎসাহের সঞ্চার না হওয়ায় এই কন্ভেন্শন স্পষ্টতই জনসাধারণের সংকীর্ণ একটিমাত্র অংশের প্রতিনিধিত্ব করেছে—নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শান্তিকামী মানুষের প্রতিনিধিস্থানীয় হতে সক্ষম হয় নি।

এই জন্যেই শান্তির দাবির মত অত্যন্ত জরুরি ও সর্বজনীন একটি দাবির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত কন্‌ভেন্‌শনেরও প্রকাশ্য অধিবেশনে কলকাতার ব্যাপক জনসাধারণকে সমবেত হতে দেখা গেল না। প্রতিনিধি-সম্মেলনে আলাপ-আলোচনার সময়ে অনেক প্রতিনিধি বিশ্ব শান্তি কমিটি কর্তৃক প্রাগ্ থেকে প্রচারিত পাঁচ দফা দাবিকে যান্ত্রিকভাবে মেনে নেওয়ার স্বপক্ষে গোঁড়ামি ও সময়ে সময়ে কিছুটা অসহিষ্ণুতাও প্রকাশ করেন, তাঁদের কারো মধ্যে ঐ প্রস্তাবের চার দফা নতুন সংযোজিত দাবি নিয়ে আলোচনা উত্থাপনের মত মনোভাব দেখা যায় না, আবার কোন কোন প্রতিনিধি (এঁরা অবশ্য সংখ্যায় ছিলেন অনেক কম) সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম আর শান্তির সংগ্রাম এক, এই মর্মে মতপ্রকাশ করেন। এছাড়া দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা ও সময়াভাবের দরুণ প্রস্তুতি-কমিটির কাজেও নানাবিধ ত্রুটি দেখা গেছে—তার মধ্যে মূল খসড়া প্রস্তাবটি সম্পর্কে আলোচনার জন্যে অধিবেশনে পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার ব্যবস্থা না করা, তাড়াহুড়ো করে প্রস্তাবটি কোনমতে পাশ করিয়ে নেবার মনোভাব, আণবিক বোমা বে-আইনী ঘোষণার দাবি ছাড়াও খসড়া প্রস্তাবে অন্যবিধ নতুন দাবি যে-সমস্ত তাঁরা উত্থাপন করলেন, সমবেত প্রতিনিধিরা সেগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলেই গ্রহণ করবেন—আত্মসন্তুষ্টির এই মনোভাব থেকে প্রতিনিধিদের চেতনার অসমবিকাশ সম্পর্কে মনোযোগ না দেওয়া, এই নতুন দাবিগুলি উত্থাপনের (অর্থাৎ, শান্তি-আন্দোলনকে উন্নততর স্তরে উত্তীর্ণ করার) তাৎপর্য ও তার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা না করা এবং শান্তি-আন্দোলনের মূল ভিত্তি স্থানীয় ও আঞ্চলিক শান্তি কমিটিগুলির প্রতিনিধিদের এবং স্টকহোম-আবেদনে স্বাক্ষর-সংগ্রহকারীদের বাস্তব ও জীবন্ত অভিজ্ঞতা বিবৃত করা ও সে সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ প্রতিনিধি-সম্মেলনের গোড়ার দিকেই না দেওয়া, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অবশ্য এই ধরনের একটা বৃহৎ কর্মের অনুষ্ঠানে এইরকম এবং আরও অনেক খুঁটিনাটি ত্রুটির তালিকা দিয়ে মহাভারত রচনা করা এমন কিছু শক্ত নয়। এবং এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, বিগত পশ্চিমবঙ্গ শান্তি কন্‌ভেন্‌শন উপরোক্ত এই সমস্ত খুঁটিনাটি ও গুরুতর ও এমন কি মূলগত ত্রুটির ফলে বিশেষভাবে অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, কন্‌ভেন্‌শনটি শুধুই এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির যোগফলমাত্রও নয়। এর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তব সার্থকতার দিকও রয়ে গেছে। কন্‌ভেন্‌শনে আগাগোড়া

যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের চোখে এই সার্থকতার দিকটিও স্পষ্টভাবে ধরা না পড়ে পারে না। কনভেনশন যথেষ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল না, একথা ঠিক; সমবেত প্রতিনিধিদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক যে যথেষ্ট মুক্তদৃষ্টি ছিলেন না, তাঁরা যে বিশ্ব শান্তি কমিটির খসড়া প্রস্তাবকে সংকীর্ণ অর্থে নেতৃত্বের অবশ্যপালনীয় নির্দেশ হিসেবে বুঝেছিলেন, একথাও সত্যি; কিন্তু তা সত্ত্বেও, জনসংখ্যার সেই সংকীর্ণ অংশের প্রতিনিধিরা তাঁদের গুরুতর বিভ্রান্তি সত্ত্বেও কনভেনশনের খসড়া প্রস্তাবটির ভিত্তিতে যে মন খুলে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, তুমুল বিতর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন—এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। এবং এ বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই সমস্ত প্রতিনিধির সমস্ত আলোচনার বক্তব্য বিষয় ছিল এই একটিমাত্রই যে, পশ্চিমবঙ্গে শান্তি-আন্দোলনের পূর্বাপর সংকীর্ণ নীতিকে আজ সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে এবং এই আন্দোলনকে এমন এক ব্যাপক গণভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে-ভিত্তিতে দেশের সমস্ত সৎ ও শান্তিকামী মানুষ একত্রিত হতে পারেন। এই সমস্ত প্রতিনিধির এই যুক্তিটিও সঠিক ছিল যখন তাঁরা বলেন যে, এই উপরোক্ত উদ্দেশ্যটিকে সফল করে তুলতে হলে বিশ্ব শান্তি কমিটির খসড়া প্রস্তাবটিকে খুশিমত পরিবর্ধিত বা সংশোধিত করে গ্রহণ করা চলবে না, কেন না এর আগে বিশ্ব শান্তি কমিটির পূর্ববর্তী কোন কোন প্রস্তাবকে এইভাবে গ্রহণ করার ফলেই মারাত্মক সংকীর্ণ নীতির ফাঁদে আমরা পা দিয়েছিলাম। দেখা গেল, আন্দোলনকে আরও ব্যাপকতর গণভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার উপরই যে তার সার্থকতা নির্ভর করছে, এ সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত নেই। কেউই নিজেদের প্রাক্তন ত্রুটিস্বীকারে পরাঙ্মুখ নন। এমন কি শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কোন কোন প্রতিনিধি যাঁরা এখনও পর্যন্ত আন্তরিকভাবেই শান্তি-আন্দোলনকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রামেরই নামান্তর বলে বিশ্বাস করেন, তাঁরাও শান্তির দাবিতে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকতম ঐক্য গড়ে তুলতে না পারলে যে শান্তি রক্ষা করা অসম্ভব—এ সত্যকে স্বীকার করেন। এবং এ সত্যকে স্বীকার করেন বলেই মতপার্থক্য সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তিরাও ছিলেন কনভেনশনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, পশ্চিমবঙ্গ শান্তি-আন্দোলনের মৌল নীতিগত সংকীর্ণতার জন্যে এই কনভেনশন জাতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের প্রস্তুতির পদক্ষেপ

হিসেবে এর দায়িত্ব মূলত পালন করতে সক্ষম হয়নি; কিন্তু সেই সঙ্গে এই ঘটনাটিকেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিশ্ব শান্তি কমিটির খসড়া প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত কনভেন্‌শনের খসড়া প্রস্তাবটিকে এবং কোরিয়া সম্পর্কিত প্রস্তাবকে যথোচিত জাতীয় রূপ দেবার চেষ্টায় প্রতিনিধিরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক-বিতর্ক করেছেন, এই অত্যন্ত যৌল একটি সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় ব্যাকুল হয়েছেন যে, শান্তি আন্দোলনকে এ দেশের মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এ দেশের জল-হাওয়ায় তাকে জীবন্ত ও পরিপুষ্ট করে তুলতে হবে দেশের অসংখ্য শান্তিকামী মানুষের মনের গভীরে এই আন্দোলনকে মূলবিস্তার করতে হবে, এই সব মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় কথা বলা তাকে আয়ত্ত করতে হবে—শান্তি-আন্দোলনকে আমাদের দেশজ রূপ, জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করতে হবে। প্রতিনিধি-সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত পি. সি. যোশী পশ্চিমবঙ্গ শান্তি-আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর অনুযোগপূর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতায় এই কথাই বলেন যে, এখানে শান্তি আন্দোলন যে এখনও পর্যন্ত ব্যাপক গণভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি তার মূল কারণ হচ্ছে এই যে এই আন্দোলন এখনও তার জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি এবং তারই ফলে ব্যাপক জনসাধারণকে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে ও এই কাজে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারেনি। কী কী বিশিষ্ট উপায়ে এই আন্দোলনকে জাতীয় রূপ দেওয়া যায় সে সম্পর্কেও শ্রীযুক্ত যোশী তাঁর নিজের মত ব্যক্ত করেন। যাঁরা বিশ্ব শান্তি কমিটির খসড়া প্রস্তাবকে সংকীর্ণ অর্থে নির্দেশ হিসেবে গ্রহণের মনোভাব দেখান, কনভেন্‌শনের শেষ দিনের অধিবেশনে সেই সমস্ত প্রতিনিধির দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জ্যোতি ভট্টাচার্যও আন্দোলনের এই জাতীয় রূপের উপর সমধিক গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন যে, জাতীয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খসড়া-প্রস্তাবের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করা আর 'ব্যাখ্যা'র নামে সেই প্রস্তাবকে খুশিমত সংশোধিত ও পরিবর্ধিত করে নেওয়া, এ দুটির মধ্যে মূলগত প্রভেদ বর্তমান। ঐ দিনের অধিবেশনে কনভেন্‌শনের সমস্ত আলোচনা ও তার ফলাফলকে বিশ্লেষণ করে প্রস্তুতি-কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত নরহরি কবিরাজ বলেন যে, আলাপ-আলোচনার ফলে প্রতিনিধিদের ও প্রস্তুতি-কমিটির সভ্যদের অনেকেরই বহু বিভ্রান্তির হদিশ আমরা পেলাম; তাঁদের কেউবা দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেস সম্পর্কে, কেউ বা তার খসড়া প্রস্তাব সম্পর্কে নিতান্তই সংকীর্ণ ও আনুষ্ঠানিক ধারণা পোষণ

করছেন, কেউ বা আমাদের শান্তি-আন্দোলনের জাতীয় রূপের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করছেন না। প্রতিনিধিদের মধ্যে, এমন কি প্রস্তুতি কমিটির সভ্যদের মধ্যেই বহু গুরুতর ও মূলগত বিষয়েই মতান্তর আছে। যাঁরা সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের সঙ্গে শান্তির জন্যে সংগ্রামকে এক করে দেখেন তাঁদের সমালোচনা প্রসঙ্গে নরহরিবাবু শান্তি-আন্দোলনের বহুবিস্তৃতির মূল নীতিগত ভিত্তি—অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে যে শান্তিতে পাশাপাশি থাকা সম্ভব—এই নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও বলেন যে, নীতিগত মতান্তর কিছু এই মুহূর্তেই দূর করা সম্ভব নয়। ঐক্যবদ্ধ কাজ এবং দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে দিয়েই মতান্তর দূরীকরণের দিকে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি বলেন যে, সামগ্রিকভাবে কনভেনশনের আলাপ-আলোচনা ফলপ্রদ হয়েছে; সমবেত সকলেই যে শান্তি রক্ষার জন্যে উৎসুক ও অগ্রসর, এটা এই আলোচনার ফলে স্পষ্ট হয়েছে। এবং এই দিক থেকেই কনভেনশনের কাজ সফল হয়েছে বলা চলে।

এবং ঠিক এই দিক থেকেই পশ্চিমবঙ্গ শান্তি-কনভেনশন সফল হয়েছে। আন্দোলনের পূর্বাপর সংকীর্ণতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার দুর্বলতার ফলে জাতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের প্রস্তুতির পদক্ষেপ হিসেবে এই কনভেনশন প্রধানত ব্যর্থ হলেও, কনভেনশনে সমবেত প্রতিনিধিদের খোলাখুলি নিজেদের প্রাক্তন নীতিগত ও সাংগঠনিক ভুলভ্রান্তি স্বীকারের মনোভাব, আন্দোলনকে বহুবিস্তৃত গণভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ঐকান্তিক আগ্রহ, সর্বব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে প্রত্যেকটি শান্তিকামী মানুষকে শান্তি রক্ষায় উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় করে তোলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা ও এই উদ্দেশ্যে আন্দোলনের জাতীয় রূপ কী হবে সে সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করা এবং ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় যোগদানের সক্রিয় উদ্যম অত্যন্ত বাস্তব সত্য। এ সমস্ত লক্ষণ কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। এ-সমস্ত লক্ষণ প্রতিনিধিদের একটি মৌল চেতনাকে প্রতিফলিত করছে; বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা এ-বিষয়ে একমত যে আমাদের সমবেত চেষ্টায় বিশ্বশান্তি রক্ষা করা সম্ভব। এবং কনভেনশনের প্রবীণ সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু যখন ঘোষণা করেন যে, তিনি এত উৎসাহিত বোধ করছেন যে অতঃপর তিনি নিজেই স্টকহোম-আবেদনপত্রে গণসহি সংগ্রহ করবেন, সমস্ত

মতপার্থক্য সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় যখন শান্তি-আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের একজন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, তখন এ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশই থাকে না যে, পশ্চিমবঙ্গের শান্তি-অভিযানকারীরা শুধু যে বিশ্ব শান্তি রক্ষা করা সম্ভব বলে মনে করেন তাই নয়, শান্তি রক্ষাকল্পে তাঁরা সকলে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অগ্রসরও বটে। আমাদের আন্দোলনের গুরুতর পশ্চাদ্‌পদতার পরিপ্রেক্ষিতে এই দুটি মূলগত লক্ষণ নিঃসন্দেহেই পশ্চিমবঙ্গ শান্তি-কন্‌ভেন্‌শনের সার্থকতার পরিচায়ক।

এবং এই দিক থেকেই, স্থায়ী বিশ্ব শান্তি কমিটির প্রাগ্‌ থেকে প্রচারিত প্রস্তাব যে-দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ শান্তি-আন্দোলনকে সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টার গণ্ডি ডিঙিয়ে গণ-আন্দোলনের পর্যায়ে উন্নীত করার পথে প্রথম পদক্ষেপ, এই কন্‌ভেন্‌শন সেই দিক থেকেই—আমাদের প্রাক্তন ভুলচুক সম্পর্কে আরও একটু সচেতন করার দিক থেকে, আমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি, আমাদের ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে আবও একটু সজ্ঞান করার দিক থেকে—আর একটি অগ্রসর পদক্ষেপ।

এই অগ্রসর পদক্ষেপ কি ব্যর্থ হবে? আজকের এই কন্‌ভেন্‌শনের চৈতালি ঘূর্ণি আগামী সম্মেলনে যুদ্ধলিপ্সুদের ভাগ্যাকাশে কি আন্দোলনের কালবৈশাখী হয়ে দেখা দেবে না?

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক কলা প্রেস, ৩, ডেকার্স লেন থেকে মুদ্রিত ও ৩০৯, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত।

বিংশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩৫৭

ভারত সম্পর্কে মার্কসের 'ক্রনোলজিকাল নোট্‌স'

নিকোলাই গোল্ডবার্গ

মস্কোতে মার্কস্‌-এঙ্গেল্‌স্‌-লেনিন ইনস্টিটিউট কর্তৃক কার্ল মার্কসের 'ক্রনোলজি অব ইণ্ডিয়া'র রুষ ভাষায় একটি অনুবাদের প্রকাশ (এ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি আকারে প্রাপ্তব্য) সোভিয়েট ইউনিয়নের ঐতিহাসিকমহলে ও পাঠকসমাজে রীতিমত আগ্রহের সঞ্চার করেছে। সোভিয়েট দেশের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও পুস্তক-ইতিবৃত্তবিষয়ক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত অসংখ্য মন্তব্য ও সমালোচনাই তার পরিচয় দেয়।

মার্কস 'ক্রনোলজি অব ইণ্ডিয়া'র সংকলন আরম্ভ করেন ১৮৮০ সালে, অর্থাৎ জীবনের শেষ দিকে। কিন্তু তাঁর পূর্বলিখিত অনেকগুলি বইতে, বিশেষ করে তাঁর বন্ধু ও চিরসঙ্গী এঙ্গেল্‌সের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় লিখিত 'নিউইয়র্ক ট্রিবিউন'-এর প্রবন্ধগুলিতে (মে-জুলাই, ১৮৫৩) এবং এঙ্গেল্‌সকে লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে দেখা যায় যে মার্কস তাঁর কর্মজীবনের প্রথম দিকেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেছিলেন।

ঐতিহাসিক বিকাশবিধির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতা মার্কস প্রাচ্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রচুর সময় অর্পণ করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করতেন এটা পৃথিবীর ইতিহাসের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির ইতিহাসের

সঙ্গে প্রাচ্যের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাঁর চোখে পড়েছিল। ভারতের ইতিহাস, অর্থনৈতিক জীবন, কৃষি-সম্পর্ক ও সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন।

তিরিশ বৎসর ধরে ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসের এই অনুসন্ধান, তাঁর 'ক্রনোলজিকাল নোট্‌স অন ইণ্ডিয়া'কে এক বিশিষ্ট সার্থকতা দিয়েছে। এর আলোচ্যকাল ৬৬৪-১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বাদশ শতাব্দী। এখানে মধ্যযুগের প্রারম্ভ থেকে মহান সিপাহীবিদ্রোহের পরাজয়ের পর ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত একটি প্রদেশে পরিণত হওয়ার দিন পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসের প্রধান স্তরগুলির শ্রেণী-বিভাগ ও সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে।

ক্রনোলজির প্রথম উনিশ পৃষ্ঠার আলোচ্য বিষয়বস্তু সিন্ধু উপত্যকায় আরবদের স্বল্পকালস্থায়ী অনধিকার প্রবেশ ও হিন্দুস্থানে যে সকল রাজবংশের উৎপত্তি বৈদেশিক (মধ্য-এশীয় ও আফগান) প্রথম সেই সমস্ত মুসলমান রাজবংশ-স্থাপনা। পরবর্তী তিন ভাগে (২২-১৬০ পৃঃ) মার্কস বিশদভাবে মহান মুঘল সম্রাটদের সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান, বিকাশ ও পতনের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ভারতে নানা আভ্যন্তরীণ শক্তি গড়ে উঠে মধ্যযুগের প্রথম ও শেষ ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র মুঘল সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা ভারতের রাজনৈতিক অখণ্ডতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছে। মার্কস এই প্রচেষ্টার বিফলতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটেছে বৃটিশ বিজয়ের আঘাতে। এর ফলে ভারতবর্ষ পুনরায় রাজনৈতিক ঐক্য লাভ করে, কিন্তু বৈদেশিক দাসত্বশৃঙ্খলের বন্ধনদশায়। এই স্তর সম্পর্কে মার্কস প্রভূত আলোচনা করেন ও ১৮৫৮ সালে পৌঁছে তাঁর নোট্‌স শেষ করেন। মার্কস ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনপদ্ধতির অমানুষিক চেহারা তুলে ধরেন ও বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ধ্বংসাত্মক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিণাম লক্ষ্য করেন।

ভারতীয় পাঠককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে পারে এমন দু'টি ধারার সুস্পষ্ট প্রবণতা ক্রনোলজিতে লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাসে যে আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ ভারতে রাজনৈতিক একতার জন্য কাজ করেছিল, অথবা করতে পারত, তাদের তুলে ধরবার জন্য মার্কসের প্রচেষ্টা। দ্বিতীয়ত, যেরূপ সম্পূর্ণভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মার্কস ভারতে বৃটিশ শাসনের বিস্তার অনুধাবন করেছেন তা লক্ষ্যণীয়। হিন্দুস্থানের বিশাল ভূখণ্ডের উপরে

অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সম্রাট আকবর যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপায় অবলম্বন করেছিলেন মার্কস তার বিষয়ে লিখেছেন "ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য" (১৫২৬-১৭৬১) এই শিরোনামায়। তিনি রাজস্ব, শাসনতন্ত্র, বিচার-বিভাগ ও সামরিক বিভাগের প্রধান সংস্কারগুলি বর্ণনা করেছেন, সংখ্যায় মুসলমান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর মধ্যে সমান সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আকবরের প্রচেষ্টার উপরে জোর দিয়েছেন ও আকবরের কেন্দ্রিকরণ ও ঐক্যনীতি সম্পর্কে তাঁর উচ্চ অভিমত প্রকাশ করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের প্রথম লক্ষণগুলি মার্কস তুলে ধরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন মারাঠার নবজাগ্রত অগ্রগামী শক্তির প্রতি, ভারতের সমস্ত অংশকে যে শক্তি পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু ফলত সেই যুগের অবসান সূচিত করেছিল। আকবর ও ঔরঙ্গজেবের নির্মিত সাম্রাজ্যের তখনও অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তার ভাগ্যলিপি চিরদিনের মত নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের বৃহত্তম অংশকে যে রাষ্ট্র ঐক্যবদ্ধ করেছিল তার অবসান প্রায় আসন্ন হয়ে উঠেছিল। নতুন ঘটনাপ্রবাহ সুনির্দিষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছিল। ক্রনোলজিতে বর্ণিত হয়েছে যে একদিকে মারাঠার ক্রমবর্ধমান জাতীয় পরাক্রম দেশের প্রধান শক্তিরূপে গড়ে উঠছিল, অপরদিকে বিদেশীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব, বিশেষ করে ইংরেজ বণিকদের, যারা উপকূলের বাণিজ্যাঞ্চলে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠছিল।

ভারতের অভ্যন্তরে ইওরোপীয়দের প্রবেশের প্রথম প্রচেষ্টাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করে মার্কস ভারতের ইতিহাসে ইংলণ্ডের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের এই বৃহত্তম অংশটির উপক্রমণিকায় সমগ্র যুগের একটি রেখাচিত্র পাওয়া যায়; এই যুগে সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষের সর্বত্র যে গৃহবিচ্ছেদের বহ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং যার পরিণতি হয় ১৭৬২ সালে পাণিপথ যুদ্ধে আহ্‌মদ শা'র হাতে মারাঠাদের পরাজয়ে, তার বর্ণনা এখানে স্থান পেয়েছে। ছিন্ন, খণ্ডিত দেশে তখন অনাহূত ইংরেজ অতিথিদের বিতাড়িত করবার মত ক্ষমতাশালী আর কোনও শক্তি রইল না। কিন্তু ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গে মার্কস দেখিয়েছেন যে পাণিপথ যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারতের সাধারণ দুর্বলতাই এই প্রভাব বিস্তারের

কারণ। কিন্তু ১৭৬৯ সালেই আবার সারা ভারতে অধিকার বিস্তারের জন্য মারাঠাজাতির সংগ্রামের পুনরুত্থান মার্কস লক্ষ্য করেছেন ও ১৭৭৩ সালে ইংরেজ যে গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল তার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারতে তখন বৃটিশের একচ্ছত্র শাসন বহুদূরে।

ইংরেজের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতবিজয়ের কাহিনী এই গ্রন্থের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করে আছে। নোট্‌সটিতে বিজিত দেশে বৃটিশের কার্যকলাপের বৎসরের পর বৎসর, মাসের পর মাস, এমন কি দিনের পর দিনেরও বিবরণ স্থান পেয়েছে। ক্লাইভ, হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিস, ডাল্‌-হাউসি প্রভৃতি ভারতে বৃটিশ-অধিকৃত ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলির স্বেচ্ছাচারী শাসকবৃন্দের চেহারা তাদের সমস্ত উলঙ্গ বীভৎসতায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ১৭৯৩ সালে বৃটিশ-প্রবর্তিত ভূমি-সংস্কারমূলক জমিদারী-প্রথাকে বাঙালী কৃষককে জমি থেকে উৎখাত করার উপায় ও অবশেষে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমভাগে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে প্রতিষ্ঠিত রায়তওয়ারি প্রথাকে কৃষককে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্ধ-ভূদাসে পরিণত করার উপায় বলে মার্কস বর্ণনা করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে যে সকল ভারতীয় রাষ্ট্র তখনও স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল, তাদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ক্রমাগত আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালাতে থাকে। ১৭৯৯ সালে মহীশূরের পতন ও মারাঠা রাজন্যবর্গের নিজেদের পারস্পরিক শত্রুতা প্রশমিত করে সাধারণ শত্রু ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সমবেত হবার শেষ চেষ্টা (যার ব্যর্থতা অবধারিত ছিল) নোট্‌সে লিপিবদ্ধ হয়েছে। অবশেষে ইংরেজই মারাঠাকে পরাজিত করল ও ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।

যে সকল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনার ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আয়ু নিঃশেষ হল ও ভারতের শাসনযন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশরাজের অধিকারে হস্তান্তরিত হল তারই বিবরণ রয়েছে ক্রনোলজির শেষাংশে।

নোট্‌সে দেখান হয়েছে কেমন করে সারা প্রাচ্যদেশে বিস্তারলাভের জন্য বৃটিশ ভারতবর্ষকে ঘাঁটিতে পরিণত করেছিল। নোট্‌সে আছে বৃটিশ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে শিখদের নির্ভীক সংগ্রামের কাহিনী, আর আছে প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের ও মধ্য এশিয়ায় বৃটেনের প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টার বিবরণ। সঙ্গে সঙ্গে নোট্‌সে বিবৃত হয়েছে ভারতে অনুসৃত বৃটিশ নীতির

জীবন্ত চিত্র, যার ফলে সম্ভব হয়েছিল ভারতীয় জাতীয় চেতনার প্রথম মহাশক্তিশালী প্রকাশ—১৮৫৭-৫৯ সালের মহান সিপাহী বিদ্রোহ।

গভর্নর জেনারেল মার্ক্‌ইস অব ডালহাউসির কার্যকলাপ বিচার করে ও তৎকর্তৃক সাতারা, বেরার, কর্ণাটক, আউধ ও অন্যান্য রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে মার্কস মন্তব্য করেছেন যে, অবসর গ্রহণ করবার আগে ডালহাউসি একটি বিবৃতি প্রস্তুত করেন, যাতে তিনি রেলওয়ে নির্মাণ, খাল খনন, টেলিগ্রাফ-কর থেকে আয় বৃদ্ধি, বিদেশী বাণিজ্যের বিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে অহংকার প্রকাশ করেন। মার্কস শ্লেষভরে মন্তব্য করেছেন যে এই স্পর্ধিত দম্ভের সমুচিত জবাব "সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৯)"। নোট্‌স শেষ হয়েছে এই বিদ্রোহ ও তার বিফলতার কাহিনী দিয়ে। এই বিফলতার কারণ ছিল এই বিদ্রোহে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী প্রধান সামাজিক স্তরগুলির মধ্যে অনৈক্য ও অভিজাত নেতাগণের জাতীয় আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

মার্কস তাঁর দূরদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে ভারতবর্ষ একদিন বৃটিশ শাসনের কবল থেকে মুক্তি লাভ করবে। ১৮৪০ সালের কিছু পরেই রুশদেশীয় পর্যটক সালতীকভ্‌ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছিলেন। ভারতবাসী সম্পর্কে তাঁর বর্ণনার উল্লেখ করে ১৮৫৩ সালে মার্কস লেখেন :

"সে যাই হোক, আমরা স্বচ্ছন্দে আশা করতে পারি যে অল্পাধিক দূর যুগে এই বিশাল ও চিত্তাকর্ষক দেশের পুনরভ্যুত্থান একদিন দেখতে পাব, যে দেশের শান্তস্বভাব অধিবাসীরা, এমন কি নিম্নশ্রেণীগুলিও, প্রিন্স সালতীকভের ভাষায় "ইতালীয়দের চেয়ে বেশি নিপুণ ও সুরুচিসম্পন্ন।"

১৮৮০ সালে মার্কস একজন উগ্রপন্থী রুশদেশীয় পণ্ডিতকে লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষে ঠিক একটা সর্বাত্মক অভ্যুত্থান না হলেও বৃটিশ সরকারের পক্ষে একটা গুরুতর জটিল অবস্থা ঘনীভূত হচ্ছে।

এই তিরিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে মার্কসের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য এতটুকু প্রশমিত হয়নি। ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি এই মহান বিপ্লবী ও মনীষীর গভীর সহানুভূতির আরও বেশি পরিচয় পাওয়া যায় অধুনা-প্রকাশিত ক্রনোলজিকাল নোট্‌স-এ। এই দেশের ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসের তথ্যানুসন্ধান বিজ্ঞানজগতে এক বিরাট অবদান।

আমাদের বর্তমান যুগেও মার্কসের ক্রনোলজিকাল নোট্‌স অন ইণ্ডিয়া গ্রন্থের একটা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সার্থকতা আছে। সেই সার্থকতার

একটা দিক এই যে, গ্রন্থটি ভারতের নবতম ইতিহাসের যে কোন ছাত্রকে সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে বৃটেনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের তীব্রতাকে বুঝতে সাহায্য করে। যদি বহু ইংরেজ ঐতিহাসিক, শুধু ইংরেজ কেন, অন্যান্য ঐতিহাসিকদের উপরেও আস্থা স্থাপন করতে হয় তবে ভারতবর্ষের পক্ষে বৃটিশ শাসনের অধীনে আসাকে একটা "স্বাভাবিক" বিকাশের পরিণতি বলে মেনে নিতে হয়। তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে বৃটিশ বিজেতাদের বিরুদ্ধে প্রকৃত প্রতিরোধ গড়বার ক্ষমতা ভারতবর্ষের কোনদিনই ছিল না। তাঁরা আরও বলতে চেয়েছেন যে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রগতির পথে পরিচালিত করার উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ ভারতবর্ষে কখনও গড়ে ওঠে নি। বৃটিশদের সম্পর্কে বলা হয় যে তারা আসার আগে দেশে যে বিশৃঙ্খলা ও দারিদ্র্য বিরাজ করছিল, তারই ফলে তারা ভারতবর্ষে ক্ষমতালাভ করে। মার্কস সর্বাধিক সত্যতার সঙ্গে দেখিয়েছেন যে, বৃটেন কর্তৃক ভারত জয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেড় শতাব্দী ধরে চলেছিল বর্বর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, বৃটিশের লুণ্ঠন, কোটি কোটি ভারতবাসীর অনাহার ও মৃত্যু। তিনি দেখিয়েছেন যে ইংরেজ তখন ভারতের জনগণের সর্বস্ব নিষ্ঠুরভাবে লুণ্ঠন করেছে। তিনি অনেকগুলি ভারতীয় রাষ্ট্রের (যথা মারাঠা, মহীশূর, শিখ পাঞ্জাব) নাম করেছেন, যারা বৃটিশের বিরুদ্ধে দুর্দম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল ও বহুবার ভারতে বৃটিশ শাসনের অস্তিত্বের পক্ষে আশংকাজনক হয়ে উঠেছিল। মার্কস দেখিয়েছেন যে, সিপাহীবিদ্রোহ উপনিবেশ স্থাপয়িতাগণের তথাকথিত "সভ্যতা প্রচার"-এর কার্যকলাপের উত্তর। এই পটভূমিকায় ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের প্রধান তথ্যটি সম্পর্কে এই পরিষ্কার শিক্ষালাভ করি যে ভারতের মুক্তি-আন্দোলন বৃটিশ-প্রবর্তিত পাশ্চাত্য ভাবধারার ফল নয়, বরং পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে তার ঔপনিবেশিক অত্যাচারের ফল। পরিশেষে, মার্কসের ক্রনোলজিকাল নোট্স ভারতে সমগ্র বৃটিশ শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে এক তীব্র ধিক্কারের কশাঘাত।

অনুবাদ: করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিক্রমা

সুরেশচন্দ্র সরকার

(১)

জঙ্গল পাহাড় আর ছোট ছোট গ্রামে গাঁথা দেশ
মালয়।
সারা পৃথিবীতে যোগান দেয় সে রবার, তেল আর টিন।
হাজার হাজার কুলির রক্তে উর্বর তার রবার বাগান;
টিনের খনির অন্ধকারে
নিরালোক তাদের জীবন।
মালয়ী, তেলেঙ্গী, বর্মী,
চীনা, বিহারী, মলয়ালী,
শতেক ভাষার মজুর খাটে
একই বিদেশী বণিকের কোড়ার ছায়ায়॥

এরও ওপরে আছে সুলতান আর রাজা
দোর্দণ্ডপ্রতাপ দেশী পরগাছার দল।
গ্রামের কুমারীদের হরণ করেছে
তাদের চরেরা,
ভেট পাঠিয়েছে
নিঃসঙ্গ রবার-মালিকের সৌখীন বন-ভবনে॥

প্রতিবাদ ভাষা পায়নি;
নিরুদ্ধ বোবা শোক
ঘনতর করেছে নিশ্বসিত অরণ্যের অন্ধকার;
মালয়ের নীল গিরিমালায়
বিষণ্ণ ছায়া ফেলেছে
দাসজাতির নিরানন্দ, বিষাক্ত জীবন॥

স্ফীতোদর বণিকের নিরাপদ এই নরকে একদিন
জাগল উপদ্রব।
এশিয়ার ক্ষুদ্র দ্বীপের সামন্ত-ধনিক রাক্ষসেরা
মহাচীনের নারী আর শিশুর রক্তে রঞ্জিত তাদের
লুব্ধ হাত দিল অতর্কিতে বাড়িয়ে।
এশীয় ব্যাঘ্রের একচ্ছত্র অধিকারের ঘোষণা নিয়ে এগিয়ে এল
কাগুজে বাঘ হিরোহিতো।
জবদ্গব শ্বেত শোষকের দল
প্রাণভয়ে ফিরে এল উর্ধ্বশ্বাস পলায়নে :
পিছনে পড়ে রইল শতাব্দীব্যাপী শোষণের হৃতস্বর্গ॥

(২)

ইওরোপে সেদিন চলেছে
বিভীষিকার তাণ্ডব।
অনার্য ইহুদী শিশুর নরম চামড়া ট্যান্ করে
তৈরি হয়েছে টেবিল বাতির সুদৃশ্য ঘেরাটোপ।
বিষবাষ্পের কামরায় নিরুদ্ধ হয়েছে
মানবীয় প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর।
রলাঁর রহস্যাবৃত মৃত্যু,
আরো কত শিল্পীর, কবির, বৈজ্ঞানিকের॥

তখন মহাকবি গ্যেটে আর দান্তের দেশে
অস্ত্রের কারখানায় খাটছে
বৃটেন, আমেরিকা আর ফ্রান্সের পুঁজি।
হত্যার আয়ুধ বেরিয়ে আসছে পলকে পলকে ঝাঁকে ঝাঁকে,
দারুণ বিষ্ফোরকে ধ্বংস হচ্ছে
বৃটেনের শ্রমজীবীর মাথা গোঁজবার ঠাঁই,
আঙুর লতায় জড়ান ফরাসী চাষীর পর্ণকুটির,
সুদূর আবিসিনিয়ায় সদ্য ঘুমভাঙা
বিস্মিত কালো মানুষদের নিরীহ গ্রাম॥

গোপন শর্ত তৈরি হয়েছিল
চেম্বারলেনের ছাতার আড়ালে, মিউনিকের দস্যু-সভায়।
নিজেরই দুধ-কলায় পোষা কাল সাপ
সে যেন তার সবটুকু বিষ ঢেলে দেয় শুধু
নবীন সোভিয়েটের ধমনীতে,
শোষণমুক্ত নব-সমাজের ইতিহাস যেন বিলুপ্ত হয়
পৃথিবীর বুক থেকে ॥

প্রথম মহাসমরের ঝড়ে বিধ্বস্ত
জার্মানির মধ্যবিত্ত জীবনে নেমেছিল
চরম হতাশার দিন।
ফ্রয়েডের রিরংসু দর্শন,
শ্মশ্রুল প্রাচ্য 'মহাত্মা'দের
স্বপ্নতন্দ্রাচ্ছন্ন জীবনবেদ,
রক্তশূন্য স্পেঙ্গলারের
মানব সভ্যতার হিমশীতল মৃত্যুসংগীত,
বাস্তবনির্ভর স্বচ্ছ প্রত্যয়ের ওপরে টেনে দিল
মধ্যযুগীয় সংশয়ের প্রগাঢ় অন্ধকার।
উদারপন্থার নয়নলোভন তকমা লাগিয়ে
নায়কহীন শ্রমিক জনতার তরীতে হাল ধরল এসে
জার্মান বিড়লার তৃতীয়পন্থী লুচ্চাতন্ত্র ॥

মধ্যবিত্তের বেকার বখাটেরা
যারা শিষ দিয়ে দিয়ে ফিরত
গণিকা-পল্লীর পথে পথে
আর গালভরা বক্তৃতা শুনত আজগুবী আর্যামীর,
তারা কেউ শোনেনি
গ্যেটে কিংবা শিলারের নাম,
শুধু ইহুদী বলেই
হাইনের কাব্যগ্রন্থের করল বহ্ন্যুৎসব

অসংকোচে বলাৎকার করল নিষ্পাপ কুমারীদের।
নিরংকুশ পাশবতাকে মানল
পৌরুষের অঙ্গ বলে॥

জার্মানির একচেটিয়া ধনিকের চর
দিশেহারা শ্রমিক জীবনে আনল চরম বিভ্রান্তি।
সুড়ঙ্গের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল দলে দলে
ঘৃণিত, রাত্রিচর জীব ;
মাতাল, কোকেনখোর, বেশ্যার দালাল,
গুণ্ডাগলির নাম করা কশাই-সর্দার,
অপদার্থ অধ্যাপক, কাপুরুষ বৈজ্ঞানিক,
বানিয়াদের রক্ষিতা কাগজগুলোর
'নির্ভীক জাতীয়তাবাদী' সম্পাদক।
রাতারাতি স্বস্তিক-চিহ্নিত পোষাকের মহিমায়
জেল-ফেরৎ ফেরেব্বাজরা হল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।
নির্বাসিত হলেন
বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যকার টমাস মান।
গভীর রাত্রে থানাতল্লাসীর পরোয়ানা এল
আইন্‌স্টাইনের নিভৃত পাঠকক্ষে।
বিহ্বল নরদেবতার অসতর্ক হাত থেকে
জার্মান সভ্যতার বল্‌গারশ্মি ছিনিয়ে নিল
মহাকায়, ক্ষুদ্রমুণ্ড নরকপি।
অবারিত হল
দ্রুতবেগ পতনের শোণিতপিচ্ছিল পথ॥

একটি অতিকায় কালো পতঙ্গ
তার বিরাট বর্মিত সাজের বিপুল ভার নিয়ে
বিদ্যুৎ-ঘড়ির লক্ষিত কাঁটার তালে তালে
যান্ত্রিক পা ফেলে ফেলে এগিয়ে গেল

পৃথিবীর সভ্যতা যেখানে নতুন করে ফুটে উঠেছে
ফুলের মত,
সৃষ্টিশীল কর্মের বিশাল মধুচক্রে যেখানে গুঞ্জিত হচ্ছে
বিশ্বের নবযৌবনের গান ॥

(৩)

প্রাচ্যের নিবিড়তম নরকে সেদিন
দুরবগাহ অন্ধকার ॥

সেখানকার কারুখচিত, স্বর্ণচূড় দেবালয়ের গোময়-পঙ্কিল প্রাঙ্গণে
বণিক-শুদ্ধান্তঃপুরের মহার্ঘবসনা, নগোদরী ষষ্ঠৌযীদের ভিড়।
কাঙাল কঙ্কাল হাতের তারস্বর বীথিকা পার হয়ে
দেশীয় রাজ্যের দয়ালু দেওয়ান চলেন
জগবম্পিত গঙ্গাস্নানে ॥

শহরের হোটেলে হোটেলে ভূরিভোজমত্ত
মার্কিন সিপাহীর হল্লোড়।
তারা হলিউডের জীবন্ত সিনেমা দেখে
প্রাচ্য রাজপথের কঙ্কাল জনতায়।
কলকাতার কঠিন কংক্রিটে এসে মাথা কোটে
ক্ষুধার নিঃশব্দ দাবদাহে ঝলসান দূর দূরান্তের গ্রাম।
কোথায় লেগেছে ঝড়,
আর তারই অন্তঃশিল প্রবাহে
বাংলার শ্যামল প্রান্তরে বয়ে গেল
জিরজিরে হাড় আর ছেঁড়া কাপড়ের
অহিংসা-বিমূঢ় শবস্রোত !
ক্ষুধিত পিঁপড়েদের মৎসর দৃষ্টিপাত থেকে
হাতির খাদ্যভাণ্ডারকে আড়ালে রেখেছিলেন
দণ্ডহস্ত যে সব অমায়িক অহিংসক,
তাঁরা তখন যেত বণিকের সম্মানিত রাজ অতিথি।

সাম্রাজ্যবাদের সামুহিক কবরখানা আর শ্বাসরোধী গ্যাস্‌-ঘর,
তাদের পরিহাস-নিক্ষিপ্ত দম্‌দম্‌ বুলেট
আর বিশ্বস্ত পাহাড়ী ফৌজের নির্বোধ পশুবাহিনী ছিল কেবল
বস্তী-বালিয়াব কৃষাণ-শহীদদের জন্ম,
মেদিনীপুরের হিংস্র 'গান্ধি-বুড়ী'
মাতঙ্গিনী হাজরার জন্ম ,
মাদ্রাজের ক্ষুধিত জনতার কিশোর কমিউনিস্ট নেতা
কায়ুর ভ্রাতাদেব জন্ম,
প্রগতিশীল মানব-সত্যের নির্মল ধারায় রক্ত আর পাঁক গুলতে
রাজি হননি যাঁরা
চীন আর সোভিয়েটের সেই সব অমর মানুষদের জন্ম ॥

দেশে দেশে তখনো নির্বোধেরা তারিফ করছে
ইঙ্গ-মার্কিনের হাত ফসকানো সেই উজ্জীবিত শব,
ফ্র্যাংকেনষ্টাইনের ।
বনেদী কলকাতার এঁদোগলির সাত্ত্বিক রেস্তোঁরায়
গদ্‌গদ দেশভক্তের মুখে ফুটছে থুতু ভিজনো খই ।
আবিষ্কার করেছে সে নাৎসীবাদী কল্কিকে ।
হিট্‌লারের কাছে ম্লান হয়েছে তখন
শিবাজীর বীরখ্যাতি ।
সেই বোঁচা-গোঁফ তেড়িবাগানো বর্বর নাকি
ত্রাণকর্তার নবতম অবতার
বৈষ্ণব গোবিন্দবল্লভের গান্ধি-স্তোত্রে
নরপশু সম্মানিত হয়েছে উপমানের গৌরবে ॥

বিশীর্ণ কেরানিকুল তখন গল্প করে পান খেতে খেতে
জাপ-অধ্যুষিত মালয়-ব্রহ্মে কেমন
শস্তা জাপানী মালের রাম-রাজত্ব ;
চীনেব হত্যাকারী জাপদস্যুর
ভারত-প্রেমের জোর গুজব রটে
হাটে-বাজারে ।

অন্ধ নিবীর্য বৃটিশ বিদ্বেষের সঙ্গে মিলেছে
পঙ্গু গর্ভদাসদের বিচিত্র জাপ-জার্মান পিরিতি ॥

ফৌজী ঠিকেদারির এঁটোপাত কুড়িয়ে
মেয়ে ঘুগিয়ে আর মড়া খেয়ে
মোটা হল ঘনশ্যামদাস আর রামকৃষ্ণের দল।
ইস্পাহানী আর কাশেমদাদারাও
জাতে উঠল সেই দুর্ভিক্ষের শবভুক্‌ সুপুষ্ট নেড়ী কুত্তাদের সঙ্গে।
ভাবী 'আজাদী'র দুই স্তম্ভের
পাকা বনিয়াদ গাঁথল বিদেশী জালিম
স্বেচ্ছাসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের অশ্রু আর রক্তে।
নির্জন গলির নিরাপত্তায় আইন ভাঙলেন
যে অসম-সাহসী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহী,
অনায়াসে নেমে এলেন তিনি
কাঁকর আর তেঁতুল বীচির বেনামী বাণিজ্যে।
"গান্ধি-সংবাহন মন্দিরে"র রেওখানায় আজ
নিযুক্ত হয়েছে যাঁর বাঁ হাতের পুঁজি,
আর অকলঙ্কিত ডান হাতখানা জপে চলেছে কেবল
রঘুপতি রাঘবের পুণ্যনাম ॥

রোমাঁ রলাঁকে ভাঙিয়ে খেলেন এতদিন
যে আন্তর্জাতিক শান্তিবাদী অধ্যাপক,
ফাসিস্তির সঙ্গে গোপন যোগাযোগের অভিযোগে
তিনিও হলেন সৌখীন রাজবন্দী
আর তখনই হয়ত তাঁর নতুন মনিব
ফ্যাসিস্টদের বাষ্পকক্ষে
তাঁরই একদা-আরাধ্য রলাঁকে হত্যা করা হচ্ছে
ধীরে সুস্থে শ্বাসরোধ করে ॥

বিশ্ববিখ্যাত ভাষা-বৈজ্ঞানিক
ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নিগ্রো-শিল্প আর চিত্রকলায় যিনি ছিলেন

উদার মানব-তীর্থের মুগ্ধ পথিক,
প্রাক্‌-সমর ইওরোপ ঘুরে এসে তিনি গাইলেন
বিশ্ব ঠগীতন্ত্রের শখের যাত্রার ভীম, ফুহ্‌রেরের গুণকীর্তন !
আজ সবচেয়ে নিরাপদ তাঁর রাজনীতি,
—সাভারকরের হুংকৃত হিন্দুয়ানীর।
আজ সবচেয়ে জঘন্য তাঁর অপরাধ,
—নারী হত্যায় কলুষিত নীরবতার ॥

(৪)

পদদলিত ইওরোপের অগণিত দাস-অক্ষৌহিণী
আরীবীজের সচল ভাণ্ডার আর বোধ কবরের যন্ত্রচালিত খনিত্র নিয়ে
ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সোভিয়েটের বুকে।
নারী আর শিশুদেহের সুলভ চর্বি
বার্লিনের পতিগরবিনীদের যোগাল রতিস্নানের সাবান।
ঋষি টলস্টয়ের শান্তিময় পাঠাগারে
কুষ্টিগর্বী আর্যপশুর দল বানাল পায়ু-গৃহ।
গ্রামের পর গ্রাম হল ভস্মস্তূপ।
সুনিশ্চিত বিজয়ের আশায় চেম্বারলেনের প্রাক্তন সুহৃদ্‌
চালাও হুকুম দিল পাইকারি খুনের ॥

দ্বিতীয় সীমান্ত খোলবার টালবাহানায়
কেটে গেল চরম বেদনাময় বীভৎস দিন।
রাতের বাদুড় হেস উড়ে এল শ্বেতদ্বীপে
গোপন পরামর্শের দৌত্যে।
শিশু সোভিয়েটকে যাঁরা সাবাড় করতে পারেননি তার আঁতুড়ে,
ঊর্ধ্বগ্রীব বেহায়াপনায় দিন গুনতে থাকলেন।
ষাঁড়ের শত্রুকে খায় তো খাক্ না বাঘ,
শুক্ত রণাঙ্গনের অসপত্ন মাতঙ্গরা আসুক
হাতের মুঠোয় ॥

দুর্গন্ধস্রাবী পঙ্কিল পশুবন্যা
মস্কোর নির্মল মানব-প্রাকারে ব্যাহত হল।
ধনবাদের অভিচারে দানো পাওয়া শব-বাহিনী
অবিনশ্বর স্টালিনগ্রাদের কবরে পেল
অন্তিম সদ্‌গতি।
মার্কিন আর বৃটেনের বণিক সেনাপতিরা যখন
মাদাগাস্কারের বনে বনে নিয়েছেন
বানর-শিকারী বানপ্রস্থ,
তখন স্টালিনের মৃত্যুঞ্জয়ী সন্তানেরা
দেশে দেশে মুক্তি আর স্বাধীনতার অজস্র প্রাণ-বর্ষণে
বার্লিনের পথে অগ্রসর হল
সেই মৃত্যুভয়বিহ্বল, বিকারগ্রস্ত, বিবরাশ্রয়ী পশুকে
জীবন্ত ধরবার জন্য॥

চরম নৈরাশ্যে মার্কিন বুলিট্ বলল,
আর নয়!
দাঁতে দাঁত ঘষে ইংরেজ চার্চিল বলল,
আর নয়!
শয়তানীর বাঁধ বাঁধো এই বিপ্লাবিনী মানব-বন্যার মুখে,
গেল ইওরোপ!
গেরিলাদের নিরস্ত্র করে হাতিয়ার তুলে দাও গুণ্ডাদের হাতে,
গেল সভ্যতা!
গেল সভ্যতা! গেল ব্যক্তিস্বত্বের অধিকার!
অত্যাবশ্যক যে সভ্যতা, কোকাকোলা আর চিবনো গঁদের
পবিত্রতম যে অধিকার, শ্রমজীবীর শোণিত-মোক্ষণের

সুতরাং
বিদ্যুৎ গতিতে খুলে গেল এবার দ্বিতীয় সীমান্ত।

তবু বার্লিনের বিধ্বস্ত আর্যামীর স্তূপে উড়ল
মানবাত্মার অপরাজেয় নিশান।

প্রতিহিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর কদর্য ঐক্যতানের মধ্যে শোনা গেল
ক্রেমলিনের সেই আশ্চর্য মানবীয় কণ্ঠস্বর :
"যুদ্ধোন্মাদ পশুরা আসে, আবার তারা চলে যায়,
কিন্তু চিরজীবী এই জার্মানির জনগণ ॥"

(৫)

অক্ষশক্তির একচাকা-ভাঙা রথ তখন এশিয়ার বনে বাদাড়ে
খোঁড়া কুকুরছানার মত কেৎরিয়ে হাঁটে।
গেরিলার হাতে তোজোর গোলামেরা খায়
গাধার মার ॥

জাপানের আতঙ্কিত বণিক গোষ্ঠী অবশেষে
মাঞ্চুরিয়ায় পাঠায় তার অন্তিম রণ-সম্বল।
প্রশান্ত পারের মহাশ্রেষ্ঠীরা আসুক,
সমুৎপন্ন সর্বনাশের গ্রহশান্তি হোক
আংশিক ত্যাগধর্মে,
আপাতত স্থগিত হোক রুশীয় রক্তবন্যার অমোঘ বিস্তৃতি
স্বপ্নভঙ্গের নৈরাশ্যে মারমুখো জনতার চেতনাকে
আবার দেব ঘুমিয়ে,
মার্কিন বণিক-সেনানীর সহায়তায় আসুক
অনুকূল সেই মুহূর্ত ॥

বাবু-বিবর্জিত শ্রমিক রাষ্ট্রের কঠিন হাতুড়ির ঘায়
গুঁড়ো গুঁড়ো হল জাপানী বাবুদের
শখের সংশপ্তক-বাহিনী।
াবুরাই শাসিত জাপানের শীর্ণ মায়েদের মুখে নামল-
আসন্ন রণ-বিরতির প্রশান্তি ॥

আর সেই মুহূর্তেই নীল শূন্য থেকে নেমে এল
অতর্কিত প্রলয়।

লক্ষ লক্ষ শিশু আর জননীর দেহভস্ম
রেণু রেণু হয়ে মিশে গেল পৃথিবীর উদাসীন বাতাবরণে।
ধূম্রচ্ছায়ার অপসারণে দেখা গেলো
জাপানের সুন্দর দ্বীপ-উপবনে
মার্কিন বণিকের সোনা-বাঁধান দাঁতের ঝলক॥
মৃত হিটলারের কবন্ধ
ওয়াশিংটনে পেয়েছে নব কলেবর॥

(৬)

এদেশের জেলে জেলে চলছে তখন
নৈরাশ্য আর আতঙ্কের চাপা গুঞ্জরণ;
ভারতবর্ষে বিক্ষোভ [illegible] দিন,
বিস্ফোরক প্রতিটি মুহূর্ত॥

তিলক-কাণ্ডে,
চৌরিচৌরায় আর চম্পারণ্যে
বার বার যাঁরা দিয়েছেন অহিংসক আনুগত্যের প্রমাণ,
স্টালিনগ্রাদের বজ্রগম্ভীর দিনে বেছে নিলেন তাঁদের
চিরাভিলষিত মোক্ষমার্গ॥

উদার ওয়াভেলকে জানালেন জন্ম-গোলামেরা
ভারতের অহিংসক ঐতিহ্য,
ভারতের অনমনীয় জড়বাদ-বিরোধিতার ইতিহাস।
আগস্ট-হিংসার সর্ববিধ দায়িত্ব চাপালেন সর্বংসহ ভারতীয় চাষীর কাঁধে॥

চতুর বণিক চকিতে বুঝলেন সব।
লোক-দেখানো দর কষাকষির সভায়
মুক্তি পেলেন বৈষ্ণবের দল
বিয়াল্লিশের বেওয়ারিশ মহিমায় ভাস্বর হয়ে॥

তারও পর এল কতো না রক্তাক্ত দিন
যুগান্তরের আভাস নিয়ে।
এল বোম্বাইয়ের নীল সমুদ্রে
বিদ্রোহী নাবিক-রক্তের জোয়ার ;
অহিংসক দ্বি-জিহ্বেরা তাঁদের আশ্বাসিত করে সঁপে দিলেন
বিদেশী শত্রুর রক্তকলুষিত হাতে।
ছাত্রদের বুকে বিঁধল বুলেট ভিয়েৎনাম দিবসে,
চণ্ডভোজী নেতারা তাঁদের নাম দিলেন, গুণ্ডা॥

সুদূর ব্রহ্মে নির্বাসিত বাহাদুর শা'র
অবজ্ঞাত গরীব গোর থেকে
একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বয়ে গেল
অহিংস হেড-কয়েদীদের মাথার ওপর দিয়ে।
কোটি কোটি নির্যাতিতদের বেদনার সঙ্গে মিশে
সেই দীর্ঘনিশ্বাস পেল একটা ঝড়ের চেহারা।
হিন্দু মুসলমানের মিলিত হৃদয়ের একটা উদ্দাম চলোর্মি
টলিয়ে দিল বিদেশী শাসনের ভিত।
গঙ্গোত্রী থেকে কুমারিকা পর্যন্ত শোনা গেল
একটি ক্রোধোদ্দীপ্ত রণ-ধ্বনি,
দিল্লী চলো॥

ভারতের বিহ্বল জনতার পায়ে
নতুন শিকল পরাবার ভার নিয়েছেন যাঁরা
দ্রুত নেপথ্য আলাপে স্থির করে নিলেন
তাঁদের করণীয়।
চলল মান-অভিমানের অভিনয় ;
তারপর
রামনামের নামাবলী-আঁটা উল্লসিত রাক্ষসের দল
বিদেশী যক্ষের চর্বিতশেষ হাড়ের টুকরো পাবার আশায়
ছড়াল অজস্র স্তোকবাক্যের বর্ষণ।
শোনা গেল আশ্বাস,

বিজলীর থাবায় কালো বাজারীর লাশ ঝুলবে।
বিলুপ্ত হবে নারকীয় সামন্ত শাসন।
স্বীকৃত হবে শ্রমিকের সুখী জীবনের অধিকার।
অবিভক্ত থাকবে
অশোক আর আকবরের ভারতবর্ষ॥

(৭)

হায় স্বপ্ন! ধর্মীয় দাঙ্গায় রক্তনদী সাঁতরিয়ে,
উদ্বাস্তর স্রোত পার হয়ে, কলঙ্কিত কমনওয়েলথের গোলামী নিশান উড়িয়ে,
এল বিদেশী বণিকের নতুন ডাণ্ডাবেড়ী।
দ্বিধা-বিভক্ত বাংলায় আর পাঞ্জাবে,
দেশীয় রাজ্যের সামন্তী নরকে
অভিনব কায়দায় কায়েম হল সেই বৃদ্ধ পুরুভুজের
শোণিতপায়ী শোষণ-বাহু॥

বিজলীর থাবায় ঝোলে আজ
বেকার উদ্বাস্তর শব,
অন্নের দাবিতে ক্ষুধিত চাষীর ঘর পোড়ে,
শত শত ক্ষুদিরামকে খুঁজে বেড়ায়
সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবহ শয়তানের ফাঁসিকাঠ,
দিন দুপুরে লুটোয় কুলস্ত্রীর
বুলেট-বিচূর্ণ রক্তসিক্ত মাথা
কলকাতার প্রকাশ্য রাস্তায়॥

বুড়ো, যেয়ো সেই পুরুভুজের
বিষস্রাবী স্নিগ্ধ কপালে আজ
পবিত্র গান্ধিভস্মের পুরু আস্তরণ।
সারিপুত্ত আর মোগ্‌গল্লায়নের হাড়ের মাদুলীতে
সাত্ত্বিক হয়ে উঠল তার নড়বড়ে শরীর;
সহস্রাব্দস্থায়ী বুদ্ধের দাঁতে বাঁধাই হয়ে
নবযৌবন ফিরে পেল তার দশন-পংক্তি॥

সেই নারকীয় দানবের
চা-বাগানে, ট্রামে, স্টিমারে, চটকলে আজ আর
শোণিত ক্ষরণের বিরাম নেই।
শ্রমিকদের দেহে বিঁধছে তারই বশম্বদ গোলামদের
অহিংস্র সঙ্গীন।
ব্রহ্মে, মালয়ে, কোরিয়ায়
তারই বৈতনিক ঘাতকদের সাহায্য পাঠায় আজ
দুর্ভিক্ষ পীড়িত পাক্-ভারতের
স্বাধীন জনাব আর পালের দল॥

কোরিয়ায় যখন
বীর শোণিতের গলিত লৌহস্রোতে
পুড়ে মরছে পৃথিবীর দস্তুর পশুরা,
জাতি সংঘের সভায় শোনা যায় এশিয়ার নির্লজ্জতম ক্রীতদাসদের
সুললিত 'ধর্ম'-ভাষণের ভণ্ডামি।
শোনা যায় বনমহোৎসব রামগীতি
উপবাসীর অস্থি বিকীর্ণ প্রান্তরে;
শোনা যায় ইসলামি তমদ্দুনের আস্ফালন
নাঙ্গা কাফেরদের
লা-হোশ কবর-ই-স্তানে॥

(৮)

তবু সংগ্রামের ডাক দিয়েছে মালয়;
রাতের ছায়া ঢাকা, টাইফুনের হাওয়ায় দোলান,
অজাগর অরণ্যের মালয়॥
টিনের খনির নিরালোকে,
রবার বনের অন্ধকারে
সন্ধানী চোখের মণি জ্বলে॥

আজ পঞ্চাশ লক্ষ মালয়ীর জীবনে এনেছে নরক
বোর্নিয়োর আদিম নরখাদক।

একলক্ষ সৈন্যের বর্মিত মারণ-বাহিনী আজ
আলায় নিরন্ন গ্রাম।
ঘুমন্ত মায়ের বুকে তারা
ঘুমন্ত শিশুকে গাঁথে সঙ্গীনে।
স্কুল থেকে বই হাতে ফেরে কিশোর;
আততায়ীর কৌতুক-নিক্ষিপ্ত আগুনে
জ্বলে ওঠে তার নিষ্পাপ দেহ॥

তবু বেড়ে চলে উদ্ধত, উদ্দাম, অবাধ গণ-সংগ্রাম॥

দূরে দূরে গ্রাম।
রাতের অন্ধকারে বাঁশী বাজে।
বাঁশীতে বেজে ওঠে প্রত্যুত্তর।
সেই বাঁশীতে আজ আর নেই
প্রাচ্যের সেই চিরকেলে করুণ সুর।
রবার-বাগানের ভয়াতুর শূকরেরা
বিষয়ে মূর্ছিত হয় সেই বাঁশীর আওয়াজে॥

রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দ সঞ্চারে কারা হাঁটে।
পোড়ে শত্রুর ভয়বিহ্বল ব্যারাক ঘর।
ওলটায় গোলাম-বাহিনীর বর্মিত ট্রেন।
অব্যর্থ বুলেটে মাটি নেয় বোমারু বিমান॥

ভোরের পাংশু আলোয়
গণপতির ক্ষুধিত ফাঁসিকাঠের হিংস্র ছায়া নামে
পাকা সাহেবদের পাণ্ডুর জীবনে।
হোটেলের বেয়ারার কুর্নিশে কোটে
অনাবৃত ব্যঙ্গ;
কুলির বিনীত হাসির পিছনে উঁকি দেয়
ছুরির ঝলক॥

এখানে বিপর্যস্ত হল
এশিয়ার বিকট পুরুভুজ।
এখানে ব্যর্থ হল
যোগ পলায়নের হাড়ের ভেলকি।
এখানে ভোঁতা হলো কুমিরের
যৌবনামাখিত জাল দাঁত।

(১)

যদিও কোরিয়ায় অসম-সংগ্রামে ঝরে আজ
নির্ঝারিত রক্তস্রোত,
লক্ষ টন বোমার বিস্ফোরণে
গ্রাম নগরীর চূর্ণ রেণু আজ শূন্যাশ্রয়ী,
তবুও ইতিহাস মুছবেনা তার অমোঘ অভিশাপ-লিপি॥

আজ সপারিষদ নিগ্রোভুক রাক্ষস
যদিও অবারিত করেছে তার লোলুপ দশন-পংক্তি,
শান্তিপ্রিয় মানুষের লেলিহান ঘৃণার শিখায়
নিঃশেষে ছাই হয়ে যাবে তার
অভ্রভেদী দম্ভের প্রাসাদ॥

যুগ-যুগান্তরের রাত্রির তপস্যায়,
অপরিমাণ অশ্রু আর রক্তের মূল্যে-
জন্ম নিল আজ
নতুন মানুষের পার্থিব স্বর্গলোক।
লোভের লালাস্রাবী হানাদার রোমশ জন্তুর
বিষ-দংষ্ট্রাকে উপড়ে ফেলবার জন্য প্রস্তুত রয়েছে
সমস্ত পৃথিবীর চিরবঞ্চিতের দল।
উষ্ণ বর্মশোণিতের পরিখায়
পাহারা দেয় তারা ঐ নবজাতকের।
ক্ষুধার্ত হাড়ের ব্যারিকেডে অতন্দ্র তাদের
প্রতীক্ষায় মহৎ মুহূর্তগুলি॥

ধনীর ঈশ্বরের দয়ার মহিমা তারা শুনেছে অনেক ;
মায়াবিনী আলেয়ার পিছনে
নষ্ট হয়েছে অনেক অমূল্য প্রাণ ;
আজ বাস্তবের বিশ্বস্ত নির্ভর পেল তাদের
শ্রমবলিষ্ঠ পদযুগ।

যদিও পলায়নপর অন্ধকার
এখনো ছড়াবে অনেক বিভ্রম,
আর ছলহস্ত দিঙ্‌নাগের দল
উদিত সূর্যের রক্তিম তোরণে দোলাবে
সংশয়ের কুহেলিকা,
তবুও নিশ্চিত জানি
শোণিতবর্ণ অক্টোবর বিপ্লবের নিশিত শায়কে ছিন্ন হবে
সেই মুমূর্ষু ডাকিনীর অন্তিম ইন্দ্রজাল॥

পৃথিবীব্যাপী শান্তি-সংগ্রামের বেড়া আগুনে
তারস্বর বিলাপ শোন আজ
আতঙ্কিত যুদ্ধ-দানবের !
তবুও স্পর্ধিত পাপের নিরুপায় স্কন্ধে চাপাব আমরা
আবশ্যিক শান্তির জগদ্দল পাষাণ।
ব্যর্থ করব সেই যুদ্ধ জরদ্গবের
শেষ মাংসাহারের সাধ॥

অতল কুম্ভীপাকের অন্ধকার থেকে
মরীয়া পশু কি শুনতে পায়
বিদেহী হিটলারের নিঃসঙ্গ আত্মার আহ্বান ?
জনতার উদগ্র ঘৃণার ফাঁসিকাঠ
অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে আজ
যুদ্ধাপরাধীদের শেষ বিচারের দিন॥

আমাদের মুক্তিযজ্ঞে রোরুদ্যমান বলির পশুকে
আবদ্ধ করবে যে শৃঙ্খল
দেশে দেশে জনতার
মুক্তি-সংগ্রামের কর্মশালায়
দিনে দিনে গড়ে উঠছে তার
একটির পর একটি দুশ্ছেদ্য গ্রন্থি॥

ইজ্জৎ

বরেন বসু

নরেশবাবুর ছেলে দপ্তরীর লিও ডেকাম্বিতে ভর্তি হয়ে আজ জয়েন করেছে।

ডিপার্টমেন্টের পক্ষে এটা একটা অভিনব ঘটনা। কেরানীর ছেলে কেরানী হয়েই চাকরিতে ঢোকে। কিন্তু কেরানীর ছেলে দপ্তরী! নরেশ-বাবুর সমবয়সী বড়বাবু বললেন, নরেশের নিশ্চয় মতিভ্রম ঘটেছে কখন যে চুপিসাড়ে বড়-সাহেবকে বলে কয়ে কাজ সেরে নিয়েছে, আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি—।

ঘটনাটা শুধু যে অভিনব, তা নয়, আকস্মিকও! কলকাতায় চলেছে দাঙ্গার তাণ্ডব—নতুন ধরনের দাঙ্গা—এক পক্ষ মুখ বুজে মার খাচ্ছে, আর অপর পক্ষ নির্বিবাদে কাজ হাসিল করে চলেছে। পাকিস্তানের খবরের উপর কলকাতার দাঙ্গায় জোয়ার ভাঁটা খেলছে। সন্ত-আগত বাস্তুহারার মর্মন্তুদ কাহিনী মুখে মুখে ছুটে বেড়াচ্ছে—এ হেন সময়ে নরেশবাবুর এই কীর্তি।

জহরবাবুর চাকরি প্রায় কুড়ি বছর হল—অনেক ঝুটঝামেলায় ধাক্কা খাওয়া মানুষ তিনি। বাড়ি থেকে ডিবে ভর্তি পান নিয়ে আসেন—ডিপার্টমেন্টশুদ্ধ লোকের তাতে সমানাধিকার। রসিকবাবু, জহরবাবুর পকেট থেকে পানের ডিবেটা বার করে পরপর দুখিলি মুখে পুরে, আঙুলের ডগায় একটু চুন নিয়ে বললেন, শুনেছেন খবর?

জহরবাবু চেয়ারের উপর খাড়া হয়ে বসে রসিকবাবুর দিকে ফিরে তাকান। রসিকবাবু মুখটা নামিয়ে জহরবাবুর কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে সমস্ত খবরটি সবিস্তারে জানান। বেঁটে ছোট খাটো মানুষ জহরবাবু বেশ চট্ করে লম্বা হয়ে যান, এ্যাঁ বল কি হে!

রসিকবাবু বললেন, ওইতো স্বচক্ষে দেখে চক্ষু সার্থক করুন ওই যে, ছোট দপ্তরী নাদেরের পাশে বসে রয়েছে।

অহরবাবুর চোখ তখনও গোলাকার—ঘুরিয়ে দেখে চমকে ওঠেন, 'ওরে শালা, এ যে রাজপুত্তুরের মত চেহারা—এমন একটা ছেলে পেলে আমি তো জামাই করতেও রাজি।

রসিকবাবু নিজের সিটে যেতে যেতে বলেন, তাহলে সেই চেষ্টাই দেখুন অহরবাবু, তাতে ছোঁড়াটারও একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

অহরবাবু আপন মনেই শিউরে ওঠেন, আরে ছি: ছি: ছি:—এতো বড় ভয়ানক কথা হল—হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ান, এতো দেখছি আমাদের জব্দ করার মতলব!

নতুন চাকুরে ছোকরা অজয় পাশের সিট থেকে বলল, এতে আপনি জব্দটা হলেন কোথায় অহরবাবু?

জব্দ হলুম না? আলবৎ জব্দ! নরেশের ছেলেকে কি আর দপ্তরী বলে হাঁক পাড়তে পারব, না দুটো গাল মন্দ দিতে পারব? কাজ করবে দপ্তরীর, তবুও তাকে 'মশাই মশাই' করতে হবে—

অজয় বললে, একটা মানুষের সঙ্গে একটু ভদ্রভাবে কথা বলার মধ্যে এমন কি কষ্ট অহরবাবু!

অহরবাবু আবার সিটে বসে পড়েন। আড় চোখে নরেশবাবুর ছেলের দিকে বারেক চেয়ে দেখে আবার পানের ডিবে খুলে বসেন, হঠাৎ কি যেন তাঁর মনে হয়, উঠে অজয়ের পাশে গিয়ে তার হাতে একটা পান দেন। কলম নামিয়ে অজয় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। অহরবাবু ঝুঁকে পড়ে ফিস্ ফিস্ করে বলেন, আহা কি চেহারা! ওই চেহারার জন্যেই ওর একটা ভাল চাকরি হওয়া উচিত। হত এটা সাহেবদের আমল, দেখতে ওর নিশ্চয়ই একটা ভাল চাকরি হত!

ছোট সাহেবের স্টেনোগ্রাফার রমণীবাবু উত্তেজিত ভাবে সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সৌখিন লোক তিনি, কাপড় দুর্ভিক্ষের সময় থেকে স্যুট পরেন। তবে স্যুটই তিনি পরেন—চাঁদনি থেকে সেরদরে প্যাণ্টকোট কিনে গলিয়ে ঝুলিয়ে বেড়ান না। রসিকবাবু টেবিলের সামনে এসে প্যাণ্টের ক্রীজটা টেনে দিয়ে, কোটের কলারের উপর টুস্‌কি মেরে বললেন, নাও প্রেস্‌টিজ্ লস্ট—

রসিকবাবু প্রশ্ন করলেন, ছোট সাহেব কিছু বললেন নাকি?

সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। রসিকবাবুও টেবিলে

আরও জনকয়েক এসে জমা হয়েছেন। শশধরবাবু ঝুঁকে পড়ে বললেন,—কি বললেন ছোটসাহেব ?

পাশের টেবিল থেকে অহরবাবু আর অজয়ও উঠে এসেছে। রমণীবাবু কাঁধ কুঁচকে হাত দুটো এলিয়ে দিয়ে বললেন, আর কি। হিতোপদেশ—দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথা—অর্থনৈতিক সংকটের কথা—মানবতার কথা—উনি যে আজকাল একজন নিও-হিউম্যানিস্ট—

অজয় বলে উঠল, মোদ্দা কথাটা কি ?

রমণীবাবু বললেন, মোদ্দা কথা হচ্ছে, এক কথায় উনি বুঝিয়ে দিলেন, কেরানীর ছেলে এখন থেকে দপ্তরীই হবে—'

অজয় আবার বলে ওঠে, সাহেব বোধহয় খুব খুশি হয়েছেন—না রমণীবাবু ?

রমণীবাবু চোখ কুঁচকে বারেক অজয়ের দিকে চেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেন—সাহেব-সুবো সম্বন্ধে ঠাট্টা রসিকতা তিনি পছন্দ করেন না।

অহরবাবু ফুঁসে উঠলেন, নাঃ, নরেশটা দেখছি মুখে চুনকালি লেপে দিলে হে। এতো বড় ভয়ানক কথা হল।

রসিকবাবু বললেন, তাতো হলই—ইজ্জৎ তো ঘোলাটে হয়ে গেল ! সাহেব-সুবোরা কি আর খাতির রেখে কথা কইবে ভাবছ ?

শশধরবাবু বলেন, সাহেব-সুবোর খাতির তো অনেক পরের কথা—ওই নেড়ে দপ্তরীই কি আর আমাদের কেয়ার করবে ?

দপ্তরীর টেবিলে সকলেরই নজর ঘুরে যায়। নাদের হুমড়ি খেয়ে পড়ে নবনিযুক্ত দপ্তরী শ্রীসন্তোষ কুমার ব্যানার্জিকে প্রচুর আবেগ ঢেলে কাজ শেখাচ্ছে। দুজনে প্রায় সমবয়সী—বসেছে ঘেঁষাঘেঁষি—হাসছে, গল্প করছে।

অজয় বললে, বাঃ, ওদের দুজনের মধ্যে বেশ আলাপ জমে উঠেছে তো।

রসিকবাবু তেড়ে ওঠেন, তা জমবে না ! তা জমবে না। তা না হলে ইজ্জৎটি আর ধুলখলে হবে কেমন করে। কেমন জমেছে—নেড়ে দপ্তরীর আণ্ডারে-ব্রাহ্মণ সন্তান দপ্তরীর কাজ শিখছে—

শশধরবাবু টেবিল ঘেঁষে এসে বললেন, নেড়ে উড়ে নিয়ে কথা হচ্ছে না—কথা হচ্ছে নরেশবাবুর ছেলের এ ডিপার্টমেন্টে দপ্তরীর কাজ করা চলবে না—

রমণীবাবু প্যান্টের পকেট থেকে হাত বার করে টেবিলের ওপর ঘুঁষি মেরে বললেন, ছাট্‌স্ দি পয়েন্ট—

রসিকবাবু বললেন, আমাদের বড় দপ্তরী ফিরছে কবে ?

শশধরবাবু বলে ওঠেন, সে আর ফিরেছে। পাকিস্তানে গিয়ে লুটেপুটে এতদিনে সে একটা নবাব বাদশা হয়ে বসেছে—দেখুন, হয়ত ডজন-খানেক হিন্দু বেগম বানিয়ে ফেলেছে।

রসিকবাবু সমর্থন করলেন, কিছু আশ্চর্য নয় মশাই—ওরা সব পারে। দেখেছেন আজকের 'যুগান্তর'—ওঃ পড়তে পড়তে যেন খুন চেপে যায়।

রমণীবাবু স্মরণ করিয়ে দেন, ওটা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়—কথা হচ্ছে, বড় দপ্তরী ফিরবে কিনা ?

শশধরবাবু বললেন, ডেকে জিজ্ঞেস করুন না ছোট দপ্তরীকে।

সঙ্গে সঙ্গে রসিকবাবু হাঁক পাড়লেন, দপ্তরী—।

অজয় চমকে উঠে বললে, আহা, আবার 'দপ্তরী' কেন—নামটা ধরে ডাকলেই তো হত—

নাদের আর সন্তোষ দুজনেই এসে হাজির হল। শশধরবাবু বললেন, আহা-হা, তুমি কেন, তুমি যাও—

সন্তোষ বললে, ওই যে—ডাকলেন যে—

শশধরবাবু বললেন, না না, তোমাকে না—নাদেরকে। নাদেরকে কাছে ডেকে বললেন, বড় দপ্তরী কবে ফিরছে, কিছু জান ?

নাদের বলে, তা কি কিছু বলা যায় বাবু! কলকাতার হালচাল যদি ভাল হয়, তবেই ফিরবে—বুঝলেন না, জানটাতো আগে, তারপর কাম্—

শশধরবাবু ঝংকার দিয়ে ওঠেন, খুব বুঝলুম—এই না হলে পাকিস্তানি চর। তোমরা ওখানে ধরে সব জবাই করছ—আর জানের ডর্ লাগল তোমার এখানে—

রমণীবাবু মধ্যস্থতা করেন, যেতে দিন শশধরবাবু ওসব কথা—এখন দেখা যাচ্ছে বড় দপ্তরীর ফেরার ওপর ভরসা করা যাচ্ছে না—

রসিকবাবু হতাশ হয়ে পড়েন, তাহলে উপায়।

শশধরবাবু প্রস্তাব করেন, উপায় হল, নরেশদাকে বলে দেওয়া, ওঁর ছেলের এ ডিপার্টমেন্টে দপ্তরীর কাজ করা চলবে না। অন্ত যেখানে হোক গিয়ে যা খুশি করুক—তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই—

অহরবাবু মিইয়ে যান, তা বলে চাকরিটা ছাড়তে বলা! তবুও তো দুটো পয়সা রোজগার করছিল—বুড়ো বাপটার একটু সাহায্য হচ্ছিল—

শশধরবাবু বললেন, এখানে কারও ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয় জহরবাবু—এখানে প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের সকলের—কেরানি এ্যান্ড্‌ এ ক্লাসের।

জহরবাবু আঁতকে ওঠেন, এতো বড় ভয়ানক কথা হল!

অজয় এগিয়ে এসে বললে, সেতো হলই। নরেশদার ছেলেকে দপ্তরী হয়ে ঢুকতে দেখে আমারও তো বিয়ে করার সাধ মিটে গেছে।

রমণীবাবু বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে অজয়ের দিকে চেয়ে বললেন, এর সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্পর্কটা আবার কোথায়?

সবটাই—টপ্‌ করে অজয় জবাব দেয়, এই দেখুন না—বিয়ে করলেই ছেলে হবে—আর ছেলে হলে তার গতি হল দপ্তরী! এছাড়া আর তো কোন গত্যন্তর দেখছি না—

রসিকবাবু বলেন, গত্যন্তর কেন থাকবে না—বাপের কর্তব্যটুকু করলেই হত ছেলেটাকে আই-এ'টা পাশ করালে তো আর দপ্তরী করে ঢোকাতে হত না—

অজয় ফোঁস্‌ করে ওঠে, আপনাকে নিয়ে দুনিয়াটা আজকাল চলছে না রসিকবাবু—সকলেই তো আর আপনার মত জ্যাঠার প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, বাপের পেন্সন আর শ্বশুরের বাড়ি পায়নি—

রমণীবাবু আবার মধ্যস্থতা করেন, আহা-হা, ওসব আলোচনা এখন থাক না অজয়, ওসব নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এখন তাহলে আমাদের কাজটা দাঁড়াচ্ছে, নরেশদাকে বলা—তাঁর ছেলের আর এ ডিপার্টমেণ্টে দপ্তরীর কাজ করা চলবে না।

শশধরবাবু অজয়কে বলেন, যাও তো ভাই অজয়, নরেশদাকে একটু ডেকে আনত। আর দেখ, ওসব কথা তুমি যেন কিছু বল না—

জহরবাবু আরও দুটো পান মুখে পুরে বললেন, নরেশকে বেশ করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, অভাব সকলেরই আছে—তা বলে এত সহজে ইজ্জৎ খোয়ানো যায় না—

রসিকবাবু বললেন, হ্যাঁ শশধরবাবু, সেই সঙ্গে আরও বলে দেবেন, কাল থেকে যেন ওঁর ছেলে আর না আসে—

নরেশবাবু বলতে বলতে আসেন, কিগো ভায়া, আবার এই বুড়ো বড়াকে তলব করলে কেন?

জহরবাবু বেঁকিয়ে উঠলেন, তলব মানে! তোমার শূলে দেওয়া উচিত—এ তুমি করেছ কি?

নরেশবাবু থতমত খেয়ে যান, কি করেছি !

কি করেছ ? সর্ব্বনাশ করেছ—ছেলেটাকে কিনা দপ্তরী করে ঢুকিয়েছ—গলায় তোমার দড়ি জোটে না ?

নরেশবাবুর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। রমণীবাবু আমতা আমতা করে বলেন, না অহরবাবু, নরেশদাকে আমরা এভাবে চার্জ করতে চাইনি—ব্যাপারটা ওঁকে বুঝিয়ে বলতে চেয়েছিলুম।

অহরবাবু চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, হল—ওই একই কথা হল—ছুরি যখন মারবে, তখন আর মিছরির ছুরি মেরে লাভ কি—অনেকখানি চুন একসঙ্গে তিনি জিভ দিয়ে চেটে নিলেন।

আবহাওয়াটা কেমন যেন থম্‌থমে মেরে গেল। নরেশবাবু বারান্তরে সকলের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কি করব বল ভাই—আর তো কোন উপায় খুঁজে পাইনি—

রসিকবাবু বললেন, কিন্তু—

শশধরবাবু বললেন, যাক্, আর গোঁজিয়ে দরকার নেই—সোজাসুজি আমিই বলছি। দেখুন নরেশদা আপনার ছেলের এ ডিপার্টমেণ্টে দপ্তরীর কাজ করা চলবে না—কাল থেকে সে যেন না আসে—এইটুকুই আপনার কাছে আমাদের বক্তব্য কথা—

সরব দীর্ঘশ্বাস ফেলে রমণীবাবু উঠে দাঁড়ান, রসিকবাবু কাগজপত্রের দিকে মনোনিবেশ করেন। নরেশবাবু কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে থাকেন। হঠাৎ তিনি বলে ওঠেন, এই তোমাদের বক্তব্য, এই কথা বলবার জন্যে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলে ? কিন্তু একবার কি আমার কথাটা ভেবে দেখেছ ? ইজ্জৎ কেবল তোমাদের আছে—আমার নেই ? তবে শোন—বৃদ্ধ নরেশবাবু বসবার জন্যে পিছনে হাতড়াতে থাকেন। অজয় অন্য টেবিল থেকে একটা চেয়ার এনে নরেশবাবুর পিছনে রাখে।

নরেশবাবু চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়েন। তবে শোন তোমরা—কেউ যেয়োনা, আমার কয়েকটা কথা শুনে যাও—

রমণীবাবু আবার বসে পড়েন, রসিকবাবু কাগজ থেকে মুখ তুলে নরেশবাবুর মুখের দিকে তাকান, অহরবাবুর চোখ দুটো গোলাকার হয়ে ওঠে, অজয় মনে মনে খুশি হয়।

নরেশবাবু বলতে থাকেন, ইজ্জৎ—তোমাদের ইজ্জতে ঘা লেগেছে,

আমার ছেলে দপ্তরীব হয়ে ঢুকেছে বলে। আমার ইজ্জৎ নেই—তোমাদের কারও চেয়ে কি আমার ইজ্জৎটা কম ? তবে, তবে কেন আমি এমন কাণ্ড করে বসলুম—

অহরবাবু বললেন, সত্যিই তো—তবে কেন এমন কাণ্ড করলে ভাই ?

নরেশবাবু বললেন, সেই কথাটাই বলছি। তবে শোন। ছেলেটাকে আমি মানুষ করতে পারিনি—লেখাপড়া শেখাতে পারিনি—সবই টাকার খেল্। বড় মেয়েটার বিয়ে দিতে প্রায় দুটি হাজার টাকা খরচ হল—গিন্নির গয়নাতো সব গেলই, তার উপর ক্রেডিট্ সোসাইটির দেনা। ক্রেডিট সোসাইটি মাঝে মাঝে মাইনে থেকে কেটে নেয়—সংসার খরচে টান পড়ে। দুবছর যেতে না যেতে, প্রথমটার ঘা শুকোবার আগেই মেজ মেয়েটার বিয়ে দিতে হল। ছেলেটা যদি প্রথম হত, তাহলে হয়ত টেনেটুনে ম্যাট্রিকটা পাশ করাতে পারতুম। কিন্তু দুটো মেয়ের পর ছেলে—ছেলেটার যখন স্কুলে যাওয়ার বয়েস হল, তখন বড় মেয়েটা বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে। ধারদেনা করে, যথাসর্বস্ব খুইয়ে ইজ্জৎ বজায় রেখেছিলুম—

অহরবাবু দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বলে ওঠেন, আজকালকার ছেলেরা যা হয়েছে, মেয়েব বিয়ে দেওয়া তো দেখছি মারাত্মক ব্যাপার—এতো বড় ভয়ানক কথা হল !

রসিকবাবু বললেন, ইজ্জতের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। কিন্তু ছেলেটার আখের তো দেখতে হবে—এই দপ্তরীর কাজে তার আখের কোথায় ?

নরেশবাবু বললেন, আখের ! আমাদের মত লোকের কোনো আখের নেই ! কলে, কারখানায়, টেক্‌নিক্যাল্ কোন কাজে ঢোকাতে গেলে চাই ম্যাট্রিক পাশ—কাজেই সেদিক বন্ধ। তবুও পাড়ায় এক দরজীর দোকানে দিয়েছিলুম কাজ শিখতে ! তা কাজ সে আর শেখাচ্ছে কি, কাজ তার নিজেরই জোটে না—হয়ে গেল ওর কাজ শেখা। ছেলেটার বয়েসও হয়েছে, পয়সাকড়ির খাঁচও আছে। মাঝে মাঝে আমার পকেট হাতড়েছে—ওর মার হাতবাক্স থেকে চুরি করেছে। ভয় পেয়েছি, ছেলেটার স্বভাব নষ্ট হচ্ছে ভেবে, কিন্তু সামাল দিতে পারিনি। কিন্তু…, নরেশবাবু হঠাৎ চুপ করেন।

রমণীবাবু বললেন, কিন্তু কি ভাই ?

কিন্তু পোড়ার এই দাঙ্গা—ছেলেটাকে জানোয়ার করে ফেললে। ও খুন করেছে, ঘরে আগুন দিয়েছে, জিনিসপত্তর লুঠ করে এনেছে। ওর মা প্রায় পাগল হয়ে গেছে। বল, আমার ইজ্জৎ আগে না ওকে মানুষ করা আগে…বল ?

অহরবাবু বললেন, তাইতো, ভদ্রলোকের ছেলেরাও দাঙ্গা করে…এতো বড় ভয়ানক কথা হল।

নরেশবাবুর চোখ দুটো উত্তেজনায় বড় হয়ে উঠেছে। তিনি টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, বল তোমরা, তোমরাই বল, তোমরা তো অনেকেই ছেলেপুলের বাপ…কি চাও তোমরা, তোমার ছেলে নিরীহ মানুষকে ঠেঙিয়ে মারুক, ঘরে আগুন লাগাক, জিনিসপত্তর লুট করে এনে তোমার ঘরে ঢুকুক…তাতে তোমার ইজ্জতে ঘা লাগবে না ? তোমাদের ইজ্জতে ঘা লেগেছে কেবল আমার ছেলে দপ্তরী হয়েছে বলে। আমি বলে দিচ্ছি, চাইনা আমার ইজ্জৎ…আমার ছেলে শুধু মানুষ হোক্…নরেশবাবু ঝট্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

অহরবাবুর চোখ দুটো গোলাকার হয়ে যায়, অগতে তিনি বলে ওঠেন, এতো বড় ভয়ানক কথা হল।

আমরা জয়ী

রামশঙ্কর চৌধুরী

আকাশ জুড়ে মেঘ করে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সাপের ফণার মত লিক্ লিক্ করে ওঠে বিদ্যুৎ। জেলখানার উঁচু প্রাচীরটা ক্ষণে ক্ষণে ওঠে স্পষ্ট হয়ে। সুখময় আপনার সেলের দরজায় একটা চেয়ারে বসে তাকিয়ে আছে দূর আকাশের পানে। মনটা আজ আর তেমন ভাল নাই তার।

'কিরে সুখময় আজ আবার বেদনাটা উঠল নাকি?'

পবিত্র সুখময়কে একলা একপাশে বসে থাকতে দেখে কাছে এসে প্রশ্ন করে।

কিছুদিন আগে সুখময় কঠিন গ্যাস্ট্রিক আলসারের আক্রমণ হতে উদ্ধার পেয়েছে। ডাক্তার ছেড়ে দিয়েছিল জীবনের আশা। বহু যত্নে, সেবায় ও সাবধানতায় উঠেছে বেঁচে। তারপর আবার ধরা পড়েছে ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যানসার। বেশী কথাবার্তা চলবে না। নিতে হবে বিশ্রাম।

এ সবই জানত পবিত্র।

'উঠলে ভালই হত।' অত্যন্ত বিমর্ষকণ্ঠে বলে সুখময়। খানিকটা অভিমানের রেশ বেরিয়ে আসে কথার সুরে।

'কেন, ভাল হবে কেন?'

'তা নয়ত কি? সবাই নামবে সংগ্রামে, আমারই শুধু অধিকার নেই! সবাই ভাববে আমি দুর্বল, আমি ভীরু!' বলতে বলতে গলাটা ধরে আসে তার। আর বলতে পারে না।

পবিত্র এতক্ষণে বোঝে কেন সুখময় এমন সময় একলা আছে অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করে। তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, 'অতো ভাবপ্রবণ হয়ে পড়িস না।'

সুখময় পবিত্রের কথার উপরে ক্ষোভের সঙ্গে বলে, 'একে তোরা যা খুশি তাই বলতে পারিস পবিত্র, কিন্তু আমি জানি তোদের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া,

আমার উপর করুণা করা, যেটা আমি জীবনে কোনও দিনই চাই না। যে অত্যাচার আমিও সইছি তার প্রতিবাদ জানাবার অধিকারই তো আমি চেয়েছিলাম! আজ আমি সত্যিই মরতে চাই পবিত্র।'

সত্যই দিনের পর দিন অত্যাচার বাড়ছে। বন্দীরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সংবাদপত্র নেই, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করবার বা সাহিত্য পাঠ করবারও অধিকার নেই। তাতা পাওয়া যায় না, রাজনৈতিক বন্দীদের থাকতে হয় সাধারণ কয়েদীর মত। এর পরিসমাপ্তি প্রয়োজন, তাই বন্দীরা অনন্যোপায় হয়ে অনশনের পথ ধরেছেন। সেই অনশন যুদ্ধে সুখময় নামতে পারবে না—তার শারীরিক অসুস্থতার জন্য। এ তার কাছে কতবড় যে লজ্জার কথা—তা একমাত্র সেই জানে।

পবিত্র সুখময়ের কথার উত্তরে বলে, 'বিপ্লবীর মৃত্যু সেইদিনই হয়, যেদিন সে বিপ্লবের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে এ তো তোর পশ্চাৎধাবন নয় সুখময়।'

সুখময় আজ কোনো কথাই চায় না শুনতে। যুক্তি আজ সে মানে না। সে মনে করে এ সব প্রবোধ-বাক্য। তাই পবিত্রের কথার উত্তরে বলে, 'তোর কথাগুলো শুনতে ভালই লাগে পবিত্র, কিন্তু মিছে তুই আমাকে প্রবোধ দিচ্ছিস।'

পবিত্র কি একটা উত্তর দেয়, কিন্তু তা শোনা যায় না। কড়্-কড়্-কড়াৎ করে মেঘটা ডেকে উঠে। চৌচির হয়ে যায়। ঝম্ ঝম্ করে নামে বৃষ্টি।

২

দিন এগিয়ে যায়। এগিয়ে যায় বন্দীদের প্রস্তুতি। কবি অজয়ের প্রাণ আজ নেচে ওঠে যেন মহাকালের ডম্বরু তালে তালে। অনেককাল পর আবার কলম ধরে অজয়।...জাম-ধরা দরজা তার খুলে গেল আজ কোন ক্যাপা সম্ভাবনার ধাক্কায়? আপনার কুক্ত সেলে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না সে। চায় মুক্তি—সর্বসাধারণের মুক্তি, সকল রকম অত্যাচার, নিপীড়ন হতে। সেই মুক্তির স্তোত্র রচনায় টগবগ করে ফুটছে সে উদ্দাম জীবন বেগে। কলম ধরেছে।

'অজয়-দা।'

অজয় শুনতে পায় না। আপনার মনে লিখে যায়।

হরতাল ভাই শুধ হরতাল
বন্দী-শিবিরে ডাক যুদ্ধের,
বজ্র আকাশ ভেঙে পড়লেও
ভাঙে না কঠিন পণ আমাদের।

'অজয়-দা!' আবার ডাকে সুখময়।

এবার কবির ধ্যান ভাঙে। পেছনে তাকিয়ে দেখে সুখময় দাঁড়িয়ে আছে।

'কি সুখময়?'

'আজ থেকে ইন্‌টারভিউ বন্ধ, এই দেখ নোটিশ!'

ইংরেজি হরফে টাইপ করা একটা কাগজ এগিয়ে দেয় সুখময়।

অজয় একবার তাতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, 'এ জানা কথা।'

'দৈনিক সংবাদপত্রও আজ থেকে আসা একেবারে বন্ধ।'

'তাও জানি।'

'কিন্তু খবর আমি যেখান থেকে হোক আনবই—তুমি দেখে নিও!'

অজয় আপনার পাশটিতে সুখময়কে বসিয়ে বলে, 'বসো, উত্তেজিত হয়ো না। গলা কেমন আছে?'

'ও কিছু না।' সুখময় সে কথা চাপা দিয়ে বলল, 'কিছু লিখছিলে নাকি অজয় দা?'

'হ্যাঁ—বহুদিন পরে লিখছি সুখময়। শোন তো।'

মাত্র কয়েক ছত্রই লেখা হয়েছে। তাই শুনে সুখময় লাফিয়ে ওঠে। বলল, 'আমাকে দাও—দাও ওটা। সুর দেব আমি। গাইব, শোনাব—'

অজয় ঠাণ্ডা জলের ঝাপটার মত বলল, 'আর গলা!'

'চুলোয় যাক।'

'পাগলামী কোরো না সুখময়। মনে থাকে যেন—তোমার গলার সম্বন্ধে ডাক্তার কি বলেছে।'

'তোমরা অনশন করে যখন মরবে—তখন গলা নিয়ে আমি বসে থাকব! আমার গলার শেষ শক্তিটুকু দিয়ে প্রতিবাদ করতে দেবে না, এই জযন্ত—জঘন্ত— ' উত্তেজনায় থেমে যায় সুখময়।

অজয় চুপ। সুখময় তীব্রদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে।

সুখময় বলল, 'আমি সুর দেব ওই গানে—আমি শোনাব তোমাদের। অনশন কর তোমরা—কিন্তু তোমরা যখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়বে দিনের পর দিন, ঝিমিয়ে পড়বে তখন ওই গান গেয়ে শোনাবার অধিকার দাও আমাকে।'

অজয় ম্লান হেসে বলল, 'আগে শেষ করতে দাও তো।'

'দেবে তারপর?'

'দেব,' অজয় বলল। 'কিন্তু তারপর?'

'কিছু না।' সুখময় বলল, 'তুমি শেষ কর আগে।'

সুখময় চলে গেল। তার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ জ্বলে অজয়ের—প্রাণচঞ্চল সুখময় যেন ঝকমক করছে তার চোখের গভীরে। লেখায় সে মন দেয়।

৩

দেখতে দেখতে অনশনের দশ দিন গত হয়। শয্যায় আশ্রয় নেয় অনশনক্লিষ্ট বন্দীরা। উঠবার-চলবার ক্ষমতায় পড়ে ভাটা। পিটে পিটে ধরে বেদনা—কন্‌-কন্‌ করে উঠে খিলগুলো। ছ' নম্বর ব্লকের সরোজ ক্ষণে ক্ষণে কাঠ বমি করে। কখনো খানিকটা সদ্য পান-করা জল আসে বেরিয়ে। এলিয়ে পড়ে বিছানায়। সুখময় ছুটে যায়। শিয়রে বসে হাওয়া করতে করতে বলে, আজকের খবর শুনেছ সরোজ?

সরোজ সুখময়ের মুখের পানে তাকিয়ে বলে, না তো। খবর শুনবার জন্য অধীর হয়ে উঠে সে। ভুলে যায় তার যন্ত্রনা।

সংবাদ এমন কিছু নয়। আজকের কাগজে এক প্রেসনোট বেরিয়েছে।

—ও তো মিথ্যায় ভরা।

—তা সত্যিই বলেছ। কি বলেছে জান?

—কি?

—বলেছে—আমরা এই দিচ্ছি, ঐ দিচ্ছি।

—বুঝেছি, জনসাধারণকে একটা ভাঁওতা দেওয়া। কিন্তু তারা বোকা নয়। নুন দিয়ে একটু জল দাও তো ভাই।

পবিত্র টেবিল থেকে গ্লাসটা নিয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল সরোজের মুখের সামনে ধরে বলে, 'কই হুন তো নেই!'

—দেখ, হুন দিচ্ছে না, তার জন্ত কি দেবে! দাও, জলটাই দাও।

এক গ্লাস জলের সবটা খেতে পারে না সরোজ। একটুখানি খেয়ে গ্লাসটা সুখময়ের হাতে দিয়ে বলে, 'অন্তান্ত ওয়ার্ডের কি খবর ভাই?'

—ভাল। হাওয়া করতে করতে উত্তর দেয় সুখময়।

তারপর একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, 'আট বছরের ছেলে মনিকে দেখেছ তো? আণ্ডার-ট্রায়াল।'

সরোজ আস্তে আস্তে উত্তর দেয়, 'হাঁ দেখেছি। ও তো অনশন করেছে? কেমন আছে?'

চাষীর ছেলে মনি। বাপের সঙ্গে গিয়েছিল মাঠে জমি দখলের আন্দোলনে। পুলিশ মনির বাপের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করে, কিন্তু তাকে পায় না, পিতাকে পায়নি বলে ছেলেকে নিয়ে এসেছে এখানে, এই কারাগারে। চার্জ দিয়েছে বলাৎকার, গুণ্ডামি, ডাকাতি ইত্যাদি।

'কেমন থাকা কি হে,' বলে, 'আমার জন্ত ভাববেন না। আমাদের গাঁয়ে এক মাসে পাঁচ বার গুলি চলেছে, তাতে মরিনি, মরার ভয়ও করিনি, আজও করি না।'

সুখময়ের মুখে ঐ আট বছরের ছেলেটির কথা শুনে সরোজ উঠে বসে বিছানার উপর। তারপর সুখময়কে আপনার অতি নিকটে ডেকে বলে, 'আমার জন্ত ভেবো না সুখময়, তুমি আবার যাও মনির কাছে। হাজার হোক্ বয়স তো নেহাৎ কম—'

—যাব, যাব। তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি।

'ঘুম আসবে না সুখময়। ঘুমবার আগের মুহূর্তটাকে ভয় পাই—যত রাজ্যের ভয়াবহ চিন্তা এসে জড়ো হয়। বাড়ীর কথা মনে পড়ে।'

'তবে জেগে থাক', সুখময় বলল, 'গান গাই—শোন—'

সুখময় গান ধরে দেয়—

বজ্র আকাশ ভেঙে
পড়লেও ভাঙে না
কঠিন পণ আমাদের···

সুখময়ের গলার সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করে ক্লান্ত ক্ষীণ একটা গলা।

৪

তারপর সুখময়ের মনে পড়ে সুধীরের কথা। এই কয়দিনেই সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সুখময়ের সঙ্গে দেখা হলেই প্রশ্ন করে, 'আজ তো বারো চৌদ্দ দিন হয়ে গেল সুখময়। আর কতদিন চলবে?'

সুখময় একটা হাতপাখা নিয়ে তার মাথায় হাওয়া করতে করতে উত্তর দেয়, 'আর চার পাঁচ দিন চালিয়ে যেতে পারলেই আমাদের জয়। শুনেছেন তো, বাইরে আন্দোলন গড়ে উঠেছে, কাল শহরের রাজপথে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল আমাদের দাবির সমর্থনে।'

শুনে আনন্দ হয় সুধীরের। সংকোচ-সংশয় কাটিয়ে বলে, 'দেখছ, আমরা একটুতেই খুব কাবু হয়ে পড়ি। আন্দোলন হলে চার পাঁচ দিন কেন, আরো বেশি দিন চালাতে পারব। তোমার কি মনে হয়, পারব না?'

'নিশ্চয় পারবেন।'

ন' নম্বর ব্লকের অসীমের মনে দেখা দেয় সন্দেহ। তাইত, এক এক করে পনেরটা দিন যায় কেটে—আজও দাবি মেনে নেবার কোন লক্ষণ দেখতে পায় না সে। এবারের সংগ্রাম বুঝি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কিন্তু আরও অধিক দিন চালিয়ে যাবার ক্ষমতা তো তার নেই। জেল হাসপাতালের ডাক্তার কাল বলে গেছে বুকের একটু দোষ হয়েছে। দীর্ঘদিন এমনি অনাহারে থাকলে নাকি ক্ষয় রোগও হয়। ডাক্তারের কথা শুনে বুকটা তার কাঁপে। অফিসে চাকরি করে কোনও উপায়ে সংসার চালাচ্ছিল অসীম, আজ যদি সে মরে যায়, যদি ঐ রূপ দুঃসাধ্য ব্যাধি তার হয়—যা মৃত্যুরই সমান, তখন পথে পথে কেঁদে বেড়াবে তার পরিবার, তার সংসার।

সুখময় বলে, 'অনশনে কেউ মরে না, মরে জোর করে খাওয়ানর ফলে।' ডাক্তার বলে, 'না খেলে—মৃত্যু অনিবার্য।' এক্ষুনি উপযুক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন, যেতে বলে জেল হাসপাতালে। মানসিক শক্তি হারাতে বসে অসীম।

সুখময় অসীমকে শয্যা থেকে তুলে স্নান করিয়ে দিয়ে আবার বিছানায় শুইয়ে দেয়। চিরুনি নিয়ে যত্ন করে চুলগুলি আঁচড়ে দিতে দিতে বলে, 'আজ তোমাকে খুব fresh দেখাচ্ছে অসীম।'

'আপনার হাতের গুণে নিশ্চয়ই।' হাসতে হাসতে উত্তর দেয় অসীম।

তারপর অসীম আপনার ডান হাতটা বুকের উপর দিয়ে সুখময়কে দেখিয়ে দেয়, ঐখানে তার ভয়ংকর বেদনা। ডাক্তারের অভিমতটাও জানিয়ে দেয়। সুখময় অসীমকে সাবধান করে দিয়ে বলে, 'ওদের দুরভিসন্ধি। সংগ্রামকে চূর্ণ করার মতলব। যাক এই দেখ, আজকের বাংলা কাগজটা। প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আজ আমাদের সমর্থনে।'

সুখময় দুমড়ানো কাগজটা পেটের তল থেকে টেনে বের করে দেখায় অসীমকে। অসীম কাগজটার পানে তাকিয়ে থাকে। খবরের কাগজ পড়বার মত অবস্থা তার নাই, অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ে সে। সুখময় পড়ে শুনিয়ে দেয় খবরগুলো, প্রবন্ধটা। অসীম অতি আগ্রহে সবটা শোনে। তারপর আপনার মনেই বলে, 'তুমিই ঠিক বলেছ—ডাক্তারদের দুরভিসন্ধি।'

বলতে বলতেই ডাক্তার আসে। সঙ্গে আসে কয়েকজন সেপাই আর মোটা-সোটা কয়েকটা কয়েদী। সোজা এসে অসীমকে দেখে বলে, আপনাকে আজ তো অত্যন্ত ফ্রেস্ দেখাচ্ছে। কই দেখি নাড়ীটা।

ডাক্তারকে আসতে দেখেই সুখময় খবরের কাগজটা নিয়ে চলে যায়।

অসীম হাত দুটো বিছানার মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলে, 'না না, আপনাকে দেখতে হবে না। আপনি ভয়ানক মিথ্যে কথা বলেন, আমার কিছু হয়নি।

ডাক্তার আবহাওয়াটা নরম করবার উদ্দেশে একটু মৃদু হেসে বলেন, 'তাতো বলবেনই, কথায় বলে না, যার তরে চুরি করি সেই বলে চোর। আমার কি মশায়, আপনার স্ত্রী-পুত্র যদি না খেয়ে মরে আমি তো তাদের খেতে দেব না। আমি চিকিৎসক, সে হিসেবে আমার একটা ডিউটি আছে।'

ভয়ানক রাগ ধরে অসীমের। 'ডিউটি'—ডাইনী মাসী। ভালবাসা—মঙ্গলাকাঙ্খী—তার বুঝতে কষ্ট হয় না, এ হল জল্লাদ ভালবাসা।

আপনার ডিউটিটা এখানে না করে অন্যত্র করুন গে। ফিস্ পাবেন।

ডাক্তারের চোখ আর মুখ কী রকম অস্বাভাবিক হয়ে উঠে। গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে এক মৃদু হাসি আসে বেরিয়ে। হাতের জামা গুটিয়ে, বড়-জমাদারকে হুকুম দেন, 'পাকড়িয়ে'।

—না না না—আমি কিছুতেই Feeding নেব না। ঐ নল নাকে ঢুকলেই আমি মরে যাব।

দারুণ উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে সে। উঠবার ক্ষমতা নাই, তা নইলে সবকটা লোককে মেরে তাড়িয়ে দিত। এই দীর্ঘ দিন উপোস দিয়ে

শারীরিক বল তার হারিয়ে গেছে। তবু মনের-সাহস তো আছে, তাই দিয়ে লড়বে। যতটুকু পারে বাধা দেবে। সেই জন্ম উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে অসীম, মুখটা থাকে বালিশের উপর।

কিন্তু পারে না, পাঁচ সাত জন ষণ্ডা মার্কা সিপাই আর কয়েদীর জোরে তার উপবাস-ক্লিষ্ট দেহ নিয়ে লড়তে পারে না। তারা তাকে চিৎ করে তুলে দিয়ে মাথায় কোমরে ও পায়ে জোর করে থাকে ধরে। ডাক্তার একটা রবারের নল নাকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন—খানিকটা রক্ত আসে বেরিয়ে। নাকটা জ্বালা করে, চোখ দিয়ে যন্ত্রণায় গড়িয়ে আসে জল। যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না অসীম। অজ্ঞান হয়ে যায়।

৫

দিন এগিয়ে যায়—সংগ্রাম এগিয়ে যায়। তবু সবটা থম্‌থমে। বাইরের সংগ্রামের দিকে তাকিয়ে থাকেন বন্দীরা। আপন আপন সেলের দরজায় কম্বল বিছিয়ে শুয়ে আলাপ-আলোচনা জমাবার চেষ্টা করেন নেতালী বন্দী। কিন্তু জমেনা। তাজা খবর, চাঞ্চল্যকর সংবাদ চায় তাদের মন। আজ বিশ দিন গত হল। কারও কারও মনে দোলা দেয় সন্দেহ—শ্রমিক আন্দোলন নেই, এ সময় অনশন করা ঠিক হয়নি হয়ত।

এমন সময় কোথায় কোনো এক ক্লান্ত বিষণ্ণ সেল থেকে ভেসে আসে সুখময়ের তাজা গলা:

"বজ্র আকাশ ভেঙে পড়লেও—ভাঙে না কঠিন পণ আমাদের।"

ক্লান্ত বিষণ্ণ মুমূর্ষু সেলগুলি থেকে প্রথমে গুণ গুণ করে একটি কি দুটি গলা। তারপর পাঁচটি···দশটি···বিশটি। দেখতে দেখতে মনে হয়, সারা জেল মুখরিত হয়ে উঠেছে। কঠিন দেয়ালে ধাক্কা লেগে লেগে ক্ষীণ কণ্ঠগুলো একযোগে গম্ গম্ করে ওঠে। সমস্তটাকে ছাড়িয়ে যায় সুখময়ের গলা—বলিষ্ঠ, আবেগোত্তেজিত।

কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় সুখময়কে। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে সংবাদ শুনবার জন্ম। যারা শয্যা থেকে উঠতে পারে না, তারাও টলতে টলতে এসে বাইরে বসে।

'বল—খবর বল সুখময়।'

'আজকের খবর শুধু ধোকার—ধাপ্পার', বলে একটা খবরের কাগজ সকলের সামনে মেলে ধরে পড়ে যায় :

"হাংগার স্ট্রাইকারদের স্বাস্থ্য বেশ ভালই আছে। তাদের দুধ, ডিম, গ্লুকোজ খেতে দেওয়া হচ্ছে। অনেকেই আপনাদের ভুল বুঝতে পেরে স্ট্রাইক ভেঙে দিয়েছেন। সবাই—"

—থাক থাক আর পড়তে হবে না।

পবিত্র কাগজটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, 'যত সব মিথ্যে কথা! —ঐ অংশটা কেটে পুড়িয়ে দাও, সুখময়' পবিত্র বলে উঠে।

সবাই সায় দেয় পবিত্রের কথায়।

সুখময় কাগজটা তুলে নিয়ে বলে, 'পরের কাগজ।'

সুখময় চলে যায়। তারপর আবার একটা বিষণ্ণ নিঃশব্দতা সমস্ত সেল-গুলোকে যেন তার বিরাট জাঁতায় পিষতে থাকে। দিনের পর দিন। মাঝে মাঝে এক-একটা শুধু জবরদস্ত নল চালিয়ে খাওয়ানোর আর্তনাদ ওঠে—মুমূর্ষু কণ্ঠের প্রাণপণ চিৎকার শোনা যায়। তারপর অস্পষ্ট একটা গোঙানী কঠিন দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মিলিয়ে যায় আস্তে আস্তে।

এরই মাঝখানে সুখময় এসে দাঁড়ায় উদ্‌ভ্রান্তের মত : না—কোনো খবর নাই। শুধু নির্লজ্জ ধাপ্‌পা ছাড়া : 'ভালো আছে বন্দীরা'। অপেক্ষমান উজ্জ্বল জোড়া জোড়া চোখ স্তিমিত মুমূর্ষু হয়ে আসছে দিনে দিনে। একটা অদৃশ্য কড়া কঠিন পাঞ্জা ধীরে ধীরে চেপে ধরছে যেন বন্দীদের গলাগুলো। সবাই অবসন্ন—শয্যাশায়ী।

এর মাঝখানে, কোথায় কোন নিঃশব্দ বোবা সেলে গম্ গম্ করে ওঠে সুখময়ের গলা। একটা প্রচণ্ড প্রাণের ঝড় বয়ে যায় মুমূর্ষু সেলগুলো দিয়ে। তাকে অনুসরণ করে গোঙানীর মতো প্রাণপণ আবেগে—কয়েকটি মাত্র গলা। তার সংখ্যাও কমে আসছে দিনে দিনে।

এর ভেতরে ঘুরছে সুখময় মূর্তিমান গানের মত :

হে বিষাদঘন রাত্রি, তোমাকে বদলাতে হবে রং।
নতুন প্রত্যুষের ছাঁচে ঢালতে হবে নিজেকে।
আমি নেতা, আমি দিশারী নতুন যুগের।
আমার সাহসিক যাত্রায় পায়ে পায়ে তোমাকে
আমার সঙ্গী হতে হবে।

৬

বাইশ দিন গত হল। এবার ক্লান্ত হয়ে পড়ে সুখময়। গলার বেদনাটা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। অস্থির করে দেয় সুখময়কে। তখন দম চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে সে বিছানায়।

তেইশ দিনের প্রভাত। শয্যা থেকে উঠতে পারে না সুখময়। একলা ছটফট্ করে যন্ত্রনায়। রাগ হয় তার রোগটাকে—এই কী তার সময় আক্রমণ করবার। বন্দী-সাথীরা তার মুখ চেয়ে আছে বসে। কিন্তু নাই, কোনো খবর নাই। গান নাই। জেলখানার কালো ছায়ায় মৃত্যু যেন গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে এসেছে সে একেবারে সুখময়ের মাথার শিয়রে যেন। অসহ্য যন্ত্রনায় ছটফট করে সে।

'কিরে সুখময়, এখনো তুই ঘুমুচ্ছিস নাকি'? বিনা অবলম্বনে চলতে পারে না পবিত্র, তাই দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে পা ফেলে এসে উপস্থিত হয় সুখময়ের সেলের দরজায়।

—তুই আবার কেন এলি? না, আমার কিছু হয়নি। একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলাম—কাল সারারাত রঘুর কাছে থাকতে হয়েছিল কিনা।

—রঘু বলে রেলের একটি কমরেডের অবস্থা সত্যই খারাপ হয়েছিল। পালস্ ছিল না, শ্বাস-প্রশ্বাস গিয়েছিল বেড়ে, সারাটা রাত তাকে নিয়ে কি ধকলটাই গেছে। যাক্ এখন আর কোন চিন্তার কারণ নেই।

—এখন কেমন আছে রঘু?

—মন্দের ভাল। তুই দাঁড়িয়ে থাকলি কেন বস।

—না বসব না, তোকে একটা খবর দিতে এলাম।

—বল।

—সুপার একজন কাকে সঙ্গে করে ন' নম্বর ব্লকে গেল, হয়ত মিটমাট করতে এসেছে। একবার খবরটা নিয়ে এস তো।

—এই যে যাচ্ছি। তুই যা—শুয়ে থাক।

পবিত্র দেয়াল ধরে ধরে চলে গেল আস্তে আস্তে। সুখময় উঠে দাঁড়াল সমস্ত কিছু ঠেলে: সবাই অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে। উঠল—দাঁড়াল দেয়াল ধরে। তারপর পড়ে গেল মাথা ঘুরে। একটা পাক-খাওয়া যন্ত্রনায় ছটফট করতে লাগল সে কঠিন মেঝেয় পড়ে।

*　　*　　*

তখন স্ট্রাইক কমিটির বৈঠক বসেছে নবাগত মানুষটিকে কেন্দ্র করে। তিনি বে-সরকারী জেল-পরিদর্শক। বন্দীদের দাবি যাতে সরকার মেনে নেয় তারই চেষ্টায় নাকি তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন।

টাক-মাথা সাহেবী পোষাক-পরা মানুষটির কথা শুনে হাসি পায় বন্দীদের। তিনি পকেট থেকে একটা নোট বুক বের করে বন্দীদের দাবির কথাগুলো লিখতে লিখতে বলেন, 'আমার আশা হয়। আমি এ দাবিগুলো মানিয়ে নেওয়াতে পারব। তবে আপনাদের স্থানান্তরের কথা বলতে পাচ্ছি না।'

শ্যামসুন্দর বলে চাষীটি বসেছিল এক পাশে। তে-ভাগা আন্দোলন করে ধরা পড়েছে। ধরিয়ে দিয়েছে—জমিদার। লড়াই করেছে শত্রুর সঙ্গে, দালালের সঙ্গে। বে-সরকারী পরিদর্শকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'আপনি আর কি মানাবেন—মানাবে জনসাধারণ। তাদের ভয়ই নামিয়ে আনবে সরকারকে।'

গুম্ফ বিহীন মুখে—এক মুখ হেসে বলেন জেল পরিদর্শক, 'সে কথা ঠিকই। তাহলে আমি চলি ?- আবার ও-বেলায় আসব।'

উঠে চলে যান জেল পরিদর্শক।

ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে খবরটা দিয়ে আসে সুখময় চোখ কান বুজে। অসীমের কাছে গিয়ে বলে আসে খবরটা। সে শয্যাশায়ী।

—আমি বলেছিলাম অসীম, জয় আমাদের নিশ্চিত!

অসীম নীরবে স্বীকার করে সে কথা। ভাগ্যিস্ ডাক্তারের কথায় সংগ্রাম ক্ষেত্র থেকে সরে আসেনি, তাহলে আজ মুখ দেখাতে পারত না।

—তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছ ভাই, আমাকে উদ্ধার করেছ। এই তো তেইশ দিন চালিয়ে দিলাম, কই কিছুই তো হল না। বুকের বেদনাটাও আর আজ মালুম হচ্ছে না।

আর দাঁড়াতে পাচ্ছে না সুখময়। যন্ত্রনা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অন্ধকার হয়ে আসে দৃষ্টি, টল্ টল্ করে শরীরটা।

অসীম তার মুমূর্ষু কণ্ঠে বলল, 'তোমার সেই গানটা গাও একবার—হে বিষাদঘন রাত্রি'—

তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল সুখময় একবার অসীমের দিকে। দম চেপে আছে সে। আস্তে আস্তে বলল শেষে, 'কাল—কাল শোনাব অসীম।'

আপনার সেলে ফিরে এসে শয্যায় আশ্রয় নেয় সুখময়। সোজা হয়ে শুতেও পারে না—ধনুকের মত বেঁকে যায় দেহটা। যন্ত্রণা সামলাবার জন্ত নীচের ঠোঁটটাকে শক্ত করে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে। ঠোঁটটা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসে। বালিশটা ভিজে যায় চোখের জলে।

সারা দ্বিপ্রহর কাটে এমনি অবস্থায়।

বিকালে তার ডাক আসে, ন' নম্বর থেকে সম্পাদক ডেকে পাঠান। উঠে চলে যায় পবিত্র—দেয়ালের গায়ে আপনার দেহের ভারটা দিয়ে শুধু পায়ে এসে উপস্থিত হয়।

সম্পাদক বলেন, 'আমাদের দাবি মেনে নিয়েছেন সরকার। এই নাও এগ্রিমেণ্টের কাগজ। খবরটা দিয়ে এস সকলকে।'

অন্ধকার চোখে কাগজটা একবার পড়ে নেয় সুখময়।

সুখময় দম চেপে বলল কোনো রকমে, 'ব্যথাটা বড্ড চেগেছে পবিত্র।'

—আচ্ছা আচ্ছা—শুয়ে থাক তুই। আমি খবর দিচ্ছি।

পবিত্র চলে গেল আস্তে আস্তে—দেয়ালে পিঠ দিয়ে দিয়ে।

নিমিষে সকল রাজবন্দীর কানে পৌছে যায় সংবাদ। সকলের মুখে চোখে ফুটে উঠে বিজয়ী বীরের আনন্দ। কিন্তু আর তো পারে না সুখময়—না কিছুতেই না। গলার যন্ত্রণা তো নয়—যেন একটা গরম দগ্‌দগে লোহার ডাণ্ডা আমূল বসিয়ে দিয়েছে শরীরের মধ্যে। সকলের অগোচরে শুয়ে থাকে সে শয্যায়।

বেলা পাঁচটা। অনশন ভঙ্গের আনন্দ কোলাহল আর বিপ্লবী রণধ্বনি—সংকিত করে তুলে কারাগারের লৌহ প্রাকার। হাসপাতালের বন্দীরা (যারা অনশনের সময় আসতে পারেননি) ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে আসে মিছিল করে সাথীদের অভিনন্দন জানাতে। দূর থেকে ভেসে আসে সুখময়ের গানের সুর:

হে বিষাদঘন রাত্রি···

অ—হ্, অ—হ্—

মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে পড়ে, কারাগারের শক্ত শুভ্র দেয়ালে গিয়ে ছিটকে লাগে তার কণিকা। বিচিত্র করে তুলে প্রাচীরটা।

রক্ত দেখে একটুক্ষণের জন্ত জ্ঞান ফিরে পায় সুখময়। মনে পড়ে আজ ১লা জুলাই, ১৯৪৯ সাল।

বাঙলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"২রা অক্টোবর, ১৯২৯, বুধবার, মহালয়া"—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হল। বিভূতিভূষণ তাঁর ডায়েরিতে লিখছেন ('তৃণাঙ্কুর', ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৮) :

"আজ বই বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ করেছে দেখে আমি আনন্দিত।

"আজ এই নির্জন নীরব রাত্রিতে বহুদূরবর্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হল যে, তার প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্না-মাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো, ছায়া, বন, নদী,—বিশ বৎসর পূর্বের সেই অতীত জীবনের কত হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, কত অপূর্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টির মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই সুর।

"আজ বিশ বৎসরের দূর জীবনের পার হতে আমি আমার সেই পাখী-ডাকা, তেলা-কুচা-ফুল-ফোটা, ছায়াভরা, মাটির ভিটাকে অভিনন্দন করে জানাতে চাই—

"ভুলি নি। ভুলি নি। যেখানেই থাকি ভুলি নি।···তোমারই কথা লিখে রেখে যাবো—সুদীর্ঘ অনাগত দিনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সুর-মধ্যে তোমার মেঠো একতারার উদার, অনাহত, ঝঙ্কারটুকু যেন অক্ষুণ্ণ সংযোগের থাকে।"

'পথের পাচালী' এই নিশ্চিন্দিপুরের কাব্য-কথা। ১৯২৪ থেকে এ বই-এর ভাবনা বিভূতিভূষণকে পেয়ে বসে, 'অপরাজিত'-এ এসে তা শেষ হয় ১৯৩২এর মার্চ মাসে (তৃণাঙ্কুর, ২য় সং, পৃঃ ৬৭-৬৮)। চব্বিশ বৎসর পরে ৩৪ বৎসরের অপু আবার তার গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে এল—পল্লীদেবীর কাছে সেদিনও তার প্রার্থনা, "আর কিছু চাইনে, এ গাঁয়ের বন-ঝোপ, নদী, মাঠ,

বাঁশ-বাগানের ছায়ায় অবোধ উদ্‌গ্রীব স্বপ্নময় আমায় যে সেই দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি তাকে আর একটিবার ফিরিয়ে দেবে, দেবী ? ('অপরাজিত, ২৬শ পরিচ্ছেদ, ৬ষ্ঠ সং)।

'অপরাজিত জীবন-রহস্য' তখন অপু থেকে তার পুত্র কাজলের মধ্যে 'অপূর্ব মহিমাতেই আবার আত্মপ্রকাশ করছে।'

১৯২৮ থেকে ১৯৩২-এর মার্চ এই সময়ের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বক্তব্যটি বাঙলা-সাহিত্যে শিল্পিত করে তোলেন তা এই—বহিঃপ্রকৃতি এক পরম শ্রীময়ী শক্তি ; তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, সাধারণ জীবনও শ্রীহীন নয় ; আর জীবন অপরাজেয় ! অবশ্য তাঁর এই বক্তব্য শিল্পিত হয়েছিল সুকুমার কবিত্বসম্পদে আর স্বচ্ছন্দ, অনাড়ম্বর পরিশীলন সৌন্দর্যে, অর্থাৎ সাহিত্যের নিয়মে।

'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভূতিভূষণ বাঙলা সাহিত্যে অসাধারণ সমাদর ও সম্বর্ধনা লাভ করেন। আর কোনো বাঙালী লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এমন শুভকামনা ও অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিলেন কিনা সন্দেহ। 'অপরাজিত'ও সেই জয়ধ্বনির মধ্যেই শেষ হয়—সে গ্রন্থ ভালো করে যাচাই করবার মত অবসরও ছিল না মুগ্ধ বাঙালী পাঠকের। তারপর বিশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। বিভূতিভূষণের ছোট বড় নানা গল্প ও উপন্যাস বাঙালীর চিত্তভূমিকে এই দীর্ঘদিন ধরে সরস করে এসেছে। বিভূতিভূষণের যে পরিচয় 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিতের' মারফত বাঙালী মনে স্থাপিত হয়েছিল, তার দুই-একটি দিক আরও পরিস্ফুট হয়েছে 'আরণ্যকে', 'দৃষ্টি-প্রদীপে' আর একেবারে শেষদিককার 'ইছামতীতে', —নিরাশ হননি কোনো পাঠক শেষ দিনও তার গল্পের রসে। কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র পরে বিভূতিভূষণের সেই পরিচয় আর নতুন হয়ে ওঠেনি, বাঙালী পাঠকের মনের আর কোনো নতুন তার স্পর্শ করেননি বিভূতিভূষণ, সেই একতারাটিতেই নতুন আঙুলে তার করুণ মধুর নতুন গৎ ফুটিয়ে তুলেছেন বার বার—বারে বারে একটি কথাই বলে গিয়েছেন—'ভুলি নি', 'ভুলি নি' ; বারে বারে একটি বিস্ময়ে ও বিশ্বাসেই অভিভূত হয়েছেন, 'যুগে যুগে অপরাজিত জীবনরহস্য কি অপূর্ব মহিমাতেই আবার আত্মপ্রকাশ করে।'— অপুর পুনরাবৃত্তি হয় কাজলে। বারে বারে একটি কথাই জানিয়েছেন— তা সেই ৩৪ বৎসরের অপুর উপলব্ধি :—"জীবন খুব বড় একটা রোমান্স—

বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্‌স্‌। অতি তুচ্ছতম, হীনতম, একঘেয়ে জীবনও রোমান্‌স্‌।" (অপরাজিত, পৃঃ ৪৩৫)

রোমান্‌সের এ জাতীয় চেতনা ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের দিন থেকেই সুপরিচিত। আমাদের সাহিত্যেও তা অজানা ছিল না। গল্পগুচ্ছের (প্রাক্‌-সবুজপত্র যুগের) রবীন্দ্রনাথ ও 'কণিকার' রবীন্দ্রনাথ জীবনের সাধারণ তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও এই বিস্ময় আবিষ্কার করেছিলেন, প্রকাশও করেছিলেন। এ আবিষ্কার বিশেষ করে কবি-প্রতিভারই সাধনা। সেই শেওলা-ধরা পাথরের পার্শ্বের ছোট্ট প্রিমরোজটির মধ্যে চিন্তার অশ্রু-উৎস যে অকূরন্ত হয়ে আছে তা কবি-দৃষ্টির অজ্ঞাত নয়। এই জাতীয় কবিদৃষ্টিতেই 'short and simple annals of the poor' আপনার অনাড়ম্বর সত্যে মহিমান্বিত; যা সামান্য তাও অসামান্য। কিন্তু কথা-সাহিত্যে এ দৃষ্টি বড় সহজে স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারে না। কারণ, কথা-সাহিত্যের আশ্রয় বাস্তব পৃথিবী। আর এ পৃথিবী দ্বন্দ্বে-কোলাহলে জটিল। দারিদ্র্যও সত্যই নির্মম। the poor যেমন হোক, the poor middle class বা নিম্নবিত্তের জীবন আরও জটিল ও আরও দ্বন্দ্বময়—সব হারিয়েও সে 'সর্বহারা' নয়, 'সব পেয়েছির দেশের' সুরঙ্গ-সন্ধানী। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই বাঙলা সাহিত্যে নির্দয়রূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই বোধ—'গল্পগুচ্ছের' বাঙলাদেশ গল্পই শুধু। হয়ত সে সময়টা না মনে রাখলে 'পথের পাঁচালী'র বিশেষ আবির্ভাব-ক্ষণ ও বাঙলা সাহিত্যে তার তাৎপর্যটা সম্পূর্ণ বোঝা যায় না।

যে বাঙলা সাহিত্য উনিশ শতকে নবজন্ম লাভ করে তার জন্ম ইংরেজি শিক্ষা-সভ্যতাও সাহিত্যের বাহু স্পর্শে। এ সাহিত্যের সৃষ্টি ইংরেজের শহর কলিকাতায়, কলিকাতার বাহিরে পদার্পণ করতেও সে কুণ্ঠিত। অথচ বাঙলা দেশের শতকরা ৯৫টি লোক পল্লীবাসী, ভারতবর্ষেরও অন্যান্য জাতির তুলনায় বাঙালী পল্লী-সমাজে অধিকতর বিসারিত। এ বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ এ পল্লী-সমাজেরই অঙ্গ, আর এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তই আবার বাঙলা সাহিত্যের স্রষ্টা। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সাহিত্যাদর্শও ইংরেজির মারফত প্রাপ্ত, তা শহুরে-বণিক-ধনিক সভ্যতায় উদ্ভাবিত। জীবিকার ক্ষেত্রেও এই বাঙালী মধ্যবিত্ত সেই বণিক-ধনিক সভ্যতার টানেই শহরমুখী, কিন্তু জীবনের শত

সম্পর্কে 'কলোনির' এই মধ্যবিত্ত বাঁধা ভূমির সঙ্গে. কৃষি-সভ্যতার সঙ্গে, একটা ভাঙন-মুখী পল্লী-সভ্যতার সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদী-আওতার কাল্‌চারের একটা পরিহাসই এই সাহিত্য জীবিকায়। যারা শহরমুখো, জীবনে ও ঐতিহ্যে আবার তারাই পল্লীকেন্দ্রিত। সে মধ্যযুগের নিয়মে ও ঐতিহ্যে চালিত পল্লী-সমাজে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নতুন-স্বাতন্ত্র্যবোধ, ব্যক্তি-চেতনা, সভ্য-জীবন-যাত্রার কোনো অবকাশ নেই। অথচ, বাস্তবজীবনে যে বাঁধা সেই কৃষি-সভ্যতারই নিগড়ে, শিল্পে-বাণিজ্যে সাম্রাজ্যবাদী দাপটে যার প্রবেশ নিষেধ, শিল্প-বাণিজ্যবাহী সভ্যতার আদর্শকে সেই কলোনির মধ্যবিত্ত গ্রহণ করবেই বা কিরূপে? জীবনাদর্শে তাই বাঙালী মধ্যবিত্তের একটা দ্বন্দ্ব থেকেই যায়, আর একটা অবাস্তব ভাবালুতাও প্রশ্রয় পায়। একই কালে বাঙালী মধ্য-বিত্তের মনে মমতা ও ক্ষোভ, দুইই থাকে তার পল্লীসমাজের জন্য। দুইই অনিশ্চিত, দুইই একটু অগভীর; একই কালে তা 'পল্লীগুচ্ছের' বাঙলা দেশ, আবার শরৎচন্দ্রেরও 'পল্লীসমাজ'। সেখানেই শ্রী সরলতা, সৌন্দর্য-মাধুর্য; আবার সেখানেই ম্যালেরিয়া ও কুসংস্কারের ডিপো। পল্লী-সভ্যতাই আমাদের স্বদেশী সমাজ; অথচ সে সভ্যতা, সে সমাজকে আর কিছুতেই 'আদর্শ' বলে ভাবা চলে না। তাই তার প্রতি অনুরাগ ও বিরাগ পর্যায় ক্রমে দেখা দেয় বাঙলা সাহিত্যিকেরও মনে।

'পল্লীগুচ্ছের' যুগ ছাড়িয়ে যখন রবীন্দ্রনাথ 'সবুজ পত্রের' যুগ পেরিয়ে যাচ্ছেন, 'রামের সুমতি' 'বিন্দুর ছেলের' ভূমিকা শেষ করে শরৎচন্দ্র যখন তাঁর 'পল্লী-সমাজের' যুগের মধ্যপথে, তখন প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী নিবারণ-তাকে স্বাগত করে বাঙলা সাহিত্যে উপস্থিত হলেন, প্রথম শৈলজানন্দ, পরে 'কল্লোল', 'কালি-কলমের' লেখকেরা। বাস্তববাদ মানে অবশ্য নিবারণতাবাদ নয়। কিন্তু বাঙালী লেখকের চোখ শরৎচন্দ্র-শৈলজানন্দের দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিরল বাস্তবের দিকেই। রোমান্‌স্‌-এ এসেছিল তাদের অশ্রদ্ধা, তাই রবীন্দ্র-নাথের প্রতিও তারা সেদিন বিমুখ (অবশ্য তার অর্থ রোমান্সের প্রতি বিমুখিতা নয়; একটা বর্ণচোরা রোমান্‌স্‌-পিপাসাই ছিল তারও মূল)। কিন্তু চোখ অন্যদিকে ফিরলেও তাঁদের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়নি। তাঁরা বাস্তবকে দেখছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের ধার-করা ধারালো দৃষ্টিতে। তাই সেই পুঁথি-পড়া বাস্তবকে তাঁরা পাশ্চাত্য ধারায় খুঁজছিলেন বাঙলা দেশের শহরে,

বস্তিতে, খনির অপরিচিত অস্পষ্টতায়;—কদাচিৎ অস্পষ্ট পল্লীসমাজ। যে বাঙলার শতকরা ৯০ ভাগ জীবন পল্লী-কেন্দ্রিত; সেখানে শতকরা ৯০ ভাগ বাস্তব সাহিত্য শহরকেন্দ্রিত এ প্রয়াসও নিশ্চয়ই শতকরা ততো ভাগই ছিল মূল্যহীন। কিন্তু তা মূল্যহীন হয় তাদের আরও উদ্ভট ভাবনা ও আবস্তব চরিত্র পরিকল্পনায়। বাঙলা কথা-সাহিত্যের মোড ও বাস্তবের দিকে ঘুরতে না ঘুরতেই অবাস্তবের চোরাবালিতে আটকে গেল। তার কারণ এই যে, ইংরেজ আমলের বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার মূলেই ছিল না মাটি।

এমনি সময়ে 'যোগাযোগ' শেষ হয়েছে 'বিচিত্রায়', 'শেষের কবিতা শেষ' হয়েছে 'প্রবাসীতে', 'পথের পাঁচালী' আরম্ভ হল 'বিচিত্রায়'। বাঙালী পাঠকের মন এবং নতুন রসে অভিষিক্ত হল। আরও দুই বৎসর পরে বিচিত্রার পাতা থেকে খানিকটা বাড়াই-বাছাই হয়ে প্রকাশিত হল বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'। স্মরণ করবার মত কথা। তারপরে বাঙলা দেশের পাঠক সমাজের সমস্বরে বিভূতিভূষণের স্বাগতীকরণ।

বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে 'সাহিত্য সেবক সমিতির' অনুষ্ঠিত 'পথের পাচালীর' সম্বর্ধনা সভায় ব্যারিস্টার, অধ্যাপক ও বিদগ্ধজনের অভাব ছিল না। কথারও অভাব হয়নি। কিন্তু অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটু সলজ্জ সংকোচে জানান, "আমি চিরদিনের কলকাতার মানুষ। বাঙলার পল্লী-প্রকৃতি ও পল্লীজীবনের সঙ্গে এমন আজন্ম পরিচয়ের দাবি করতে পারি না। কিন্তু বেশ একটা মমতা বোধ করি তার জন্ম, তাতে ভুল নেই। আর 'পথের পাচালীর' অপুর সঙ্গে অনুভব করি বাঙালী শিশুর অভিন্নতা।"

চিরদিনের কলকাতায় মানুষ হলেও কলকাতাই যে ইংরেজের,—এখন হয়ত আবার মারোয়াড়ী-ভাটিয়ারও। বাঙলার পল্লীর জন্ম তাই একটা অশ্রু-সজল মমত্ব-বোধ—nostalgia—এই কলকাতার মানুষদেরও মনে জাইয়ে আছে, আর পল্লীত্যাগী শহরমুখো শিক্ষিতের মধ্যেও রয়েছে সেই স্মৃতি। ম্যালেরিয়ার ডিপো, এই এঁদো পুকুর ও বাঁশঝাড়ের গ্রাম, তা ঠিক। দলাদলি, কুড়োমি ও গোঁড়ামিতে তা উচ্ছন্ন যেতে বসেছে, তাও সত্য। কিন্তু আরও সত্য একটা আছে তাও বুঝতাম। 'গল্পগুচ্ছের' রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রলোকের ওপার থেকে তার উপরে তাঁর কবি-দৃষ্টির কিরণ রেখাটি পাত করে আমাদের তা জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে দেখা তবু জানতাম কাব্য-চন্দ্রিকার কাক-জ্যোৎস্নায় দেখা বাঙলার পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবন। তাই একটা অর্ধ-

অবিশ্বাসও তাতে জাগ্রত থেকেই যায়। কিন্তু 'পথের পাঁচালীতে' এখন আমরা সেই পল্লীপ্রকৃতিতে দেখলাম ঠিক চন্দ্রলোকের মানুষের চোখে নয়। বরং অতিপরিচিত এই বাঙলা দেশের গ্রাম থেকেই সেই গ্রাম্যপথ রেখাটি চন্দ্রলোকের দিকে উঠে গিয়েছে: তিন্তিরাজ গাছের তলা দিয়ে সে পথ—মোটা মোটা গুলঞ্চ-লতা দুলানো থলো থলো বন-চালতার ফল চারধারে; আমবাগানে এসে শেষ হয়েও শেষ হয়নি। আবার এ গাছের ওগাছের তলা দিয়ে চলে কুঠির মাঠের ধার বেয়ে—সোনা ডাঙার রাস্তাও শুধু নয়, মাধবপুর দশঘরা হয়ে ধলচিতার খেয়াঘাটে তা থামেনি—গিয়েছে আরও অনেক দূরে—রামায়ণ মহাভারতের দেশে (পৃঃ ৬৪), ঐ অশথ গাছটার ওপারে আকাশের তলে, অনেক দূরে কোথায় এখনো মাটি হতে রথের চাকা দু'হাতে প্রাণপণে টেনে তুলছে রোজই তোলে মহাবীর, কিন্তু চিরদিনের কৃপার পাত্র কর্ণ। (পৃঃ ৩৪)

কিন্তু সে পথ সেই আকাশেই উঠে যায়নি শুধু—গল্পগুচ্ছের পথ যেখান থেকে নেমে এসেছে—নদীর ধারের, শ্যামল গ্রামে। এই "সুড়ি পথটা একটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এ-গাছের ও-গাছের তলা দিয়া বন-কলমী, নাটা-কাঁটা, ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোন দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, শুধুই বন-ধুধুলের লতা কোথায় কোন ত্রিশূন্যে দোলে, প্রাচীন শিরীষ গাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার নজরে আনে।" (পৃঃ ৮৮)

না, এ পথ সেই পৃথিবী-ছাড়া রোমান্সের পথ নয়। প্রত্যেকটি গাছ লতা আর ফুল এখানে আপন স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবিতে নাম নিয়ে উপস্থিত—কোনো ফুল, কোনো গাছ, কোনো লতা শুধু নাম না-জানা ফুল বলে, গাছ বলে, লতা বলে,—একাকার হয়ে যায়নি। বাঙলার পল্লীপ্রকৃতি প্রকৃতি-বিজ্ঞানের গবেষণার বা শুধু বোটানির বইতেই আর আবদ্ধ রইল না, বিভূতিভূষণের সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে প্রত্যেকেই তার বিচিত্র সত্তা আর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এই প্রথম জন্মলাভ করল বাঙলা সাহিত্যে। তাই চিরদিনের কলকাতার মানুষ বা চিরদিনের পল্লীকেন্দ্রিক শহরমুখো বাঙালীর চেতনায় তাদের অস্তিত্ব হল উদ্‌ঘাটিত। আর তা উদ্‌ঘাটিত হল বিভূতিভূষণের আন্তরিক অনুরাগের ও রোমান্টিক বিস্ময়-রসের মায়া-কাজল মেখে। প্রকৃতি বলে একটা কিছু যে আছে—আর তা আছে শুধু 'ডেজি', 'ডেফোডিল', 'প্রিমরোজে' নয়,

শুধু পাহাড়ে পর্বতে সমুদ্রে-নদীসৈকতে নয়, সাঁওতাল পরগণায় বা দার্জিলিং-এও নয়—আছে তা আমাদেরই ঘরের দুয়োরে—ঝোপে ঝাড়ে বনে জঙ্গলে এঁদো পুকুরের পাশে, আশশ্যাওড়ার বনে, তেলাকুচায়, ঘেঁটু ফুলের বিশিষ্ট গন্ধে—আমাদের এই চেতনাকে সেদিন আমাদের হয়ে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন বিভূতিভূষণ—বাঙলা পল্লীপ্রকৃতির প্রতি যে মমতা আমাদের ছিল তা এক মুহূর্তে এইখানে আত্মউপলব্ধি করলে। আর শহরে-সভ্যতায় আমাদের কোনো সৃষ্টি সার্থকতা নেই বলেই এই শহর-ত্যাগী পল্লী-প্রশান্তিতে আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করলাম আরও বেশি—হোন্ তিনি কলকাতার মানুষ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বা কলকাতা-প্রবাসী ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জের নীরদচন্দ্র চৌধুরী

এমনি দ্বিতীয় এক আবিষ্কার—আমাদের সুপ্ত চেতনার নতুন জাগরণ সেই নিশ্চিন্দিপুরের অপু-দুর্গার সঙ্গে পরিচয়। অপু 'রামের সুমতির' রামের মত নয়, অথচ তেমনি সত্য। বৈশাখের ঝড়ে সে দিদির সঙ্গে আমকুড়োতে ছোটে, নোনাফল পেড়ে খেয়ে অপার তৃপ্তি লাভ করে, দু'জনায় পানফল তুলতে গিয়ে দিদিকে টেনে ধরে—ভালো ফলারের নামে সহজেই লুব্ধ হয় তার দরিদ্র রসনা, সহজেই তেমনি ছাঁদা বেঁধে আনে লুচি আর খাবার; চুরি করে আনে পুঁতির মালা তার বোন, চুরি করে আনে তেমনি সহজ লোভে সিঁদুরের সোনার কৌটো। আর দিদি আর মায়ের সহজ মমতায় তার জীবন যখন ঘেরা, তখন নিশ্চিন্দিপুরের বনঝোপ এই শিশুকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যায় নব নব বিস্ময় ও অনুভূতির দিকে—সে ডাইনী বুড়ীর ভয়ে ছুটে পালায়, সন্ধ্যার অন্ধকারে তার বড় ভয়, রেলপথের সিধা লোহা দুটোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে আর ঠিকানা পায় না এ পৃথিবীর, সীতার বনবাসের সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরির, (পৃঃ ৬৪) ঝঙ্কার-জড়ানো শব্দ-সঙ্গীতে আর বারোয়ারী তলার যাত্রার কাহিনীতে মানব-কল্পনার অতলস্পর্শী দেহোল্লাস সে দেখতে পায়। বাঙালী শিশু মনের এ বৃহত্তর সত্য,—শহর-পালিত বাঙালী বালকের পক্ষেও সত্য, আর গ্রাম-ছাড়া বাঙালী বালকের পক্ষেও সত্য। কিন্তু বিভূতিভূষণের সৃষ্টি-চমৎকারিত্বেই এক মুহূর্তে এই সত্য আমরা বাঙালী পাঠকেরা আবিষ্কার করলাম। ইতরতা, নিষ্ঠুরতা, ছেঁচড়ামো, কাঙালপনা vulgarityই যে বাঙালী পল্লীসমাজের একমাত্র সত্য নয়, এ কথা অবশ্য আমরা জানতাম। শরৎচন্দ্রও এই কথা দিয়েই তাঁর সাহিত্যের ভূমিকা-রচনা

করেছিলেন, ('গ্রামের স্মৃতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'নিষ্কৃতি' পর্যন্ত)। কিন্তু সর্বজয়া-অপু-দুর্গার সংসারের মধ্যে—sort and simple annals of the poor নয় শুধু, poor middle class-এর সমস্ত দারিদ্র্যের মধ্যেও কতখানি অশ্রুসজল মাধুর্য ও মমতা, রোমান্সের মায়া ও রোমান্সের বিস্ময় যে সর্বদাই সঞ্চিত—এই বিস্ময়রসের সত্যটা বিভূতিভূষণের মত এমন করে আজ পর্যন্ত কেউ বাঙলা কথা-সাহিত্যে আবিষ্কার করতে পারেননি। 'গল্পগুচ্ছের' রবীন্দ্রনাথও বোট আর কাছারি-বাড়ি থেকেই এই বিস্ময়ের আভাস দিয়েছেন—সর্বজয়ার সংসারের মাঝখানে বসে আমকুড়োন, কাঙালপনা, হ্যাংলামো প্রভৃতি প্রতি-দিনের পল্লী-জীবনের অতিপরিচিত তুচ্ছতাকে এমন খুঁটে খুঁটে প্রকাশ করতে তিনি সাহসীও হননি; হয়ত তা তাঁর জানাও ছিল না। এই অতি-পরিচিত তুচ্ছতা জানা থাকলেও তার এই তাৎপর্য, তার এই অন্তর্নিহিত সত্যে শরৎচন্দ্রের প্রয়োজন ছিল না; এই সকরুণ বিস্ময়েও তাঁর প্রবৃত্তি ছিল না। কারণ শরৎচন্দ্র বাস্তব চেতনার কথাকার, আর বিভূতিভূষণ বিস্ময়বোধের কথাকার; শরৎচন্দ্রের প্রধান বক্তব্য—সামাজিক বিকাশ; আর বিভূতিভূষণের প্রধান বক্তব্য—সামান্যের মধ্যে অসামান্যের অনুভূতি।

'পথের পাঁচালী' বাস্তব-বিমুখ মধ্যবিত্ত বাঙালীর এই রোমান্স-পিপাসী তারটিই স্পর্শ করল। কিন্তু তার বিশেষত্ব এই যে, শরৎচন্দ্রের বাস্তব-সাক্ষ্যকেও তা একেবারে অস্বীকার করল না। রোমান্সের প্রধান কথাটা—বিস্ময়ের বোধন। কিন্তু সে বিস্ময় অসম্ভব দেশের অসম্ভব কথাকে আশ্রয় করে রচিত করবার দিন আর নেই। 'পথের পাঁচালীর' বিস্ময় পরিচিতের মধ্যে অপরিচিতের আবিষ্কারে; সহজের মধ্যে স্বপ্নময়তার সঞ্চারে; আর সামান্যের অসামান্যের উদ্ঘাটনে। বিশেষ করে এই বিস্ময়-বোধন সার্থক হল এই জন্য যে, 'পথের পাঁচালী' নিশ্চিন্দিপুরের কথা হলেও শিশুর চোখ দিয়ে দেখা নিশ্চিন্দিপুরের কথা—আর বিস্ময় শিশু মনেরই প্রধান রস, প্রায় তার নিজস্ব ধর্ম। তাই, 'পথের পাঁচালী' আসলে পল্লী-সমাজের কথা নয়—মাত্র একটি পল্লীগৃহের কথা, এবং মূলত অপু-দুর্গার মত অনুভূতি-প্রবণ কল্পনা-কুশল শিশু-লীলারই কাব্য-কথা। শরৎচন্দ্রের পল্লী-সমাজের সত্যকে অস্বীকার সে করে না, তার পাশ কাটিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় পল্লীজীবনের ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের তেমনি সত্যনিষ্ঠ, অথচ রোমান্সের মায়া-মাখানো আর একটি রূপ। শরৎ-

চক্ষুকে অসত্য বলতে পারব না, কিন্তু সাধ্য কি বলব—এই শিশু নয়নের দৃষ্টিতে নিশ্চিন্দিপুরের যতটুকু দেখেছি তা মিথ্যা? কি করে বলব, বাঙলা-দেশে এই নিশ্চিন্দিপুর আর তার অপু-দুর্গা শুধু কাল্পনিক? মিথ্যা আমাদের এই বিস্ময়বোধ?

কিন্তু এই বিস্ময়-বোধ যে কতখানি কাল্পনিকতাকে আশ্রয় করে দাঁড়াতে চায় তার পরিচয় পাওয়া গেল এর পরে। 'অপরাজিত' 'পথের পাঁচালীরই' পরিণতি। প্রথম যখন তা প্রকাশিত হয় (১৯৩২) তখন তার বিচার সম্ভব ছিল না—বরং একটা নিঃশ্বাস ফেলে আরাম উপভোগ করলেন পাঠকেরা যখন ২৪ বৎসর পরে অপু উপলব্ধি করলে নিশ্চিন্দিপুরেই তার নিজ বাসভূমি। কিন্তু 'অপরাজিত' জীবন-রহস্য তাকে টেনে নিয়েছিল দূরে—শহরে, গ্রামে, অরণ্যে—আর পরম বিস্ময়কর মানুষের জগতে। এই মানুষের জগতেই জীবনের সত্য পরিচয় আর জীবনের সত্য পরিণতি। যা 'পথের পাঁচালী', তা সেখানে দাশু রায়ের ছড়া ছেড়ে পরিণত হয় মহাকাব্যের মহিমায়। 'অপরাজিত জীবনরহস্য' সেখানে 'আত্মপ্রকাশ' করে জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে অপরাজেয় সৃষ্টির সংকেতে। তাও বিস্ময়, বরং তাই পরম বিস্ময়। কিন্তু এ পরম বিস্ময় শিশুর বিমুগ্ধ-বিস্ময় নয়; দ্বন্দ্ব-বিরোধ-মথিত মানব-সৃষ্টির মহান্ বিস্ময়। অথচ মানুষের এই জগতে অপু বয়সে বাড়ে, বাড়ে না জীবন-বোধ; তাই বাড়ে না তার বিস্ময়-বোধও। এ সমালোচনা তাই অতি সত্য 'অপরাজিতের' অপু অপরাজিত নয়, 'তাহার সারা জীবনই তো অপরিণত।' (নীরেন্দ্রনাথ রায়, পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৩৯, পৃঃ ৫২৮)। অপু অনেক কিছুই করে, অনেক কিছুই বলে, অনেক ভাবে, অনেক কল্পনা করে—কিন্তু করে না জীবনের বিকাশ। তার চারদিকে মানুষ, চারদিকে জটিলতা, চারদিকে সেই জটিলতার চক্রব্যূহের অক্ষৌহিণী। কিন্তু মানুষের এই পৃথিবীতে সেই সব দ্বন্দ্বের পাশ কাটিয়েই অপু চায় জীবন। অথচ জীবন দ্বন্দ্বময়। তাই সম্মুখের জীবনকেই পাশ কাটিয়ে অপু ফিরে যায় অতীতে-জীবনের স্মৃতিতে। ৩৪ বৎসরের ক্রমবর্ধিত যৌবনেও সে পেতে চায় সেই শিশুতীর্থের আশ্রয়,—বাহ্যত তা নিশ্চিন্দিপুর, কিংবা বহিঃপ্রকৃতির অন্য কোনো কোল—যেমন, অমর-কণ্টকের বিপুল অরণ্যানী। প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগটা অপুর আন্তরিক, তাই অরণ্যেও সে স্বচ্ছন্দ;—সভ্যতার শৈশবে অরণ্যই তো ছিল মানুষের মাতৃক্রোড়। অমরকণ্টক; তাই চির-অপরিণত

অপুর সেই আত্ম-নিবেদনের সুরে গাঁথা এক মহান্ অরণ্য স্তব—(পৃঃ ৩৬৪, অরণ্যকে তারই রোমন্থন চল্‌ল পাতার পর পাতা)। তাতে আছে সভ্যতার শৈশবের সেই শিশু-মানবের বিস্ময় ও গাম্ভীর্য; আছে পরিণত সভ্যতার মানুষের পক্ষে সেই বিস্ময়-বোধন, আশ্রয়-অন্বেষণ।

জীবনের বিপুল স্রোত অপুকে সামনেও টানছে—টানছে প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের বোঝাপড়ায়। আর চিরশিশু অপু আঁকড়ে ধরে এই তার আশ্রয়-ভূমিকে। অপু শিশুই থাকতে চায়; দ্বন্দ্বময় জীবনকে সে চায় না, সম্ভবত চিনেও না। তার শিশুমন শেষ পর্যন্ত তাই শুধু স্মৃতিমন্থনেও আশ্রয় পায় না, আশ্রয় খোঁজে তখন অতি-প্রাকৃতিক স্বপ্নে, ভাব-বিলাসে। বিস্ময়-সন্ধানী দৃষ্টি তখন চায় 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'দেবযান'।

দ্বন্দ্বভীত মানুষ আসলে জীবন ভীত মানুষ। আপনার শিশুজীবনকে উত্তীর্ণ হযে যেতে পারেনি বিভূতিভূষণের সাহিত্য-জীবন। 'পথের পাঁচালীর' কীর্তিকে তাই আর ছাড়িয়ে যেতে পারেনি বিভূতিভূষণের কোনো কৃতিত্ব।

কোনো লেখকের কীর্তি কী, সেইটাই বড় কথা। কী তাঁর অনায়ত্ত বা অসাধ্য, তা তত বড় কথা নয়। কিন্তু বা তার সাহিত্য-জীবনের পরিচয়কে স্পষ্টতর করে তা সর্বক্ষণই স্মরণ করা চলে। এ কথা মনে রাখা তাই অন্যায় নয়—বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-অনুরাগে ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় গাম্ভীর্য ও মহিমার সন্ধান করা চলে না; সেই awe and adoration তাতে নেই—প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সেই ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় ঐকান্তিকতা নেই। আর, 'পল্লী বনাম শহরের' প্রশ্নে তাঁর যে আবেগ-উচ্ছ্বাস, অনেকটাই তা আবেগ-ময়তা। কারণ, এ প্রশ্ন বাঙালী জীবনে ওঠেইনি এখনো। শিল্পোন্নত সমাজ 'পল্লী বনাম শহর' এই প্রশ্নের সমাধান করছে নতুন বিজ্ঞান-সম্মত সমাজতান্ত্রিক শিল্পাঙ্কিক বিন্যাসে। কিন্তু পল্লীপ্রকৃতি বা অরণ্যপ্রকৃতি যারই কোলে বিভূতিভূষণ আশ্রয় গ্রহণ করুন তিনি সে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন মাতৃক্রোড় ছাড়তে চান না বলে; জীবনের জটিলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি বিমুখ। তাই তিনি মানুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতাদ্বৈত লীলার কবি হতেও পারেননি; হয়েছেন গোষ্ঠলীলার কবি। আর এরূপ দ্বন্দ্ব-শংকিত বলেই তাঁর বাঙলার পল্লীচিত্রেও নেই কৃষক চরিত্র। কৃষিক্ষেত্রেরও চিহ্ন তাতে নেই, আছে পোড়ো ভিটা আর ঝোপঝাড়। এ জন্যই তিনি নিম্ন মধ্যবিত্ত মনের ক্ষোভ-বেদনা-বিদ্রোহেও নির্বাক—অথচ এই

বিস্ময়রসের অপেক্ষা তাদের জীবনের সেই রৌদ্রবীভৎস রসও কম সত্য নয়। সেই ক্ষোভ থেকে তাঁর মতে নিস্তারের পথ 'দৃষ্টিপ্রদীপ'—জীবন-সংগ্রাম নয়, সমাজের বিপ্লবী বিকাশ নয়।

স্বপ্নেই যে ভীত, স্বপ্নময় মানবপ্রকৃতি ও স্বপ্নময়ী বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রহস্যকেই বা সে তবে উপলব্ধি করেছে কতখানি? বিভূতিভূষণের জীবনবোধ শিশুর জীবন-বোধ। এবং শুধু তাই নয়। বিভূতিভূষণ 'অপরাজিত জীবন-রহস্যের' যে 'আত্মপ্রকাশ' দেখে মুগ্ধ, তাঁর দৃষ্টিতে সেই জীবন-রহস্য বা Life Force শুধুই অণু থেকে কালে আবার 'আত্মপ্রকাশ' করে। কিন্তু নব নব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যে এই জীবন-রহস্য শুধু 'আত্মপ্রকাশ' করে না, আত্ম-বিকাশ করে, এ সত্যও বিভূতিভূষণের উপলব্ধিতে সুস্পষ্ট নয়। 'পথের পাঁচালীর' পথটা তাই একটা জীবন-চক্রের বৃত্তখণ্ড মাত্র। পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে তা ক্রমোন্নতি লাভ করে না। জীবন পাক খায়, এগোয় না; আর তাই বিভূতিভূষণ কখনো মানুষকে দেখেন না স্রষ্টা হিসাবে—যে মানুষ বহিঃ-প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করে, আর পরিবর্তিত হয় সঙ্গে সঙ্গে যার অন্তঃপ্রকৃতিও; যে শুধু বিমুগ্ধ শিশু নয়, সচেতন স্রষ্টাও। এ যুগের মানব সভ্যতার এই বৃহত্তম আবিষ্কার ও জীবনের এই বিরাট রোমান্স্ বিভূতিভূষণের অগোচর।

জীবনের তবু যে পরিচয়খানি বিভূতিভূষণ লাভ করেছিলেন তা 'পথের পাঁচালীর' পরেও দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরে বহু গল্পে, বহু উপন্যাসে ও ডায়েরির অজস্র লেখায় তিনি উৎসারিত করে দিয়েছেন। তাতে কত মানুষ, কত ঘটনা, কত অলৌকিক তত্ত্ব, আর কত প্রতিদিনের পরিচিত সত্য। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর সেই গল্প উপন্যাস ডায়েরির পাতা—একটা কৃতিত্ব। অবশ্য যে বিস্ময় 'পথের পাঁচালীতে' তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তার পরে আর কোনো নতুন বিস্ময় বা নতুন সত্যের তিনি সন্ধান দিতে পারেননি। সেই 'মোঠা একতারার উদার, অনাহত ঝঙ্কারই' 'বিভিন্ন বিচিত্র সুর-সংযোগের মধ্যেও' বরাবরই অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে, এই প্রতিশ্রুতি সত্যই তিনি পালন করেছেন। বারে বারে স্মৃতিমন্থনে বা জীবনাবর্তনে ফিরে ফিরে এসেছে সেই নিশ্চিন্দিপুরের পুনরাবৃত্তি, সেই শিশুচিত্তের মায়াময় বিমুগ্ধতার পুনরুক্তি। কিন্তু জীবন তো পুনরুক্তি করে না। আর সাহিত্যেও এই পুনরুক্তি একটা অভ্যাসের যান্ত্রিকতা, কিংবা আত্মগত দুর্বলতা। জীবনের সুনিবিড় পরিচয়ের প্রমাণ এ নয়—তা শিল্পী হিসাবেও সীমাবদ্ধতার প্রমাণ।

সে সব অসংখ্য পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও তবু বিভূতিভূষণের পরবর্তী প্রত্যেকখানি গ্রন্থকে আমরা সাদরে গ্রহণ করেছি—এমনি তাঁর লিপিকুশলতা ও কলা-কুশলতা, এমনি মাধুর্য তাঁর কল্পনাকুশল কবিমনের; এমনি অক্লান্ত তাঁর চিন্তা আর অফুরন্ত তাঁর চরিত্রসৃষ্টি—ক্ষোভহীন, গ্লানিহীন এক মানবীয় মমতায় অভিষিক্ত তাঁর পরিচিত জগৎ। তাঁর সাহিত্য একটি বড় সত্যের স্বাক্ষর—"অতি হীনতম তুচ্ছতম এক মেয়ে জীবনও রোমান্স"। কারণ, তা জীবন, আর তাই সৃষ্টিময়। আর জীবনের চরম বিস্ময় সেখানে, যেখানে—হীনতাকে তুচ্ছতাকে একঘেয়েমিকে সে মেনে না নিয়ে, সদর্পে তা অপসারিত করে, সকল মানুষের এই সৃষ্টিশক্তিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করে; কোনো জীবনকেই হীন, তুচ্ছ থাকতে দেয় না।

গোপাল হালদার

"অপরাজিত" ও বিভূতিভূষণ

['পথের পাঁচালী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৯এ। তখনই সাহিত্যক্ষেত্রে তা সাদরে অভিনন্দিত হয়। 'অপরাজিত' তখনও মাসিকপত্রে চলছে। তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩২এ। তার শেষ ফর্মা প্রেসে ছাপতে দিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ডায়েরিতে ('তৃণাঙ্কুর' ২য় সং, পৃঃ ৬৭-৬৮) লিখছেন :

"১৯২৫ সালের পূজার সময়টা থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সব সময়েই এই বই-এর কথা ভেবেচি। ১৯২৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩২-এর ১০ই মার্চ পর্যন্ত এমন একটা দিনও যায়নি, যখন আমি এ বইখানার কথা না ভেবেচি—বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন মনোভাব নোট করেচি, মনে রেখেচি,—কত কি করেচি। ইস্‌মাইলপুরের জঙ্গলে এমন কত শীতের গভীর অন্ধকার রাত্রি, ভাগলপুরের বড় বাসায় এমন কত আমের বকুলের গন্ধ-ভরা ফাল্গুন দুপুর, কত চৈত্র বৈশাখের নিম-ফুলের গন্ধ-মেশানো অলস অপরাহ্ণ, বড় বাসার ছাদে কত পূর্ণিমা জ্যোৎস্নারাত্রি অপু, দুর্গা, পটু, সর্বজয়া, হরিহর, রাণুদি এদের চিন্তায় কাটিয়েচি। এরা সকলেই কল্পনা-সৃষ্ট প্রাণী। অনেকেই ভাবেন আমার জীবনের সঙ্গে বুঝি বই দু'খানির খুব যোগ আছে—চরিত্র-

গুলি বোধ হয় জীবন থেকে নেওয়া। অবশ্য কতকটা যে আমার জীবনের সংযোগ আছে ঘটনাগুলির সঙ্গে এ বিষয়ে ভুল নেই—কিন্তু সে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয়—ভাসা ভাসা ধরনের। চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক। সর্বজয়ার একটা অস্পষ্ট ভিত্তি আছে—আমার মা। কিন্তু যারা আমার মাকে জানে, তারাই জানে সর্বজয়ার সবখানি আমার মা নন।···

"যদি সাহিত্যের বাজারে আন্তরিকতার কোনো মূল্য থাকে, তবে আমার ইস্মাইলপুরে, ভাগলপুরে বড় বাসার ছাদে আমার বিনিদ্র রজনীযাপনের ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দেবে যে, বই দু'খানি লিখতে আন্তরিকতার অভাব আমার ছিল না বা চিন্তার আলস্য আমি দেখাইনি।

"আজ সত্যই কষ্ট হচ্ছে। অপু, কাজল, দুর্গা, লীলা—এরা এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে আমার আপনার লোক হয়ে পড়েছিল। আজ ও-বেলাও প্রুফ দেখেছি, অদলবদল করেচি—কিন্তু এ-বেলা থেকে তাদের সকলকেই সত্য-সত্যই বিদায় দিলাম। আজ রাত্রে যে কতখানি নিঃসঙ্গ ও একাকী বোধ করচি, তার সন্ধান তিনিই জানেন, যিনি কখনো এমন দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে গুটিকতক চরিত্র সম্বন্ধে সর্বদাই ভেবেচেন। তাদের সুখদুঃখ, তাদের আশা-নিরাশা, তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুরু দুরু বক্ষে চিন্তা করেচেন।

"অপুকে জন্ম থেকে ৩৪ বৎসর পর্যন্ত আমি কলমের ডগায় সৃষ্টি করেচি। তাকে ছাড়তে সত্যিকারের বেদনা অনুভব করচি—তবে সে ছিল অনেক-খানিই আমার নিজের সঙ্গে জড়ানো। সেইজন্যে বেশী কষ্ট হচ্চে বিদায় দিতে কাজলকে, লীলাকে, দুর্গাকে, রাণুদি'কে—এরা সত্য সত্যই কল্পনা-সৃষ্ট প্রাণী। কোনো দিকে এদের ভিত্তি নেই এক আমার কল্পনা ছাড়া।···

"···যখন 'পথের পাঁচালী' ছাপা হয়েছিল, তখনও 'অপরাজিত' ছিল—বেশীটাই বাকী ছিল কিন্তু আজ আর কিছু নেই।"

সুদীর্ঘ হলেও এই উদ্ধৃতি লক্ষণীয় দু-একটি কারণে—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বচ্ছন্দ লেখক হলেও তাঁর সাধনা ছিল কতটা আন্তরিক ও অনলস। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক চরিত্রপ্রধান ও আত্ম-চরিত্র-অর্দ্ধবর্জিত উপন্যাসের মতই তাঁর এই উপন্যাস দুটিতেও কতটা সত্য লেখকের জীবন থেকে গৃহীত, আর কতটা কল্পনা-সৃষ্ট। এ ছাড়া, অনেক ভালো গল্প রচনা করলেও বিভূতি-ভূষণ 'পথের পাচালী' 'অপরাজিতের' মত আর নতুন কোনো উপন্যাস রচনা করতে পারেননি। তাই 'অপরাজিতের' প্রকাশ সময়ে সে বই সম্বন্ধে যে

সমালোচনা তখনকার 'পরিচয়ে' (ত্রৈমাসিক) প্রকাশিত হয়েছিল আমরা আজও তার পুনর্মুদ্রণ করলাম। অবশ্য সমালোচক আজ লিখলে এই বক্তব্যই বলতেন আরও সুপরিণত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, আর 'পরিচয়ও' তাই কামনা করত; কিন্তু ১৮ বৎসর পূর্বে বিভূতিভূষণের শিল্পপ্রতিভার এই পরিমাপ এত সহজ ছিল না। আর এখনো এই পরিমাপ আসলে গ্রাহ্য। —সম্পাদক, পরিচয়]

বিভূতিবাবুর মত সৌভাগ্যশালী লেখক বাংলাদেশে কখনও জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হইতে না হইতে তিনি যে খ্যাতি ও স্তুতি লাভ করিয়াছেন, তাহা বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনার ভাগ্যে জোটে নাই। একথা আর বলা চলে না যে বাঙালী পাঠক গুণের মর্যাদা করিতে জানে না।

সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় সমসাময়িক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি অনেক স্থলেই কতকগুলি সাময়িক কারণের সমাবেশ। 'পথের পাঁচালী'র ক্ষেত্রে তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতার নিয়ত-প্রবর্ধমান প্রভাব সত্ত্বেও একথা এখনও নির্বিবাদে বলা যায়, বাংলার সামাজিক জীবন প্রধানত পল্লী-কেন্দ্রিত। এমন শিক্ষিত পরিবার খুবই কম, দুই তিন পুরুষের মধ্যে যাহারা বাংলার জমির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুক্ত ছিল না। এমন বাঙালী ক'জন পাওয়া যায় যাহারা ছাত্রবয়সে শহরে বাস করিয়াও শহরে জীবনকে তীব্র ভাষায় নিন্দার পর পল্লীজীবনের সহজ সরল অনাড়ম্বরতার গুণগানে স্কুল বা কলেজগৃহ মুখরিত করিয়া তোলে নাই? চলন্ত রেলগাড়ির জানালা দিয়া কোন্ বাঙালী ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলির দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকায় না? প্রাচীন সাহিত্যের কথা ধরিবার প্রয়োজন নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত সামাজিক উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোট গল্প পল্লীজীবনকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। ফলে এই সব ওস্তাদ শিল্পীর কবিপ্রতিভার জ্যোতিঃতে বাংলার পল্লীশ্রী আমাদের কল্পনানেত্রে ধরাধামে সুখস্বর্গের শোভায় বিরাজিত ছিল।

কিন্তু চমক ভাঙিল, স্বপ্ন-জড়িমা পলকে টুটিল যেদিন শরৎচন্দ্রের সত্য-সন্ধানী দৃষ্টি রূঢ় দীপের আলোক লইয়া বাংলার পল্লীজীবনের বাস্তব চিত্রটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল, তাঁহার "পল্লী সমাজে"। সে চিত্র এমনই নিরুকণ অথচ এতই অবিতর্কিত যে পল্লীসম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়া গেল;

যাহা ছিল সুখের খনি, সৌন্দর্যের আকর, তাহাই হইয়া উঠিল দলাদলির আড্ডা, ম্যালেরিয়ার ডিপো, সংকীর্ণতার দৃঢ় দুর্গ ও পুঞ্জীভূত কলঙ্কের বিস্তীর্ণ পসরা। সাহিত্যেও, নদীর মত, একদিকে ভাঙন ধরিলে অন্যদিক গড়িয়া ওঠে। বাংলা সাহিত্যের টান অতিমাত্রায় শহরমুখী হইয়া পড়িল। এমনকি যে-লেখকের নিকট পল্লীগ্রাম শ্রুতিমাত্রে পর্যবসিত, হয়ত যাঁহার নিজের বাড়ী শ্যামবাজার ও মামার বাড়ী বাগবাজার হওয়ায় পল্লীগ্রামের সহিত চাক্ষুস পরিচয়ও ঘটে নাই, তিনিও সুযোগ পাইয়া পুরামাত্রায় ওয়াকিবহাল হইবার জন্য পল্লীজীবনকে দুটো খোঁচা না দিয়া ছাড়িলেন না। তদুপরি আবার একদল পশ্চিমানুরক্ত লোক বাংলা সাহিত্যকে ইওরোপীয় সাহিত্যের আধুনিকতার কোঠায় তুলিবার প্রাণপণ চেষ্টায় অনেকস্থলে মূলহীন ভাব ও অবাস্তব চরিত্রের প্রবর্তনে সাহিত্যক্ষেত্রে সমুদ্র মন্থনের কোলাহল সৃষ্টি করিলেন, যাহা হইতে কেহ বলিলেন অমৃত উঠিতেছে, কেহ বলিলেন গরল। এই বিপর্যয়ে আত্মহারা হইয়া পল্লীগ্রামে নাড়ী-বাঁধা বাঙালী পাঠকের সাহিত্যিক শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম ঘটিল।

এহেন সংকটে ত্রাণের বার্তা আনিলেন বিভূতিভূষণ নিশ্চিন্দিপুরের বৃদ্ধা বালবিধবা ইন্দিরঠাকরুণ ও তাঁহার স্নেহের ধন দুর্গা ও অপুর বাল্যজীবনের কাহিনীর ভিতর দিয়া। পল্লীমাতা আবার যেন কথা কহিয়া উঠিলেন। স্বদেশপ্রাণ-বাঙালী পাঠক তাহার একান্ত প্রিয় স্বদেশী বস্তু পাইয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। বিভূতিভূষণের বর্তমান সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের ফল, সুনিপুণ বিষয়নির্বাচনের পুরস্কার।

কিন্তু 'পথের পাঁচালী'-তে বিভূতিবাবু বাংলা সাহিত্যকে স্থায়ী এমন কিছু দিয়াছেন যাহার মূল্য সমসাময়িক রুচি-অরুচির মানদণ্ড দিয়া নিরূপিত হইবার নহে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে কিরূপ সতর্কতার সহিত তিনি শরৎচন্দ্রের এলেকার পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পল্লীচিত্র শরৎচন্দ্রের পল্লীচিত্রকে সমর্থনও করে না, প্রতিবাদও করে না, পাশাপাশি দাঁড়াইয়া থাকে। যেখানে শরৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন পল্লী-সমাজ, বিভূতিভূষণ আঁকিয়াছেন একটি পল্লী-গৃহ, তাহাও সম্পূর্ণ নহে, কারণ সর্বজয়া ইন্দিরঠাকরুণের সংসারে হরিহর রায়ের অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। আর ইন্দিরঠাকরুণের শোচনীয় মৃত্যুর যে করুণ চিত্র গ্রন্থকার আঁকিয়াছেন তাহা কোন প্রকৃত পল্লীগ্রামে ঘটা সম্ভব বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। বাংলার পল্লীসমাজ যতই পাপদুষ্ট কলঙ্ক-জর্জরিত

হউক, এটুকু হিতবুদ্ধি ও ক্ষমতা তাহার এখনও আছে যে ওরূপ অবস্থায় গৃহস্থকে বাধ্য করে অসহায় মুমূর্ষুর সেবা-যত্ন করিতে। লোকালয় হইতে সামান্য দূরে গ্রামের একপাশে ফেলিলেই কোন পল্লী পরিবার যে সমাজ-নিরপেক্ষ হইয়া উঠে তাহা আমাদের সহজে বিশ্বাস হয় না।

তবে একথা মনে রাখিতে হইবে, কোন প্রকৃত পল্লীর অবিকৃত চিত্রাঙ্কন বিভূতিবাবুর মূল উদ্দেশ্য নহে; তিনি চাহিয়াছেন, বাংলার বাঁশ-বনে ঘেরা ঘন-শ্যামল পল্লীগ্রাম দুটি সদ্যজাগ্রত, গ্রহণশীল উপভোগসমর্থ শিশুচিত্তের উপর কি ছাপ ফেলে, কোন্ প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে, তাহাই আঁকিয়া দেখাইতে। তাঁহার নিশ্চিন্দিপুরকে সাধারণ পরিণতমন মানুষের চোখ দিয়া দেখিলে চলিবে না, তাহাকে দেখিতে হইবে দুর্গা অপুর বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখ দিয়া। বিস্ময়বোধ কাব্যানুভূতির উৎস ও বিভূতিভূষণ বিস্ময়বোধের কবি। শিশুচিত্ত বিস্ময়বোধের প্রথম ও প্রধান আধার; তাই 'পথের পাঁচালী'র সুবৃহৎ আয়তন তিনি শিশুচিত্তের বিকাশের ইতিহাসে ভরাইয়া তুলিয়াছেন। এই দিকে তাঁহার শক্তি অনন্যসাধারণ ও তাঁহার কীর্তি বঙ্গ সাহিত্যে অতুলনীয়। বিস্ময়বোধের ফলে, বস্তু-বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁহার চোখ নাক কান আশ্চর্য রকমে খোলা ও সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীগ্রামের তুচ্ছতম গাছ-গাছালির পাখ-পাখালির খুঁটিনাটিও তাঁহার লক্ষ্য এড়াইয়া যায় নাই। ইংরেজি সাহিত্যে দেখা যায় গাছ, লতা, ফুল, ফল, পশু, পাখীদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের সহিত সাহিত্যসেবীগণের কি অন্তরঙ্গ সহমর্মিতা ও নিগূঢ় পরিচয়। তুলনায় বঙ্গ-সাহিত্যে এই অভাব অতি সহজেই চোখে পড়ে। কোন দৃশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া বাঙালী কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট জ্ঞানের অভাবে কয়েকটি অতিপরিচিত নামের পরই 'কত-কি ফুল', 'নাম-না-জানা পাখী' ইত্যাদি অস্পষ্ট কথার আড়ালে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কিন্তু 'পথের পাঁচালী'-তে এরূপ ফাঁকি কোথায়ও নাই বলিলে চলে। বর্ণে-গন্ধে-স্বাদে-শব্দে পল্লীলক্ষ্মীর ভাণ্ডারও যেরূপ প্রচুর, বিভূতিবাবুর বর্ণনাও সেইরূপ সমৃদ্ধ। বহিঃপ্রকৃতির সানুরাগ পর্যবেক্ষণ-শক্তিতে তাঁহার আসন সুবিখ্যাত ডব্লিউ, এইচ্ হাড্সন্-এর শ্রেণীতে অকুণ্ঠ-অধিকার বলে বসানো যাইতে পারে। ইহার অতিরিক্ত প্রশংসা ভাবোচ্ছ্বাস বলিয়া বোধ হয়।

বাল্যকালে পল্লীগ্রাম যত বিভিন্ন উপায়ে আনন্দ দিতে পারে, 'পথের পাঁচালী'তে গ্রন্থকার তাহাদের সবিস্তার ও সর্বাঙ্গসুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন।

আমকুড়ানো, নোনাপাড়া, পানফলতোলা হইতে কড়িখেলা, নৌকাবাওয়া, বায়োস্কোপ দেখা ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়ে নাই। কিন্তু পল্লীশিশুর প্রধানতম সুখের একটি উপলক্ষ সাঁতার দেওয়া। কি মনে করিয়া যে বিভূতিবাবু দুর্গা ও অপুকে ইহা হইতে বঞ্চিত করিলেন তাহা তিনিই জানেন। ইছামতীতে না হয় কুমীরের ভয়, কিন্তু নিশ্চিন্দিপুরে কি কোন পুকুর ছিল না?

'অপরাজিত'-র পরিচয়-প্রসঙ্গে 'পথের পাঁচালী'-র এই পর্যালোচনা অপরিহার্য, কেননা, 'অপরাজিত' স্বতন্ত্র উপন্যাস নহে, শেষোক্ত গ্রন্থেরই সম্প্রসারণ। 'পথের পাঁচালী'-র শেষভাগে দেখিতে পাওয়া যায় দশ-এগারো বৎসরের পিতৃহীন শিশু অপু মফঃস্বলের কোন এক শহরে পাচিকা মায়ের মনিব জমিদার বাড়িতে থাকিয়া স্কুলে যাইতেছে ও বিনাদোষে মার খাইয়া নিশ্চিন্দি-পুরে ফেরার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সেই একান্ত বাসনা পূর্ণ হইল বছর চব্বিশ পরে। এই চব্বিশ বৎসরের বঙ্কিম ইতিহাস 'অপরাজিত'-র দুইখণ্ডে প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ। সে ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার অসম্ভব— কারণ অপু-র ঘটনাবহুল জীবনকাহিনীটি ঠিক দশগজী মসলিন্-এর মত নয়, যাহাকে নাকি একটি আংটির আয়তনে আঁটা যাইত। মোটামুটি এটুকু জানিলেই যথেষ্ট যে, অপু মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া হাইস্কুলে পড়িল, প্রবেশিকা পাশ করিয়া কলিকাতার রিপণ কলেজে ভর্তি হইল। দারিদ্র্যের সহিত লড়াই করিয়া আই, এ, পরীক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে মা সর্বজয়াকে হারাইল। খবরের কাগজে কাজ করিতে করিতে বন্ধুর মামার বাড়ী বেড়াইতে গিয়া তাহার প্রায় দোপড়া মামাতো বোন অপর্ণাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইল। পরে একদিকে ক্লান্তিকর কেরানীগিরি, অন্যদিকে শান্তিময় পারিবারিক জীবন। পুত্রের জন্ম দিয়াই স্ত্রীর মৃত্যু ও অপুর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছু দেশ-ভ্রমণের পর সুদূর মধ্যপ্রদেশে অরণ্যবাস। পাঁচ-ছয় বৎসর পরে বাংলাদেশে ফিরিয়া পুত্র কাজলকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিল ও ক্রমে গল্প ও উপন্যাস লেখক হিসাবে তাহার প্রতিপত্তি ও অর্থাগম হইতে লাগিল। এক বিদেশী বন্ধুর প্রস্তাবে সে ভারতবর্ষের বাহিরে পর্যটনের সুবিধা পাইল ও নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া তাহার বাল্যসঙ্গী বর্তমানে নিঃসন্তান বিধবা রাণুদির অভিভাবকতায় পুত্রকে রাখিয়া সুদূরের পিয়াসা মিটাইবার জন্য ভাসিয়া পড়িল। অপুর জীবন-কাহিনীর বর্তমান পরিসমাপ্তি এই চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরেরই। বঙ্গ-

সাহিত্যে তাহার পুনরুদয় দেখার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিবে কিনা তাহা বিভূতিবাবুই বলিতে পারেন।

দেখা যাইতেছে সেই একই অপু-র জীবনকাহিনী হইলেও 'অপরাজিত' ঠিক 'পথের পাঁচালী'-র সমধর্মী রচনা নহে। যে ক্ষুদ্র পল্লী-বিশ্বের গণ্ডীর ভিতর অপু-র বাল্যজীবন কাটিয়াছে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে চিরদিন সেখানে আবদ্ধ রাখা সম্ভব হইল না। বলা যাইতে পারে, 'পথের পাঁচালী'র প্রধান চরিত্রই হইয়াছে নিশ্চিন্দিপুর। 'অপরাজিত'-র নিশ্চিন্দিপুর দূরে মিলাইয়া গিয়াছে, চোখের উপর হইতে মনের আড়ালে স্থান পাইয়াছে। যাহা প্রত্যক্ষ ছিল, তাহা হইয়া উঠিয়াছে স্মৃতি। গ্রীক পুরাণে বলে মিউজ্-রা নিমোজিনী-র কন্যা, অর্থাৎ স্মৃতিই কবিতার জননী। বিভূতিভূষণ যে কবি, ও তাঁহার কবিত্ব যে স্মৃতিমূলক, তাহার প্রভূত নিদর্শন 'অপরাজিত'-র পাওয়া যায়। যখন তখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে নিশ্চিন্দিপুরের কথা অপু-র মনে পড়িয়া যায়, ও কোন্ অদৃশ্য অঙ্গুলির পরিচালনায় স্মৃতির জলতরঙ্গ টুং-টাং করিয়া বাজিয়া ওঠে। সামান্য কয়টি কথার ভাবগর্ভ প্রয়োগে বাংলার পল্লী-শোভা রূপ পরিগ্রহ করে। শুধু বাংলাদেশ কেন, প্রকৃতির অন্য দৃশ্যও যে বিভূতিভূষণের কবিত্বশক্তিকে উদ্‌বোধিত করিতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মধ্য-প্রদেশে বিন্ধ্যারণ্যের সুবিস্তৃত বর্ণনা। ভাষার লালিত্যে, ভাবের ঘনত্বে, পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতায় তাহার তুলনা বাংলা ভাষায় দুর্লভ।

স্মৃতির আর এক কাজ সময়ের গতিকে স্তম্ভিত করিয়া, কালপ্রবাহকে বিপরীত মুখে চালানো। প্রথম স্মৃতির সাহায্যে বর্তমানের কঠিন নিগড় হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, অতীত বর্তমান অপেক্ষাও সজীব হইয়া উঠে। এই স্মৃতিলীলার ফলে বিভূতিবাবুর উপন্যাসে বর্তমান হইতে অতীতে ও অতীত হইতে বর্তমানে নিয়ত যাতায়াত চলে। হঠাৎ প্রুস্ত্-এর "হারানো কালের অনুধাবনের" কথা মনে পড়িয়া যায়। পরক্ষণেই ধরা পড়ে এ তুলনা কপট তুলনা। কথাশিল্পে কাল-বোধের প্রয়োগে বিভূতিবাবু সনাতনপন্থী; অপু-র জীবনকাহিনীতে সময়ের ক্রম সহজেই অনুসরণ করা যায়, ঘটনার পারম্পর্যের শৃঙ্খল অটুট থাকে বলিয়া। প্রুস্ত্ একেবারে বিপ্লবপন্থী। তাঁহার কালক্রম বৈজ্ঞানিকের ক্রনোমিটারে ধরা পড়িবার নয়। তাহা একেবারে স্বসিদ্ধ, যেতর কোন শাসনের বশীভূত নয়।

প্রুস্ত্-বর্ণিত কাল স্থিতিস্থাপকশীল, তাহার আপেক্ষিকতা বহির্বর্তী

মানদণ্ডের অতীত। এ-কথায় সকলেই সায় দিবেন যে গ্রন্থের মধ্যে তারিখ বা যুগ-সম্বন্ধে কখনো কোন সুনিশ্চিত নির্দেশ থাকে না। তাঁহার উপন্যাসে কালগণনা মাস বা বৎসরের অনুপাতে হয় না, হয় কেবল আত্মার ঋতুপরিবর্তন অনুসারে। কালের সেই বঙ্কিম প্রবাহ এতই অনিয়ন্ত্রিত যে তাহাকে অঙ্কে বাঁধা অসাধ্য। সেখানে পরিবেষ্টনের সামান্য বিকারই বিশ্বসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট, এবং সেই বিবর্তনেই পাঠক সঞ্জীবিত হইয়া উঠে; সেখানে দেশ ও কাল স্বপ্নের উপকরণ মাত্র, আসলে উহাদের পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতই অভীষ্ট বস্তু।

কিন্তু মানবমনের কারবার তো শুধু বস্তু-বিশ্বকে লইয়া নহে, বুদ্ধির জন্য, তৃপ্তির জন্য, আনন্দের জন্য তাহাকে মানবজগতেও চলাফেরা করিতে হয়। মানব-জগতের বৈচিত্র্যের অবধি নাই, মানুষের সংস্পর্শে আমাদের অন্তরলোক যে বিকাশ লাভ করে তাহার রহস্যের আদি অন্ত নাই। বিভূতিবাবু তাঁহার রচনায় এই মানবজগতকেও প্রতিবিম্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গতির পথে অগ্রসর হইতে গিয়া অপু যে কত বিভিন্ন ধরনের নরনারীর জীবন-বৃত্তকে ছেদ করিয়া গেল, বিভূতিবাবু সযত্নে তাহাদের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়। তিনি জীবনকে ব্যাপকভাবে দেখিতে চাহিয়াছেন—মস্তিষ্ক-প্রসূত কোন মতামতের পরকলার ভিতর দিয়া নহে। অনেক তুচ্ছ ঘটনা ও অবহেলিত প্রাণী তাই তাঁহার অনুকম্পালাভে বঞ্চিত হয় নাই। তাঁহার চিত্রপট বিস্তৃতপরিসর ও চিত্রশালিকা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ; তবুও মনে হয়, মানবচরিত্র অঙ্কনে তাঁহার দৃষ্টি অগভীর, অভিজ্ঞতা স্বল্প, শক্তি ক্ষীণ ও সাফল্য সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ। ইহার কারণ, প্রাকৃতিক জগতে সামান্য তৃণগুচ্ছ হইতে বিরাট নীহারিকাপুঞ্জ ও নাক্ষত্রিক আকাশের নিকট তিনি নিজেকে যেমন ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছেন, মানবজগতে তাহা পারেন নাই।

"ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু, কবির স্বপ্ন বহির্জগৎ হইতে অন্তরে প্রবেশ করে যেন অত্যাচারীর মত। প্রসঙ্গ-নির্বাচনে শিল্পীর কোন হাত নাই, প্রসঙ্গই তাহাকে মনোনীত করিয়া লয়। তখন প্রকাশ করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর তো থাকেই না; উপরন্তু ব্যঞ্জনাকে অকৃত্রিম ও অবিকল করিতেও সে বাধ্য হয়। ভাবুক ও বিজ্ঞজনের মত ধ্যেয় সত্যের নিকটে আত্মসমর্পণ করাই শিল্পীর পরম কর্তব্য। যেমন বহিরঙ্গ বস্তুর প্রত্যুৎপাদনই জ্ঞানার্জনের একমাত্র লক্ষ্য, রূপকারের সাধনাও তদনুরূপ। সে উদ্ভাবক নহে, আবিষ্কারক, কপোলকল্পনা তাহার ব্রত নহে, তাহার ব্রত কেবল জিজ্ঞাসা।" (প্রস্থ)

মানবজীবন সম্বন্ধে এই exploration-এর, অনুসন্ধানের আভাস বিভূতি-বাবুর রচনায় পাওয়া যায় না। আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা অত্যন্ত ভাসা-ভাসা, সাদামাটা মামুলি স্তরের। তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি হয় মামুলি ধরনে ভাল, না হয় মামুলি ধরনে মন্দ, না হয় মামুলি ধরনেই প্রাণহীন জড় পদার্থ—এতই মামুলি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের সম্বন্ধে আরও জানিতে কোন কৌতূহল হয় না। তিনি নিজে লিখিয়াছেন বটে সকল বড় সাহিত্যের মূলে আছে মানব-বেদনা, কিন্তু বোধহয় উপলব্ধি করেন নাই যে বেদনার অনন্ত-রূপ, শুধু দারিদ্র্যের সহিত সংঘর্ষই তো তাহার একমাত্র প্রকাশ নয়। দারিদ্র্যের সহিত অপু-র বিরোধও অত্যন্ত মামুলি ধরনের—কখনও খাইয়া কখনও না খাইয়া, কখনও চাকরি করিয়া, কখনও না করিয়া অপু দারিদ্র্যকে বহিয়া চলিয়াছে মাত্র। একটা সহজ জীবনানন্দ ও রোমান্স-প্রিয়তার দোহাই দিয়া গ্রন্থকার অপু-কে সর্ববিধ অন্তর্দ্বন্দ্ব—প্রলোভন, প্রেমাবেগ, ভাববিপ্লব, আদর্শবিভ্রাট ইত্যাদি হইতে সযত্নে দূরে রাখিয়াছেন। অথচ এইসব অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারাই বালক মানুষ হইয়া ওঠে, মানুষ অতিমানুষ হইবার আশা রাখে। জীবনের জটিলতাকে জানিলে তবেই জীবনকে জয় করা সার্থক—যে তাহা জানিল না সে কিসে অপরাজিত? তাহার সারা জীবনই তো অপরিণত। এই অতিকায় উপন্যাসখানির কোথায়ও জীবনের কোন জটিলতার সম্মুখীন হইবার প্রয়াস দেখা যায় না। ইহারই মধ্যে সবচেয়ে জটিল চরিত্র "লীলা"; সেও অত্যন্ত মামুলিভাবে জটিল। বড় ঘরের রূপসী, বিদুষী তরুণী এক বিলাতফেরৎ বদ্-মেজাজ চরিত্রহীন বড়লোক স্বামীর অত্যাচারে কুলত্যাগ করিয়া অন্য এক তরুণ ব্যারিস্টারের হাতে গিয়া পড়িল যে তাহার সঞ্চিত অর্থ নির্বিকারে ফাঁকি দিয়া ফুঁকিয়া দিল। পরে সে থাইসিস-এ আক্রান্ত হইয়া একদিন হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়া বসিল—এ কাহিনী কি সর্বজন পরিচিত নহে? অপু-র সহিত লীলা-র স্বল্পব্যক্ত প্রণয় সম্বন্ধের প্রকৃতি এমনই অবাস্তব, ভিত্তি এতই শিথিল যে তাহার গভীরত্বে বিশ্বাস করা রমণীমন-অনভিজ্ঞ অপরিণত বয়সের বাহিরে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। গভীরতার ও জটিলতার অভাবে কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরম দুর্বলতাই উপন্যাসখানির প্রধান ব্যর্থতা। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরিয়া এই বিমুখীনতার তথ্যবহুল বিবরণ পড়া ক্লান্তিদায়ক হইয়া উঠে। ছদ্মবেশী আত্মচরিতের বিপদই বোধ হয় এই যে যে ছোট ঘটনা গ্রন্থকারের নিকট দ্যোতনাপূর্ণ, তাহা পাঠকসাধারণের নিকট ব্যর্থ হইতে পারে, এ চেতনা সহজেই

লোপ পায়। খুঁটিনাটির বিবরণেও মাঝে মাঝে ত্রুটি ঘটিয়াছে। ইতুপূজা কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে না হইয়া পৌষ মাসের পিছনে চলিয়া গিয়াছে। সরস্বতী পূজা কোনকালে মাঘ মাসের কয়েক মাস পরে হইতে পারে না; পূজার ছুটির ঠিক পূর্বেই কলিকাতায় হকি খেলিবার সীজ্‌ন্ নয়; ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ্ সায়েন্স এণ্ড টেক্‌নলজির ঠিকানা বোধহয় কেম্‌ব্রিজে নয়, লণ্ডনে। কিন্তু ক্লান্তি না আসার আসল কারণ বিভূতিবাবুর ভাষা। মাঝে মাঝে শব্দবিন্যাস-বিপর্যয় আছে। তথাপি তাহা স্বচ্ছ ও অনায়াস। মনে পড়ে মিড্‌লটন্ মারি-র উক্তি—"Try to be precise and you are bound to be metaphorical"। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভ্রমণ কাহিনীতে বিভূতিবাবু যে সুপঠিত তাহার অনেক ইঙ্গিত যেখানে সেখানে ছড়ানো আছে। কিন্তু কোথায়ও অবান্তর কোটেশন বা এলিউশন-এর সাহায্যে বিদ্যা জাহির করিবার সহজ পন্থায় পাঠকের চমক উৎপাদন করিবার চেষ্টা নাই। তাঁহার পরিশীলন মেঘান্তরিত সূর্যরশ্মির মত সহনক্ষম দীপ্তিতে তাঁহার রচনাকে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। রচনায় এই দুর্লভ প্রসাদগুণ ও কবিত্বশক্তি সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয় উপন্যাসকার হিসাবে, মানবচরিত্রের বিবৃতিকার হিসাবে বিভূতিভূষণ বড় বই লিখিলেও বড় লেখক নহেন। কারণ—

"বড় লেখক তিনিই যাঁহার চোখে বস্তুবিশ্বের নবতর বিন্যাস প্রতিভাত হয়। তাঁহার দিব্যদৃষ্টির এমনি অনিবার্য মহিমা যে তিনি এই বিন্যাসেই চিরন্তনের পরিপূর্ণতার সন্ধান পান। বাতায়নের মত তাঁহার সৃষ্টি আমাদের সামনে নূতন পরিপ্রেক্ষিত আনিয়া দেয়; অদ্যাবধি-অজানা জগতে নিষ্ক্রমণের পথ প্রশস্ত করে।"

শ্রাবণ, ১৩৩৯ নীরেন্দ্রনাথ রায়

শান্তির স্বপক্ষে

দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের ডাক

[গত ১৩ই নভেম্বর বৃটেনে শেফিল্ড শহরে দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেন্ট শত শত প্রতিনিধিকে—বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অনেককেই বৃটেনে প্রবেশের অনুমতি দিলেন না। বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের সভাপতি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ফ্রেডারিক জোলিও কুরী, বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জ্যাঁ লাফিং, কার্যকরী সমিতির বিশিষ্ট সভ্যগণ, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়কগণ যেমন আলেকজান্দার ফাদায়েভ, ইলিয়া এরেনবুর্গ, এমি সিয়াও, আনা সেগার্স, আর্নল্ড জুইগ, শোস্তাকোভিচ্ প্রভৃতি অনেকের সামনেই বৃটেনের রাষ্ট্রীয় দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার সংগ্রামে সর্বমতের ও পথের জনসাধারণের স্বাধীন আলোচনায়, শান্তিরক্ষার ভিত্তি নির্ধারণের জন্যে বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বৃটেনে সম্ভব হল না।

অতঃপর পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ শহরে সম্মেলনের অধিবেশন-মণ্ডপ স্থানান্তরিত হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ শহরে মর্মস্পর্শী অভিনন্দন পেলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শান্তি-সৈনিকেরা। নতুন গণতন্ত্রের দেশে, পোলিস গভর্নমেন্টের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় নিখুঁত ব্যবস্থায় স্পেশাল ট্রেন ও এরোপ্লেনে প্রতিনিধিবৃন্দ সমবেত হলেন ওয়ারশতে।

১৬ই নভেম্বর সন্ধ্যায় পোল্যাণ্ডের নবনির্মিত রাষ্ট্রীয় পুস্তক-প্রকাশালয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের উদ্বোধন হল।

১৬ই থেকে ২২শে নভেম্বর সাত দিন ধরে অধিবেশন চলল। ৮১টি দেশের পক্ষ থেকে ১৭২৬ জন প্রতিনিধি, ৩০১ জন দর্শক ও আমন্ত্রিত ব্যক্তি আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন। শেষ দিনের অধিবেশনে সম্মেলনের রাজনৈতিক কমিশনের সভাপতি পিয়েত্রো নেনী দুটি খসড়া

প্রস্তাব পেশ করেন। একটি বিশ্বের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে শান্তি কংগ্রেসের ঘোষণাপত্র, অপরটি সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের নিকট আবেদন। এছাড়া শান্তি-সৈনিকদের উপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদ করে আরও একটি প্রস্তাব সম্মেলনে উত্থাপন করেন পাব্‌লো নেরুদা। বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে প্রস্তাব-গুলি গৃহীত হল। মোট ১৭৫৪ জন প্রতিনিধি ভোটে অংশগ্রহণ করেন ; মাত্র তিন জন এর বিরোধিতা করেন এবং দুজন ভোটদানে বিরত থাকেন।

বিশ্বের জনমতের অভিব্যক্তি-সূচক এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের শেষ দিনে শান্তি-পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় 'পোলিস ন্যাশনাল থিয়েটর' গৃহে। পুরস্কার-প্রাপ্তদের তালিকায় রয়েছেন শহীদ জুলিয়াস্ ফুচিক এবং পাব্‌লো নেরুদা, পল রোব্‌সন, নাজিম হিক্‌মেৎ, পাব্‌লো পিকাসো প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক ও শিল্পীরা।

যুদ্ধবাদীদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা শান্তি-সৈনিকদের সামনে বৃটেনের দরজা বন্ধ করতে সমর্থ হলেও শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের কণ্ঠ রোধ করতে পারেনি। —সম্পাদক]

স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষ আজ যুদ্ধের বিভীষিকায় আচ্ছন্ন। সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান শান্তি ও স্বস্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে, জনসাধারণের এই আশা পূরণে ঐ প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হয়েছে। মানুষের সমগ্র জীবন ও সভ্যতা আজ ধ্বংসের সম্মুখীন।

জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে স্বাধীনতা, শান্তি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে তোলার যে আদর্শে অনুপ্রাণনার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একদিন এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্থাপনা হয়েছিল, দুনিয়ার জনসাধারণ আজ এই আশা পোষণ করে যে, সেই সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান আবার দ্বিধাহীনচিত্তে তার সেই প্রাক্তন আদর্শের ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু দুনিয়ার মানুষ এই আশা পোষণ করলেও সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে তারা নিজেদের উপর, তাদের নিজেদের অবিচল প্রতিজ্ঞা ও শুভবুদ্ধির উপর। প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ব্যক্তিই জানেন যে "যুদ্ধ অবশ্যই হবে"—একথা বলার অর্থ আজ সমগ্র মানবসমাজের নামে দোষারোপ করা।

আপনি—যিনি এই মুহূর্তে সমস্ত দুনিয়ার ৮০টি জাতির জনগণের পক্ষ থেকে ওয়ারশতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের এই ঘোষণাপত্রটি পাঠ

করছেন—আপনি কখনই ভুলতে পারেন না যে, শান্তির জন্যে সংগ্রাম আপনারই সংগ্রাম। আপনি জেনে রাখুন যে, কোটি কোটি ঐক্যবদ্ধ মানুষ সহযোগিতা লাভের আশায় আজ আপনার দিকে তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ঐ শুনুন, ওরা আপনাকে ডাকছে—মানুষের সমাজ এ-পর্যন্ত যত রকমের সংগ্রাম করেছে তার মধ্যে মহত্তম, ভবিষ্যত জয় সম্পর্কে সবচেয়ে দৃঢ়নিশ্চিত, এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার জন্যে ওরা ডাকছে আপনাকে।

শান্তি টুপ্ করে আমাদের হাতে এসে পড়বে না, তাকে ছিনিয়ে আনতে হবে। আসুন, আমাদের বিচ্ছিন্ন খণ্ড প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করে আমরা দাবি করি—যে-যুদ্ধ আজ কোরিয়াকে ক্ষতবিক্ষত করছে, কাল যে-যুদ্ধ সারা দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেবে, এই মুহূর্তে সে-যুদ্ধের অবসান হোক।

জার্মানি ও জাপানে আরেকবারের মত যুদ্ধের চিতাবহ্নি প্রজ্বালনের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের এই সংগ্রামে এগিয়ে এসে আপনিও হাত মেলান।

স্টকহোম-আবেদনপত্রে যাঁরা স্বাক্ষর দিয়েছেন সেই ৫০কোটি মানুষের সঙ্গে আপনিও আপনার কণ্ঠস্বর মেলান: আণবিক অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করার, সাধারণভাবে নিরস্ত্রীকরণের এবং এই সমস্ত সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করে তোলার জন্যে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দাবি করুন। সাধারণভাবে নিরস্ত্রীকরণ ও আণবিক অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংসের ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্যে কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করা সংগঠনগতভাবে এখনই সম্ভব; আজ শুধু প্রয়োজন শুভ বুদ্ধির।

যুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচারকে বে-আইনী ঘোষণা করার দাবি তুলুন। এই দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসে গৃহীত আমাদের শান্তির প্রস্তাবসমূহ যাতে আমাদের বিভিন্ন দেশের আইনসভার প্রতিনিধিদের, বিভিন্ন দেশের গভর্নমেণ্টের ও সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের নজরে আসে তার ব্যবস্থা করুন।

দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষের সম্মিলিত শক্তি যথেষ্ট। শান্তিকামী জনগণের কণ্ঠ এতদূর সবল যে, সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলে আমরা বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রতিনিধিদের আলোচনা-সভা ডাকার অদম্য দাবি তুলতে পারি।

দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের এই অনুষ্ঠান তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে, পাঁচটি বিভিন্ন মহাদেশ থেকে আগত সমবেত নরনারীও তাঁদের সমস্ত মতপার্থক্য সত্ত্বেও শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং যুদ্ধের অপঘাতকে প্রতিহত করার জন্যে একমত হতে পারেন।

বিভিন্ন দেশের গভর্নমেন্টও এই একইভাবে কাজ করুন এবং তা হলেই শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে।

সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন

দুনিয়ার জনসাধারণ নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানেব সৃষ্টি করেছিল। শান্তিব আশাই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় আশা।

কিন্তু আজ ইতিমধ্যেই যুদ্ধ কোন কোন জাতির শান্তিময় জীবন বিব্রত করে তুলেছে এবং আগামীকাল যে সমস্ত মানুষেরই শান্তি সে বিপন্ন করবে এমন আশংকা দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্পর্কে দুনিয়ার সমস্ত জাতি, অর্থাৎ যে সব জাতির গভর্নমেন্টেব প্রতিনিধি এতে আছে এবং যাদের আজও নেই, সবাই-ই যে মহৎ আশা পোষণ করেছিল তা যদি আজ পূর্ণ না হয়ে থাকে, তবে তার কারণ রাষ্ট্রপুঞ্জ এমন শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে যা সার্বজনীন শান্তির একমাত্র পথ, সাধারণ মতৈক্য সন্ধানের পথ, পরিত্যাগ করেছে।

দুনিয়ার জাতিসমূহ আজ রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্পর্কে যে আশা রাখে তা যদি তাকে পূর্ণ করতে হয়, তবে যেদিন থেকে তার সূচনা সে দিন থেকে জনগণ তার জন্য যে গতিপথ নির্দেশ করে দিয়েছে সে পথে তাকে ফিরে আসতে হবে এবং সেদিকে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমান বিরোধগুলির আলোচনা ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য তাকে যথাসম্ভব শীঘ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন ও. চীনা পিপ্‌লস্‌ রিপাবলিক, এই পাঁচ বৃহৎ শক্তির বৈঠক ডাকতে হবে।

আশিটি দেশের প্রতিনিধি-সমন্বিত এবং শান্তিকামী সমস্ত মানবসমাজের সত্যিকারের মুখপাত্র দ্বিতীয় বিশ্ব-কংগ্রেস দাবি করে যে, শান্তি ফিরিয়ে আনার ও রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সমাজব্যবস্থা নির্বিশেষে সমস্ত দেশের মধ্যে বিশ্বাসের ভাব ফিরিয়ে আনা ও রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি যেন রাষ্ট্রপুঞ্জ ও বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টগুলি—যাদের কাছে ঐ সব দেশের গভর্নমেন্টগুলি দায়ী—অবিলম্বে বিবেচনা করে দেখেন :

(১) আজ কোরিয়ায় যে যুদ্ধ চলছে তাতে কোরিয়ার জনগণেরই যে শুধু অপরিমেয় ক্ষতি হচ্ছে তাই নয়, ঐ যুদ্ধের এক নতুন বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। এই ঘটনায় বিচলিত হয়ে আমরা দাবি করি,

অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করা হোক, কোরিয়া থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য সরিয়ে আনা হোক এবং কোরিয়ার জনগণের প্রতিনিধিদের যোগদানে কোরিয়ার দুই অংশের আভ্যন্তরীণ বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হোক। আমরা দাবি করি, চীনা পিপ্‌লস রিপাবলিকের প্রতিনিধিদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ স্বস্তিপরিষদ এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করুক।

আমরা চীনা দ্বীপ তাইওয়ানে (ফরমোজায়) সশস্ত্র মার্কিন হস্তক্ষেপের অবসান এবং ভিয়েৎনাম গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধের দাবি করি। এই দুই সামরিক অভিযানের মধ্যেই বিশ্বযুদ্ধের বিপদ নিহিত আছে।

(২) জার্মানি ও জাপানের পুনরস্ত্রীকরণ নিষিদ্ধ করে যে সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়েছে, সেগুলি ভঙ্গ করবার প্রতিটি চেষ্টা ও ব্যবস্থাকে স্পষ্টভাবে আমরা নিন্দা করি। এই সব চেষ্টা ও ব্যবস্থা শান্তির পক্ষে দারুণ বিপদের কথা। আমরা স্পষ্টভাষায় দাবি করি, সংযুক্ত ও নিরস্ত্রীকৃত জার্মানির সঙ্গে শান্তি-চুক্তি সম্পন্ন করা হোক; জাপানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সই করা হোক এবং উভয় দেশ থেকেই দখলকারী সেনাবাহিনী সরিয়ে আনা হোক।

(৩) কোনো জাতিকে পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দাস করে রাখা শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক বলে আমরা মনে করি এবং এই সব জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার অধিকার আমরা ঘোষণা করি। সেই সঙ্গে আমরা সর্বপ্রকার জাতি-বৈষম্যের বিরুদ্ধেও আমাদের প্রতিবাদ জানাই; কারণ এর থেকে আসে জাতিবিদ্বেষ এবং শান্তি বিপন্ন হয়।

(৪) পরদেশ আক্রমণের অর্থ পর্যন্ত বিকৃত করে পরজাতির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশী হস্তক্ষেপের অছিলা তৈরি করার প্রচেষ্টার মুখোশ খুলে দেওয়া আমরা আবশ্যক মনে করি। আমরা ঘোষণা করি, কোন রাজনৈতিক, সামরিক বা আর্থনীতিক কারণে, এক বা অন্য কোন রাষ্ট্রের কোন আভ্যন্তরীণ বিরোধ বা কোন আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সুযোগে অন্য রাষ্ট্রের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ সমর্থন করা চলবে না। যে রাষ্ট্র যে কোন অছিলাতেই হোক অন্য কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করবে সেই রাষ্ট্র পরদেশ আক্রমণের অপরাধে অপরাধী হবে।

(৫) আমাদের বিশ্বাস নতুন যুদ্ধের প্রচার বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার পক্ষে এক মারাত্মক বিপদ এবং সমস্ত মানব-সমাজের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অপরাধ।

আমরা সমস্ত দেশের পার্লামেণ্টগুলিকে শান্তিরক্ষার জন্ত এমন একটি আইন প্রবর্তনের অনুরোধ জানাচ্ছি, যে আইনে নতুন যুদ্ধের যে কোনরূপ প্রচারই অপরাধ বলে গণ্য হবে।

(৬) রাজনীতিক মতবাদ নির্বিশেষে সমস্ত সুসভ্য মানুষই অসামরিক জনসাধারণের নির্মম ব্যাপক হত্যাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণ্য করেন। আমরা দাবি করি, কোরিয়ার অনুষ্ঠিত সমস্ত অপরাধ এবং বিশেষত জেনারেল ম্যাকআর্থারের দায়িত্বের প্রশ্ন পরীক্ষা করে দেখবার জন্ত একটি আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বশীল কমিশন নিয়োগ করা হোক।

(৭) যে সকল জাতি যুদ্ধ-বাজেটের বোঝা বহন করছে তাদের দাবি অনুযায়ী এবং মানব-সমাজে স্থায়ী ও সুদৃঢ় শান্তি আনয়নের কঠোর সংকল্প নিয়ে আমরা রাষ্ট্রপুঞ্জের, সমস্ত পার্লামেণ্টগুলির এবং সমস্ত জাতিগুলির বিবেচনার জন্ত নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করছি :

সর্বপ্রকারের আণবিক অস্ত্র এবং জীবাণুঘটিত, রাসায়নিক, বিষাক্ত গ্যাস, তেজস্ক্রিয় (Radio-active) প্রভৃতি সর্বপ্রকারের ব্যাপক গণহত্যার প্রক্রিয়াকে বিনাশর্তে নিষিদ্ধ করা হোক।

যে গভর্নমেণ্ট প্রথম এই সব প্রক্রিয়া প্রয়োগ করবে তাকে যুদ্ধাপরাধী বলে গণ্য করা হবে বলে ঘোষণা করা হোক।

জাতিসমূহের প্রতি নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেস বৃহৎ শক্তিগুলির কাছেও উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে এবং ১৯৫১-৫২ সালের মধ্যে স্থল, জল ও বিমানের সশস্ত্র বাহিনীকে সকলে একসঙ্গে, ক্রমবর্ধিতগতিতে ও ক্রমানুপাতে এক তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধাংশ কমিয়ে আনবার জন্ত তাদের অনুরোধ জানাচ্ছে।

এই ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে সমরাস্ত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতার সুনির্দিষ্ট সমাপ্তি ঘটবে এবং পরদেশ আক্রমণের বিপদ কমবে। এতে যুদ্ধ বাজেটের বোঝা কমে যাবে, যে দারুণ বোঝা সমস্ত স্তরের জনসাধারণকেই বইতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিশ্বাস এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্বিশেষে সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ফিরিয়ে আনবার পক্ষেও এতে সাহায্য হবে।

কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে, আণবিক অস্ত্রের ও ব্যাপক গণহত্যার অন্তান্ত প্রকারের অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ এবং সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস নিয়ন্ত্রণ করা সাংগঠনিকভাবে সম্ভব।

মন্ত্রি-পরিষদের অধীনে কর্তৃত্বসম্পন্ন একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে থাকবে অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস নিয়ন্ত্রণ করা এবং আণবিক, জীবাণুতাত্ত্বিক, রাসায়নিক ও গণহত্যার অন্যান্য উপায়ের উপর নিষেধাজ্ঞাকে কার্যকরী করা।

এই নিয়ন্ত্রণকে কার্যকরী করতে হলে শুধুমাত্র প্রত্যেক দেশ কর্তৃক ঘোষিত তার সামরিক সেনাশক্তি, তার বর্তমান অস্ত্রশস্ত্র ও তার অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনকে এই নিয়ন্ত্রণাধীনে আনলে চলবে না; অঘোষিত অথচ সন্দেহাধীন সমস্ত সামরিক সেনাশক্তি, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনকেও এই নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে হবে।

সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ সমস্ত শান্তি-সৈনিকদের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং সশস্ত্র সেনাশক্তি হ্রাসের এই প্রস্তাবগুলি ঐ লক্ষ্যপথের প্রথম পদক্ষেপ।

দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের বিশ্বাস মারণাস্ত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতার দ্বারা শক্তিসাম্য রক্ষার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে শান্তি আসতে পারে না। কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে, সে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব তুলেছে তাতে কোন পক্ষেরই কোন সামরিক সুবিধা হবে না, তাতে নিঃসন্দেহে যুদ্ধ বন্ধ হবে, দুনিয়ার জনগণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে এবং তাদের কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে।

(৮) আমরা বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই যে, কোন কোন দেশে শান্তিকালীন আর্থনীতিক ব্যবস্থা থেকে যুদ্ধকালীন আর্থনীতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার স্বাভাবিক আর্থনীতিক সম্পর্ক এবং কাঁচামাল ও শিল্পজাত পণ্য দুইয়েরই বিনিময়-ব্যবস্থা ক্রমেই বেশি করে বিপন্ন হচ্ছে। আমাদের মতে, বহু জাতির জীবনধারণের মানের পক্ষে এর প্রভাব হচ্ছে বিপজ্জনক; আর্থনীতিক অগ্রগতি এবং সমস্ত দেশের মধ্যেকার ব্যবসায় সম্পর্কের পথে এতে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে এবং পরিশেষে এই পরিস্থিতি এমন সব বিরোধের ভিত্তি রচনা করছে যাতে বিশ্ব শান্তি বিপন্ন হয়। সমস্ত দেশের জনসাধারণের জীবনমরণ-স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এবং সারা দুনিয়ার মানুষের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতিকল্পে আমরা প্রস্তাব করছি যে, সর্বপ্রকার আর্থনীতিক বৈষম্য পরিহার করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাতির প্রয়োজনানুযায়ী পারস্পরিক সুবিধার শর্তে স্বাভাবিক বাণিজ্য-সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক, যাতে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ অবাধে হতে পারে এবং ছোট বড় সমস্ত রাষ্ট্রেরই আর্থনীতিক বিকাশ সুনিশ্চিত হতে পারে।

(৯) আমরা মনে করি, বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার সাংস্কৃতিক সম্পর্কের

বিচ্ছেদ বিভেদের ও পরস্পরকে ভুল বুঝবার পথ প্রশস্ত করে এবং যুদ্ধ-প্রচারের অনুকূল একটা অবিশ্বাসের আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। আমরা সমস্ত গভর্নমেন্টকে আহ্বান করে তাঁদের কাছে দাবি করছি যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে উন্নত করতে তাঁরা যেন যত্নবান হন, যাতে সংস্কৃতিক্ষেত্রে পরস্পরের সম্পদের খবর বিভিন্ন জাতি আরও ভালভাবে পেতে পারে। আমরা এও দাবি করছি যে, সংস্কৃতিক্ষেত্রে সক্রিয় ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংগঠনের ও তাঁদের পারস্পরিক ভ্রমণ বিনিময়ের সুবিধা করে দেওয়া হোক এবং অন্যান্য দেশের সাহিত্য ও শিল্পের প্রকাশ ও ব্যাপক প্রচারের সুযোগ করে দেওয়া হোক।

(১০) রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্পর্কে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি যে আশা পোষণ করে সেই আশা পূর্ণ করার জন্য আমরা রাষ্ট্রপুঞ্জকে আহ্বান জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে তাকে এও জানাচ্ছি যে আমরা একটি বিশ্ব শান্তি পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেছি এবং এই পরিষদ এমন একটি প্রতিষ্ঠান হবে যাতে দুনিয়ার সমস্ত জাতির প্রতিনিধি থাকবে—যারা রাষ্ট্রসংঘে আছে তাদের প্রতিনিধিও থাকবে, যারা সেখানে নেই তাদের প্রতিনিধিও থাকবে। পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির প্রতিনিধিও এতে থাকবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ যাতে সমস্ত দেশের মধ্যেকার শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা দৃঢ় ও বিকশিত করে তুলে ব্যবহারিক বাস্তব ক্ষেত্রে তার কর্তব্য সম্পাদন করে তার জন্য বিশ্ব শান্তি পরিষদ রাষ্ট্রপুঞ্জকে আহ্বান জানাবে। সমস্ত জাতিরই জীবনমরণ-স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে সুদৃঢ় ও স্থায়ী শান্তি স্থাপনের মহান কর্তব্যভার এই বিশ্ব শান্তি পরিষদ গ্রহণ করবে। বর্তমান বাধা-বিপত্তিকে ছোট করে না দেখে ও তাতে বিচলিত না হয়ে সে যে কর্তব্য-ভার গ্রহণ করেছে তা সে পালন করবেই,—বিশ্ব শান্তি সংসদ মানুষের বুকে এ প্রত্যয়বোধ জাগিয়ে তুলবে।

শান্তি-সৈনিকদের দলননীতি সম্পর্কে প্রস্তাব

বর্তমানে বহু দেশের শান্তি-সৈনিকদের উপর পুলিশী নির্যাতন চলেছে। লাতিন আমেরিকায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ফ্রান্সে, ইতালিতে, আফ্রিকা ও নিকট-প্রাচ্যের কতকগুলি দেশে হাজার হাজার শান্তি-সৈনিককে জেলে আটকে রাখা হয়েছে।

এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন এমন অনেকেই এখানে উপস্থিত হতে পারেননি।

শান্তির সভা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুলিশ শান্তি-সৈনিকদের উপর গুলি চালাচ্ছে ও তাদের উপর অত্যাচার করছে।

বিজ্ঞানীরাও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাননি। যে সব শান্তি-সৈনিক পুলিশী নির্যাতন সহ্য করছেন দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেস তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং তাঁদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

কংগ্রেস পুলিশী নির্যাতনে নির্যাতিত সমস্ত ব্যক্তির অবিলম্বে মুক্তি দাবি করছে। শান্তির মহান যোদ্ধাদের সঙ্গে ঐক্য-সম্পর্ক স্থাপনের জন্য, তাঁদের মুক্তি আনার জন্য এবং সারা দুনিয়ায় যাঁরাই শান্তির জন্য লড়াই করছেন তাঁদের সমর্থন ও রক্ষার জন্য এই কংগ্রেস দুনিয়ার সমস্ত জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে।

সংস্কৃতি সংবাদ

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার

গত বছরের সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার এবার ইংরেজ দার্শনিক বারট্রাণ্ড রাসেল ও আমেরিকার সাহিত্যিক উইলিয়াম ফকনার পেয়েছেন। রাসেল সাহেব এ দেশের বিদ্বজ্জন সমাজে সুপরিচিত, ফকনার সাহেব অবশ্য ততটা নন। কিন্তু সুইডিশ অ্যাকাডেমীর দুটো সিদ্ধান্তই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। কারণ, রাসেল সাহেব মুখ্যত গাণিতিক ও দার্শনিক, ফকনার সাহেবও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণদের কোঠায় পড়েন না।

সম্প্রতি সুইডিশ অ্যাকাডেমী নোবেল পুরস্কার দেবার যে সব সিদ্ধান্ত করছেন, সে সব সিদ্ধান্ত নোবেলের শর্ত-অনুযায়ী নয়। নোবেল পুরস্কারের শর্তগুলির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, সাহিত্যের পুরস্কার তেমন লেখককেই দেওয়া হবে যাঁর লেখায় আদর্শবাদের দিকে ঝোঁক আছে। অথচ, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাসেলের বা ফকনারের এ বৈশিষ্ট্য একেবারেই নেই। ক্ষমতাবান সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও ফকনারের আদর্শ অস্বাভাবিক মানুষ, বিকৃত-বীভৎস মানুষ। সুস্থ, সবল, সংগ্রামী মানুষের জীবন-আলেখ্য নিয়ে তাই ফকনার কারবার করেননি। ফকনারের সাহিত্যসৃষ্টির মূল তাগিদ অন্ধত্বকে মানবজীবনের মূল সত্য বলে প্রতিপন্ন করা, প্রতিপন্ন করা এই যে, বীভৎসতাই জীবনসত্য, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে অন্যায়েরই জয়, বিকটতাই মানবজীবনের সর্বনিয়ামক শক্তি।

যে 'উদার মানবিকতা', 'নবজীবনের গান' পাঠক সাধারণ মহৎ শিল্পীর কাছে প্রত্যাশা করেন, ফকনার সেই সব মহৎ শিল্পীদের কোঠায় পড়েন না। চিত্ত-চমৎকৃতির নিরিখে ফকনারের সাহিত্য তাই মহৎ সাহিত্যও নয়। তবু ফকনার নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। তার কারণ বোধ হয় এই যে, ফকনার আমেরিকান এবং আমেরিকা আজ বিশ্ব-রাজনীতির আসরে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুইডিশ অ্যাকাডেমী

ফকনারকে পুরস্কৃত করে 'সর্বশক্তিমান' আমেরিকার অনুরাগভাজন হবার চেষ্টা করেননি এমন কথা তাই জোর করে বলা যায় না এবং হয়ত সেটাই ফকনারকে পুরস্কৃত করবার মূল রহস্য।

* * *

রাসেল সাহেব ইংলণ্ডের প্রখ্যাতনামা দার্শনিক। গাণিতিক হিসেবে জীবন আরম্ভ করলেও রাসেল সাহেব প্রধানত দার্শনিক হিসেবেই ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। অবশ্য তাঁর বহুমুখী প্রতিভা শুধু দর্শনেই আটকা পড়েনি। সমাজতত্ত্ব, যৌনসমস্যা, শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয় নিয়েও রাসেল আলোচনা করেছেন। একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে রাসেল সাহেবের দার্শনিক ও অন্যান্য আলোচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষও সামান্য নয়। তাঁর কাব্যিক, গীতিমুখর, অনুপম ইংরেজি পাঠককে চমৎকৃত না করে পারে না।

কিন্তু অনুপম রচনাগুলিই যদি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাবার একমাত্র মাপকাঠি হত, তাহলে ন্যাম্বি সাহেব এ সম্মানের অধিকারী হতেন অনেকদিন আগে। কিন্তু ন্যাম্বির ভাগ্যে যে সম্মান জুটল না, রাসেলের ভাগ্যে সে সম্মান জুটল কেন? তার কারণ বোধ হয় এই, রাসেল সাহেব বহুদিন ধরে বস্তুবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে এবং বিপ্লবী কর্মধারার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন মতবাদগত সংগ্রাম করেছেন। রাসেল সাহেব অবশ্য অসাধারণ বুদ্ধিমান লেখক। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যও বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু এই প্রতিভাকে তিনি কাজে লাগিয়ে এসেছেন প্রকৃত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে; প্রকৃত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করবার জন্যে। সেই উদ্দেশ্যে ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র, শান্তিবাদ (pacifism), উদারনীতি ও গণতন্ত্র নিয়ে খেলাও করেছেন বিশুদ্ধ ন্যায়বিলাসীর ধরনে।

রাসেল সাহেব "স্বাধীনতা"র গুণগানে পঞ্চমুখ, কিন্তু সে "স্বাধীনতা"— অগণিত শ্রমজীবী জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা নয়। কাজেই যে সোভিয়েট দেশে লর্ড, মেকী উদারনৈতিক, 'ভাববাদী' প্রতিক্রিয়াপন্থীদের বাদ দিয়ে জনতা সর্বাঙ্গীন মুক্তির সাধনা করছে, রাসেল সাহেব সেই সোভিয়েট দেশের উপর খড়্গহস্ত। সম্প্রতি বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রাসেল সাহেব ক্রমশই আগেকার গণতান্ত্রিক, শান্তিবাদী নামাবলী সরিয়ে 'স্পষ্টবক্তা' হয়ে উঠছেন—যে স্পষ্ট বাচনের মূলকথা হল, 'যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং স্বাভাবিক'। কারণ যুদ্ধ নাকি মানুষের স্বভাবেই নিহিত। তাহলে রণদানবের তাণ্ডবে সমাজ,

সভ্যতা, মানবতা কি ধ্বংস হবে? রাসেল সাহেবের মতে মানবতার উদ্ধারের একটাই মাত্র পথ—সেটা হল জাতীয় সার্বভৌমত্ব বর্জন করে এ্যাংলো-আমেরিকার নেতৃত্বে এক অতিকায় বিশ্বরাষ্ট্র-সংস্থাপন। কিন্তু এ পথের বাধা হল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি, যার নেতা সোভিয়েট। রাসেল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম-অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। কাজেই এ দু'ব্যবস্থার ভিতরে সহযোগিতাও তাঁর কাম্য নয়। সোভিয়েট সমাজতন্ত্র ও এ্যাংলো-আমেরিকান গণতন্ত্র—এ দুই ব্যবস্থা যখন একসঙ্গে চলতে পারে না, তখন সোভিয়েট দেশকে নিঃশেষ করাই রাসেলীয় মুক্তির একমাত্র পথ এবং এ কাজ করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি, সোভিয়েট এ্যাটম-অস্ত্র আবিষ্কার করবার আগেই। এ্যাটম-অস্ত্র আমেরিকার হাতে থাকতে থাকতেই তাই সোভিয়েটকে নিঃশেষ করা, ছোট ছোট জাতিগুলির সার্বভৌমত্ব আমেরিকার শ্রীচরণে সমর্পণ করা—এগুলিই হল রাসেল সাহেবের সুচিন্তিত নৈয়ায়িক মত। কাজেই তিনি আটলান্টিক চুক্তির একজন উৎসাহী সমর্থক এবং সোভিয়েট-বিরোধী সামরিক জোটের পক্ষে অনেকদিন থেকেই তিনি তাঁর শক্তিশালী লেখনী সঞ্চালন করছেন। এ্যাটম-অস্ত্র প্রয়োগেরও তাই তিনি একজন উৎসাহী সমর্থক এবং সোভিয়েট-নিধনযজ্ঞের একজন প্রকাণ্ড হোতা। 'গাণিতিক ন্যায়' নিয়ে রাসেল সাহেব আরম্ভ করেছিলেন যৌবনে; আজ বুড়ো বয়সে বিশ্বযুদ্ধের নৈয়ায়িক হিসেবে তিনি আমেরিকার সেবা করছেন। প্রতিক্রিয়ার এই সেবার প্রতিদান হিসাবেই কি তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন?

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শান্তি সংস্কৃতি উৎসব

কিছুদিন আগে প্যারির রাস্তায় এক শান্তির মিছিলে দেখা গিয়েছিল ছোট্ট এক মেয়েকে। মেয়েটির বুকে এক পোস্টার আঁটা, তাতে লেখা: মা, আমাকে বাঁচাও!

আরও কিছুদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে যায়। সেও এক ছোট্ট মেয়েরই কথা, পাঁচ বছরের এক মেয়ে। স্টালিনগ্রাদে তখন লড়াই চলছে—ঐতিহাসিক লড়াই। শহরের মেয়ে-পুরুষ স্টালিনের বাণী বুকে নিয়ে এক

মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লড়ছে প্রাণপণ। দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতে তারা হটবে না, কিছুতেই না। শত্রুকে তারা রুখবেই। ঠিক এমনি সময়ের নাৎসী-অধিকৃত কোন এক রুশ শহরের ঘটনা। আগের দিন সমস্ত রাত ধরে বরফের ঝড় বয়ে গেছে শহরের বুকের উপর দিয়ে, রাস্তা-ঘাট বরফে ঢেকে গেছে। সেই দুরন্ত শীতে সকালবেলায় শহরের মেয়ে-বুড়োদের নাৎসী দস্যুরা ঘরের বাইরে টেনে এনেছে। মাঠের মাঝখানে তাদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, গাত্রাবরণ যা-কিছু ছিল সবই খুলে নেওয়া হয়েছে। পিছনে লম্বা একটা খাদ, আর সামনে উলঙ্গ মেয়ে-বুড়োদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নাৎসী-দস্যুর দল বন্দুক উঁচিয়ে। মৃতদেহগুলো টেনে নিয়ে যাওয়ার দরকার হবে না, সময় আর শ্রম বাঁচানোর জন্যেই পিছনের খাদ। ঐ খাদের ভিতর ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে। উপযুক্ত শাস্তি হবে ফ্যানাটিকদের।

ঐ দলের ভিতরেই পাঁচ বছরের এই মেয়েটি ছিল, তার মায়ের কাছে সে দাঁড়িয়েছিল। তারও গা থেকে সমস্ত কিছু খুলে নেওয়া হয়েছে। শীতে ওরা কাঁপছিল কিনা জানা নেই। হয়ত নয়, হয়ত পেশীগুলো সব কেমন শক্ত হয়ে গিয়েছিল। ওরা নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল। শুকনো কঠিন মুখগুলো শেষবারের মত জ্বলে উঠেছিল কিনা জানি না, কিন্তু সেই পাঁচ বছরের মেয়েটি—দুনিয়াদারির কিছুই সে জানে না, জানার বয়স এ তার নয়। ফ্যাসিবাদের তাৎপর্য সে বোঝে না। স্টালিন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও তার কাছে অর্থহীন। তবু আশ্চর্য, সেদিনের পরিবেশ তার কাছে আর দুর্বোধ্য থাকতে পারেনি। তাই সে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। সব কিছুই তার কাছে কেমন যেন অসহ্য মনে হচ্ছিল। কোন এক মুহূর্তে তার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠেছিল, মাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর হাত দুটোর ভিতর নিজের কচি মুখখানাকে লুকিয়ে হঠাৎ কেঁপে উঠেছিল : মা, আমার বড় ভয় করছে!

পাঁচ বছরের সেই রুশ মেয়েটির কান্না। আরও কত কান্না! থরে থরে জমানো কান্না!

কিন্তু সেদিন সেই সব কান্না ডুবিয়ে দিয়ে পিশাচের অট্টহাসির মত জেগে ছিল শুধু ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর আর বোমারুর গর্জন। কামানের ধোঁয়ায় সেদিন সমস্ত আকাশ উঠেছিল বিষিয়ে। শিশু, নারী আর জোয়ানদের কাঁচা মাংসে

যমের ভোজ ভরতি করতে যুদ্ধবাদী শয়তানের দল সেদিন হন্তে কুকুরের মত ঢুঁড়ে বেরিয়েছিল সারা দুনিয়া। মানুষের যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর সব ভেঙে চুরমার করে ইতিহাসের পুঁথিকে দেউলে করতে কি অথথা বেলেল্লা-পনাই না তারা সেদিন করেছিল!

সেদিন সেই কান্না, সেই নিদারুণ পৈশাচিকতা আজ দুনিয়ার দিকে দিকে এনেছে প্রতিরোধের দুর্জয় সংকল্প, এনেছে ঘৃণা আর বিশ্বাস। আর তাই যখন প্যারিস রাজপথে বুকে পোস্টার-আঁটা মেয়েটি মিছিলের সুরে সুর মিলিয়ে আকাশ ফাটিয়ে শান্তির আওয়াজ তোলে তখন আর কারুরই বুঝতে দেরি হয় না যে কতবড় বিপদের সম্মুখে আজ আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। দেশের আনাচে-কানাচে শহরে, বন্দরে, কলে, কারখানায় মানুষ তখনই জোট বাঁধে: আর দেরি নয়, যুদ্ধকে রুখতে হবে, এটম বোমাকে বে-আইনী করতে হবে। পুরনো জ্বালা, ক্ষোভ, কান্না আর যত জড়ো করা ঘৃণা দিয়ে মানুষ তখন গড়ে তোলে প্রতিরোধের এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর: শান্তিকে বাঁচাতে হবে!

আমাদের মাথার উপরে এক প্রচণ্ড দুর্যোগ। এই দুর্যোগকে খুঁটিয়ে বোঝার দায়িত্ব আজ প্রত্যেকটি শান্তিকামী মানুষের। অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে, বর্তমানকে অন্তরের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে অনুভব করতে আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে ফলে-ফুলে ভরে তুলতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেকটি মানুষকে আজ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে শান্তির সংগ্রামে, হতে হবে শান্তির সৈনিক।

এই মহান সংগ্রামে অগ্রণী হবেন শিল্পী, সংস্কৃতিবিদ্‌রা। যুগ যুগ ধরে এঁরাই প্রথম এগিয়ে এসেছেন মানুষের কল্যাণে; সমাজের যত আবর্জনা, যত পংকিলতা, অত্যাচার আর অব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, প্রতিবাদ জানিয়েছেন কঠোরতম ভাষায়। অত্যাচারীর খাঁড়া বারবার এঁদের মাথায় এসে পড়েছে, কিন্তু তা এঁদের এতটুকু টলাতে পারেনি। ইব্‌সেনকে ওরা দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, জোলা আর রুবেয়ারকে দাঁড় করিয়েছে আসামীর কাঠগড়ায়, কিন্তু এঁদের কলমকে ওরা ভোঁতা করতে পারেনি। এই তো সেদিনও ওরা পিক্‌স্কিলের রাস্তা তাজা মানুষের রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু পল রোব্‌সনের আওয়াজ ডুবিয়ে দিতে পারেনি। সরকারী পদমর্যাদা আব অগাধ ঐশ্বর্য দিয়েও শান্তির দূত কবি নেরুদাকে ওরা রুখতে

পারেনি, মেক্সিকোর দেয়ালে দেয়ালে তিনি এঁকে দিয়েছেন মুক্তির ইস্তেহার, আর প্রেসিডেন্ট তিদেলা ও তার মার্কিন প্রভুদের চোখে ধুলো দিয়ে ডাক দিয়ে বেড়িয়েছেন দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষদের। আজকের এই শংকাকুল মুহূর্তে শিল্পী-সংস্কৃতিবিদ্‌দের প্রেরণা জোগাবেন এঁরাই—এই বিদ্রোহী মনীষীরা। এঁরাই তাঁদের আদর্শ। তাঁদের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ, রোমা রলাঁ, রাল্‌ফ ফক্স। জালিয়ানওয়ালাবাগে শাসকের উলঙ্গ পাশবিকতা আর সাম্রাজ্যবাদের উকিল, কবি নোগুচি ও কুমারী রাথবোনের নির্লজ্জ উক্তি রবীন্দ্রনাথের মনে যে ক্ষমাহীন ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল তা-ই আজকের শিল্পী সংস্কৃতি-বিদ্‌দের প্রেরণা জোগাবে। প্রেরণা জোগাবে বিদ্রোহী রোমা রলাঁর অচঞ্চল বিশ্বাস আর দুরন্ত আবেগ। শহীদ রাল্‌ফ্‌ ফক্স আর জুলিয়াস ফুচিকের স্মৃতি দিয়ে তাঁরা আজ তাঁদের বুক বাঁধবেন। অতীতের এই মহান পুঁজি, সংস্কৃতির এই গৌরবময় ঐতিহ্যের ছবি আজ তাঁদের পথ দেখাবে।

তাই আজ দেখতে পাই এ যুগের সেরা মনীষীরা মিলিত হচ্ছেন ব্রাসলস্তে, প্যারিতে, প্রাগে, ওয়ারশতে। তাঁরা ডাক পাঠান দুনিয়ার দিকে দিকে। আহ্বান জানান শিল্পী-সংস্কৃতিবিদ্‌দের। তাঁরা বিজয়মাল্যে ভূষিত করেন পাবলো নেরুদাকে, পল রোবসনকে, চিত্রকর পিকাসোকে। আর শহীদ ফুচিককে।

ভারতের শিল্পী-সংস্কৃতিবিদ্‌রাও হাত-পা গুটিয়ে থাকতে পারেন না। স্টকহোম্‌-এর ডাকে তাঁরা সাড়া দেন, শান্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন কেরালার বৃদ্ধ কবি ভাল্লাথোল, আর তাঁরই সঙ্গে এগিয়ে আসেন কিষণচন্দর, মুল্‌করাজ আনন্দ, খাজা আহ্‌মেদ আব্বাস।

একমাস আগে কলকাতায় শান্তি সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে তিন দিন ধরে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল তার ভিতরেও এই একই ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া গেছে। ত্রিশটি প্রতিষ্ঠান ও শিল্পীদের সমবেত প্রচেষ্টায় ও ঐকান্তিক সহযোগিতায় পরিষদের এই সম্মেলনটি সম্ভব হয়েছিল। এই পরিষদে রয়েছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বিভিন্ন শাখা, নাট্যচক্র, বহুরূপী নাট্য সংঘ, লিটল্‌ থিয়েটার, ইউনিটি থিয়েটার, অম্বিকা সংঘ এবং আরো অনেকগুলি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তিগতভাবে এতে যোগ দিয়েছেন ভারতের খ্যাতনামা সুরকার তিমিরবরণ, কবি বিমলচন্দ্র

ঘোষ, গায়িকা সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত, বিপিন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী এবং আরো অনেকে। সময়ের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন বলেই দলগত স্বাতন্ত্র্যের দূরত্ব পেরিয়ে শান্তির পতাকার নিচে এঁরা মিলিত হয়েছেন। একটা বিরাট প্রশ্ন, একটা অত্যন্ত সার্বজনীন তাগিদ আজ এঁদের এক পরিবারভুক্ত করতে পেরেছে। ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে আজকের এই বিপদসংকুল মুহূর্তে এঁরা এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। আর এই কথাই আজ বুঝতে হবে যে শান্তিকে বাঁচাবার, যুদ্ধকে রুখবার এই হচ্ছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ, এবং এই পথ যতই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে শান্তির আন্দোলন ততই জোরালো হবে আর যুদ্ধবাদীরাও হটে যেতে বাধ্য হবে। এই পথ থেকে যদি কোন শিল্পী সরে দাঁড়ান সেই হবে সেই শিল্পীর পক্ষে এক চরম দুর্ভাগ্যের কথা; বুঝতে হবে শিল্পী হিসেবে প্রাথমিক দায়িত্ব তিনি আজ এড়িয়ে যাচ্ছেন।

একটা কথা এখানে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শান্তি সংস্কৃতি পরিষদের সম্মেলন সম্পর্কে একটা অভিযোগ অনেকেই হয়ত করবেন, এবং তা সত্যিই অমূলক নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, আজকের দিনের প্রধান সমস্যা কি এবং তা সম্মেলনের নাচ, গান, নাটক ও আবৃত্তির ভিতর দিয়ে যথাযথভাবে রূপ পেয়েছে কিনা। আজকের প্রথম কথা হচ্ছে যুদ্ধকে রুখতে হবে। যারা আজ তৃতীয় মহাযুদ্ধের স্বপ্ন দেখছে, বাতাসের সঙ্গে যারা আজ ব্যাকটিরিয়া মিশিয়ে দিতে চাইছে, এটম বোমার কারখানা খুলে সভ্যতাকে উড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছে যে জানোয়ারের দল তাদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষদের জড়ো করার কথাই হচ্ছে আজকের দিনের প্রথম কথা। কিন্তু পরিষদের সম্মেলনে সবই কি ঠিক তাই হয়েছে?

সব তা হয়নি মানি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা ভুললে চলবে না যে বিভিন্ন নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তির ভিতর দিয়ে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে যুগ যুগ ধরে মানুষের উপর অমানুষদের অকথ্য জুলুমের কথা—মানুষের বঞ্চনা, মানুষের ব্যথা, জ্বালা আর তার বারবার রুখে ওঠার কথা। বলা হয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, আত্মস্ফীত লোভের অসহ্য লালসার বিরুদ্ধে মানুষের জোট বাঁধার কথা। দুশো বছর আগে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে রক্তচোষা নীলকর বাংলা-বিহারে যে নরক জাগিয়ে তুলেছিল সেই কথা বলা হয়েছে নাটকে, তুলে ধরা হয়েছে ফ্যাশিস্ট জার্মানিতে খেটে-

খাওয়া মানুষদের সংগ্রামী জীবনের রক্তাক্ত দলিল, যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি গত দুর্ভিক্ষের বুকভাঙা ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অতি নিখুঁতভাবে। এক দিকে শোষণের ছবি, অন্যদিকে অগ্নী জনতার কঠিন প্রতিরোধের ইস্তেহার। যুগ যুগ ধরে যারা অশান্তির সৃষ্টি করে চলেছে তাদেরই মৃত্যুর পরোয়ানা! এ বড় কম কথা নয়।

তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে এই যে কলকাতার শিল্পীরা দলের বা ব্যক্তির সীমানা ডিঙিয়ে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনবোধে সমবেত হয়েছেন শান্তি সংস্কৃতি পরিষদের আওতায়, তাঁরা পেয়েছেন আজকের দিনের সংগ্রামী পথের সন্ধান।

কলকাতার শিল্পীদের পথ তথা দুনিয়ার শিল্পী-সংস্কৃতিবিদ্‌দের পথ জয়যুক্ত হোক।

মৃণাল সেন

চিত্রপ্রদর্শনী

গোপাল ঘোষ, দেবযানী কৃষ্ণ, নরেশ সেনগুপ্ত

প্রতি বছরের মত এবারেও বিশেষ বিশেষ শিল্পীর একক প্রদর্শনীর অভাব হয়নি। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই চারজন শিল্পীর ছবি দেখার সুযোগ পেলেন শহরের চিত্ররসিকেরা (শ্রীকান্‌ওয়াল কৃষ্ণের চিত্র-প্রদর্শনীটি দেখবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটেনি) আরও অনেকের ছবি দেখতে পাওয়ার সুযোগ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে নিকট ভবিষ্যতেই। কিন্তু শ্রীগোপাল ঘোষ, শ্রীনরেশ সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী দেবযানী কৃষ্ণের ছবি যা দেখা গেল তাতে উল্লেখযোগ্য কাজ অল্পাধিক থাকলেও চিত্তহারী সৃষ্টি কিছু নেই বললেই হয়।

আজ পৃথিবীর ইতিহাস এসে দাঁড়িয়েছে একটা মোড়ের মাথায়। এই সংকট-মুহূর্তের দোলা রয়েছে জনতার মনে, কিন্তু এই তিন শিল্পীর কারো রচনায় তার আভাস পর্যন্ত নেই।

গোপালবাবুর একদা খ্যাতি ছিল অন্যতম প্রগতিশীল শিল্পী বলে। ক্যালকাটা-গ্রুপের একজন ছিলেন তিনি। তিনি কোনোদিনই স্বভাবানুগ (naturalist) নন; বাস্তবপন্থীও নন।

কিন্তু গোপাল ঘোষ কি ডেকাডেণ্ট (অবক্ষয়বাদী) ? সেদিকে দেখা যাচ্ছে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ডেকাডেণ্ট-সুলভ জীবনবিদ্বেষ আর পরিপক্ক কঠিন তিক্ততা তাঁর ছবিতে নেই ; রেখার পর বলয়িত রেখা এঁকে চলেছেন তিনি ; সে রেখা কখনো গাছ, কখনো গরু, কখনো বা নারীর মূর্তির ইশারা মাত্র জাগায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথাও তাতে ফোটে না প্রাণবিদ্বেষী খুনীর মনোভাব কিংবা রোগবিলাসীর ক্লীব আত্মকারুণ্য ! ইচ্ছে করে মানুষকে বিকৃত করে আঁকেন না তিনি ; পাশাপাশি, উপরে নিচে কতকগুলো ছোট বড় লাউ এঁকে তার নাম দেন না "দম্পতি"। কিংবা রঙ-বেরঙের নানা আকারের অসংখ্য চৌখুপী উপর-উপর সাজিয়ে তাকে বলেন না "ভারতের নিদ্রাভঙ্গ"! তাঁর রঙের ব্যবহার সাধারণ দর্শকের মন কাড়ে। রেখার বন্ধনমুক্ত দিকে, উজ্জ্বল লাল, নীল, গোলাপী, সবুজের অর্থভারমুক্ত পরীর নাচ দেখা গেল তাঁর বহু ছবিতে। বহুক্ষেত্রেই সে রঙের মনোহারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ছবিরূপে নয় 'স্বে মহিম্নি'। রঙগুলির আপন মহিমায়। যেমন "ধ্যান" (Meditation) নামক ছবিতে বেশ খানিকটা গোলাপী আভাস ছড়িয়ে আছে ; কিন্তু সে গোলাপী আভাসের কোনো সঙ্গত কারণ ছবির মধ্যে নেই।

তাঁর বহুবিক্রত রেখার ছবিতেও দেখা যায় এই খেয়ালীপনা। তাঁর বেশিরভাগ টাইপগুলি উপলক্ষ্য মাত্র, আসল উদ্দেশ্য রেখাবিলাস। তাঁর কতকগুলি খেয়ালখুশির আঁকজোককে তিনি আদর করে নাম দিয়েছেন, রূপকথা (Fairy tales)।

সন্দেহ জাগে, এখনো অবসর পাননি বলেই গোপালবাবু ডেকাডেণ্ট হতে পারেননি কিনা। অপরিণত কৈশোরের মুগ্ধতাকে এখনো তিনি রূপ দিয়ে চলেছেন, যেমন মহৎ শিল্পী বিভূতিভূষণ রূপ দিয়ে চলেছিলেন তাঁর শৈশবস্বর্গের কল্পনা-বিলাসকে। আগের চেয়ে এখন তাঁর রেখা ও রঙে যে একটা দৃঢ়তর উদ্দেশ্যবত্তা এসেছে তা কেবল তাঁর বিরল-মনন স্বপ্নালু ভাবকেই আগের চেয়ে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে সাহায্য করেছে। গোপালবাবুর তুলিতে বাস্তব মাঝে মাঝে ধরা দিতে চায়—যেমন তাঁর "গ্রাম্য চরিত্রে" (a village character) ; তাঁর কোন কোন দার্জিলিং-এর দৃশ্য চিত্রে। 'বসন্ত ও সাঁওতাল'-এ কুকুরের চেহারায় জীবনের আশ্চর্য আভাস, কিন্তু পুষ্পিত গাছটা এ দুনিয়ার মাটিতে জন্মায় না ; সাঁওতাল-সাঁওতালীরাও ভারতীয় নরগোষ্ঠীর কেউ নয়।

তবু গোপালবাবুর ছবিতে তাঁর আন্তরিকতার স্পষ্ট প্রকাশ আছে। তিনি ডেকাডেণ্ট নন এইজন্তই। সংসার সরাসরিভাবে তাঁর দৃষ্টিগোচর না হলেও, তা তাঁর অপরিণত কৈশোরিক কল্পনায় রূপান্তর পেয়ে যে পরীরাজ্যের সৃষ্টি করে, সে রাজ্যে অল্পক্ষণের জন্ম হলেও দর্শকের মনকে তিনি টেনে নিতে পারেন। তিনি যে ডেকাডেণ্ট নন, তা প্রমাণ করে তাঁর "কোয়াটার্স", "বাদলার পর" (The Storm is over), "দিনের শুরু" (The Day Begins), "কে আসে ঐ ?" (Who Comes There ?), "দার্জিলিঙ" প্রভৃতি ছবিগুলি তাদের সরল স্বপ্নালু সৌন্দর্যের আকর্ষণে।

গোপালবাবু এই অনতিজ্ঞ কিশোরের অগভীর স্বপ্ন-জগতে মোটামুটি দীর্ঘকালই কাটালেন। প্রাকৃতিক নিয়মের যদি ব্যাতিক্রম না হন তিনি, তবে বিবর্তনের নিয়মানুসারে তাঁর স্বর্গচ্যুতি ঘটবেই। সেদিন তাঁর রঙে রেখায় মৃত আধ্যাত্মিক বুজরুকের শবজ্যোতি বিকীর্ণ হবে বা কিমাকার অমানুষী চেহারার মৃত্যুযন্ত্রণা রূপ পাবে, না নতুন, শান্ত, বলিষ্ঠ জীবনের জন্ম সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা তারা পাবে ? আমাদের খেদ এই যে, আজও জোর করে কিছু বলা চলছে না।

শ্রীমতী দেবযানী কৃষ্ণের ছবি অন্য জাতের। অধিকাংশই স্বভাবানুগ। সিকিম প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রূপ পেয়েছে তাঁর সবগুলি ছবিতে। ঐসব অঞ্চলের পলিটিকাল অফিসারের নিমন্ত্রণে তিনি লামানৃত্যের ছবিও বহু এঁকেছেন। আছে নানা ধরনের মানুষের ভিড় : কাঞ্চি, কাঞ্চা (খুকি, খোকা ?) সেরিঙ বেয়ারা, বড় লামা, হলুদ টুপীপরা অনেক কেউ-কেটা, খচ্চর-চালক, বালক ভৃত্য বাহাদুর, বাচ্চা মুসলমান। কিছু স্টিলও আছে।

তাঁর সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণকারী ছবি হচ্ছে লামানৃত্যের বিবিধ ভঙ্গি ও মুখোশ। কাক আছে, ষাড় আছে, যম, মহাকাল, দেবতাত্মা গিরিরাজ এঁরা সবাই আছেন নাচের মুখোশের উৎকট অতিরঞ্জনলোকে। মধ্যযুগীয় তিব্বত তার সমস্ত জবরজঙ, অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির। হালফ্যাশনের মিহিভাষী বঙ্গজন এবং অনড়-অটল প্রাচ্যের বহুরূপপিপাসু ইওরোপীয় মেমসাহেব থমকে দাঁড়াচ্ছেন এই উজ্জ্বল তেলরঙা ছবিগুলির সামনে। মনে হয়, হ্যাঁ, এই সে তিব্বত, যেখানকার লামারা রাহুলজীর কাছে ব্যাকুল আগ্রহে জম্বুদ্বীপবাসী দেবগণের কুশলবার্তা জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আরো একটা তিব্বত আছে এবং সেটা অতিপ্রাকৃত নয়।

তবে তাকে চিত্ররূপ দেবার নিয়ন্ত্রণ আসেনি কোনো পলিটিকাল অফিসারের কাছ থেকে। মুক্তিপিপাসু এবং বিদেশী পাপচক্রান্তে স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন এই চীনখণ্ডের পরিচায়ক কোন ছবি নিশ্চয়ই শিল্পরসিকের কাছে বেশি আদরণীয় হত চটকদার নাযানৃত্যের চেয়ে।

শ্রীমতী রুক্মের প্রাকৃত বিষয়মূলক ছবিগুলির বেশিরভাগ স্বভাবানুগ। ঈষৎ ব্যতিক্রম বোধহয় "বড়লামা"। অভিজাত শাসকের চাপা কুটিলতা সুন্দর ফুটেছে তার মুখে। শিশুর চোখের জীবন্ত খুশির আলো চমৎকার ধরেছেন "কুসমায়া"য়। কিন্তু ব্যক্তির ছবিতে শিল্পী যেমন স্বভাবানুগ, সমবেত জনতার ছবিতে তিনি তেমনি বিমূর্ত (abstract)। তাঁর "সারি" (The Que) ছবিতে পার্বত্য জলহারিণীদের কলসবহন-কৌশল দেখাতে গিয়ে তাদের হাত দিয়েছেন লুপ্ত করে। তাঁর "গুরুর পদপ্রান্তে", "শাদা ও বাদামী", "পঞ্চ শিষ্য" প্রভৃতি ছবি নেহাতই খেয়ালী ; তারা বায়ুতাড়িত তুষার-পিণ্ডের অদ্ভুত স্বপ্নরূপ।

নরেশবাবুর ছবিগুলি দেখে মনে হয়, তিনি এখনো নানা পরীক্ষার মধ্যে আবদ্ধ আছেন। তাঁর প্রদর্শনীতে নানা এলোমেলো রীতি-পদ্ধতির সমাহার। কোথাও চিত্র-পরিকল্পনায় পর্ণ্যার, কোথাও বা অঙ্কন পদ্ধতিতে পরিতোষ সেনের প্রভাব। কিন্তু তাঁর "মযুরাক্ষী" স্বভাবানুগ এবং মনোহারী। বুড়ো রাজমিস্ত্রীর ক্লান্তি সুন্দর ফুটেছে তাঁর "দৈনন্দিনে" (Daily Routine)।

সুরেশচন্দ্র সরকার

পরিচয়

বিংশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : পৌষ ১৩৫৭

সংগ্রামী চীন

কে. সিমোনভ্

গ্রন্থকারের ভূমিকা

১৯৪৯ সালের শরৎকালে সোভিয়েট বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে লেখক চীনে ছিলেন। পিকিং-এর যে অনুষ্ঠানে চীনের গণ-রিপাবলিক ঘোষিত হয় তাতে আমাদের এই প্রতিনিধিদল যোগ দিয়েছিল। পরে আমরা সাংহাই, নান্‌কিং, সিনান্, তিএন্‌ৎসিন, মুক্‌দেন ও হার্‌বিন পরিদর্শন করি। চীনের কলকারখানা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি এবং চীনের গ্রামাঞ্চলের জীবনের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। বহু সভায় আমরা বক্তৃতা দিই—এই সব সভায় হাজারে হাজারে শ্রমিক, চাষী, সৈনিক এবং চাকুরিজীবী ও স্কুল-কলেজের ছাত্র যোগ দিয়েছে।

চীন পরিদর্শনের যে স্মৃতি আমি নিয়ে এসেছি তা কখনো ম্লান হবে না। আমার মনে হয় প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সকলেও এই একই কথা বলবেন। এই স্মৃতি এক মহান দেশের মহান জনগণের স্মৃতি—যারা এই সময়টিতে মানুষের সকল আনন্দের সেরা আনন্দ মুক্তির আস্বাদকে সমগ্র পরিপূর্ণতায় অনুভব করেছে।

নতুন চীন সম্পর্কে কিছু লেখার অর্থই হচ্ছে নতুন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে লেখা। গত কয়েক বছরে চীনে যে সব বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত

হয়েছে সে কথা চিন্তা করলে বহু প্রসঙ্গ মনে পড়ে। সে দেশে এখনো যে সব ঘটনা ঘটছে তা কত দিক দিয়েই না গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক—ভালো করে দেখবার, বোঝবার ও শিল্পজাত করবার উপযুক্ত বিষয়বস্তু! এই প্রসঙ্গ-গুলির অধিকাংশ সম্পর্কেই কিছু বলতে হলে আলাদা আলাদা বই লিখতে হয়। এত অসংখ্য বিষয় আছে যে-সম্পর্কে পাঠক সম্পূর্ণ সঙ্গতভাবেই বিশদ বিবরণ চাইতে পারেন এবং তাঁকে যদি সন্তুষ্ট করতে হয় তবে খানকয়েক বই লেখা প্রয়োজন।

আমি শুধু একটি প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করেছি: মুক্তিফৌজ কি, আর এই মুক্তিফৌজ আগে কি ভাবে লড়াই করেছে আর এখন কুয়োমিন্‌টাঙ সামরিক-চক্র ও তার মার্কিনী পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে কি ভাবে লড়াই করছে।

এমন কি, এই একটি প্রশ্নের জবাব এই বইয়ে যে-ভাবে দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি বিশদভাবে দেওয়া উচিত ছিল একথা আমি বুঝতে পারি। কারণ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের মুক্তিফৌজ চীনা বিপ্লবে যে অংশগ্রহণ করেছে তা বিরাট ও যুগান্তকারী। মুক্তিফৌজের ইতিহাস সম্পর্কে লেখার অর্থই হচ্ছে চীনা বিপ্লবের সমগ্র ইতিহাস সম্পর্কে লেখা। আর এই বইয়ে যেটুকু লেখা হয়েছে তা হচ্ছে, যেটুকু আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং চীনা কমরেডদের মুখে শোনা তাঁদের অতীত সৈনিকজীবন সম্পর্কে ও মুক্তিফৌজের পূর্বকালীন অভিযান সম্পর্কে কিছু কিছু বিবরণ।

আমাদের প্রতিনিধিদলের অভিযাত্রা শেষ হবার পর কিছুকাল আমি 'প্রাভ্‌দা'র বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে মুক্তিফৌজের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে দিন কাটিয়েছি। সেই সময়ে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৪৯) মুক্তিফৌজ দক্ষিণ চীনের রণাঙ্গনে কুয়োমিন্‌টাঙ সেনাবাহিনীর বৃহত্তম একটি দলকে নিঃশেষ করবার কাজে নিয়োজিত ছিল। গোড়ার দিকে কুয়োমিন্‌টাঙ সেনাদলের এই দক্ষিণাঞ্চলীয় দলটি সংখ্যায় ছিল তিন লক্ষ। সমগ্র কোয়াংসি প্রদেশ কোয়াংটুঙ-এর পশ্চিম অংশ ও কোএচাও-এর পূর্ব অংশ তখন এদের দখলে। অভিযানের শেষে সংগঠিত সামরিক শক্তি হিসেবে এই দলটির অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল।

কোয়াংসির উত্তরাংশে কেন্দ্রীয় রণাঙ্গনে এই সামরিক অভিযান যে-ভাবে অগ্রসর হয় এবং যে-ভাবে প্রাদেশিক রাজধানী কুইলিন্‌-এর মুক্তির মধ্যে

এই সামরিক অভিযান চরম পরিণতি লাভ করে তা স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল।

তারপর প্রায় এক বছর কেটেছে। জাতীয় মুক্তির মহান সংগ্রামে গণতান্ত্রিক চীন আজ জয়ী, প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিন্‌টাঙ-চক্রের শাসন থেকে প্রকৃতপক্ষে গোটা দেশই মুক্ত। চীনে নবজীবন এসেছে এবং সে-দেশের জনসাধারণ শান্তিপূর্ণ গঠনকার্যে অভিনিবিষ্ট।

এই কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছে বলে আমি সুখী। চীনের মহান জনসাধারণের পক্ষেই শুধু নয়, এশিয়ার অন্যান্য যে-সব জাতি স্বাধীনতা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করছে তাদের উত্তর-জীবনেও এই সব ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ ও যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তার করেছে।

অভিযাত্রী বাহিনী

১৯৪৯ সালের ৭ই নভেম্বর। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, অন্ধকার বাদলসন্ধ্যা। তিন ঘণ্টা আগে আমরা হেংইআই-এ পৌঁছেছি। হেংইআই হচ্ছে হুনানের দক্ষিণাংশে একটি বড় জেলা-শহর। আমার যাত্রাপথের ইতিবৃত্ত এখান থেকেই শুরু। আমি চলেছি রণক্ষেত্রে মুক্তিফৌজের ঘাঁটির দিকে, 'প্রাভ্‌দা'র সংবাদদাতা হিসেবে আমাকে চীনা কমরেডরা আমন্ত্রণ করেছেন।

কুড়ি দিন আগে এই শহরটি কুয়োমিন্‌টাঙের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ চীনে যে চতুর্থ ফিল্ড আর্মি অভিযান চালাচ্ছে তার হেড-কোয়ার্টার এখানে। এই সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কমরেড লিন্ পিআও-এর সঙ্গে আগামী কাল আমার দেখা করবার কথা।

কিন্তু সে তো আগামী কালের কথা। আপাতত আমি একা, স্থানীয় ব্যাঙ্ক-বাড়ির যে ছোট ঘরটি আমার জন্য নির্ধারিত হয়েছে সেখানে চুপচাপ বসে আছি। এই বাড়িতেই চতুর্থ ফিল্ড আর্মির রাজনৈতিক বিভাগ ঘাঁটি স্থাপন করেছে।

আমার জানলার ঠিক নিচেই একজন বন্দী মেপে মেপে পা ফেলে পায়চারি করছে। পরনের তুলোভরা জ্যাকেটের উপর আমেরিকান ফৌজী বর্ষাতি, কাঁধে রাইফেল, ভিজে বেয়নেট চিক্‌চিক্ করছে। রাস্তার ও ছাদের উপরে বৃষ্টি পড়ার নরম রিম্‌ঝিম্ শব্দ; দক্ষিণাঞ্চলের এই শরৎকালীন বৃষ্টি থেকে পথে আমরা মুহূর্তের জন্যেও রেহাই পাইনি।

আমাদের সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের উত্তর ও মধ্য চীনে পরিভ্রমণের দিনগুলি একটির পর একটি আমার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে—হারবিন, মুকদেন, পিকিং, সিনান, নান্‌কিং, শাংহাই।

মনে পড়ে, জনতা ভিড় করে আমাদের স্বাগত জানিয়েছে, আমাদের যাত্রাপথে গতিসঞ্চার করেছে। মনে পড়ে বহু জনসভার কথা, জনাকীর্ণ হলঘরে ও খোলা মাঠে, দিনে ও রাত্রে। মনে পড়ে হাজার হাজার অন্তরঙ্গ দৃষ্টির আবেগসঞ্চারী আলো, হাজার হাজার হাতের করমর্দন, নিঃশব্দ ও নিবিড়। বন্দুক ধরায় অভ্যস্ত হাতের অন্তরঙ্গ করমর্দন—মানুষগুলো করমর্দন করার পরে কথা বলে না, আগেও নয়; কোন কথা না বলে হাত ঝাঁকুনি দেয় শুধু।

মনে পড়ে, মজুরের নীল পোশাক-পরা মধ্যবয়স্ক একটি লোক তিএন্‌ৎ-সিন-এ আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। সে রুশভাষায় কথা বলে ঠেকে ঠেকে এবং প্রতিটি কথা যথাযথ উচ্চারণ করবার চেষ্টায় অতিমাত্রায় বিব্রত—স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে এই ভাষা সে সবেমাত্র শিখতে শুরু করেছে। আমার চোখের উপর চোখ রেখে সে জিজ্ঞেস করল :

'কমরেড, নতুন চীনকে আপনি ভালোবাসেন কিনা বলুন?' সে যে অত্যন্ত বিচলিত তা তার দিকে তাকিয়েই বোঝা যাচ্ছিল।

'হ্যাঁ কমরেড, বাসি। ভীষণভাবে ভালোবাসি।' জবাব দিলাম। লোকটির কথা শুনে আমিও বিচলিত হয়েছিলাম।

মনে পড়ে, একটি মেয়ের কথা। শান্তি-সম্মেলনে মেয়েটি চীনা শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দিয়েছিল। গলার স্বর আবেগকম্প্র, অনেকটা ছোট ছেলের মত—একটু যেন পুরুষভাব এসেছে; প্রতিটি কথা স্পষ্ট; ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটিতে খোঁচ হয়ে থাকা ভুরু। কুয়োমিন্‌টাঙ-শাসনে তাকে কত কি নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে প্রথমে সে সে-কথা বলল, তারপর বলল একদিন কি ভাবে সে একটি সোভিয়েট ফিল্‌ম্ দেখে। ফিল্‌ম্‌টির নাম 'উজ্জ্বল পথ', দেখে তার খুবই ভালো লেগেছিল আর ভয়ানক ইচ্ছা হয়েছিল তার জীবনটাও এই ফিল্‌ম্-এর কাহিনীর মত হয়—এইভাবেই সে বেঁচে থাকে ও কাজ করে। কিন্তু কুয়োমিন্‌টাঙ-শাসনে তা অসম্ভব, তাই সে বোবা হয়েছে। আর এখন এই নতুন চীনে অবশেষে সেই উজ্জ্বল পথ শ্রমিকদের সামনে উন্মুক্ত। তাই সে সুখী, তাই সে শান্তি চায়, আর তাই সে এই সভায় বক্তৃতা দিতে এসেছে।

অনেক কথাই মনে পড়ে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে এই যুদ্ধাঞ্চলবর্তী শহরে বসে বিশেষ জোরালো ভাবে যে-সব কথা আমার মনে পড়ছে তা হচ্ছে সেনাবাহিনী-সম্পর্কিত কথা।

মনে পড়ে পিকিং-সাংহাই ট্রেনের একজন সহযাত্রীর কথা। লোকটি কিয়াংসি অঞ্চলের চাষী, একটি রেজিমেণ্টের অধিনায়ক। তারুণ্যমণ্ডিত চেহারা, একটু যেন খর্বকায়। যোল বছর বয়সে সে মুক্তিফৌজে যোগ দিয়েছে; বিউগ্‌ল্‌বাদক হিসেবে ফৌজী জীবনের শুরু। তার সাঁইত্রিশ বছরের জীবনে একুশ বছরই কেটেছে সৈনিকবৃত্তিতে।

মনে পড়ে, দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারার মধ্যবয়স্ক একটি লোক ধীর পদক্ষেপে বক্তৃতামঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন। অধিকাংশ চীনা চাষীর মুখের মত তাঁর মুখেও গভীর বলিরেখা। মনে পড়ে, তিনি প্রথম দু-একটা কথা বলতেই সমস্ত শ্রোতা একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে দশ মিনিট ধরে অভিনন্দন জানিয়েছিল। হাততালির শব্দ ছাপিয়ে যেন গলার স্বর শোনা যায় সেই-ভাবে দোভাষী আমার কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে বলল:

'কমরেড চু তে বললেন যে বক্তৃতা শুরু করার আগে তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে একটি ঘোষণা করছেন—পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্বপ্রথম চীনের গণ-রিপাবলিককে স্বীকার করে নিয়েছে।'

মনে পড়ে, সাংহাই-এ তেরো হাজার মানুষের এক সভার কথা। কংক্রিটের মস্ত আসনগুলিতে একটিমাত্র রঙ দেখা যাচ্ছিল—ফৌজী উর্দির মেটে জলপাই রঙ। তৃতীয় ফিল্ড আর্মির তেরো হাজার সৈন্য ও অফিসারে সভাগৃহ ঠাসা। গত বসন্তে এই সেনাবাহিনী ইয়াংসি পার হয়ে সাংহাই অধিকার করেছে। স্টালিনের নাম ও 'স্টালিনগ্রাদ' শব্দটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই তেরো হাজার মানুষ একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

সব শেষে মনে পড়ে ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবরের কথা। এই দিনটিতেই চীনের গণ-রিপাবলিক ঘোষিত হয়। পিকিং প্রাসাদের দেওয়ালের সামনে বিরাট স্কোয়ার আর তার ভিতরে আড়াই ঘণ্টা ধরে চীনা জনগণের সৈন্যবাহিনী স্রোতের মত ঢুকছে। কুয়োমিনটাঙ সৈন্যদের কাছ থেকে দখল করে নেওয়া মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রে এই বাহিনী আগাগোড়া সজ্জিত; দেখেই মনে পড়ে মাও সে-তুঙের সেই গভীর অর্থসূচক শ্লেষ—'ওয়াশিংটন আমাদের অস্ত্রাগার আর চিয়াং কাই-শেক আমাদের প্রধান সরবরাহদার।'

প্রসঙ্গত, চিয়াং কাই-শেক সম্পর্কিত একটি ঘটনা। ১লা অক্টোবরের সেই জমকালো কুচকাওয়াজের মধ্যে এমন কয়েকটি মুহূর্ত ছিল যখন সেই স্কোয়ারের ভিতরে সার বেঁধে দাঁড় করানো সমগ্র বাহিনী একসঙ্গে হাসছিল। এমন হাসি যে চেষ্টা করেও চেপে রাখা যায় না। আর সেইজন্যে হাসি চাপবার জন্যে কেউ যে কোন রকম চেষ্টা করছিল তাও নয়।

নতুন রিপাবলিকের সম্মানে প্রথম তোপধ্বনি হবার কয়েক সেকেণ্ড পরেই ব্যাপারটা ঘটে। কোথা থেকে যেন একটা খেদানো বাচ্চা কুকুর এসেছিল, তোপের গর্জন হবার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা প্রাণের ভয়ে সৈন্যের সারির সামনে দিয়ে ছুটতে শুরু করে করে। কিছুদূর গিয়ে কুকুরটা একবার থামে। আর ঠিক সেই সময়ে দ্বিতীয় তোপধ্বনি, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটার আবার ঊর্ধ্বশ্বাস পলায়ন। আর তারপর যতই তোপধ্বনি হতে থাকে কুকুরটা ততই আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে যায় আর দুই পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে সেই প্রকাণ্ড স্কোয়ারের মধ্যে সেটা ততই জোরে ছুটতে থাকে। তৃতীয় বা চতুর্থ তোপধ্বনির সময় কে যেন বলে উঠল: 'আরে, এ যে দেখছি চিয়াং কাই-শেক!'

সঙ্গে সঙ্গে এই কৌতুক স্কোয়ারের প্রত্যেকের কানে পৌঁছে যায়। সৈন্যরা হাসিতে ফেটে পড়ে, হাসির দমকে কেঁপে ওঠে বসবার আসনগুলো, চারদিকের কিনারায় ভিড় করে দাঁড়ানো লোকগুলোর হেসে গড়িয়ে পড়বার মত অবস্থা। আর কুকুরটা তখনো আতঙ্কে ছুটোছুটি করছে আর প্রতিবার তোপধ্বনি হবার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটার শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে।

আমার পাশে যে চীনা কমরেডটি বসেছিল সে আকর্ণ হেসে বলল, 'তাই-ওয়ানে যাবার জন্যে ওর এত তাড়াহুড়ো!'

এই ঘটনার পর এক মাসের কিছু বেশি সময় কেটেছে। অবস্থা দেখে মনে হয়, তাইওয়ান ছাড়া চীনে আর এমন কোন জায়গা নেই যেখানে চিয়াং কাই-শেক আশ্রয় পেতে পারে। এই ভ্রাম্যমান ভূতপূর্ব ডিক্‌টেটর গত কয়েক মাস ধরে অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় এই বিরাট দেশের স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটোছুটি করছে—তার বাহন মার্কিন উড়োজাহাজ, আর শোনা যায়, চালক নাকি জাপানী পাইলট।

এখানে এই দক্ষিণাঞ্চলে চতুর্থ ফিল্ড আর্মি সামরিক অভিযান শুরু করেছে। জেনারেল পাই স্যুঙ-সির অধিনায়কত্বে যে সেনাবাহিনী আছে এবং যে বাহিনী

মূল ভূখণ্ডের কুয়োমিন্‌টাঙ সৈন্যদলের একটি বৃহত্তম অংশ—তাকে বেষ্টন করে নিশ্চিহ্ন করাই চতুর্থ ফিল্ড আর্মির সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্য।

এখান থেকে পশ্চিমে জেনারেল লিউ পো-চেঙ-এর অধিনায়কত্বে দ্বিতীয় ফিল্ড আর্মির অভিযান শুরু হয়েছে। কোএচাও, যেচ্‌ওআন্‌, য়ুনান—দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের কুয়োমিন্‌টাঙ-অধিকৃত প্রদেশগুলির বিরুদ্ধে এই অভিযান।

হুনানের রাজধানী চাংশা হয়ে হেংইআং আসবার পথে এই গত রাত্রেই আমি একটি নৈশভোজনে যোগ দিয়েছিলাম। চাংশার স্থানীয় রক্ষী সেনাদল জেনারেল লিউ পো-চেঙ-এর সম্মানে এই ভোজসভার আয়োজন করেছিল। জেনারেল লিউ পো-চেঙ-এর সেনাবাহিনী চুঙকিং অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে এবং তিনি চলেছেন নিজের সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে।

গত দুই যুগেরও অধিককাল এই জেনারেলকে অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছে, দশ বারেরও বেশি তিনি আহত হয়েছেন, কুয়োমিন্‌টাঙ সংবাদপত্রে তাঁকে বার বার মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং প্রতিবারেই তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন—কিন্তু তিনি নিজে সব চেয়ে সাদাসিধে গোছের মানুষ। তাঁর সম্মানে যে নৈশভোজন দেওয়া হল সেখানে তিনি এমনভাবে বসে রইলেন যেন আগাগোড়া ব্যাপারটার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, যেন তিনি হঠাৎ এই ভোজসভায় এসে পড়েছেন, এখন সবার চোখ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারলেই বেঁচে যান।

জেনারেল লিউ পো-চেঙ-এর কমরেডরা বলে যে, তাঁকে কেউ কখনো বিশ্রাম নিতে দেখেনি। স্পষ্টই বোঝা যায়, যদি তিনি বিশ্রাম নিয়েও থাকেন তবে তা হচ্ছে এক ধরনের কাজ থেকে আরেক ধরনের কাজের মধ্যে। জাপানী ও কুয়োমিন্‌টাঙের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দুরূহতম দিনেও এবং দৃষ্টিশক্তি অর্ধেক হারানো সত্ত্বেও (আহত হয়ে তাঁকে একটি চোখ খোয়াতে হয়েছে) এই লোকটি সামরিক বিজ্ঞানের উপর প্রচুর সোভিয়েট লেখা অনুবাদ করার সময় করতে পেরেছিলেন। নীতি ও কৌশল সম্পর্কিত মৌল রচনাবলী থেকে শুরু করে ফৌজী পত্রিকায় প্রকাশিত যে-সমস্ত লেখা তাঁর কাছে চিত্তাকর্ষক বলে মনে হত সমস্তই তিনি অনুবাদ করতেন। বছরের

পর বছর কখনো বা ডোঙায় কখনো বা জীর্ণ চালাঘরে বসে মিটমিটে আলো জেলে তিনি তাঁর সমস্ত "অবসর" সময় এই কাজে ব্যয় করেছেন।

জেনারেলের সম্মানে নৈশভোজন শেষ হবার পরে বিভাগীয় প্রচারদল কর্তৃক একটি নাট্যানুষ্ঠান হয়। সেই অনুষ্ঠানে জেনারেলের পাশেই আমি বসি। 'শেষ ট্রেন' নামে একটি নাটক অভিনীত হয়। কুয়োমিন্‌টাঙ সৈন্যরা যখন পিছু হটছিল তখন চীনা রেল-কর্মীরা যে বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছে তারই একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে গল্প। শত্রু-সৈন্যরা যেন পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্যে একটি রেলস্টেশনের শ্রমিকরা এঞ্জিন ড্রাইভারকে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুয়োমিন্‌টাঙের লোকেরা ড্রাইভারকে খুঁজে বার করে আনে। তখন রেলকর্মীরা ইঞ্জিনের সামনে লাইনের উপর শুয়ে পড়ে—তারা বরং সময়ের আগেই মরবে কিন্তু ট্রেন কিছুতেই যেতে দেবে না। শেষ দিকে ড্রাইভার এমন একটা মিথ্যে ভাব দেখায় যেন সে ট্রেণ চালিয়ে নিয়ে যেতে রাজি এবং এঞ্জিনের কামরায় ওঠে—কিন্তু আসলে সে যে কাজটুকু করে তা হচ্ছে এঞ্জিনের বাষ্প বেরিয়ে যাবার নলের মুখ খুলে দেওয়া। একজন কুয়োমিন্‌টাঙ অফিসারের বুলেটে বিদ্ধ হয়ে ড্রাইভার পড়ে যায়, কৃতকর্মের জন্যে প্রাণ দিয়ে মূল্য দিতে হয় তাকে।

নাটকটি শ্রোতাদের ভালো লেগেছিল।

চাংশা রক্ষীদলের সৈন্যরা এবং লিউ পো-চেঙ-এর সঙ্গের অফিসাররা খুব মনোযোগে নাটকটি দেখলেন। জেনারেল নিজেও সেইভাবেই দেখলেন। চোখে চশমা, গোল মাথা, ছোট করে ছাঁটা কাঁচাপাকা চুল, মুখের ভাবে আত্মসমাহিত প্রশান্তি, পরনে সম্মান-পদক বা প্রতীকচিহ্নহীন বেসামরিক কালো জ্যাকেট—তাঁকে দেখে মুক্তিফৌজের দুর্ধর্ষতম সেনাপতিদের একজন মনে না হয়ে বরং যেন মনে হচ্ছিল কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক। নাটকের শেষে আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় একটু হেসে তিনি বললেন:

'কাল আমি চলে যাচ্ছি। দক্ষিণাঞ্চলের অভিযান শেষ হবার পর আমাদের বাহিনীও দেখে যাবেন। অবশ্য যদি আপনি ঠিক সময়মত ফিরে আসতে পারেন তবেই। কি জানেন, শিগ্‌গিরই আমরা চুঙকিং অভিযান শুরু করছি কিনা।'

আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে তিনি চলে গেলেন। তাঁর দীর্ঘ সৈনিক-জীবনের সর্বক্ষণের সঙ্গী তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন; পরনে তাঁরই মত অতি সাধারণ একটি কালো জ্যাকেট।*

(ক্রমশঃ)

অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত

---

*১৯৫০ সালের ১০ম সংখ্যা Soviet Literature পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্ববিশ্রুত সোভিয়েট সাহিত্যিক K. Simonov-এর মনোজ্ঞ বিবরণী 'The Fighting China' থেকে অনূদিত। বিবরণীটি থেকে বাছা বাছা কয়েকটি অংশের অনুবাদ 'পরিচয়'-এর পরবর্তী কয়েক সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। —সম্পাদক

কবিতাগুচ্ছ

কেন স্বপ্ন দেখি

একান্ত স্বভাব, তাই
আজও স্বপ্ন দেখি, আজও গান গাই, আজও
মনের গভীরে ডুবে কত রঙ-রেখায় সাজাই
জীবনের চিত্রপট, আহা,
আজও ছেলেমানুষী খেয়ালে
খুশি হই হাঁসশাদা মেঘের সাঁতার
ভেসে এলে পূর্ণিমার রাতের আকাশে, খুশি হই
দুপুরে অশ্বত্থশাখে ঝিরিঝিরি পাতার কাঁপনে
জ্বলে হাজার হীরে স্তব্ধতার ঝিলিকে ঝিলিকে,
খুশি হই লিখে
একটি কবিতা সারা বৎসরের ব্যর্থতার পর,
একটি প্রেমের শব্দে যদি কারো চোখে
ছায়া ফেলে আমার এ মুখ, যদি পাই
মুহূর্তের সার্থকতা, খুশি হই। কেন না জীবনে
মুহূর্তেরই মেলা আজ।
দিন দিন বছর বছর জমে জমে
অনেক অনেক গ্লানি, পুঞ্জীভূত দাহ
খোঁজে সেই সূচ্যগ্র সময়
যে মুহূর্ত সুতীব্র, উজ্জ্বল,
স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে শতাব্দীর বারুদের স্তূপ,
দেশ কাল মুক্তি পায় সন্ততির হাতে।

সেই তীক্ষ্ণ, সুদূরসন্ধানী মুহূর্তের
সার্থকতা যদি পাই, যদি
একটি কবিতা, কিম্বা একটি প্রেমের গন্ধে
হাঁসশাদা মেঘের পূর্ণিমা
খুঁজে পায় আমাদের আঙিনার সীমা ;
অশ্বত্থপাতার হীরে
জলে ওঠে আমাদের দিনের তিমিরে—
সেই আশা
এখনো এ মড়কের পাহাড়ে পাহাড়ে
নামায় স্বপ্নের ঝর্ণা,
অজ্ঞতার কোটরে কোটরে হাড়ে হাড়ে
জ্বালায় গানের সূর্য,
বঞ্চনার অবরুদ্ধ প্রাকারে প্রাকারে
ঝল্‌কায় রক্তের অগ্নি।
সেই আশা, মজ্জাগত সেই স্বভাবের
অস্থির আবেগে আজও চলি—
কণ্ঠের রজ্জুকে ছিঁড়ে গাই,
দৃষ্টির পাথর ভেঙে আঁকি,
স্মৃতির পাতালে নেমে দেখি,
ঝর্ণা—সূর্য—অগ্নি—
আজও তাই
স্বপ্ন দেখি, গান গাই, জীবনের আঙিনা সাজাই।

হাওয়া লাগে

অবশেষে হাওয়া পাই।

দক্ষিণ সমুদ্র থেকে এঁকেবেঁকে মেঘে লেগে
গাছের পাতায় ডেকে ডেকে
মুক্তির আকাশে নাড়া দিয়ে
পল্লবের আঙুলে গড়িয়ে

গলি বেয়ে দেয়ালের কোলে
ঘরে ঘরে জানালায় দেখা দেয় হাওয়া ;
অন্ধকার গুমোটের পাঁজা
যেন শত খড়খড়ি খোলে ;
গরমে ভেপ্‌সা দেহে, ফুসফুসে, মাথায়
নিঃশ্বাসের মত আসে, সান্ত্বনার মত,
কামনার মত ঘেরে, মিশে যায় রক্তের দোলায়,
আমরা অনেক লোক বদ্ধ ঘরে যারা আশাহত
ছিলাম নিশ্চুপ একা বুকচাপা নিরুদ্ধ ভাষায়
হাওয়ায় কী যাদু লেগে বাহিরে তাকাই ॥

হাওয়া পাই, আরো হাওয়া পাই ॥

সমুদ্র শীকরমাখা মেঘের বিদ্যুৎ-ঢাকা
গলিঘোরা বাঁকাচোরা তীব্র হাওয়া পাই ;
ছুঁয়ে যায় গায়ে গায়ে উন্মত্ত ক্ষুধার
রুদ্র একাকার হাওয়া ;
দেশদেশান্তর ঘোচা দূর অতিদূর থেকে পাওয়া
ফুসফুসের অতি কাছে হৃৎপিণ্ডে রক্তের নাচে,
নদীনালা পাহাড়ের তেপান্তর হাওয়া
ঘরের সীমায়, মনে, ক্ষুধার অগ্নিতে গান গাওয়া
ক্ষুব্ধ এক ঝড়বাঁকা উদ্বেলিত সুর,
কেবলই নিকট হয়, দূর অতিদূর
কেবলই নিকট হয় ; দেয়ালের উদ্ধত বড়াই
ভেঙে যায় ; গারদের অন্ধ গড়খাই
খুলে যায় ; আসে হাওয়া আসে
শ্বাসরুদ্ধ ঘরে ঘরে, মৃত্যুর বিবরে, স্তরে স্তরে
রুদ্র এক হাওয়া আসে মুক্তির নিঃশ্বাসে ॥

হাওয়া পাই ॥

অন্যপথ

এবার সূচনা করি—
অন্য কথা, অন্যদিন, অন্য এক পথ।
ধুলো, কাঁটাঝোপ, মাঠ
পায়ে পায়ে ভেঙে, কবিতার ছন্দে ছন্দে
দিনের শ্রমের শর্তে অন্য পথ গড়ি—
রচনার আনন্দে যে প্রিয়া, দুঃখে জায়া, যাত্রায় যে সহচরী
সেই পথ, সেই অন্তরঙ্গ আর উত্তরঙ্গ পথ
কঠিন মাটির বুকে দিগন্ত হৃদ্‌পিণ্ডের দিকে
আঁকাবাঁকা সে লাল ধমনী
পদক্ষেপে নাড়িস্পন্দে প্রতিদিন জেগে উঠে
আমার অস্তিত্ব ঘিরে বাজাক মুক্তির নহবৎ।

এবার তাহলে অন্যপথ।

পুরনো সড়কে আজ স্বাচ্ছন্দ্যের গুলজার নরক—
আরামে নিমীলনেত্র কেউ, কেউ অহংকারে
সপ্ত এক তানছাড়া ওস্তাদের মত
এদিকে ওদিকে চায় বাহবা কুড়ায়,
কেউবা লুটের মাল বেমালুম চুপিসারে
সরায়; সবাই হাসে, কথা কয়; যদিও বস্তুত
কেউই শোনে না, কিম্বা করে না সে উক্তির পরখ।
কথায় কথায় নেচে ভেসে যায় পিচ্ছিল সড়ক।
ফলে এই কাঁটাপথ; আমার নিজের
পায়ে পায়ে হাঁটাপথ, যদিও বাজে না নহবৎ
এ পথের মোড়ে; পদক্ষেপে রাত্রিদিন
শুধু ধুলো ওড়ে, তবু আমি যাব
রক্তরাঙা এই পথে দিগন্তের হৃদ্‌পিণ্ডের দিকে
কেননা জীবন চাই, চাই গ্রামরেখা
যেখানে বসতি আছে, আছে শিশু, আঙিনা ও গাছ,

গাছের মাথায় মাঝে যেখানে সূর্যের লাল
জীয়নকাঠির রশ্মিজাল
জাগে পাখি, মানুষের ঘর জাগে, আমি
সেই পথ আঁকি, এতদিন পরে, আহা, এতকাল পরে—
এতকাল !

কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে এতকাল
চলেছে কথার দাবা ছক থেকে ছকে,
আজ বাজিমাৎ—থেমে গেছে হাত। বকে
এখনো অনেক লোক ; বকে আজেবাজে বেঁহুস বেচাল ;
এবার কথায় কিছু প্রেম দাও, আবেগ জমাও
বুকে বুক রেখে,
কাঁটাগুল্মে, আগাছায় প্রাণের ঔরসে পথ এঁকে
হে আমার কবিতা, হে রুদ্র
সন্ন্যাসী ! ঘরের পথে শুষ্ক মাঠে বালির সমুদ্র
পার হও। দিগন্তের দিকে
গ্রামের হৃদ্‌পিণ্ড ছুঁয়ে মুক্তির নিরিখে
দাও সেই যুগ-যুগ মৃত্যুঢাকা আশ্চর্য সম্পদ—
অন্য কথা, অন্যদিন, অন্য এক পথ ॥

মণীন্দ্র রায়

বাসনা

আমাকে তুলে ধর।

আমাকে তুলে ধর
জীবনের অরাজক তরঙ্গ শিখরে
নীলাভ নীলার জটিল কেনায়
দুর্বিনীত ঝড়ের অসংযত ডানায় মত্ততায়

আমাকে তুলে ধর
আয়োজন তামাটে মাটির বিদ্রূপবিদ্ধ নিশ্চুপ ভ্রুকুটির সামনে
সমুন্নত বন্যের মত অদম্য স্বেচ্ছাচারী ;
আমাকে মহান কর
আকাশ-ছোঁয়া মমতার পাহাড়চূড়ায় প্রত্যয়ের সপ্তর্ষির মত
সূর্য আর সঙ্গীতের জন্ম
ছন্দ আর সমতার জন্ম ।

আমাকে মুক্ত কর
খণ্ড চৈতন্যের জগদ্দল পীড়ন থেকে
অনাবৃষ্টি দগ্ধ ঠোঁটে শূন্যতার তর্জনী থেকে
একটা ইচ্ছায় গাঁথা হৃদয়ের অরণ্যের কথার মর্মরে
মন্দ্র তপ্ত ভোরের ভিতরে উড়ন্ত ঘুঘুর মত
ঘুমন্ত চোখের পাতায় শঙ্কিত চুমার মত ,
আমাকে মানুষ কর
জল্লাদের ছায়া ঢাকা জীবনের অন্তহীন রূপের শ্মশানে
চাঁদের বিষণ্ণ আলোয় রক্তের আঘ্রাণে অস্থির চিৎকারে
আমাকে মানুষ কর
ছুরির সুতীক্ষ্ণ ফণাকে আঁকড়িয়ে মুঠোর গহ্বরে
প্রতিশোধে অজগর আক্রোশে নিঃশ্বাসে
লোহার আঁচড়ে ক্ষত রাশি রাশি বুকের গোলাপে
আমাকে মুক্ত কর
ঝঞ্ঝামুগ্ধ মেঘে মেঘে ঝাঁকে ঝাঁকে বিদ্যুৎ-ঈগলের মত
রূপ আর রূপকথার জন্ম
শস্য আর সূর্যমুখীর জন্ম ।

রাম বসু

আমি চাই

কাল রাত্রে যে তরুণ চেয়েছিল প্রথম সূর্যকে
আজ সেই কি যে ভেবে হয়েছে উন্মনা
কখন আকাশ দেখে স্তব্ধ নেত্রে নিজেরই গলায়
চমকানো ক্ষুরের ধারে এঁকে দিল রক্তের আল্পনা।

বড়ের গলায় গলা জড়িয়ে জড়িয়ে দেবদারু
কাঁপে মাঝরাত্রে নামে বৃষ্টির সান্ত্বনা
আবার শাঁখের ডাক আবার কি নাশের নখরে
বাঁচায় বস্তিতে ফের নীলোৎপল প্রাণের যন্ত্রণা।

যতবার শব্দ হয় ততবার আলো জ্বলে ওঠে
ততবার নক্ষত্রের নাড়িতে নাড়িতে লাগে টান
তারাহীন অন্তহীন শব্দহীন যবনিকা ঠেলে
হাড়ের অরণ্য ভেঙে কথার লতায় জাগে প্রাণ।

কথা কি কথাই নেই মাথাকাটা ধড়ের ব্যথায়
পাঁকে দেয় গড়াগড়ি, দিনান্তের ট্রামের স্টপেজে
ফোলাই ফানুস আমি প্রাণপণ নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
তবু ছেঁড়ে ইন্দ্রধনু কাঁপা কোন শব্দের আওয়াজে।

চাই ক্ষিপ্ত বর্ণমালা, অন্ধকারে অস্থির হাওয়ায়
যে নামে ডেকেছি নাম আজ তার রক্তমাখা ডানা
আকাশে পায় না বাসা তীক্ষ্ণ তাই শব্দের বল্লমে
জীবন মৃত্যুর লগ্নে তুলে ধরি আমার চেতনা।

আমি চাই বারবার সৌন্দর্যের প্রখর পাথর
কাদা ও মেঘের রঙে সমুদ্রের অপর্যাপ্ত সোনা
গেঁথেছে অজস্র দাগ অঙ্গে তার চাই বারে বারে
প্রথম প্রেমের চোখে সমস্ত দেশের সম্ভাবনা।

অসীম রায়

খবরের কাগজের রিপোর্ট

উমাকান্ত ভট্টাচার্য

মিঃ বিমলপ্রকাশ রায় করিৎকর্মা লোক। তাই বাপের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া মাত্র কয়েক হাজার টাকা যে যুদ্ধের বাজারে ফেঁপে ফুলে কয়েক লক্ষে গিয়ে দাঁড়াবে তাতে আর আশ্চর্য কি? তাতেও ক্ষান্তি নেই; বিমলপ্রকাশ পরশ্রমবিলাসী নন, অলস ত ননই। তাই যুদ্ধের পরে লক্ষ যদি কোটিতে গিয়ে ধাক্কা দেয়, সেটাই ত স্বাভাবিক! কাপড়ের কল থেকে শুরু করে চামড়ার কারখানা এবং মফঃস্বলে চালের আড়ৎ পর্যন্ত প্রায় সব রকম অর্থকরী কারবারের পিছনেই "রায় এণ্ড কোম্পানি"র লেবেল আজকাল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। বিমলপ্রকাশ কোটিপতি, বড় শিল্পপতি।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। বাইরের ঘরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বিমল-প্রকাশ বললেন, আর যে সইতে পারছি না, শোভন!
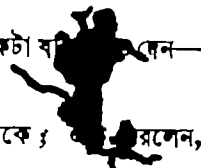
শোভন বিমলপ্রকাশের সেক্রেটারি; বয়স অল্প, কিন্তু বুদ্ধি প্রচুর। খুশির সময় বিমলপ্রকাশ স্বীকারও করেন যে, তাঁর এই ঐশ্বর্য ও প্রতিষ্ঠার মূলে শোভনের দান কম নয়।

কথার সঙ্গে বিমলপ্রকাশের-বুক থেকে অতবড় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসতে দেখে শোভন একটু আশ্চর্য হল।

—হ্যাঁ স্যর, একটা কিছু না করলে ভাল দেখাচ্ছে না।

বিমলপ্রকাশ চিন্তা করতে লাগলেন।

—তা স্যর, আমার মনে হয়, যাদবপুরের ওই ব্যারাকটা য[illegible]লেন—এখন ত কোন কাজে লাগছে না।

বিমলপ্রকাশ মুখ তুলে তাকালেন শোভনের দিকে; [illegible]রলেন, তারপর?

শোভন ভরসা পেয়ে বলল, আপাতত কিছুদিন ব্যবহার করুক। তারপর প্রয়োজন হলে তুলে দিতে কতক্ষণ? একটু হেসে শোভন চুপ করল। বিমলপ্রকাশ আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, হুঁ।

তাহলে চেষ্টা করে দেখ।—বিমলপ্রকাশ জানালা দিয়ে আকাশের দিকে

চেয়ে দেখলেন একবার, আজ আবার বিষ্টি আসছে। কি অবস্থায় আছে ওরা, ভাব ত!

শোভন সত্যিই ভাবিত হয়ে পড়ল, এই বড়-বাদলার দিনে কাঁথা-বালিশ নিয়ে ফুটপাতে নয়ত স্টেশনের বারান্দায়, মানুষ বাঁচছে কেমন করে?

—আচ্ছা স্যর, আমি দেখছি। শোভন চলে গেল।

বিমলপ্রকাশ চুপ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইলেন। মানুষ জাতির চরম দুর্দশা তাঁকে রীতিমত ব্যাকুল করে তুলেছে।

পিসির ছোট মেয়ে অরুণা ডাকল, খাবার দেওয়া হয়েছে। বিমলপ্রকাশ উঠে দাঁড়ালেন। এই ত সংসার! আপনজন বলতে কেউ নেই। বয়স হয়েছে, কিন্তু বিয়ে করার ইচ্ছা হয়নি এখনও; কি হবে ও' দিয়ে? বিমল-প্রকাশের কি এতই বেশি সময় যে, বউ নিয়ে খেলা করে কাটাবে? দূর সম্পর্কের পিসি ঘর-দোর দেখাশোনা করে, আর মেয়ে অরুণার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকে। হতাশ অবশ্য সে হয় না; বিমলপ্রকাশের উপরে তার ভরসা অনেক। তা হোক, বিমলপ্রকাশ ভাবেন, এত পয়সা করলেন কাজে ত লাগাতে হবে!

ঠাকুর ভাত দিয়ে গেল। বিমলপ্রকাশ পিসির কাছে প্রস্তাবটা উত্থাপন করলেন। শুনে পিসির আনন্দের সীমা ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম হল, তুমি করবে বাবা? ভগবান তোমার মঙ্গল করুন! তিনি যাকে দেন—এমন বুদ্ধি যদি সবার হত—! পিসি আর বলতে পারল না, আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

তা হলে ভালই হবে। বিমলপ্রকাশ খেয়ে বড় তৃপ্তি পেলেন আজ। কাল সকালেই [illegible]কে তাড়া দিতে হবে। কি অবস্থায় যে দিন কাটছে ওদের!

তুমুল [illegible] পৃথিবীকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বিদ্যুতের এক একটা [illegible] চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়। অন্ধকারের কি আর সীমা-পরিসীমা থাকতে নেই? বিমলপ্রকাশ জানালার খড়খড়িগুলো নিজে হাতেই ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে খাটের বিছানার উপর এসে বসলেন। চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মনে মনে বললেন, বড় ঠাণ্ডা পড়েছে আজ।

তিনদিন পরে বিমলপ্রকাশ শোভনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ও দিকের কাজ নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে, শোভন!

—আজ্ঞে, প্রায় শেষ করে এনেছি, আর একটা বেলা খাটলেই—

বেশ। বিমলপ্রকাশ হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, ছ'টা বেজে পাঁচ মিনিট হয়েছে।

—এই যে, আসুন। সাদা পাঞ্জাবি-পরা সুস্থ এক ভদ্রলোক এসে বসলেন বিমলপ্রকাশের সামনের চেয়ারে।

—আমি ভাবছিলাম, বুঝি ভুলেই গেলেন। আমাদের সম্পর্কে ত—

ভদ্রলোক হাসলেন একটু, হেঁঃ হেঁঃ, কি যে বলেন! আপনারা না থাকলে আমাদের কাজ ত অঙ্কুরেই বিনষ্ট হত।

বিমলপ্রকাশ তা জানেন ভাল রকমই। শোভনের দিকে ফিরে বললেন, শোভন, ইনি হচ্ছেন "—সমিতির" পরিচালক, প্রতিষ্ঠাতাও বটে।

শোভন হাত তুলে নমস্কার জানাল।

—তুমি ত আস্তানা তৈরি করে দিলে; কিন্তু লোক কোথায়? তাই এঁকে ধরে নিয়ে এলাম। আর তাছাড়া কিছু লোকজনও ত দরকার ওদের দেখাশুনো করার জন্তে, না কি বল?

—হ্যাঁ স্যর, শোভন বলল।

—তাহলে আপনি কাল বিকেল থেকেই লোক আনতে পারেন। দেরি করে লাভ নেই। জানেন, ওদের অবস্থার কথা ভাবলে—, কথা শেষ না-করে বিমলপ্রকাশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপতে চেষ্টা করলেন। একটু পরে বললেন, ওখানে মোট শ' তিনেক লোকের জায়গা হবে, কি বল শোভন?

—হ্যাঁ স্যর, তা হবে।

তারপর খানিক টুকিটাকি আলোচনার পর ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন. আমি এখন তাহলে চলি। আবার আসব, খবর দিয়ে যাব, কত [illegible] হল।

—আচ্ছা, নমস্কার।

বিমলপ্রকাশ একবার শোভনের মুখের দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করলেন, সে কি ভাবছে। তাঁর নিজের চোখেও খুশির অভাব নেই।

তারপর দু'দিনে তিন শো লোকের ব্যারাক ভর্তি হয়ে গেল। খোয়া বিছানো রাস্তার ধারে উপ-জনপদ। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, কাঁথা-বালিশ, ছেঁড়া-শাড়ি, থানের টুকরো, মাটির হাঁড়ি, ভাঙা-কলসী—সব মিলে মহা-সোরগোল। রাস্তার উপর ব্যারাকের সামনেই টিউবওয়েল; তিন শো লোক ব্যবহার করে সেই জল। টানাটানি একটু লাগে; তা হোক, মানিয়ে

চলতে জানে এরা। আর না হয় হলই একটু জলের কষ্ট, ফুটপাত আর স্টেশনের বারান্দা থেকে ত ভাল! সামনের ফাঁকা জমিটায় বৃষ্টি হলে জল জমে। তাতে কি? দেশে থাকতে জল কি ওরা কম দেখেছে? জানালাগুলো এখনো সারানো হয়নি। তাতেই বা কি হয়েছে? এমন মাথা গোঁজার ঠাঁই! যারা এতখানি করল—না করবেই বা কেন? হাজার হলেও মানুষ ত? মানুষেব দুঃখে প্রাণ কাঁদে না কার?

তার উপর শোনা যাচ্ছে, খাওয়ার ব্যবস্থাও নাকি করে দেবেন—কি যেন নাম তাঁর। তিনি দু-বেলা ভরপেট খাবার। কত টাকা না জানি আছে তাঁর! ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন, তাঁকে আরও দিন, জন্ম জন্ম ধবে তিনি যেন এমনি সৎকাজে ব্যয় করে যেতে পারেন।

খাদ্য-বিতরণ শুরু হল এক সপ্তাহ পরে। দু-বেলা ভরপেট খাওয়া। প্রথম দিন তিন শো লোক ধন্য ধন্য করল। স্থানীয় বাসিন্দারা গর্ব অনুভব করল (কারণ অজ্ঞাত), এই না হলে মানুষ! "সমিতির" ভলান্টিয়াররাও তিন শো লোকের সঙ্গে পেটপুরে খেয়ে ঢেকুর তুলল, সত্যিই, মহৎ লোক একেই বলে।

এবং সব বিশেষণ জড়িয়ে পরদিন দৈনিক কাগজে বিরাট খবর বেরুল মিঃ বিমলপ্রকাশ রায়ের সহাস্য ছবি সমেত। ছবি আরও ছিল: ব্যারাক, রাস্তা, রান্নাঘর, তিন শো লোকের লাইন দিয়ে খাবার নিতে আসা, ইত্যাদি। সন্দেহ-বাতিকদের বিরুদ্ধে মোক্ষম অস্ত্র।

বিমলপ্রকাশের বাড়িতে সদাই আনাগোনা—কত রঙের কত লোক। রিপোর্টার থেকে শুরু করে চাকরীর উমেদার পর্যন্ত। আর কিছু না-হোক, তারা যে [illegible] ভাল বলতে জানে এই কথাটা অন্তত জানিয়ে যাওয়া দরকার মিঃ বিমলপ্রকাশ রায়কে। বিমলপ্রকাশ সহাস্যবদনে সবাইকে গ্রহণ করলেন; সলজ্জ হাসির সঙ্গে নিজের ক্ষুদ্রতার কথা উচ্চারণ করে জানিয়ে দিলেন, তিনি এমন কিছু করেননি; যতটুকু করা উচিত ঠিক ততটুকুই তিনি করেছেন, বেশি নয়।

শোভন চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। মুখে তার কোন কথা নেই। সত্যিই, মিঃ রায়ের এ রূপ ত জানা ছিল না!

ক্রমে আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে এল।

পনেরো দিন পরে।

"সমিতির" পরিচালক রমণীবাবু বসে আছেন বিমলপ্রকাশের সামনে। সন্ধ্যা উত্তরে গেছে অনেকক্ষণ।

বিমলপ্রকাশ বললেন, তা, আমাকে একদিন নিয়ে চলুন ওখানে!

—নিশ্চয়ই, আপনি নিজে না দেখলে চলবে কেমন করে? চলুন না, কালই—

—কাল? বিমলপ্রকাশ কি ভেবে নিলেন, কাল নয়, আমি পরে আপনাকে জানাব। আপনি বরং যে-লোকটির কথা বলছিলেন—ড্রাইভার—তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। দুটো কথা বলব।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কাল সকালেই আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি তাকে। আচ্ছা, এখন তাহলে চলি।

—আসুন! রমণীবাবু চলে গেলেন।

শোভন ঘরে ঢুকতেই বিমলপ্রকাশ বললেন, শোভন, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। পারবে ত? বিমলপ্রকাশ হাসলেন একটু।

—পারব স্যর। শোভন ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বিমলপ্রকাশের কোন কাজ কি সে অসম্পূর্ণ রেখেছে কোনদিন? তবে আজ এ প্রশ্ন কেন? ভাল হোক, মন্দ হোক, বিমলপ্রকাশের আজ্ঞা সে কোনদিন অবহেলা করেনি, আজও করবে না।

বিমলপ্রকাশ বুদ্ধিমান। শোভনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বস, এই চেয়ারে। তারপর টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে গলার স্বর একটু নামিয়ে বললেন, শোন বলি—।

বিমলপ্রকাশ এসেছেন ব্যারাক দেখতে। প্যাকার্ড গাড়িখানা একটু দূরে রাখা হয়েছে। ব্যারাকবাসী নর-নারায়ণদের তিনি স্বাভাবিক অবস্থায়ই দেখতে চান, বিনা-আড়ম্বরে। সঙ্গেও লোকজন কেউ নেই, রমণীবাবুর দেওয়া সেই ড্রাইভারটি ছাড়া। ভালই করেছেন, একবার যদি জানাজানি হয়ে যায় বিমলপ্রকাশ এখানে আসছেন, রাজ্যের লোক তাহলে তাঁর পিছু নেবে, তাঁরই ক্যাম্প তাঁকে দেখিয়ে নিজেরা তৃপ্তি উপভোগ করবে। তার চেয়ে এই ভাল; একা একা দেখে গেলেন কেমন আছে এরা।

তখন দুপুরের খাবার বিতরণ হচ্ছে; লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে সব যে-যার পাত্র হাতে নিয়ে।

বিমলপ্রকাশ এবং ড্রাইভার। ড্রাইভার খানিকটা দূরে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল।

ড্রাইভার এক সময় আঙুল তুলে কি দেখিয়ে দিল লাইনের দিকে। বিমলপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করলেন, একেবারে শেষে আর মাঝখানে ওই বুড়োর ঠিক পিছনে?

—হ্যাঁ স্যার।

একটু পরে তাঁরা ফিরে চললেন গাড়ির দিকে। শোভন অপেক্ষা করছিল সেখানে। বিমলপ্রকাশ তাকে বললেন, তুমি এর সঙ্গে পরে এসো রেখে যেও আমাকে পৌঁছে দিয়ে।

শোভন মাথা নেড়ে সায় দিল।

পরদিন সকালে। ব্যারাকে তিন শো লোকের মধ্যে উত্তেজনার অন্ত নেই। আশেপাশের স্থানীয় বাসিন্দাও এসে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন। সর্বনেশে ব্যাপার! দিনে-দুপুরে মেয়ে চুরি! তবু ভাল, সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গেছে; নইলে—

এক বৃদ্ধ ছুটে এলেন, কই, আমার কালী কই! তের বছরের মেয়ে কালী, মুখ নিচু করে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। তাকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন, আমি ত কারুর কোন ক্ষতি করি নাই রে! আমার কপালে এত দুঃখ কেন?

স্থানীয় [illegible] ভদ্রলোক বললেন, থাক, ওকে নিয়ে আপনি ঘরে যান; আমরা [illegible]। তারপর তুমি কি বলছিলে?

[illegible]গের সেই ড্রাইভার। কিল-চড় যে কিছু না-পড়েছে এমন নয়; জামাটা পিঠের কাছে ফালা হয়ে গেছে। মাথার চুল অবিন্যস্ত। ভয়ে ভয়ে সে বলল, স্যার দেখা করতে চেয়েছেন বলেই না আমি—

কথা শেষ হল না; ছোকরা গোছের একজন চিৎকার করে উঠল, হারামজাদা কতবড় শয়তান! স্যারের নাম কইর‍্যা নিজে পার পাইতে চায়।

বৃদ্ধ গোছের কয়েকজন জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে বিমলপ্রকাশের উদ্দেশে

প্রণাম নিবেদন করল। এবং বিমলপ্রকাশের নামে এতবড় অপবাদ দেওয়ায় ছেলের দল ক্ষেপে গেল, হারামজাদা!

—আপনারা থামুন। এ করে কোন লাভ হবে না। আগের ভদ্রলোক বললেন, আমি বলি, এই গাড়িশুদ্ধু একে থানায় নিয়ে যাওয়া হোক।

—একথা মন্দ নয়। সবাই একে একে মাথা নেড়ে সায় দিলেন প্রস্তাবে।

ভদ্রলোক ড্রাইভারকে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন, চল—আর হ্যাঁ, ওই মেয়েটি আর তার বাপকে একবার যেতে হবে আমাদের সঙ্গে এজাহার দেবার জন্যে।

শোভন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত হল বিমলপ্রকাশের কাছে। কি একটা বই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন তিনি; একটু অন্যমনস্কভাব।

—স্যর!

—কি? বিমলপ্রকাশ মুখ তুলে তাকালেন শোভনের দিকে, কি? পারলে না?

—না স্যর!

—লোটন কোথায়?

—ধরা পড়ে গেছে স্যর।

বিমলপ্রকাশ বইখানা রেখে উঠে দাঁড়ালেন, তা তুমি অত হাঁপাচ্ছ কেন?

—স্যর!

বড় ছেলেমানুষ এরা। একটুতেই বুক কাঁপতে আরম্ভ করে। বিমলপ্রকাশ জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন বাইরের দিকে মুখ করে। এই দুঃসময়ে নিজে গিয়ে একবার তাদের সঙ্গে দেখা করে আসা দরকার। তাঁর সান্ত্বনা না পেলে ওরা বাঁচবে কার ভরসায়?

শোভন ডাকল, স্যর?

বিমলপ্রকাশ মুখ ফেরালেন, কি, ভয় করছে? একটু হাসলেন তিনি, যাও, থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করে এস: আমার দু' নম্বর গ্যারেজ থেকে কাল রাত্রে গাড়ি চুরি গেছে—প্যাকার্ড BLA

শিক্ষা-সংকট

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

"স্বাধীন" ভারতে আজ যে শিক্ষা-সংস্কৃতি বিপন্ন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই সে সম্পর্কে সচেতন। পশ্চিমবঙ্গ অধ্যাপক সমিতির বিগত বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, "শিক্ষা ও সংস্কৃতির আজ বড় সংকট। সমাজদেহের প্রাণশক্তি যে গভীর ক্ষতের দ্বারা দুষ্ট, যে অন্তঃপ্রসারী রোগ সমাজের সঞ্জীবনী শক্তি ক্রমশঃই নষ্ট করিতেছে, এ সংকট তাহারই দ্যোতক।" অধ্যাপক ভট্টাচার্য আরও বলেন, "আজ ভারতের সম্মুখে দুইটি জগৎ—একটি মৃত ও আর একটি এখন পর্যন্ত জন্মলাভ করিতে পারে নাই। শিক্ষক-বন্ধুরাই ঠিক করিবেন এই অবস্থায় তাঁহাদের কর্তব্য কি হইবে।"

সম্প্রতি অধ্যাপক সমিতির সম্পাদকও শিক্ষা-সংকটের প্রতি গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাগজে বিবৃতি দেন। উপরে যে দুটো উদাহরণ দেওয়া হল তা থেকে বোঝা যাবে যে দায়িত্বশীল শিক্ষাব্রতীরা "শিক্ষার সংকট" নিয়ে আজ বিশেষ চিন্তিত ও দুর্ভাবনাগ্রস্ত। আর এ দুর্ভাবনার সঙ্গত কারণও আছে।

আধুনিক ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা

ভারতে বর্তমানে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত তার উৎপত্তি উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। আঠার শতক পর্যন্ত যে দেশী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল—যথা পাঠশালা, মাদ্রাসার শিক্ষা,—সেই শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজ-শাসনে ক্রমশ অকেজো হয়ে পড়ে এবং তার স্থানে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমশ প্রচলন হয়। ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে শাসনভার ইংলণ্ডের সম্রাটের হাতে ন্যস্ত হয় এবং তখন থেকেই বৃটিশ-অনুমোদিত শিক্ষাব্যবস্থা ভারতে স্থায়ী আসন নেয়।

১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই ৯০ বছরের বৃটিশ শিক্ষানীতি কেমন ছিল, আজকের দিনে তার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকা সম্ভব। কোন তর্কের অবকাশ না রেখে বলা চলে যে বৃটিশ-শাসকেরা ভারতে যে শিক্ষানীতি চালু

রেখেছিল, সে শিক্ষানীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দু'টি। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে যে 'নতুন শিক্ষা' খানিকটা পরিব্যাপ্ত হয়, তার ফলে কার্যত পুরনো টোল, চতুষ্পাঠি, মাদ্রাসার শিক্ষার জায়গায় খানিকটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার ঘটে, একথা অনস্বীকার্য। তবুও সমগ্রভাবে সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য হল যে, একদিক থেকে এ শিক্ষানীতি ছিল 'বিজাতীয়', আর এক দিক থেকে, 'গণতন্ত্র-বিরোধী'। কেন, সে কথাটা আলোচনা করা যাক :

১) সাম্রাজ্যবাদ নিরক্ষরতা দূরীকরণের মৌলিক কোন চেষ্টাই করেনি ভারতবর্ষে। ফলে দীর্ঘদিন শাসনের পরও ভারতবর্ষ নিরক্ষরের দেশই ছিল, দেশের 'জনসাধারণ শিক্ষার স্রোতে যোগ দিতে পারেনি এই দীর্ঘদিনের ভিতর। ১৯৪৭ সালেও তাই ভারতের শতকরা ৮৭ জন লোক সম্পূর্ণ নিরক্ষরই ছিল। ১৯১১ থেকে ১৯৩১—এই কুড়ি বছরের হিসাব নিলে দেখা যায় যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষানীতির দৌলতে এই সময়ের মধ্যে, শতকরা মাত্র দু'জনের নিরক্ষরতা হ্রাস পায়, নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা ৯৪ থেকে কমে শতকরা ৯২তে দাঁড়ায়। পাম দত্তের হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৩৪-৩৫ সালে বৃটিশ ভারতে শতকরা ৪৯ জন ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোন না কোন রকমের শিক্ষা পাচ্ছিল। আর উচ্চ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের সংখ্যা ঐ সময়ে ছিল হাজারে ০.৪ জন। সাম্রাজ্যবাদ "সকলের জন্যে শিক্ষা" এ নীতি কোনদিন গ্রহণ করেনি, ক্রমপ্রসারী শিক্ষাব্যবস্থাও সুপরিকল্পিতভাবে ভারতে গড়ে তোলেনি।

২) সাম্রাজ্যবাদ "জনসাধারণের শিক্ষা"কে কোনদিন বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেনি। শুধু তাই নয়, তাদের শিক্ষানীতির শ্রেণীগত রূপও (class character) অত্যন্ত স্পষ্ট। বিশেষ একটা বৃটিশ-আশ্রিত শ্রেণী গড়ে তোলবার জন্যেই তারা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল, জাতীয় স্বার্থানুগ কোন শিক্ষাব্যবস্থা কখনও করেনি।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির (National Planning Committee—Report on Education pp 21) রিপোর্টে বলা হয়েছে যে প্রথম থেকেই বৃটিশ শাসকেরা এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করেছিল এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। সে উদ্দেশ্য ছিল এক ক্ষুদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কেরানীর কাজে, বৃটিশ শাসনযন্ত্রের সেবা করাবার উপযুক্ত বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলা। ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বহাল রাখবার জন্য সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন ছিল

খানিকটা বিদ্যা বিস্তার করা, গড়ে তোলা এমন এক শিক্ষিত সম্প্রদায় যারা সাম্রাজ্যবাদের সহায়তা করতে পারে, কেরানী হিসাবে ও অন্যান্য ভাবে।

৩) এক বিশেষ উদ্দেশ্যে "শিক্ষিত সম্প্রদায়" গড়ে তোলার জন্যে সাম্রাজ্যবাদ যে শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছিল তাও ছিল একান্ত ভাবেই "সাহিত্যিক" ও "কেতাবী"। এ শিক্ষায় শুধু সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন, ইতিহাস—এক কথায় সাহিত্যিক ও কেতাবী বিদ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত, বিজ্ঞান, সমাজ বিবর্তনের তত্ত্বকথা, কারিগরি, হাতেকলমে শিক্ষার স্থান এ ব্যবস্থায় বিশেষ কিছুই ছিল না। "ব্যবহারিক বিজ্ঞান"-এর তুলনায় এ ব্যবস্থায় "বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে"র উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া হত, স্কুল কলেজগুলি ছাঁচে-ঢালা কেতাবী ছাত্রছাত্রী তৈরি করেই কর্তব্য শেষ করত। আসলে তা শিক্ষা থেকে যেত একান্তই অপূর্ণ—বাস্তববর্জিত ও যান্ত্রিক। আর এ ত স্বাভাবিকই; সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে শিল্প-সমৃদ্ধির পথে যেতে দেয়নি। তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভারতের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে কারিগরি বিদ্যালয়, কৃষি বিদ্যালয়, ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যালয়, বিশেষ কিছুই স্থাপন করেনি।

৪) সাম্রাজ্যবাদী আমলে শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজি। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বন্দোবস্ত হওয়ায়, জাতীয় শক্তি ও অর্থের যে কত অপচয় হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। ভারতীয় ছাত্রদের অমূল্য সময় কেটে যেত ইংরেজি ভাষার খুঁটিনাটি শিখতে। শেষ পর্যন্ত অধিকাংশেরই খুঁটিনাটি শেখাও হত না। ইংরেজিতে কাঁচা থাকার ফলে কত ছাত্র যে পরবর্তী জীবনে অকৃতকার্য হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। দেশের মনীষীরা মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন; কিছু সাফল্য লাভও করেছেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজিই বহাল থাকে; অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় না। এই বিজাতীয় ব্যবস্থায় যে শুধু জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটেছে তা নয়, দেশীয় ভাষাগুলিও পরিণত ও পূর্ণাঙ্গ হবার সুযোগ পায়নি। ইংরেজির পূর্ণ মর্যাদা স্বীকার করেও একথা বলা চলে যে ইংরেজির উপর অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করায় জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচণ্ড বাধা পেয়েছে এবং আজ পর্যন্ত পুরনোর জের মিটছে না।

৫) সাম্রাজ্যবাদ যে জাতীয় স্বার্থ ও জনতার স্বার্থের দিক থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে দেখেনি, তার সবচাইতে বড় প্রমাণ এই যে জনতার সামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্যে এ ব্যবস্থায় রাজস্বের অতি সামান্য অংশ

খরচ করা হত। শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থার ঠাট বজায় রেখে শিক্ষার জন্যে বরাদ্দ হত শুধু উচ্ছিষ্টটুকু।

সাম্রাজ্যবাদের হাতে শিক্ষা-সংস্কৃতির ছিল দুয়োরাণীর মর্যাদা। সাম্রাজ্যবাদ কেবলই "এনর্মাস ডিফিকাল্‌টিসে"র কথা শোনাত, আর ভারতীয় জনতার কাছ থেকে শোষণ করে বিপুল সম্পদ ঘরে নিয়ে জমা করত। লুণ্ঠন ও শোষণই যে ব্যবস্থার একমাত্র বৈশিষ্ট্য, সে ব্যবস্থায় যে শিক্ষা-সংস্কৃতির জন্য টাকা মিলবে না, স্কুল কলেজের চাইতে কয়েদখানা তৈরিই যে বেশি হবে এ ত জানা কথা। হয়েছিলও তাই। প্রমাণ হিসাবে বলা চলে যে (ক) ১৯৩৬-৩৭ সালে, প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ছাত্র-প্রতি বছরে ৫ আনা খরচ হত এদেশে।* (খ) সার্জেণ্ট পরিকল্পনার গোড়াতে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে মাথাপিছু শিক্ষার জন্য ব্যয় হত ৮ আনা ৩ পয়সা ; অথচ ঐ সময়ে ইংলণ্ডে ব্যয় হত ৩৩ টাকা ৫ আনা। দেশের জনসাধারণের শিক্ষার উপর যে দেশের ভাগ্য ও মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করছে, সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা যে বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে একথা ঔপনিবেশিক ভারতের বেলায় স্বীকার করেছে, এসব উদাহরণ থেকে তা সুস্পষ্ট।

৫) ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির অগণতান্ত্রিক স্বরূপ নিয়ে আর বিশেষ কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট যে সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে যেটুকু শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছিল তাও ছিল একান্তভাবে বৈষম্যমূলক। এ ব্যবস্থায় "জনসাধারণ" বলতে যাদের বোঝায় তারা শিক্ষার সুযোগ বিশেষ কিছুই পায়নি। সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষানীতির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল সামাজিক বৈষম্যের বিজাতীয় গণতন্ত্রবিরোধী চেহারা। সাম্রাজ্যবাদী-শাসনে শুধু সম্পন্নঘরের ছেলেমেয়েরাই প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারত। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাও বিত্তবান, সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাতশ্রেণীর সন্তানদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা চলে যে ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের ভিতরে শুধু ১৫,০০০ গ্রামে খানিকটা বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯৪১ সাল পর্যন্ত—৬ কোটি সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের ভিতরে (৫ বছর থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত) মাত্র ১ কোটি ১৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী স্কুলে যেত। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রমিককৃষকের সন্তানেরা আসেনি বললেই হয়। অর্থাৎ ভারতের যারা শতকরা ৯০ জন, তারা শিক্ষার সুযোগ বিশেষ

*Anath Nath Basu—Education in Modern India, p. p. 75

কিছুই পেত না—মুষ্টিমেয় উপরতলার মানুষেরাই শিক্ষার সবটুকু সুযোগ পেত। এ কথাটা স্মরণীয় যে ভারতের "জনসাধারণ" যে শিক্ষার সুযোগ থেকে, বিদ্যানুশীলন থেকে বঞ্চিত ছিল তার কারণ সবটাই সামাজিক এবং আর্থিক। ঔপনিবেশিক সমাজের অনগ্রসরতা শিক্ষাব্যবস্থাকে কেমন পঙ্গু ও স্থিতিশীল করে রেখেছিল, শিক্ষার সুযোগের এই অসমান বণ্টনই তার প্রমাণ: "Education, such as it was, was the privilege of the few—those who could pay for it" (N. P. C. Report).

জাতীয়, গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার চেহারা

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। জনসংখ্যার দিক থেকে, ভাষার বৈচিত্র্যের দিক থেকে, সামাজিক-আর্থনীতিক পরিবেশের দিক থেকে ভারতবর্ষের সমস্যা সত্যিই অত্যন্ত জটিল। তাহলেও ভারতের জাতীয়, গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে, "স্বাধীন" ভারতে শিক্ষাসংস্কার কোন পথে হবে এ সম্পর্কে কতকগুলি "মূলনীতি" কংগ্রেসের দ্বারা স্বীকৃত ছিল। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির রিপোর্ট ঘাঁটলেই এ কথার সত্যতা প্রমাণ হবে। সে মূলনীতিগুলি এ রকম:

১) স্বাধীন ভারতের নিয়মতন্ত্রে "অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা" নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের অন্যতম বলে স্বীকৃত হবে।

২) ছয় থেকে চৌদ্দ বছরের প্রত্যেকটি বালকবালিকাকে বনিয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে এবং এ শিক্ষা হবে অবৈতনিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক। তাছাড়া, নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে; জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার এগুলি অপরিহার্য অঙ্গ এবং এসব দায়িত্ব রাষ্ট্রের গ্রহণ করতেই হবে, কোন অজুহাতে পরিহার করা চলবে না।

৩) জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মতে "জাতীয়" শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব হল প্রত্যেকটি নাগরিকের মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষার বন্দোবস্ত করা, বিনা বেতনে। এটা নাগরিকদের অধিকারেরই অন্তর্ভুক্ত। তবুও ভারতের বর্তমান অবস্থায় "অবৈতনিক" মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা প্রথমদিকে সম্ভব হবে না। তাহলেও ক্রমপ্রসারী, সুপরিকল্পিত, মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন ও এ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। এ দায়িত্ব রাষ্ট্র এড়াতে পারে না।

৪) জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় "প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা"কেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। অক্ষরজ্ঞানহীন প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা ভাবতে অসংখ্য। ৫ জন পুরুষের ভিতর ৪ জন এবং ১০ জন মেয়েদের ভিতর ৯ জনই ভারতে অক্ষর-জ্ঞানবর্জিত। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মতে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ গভর্নমেন্টের করতে হবে এবং শিল্পমালিক, স্থানীয় সমিতি—এদের এ দায়িত্ব নিতে বাধ্য করতে হবে—গভর্নমেন্টও আর্থিক সাহায্য করবেন। রাশিয়ার উদাহরণ থেকে শিখে এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যাপক ও সার্থক করে তুলতে হবে, এটাই ছিল জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির অভিমত।

৫) ভারতকে শিল্পপ্রধান, প্রাগ্রসর দেশে পরিণত করতে হলে কুশলী কর্মীর প্রয়োজন। এ প্রয়োজন পূর্ণ করবার জন্যে কারিগরি শিক্ষার বিশেষ প্রসার করতে হবে—বাস্তববর্জিত কেতাবী শিক্ষার বদলে ক্রমপ্রসারী কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা প্রধানত রাষ্ট্রকেই করতে হবে। তাছাড়া উচ্চশিক্ষার পুনর্গঠন, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সংযোগসাধন ও অন্যান্য নানা সমস্যার সমাধানও রাষ্ট্রকে করতে হবে—জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির এই ছিল সিদ্ধান্ত।

৬) বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য স্তরের শিক্ষা যাতে ফলপ্রসূ হয় সেজন্য প্রত্যেক নাগরিকের চাকুরীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই যদি বেকার থাকে, ক্রমপ্রসারী অর্থনীতির সংগঠনে যদি এদের স্থান না হয় তাহলে জাতীয় শ্রমশক্তির কি বিপুল অপচয় হয় সেকথা বলাই বাহুল্য। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি বলেছিল যে সাম্রাজ্যবাদী আমলে আর্থনীতিক প্রসার না থাকায় শিক্ষিত লোকের "চাহিদা"র চাইতে "যোগান" ছিল বেশি; সার্থক সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতিভা নিযুক্ত হবার সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু জাতীয় গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় পরিকল্পিত, ক্রমপ্রসারী অর্থনীতির দৌলতে দেশের সব প্রাপ্তবয়স্কদের শ্রম-শক্তিরই প্রয়োজন হবে, কোন কিছুরই অপচয় হবে না। কর্মক্ষম সকলকে চাকরি দেবার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করবে।

৭) জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাব্যবস্থার যাবতীয় প্রধান ব্যয় সরকারকেই বহন করতে হবে। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি "টাকার প্রশ্ন"কে কঠিন প্রশ্ন বলেছেন, কিন্তু "টাকা নেই" অজুহাতে শিক্ষা-ব্যবস্থা শুকিয়ে মরবে এ প্রস্তাব তাঁরা সমর্থন করেননি। জাতীয় জীবন

পুনর্গঠনের জন্যে ক্রমপ্রসারী শিক্ষাব্যবস্থা যদি প্রয়োজনীয় হয়, তাহলে সরকারকে রাজস্বের নতুন উৎস খুঁজে বের করতে হবে, শিক্ষাখাতে রাজস্বের অনেকখানি ব্যয় করতে হবে, শিক্ষাকে দিতে হবে জাতীয়জীবনে পূর্ণ মর্যাদা।

(৮) শেষ কথা এই যে জাতীয় গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা এ কথাও স্বীকৃত ছিল। শিক্ষার বাহন যদি মাতৃভাষা না হয়, শিক্ষাব্যবস্থায় বিদেশী ভাষারই যদি একচ্ছত্র রাজত্ব থাকে, তাহলে সে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে "জাতীয়" বলা চলে না।*

মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদ ও তারপর

১৯৪৭ সালে যখন মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী "স্বাধীন ভারতের" কাছে ক্ষমতা "হস্তান্তরিত" হয় সেদিন থেকে আজ তিন বছর কেটে গেল। এ তিন বছরে শিক্ষাব্যবস্থার কেমন অগ্রগতি হল, জাতীয় গণতান্ত্রিক, ক্রমপ্রসারী শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত হল কিনা, আজ এ প্রশ্ন তোলা অপ্রাসঙ্গিক নয়। প্রত্যেক শিক্ষানুরাগীর আজ ভেবে দেখতে হবে, জাতীয় শিক্ষানীতির যে সূত্রগুলি, মূলনীতিগুলি এতদিন স্বীকৃত ছিল, সেগুলি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে কিনা, ভারতের জনসাধারণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সে প্রতিশ্রুতি পালনের কোন লক্ষণ, অন্তত, দেখা যাচ্ছে কিনা। আজ শিক্ষাব্রতী, ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী জনসাধারণ—সবাই উপলব্ধি করছেন যে পুরনো ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার জায়গায় জাতীয় গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন হয়নি; শিক্ষাজগতের আজও সেই আগের মতই দুর্দশা। বরং, শিক্ষার রাজ্যে অরাজকতা আরও বেড়েছে, সুশিক্ষার বন্দোবস্ত বিশেষই কিছুই হচ্ছে না "জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি"র সুপারিশ, পুরনো সব প্রতিশ্রুতি সব ফাইলেই চাপা আছে—নতুন সরকারও মহা আনন্দে "ল এ্যাণ্ড অর্ডার"ই শুধু বজায় রাখছেন।

নতুন সরকার যে ক্রমপ্রসারশীল গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন চেষ্টা করেননি,—সরকারের কাছে শিক্ষার যে আজও দুয়োরাণীরই মর্যাদা, শাসন এবং শোষণযন্ত্র বহাল রাখবার জন্যেই যে সরকারের সব প্রচেষ্টা নিঃশেষিত, এ সত্য আজ স্বপ্রকাশ। শুধু তাই নয়। ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনের তরফে ভারতের জনসাধারণকে যা যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া

* Anath Nath Basu—Education in Modern India ; pp. 161.

হয়েছিল, আজকের সরকার সে সব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পুরনো ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাই বহাল রেখেছেন, ভারতীয় জনসাধারণকে করেছেন বঞ্চিত। এই বঞ্চনার ইতিহাস খানিকটা আলোচনা করা যাক :

(১) করাচী কংগ্রেস থেকে আরম্ভ করে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি পর্যন্ত "শিক্ষার অধিকার" স্বাধীন ভারতের নিয়মতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হবে,এ নীতি ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় নিয়মতন্ত্রে এ অধিকার মৌলিক অধিকারের সনদে লিপিবদ্ধ হয়নি। ভারতীয় নিয়মতন্ত্র অনুযায়ী "সম্পত্তির অধিকার" মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এ অধিকার আদায়ের জন্যে সর্বোচ্চ আদালতের সাহায্য নেওয়া চলবে। [ধারা ৩১ (১) ও ৩২ (১)]; কিন্তু শিক্ষার অধিকার "ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপল্‌স্ অফ স্টেট পলিসি" অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ রাষ্ট্র জন-সাধারণের শিক্ষার কথা আদর্শ হিসাবে রাখবে, চেষ্টা করবে, কিন্তু ভারতীয় নাগরিকেরা এ অধিকার আদায় করবার জন্তে আদালতের সাহায্য নিতে পারবেন না, কারণ শিক্ষার অধিকার আজ আর মৌলিক অধিকার নয়।

২) ভারতের "স্বাধীন" সরকার ক্রমপ্রসারী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব আজ পর্যন্ত গ্রহণ করেননি, শিক্ষাবিস্তারের বেগ আজও ঠিক আগের মতই স্তিমিত। এটা সহজেই অনুমেয় যে প্রাথমিক শিক্ষার যদি ব্যাপক প্রসার না হয়, তবে উচ্চশিক্ষারও প্রসার সম্ভব নয়। আর শিক্ষিত কর্মীদল যদি না তৈরি হয়, তবে জাতীয় পুনর্গঠনও হতে পারে না। সরকার অবশ্য শিক্ষার ভোজে সবাইকে আমন্ত্রণের দায়িত্ব নেননি—নেবেন এমন লক্ষণও নেই।

৩) একথা স্মরণীয় যে আজও ভারতে সব স্তরের শিক্ষার্থীর সংখ্যাই জনসংখ্যার অনুপাতে অতি সামান্য। সংখ্যার হিসাব নিলেই দেখা যাবে যে জনসংখ্যার অনুপাতে অধ্যয়নরত ছাত্রের সংখ্যা ভারতে অত্যন্ত কম। ভারতে শিক্ষাসংস্কৃতির কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি, শিক্ষাসংস্কৃতি পুরনো ঔপনিবেশিক ধারা বহন করেই চলেছে। "অবৈতনিক", "বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা", জাতিগঠনের গোড়ার কথা। এ স্তরের শিক্ষার কথা বাদ দিয়ে শুধু উচ্চশিক্ষার স্তরের আলোচনা করলেও বর্তমান সরকারের বিজাতীয় নীতির সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। আজও ভারতে ২২০৫ জন লোকের ভিতর ১জন মাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করছে, অথচ ইংলণ্ডে

এ সংখ্যা হল ৮৩৭ জনে ১ জন—আর আমেরিকায় ২২৫ জনে ১ জন। "জাতীয়" সরকারের আমলে যে শিক্ষার খুব প্রসার ঘটছে, উচ্চশিক্ষায় দেশ প্লাবিত হচ্ছে, এধরনের ঘোষণারও তাই কোন বাস্তব প্রমাণ নেই। সাম্প্রতিক সংখ্যা সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। তাহলেও, সরকারী তথ্য থেকেই বলা চলে যে ভারতের মত অনগ্রসর দেশে আজও ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৩'৬ জন ছাত্রই শুধু ডাক্তারী, কৃষিবিদ্যা, কারিগরিশিক্ষা, বাণিজ্যিক শিক্ষা নেবার সুযোগ পাচ্ছে। অথচ ভারতের সামনে আজ কোটি কোটি লোককে শিক্ষিত করে তোলবার দায়িত্ব। শিল্পসমৃদ্ধ ভারত গড়ে তুলতে হলে কারিগরি, বাণিজ্যিক শিক্ষার অসামান্য প্রসার চাই। রোগজীর্ণ ভারতকে সুস্থ সবল করে তোলবার জন্যে চাই অগণিত ডাক্তার ও নার্স। প্রাথমিক ও অন্যান্য স্তরের ক্রমপ্রসারশীল শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে হাজার হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন। সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য, ক্রমপ্রসারী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য, ভারতের নিম্নতম চাহিদার হিসাব দেয়া হয়েছিল—যথা, (ক) ৬ থেকে ১৪ পর্যন্ত প্রায় ৬ কোটি শিক্ষার্থীর জন্যে ১৮ লক্ষ বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন; (খ) ১৯৪১-৪২ সালে সারা ভারতের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষের মত। সার্জেণ্ট পরিকল্পনা মত এ ব্যবস্থার উপর আরও ৮২ লক্ষ ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করণীয় ও এজন্যে সবশুদ্ধ ৩ লক্ষ ৬৩ হাজারের মত শিক্ষকের প্রয়োজন; (গ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও ব্যাপকতর হবে এবং এটাও সার্জেণ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী করণীয়। শুধু তাই নয়। শিক্ষাব্যবস্থাকে করতে হবে শক্তিশালী—শুধু শিক্ষার ক্রমপ্রসার নয়, সুশিক্ষারও বন্দোবস্ত করতে হবে, রাষ্ট্রকে শিক্ষার জন্যে প্রচুর ব্যয় করতে হবে—এই ছিল সার্জেণ্ট পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত। অথচ "স্বাধীন" ভারতের তিন বছরের হিসাব নিলে দেখা যাবে যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির বা সার্জেণ্ট পরিকল্পনার কথামত কাজ বিশেষ কিছু আরম্ভ হয়নি। অন্যদিকে "ভারতে বড় বেশি উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা" এ ধরনের অজুহাত তুলে সরকারী কর্তারা সভ্য সরকার হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে হলে মূল দায়িত্ব পালন করা দরকার সেই মূল দায়িত্ব এড়াচ্ছেন। ভারতের সরকারী কর্তারা বলেন যে ভারতে "বড্ড বেশি শিক্ষিতের দল", "শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি হওয়ায় বেকারী ও অন্যান্য সমস্যা" দেখা দিয়েছে। অথচ কথাটা একেবারেই অসত্য।

শিক্ষিতের সংখ্যা ভারতে অতি সামান্য ভারতকে প্রাগ্রসর দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাকে করতে হবে অসম্ভব প্রসারিত এটা বিশেষজ্ঞদেরও বক্তব্য। 'স্বাধীন' সরকার এ দায়িত্ব পালন করেননি, পালন করবার কোন চেষ্টাও সরকারের নেই। এবং সে জন্যেই নানারকম কুযুক্তি আউড়ে নিজেদের অকর্মণ্যতার সাফাই।

৩) শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী ঔদাসীন্যের একটা বড় প্রমাণ হল যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশরক্ষা বাবদ রাজস্বের সিংহভাগ ব্যয় করেছেন, আর শিক্ষাখাতে শতকরা ১ ভাগ। সার্জেন্ট রিপোর্ট অনুযায়ী সুসংহত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে অন্তত ৩১৩ কোটি টাকা খরচ করতে হবে, তার ভিতর প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই ২০০ কোটি টাকা। অথচ "স্বাধীন" সরকার 'জাতীয়' শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বর্তমানে খরচ করছেন বাৎসরিক ৩০ কোটি টাকা। সরকারের 'বিজাতীয়' শিক্ষানীতির এর চাইতে বড় প্রমাণের প্রয়োজন আর আছে কি?

৪) শুধু তাই নয়। "শিক্ষাপ্রসার" শিক্ষানীতির দৌলতে শিক্ষার আপেক্ষিক সংকোচনই ঘটছে। গত দু'তিন বছরে ভারতের প্রায় সব প্রদেশে স্কুল-কলেজের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার ফলে মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীদেরও শিক্ষা দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির প্রস্তাব ছিল যে মাধ্যমিক শিক্ষাও অবৈতনিক হবে, তবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিচার করে প্রথমেই হয়ত এ ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব হবে না। মাধ্যমিক শিক্ষা 'অবৈতনিক' হওয়া ত দূরের কথা, নতুন সরকারদের আমলে সব প্রদেশেই শিক্ষার খরচ অসম্ভব বাড়ান হয়েছে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিবাদ সত্ত্বেও।

এর ফল যে মারাত্মক হয়েছে একথা বলা বাহুল্য। সঠিক সংখ্যা জানা না থাকলেও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলা চলে যে এই বেতনবৃদ্ধির ফলে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তদের প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়তে হয়েছে, অনেককে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হচ্ছে। শিক্ষাব্রতীরা সবাই জানেন, কলকাতার স্কুল-কলেজে ছাত্রবেতন হাজার হাজার টাকা অনাদায়ী থাকছে। অবস্থা এমনই গুরুতর যে রক্ষণশীল সংবাদপত্র "টাইমস অফ ইণ্ডিয়া" ২৮শে জুন, ১৯৪৯-এর সম্পাদকীয়তে বলেছেন, "The middle class, already groaning under heavy burdens, called upon to bear an additional weight.

The sad truth is that higher education has become inaccessible even to those classes who at one time could afford it".

এ ছাড়াও ছাত্র ফেলের হারও ক্রমশ সব প্রদেশে বাড়ছে, অগণিত ছাত্র শিক্ষাজগৎ থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার গত কয়েক বছরে অসম্ভব রকমে কমে গেছে। ১৯৫০ সালে পাশের হার এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী জনসাধারণ ক্রমশই "শিক্ষার সংকট" সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠছেন। ছাত্রদের ফেলের হার বৃদ্ধির কারণ অবশ্য অনেক। ছাত্রদের যোগ্যতা ক্রমশ কমছে গত দশ বছর ধরে, একথা সত্য। কিন্তু তার কারণও আছে। সামাজিক, আর্থনীতিক নানারকম সংকটে আজ ছাত্রেরা সুশিক্ষা পাচ্ছে না, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হওয়ায় শিক্ষার প্রেরণাও তাদের আগের চাইতে কমেছে—শিক্ষার মানের ক্রমশই অবনতি ঘটছে। শিক্ষাসংস্কার সম্পূর্ণ হলে, পরিকল্পিত জাতীয় গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই এ সংকট মোচন সম্ভব। কিন্তু শিক্ষাজগতের কর্তাব্যক্তিরা গভীর সংকটের সহজ দাওয়াই বার করেছেন—সরকারী কর্তাদের যোগসাজসে শিক্ষাজগৎ থেকে "অযোগ্যদের বহিষ্কারের" নীতি গ্রহণ করেছেন তাঁরা, এজন্যে ইংরেজির উপরে এখনও তাঁরা অত্যধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং ইংরেজিতে অপটু বলে বহু ছাত্র অকৃতকার্য হয়ে শিক্ষাজগৎ থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বাঙলা দেশে এই বিয়োগান্ত নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১৯৪৯ থেকে বিশেষভাবে। অমৃতবাজার পত্রিকা (২৮শে মে, ১৯৪৯) বলেন, "Most of the failures this year (1949) and in previous years are in English. In the Inter Science examination it is said that about 60% of those who have passed in Science subjects have failed in English". ১৯৫০-এ এ-কথা আরও সত্য। অথচ বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ত ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বে, ইংরেজিতে বিশেষ পটু না হলেও তার চলবে—কিন্তু শিক্ষা-জগতের এমনই খেলা যে ইংরেজির জন্যই সে ফেল হল, উচ্চতর শিক্ষার বা কারিগরি শিক্ষার দ্বার হয়ত তার সামনে বন্ধ হল। অদ্ভুত নয় কি?

আর প্রশ্নপত্র তৈরি করার বেলায়ও নানারকম ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে, ছাত্রদের ক্ষমতা-বহির্ভূত প্রশ্নপত্র করে ছাত্রদের মান বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে। অবস্থা মাঝে মাঝে এমনই দৃষ্টিকটু হচ্ছে যে প্রবীণ শিক্ষাব্রতীরাও কর্তাদের

এসব খেয়ালখুশির তীব্র প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছেন। যেমন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৯ সালের ইণ্টারমিডিয়েট ইংরেজি থার্ড পেপার এমন শক্ত হয় যে অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী কাগজে বিবৃতি দিয়ে বলেন, "The Third paper in Inter English was stiffer than in the B. A. examination this year".

উপরে যে সব ঘটনা সম্পর্কে উল্লেখ করা হল তাতে দেখা যাবে যে 'স্বাধীন' ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার কিছু না হলেও, ক্রমপ্রসারী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন না হলেও (১) বেতন বৃদ্ধি ও (২) শিক্ষার মান বাড়াবার জন্যে "ফেলের হার বৃদ্ধি" ঘটেছে। বাস্তবে তাই ভারতের একান্ত সংকীর্ণ শিক্ষার ধারা সংকীর্ণতর হয়ে উঠেছে—শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে সংকুচিত। শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ অবশ্য দূর হচ্ছে না, পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থাও গড়ে উঠছে না, জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির রিপোর্ট, সার্জেণ্ট রিপোর্ট কীটদষ্ট-ধূলিমলিন হয়েই থাকছে; শুধু, গভীর সংকটের মনগড়া সহজ সমাধান নতুন শাসকেরা প্রয়োগ করছেন সুশিক্ষার নামে।

আমরা আগেই বলেছি যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির রিপোর্ট, সার্জেণ্ট রিপোর্ট কীটদষ্ট হয়েই পড়ে আছে বর্তমান সরকারের আমলে। কিন্তু ওসব পুরনো কথা। সাম্প্রতিক ঘটনাতেই আসা যাক। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্ট (বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত) বেশ কিছুদিন হল প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের "স্বাধীন" সরকার এই কমিশন গঠন করেন, কাজেই সঙ্গতভাবেই আশা করা চলে যে কমিশনের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সরকার গ্রহণ করবেন। অথচ সরকার দীর্ঘদিন মৌনতা অবলম্বন করে আছেন, মুখ খুলছেন না; "নীতি হিসাবে মানি" বলে কাজের বেলায় উদাসীনই আছেন। কারণ বোধ হয় এই যে কমিশনের সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করতে গেলে "শিক্ষার দায়িত্ব" সরকারের নিতে হয়, সরকার কিন্তু সে ব্যাপারে একান্তভাবেই নারাজ। কমিশন বলেছেন, (১) সাধারণ সাহিত্যিক শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি ও অন্যান্য শিক্ষার সমন্বয়ে নতুন শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার; (২) লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, খেলাধূলা ও অন্যান্য ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি করা প্রয়োজন সুশিক্ষার জন্যে; (৩) শিক্ষকদের ভাল বেতন দেওয়া প্রয়োজন, শিক্ষা-কার্যের এমন আকর্ষণ যাতে থাকে যে প্রতিভাবান ব্যক্তিরা শিক্ষকতা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হন; (৪) কলেজগুলির চলতি খরচের, শিক্ষকদের বেতনাদির

অর্ধেক ও অন্য খরচের এক-তৃতীয়াংশ সরকারকে বহন করতে হবে; (৫) টাকা দেবার ক্ষমতা সরকারী কর্তাদের হাত থেকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস কমিটির হাতে ন্যস্ত করতে হবে।

আমাদের 'স্বাধীন' সরকার যেমন জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির রিপোর্ট ফাইলে রেখে নিশ্চিন্ত, তেমনি রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কেও তাঁরা বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন নন। কারণ সাম্রাজ্যবাদীদের ধারা অনুসরণ করে তাঁরা কমিটি ও কমিশন বসান, কমিটি-কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবে প্রয়োগ করবার দায়িত্ব তাঁদের নয়। কারণ সব সময়েই রয়েছে "এনরমাস ডিফিকালটিস্", "টাকার অভাব", আরও কত কি? সরকার আর কি করেন।

বাঙলাদেশের অবস্থা

সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, উপরে যে সব সংকটের কথা বলা হল বাঙলাদেশ তার থেকে মুক্ত নয়। বরং বাঙলাদেশের শিক্ষাসংস্কৃতি আজ আরও গুরুতরভাবে বিপন্ন। বাঙলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভিৎ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আরও দুর্বল। অন্য প্রদেশে যেখানে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে,—বাঙলাদেশে সেখানে এ নিয়ন্ত্রণভার ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় যে অগণতান্ত্রিক নিয়মতন্ত্র অনুযায়ী সংগঠিত তাতে বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ গোষ্ঠীর দ্বারাই এতদিন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা, শিক্ষকদের দ্বারা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা ১৯২৩ থেকে সব রকমের সংস্কারের বিরোধিতা করে এসেছেন নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থরক্ষা করবার জন্যে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্বার্থে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে শোষণ করে এসেছেন।

স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট অন্যান্য প্রদেশ কর্তৃক গৃহীত হলেও, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ঐ রিপোর্টের প্রস্তাব সম্পূর্ণ বানচাল করেন, প্রস্তাবানুযায়ী কোন ব্যবস্থাই এখানে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান-ব্যবস্থা আজও তাই শিক্ষাব্রতীদের হাতে নয়—উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের হাতে। অধুনাতনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের "শিক্ষার মান" যে ক্রমশই নামছে, ছাত্রছাত্রীরা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ান ও গবেষণার ব্যবস্থায় একেবারেই সন্তুষ্ট নয় এ কথাও সর্বজনবিদিত। বিশেষ গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষমতা যে ক্রমশই হ্রাস পাবে, নানারকম

স্বজনপোষণ ও অন্যান্য দোষ যে এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংক্রমিত হতে বাধ্য, গত বছরের বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটির রিপোর্টই তার সাক্ষ্য। এর উপর আছে বাঙলা সরকারের শিক্ষানীতির বিজাতীয় চেহারা : (১) বাঙলা সরকার আজ পর্যন্ত সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। বাঙলা সরকারের কৃপায় আজও প্রাথমিক শিক্ষকেরা সর্বোচ্চ ৩৬ টাকা ৮ আনা বেতন পান, আর কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসের পিওনেরা বেতন হিসাবে পান সর্বনিম্ন ১০০ টাকা ; (২) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির জন্যে সরকার ১৯৪৮-৪৯ সালে ১৩ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করেন। পশ্চিম বাঙলার ১২০০ বিদ্যালয়ের ২০ হাজার শিক্ষক এই সরকারী বদান্যনীতির দৌলতে কেমন উপকৃত হচ্ছেন সহজেই অনুমেয় (ব্যবস্থা-পরিষদের আলোচনা দ্রষ্টব্য) ; (৩) বাঙলাদেশের "জাতীয়" সরকার বিষ্ণুপুর ও বর্ধমানে কারিগরি বিদ্যালয়ের পুনঃসংস্কারের জন্যে এ পর্যন্ত সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য করেছেন। বালিগঞ্জ শিল্পবিদ্যালয়, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজও সরকারী সাহায্য কিছু পেয়েছে—শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা থেকে জানা গেছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যার দাবি মেটাতে গেলে যে ক্রমপ্রসারী শিল্পবিদ্যার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন আজ পর্যন্ত তা হয়নি। কারিগরি শিল্প-বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা যৎসামান্যই বেড়েছে 'স্বাধীন' পশ্চিমবঙ্গে—যে বেগ বজায় থাকলে কারিগরি বিদ্যাবিস্তার সম্পূর্ণ হতে অন্তত কয়েক শ' বছর লাগবে। শুধু তাই নয়। ইঞ্জিনিয়ারীং প্রভৃতি শিক্ষা যাঁরা পাচ্ছেন তাঁদেরও প্র্যাক্‌টিকাল শিক্ষার বন্দোবস্ত বিশেষ কিছু নেই, যেমন যাদবপুর কলেজের ছাত্রদের ; আর ক্রমপ্রসারী অর্থনীতি দেশে গড়ে না উঠায় এ সব ছাত্ররাও সৃজনশীল কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে পারছেন না, বেকার থাকতে বা সামান্য চাকুরী নিয়ে শক্তি ও প্রতিভার অপচয় করতে বাধ্য হচ্ছেন।

(৪) বাঙলাদেশে বর্তমানে ৭০টি বেসরকারী কলেজে ১২০০ অধ্যাপক নিযুক্ত। অধ্যাপকেরা যে বেতনে কাজ করেন তা সত্যিই হাস্যকর এবং বাঙলার অধ্যাপক-সমাজ বহুদিন থেকেই "শিক্ষার জাতীয়করণ চাই" বলে আন্দোলন করছেন। অবশ্য তাঁদের আন্দোলন আজও সফল হয়নি। বাঙলা সরকারও বেসরকারী শিক্ষার দায়িত্ব তাঁদের নয় বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

(৫) শুধু তাই নয়। বাঙলা সরকারও "শিক্ষাসংকোচন নীতি" চালু করে বাস্তবে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকেও বিপর্যস্ত করছেন।

এর একটা আধুনিক রূপ হল "ডিস্‌পারস্যাল স্কীম"। কলকাতার অধ্যাপক সমাজ সরকারকে এ স্কীম পুনর্বিবেচনার জন্যে অনুরোধ করেছেন। অথচ সরকার 'ডিস্‌পারস্যাল' পরিকল্পনার পিছনে ৫০০ জন ছাত্রের জন্যে জনসাধারণের ৭০ লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন।

(৬) ক্রমপ্রসারী গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা না হয় বাদই গেল, শিক্ষার প্রতি বাঙলা সরকারের "চরম উদাসীনতা"র কথা পশ্চিমবঙ্গ অধ্যাপক সমিতির গত অধিবেশনে অধ্যক্ষ অমিয়কুমার সেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। অধ্যক্ষ সেন বলেন যে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় কলেজগুলি প্রচুর সরকারী সাহায্য পায়, ছাত্র-বেতনের উপর নির্ভর করে তাদের অনিশ্চিত জীবনযাপন করতে হয় না। অধ্যক্ষ সেন এ সম্পর্কে যে হিসাব দেন তা এইরকম :

		শিক্ষাখাতে ব্যয়
ইংলণ্ড—	পার্লামেন্টের দেয় —	শতকরা ৫২.৭ ভাগ
(১৯৪৬-৪৭)	স্থানীয় শাসনব্যবস্থার দেয়	শতকরা ৫.৬ ভাগ
	ছাত্র বেতন	" ২৩.২ "
	অন্যান্য দান	" ১৮.৩ "
আমেরিকা—	সরকারী সাহায্য	" ৫৯.১ "
(১৯৪৩-৪৪)	পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়	" ৮.৫ "
	ছাত্র বেতন	" ১৭.৯ "
	অন্যান্য উৎস	" ১৪.৫ "

অধ্যক্ষ সেন বলেন যে, বাঙলা সরকার যে শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন, তার প্রমাণ এই যে, বাঙলা সরকার ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়ও শিক্ষা খাতে কম ব্যয় করেন—ইংলণ্ড, আমেরিকার সঙ্গে তুলনা ত একেবারেই হাস্যকর। অধ্যক্ষ সেন শিক্ষাখাতে কোন্ প্রদেশ কত ব্যয় করে তার এই হিসাব দেন :

প্রদেশ	শিক্ষাখাতে ব্যয়—রাজস্বের অংশ
বোম্বাই	শতকরা ২০ ভাগ
মাদ্রাজ	" ১৮ "
মধ্যপ্রদেশ	" ১৬.৬ "
আসাম	" ১৪.১ "
উড়িষ্যা	" ১৩.৪ "

বিহার	শতকরা ১২·১ ভাগ
পাঞ্জাব	" ১১·১ "
পশ্চিম বাঙলা	" ৮·৭ "

এ হিসাব থেকে পরিষ্কার যে বাঙলায় জনসাধারণের শিক্ষা-সংস্কৃতির জন্ত সরকার রাজস্বের সামান্যতম অংশ ব্যয় করেন এবং এর তুলনা সারা দুনিয়ায় আর নেই। 'ল এ্যাণ্ড অর্ডার' বহাল রাখবার জন্যে সরকার চেষ্টার ত্রুটি করছেন না, "রাষ্ট্রের স্বার্থে" বিনা বিচারে লোককে জেলে পুরছেন; অথচ শিক্ষার মত এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ "জাতীয়" ব্যবস্থার প্রতি সরকার উদাসীন, "বে-সরকারী স্কুল কলেজের দায়িত্ব আমাদের নয়" বলেই নিশ্চিন্ত। এই বিজাতীয়, জনস্বার্থ-বিরোধী নীতির সমালোচনা করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ অধ্যাপক সমিতির গত সম্মেলনে ডাঃ রাধাবিনোদ পাল শ্লেষ করে বলেন যে, সরকার যদি 'জাতীয়' হয় তবে জনসাধারণের শিক্ষাব্যবস্থা করা এর অবশ্য কর্তব্য। ডাঃ পাল বলেছেন, বাঙলা সরকার কি কেবল বিনা বিচারে আটক রাখবার বেলায়, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হাতে নেবার বেলায় "জাতীয়"? শিক্ষার বেলায় এই "জাতীয়" চরিত্রের কোন প্রমাণ ত মিলছে না?

শিক্ষারাজ্যের আরও নানা সমস্যা রয়েছে যে সমস্যার সত্বর সমাধান না হলে শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। কিন্তু কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকার যে ফরমুলায় সব সমালোচনা স্তব্ধ করে দেন, সেটা হল "টাকা নেই"-এর ফরমুলা। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতে "টাকা আসবে কোথা থেকে?" এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। সার্জেন্ট রিপোর্টেও এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, টাকার প্রশ্ন জটিল প্রশ্ন সন্দেহ নেই, কিন্তু ইচ্ছে থাকলে এ প্রশ্নের সমাধান হবেই। যুদ্ধের সময় প্রত্যেক দেশই টাকার ব্যবস্থা করে, কারণ যুদ্ধ অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। শিক্ষার ব্যাপারও যদি অতি জরুরী হয়, তাহলে শিক্ষার জন্যেও টাকার ব্যবস্থা যেখান থেকে হোক করতে হবে।

এ হল ১৯৪৪ সালের মন্তব্য। অথচ আজ ১৯৫০ সালেও 'টাকা নেই' —এই অজুহাত সরকারী কর্তাদের মুখ থেকে প্রায়ই উচ্চারিত হচ্ছে, যদিও ভারতবর্ষ "স্বাধীনতা"র স্বর্ণযুগে প্রবেশ করেছে তিন বছর।

এটা খুবই সত্যি যে শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে হলে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। সার্জেন্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী খুব কম করেও এ টাকার পরিমাণ

হবে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের হিসাব অনুযায়ী সব স্তরের শিক্ষার জন্যে দশ বছরে খরচ পড়বে ১৫০০ কোটি টাকা, আর প্রতিবার খরচ করতে হবে আরও ১৮০ কোটি টাকা। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ অনুসরণ করে এবং ডা: করুণাময় মুখার্জির হিসাব অনুযায়ী "টাকা আসবে কোথা থেকে"—এ প্রশ্নের আলোচনা নিচে করা হল :

১) ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্বের শতকরা ৫২ ভাগ সামরিক খাতে ব্যয় করেন, শিক্ষাখাতে ব্যয় করেন শতকরা ১ ভাগ। প্রাদেশিক সরকারদের শিক্ষাখাতে ব্যয় হল অতি সামান্য—গড়ে শতকরা ৫ ভাগ। জাতিকে যদি শিক্ষিত করে তুলতে হয় তবে জাতি গঠনের জন্যে ব্যয় বাড়াতে হবে, সামরিক খাতে, পুলিশখাতে ব্যয় কমাতে হবে। কারণ ভারত ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের চাইতে সামরিক খাতে শতকরা বেশি টাকা ব্যয় করবে এর কোন সঙ্গত কারণ নেই। এ ভাবে ব্যয় সংকোচের পথ নিলে কয়েক কোটি টাকা উদ্‌বৃত্ত হওয়া সম্ভব এবং তা দিয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার করা চলে।

২) অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় হিসেব করে দেখিয়েছেন যে বাঙলাদেশের জোতদারেরা ২৯ কোটি টাকা নীট মুনাফা করে, আর জমিদারেরা আয় করে বছরে প্রায় ৯ কোটি টাকা। জোতদার ও জমিদারদের অনর্জিত টাকা যদি রাষ্ট্র আদায় করে, তাহলে বছরে প্রায় ২০ কোটি টাকা সরকারের উদ্‌বৃত্ত আয় হতে পারে।

৩) দেশের বর্তমান অবস্থায় রাজস্বের পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পাবে এমন আশা অবশ্য কম। তবুও ভারতে বিত্তবান, মূলধনী, মহারাজ, বড় সামন্ত প্রভুদের সংখ্যা কম নয়। কাজেই আজ নানাভাবে রাজস্ব কিছুটা বাড়ান সম্ভব। যেমন মৃত্যুশুল্ক বার্ধ করা। কোন প্রাদেশিক সরকার এখনও এ বিষয়ে কিছু করেননি। তাছাড়া, জমিদারী প্রথা যতদিন বিলুপ্ত না হচ্ছে, ততদিন পরগাছা-শ্রেণী জমিদার-জোতদারদের কাছ থেকে কৃষি-আয়কর আদায় করা সম্ভব এবং বাঙলাদেশের মত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-অঞ্চলকল জায়গায় এ আয় বেশ ভালই হবে

৪) ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাঙলাদেশে, এখনও বিদেশী পুঁজি প্রচুর খাটছে—প্রভূত পরিমাণ টাকা ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে বেরিয়ে যাচ্ছে। অথচ 'স্বাধীন' সরকার বিদেশী মহাজনদের থলি থেকে একটি পয়সা আদায় করেননি। রবীন্দ্রনাথ "রাশিয়ার চিঠি"তে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন বহুদিন আগে,

সে প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করে আমরাও প্রশ্ন করব: "শিক্ষা দেবার জন্তে রাজকোষে টাকা নেই কেন?" তার প্রধান কারণ, বিদেশী মহাজনেরা, দেশী মূলধনীরা, দেশের টাকার সিংহভাগ গ্রাস করে বসে আছে। পাট-ব্যবসায়ীরা, বৃটিশ ও অবাঙালী ব্যবসায়ীরা যে বাঙলার ধনে ধনী, তার ন্যূনতম উচ্ছিষ্ট মাত্রই কি বাঙলার জনসাধারণের ভাগে পড়েছে? সরকার ব্যক্তিগত সম্পদশালীদের যে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ব্যয়ভার নিতে বাধ্য করবেন না, সে দোষ জনসাধারণের নয়। অথচ এই অতিমুনাফার (Superprofits) সামান্যতম অংশ যদি আদায় করা হয় লোকশিক্ষার খাতে, তাহলে টাকার অভাব অনেকখানি মেটে।

৫) 'স্বাধীন' ভারতের স্টার্লিং উদ্বৃত্ত জমা রয়েছে ইংলণ্ডের কাছে—সে টাকার পরিমাণ এখনও প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। বাঙলার ভাগে ১৬০ কোটি আদায়ী টাকা বাকি। এই কোটি কোটি টাকা অনাদায়ী থাকবার কোন হেতু নেই। ভারতীয় জনতার অশ্রুজলে সে টাকার পাহাড় গড়ে উঠেছে—ভারতীয় জনতার স্বার্থে 'স্বাধীন' সরকার এখনই সে টাকা উদ্ধার করুন। নয়ত যে ১২০০ কোটি টাকা বৃটিশ মূলধন ভারতে খাটছে তার সঙ্গে এ টাকার কাটাকাটি করা হোক; ওসব শিল্পের উপর ভারতীয় জনসাধারণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক। তাহলে, বৃটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশের স্বার্থে পরিচালিত করেও যথেষ্ট টাকার জোগাড় করা যাবে।

৬) বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডাঃ যোগীশচন্দ্র সিংহ গত দু'বছর আগে হায়দরাবাদ অর্থনৈতিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গেই হিসাব দিয়াছিলেন যে, ভারতীয় মূলধনীদের হাতে আয়কর ফাঁকি দেওয়া ৩০০ কোটি টাকা জমা আছে—মুদ্রাস্ফীতির এটাও অন্যতম কারণ। ভারত গভর্নমেন্ট আজও সে টাকা আদায় করেননি। অথচ সে টাকা রাজকোষে থাকবার কথা এবং সে টাকা আদায় হলে টাকার সমস্যা অনেকখানি মিটত।

গত বছর বস্ত্র-সংকটের আলোচনা-প্রসঙ্গে ভারতের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে বড় বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা তিন মাসে কৃত্রিমভাবে ১০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করেছে, জনসাধারণের নগ্নতার বিনিময়ে। এই চুরির টাকা আসলে জনসাধারণের। এ টাকাও আজ পর্যন্ত বস্ত্র-কালোবাজারী-দের কাছ থেকে আদায় করা হয়নি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে জনসাধারণের প্রাপ্য কয়েক শ' কোটি টাকা বিভিন্ন জায়গায় আটকে রয়েছে, যার পরিমাণ কম নয়। উপরের হিসাব থেকে টাকার অঙ্ক আমরা যা পেলাম তা হচ্ছে এই :

		আয় :
(১)	সামরিক ব্যয়হ্রাস বাবদ শতকরা ৫২ থেকে ২৫ ভাগ	প্রায় ১০০ কোটি টাকা
(২)	জমিদার জোতদারদের অনর্জিত টাকা	" ১০০ " "
(৩)	উদ্বৃত্ত স্টার্লিং পাওনা	" ৮০০ " "
(৪)	আয়কর ফাঁকি দেওয়া	" ৩০০ " "
(৫)	বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা	" ১০০ " "
(৬)	মৃত্যু শুল্ক ও বিদেশী মূলধনীদের উপর কর	কয়েক শ' কোটি
		মোট ১৪০০ কোটি টাকার উপর

কাজেই সরকার ১৪০০ কোটি টাকা অনাদায়ী ফেলে রাখছেন আর লোককে বিভ্রান্ত করবার জন্য, সাম্রাজ্যবাদীদের ধারায় "টাকা নেই" এই চিরন্তন অজুহাত দেখাচ্ছেন। এটা অবশ্য সুস্পষ্ট যে গণ-সরকারের দায়িত্ব সরকার পালন করছেন না কারণ, আসলে এ সরকার গণ-সরকারই নয়। কিন্তু শিক্ষানুরাগীদের বুঝতে হবে যে টাকা প্রচুর আছে, অবশ্য সে টাকা সরকার আদায় করছেন না লোক-শিক্ষার জন্যে, সে স্বতন্ত্র কথা।

আধা-ঔপনিবেশিক পরাশ্রিত সমাজের অর্থনীতি

প্রশ্ন হবে কেন এমন হল? এটাই অবশ্য আসল প্রশ্ন। যতদিন আমরা ভারতীয় পরিস্থিতির চেহারা তলিয়ে না বুঝছি ততদিন শিক্ষা-সংকট কেন, কোন সংকটেরই সত্যিকার পরিচয় মিলবে না। আজকের ভারতীয় পরিস্থিতিটা কি? অনেকে সত্যি মনে করেন ভারত আজ 'স্বাধীন'। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় 'স্বাধীন ভারতের' কাছে "ক্ষমতা হস্তান্তরিত" হয় ১৯৪৭ সালে। এ ভুল যতদিন আমাদের না ভাঙছে, সাম্রাজ্যবাদীদের নতুন কায়দা যতদিন আমরা ধরতে না পারছি, ভারতের আধা-ঔপনিবেশিক পরাশ্রিত সত্তা যতদিন আমাদের উপলব্ধিতে ধরা না পড়ছে ততদিন সমস্যার গোড়ার কথা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়েই যাবে। আজ অবশ্য তিন বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় বোঝা যাচ্ছে যে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ছিল

বৃটিশ বিভেদনীতির নতুন পালা এবং এর দৌলতে ভারত মোটেই মুক্তি অর্জন করেনি। সাম্রাজ্যবাদ যে কৌশল অবলম্বন করেছে ইজিপ্টে ১৯২২ সালে, বা ইরাকে ১৯২৮ সালে সাম্রাজ্যবাদ যে খেলা খেলেছে, সেই কৌশলেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ভারতে। অর্থাৎ 'স্বাধীন' এই লেবেল পরলেও, আসলে ভারত রয়ে গেছে অর্থনীতি ও সামরিক দিক থেকে কমনওয়েল্‌থ-আশ্রিত পরাধীন, আধা-ঔপনিবেশিক দেশ। যাঁরা প্রথম দিকে ভারতের স্বাধীনতাকে প্রকৃত ও বাস্তব বলে মনে করেছিলেন, আজ তাঁরাও অবশ্য বুঝতে পারছেন ভারতের স্বাধীনতা কত অলীক ও অবাস্তব। আসলে ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লব, ভারতীয় মূলধনী বিত্তবানদের চক্রান্তে অসমাপ্তই রয়ে গেছে, নতুন সরকারী ছত্রছায়ায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অক্ষয় হয়েই রয়েছে।

কাজেই নতুন সরকারগুলি পুরনোর জের টেনেই চলেছে—সাম্রাজ্যবাদী ধারা বজায় রেখেই এদের সার্থকতা। নতুন সরকারগুলি কোন পরিবর্তন না করে পুরনো সাম্রাজ্যবাদী শাসনযন্ত্রই হাতে তুলে নেয়। সেই আগেকার আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগ, পুলিশ বর্তমান সরকারের প্রধান আশ্রয়। কাজেই সেই আগেকার আমলের নির্যাতন-পদ্ধতি, নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ, লাঠিবাজি প্রভৃতি এবং ঠিক আগেকার মতই সভা-সমিতি বন্ধ করা, খবরের কাগজের স্বাধীনতা হরণ, বিনা বিচারে আটক ব্যবস্থা চালু আছে, এবং শ্রমিক-কৃষক, ট্রেড ইউনিয়ন, বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের হাজারে হাজারে হাজতে প্রেরণ করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরাট সম্পত্তি তাই বর্তমান সরকার অসীম আগ্রহের সঙ্গে রক্ষা করছেন; বাস্তবে নৌবাহিনী ও দেশরক্ষা ব্যবস্থার চাবিকাঠি সাম্রাজ্যবাদী হাইকমাণ্ডের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। শেষে চক্ষুলজ্জার বালাই ছেড়ে কমনওয়েল্‌থে গিয়ে "স্বাধীন" সরকার আশ্রয় নিয়েছেন।

এই হল বর্তমান 'স্বাধীন' সরকারের স্বরূপ। কাজেই এই পরাশ্রিত, আধা-ঔপনিবেশিক সরকারের শিক্ষানীতি সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষানীতির ধারাকেই জিইয়ে রেখে চলছে—গণতন্ত্রবিরোধী, বিজাতীয় শিক্ষানীতির জায়গায় ক্রমপ্রসারী, গণতান্ত্রিক, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তনের পথে পা দেয়নি। আমাদের শিক্ষাসংকট তাই আধা-ঔপনিবেশিক ভারতের সর্বাঙ্গীন সংকটেরই প্রতিফলন মাত্র।

শান্তির স্বপক্ষে

কেম স্বাক্ষর

বোবা কণ্ঠের গোঙানিতে শোনো বিদীর্ণ হৃদয়ের
অতলান্তিক তবলরোলে ইতিহাস মানবের
মূক আদিমের অন্ধ আকুতি উপনিষদের ওম্
রাগে ফেটেপড়া ধূমোদ্গারিত যন্ত্রশালার চোঙ
ক্ষুধিত ধূমল তপ্ত রসনা আকাশের তারা চাটে—
গুরুভারে মেরুদণ্ডী জীবন বেদনায় বুকে হাঁটে
প্রলয়ঙ্কর বিশ্বাসে তবু বেঁচে আছে ধুঁকে ধুঁকে
অবুত আঁখির নোনাজলে ভেজা মরুহাড় শুঁকে শুঁকে
জীবনের পথে পায়নিক যারা শান্তির অণুকণা
অনাগত মহাস্বপ্নে যাদের অনলস দিনগোনা
উদাস করুণ ফ্যালফ্যালে চোখে বিশ্বব্যথার শান্তি চায়
বঞ্চিত কোটি মানবাত্মারা বন্ধনহারা শান্তি চায়
ক্ষুধিত প্রাণের অগীত গানের সুরে সুরে ওরা শান্তি চায়।

ওদের শান্তি গগ-মিনারের আজানের আহ্বান
ওদের শান্তি-হুঙ্কার শুনে স্তব্ধ মেসিনগান
স্বর্গের বুকে লাথি মেরে ওরা ইন্দ্রের টুঁটি টিপে
বাজ কেড়ে নিয়ে রক্তপতাকা ওড়ায় সপ্তদ্বীপে
ওরা পৃথিবীতে রণোন্মাদের অজেয় শান্তিদাতা
নখে ছিঁড়ে ফেলে শোষকের বিধি ব্রহ্মার কাঁচা মাথা
ওদের ঘরের মায়েরা বধূরা ভীমা ভৈরবী বেশে
শান্তি স্বপ্নে বাঁধেনি গ্রন্থী রুক্ষ ভ্রমর কেশে

থমকে দাঁড়ায় গোটা ইতিহাস স্তম্ভিত ভ্রূকুটিতে
ঝনঝন করে তাম্রশাসন প্রলয় শর্বরীতে
নয়নে অগ্নি জননী ভগ্নি কন্যা বধূরা শান্তি চায়
পালক জনক সন্তান স্বামী ভাই বন্ধুরা শান্তি চায়
গোটা পৃথিবীর ব্যথিত অধীর মুক্তিকামীরা শান্তি চায়।

থামাও তর্ক সূক্ষ্ম কথার বিমূঢ় বুদ্ধিজীবী
ছুঁড়ে ফেলে দাও কুলটা ভাষার কটিতে নির্লাজ নীবি
জনসভাতলে বেইমানী আর সহে না ওড়নাঢাকা
সুরুচির শুচিগ্রস্ত মনের বাক্য-বিলাস ফাঁকা;
আজো কি বোঝ না কী বিপুল দেনা জমেছে মাটির বুকে
মারমুখো হয়ে উঠেছে মানুষ সূক্ষ্মকথায় রুখে
কাস্তের ধারে রৌদ্র ঠিকরে ঘামঝরা পৃথিবীতে
কিষাণের ব্যথা মূর্চ্ছিত মৃত ধানের মঞ্জরীতে
শোষণের ঝড়ে শস্যের চিতা ধু ধু জ্বলে ফাঁকা মাঠ
অট্টহাসিতে হু হু করে ওঠে বোঝে না শান্তিপাঠ
বিদ্রোহী মন অমিয়-বচন বিনয়ী-ভাষণ বোঝে না হায়
কাস্তের ধার অসীম অপার মহাজাগতিক শান্তি চায়
ভূমিলক্ষ্মীর কোটি সন্তান কিষাণী কিষাণ শান্তি চায়।

যাদের কঠিন হ্যামারের ঘায়ে ইস্পাত হয় সিধে
রিপিটে লৌহ জাহাজ বানায় ফুরপুন বিঁধে বিঁধে
খাঁটাপড়া কড়া ক্ষত-বিক্ষত ক্ষুধিত অঙ্গ যুড়ে
রোমে রোমে জ্বলে কলিজার জ্বালা গুমে গুমে পুড়ে পুড়ে
বোঝে নাক' তারা মদিরাক্ষরা মাধুরীর মায়ারসে
ভিজে ভিজে তারা আছুয়ে কেদারা কৌচেতে বসে বসে
কি যে লেখ আর কি যে কও তুমি বোঝে না সর্বহারা
খিহি খিহি হাড়-জ্বালান হাসিতে প্রজ্ঞার পাঁয়তারা
শীৎকার মধুমাখান ব্যথার ঠোঁটফোলা অভিমান
বোঝে না মজুর কুলিকামারের দুর্জয় বলবান

অমির সাহসে কৌপীন কষে ধজু মাথা তুলে শান্তি চায়
দুর্গপ্রাসাদ ঝনঝন করে হাতকড়া বেড়ি শান্তি চায়
মহাভুবনের গণজীবনের শৃঙ্খলছেঁড়া শান্তি চায়।

বোঝে না বিপুল মানব-সাহারা বর্ণার এপ্রান্তে
শৈল-সানুর প্রান্তশায়িনী কি সুর নিভৃতে বাজে
দাবানলে জলা মানবারণ্য অযুত চক্ষে জ্বালা
কখন গাঁথবে গ্রাম্যপথের ঝরা বকুলের মালা ?
তোমরাও হায় বোঝ না মূর্খ প্রজ্ঞার পিরামিড,
বিলাসের তাপে শিল্প তোমার পুড়ে পুড়ে ঝামা ইট ;
সব তত্ত্বের গোড়ায় তত্ত্ব ভুলেছ ভ্রান্তিবশে
জীবন-যুদ্ধে লম্ফের বেগে ব্যাঙাচির ল্যাজ খসে.
উন্নাসিকের কেতাবী খেতাব বুর্জোয়া ছলাকলা
শান্তির পথ কুয়াসায় ঢাকে পিশাচী অমঙ্গলা।
তিমির ভেদিয়া কুয়াসা-বিজয়ী সুস্থ মানুষ শান্তি চায়
জলে পুড়ে মরা মানব-সাহারা স্নিগ্ধ শীতল শান্তি চায়
রজতশুভ্র সৌর-কপোত রৌদ্রোজ্জ্বল শান্তি চায়।

কে দেবে তোমার বুদ্ধির দাম ? যে বুদ্ধি নরঘাতী
মননশিল্পে দাসখত লেখা সাধনার বজ্জাতি
সোজা কথা যদি সোজা করে লেখ সে লেখার কোন দাম
দেবে না রক্তপিপাসুর দল, পশুর মনস্কাম
না যদি মেটাও ক্রূর হেঁয়ালিতে রচিয়া কুজ্ঝটিকা
ভুখা গণমনে না যদি জ্বালাও বিকৃত যৌনশিখা
স্থির জেন তবে রাসেলের মত পাবে না পুরস্কার
এলিয়ট-সম-হাক্সলী-ক্রয়েড শান দেয় তলোয়ার
ইতিহাস-জোড়া প্রাণান্তকর সামন্ত রণনীতি
অযুত বুকের শান্তি সুখের মর্মে জাগায় ভীতি
তাইত অযুত মানবাত্মারা চির জীবনের শান্তি চায়
মারণাস্ত্রেব চির নিষেধের বিপুল দাবিতে শান্তি চায়
সমসুখভোগী ক্ত মানব-সমাজের চির শান্তি চায়।

শান্তি-কপোত হীরকদীপ্র কাঁপায় শুভ্র ডানা
পালকে দীপ্ত উদয়াচলের প্রভাতী ললাট রাঙা
শিশিরে শিশিরে রক্তোৎপল মণি-মাণিক্য জলে
দানব দর্পদলনে অযুত শান্তি-সেনারা চলে
পক্ষ-পতাকা বিস্তারি নভে কপোতেরা সারি সারি
মহাকাশ জুড়ে চলে উড়ে উড়ে। ভূতলে অস্ত্রধারী
যুদ্ধবাদীর রণ-হুঙ্কার নির্জীব ভয়ে ভয়ে
জেগেছে বিশ্বমানব-গোষ্ঠী মাথা তুলে নির্ভয়ে
এটম বমের চেয়ে বলীয়ান একটি শিশুর লেখা
আঁকাবাঁকা নাম শান্তিপত্রে বিপ্লবী রাগ রেখা
একটি মায়ের অশ্রু আখর অযুত শিশুর শান্তি চায়
একটি বাপের ঘাম ঝরা হাতে বাঁকা স্বাক্ষর শান্তি চায়
একটি প্রাণের রাঙা স্বাক্ষর বিশ্বপ্রাণের শান্তি চায়।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

পশ্চিমী লেখকদের প্রত্যুত্তরে

এই বসন্তে পশ্চিমের লেখকদের উদ্দেশে একটা খোলা চিঠি আমি লিখেছিলাম। নতুন আর একটি যুদ্ধের যে বিপর্যয় সমগ্র মানবজাতির সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য তাঁদের আমি আহ্বান করেছিলাম। শান্তির সমর্থকেরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন এমন একটি দাবি নিয়ে যা সব চেয়ে সরল, সব চেয়ে মানবিক ও সব চেয়ে অবিসংবাদী এবং যা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী নরনারীকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। এই দাবি আণবিক বোমা নিষিদ্ধ করার দাবি। পশ্চিমী লেখকদের আমি ডাক দিয়েছিলাম স্টকহোম আবেদনে সই দিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করতে।

পশ্চিমী লেখকদের মধ্যে অনেকে আমার সঙ্গে একমত হয়ে স্টকহোম আবেদনে সই দিয়েছেন। কেউ বা মনে করেছেন জবাব না দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয়—তাঁরা একমতও হননি, বা বাতিল করেও দেননি। কিন্তু লেখক ত আর কূটনীতিক নন: তিনি 'হ্যাঁ' বা 'না' বলতে নিশ্চয়ই সক্ষম। পশ্চিমী

লেখকদের মধ্যে যাঁরা এখনও নীরব, আমি বিশ্বাস করি যে তাঁরা প্রশ্নটা বিবেচনা করছেন। তাঁদের উত্তরের প্রতীক্ষায় আমি থাকব।

কোন কোন লেখক ও অন্যান্য সংস্কৃতি-কর্মীরা জবাব দিয়েছেন প্রত্যাখ্যান করে। স্টকহোম আবেদনে সই দিতে যাঁরা অস্বীকার করেছেন তাঁদের মানসিক প্রকর্ষ বিভিন্ন স্তরের এবং যে সব কারণ তাঁরা দেখিয়েছেন তা বহু বিচিত্র। নরওয়েদেশীয় একশ ন'জন আমাকে যে খোলা চিঠি দিয়েছেন তা দিয়েই আমি শুরু করব। চিঠিতে যাঁরা সই করেছেন তাঁরা আত্মপরিচয় দিয়েছেন লেখক ও সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে। এমনও মনে হতে পারে যে ব্যক্তিগত নামের জোরের উপর তেমন আস্থা না থাকায় এঁরা সংখ্যার জোরে ভালো একটা ধারণা সৃষ্টি করতে চান। অবশ্য একশ ন'জন লেখক যে সব সময়েই একজন লেখকের চেয়ে ওজনে ভারি হবেন তা নয়। আসল কথাটা হচ্ছে প্রতিভা ও ধীশক্তির নীতিগত মূল্যবিচার। অল্পবিস্তর পরিচিত এমন লেখক এই একশ ন'জনে মধ্যে দু-তিনজন ছাড়া কেউ নেই। এই সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে কয়েকজন নরওয়েদেশীয় সাহিত্যিক, যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে হামস্ হেইবার্গের নাম করা চলে—এই একশ ন'জন লেখকের চিঠিতে সই দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেননি, সই দিয়েছেন স্টকহোম আবেদনে।

এই একশ ন'জন লেখক বলেছেন যে এঁরা স্টকহোম আবেদনে সই করেননি এবং করবেনও না, কারণ এটা শুধু মাত্র আণবিক বোমারই বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে নয়। নরওয়েদেশীয় লেখকেরা বলেন: "তাঁর চিঠির পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে এরেনবুর্গ শান্তি সম্পর্কে একটিও খাঁটি কথার স্থান খুঁজে পাননি।" একথা সত্যি নয় এবং একশ ন'জন লেখক মিলে যখন একজন লেখকের লেখার অর্থ বিকৃত করেন তখন তা আমি পছন্দ করি না। চিঠিতে আমি বলেছিলাম যে, সকল দেশ ও সকল জাতির পক্ষে শান্তি প্রয়োজন। আমার পত্রে আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে, সবচেয়ে বীভৎস ও সবচেয়ে অমানুষিক অস্ত্র হিসাবে আণবিক বোমাকে নিন্দা করা হোক। আণবিক বোমা নিষিদ্ধ করতে বলার ফলেই আমি নিশ্চয়ই সাধারণ ধরনের বিধ্বংসী বোমার সমর্থক হই না। ট্রেঞ্চ মর্টার বা সাধারণ বুলেটের সমর্থকও হই না। আমি আগেও বলেছিলাম এবং আবার বলছি, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ রোধ করা সম্ভব। শান্তির সমর্থকেরা কাজ শুরু করেছিলেন আণবিক বোমা নিষিদ্ধ করার দাবি নিয়ে। স্বভাবত এইটেই

প্রথম পদক্ষেপ। আর প্রথম পদক্ষেপ ছাড়া কি করে যে অগ্রগমন সম্ভব তা এই নরওয়েদেশীয় একশ ন'জন লেখক মিলেও আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবেন কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। নরওয়েদেশীয় লেখকেরা প্রশ্ন করেছেন, কেন আমি আরও অনেক জিনিসকে নিন্দা করি না—যেমন, উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, অস্ত্র-নির্মাণোদ্যোগ এবং এক জাতির উপর অপর জাতির নির্যাতন। এই একশ ন'জনের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন যাঁদের বিবৃতি থেকে আমি জানি যে তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির পক্ষপাতী এবং আমেরিকার সঙ্গে নরওয়ে সরকারের সামরিক চুক্তির তাঁরা সমর্থক। "মার্কিনী জীবনযাত্রা পদ্ধতি"র সমর্থকদের উগ্র জাতীয়তাবাদী বলে শ্রেণীভুক্ত করা আমাদের অন্যায় এবং গ্রীণল্যাণ্ড থেকে তাইওয়ান পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ যারা দখল করেছে তাদের সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে অভিযুক্ত আমরা যেন না করি, এ কথা যে-সব লেখক মনে করেন তাঁরা যেন আমাদের থেকে দূরে সরে না যান সেজন্যেই সাম্রাজ্যবাদ বা উগ্র জাতীয়তা-বাদ সম্বন্ধে আমি কিছু লিখিনি। যে সব সাহিত্যিক বিশ্ব-রাজনীতি ও দর্শন নিয়ে একেবারেই চিন্তা করেন না অথবা সাম্রাজ্যবাদী ও উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচারে কিছু পরিমাণে মোহগ্রস্ত অথচ মনে করেন যে যুদ্ধের দ্বারা বিভিন্ন বিশ্ব-দর্শনের দ্বন্দ্ব সমাধান করা যায় না—আমি চাইনি আমার চিঠি তাঁদের শান্তি-শিবিরের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন করে তুলুক। এই একশ ন'জন লেখক আমার সহিষ্ণুতাকে অপমান বলে ধরে নিয়েছেন। তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে একজাতির উপর অপর জাতির নির্যাতনকে আমি নিন্দা করিনি। এই পত্র-লেখকদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা আধুনিক আমেরিকার উপাসক। এঁদের এই বলে জবাব দিতে পারি যে পল রোবসনের পক্ষে স্টকহোম আবেদনে সই দেওয়া আকস্মিক কিছু নয় এবং পল রোবসন বা কোন নির্যাতিত জাতির কোন প্রতিনিধির পক্ষে আটলান্টিক চুক্তির স্বপক্ষে সই করতে না পারাটাও আকস্মিক নয় এই একশ ন'জন লেখক বলেছেন যে আমার পত্রে সামরিক অস্ত্র নির্মাণোদ্যোগকে নিন্দা করা উচিত ছিল ঠিক যে-সময়ে বৃহৎ আমেরিকার নির্দেশে ক্ষুদ্র নরওয়ে ঘোষণা করছে যে নরওয়ে সমরাস্ত্র নির্মাণে পিছিয়ে থাকবে না সেই সময়েই কিনা তাঁরা এই কথা লিখছেন এবং এই লেখায় সই করছেন কয়েকজন সরকারী—সরকারী না হলেও আধা-সরকারী ত বটেই—নরওয়েবাসী। ফাঁসি-যাওয়া মানুষটার দিকে এই একশ ন'জনের

নজর নেই, তাঁদের যত কিছু গোরগোল ফাঁসিকাঠের দড়িটা নিয়ে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সই দেওয়ার লোক বেশ কিছু পাওয়া সত্ত্বেও রসজ্ঞানসম্পন্ন একজনকেও এঁরা পাকড়াও করতে পারেননি। ব্যক্তিগতভাবে এঁদের সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না, এঁরা নিজেদের কাজ করেছেন। নরওয়ের জনসাধারণের অকপটতা ও সংহতিকে আমরা জানি ও সে-দেশকে আমরা ভালবাসি। অবশ্যই এটা দুঃখের বিষয় যে এই একশ ন'জন নরওয়েদেশীয় লেখকের মধ্যে এই গুণগুলি নেই। কিন্তু খোলাখুলি বলতে কি, একত্রিত এই একশ ন'জন লেখকের চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ লেখক ক্নুট হামসুনের পতন লক্ষ্য করবার পর এই একশ ন'জনের পত্রে আমি বিস্মিতও হইনি বা দুঃখিতও হইনি।

আর এই রকম খোলাখুলিই বলতে হয়, প্রিস্টলীর জবাব আমাকে বিস্মিতও করেছে, দুঃখিতও করেছে। সময়ের গুরুত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন অনেক বেশি বাগ্‌বিতণ্ডা এবং ইংলণ্ড ও বিশ্বের জনগণের প্রতি অনেক কম দায়িত্ববোধের পরিচয় তাঁর পত্রে রয়েছে। প্রিস্টলী বলেছেন, তিনি আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের দাবিতে যোগ দিতে পারেন না, কারণ থিয়েটার-সংক্রান্ত সমস্যাবলী আলোচনার আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোয় যোগদানে সোবিয়েত প্রতিনিধিরা বিরত ছিলেন। কথাটা কৌতুকের মত শোনাচ্ছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশত প্রিস্টলী একথা লিখেছেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। নাট্যশালাকে ও ক্ষমতাবান নাট্যকারদের এবং তাঁদেরই একজন হিসেবে প্রিস্টলীকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমি তো তাঁর কাছে থিয়েটার-সংক্রান্ত সমস্যার আলোচনা তুলিনি। আর আসরে যখন চায়ের সরঞ্জামের বদলে আণবিক বোমা সাজানো তখন কি নাট্যকার বা নাট্য-পরিচালকের অবদান সম্পর্কে শান্তভাবে আলোচনা চালানো সম্ভব? প্রিস্টলী অবশ্য বুঝেছেন, এটি শুধু যে-কোন রকমের একটা ঘৃণ্য মারণাস্ত্র নিষিদ্ধকরণের প্রশ্ন মাত্র নয়, শান্তিরক্ষারও প্রশ্ন। প্রিস্টলীর কাছে যে আবেদন আমি করেছিলাম, পশ্চিমের সকল লেখকের কাছেও সেই আবেদন করি: শান্তির সমর্থকদের আন্দোলনে যোগ দিয়ে যুগের নৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তনসাধন; অস্ত্রের ঝনঝনা, স্থানীয় যুদ্ধ ও "ঠাণ্ডা যুদ্ধ" বলে যা প্রচলিত পারস্পরিক আলোচনা, চুক্তি এবং শান্তির দ্বারা তা'র অবসান। আমি অনুভব করছি, আমার সঙ্গে প্রিস্টলীর এই তর্ক তাঁর নিজের সঙ্গে নিজের তর্কেরই প্রতিধ্বনি। নিঃসন্দেহে প্রিস্টলীর চিন্তা-

জগতে এক সংশয়-নাট্যের পালা চলছে—তিনি ওই একশ ন'জন নরওয়ে-দেশীয় লেখকের কারও মত নন। নিজের বিরুদ্ধ মতামতের দিক থেকে তিনি ইংলণ্ডের আরও অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীর মত; এঁরা যুদ্ধকে ঘৃণা করেন কিন্তু কি করে যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে হয় জানেন না এবং ঘরের পাশের কাঁটাবনে নিজেদের হারিয়ে ফেলে ভাগ্যের দোহাই পেড়ে ভয়াবহ পরিণতির অপেক্ষা করেন।

অস্ট্রিয়া থেকে খোলাচিঠিতে জবাব দিয়েছেন হের টিরিঙ—ইনি লেখক নন বৈজ্ঞানিক। ইনি লিখেছেন, ইনি আণবিক বোমার বিরুদ্ধতা করতে পারেন না, কারণ কমিউনিস্টরা ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধতা করছে এবং ধনতন্ত্রের ধ্বংস দাবি করছে। হের টিরিঙ সমাজবিজ্ঞানী নন, পদার্থবিজ্ঞানী এবং আমার মনে হয় তাঁর চিঠি লেখার তাগিদের পিছনে আছে যতটা না বিবেকসম্মত উদ্দেশ্য, তার চেয়ে বেশি আছে স্বাভাবিক সরলতা। একথা না বললেও চলে, কমিউনিস্টরা কখনও যুদ্ধকে ধনতন্ত্র ধ্বংসের ও উন্নততরনের সমাজে উৎক্রান্তির উপযুক্ত উপায় বলে মনে করে না। ধ্বংসের উপরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা পাগলেরও নেই। এইজন্যেই হের টিরিঙ-এর যুক্তি আমার কাছে ছেলেমানুষি বলে মনে হচ্ছে। আমি জানি, হের টিরিঙ অস্ট্রিয় শান্তি-সংসদের একজন সভ্য। আমি আরও জানি আণবিক বোমার মার্কিনী সমর্থকদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে তিনি পশ্চিম বার্লিনে গিয়েছিলেন। এটা আমার কাছে এত গোলমেলে ঠেকেছে যে আমি এমন কি দুজন হের টিরিঙ-এর অস্তিত্ব স্বীকার করতেও রাজি আছি। ব্যাপারটা তাহলে খুবই নাটকীয় হত, কিন্তু দেড়শ বছর আগেকার দু-মুখো খামখেয়ালীপনার দিন আজ শেষ হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে সোজা কথার ও সোজা কাজের যুগ। পশ্চিমী লেখক ও সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে এখনও অনেকে আছেন যাঁরা হের টিরিঙ-এর সমগোত্রীয়: এঁরা এক হাতে ভোট দিচ্ছেন শান্তির জন্য এবং অপর হাতে আশীর্বাদ করছেন আণবিক বোমাকে। এঁদের আমি বলতে চাই: যুদ্ধ নিবারণের নিশ্চিততম পথ এটা নয় এবং পৃথিবীর সাধারণ মানুষ এঁদের কাছে এ ধরনের কাজ আশা করে না।

এবার আসছি শেষ চিঠিটির উত্তরে—এটি এসেছে আমার ফরাসি লেখক বন্ধু আঁদ্রে শামসঁ-র কাছ থেকে। মঃ কে'এভা'র লিখে-নেওয়া এক কথোপকথনের ভঙ্গিতে তিনি উত্তর দিয়েছেন। আঁদ্রে শামসঁ বলেছেন,

মানুষের আবিষ্কৃত আণবিক বোমাকে তিনি ক্যান্সার বা প্লেগের মত দেখেন। তিনি আরও বলেন: শুধু সই দিয়ে আণবিক বোমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যোগ দেব না, যোগ দেব আমার সমগ্র জীবন দিয়ে, সমগ্র সত্তা দিয়ে, সমস্ত কর্মক্ষমতা দিয়ে।" এ কথায় আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু এত কথার পরেও যে তিনি স্টকহোম আবেদন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এতে কিন্তু আমি আনন্দিত হইনি। আমি বুঝি, একটা স্বাক্ষরের চাইতে জীবন বড়। কিন্তু যখন জীবন দিতে পারা যায় তখন স্বাক্ষর দিতে নিশ্চয়ই ইতস্তত করা চলে না। শান্তির সমর্থকদের স্বপক্ষে সমগ্র সত্তা সঁপে দেবার পরেও কেন তিনি তাদের সঙ্গে একযোগে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে অনিচ্ছুক আঁদ্রে শামসঁ সে-কথা ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেছেন: "আমার লেখার জন্য আমি যে নৈতিক মর্যাদা পেয়েছি তা বিক্ষিপ্ত হতে দিতে চাই না।" আঁদ্রে শামসঁ-র বইকে আমি মূল্য দিই এবং জানি যে তাঁর নৈতিক মর্যাদা আছে, নইলে তাঁকে উদ্দেশ করে খোলা-চিঠি লিখতাম না। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, শান্তির স্বপক্ষে সংগ্রাম করে কোন লেখক তাঁর সম্মানের হানি করেন না বরং বাড়ান। স্টকহোম আবেদনে সই করেছেন বলে টমাস মান খেলো হয়ে যান নি। শান্তির সংগ্রাম পাবলো নেরুদা বা সমসাময়িক অন্যান্য বড় কবিদেরও খেলো করেনি। বরং প্রশ্নটা যখন মানুষের জীবন, বিবেক এবং মানবিক মর্যাদাবোধের, তখন নীরবতাই লেখককে খেলো করে। আর একথা আঁদ্রে শামসঁকে মনে করিয়ে দেবার সাহস আমার আছে যে, যে মহৎ শিল্পী ওঅর এণ্ড পীস-এর রচয়িতা, তিনিই নিজের একটি রচনার নাম দিয়েছিলেন, "আমি নীরব থাকতে পারি না"; রচনাটি যে বিষয়ের উপর লিখিত সৌন্দর্যতাত্ত্বিকদের ছাপ অনুসারে তা হচ্ছে "রাজনীতি"। আজ যে সময়ে এক ভয়াবহ যুদ্ধ পৃথিবীর উপর ঘনিয়ে আসছে তখনও আপনি কি নীরব থাকতে পারেন, আঁদ্রে শামসঁ? আমি বিশ্বাস করি, তা আপনি পারেন না এবং আমি আরও বিশ্বাস করি যে আজ হোক বা কাল হোক আপনি শান্তির সমর্থকদের সঙ্গে যোগ দেবেনই। আশাকরি সেই দিনটি খুব বেশি দেরিতে আসবে না।

সম্প্রতি পারীতে "ইওরোপীয় সমস্যাবলী অধ্যয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সংসদ"-এর এক বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে। এই দলিলের তুলনায় সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সমস্ত ফ্যাশিস্ট অত্যাচারকে নিষ্কলঙ্ক বলে মনে হয়।

ব্যাপক ধ্বংসলীলা ও হত্যাকার্যকে এই দলিলে সম্মানের আসন দেওয়া হয়েছে। আমি উদ্ধৃত করছি: "আণবিক অস্ত্র (ক) ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম বোমা, নাগাসাকি বা হিরোশিমা বোমার চেয়ে বহুগুণ মারাত্মক, (খ) হাইড্রোজেন বোমা, বইয়ের হিসেবে হিরোশিমা বোমার চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী, (গ) তেজস্ক্রিয় গ্যাস, তৈরি করা ব্যয়সাধ্য নয়। (২) জৈবিক (বায়োলজিকাল) অস্ত্র মানুষের ধ্বংসের জন্য (বীজাণু ও বিষ), পশুদের ধ্বংসের জন্য (বীজাণু ও বিষ), উদ্ভিদাদি ধ্বংসের জন্য (মাইক্রোব ও পোকামাকড়)। (৩) রাসায়নিক অস্ত্র, প্রধানত শ্বাসরোধী ও বিষাক্ত গ্যাস। (৪) বায়বীয় (meteorological) যুদ্ধ, কলাকৌশল এখনও তেমন পরিণত হয়নি।" বিবরণীটি আরম্ভ হয়েছে কোরিয়ায় একটি আণবিক বোমা ফেলবার প্রস্তাব দিয়ে। এই দলিলে স্বাক্ষর দিয়েছেন বহু সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং সুপরিচিত ফরাসী কবি পল ক্লদেল। এই বীভৎস বিবরণী প্রকাশ হবার পরে এমন একজনও লেখক নেই এবং থাকতে পারেন না যিনি বুঝতে অক্ষম —নীরবতা বা দ্বিধা তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবে। কোন্ পক্ষে তিনি? শান্তির সমর্থকদের পক্ষে অথবা যারা জীবন-বিধ্বংসী সকল প্রকার উপায়, অতি-বোমা থেকে পোকামাকড়-গ্যাস থেকে প্লেগ বীজাণু পর্যন্ত, সব কিছু ব্যবহার করবার প্রস্তাব করছে তাদের পক্ষে?

সাধারণভাবে যুদ্ধকে নিন্দা করতে হবে এই অজুহাতে আণবিক বোমাকে নিন্দা করতে অস্বীকার করা চলে না। সাধারণভাবে আণবিক বোমার বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে এই দোহাই পেড়ে স্টকহোম আবেদনে সই করতে অস্বীকার করা চলে না। অধিকতর প্রয়োজনীয় কিছু করবার আছে এই ছুতো ধরে প্রয়োজনীয় কোন কাজ করতে অস্বীকার করা চলে না। এটা হয় বিবেচনা-শক্তিহীনতা আর নয় ত ভণ্ডামি।

আঁদ্রে শামসঁ বলেন, পৃথিবীকে দ্বিধাবিভক্ত করার বিরুদ্ধে, কথা বলার, তর্ক করার ও একযোগে সত্যসিদ্ধান্তে উপনীত হবার অসম্ভাবিতার বিরুদ্ধে লেখককে সংগ্রাম করতে হবে। আমি তাঁর সঙ্গে একমত। স্টকহোম আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত হবার জন্য আমি প্রস্তাব করেছিলাম এবং পশ্চিমী লেখকদের কাছে ফের এই প্রস্তাবই করছি। কারণ আণবিক বোমার নিষিদ্ধকরণ ভয়াবহ ধ্বংসের হাত থেকে মানবতাকে বাঁচাবে। এই ধরনের নিষিদ্ধকরণ সাধারণ আবহাওয়াকে পরিবর্তিত করবে এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস ত্যাগ

করে আদর্শগত বিপক্ষের সঙ্গে লোকে কথা বলতে-পারবে ও শান্তিরক্ষার কাজ সহজসাধ্য হবে। সবচেয়ে ঘৃণ্য হলেও একটিমাত্র অস্ত্রের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করবার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করার কথা আমি ভাবিনি এবং ভাবিও না; পশ্চিম ইওরোপের লেখকদের কাছে আমি যে প্রস্তাব করেছিলাম তা এই নয় এবং এখনও এই প্রস্তাব আমি করছি না। শান্তির সংগ্রামে যোগ দেবার জন্যে আমি তাঁদের ডাক দিচ্ছি—আমাদের এই সংগ্রাম আণবিক বোমাকে বে-আইনী করবার জন্য, এশিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য, 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' ও অস্ত্রসজ্জা থামাবার জন্য, স্থায়ী শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি দেশের গভর্ণমেণ্ট ও রাষ্ট্রসংঘের কাছে সম্মেলন আহ্বানের দাবি জানাবার জন্য। এখনও সময় একেবারে চলে যায়নি। এখনও যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব। মেশাক্রান্ত মাছি আর কলোরাডোর পতংগের সঙ্গে যারা নিজেদের ভাগ্য জড়িত করেছে তাদের বাদ দেওয়া যাক। দুর্বৃত্ত ও দুর্বলচিত্তদের আমরা ত্যাগ করব।—কিন্তু জীবনকে, সংস্কৃতিকে ও ভবিষ্যৎকে বাঁচাবার জন্য পশ্চিমের সকল সৎ লেখককে শান্তির সমর্থকদের সঙ্গে নিশ্চয়ই যোগ দিতে হবে।

নিজের পথ বেছে নিন। সময় কারও জন্যে বসে থাকে না।

ইলিয়া এরেনবুর্গ

অনুবাদ: সত্যজিৎ দাশ

পুস্তক পরিচয়

জয়ী ভিয়েৎনামঃ– বরেন বসু ; সাধারণ পাবলিশার্স, ৭ ওয়েস্ট রো, কলিকাতা ৭, প্রথম মুদ্রণ—শ্রাবণ ১৩৫৭, দাম এক টাকা।

বরেন বসুর 'জয়ী ভিয়েৎনাম' সত্যি ভাল বই হয়েছে। ১০৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ভিয়েৎনাম মুক্তি-সংগ্রামের এমন সর্বাঙ্গীন চিত্র আঁকতে পারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। বইটি একদিকে যেমন ভিয়েৎনাম মুক্তি-সংগ্রামের নির্ভুল ইতিহাস, অন্যদিকে তেমনই এই ইতিহাসের সাহিত্যিক রূপায়ন—মনে যা একটা স্থায়ী দাগ রেখে যায়। বরেনবাবুর লেখার ধাঁচটি আমার খুব ভাল লাগল। অসংখ্য সন তারিখ ও নীরস স্ট্যাটিস্টিকসের (সত্যই কি নীরস ?) পাশাপাশি রয়েছে অসংখ্য মানুষ ও তাঁদের কাহিনী—সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার, নৃশংসতার ও পশুত্বের কাহিনী আবার সংগ্রামী ভিয়েৎনামের ছেলে-মেয়েদের কাহিনী। কে ভুলবে এশিয়ার এই বীর ছেলে-মেয়েদের অপরাজেয় মনুষ্যত্বের ও সীমাহীন বীরত্বের কাহিনী ? কে ভুলবে এশিয়ার এই বীর ছেলে-মেয়েদের, কে ক্ষমা করবে তাদের শত্রুদের ? কে আছে বাঙলার ও ভারতের মানুষ যার বুক গর্বে দশহাত হবে না ভিয়েৎনামের বীর মেয়ে দাও-য়ের কাহিনী শুনলে ? জয়ী ভিয়েৎনাম জিন্দাবাদ! হো চি-মিন জিন্দাবাদ!—এই ধ্বনি বাঙলার ঘরে ঘরে জাগছে, আরও যাতে জাগে তার সহায়ক হোন্ বরেনবাবুদের মত সাহিত্যিকরা।

ভিয়েৎনামের জাতীয় ইতিহাসের মুক্তি-সংগ্রামের ঐতিহ্যের উল্লেখ করে বরেনবাবু ১৮৬৭ ও ১৮৮৪ সালে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ভিয়েৎনাম দখলের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তার পরেকার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শোষণের ও ঔপনিবেশিক মুক্তি-সংগ্রামের সুপরিচিত ইতিহাস—ধাপে ধাপে তার উল্লেখ করে গেছেন বরেনবাবু, পড়তে পড়তে চমকে উঠতে হয় ভারতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য দেখে। সেই রাজারাজড়াদের রাজভক্তে পরিণত হওয়া,

সেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দেশাত্মবোধের অভ্যুদয়, সেই রুশ-জাপান যুদ্ধের পর জাপানের দিকে মুখ-ফেরানো মধ্যবিত্ত রাজনীতি, সেই প্রতিহিংসামূলক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিস্ফোরণ, সেই অক্টোবর সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের পর জাতীয় ধনিকদের নেতৃত্বে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন, ছাত্র-ধর্মঘট, শ্রমিক ও কৃষক অভ্যুত্থান, চীনের কুয়োমিন্‌টাঙ ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মত ভিয়েৎনামে বুর্জোয়া গণ-পার্টি কুয়োক দান দঙের পত্তন এবং ইন্দোচীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা। ১৯৩০ সালে ইয়েন বে'র সৈনিক-বিদ্রোহ সমগ্র ভিয়েৎনামে জাগিয়ে তুলল স্বতঃস্ফূর্ত সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং এই সময়েই হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎনামের কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকদের অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রাম ও কৃষক-বিপ্লবের প্রাথমিক দাবির ভিত্তিতে ভিয়েৎনামের মুক্তি-সংগ্রামকে শক্ত শিকড় দিয়ে ভিয়েৎনামের মাটি থেকে অফুরন্ত শক্তি আহরণ করার দিকে চালিত করেছিল। ১৯৩০-এর বিদ্রোহ ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের চণ্ডনীতিতে ব্যর্থ হওয়ার পর যখন ভিয়েৎনামীরা দেখল যে সুদীর্ঘ ও আপোষহীন গণ-সংগ্রাম ছাড়া জাতীয় মুক্তির অন্য কোন পথ নেই, তখন কুয়োক দান দঙ দল বিধ্বস্ত এবং তার উচ্চতম নেতারা অনেকেই ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোষকামী। এই-যুগে কমিউনিস্ট পার্টিই এগিয়ে এল ভিয়েৎনামীদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র কেন্দ্রস্থল হিসাবে। ১৯৩৫-৩৬ সালে ট্রট্‌স্কিবাদী ভুল সংশোধন করে কমিউনিস্ট পার্টি ভিয়েৎনামে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠন করে। তারপর বাধল বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪০ সালে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে জন্ম নিল ভিয়েৎমিন বা ভিয়েৎনাম স্বাধীনতা-সংঘ—এই সংঘে "শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী নেতৃত্বে মিলিত হলো শ্রমিক, কৃষক, শহরের গরীব, কারিগর, বুদ্ধিজীবী, ছোট ও মাঝারি শহরে ধনিকশ্রেণী"। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত হো চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎমিন অবিরাম চালিয়ে গেল জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ। ২৬শে আগস্ট, ১৯৪৫, জন্ম নিল স্বাধীন ভিয়েৎনাম রাষ্ট্র ও গঠিত হল হো চি-মিনের রাষ্ট্রপতিত্বে ভিয়েৎনামের লোকায়ত্ত সরকার।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত স্বাধীন ভিয়েৎনাম নীচ ও বর্বর ফরাসি ফাশিস্তদের বিরুদ্ধে, বিশ্বাসঘাতক বৃটিশ ফাশিস্তদের বিরুদ্ধে ও এখন সমগ্র পৃথিবীর জন-গণের জঘন্যতম শত্রু মার্কিন গুণ্ডারাজের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তীর, ধনুক বল্লমের লড়াই, শুধু শত্রুর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার লড়াইয়ের যুগ

অতীত হয়েছে, এখন ভিয়েৎনামে সর্বপ্রকার অস্ত্র ব্যাপকভাবে তৈরি করার জন্য অসংখ্য ছোট বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ফসলের উৎপাদন ও শিল্পের উৎপাদন তিনগুণ বেড়েছে, শতকরা পঁচাশি জন লোক বলতে গেলে রাতারাতি শিক্ষিত হয়েছে, গঠিত হয়েছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বিরাট নিয়মিত ভিয়েৎনাম সেনাবাহিনী। গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধারণ মানুষের সৃজনীশক্তি, কর্মশক্তি ও চারিত্র্যশক্তিকে কি বিরাটভাবে উদ্বুদ্ধ করে, ভিয়েৎনামের ইতিহাস থেকে প্রত্যেক ভারতবাসী তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন ও উপলব্ধি করবেন যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ভারতের কংগ্রেস নেতারা যখন উৎপাদন বাড়াও, সৃষ্টি কর, নিজের চেষ্টায় শিক্ষিত হও ইত্যাদি বুলি আওড়ান, তখন সেই বুলিগুলি হয় কতদূর ফাঁকা ও হাস্যকর। তিনি আরও বুঝবেন যে পূর্ণ স্বাধীনতা, ভূমিসংস্কার ও জাতীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ভিত্তিতে সর্বশ্রেণীর গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট ও লোকায়ত্ত সরকার গঠনই আজকের দিনে ঔপনিবেশিক দেশের ঐতিহাসিক কর্তব্য—কেতাবী সোশ্যালিজমের বুলি আউড়ে এই ঐতিহাসিক কর্তব্যকে এড়িয়ে যাওয়া আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়।

বরেনবাবু খুব নিপুণভাবে ও অল্প কথায় সকল বিষয়কেই আলোচনা করেছেন। সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে আটপৌরে শব্দের ও উক্তির সংমিশ্রণ করে তিনি বইটিকে জনসাধারণের উপযোগী করার চেষ্টা করেছেন। সাহিত্যিক-সাংবাদিক-ঐতিহাসিক রচনার যে পথ সোভিয়েট লেখকগণ দেখিয়েছেন, সেই পথ অনুসরণ করে আমাদের দেশে যাঁরা নূতন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিতে মনোযোগ দিয়েছেন, তাঁদের তিনি একজন। এইজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রগতি সাহিত্যের আন্তর্জাতিক ধারা, ঐতিহ্য ও শিল্পরূপকে অধিকতর নিষ্ঠার সহিত অনুশীলন করতে হবে। শুধু মাত্র জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে নূতন সাহিত্য গড়া আজকের দিনে সম্ভব নয়।

বরেনবাবুর বইটি অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে রচিত হয়নি—লিখিত উপাদানের উপরই তাঁর নির্ভর এবং ভূমিকায় তিনি কথাটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তাঁর লেখা নীরস হয়নি, খুব জীবন্ত, উদ্দীপনাপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

১৯৪৫-এর জাপানী পুতুল বাও দাই আজ মার্কিন পুতুল। এমন হতভাগ্য

কেউ নেই যে বাও দাইয়ের পুতুলনাচ দেখার জন্ম একটি পয়সা খরচ করতেও প্রস্তুত। বিপ্লবী কুয়োক দান দলের প্রাক্তন নেতারা আজ চিয়াং কাই-শেকের চর রূপে ভিয়েৎনাম মুক্তি-সংগ্রামকে সাবোতাজ করার নীচ চক্রান্তে অংশী। কত বড় দেশদ্রোহী এবং তার চেয়েও কত বড় ইডিয়ট !! কিন্তু এইসব জাতীয় দেশদ্রোহীদের ভারতীয় প্রতিরূপদের চেহারা আমাদের কাছে অস্পষ্ট মনে হয় কেন? এই প্রশ্নটিই শেষ প্রশ্ন হিসাবে আমার মনে জেগেছে স্বরেনবাবুর বইটি পড়ে।

অনিমেষ রায়

Mystery of the Birla House—Prof. Debajyoti Burman :-
Jugabani Sahitya Chakra, 28 Kabir Road, Calcutta.

১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি মস্কো থেকে প্রকাশিত নিউ টাইমস্ পত্রিকায় "ভারতের ধনকুবেরগোষ্ঠী ও কংগ্রেস সরকার" সম্পর্কে এ. দিওনিডভের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে ভারতীয় ধনকুবেরদের সম্বন্ধে বলা হয়, "ভারতে গণ-আন্দোলনের আঘাতে যখন বৃটিশরাজ টলটলায়মান, তখন বোম্বাই ও কলকাতার বড় বড় ব্যবসায়ীরা, যারা যুদ্ধের সময়ে সরকারী কন্ট্রাক্ট ও চোরাকারবারে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটেছিল, তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের ঘনিষ্ঠ মহলে কোটিপতিদের আসর জমে ওঠে—আজ জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এদের প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

"এই ধনকুবেরদের নেতা হচ্ছেন বাঙলা দেশের ঘনশ্যামদাস বিড়লা। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত বিড়লারা ছিলেন শুধু ভারতীয় বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম, আজ মিঃ বিড়লা ভারতের অন্যতম প্রধান ক্ষমতাশালী লোক। কোন কোন ভারতীয় মহলে দিল্লীর বর্তমান সরকারকে 'বিড়লা কোম্পানির সরকার' আখ্যা দেওয়া হয়।

"বিড়লা ব্রাদার্স একাধারে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কের মালিক, জমিদার ও সংবাদপত্রের মালিক। জাতীয় অর্থনীতির বহু শাখায় বিস্তৃত ৭০টির বেশি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর বিড়লা কোম্পানি সরাসরি ক্ষমতা পরিচালনা করেন।...সম্প্রতি মিঃ বিড়লা ও তাঁর অংশীদার—

দের ব্যবসায় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। এঁদের প্রতিষ্ঠিত ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক আজ ভারতের শিল্পজগতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে—এই ব্যাঙ্কের কার্যকরী মূলধন ৩০ কোটি টাকায় উঠেছে।

"বিড়লাজী জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবর্গের বহুদিনের পুরনো বন্ধু—কংগ্রেস সংগঠন পরিচালনার জন্য তিনি উদার হস্তে টাকা ঢেলেছেন। কংগ্রেসপন্থী সংবাদপত্রগুলির মধ্যে 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স' 'হিন্দুস্থান' 'বোম্বে ক্রনিক্‌ল্‌', 'ভারত', 'নাগপুর টাইমস্‌', 'ইস্টার্ন ইকনমিস্ট', 'লিডার', 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'সার্চ লাইট' প্রভৃতি বহু সংবাদপত্রের তিনিই মালিক। গান্ধীজীর পুত্র শ্রীদেবদাস দিল্লীতে বিড়লার কাগজের সম্পাদক। আজ ভারতবর্ষে জনমত গঠনের চাবিকাঠি মিঃ বিড়লা ও অন্য দুজন ধনকুবেরের কুক্ষিগত।"

"সকলেই জানে নেহরু সরকারের অন্যতম কর্ণধার স্বরাষ্ট্রসচিব সর্দার প্যাটেল মিঃ বিড়লার একজন ঘনিষ্টতম বন্ধু। সর্দার প্যাটেলের পুত্র দয়াভাই প্যাটেল মিঃ বিড়লার অনেক বন্ধুর কোম্পানীতে ডিরেক্টরের চাকুরী করেন মিঃ বিড়লার পত্রিকাগুলি এবং সময়ে সময়ে তিনি নিজে স্বরাষ্ট্রসচিবকে দেশের 'ত্রাণকর্তা' বলে জনসমক্ষে তুলে ধরেন। সর্দার প্যাটেলকে অনেকে ভারতের ভাবী ডিক্টেটর বলে মনে করেন। বিড়লা ব্রাদার্স লিমিটেডের বিরাট পৃষ্ঠপোষকতার উপর ভর করেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, এ সম্পর্কে বহু সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে।"

সোভিয়েট ভাষ্যকারের এই রচনার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট আলোকপাত করেছেন কংগ্রেসপন্থী লেখক শ্রীযুক্ত দেবজ্যোতি বর্মণ তার এই "বিড়লা প্রতিষ্ঠানের রহস্য" (Mystery of the Birla House) বইতে। এই বইতে তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে মন্ত্রীসভার সদস্য থেকে শুরু করে সাধারণ সরকারী কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই বিড়লা ব্রাদার্সকে ভয় করে চলেন। তাঁদের অসন্তুষ্টির কারণ ঘটলে যে-কোন লোকের যে কোন মুহূর্তে চাকুরী যেতে পারে, এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আসছে। উচ্চতম নেতৃবর্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পুরোপুরি সুবিধা বিড়লা ব্রাদার্স সরকারী কর্মচারী ও মন্ত্রীদের মারফৎ নিচ্ছেন। সর্দার প্যাটেল ও মিঃ ঘনশ্যাম দাস বিড়লার মধ্যে অর্জুন ও কৃষ্ণ-সখার মত বন্ধুত্ব; এককালীন কংগ্রেসদ্রোহী শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার বাঙালী ব্যবসায়ী সংঘের আস্থা হারিয়ে কি করে বিড়লা ব্রাদার্সের কৃপায় ভারতীয় বণিক সংঘের প্রতিনিধিরূপে বাঙলার আইন পরিষদে ঢুকেছেন এবং বিড়লা

ব্রাদার্সের বিশ্বস্ত হিসাবে মন্ত্রীপরিষদে কাজ করছেন ইত্যাদি শ্রীযুক্ত বর্মণ কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন। এছাড়া কাস্টম্‌ আই-সি-এস অফিসার ভূতপূর্ব বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণকর্তা মিঃ ভেলোডি, ভূতপূর্ব ইন্‌কামট্যাক্স কমিশনার মিঃ ভাস্কেকার, বর্তমান ইন্‌কামট্যাক্স কমিশনার মিঃ নাগরওয়ালা, বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী সি. সি. দেশাই প্রভৃতির সঙ্গে বিড়লা ব্রাদার্সের দহরম-মহরমের কথা তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন। আয়কর তদন্ত কমিশনের বিড়লা ব্রাদার্স সংক্রান্ত ফাইল সরকারী দপ্তর থেকে কি করে চুরি যায়, বহু লক্ষ টাকা বিক্রয়কর ফাঁকি দিয়ে এসিস্ট্যান্ট সেলস্‌ট্যাক্স কমিশনার শ্রীনির্মল-চন্দ্র রায়ের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়া সত্ত্বেও সেলস্‌ট্যাক্স কমিশনার মিঃ পালচৌধুরী, রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি. বি. দাসগুপ্ত ও মন্ত্রী শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারের হস্তক্ষেপ এবং অবশেষে অব্যাহতি লাভ ইত্যাদি প্রায় ডিটেকটিভ গল্পের মতই জটিল ও রোমাঞ্চকর কাহিনী এর মধ্যে রয়েছে— রীতিমত সরকারী নথিপত্রের প্রতিলিপিসহ এই সব ঘটনার সঙ্গে কর্তব্যপরায়ণ ও সৎ রাজকর্মচারী শ্রীনির্মলচন্দ্র রায়ের পদাবনতি ও পরে সাস্‌পেন্‌সন্‌ আদেশ এবং অন্যদিকে মিঃ বি. বি. দাসগুপ্ত ও মি পালচৌধুরীর দ্রুত পদোন্নতি—এই অনুমানকেই দৃঢ় ধারণায় পরিণত হতে সাহায্য করে যে সরকারী শাসনযন্ত্র কার্যত বিড়লা ব্রাদার্সের আজ্ঞাবহ হিসাবেই কাজ করছে।

শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি হিসাবে বাজারে বিড়লা ব্রাদার্সের নাম থাকলেও শ্রীযুক্ত বর্মণ সরকারী হিসাবপত্র দাখিল করে দেখিয়েছেন যে, বিড়লা প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত সহজে মুনাফা লুটবার উপকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। হিসাবের মারপ্যাচে প্রকৃত মুনাফার পরিমাণ কোম্পানীগুলির ব্যালান্স সীটে অনেক কম করে দেখান হয়, এইভাবে রন্ধ্র পথে কোটি কোটি টাকা বিড়লা ব্রাদার্সের পকেটে যায়। হিসাবে জালজুয়াচুরির পথগুলিও লেখক নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, যথা : ১) ভুয়া-বিক্রেতাদের কাছে ভুয়া-ক্রয়ের হিসাব দেখান ; ২) উৎপাদনের প্রকৃত হিসাব গোপন রেখে উৎপাদনের একাংশ ভুয়া নামে বিক্রয় করা ; ৩) নিজেদের নিয়োজিত রেজেস্টীকৃত ভুয়া বিক্রেতাদের কাছে অত্যন্ত শস্তা দরে মাল বিক্রয় দেখান ; ৪) বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত অর্থে কতগুলি শাখা কোম্পানি গড়ে তোলা, এবং এগুলির মারফৎ ক্রয়-বিক্রয় চালানো ও প্রয়োজনমত এই কারবারগুলি গুটিয়ে নেওয়া, ৫) চলতি আয়ব্যয়ের হিসাবে মূলধনখাতে ক্ষয়ক্ষতির খরচ

দেখান, অন্যদিকে গোপনে মূলধন বিক্রয় করা ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ করা।

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত ডি. এফ. কারাকা তাঁর সম্পাদিত 'Current' পত্রিকায় লিখেছিলেন,

"১৯৪৮ সালে বিড়লা ভবনে গান্ধীজীকে হত্যা করা হয়।

আজ বিড়লা ব্রাদার্স প্রমুখ প্রতিষ্ঠানগুলিতে এর চেয়েও ব্যাপক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে—আমাদের জাতির স্বাস্থ্য, ধন, সুখ বিনষ্ট করা হচ্ছে এই সব প্রতিষ্ঠানে।"

বিড়লা ব্রাদার্সের চোরাকারবারী কীর্তিকলাপ প্রকাশ করে শ্রীযুক্ত বর্মণ যে সত্যনিষ্ঠা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যই প্রসংশনীয়। এই পুস্তক প্রকাশ ভারতীয় সাংবাদিক সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যাকে তুলনা করা যেতে পারে আমেরিকার মিস্ টার্নবেল রচিত "History of the Standard Oil Company" শীর্ষক পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে। শেষোক্ত পুস্তকটি অবশ্য 'স্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানি'র মালিকরা লেখিকাকে বহু টাকা ঘুষ দিয়ে কিনে নিয়ে প্রচার বন্ধ করে দেন, এই ভাবে রকফেলারের কুকীর্তিসমূহ ঢেকে চেখে তাঁর 'দানবীরের' মুখোশ রক্ষা করা হয়। আমরা এই দৃঢ় আশা পোষণ করি যে, 'Mystery of the Birla House'-এর সে শোচনীয় পরিণতি ঘটবে না।

শুধুমাত্র বিড়লা ব্রাদার্সই নয়, টাটা, গোয়েঙ্কা, ডালমিয়া, সিংহানিয়া, ওয়ালচাঁদ-হীরাচাঁদ প্রভৃতি ভারতীয় ধনকুবেরগোষ্ঠীর ব্যবসায় সংক্রান্ত সমস্ত কার্যকলাপও প্রামাণ্য তথ্য সমেত আজ জনসাধারণের গোচর করা প্রয়োজন। সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হলে এ-সমস্ত প্রশ্নের তর্কাতীত সদুত্তর পাওয়া যাবে বলে আমাদের ধারণা যে, কেনই বা আজ ভারতবর্ষ দ্রুত অর্থনৈতিক সংকটের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হচ্ছে; খাদ্য, বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব মোচনের আশু সমাধান কেনই বা দেখা যাচ্ছে না; কারাই বা যারা ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করেছে, রাষ্ট্রনায়কদের মুঠোর মধ্যে রেখেছে এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের সামন্তশ্রেণী ও অন্যান্য শক্তির সঙ্গে একযোগে দেশের সর্বাঙ্গীন শিল্পবিস্তারের পথে, দেশের স্বাবলম্বী হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছে; বোঝা যাবে, কাদের শোষণের দৌরাত্ম্যে শুধু শ্রমিক-কৃষকই নয়, এই শোষণসাম্রাজ্যে চোরাবাজার

ও অর্থনৈতিক সংকটের আবর্তে পড়ে মধ্যবিত্ত, ছোট ব্যবসায়ী ও এমন কি মাঝারি ধরনের প্রাদেশিক শিল্পপতিরাও ক্রমশই ক্ষয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য বইটিতে শ্রীযুক্ত বর্মণ যদিও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শিরোমণি ডালমিয়া বাদার্সের ব্যবসায়ী অপকীর্তির সন্দেহাতীত প্রমাণ দিয়েছেন, তবু সাধারণভাবে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের এই দেশদ্রোহিতার ও তাদের এই শোষণসাম্রাজ্যের মূলচ্ছেদ না হলে যে ভারতীয় উৎপাদনশক্তির পূর্ণ বিকাশের বাধা অপসারিত হচ্ছে না, আর্থিক সংকটের সমাধান সুদূর-পরাহত এবং জনসাধারণের প্রকৃত মুক্তি আসছে না, গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসমাপ্তই থাকছে—এসব তত্ত্ব আলোচনা করার অবকাশ পাননি।

অবশ্য এ-সমস্ত এবং অন্যান্য নানা ত্রুটি সত্ত্বেও বইটির বিশেষ গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং গ্রন্থকার বিশেষভাবে ভারতীয় জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ।

করুণা গুপ্তা

সংস্কৃতি সংবাদ

সোভিয়েট চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী উৎসব

গত ১৬ই থেকে ২১শে ডিসেম্বর (১৯৫০) কলকাতার সিনেমারসিক ও সোভিয়েট-জ্ঞানান্বেষীদের পক্ষে একটি স্মরণীয় সপ্তাহ। সোভিয়েট-চলচ্চিত্র শিল্প উৎসবে' তখন দক্ষিণ কলকাতার 'বসুশ্রী' ও কলকাতার 'বীণা' প্রেক্ষাগার দর্শক-সাধারণের আনন্দ ও শিক্ষার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। অবশ্য ১৫ই ডিসেম্বর সর্দার বল্লভভাই-এর মৃত্যুতে 'বীণার' দর্শকগণের ভাগ্যে একটি পরম আশ্চর্য চিত্র দর্শন আর ঘটল না। 'বসুশ্রী'র উদ্বোধন উৎসব এবং আলেকজেণ্ডার নেভ্স্কির চিত্রাভিনয় তাই পরদিবস প্রভাতে সুসম্পন্ন করতে হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মঃ নোবিকভ, উৎসব কমিটির সভাপতি বিচারপতি শ্রীযুক্ত কমল চন্দ্র ও উদ্বোধনকর্তা শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের ভাষণ উৎসবের সূচনা করে; ২১শে ডিসেম্বর 'বসুশ্রী'তে মস্কোস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ভাষণে উৎসবের উপসংহার হয়। এঁদের সকলেরই কথাতে প্রচুর শুভেচ্ছা ও আগ্রহ ছিল। দর্শকদের উৎসাহ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা প্রতিদিন উদ্যোক্তাদের আশা ও অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করেছে, উৎসব-কমিটিও নিশ্চয়ই নিজেদের প্রয়াস সার্থক মনে করছেন। সাধারণের রুচি ও আগ্রহ দিয়ে যদি বিচার করতে হয়, তাহলে মানতে হবে—হলিউড ও বোম্বাই-মার্কা শিল্পরীতি তাকে বিকৃত করতে পারেনি,—সত্যই সুস্থ, সহজ, শিল্প ও জীবনানন্দের রসিক এই সাধারণ মানুষেরা।

ইতিপূর্বেও কলকাতার দুই একটি প্রেক্ষাগারে কোন কোন সোভিয়েট চিত্র নিমন্ত্রিত দর্শকেরা দেখবার সুযোগ লাভ করেছেন। কদাচিৎ দর্শনী দিয়েও দু'একটি চিত্র কিছু কিছু সাধারণ দর্শক দেখতে পেয়েছেন। যুদ্ধকালে আমরা বিশেষ করে সোভিয়েটের যুদ্ধকালীন ও দেশভক্তিমূলক চিত্রও দেখেছি,—তার মধ্যে ছিল 'রামধনু' (রেনবো), পুদোভকিন রচিত 'জেনারেল

সুবোরোব', 'জোয়া', 'ভীম-চরিত ইভান' (ইভান দি টেরিবল্), 'প্রফেসর ম্যামলক' ও 'বার্লিন জয়' (তথ্যমূলক) প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ চিত্র। আর, এসব শৌর্যবীর্যের কাহিনী ছাড়াও আমরা কেউ-কেউ দেখেছি পরমাশ্চর্য নির্বাক-চিত্র 'জীবনের পথ' (রোড টু লাইফ্) ও 'ম্যাক্সিম্ গোর্কির বাল্যজীবন'; আমার মত অনেকের চক্ষে ও দু'চিত্রের তুলনা নেই। কিন্তু কথা এই—এ দেশের জনসাধারণ এই প্রথম সাধারণভাবে সোভিয়েট চিত্র-শিল্পের ও সোভিয়েট জীবনাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করলেন। 'সোভিয়েট-চলচ্চিত্র-শিল্প উৎসব সমিতিকে' আমরা তাই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি—এই সদ্যমুক্ত পথটি তাঁরা সাধারণের পক্ষে সুপ্রশস্ত করে দিতে সচেষ্ট থাকবেন, এই আমাদের নিবেদন।

এই উৎসব উপলক্ষে সাতখানি প্রধান সোভিয়েট চিত্র প্রদর্শিত হয়—(১) আইজেনস্টাইনের 'আলেকজেণ্ডার নেব্স্কি', (২) 'ভীম-চরিত ইভান', (ঐতিহাসিক কথা); পিবয়েভ-এর গীতমুখর দু'খানি রচনা—(৩) সাইবেরিয়ার কাহিনী 'জীবন মহাগীতি', ও (৪) 'কুবানের কসাক' জীবন-প্রাচুর্যভরা রসনাট্য; (৫) 'জোয়া' (বীরকন্যা জোয়ার কাহিনী), (৬) 'মিকলুহো ম্যাক্লে' (একজন রুশ-বৈজ্ঞানিকের ৭০।৮০ বৎসর পূর্বে 'রক্তগত-জাতিবাদের' বিরুদ্ধে মহান্ সংগ্রাম), এবং (৭) 'বনানীর কাহিনী'—(জলের ও বনের প্রাণি-জগতের এক সত্যনিষ্ঠ রূপকথা)। এছাড়াও প্রদর্শিত হয় এদেশীয় সেন্সরের কাঁচি-কাটা (৮) 'বিশ্বের যুবশক্তি' নামক বুদাপেস্ত যুবমহাসম্মেলনের প্রামাণিক চিত্রখানি; আর প্রতিদিনই ছিল কোন না কোন কার্টুন বা হস্তাঙ্কিত সবাকচিত্র—রূপরসে কাহিনীতে সেগুলিও চমৎকার। উৎসবকালে অবশ্য এছাড়া নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে কেউ-কেউ অন্যত্র দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, আইজেনস্টাইনের সেই বিশ্ব-বিশ্রুত নির্বাক চিত্র 'পোটেমকিন্' (১৯২৬ এর রচনা,—যাতে পরে সঙ্গীত সংযোজিত হয়—সে সঙ্গীত নাকি এমনি উম্মাদনার সঞ্চার করত যে সঙ্গীত-ভুক্ত এ চিত্র প্রদর্শন সোভিয়েটের বাহিরে নিষিদ্ধ হয়ে থাকে); 'লেনিন' নামীয় প্রামাণিক চিত্র; 'ইয়ং গার্ডস্' নামীয় (ফেদায়েভ-এর সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস অবলম্বনে রচিত) সুবৃহৎ সবাক্ চিত্র, আর 'বার্লিনের পতন' নামক এ. চিয়াউরেলির বহু-বিশ্রুত সবাক চিত্র (সম্ভবত সেন্সারের কাঁচিতে এ কাহিনী এদেশে অখণ্ড থাক্‌বে না)। মোটের উপর আইজেনস্টাইনের 'পোটেমকিন্' থেকে চিয়াউরেলির 'বার্লিনের পতন' পর্যন্ত

এই চিত্রগুলি যাঁরা দেখতে পেয়েছেন তাঁরা 'সোভিয়েট চলচ্চিত্রের ক্রম-বিকাশের ধারা'র একটা সুন্দর পরিচয় লাভ করেছেন। আর যাঁরা শুধু উৎসব সমিতির উদ্যোগে প্রদর্শিত চিত্রগুলি দেখেছেন, তাঁরাও সমসাময়িক সোভিয়েট চলচ্চিত্রের মূল গুণগুলির পরিচয় লাভ করতে পেরেছেন।

কী থেকে সোভিয়েট চলচ্চিত্র যাত্রারম্ভ করে, আর কোথায় সে এখন পৌঁছেছে—এ কাহিনী কি আঙ্গিক-উৎকর্ষের দিক থেকে, কি শিল্পোদ্যোগের দিক থেকে, সোভিয়েট সভ্যতার ইতিহাসের মতই চমকপ্রদ, তারই অঙ্গ, আর এযুগের মানুষের জয়-যাত্রারও একটি প্রধান অধ্যায়। মানুষের সভ্যতার এই নতুন যুগের উদ্বোধন করেন লেনিন। তিনিই বলেন: 'চলচ্চিত্র আমাদের পক্ষে সর্বপ্রধান শিল্পকলা।' লেনিনের শিল্পাদর্শও আমরা জানি—শিল্প জনতারই জিনিস, জনতার জীবন ও সংগ্রাম তার প্রেরণার উৎস; আর জনতার জীবন ও সংগ্রামেরও প্রেরণা আবার শিল্প। তবু তখনো সোভিয়েট চলচ্চিত্র জন্মেনি—১৯২৫এ আইজেনস্টাইনের 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন্' 'অক্টোবর', 'পুরাতন ও নতুন' প্রভৃতি চিত্রে তার উদ্বোধন হল। এ সব চিত্র বিপ্লবের নানা দিকের কাহিনী। সেই নির্বাক চিত্রের যুগে "পোটেমকিন্" তার কথা বস্তু, তার শিল্প-গরিমা, কল্পনা ও আঙ্গিকের জন্ত পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠচিত্র বলে গণ্য হয়। আজও ওদেসার ঘাটে জনতা ও জার-সিপাহীদের সেই সংঘর্ষ দর্শকদের মনে তেমনি শিহরণ জাগায়। এর পরে সোভিয়েট চলচ্চিত্র জগতে উদিত হন পুডভকিন্—গোর্কির অমর উপন্যাস 'মা'কে যিনি রূপায়িত করেন, আর দোভজেংকো—মাটির কাছাকাছি ছিল যাঁর কান তাছাড়া প্রথম থেকেই সোভিয়েট সূচনা করে 'ডক্যুমেণ্টরি' বা প্রামাণিক চলচ্চিত্রের চিত্র-জগতে এইটি সোভিয়েটের প্রধান এক দান। সবাক্ চিত্রের যুগ যখন এল সোভিয়েট চলচ্চিত্র প্রধানত তখন প্রথম 'পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের' (১৯২৮-৩২) উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত। অন্যদিকে জীবন ও শিল্পের আদর্শ তখনই সোভিয়েট ভূমিতে সুস্থির হয়ে উঠেছে। ১৯৩২-এর এপ্রিল মাসে 'সমাজবাদী বাস্তবতার' শিল্পনীতি গৃহীত হয়, শিল্পাদর্শের ক্ষেত্রে তা সোভিয়েটের নিজস্ব দান। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র পর্যন্ত সকল শিল্প-ক্ষেত্রে এই নীতিই হয় সোভিয়েটের রস সৃষ্টির নির্দেশ। তখনকার যুগেরই একখানা প্রধান চিত্র হল (এক্কের চিত্র) জীবনের পথ'। মাকারেংকো, নায়ক সোভিয়েট শিক্ষাবিদ্ বাপ-মা-হীন পকেটমার, গাঁটকাটা ধরনের পথের দুরন্ত ছোকরাদের নিয়ে শিক্ষাদানের

যে-একটা সার্থক পরীক্ষা করেন, 'জীবনের পথের' চিত্র তাঁর সে পরীক্ষারই কাহিনীর উপর গঠিত। কিন্তু বাঙলা দেশের মায়েরাও ভুলতে পারেননি মুস্তাফাকে (আই, কিবূলা এ ভূমিকায় অভিনয় করেন), আর তার সেই মমতাভরা শিক্ষককে (এন্, বাটালোভ্ এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন)। ট্রাজিক পরিণতির দিক থেকে এই চিত্রের শেষ দৃশ্য বেদনায়, করুণায়, গাম্ভীর্যে, মমতায় অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত। অন্য সুপ্রসিদ্ধ চিত্র ছিল 'চাপায়েভ', 'ক্রেগান্স্টাডের আমরা' প্রভৃতি; সে সব এদেশে আসেনি। কিন্তু মার্ক ডনস্কোইর রূপায়িত 'গোর্কির আত্মকাহিনীর প্রথমাংশ' আমরা দেখেছি ('পরিচয়ে'র পাঠকেরাও তা জানেন)। সেই চিরন্তনী দিদিমার (বার্বারা ম্যাসিলোটোনোভা) ব্যথা-আনন্দভরা সরসতা, সেই সকরুণ কাব্যশ্রী মণ্ডিত পঙ্গু বালকের (আই, স্মির্নভের) প্রজাপতি উড়িয়ে দেওয়া—এসবে মিলে এ চিত্র আমাদের অনেকের জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ রস-সম্পদ হয়ে রয়েছে। কিন্তু এ যুগে (১৯৩২-৩৯) সোভিয়েট জীবনের শিল্প-উদ্যোগের যে বিরাট কাহিনী চিত্রে রূপায়িত হয়, এদেশে আমরা সে সব চিত্র দেখতে পাইনি। তার পরে আমরা দেখেছি 'প্রোফেসর মাম্লক্' (১৯৩৮-এ রচিত) ও যুদ্ধকালীন চিত্র 'রামধনু' প্রভৃতি।

যুদ্ধের যুগের চিত্রের একটা প্রধান ধারা ঐতিহাসিক চিত্র। রুশ ইতিহাসের বীরদের কথা রুশ সৈনিকের যুদ্ধোৎসাহ যোগায়। আর একদিকে সোভিয়েট ক্যামেরা-শিল্পীরা প্রাণ দিয়ে তখন সংগ্রহ করতে থাকেন মস্কোর যুদ্ধ, লেনিনগ্রাদের যুদ্ধ, ও স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ প্রভৃতি মহাযুদ্ধের প্রামাণিক চিত্র। অথচ এ সময়েই আইজেন্স্টাইন সুদূর আল্মা-আটার শিল্পনির্মাণাগারে তোলেন 'ভীমচরিত ইভানের' চিত্র—এন্. চেরকাসভ্ তাতে ইভানের ভূমিকা গ্রহণ করেন। যাঁরা চলচ্চিত্রের আঙ্গিক-বিশারদ তাঁদের বিবেচনায় এ চিত্র শিল্প-সংযোজকদের পক্ষে এক পরম শিক্ষাগার। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিত মানুষ 'ইভান' চিত্রের ঐশ্বর্যে চমৎকৃত হলেও তাঁর শিল্প রীতিতে একটা মুদ্রাদোষ দেখতে পান। অবশ্য আইজেনস্টাইন্-এর লক্ষ্য ছিল একটা মহাকাব্যিক রীতির চিত্র নির্মাণ। অতিশয়োক্তি মহাকাব্যের একটা ধর্ম না হোক্, রীতি। এই কথা মনে রেখে আইজেন্টাইন্ ও তাঁর এ শিল্প-নিদর্শনকে বিশেষ করে আলোচনা করতে হয় আঙ্গিকের ও রীতি-পদ্ধতির দিক থেকে। কিন্তু তথাপি সাধারণের সাক্ষ্য যে তুচ্ছ নয় তার প্রমাণ—সোভিয়েট শিল্পকলার মূলকথা, 'সমাজবাদী

বাস্তবতা'—আইজেন্‌স্টাইন্ যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে অসমর্থ, জনতার জীবন-উৎস থেকে তিনি আপনার শিল্প-প্রেরণাকে আহরণ করতে পারেননি, তার সম্বন্ধে এ ধারণা সোভিয়েট শিল্পরসিকেরাও বহুদিন থেকে পোষণ করতেন। এইখানেই দোব্‌ঝেংকো, পুডভ্‌কিন (আইজেন্‌স্টাইনেরই ছাত্র), চিয়াউরেলি প্রমুখ নতুন শিল্পীদের কৃতিত্ব—তাঁরা সেই সোভিয়েট আদর্শের ও সোভিয়েট জীবনের শিল্পী, নতুন যুগের চিত্রকার।

মহাযুদ্ধের শেষে সোভিয়েটের এই নতুন যুগ যে পর্বে গিয়ে পৌঁছেছে সমসাময়িক চলচ্চিত্রে আমরা এবার পেলাম তার পরিচয়, একদিকে আছে 'বার্লিনের পতন' ও 'ইয়ং গার্ড' (কিশোর সাম্যবাদী), 'মিকলুহো ম্যাকলেব', কথা—(বোসালের পাব্‌লব্, দোবজেংকোর মিচুরিন্ প্রভৃতির জীবনী-চিত্র নাকি অপূর্ব, কিন্তু তা এ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাইনি); যুদ্ধকালীন চিত্রেরই এসব নতুন সংস্করণ।—সোভিয়েটের নতুন জন-সমাজকে নূতন যুগ গঠনের জন্য সুস্থ চিন্তায় ও গৌরবে প্রবুদ্ধ করা এসব চিত্রের লক্ষ্য। আর একদিকে এসেছে শিক্ষাপ্রদ বৈজ্ঞানিক চিত্র : 'গাছের কথা'. 'স্ফটিকের সংসার' প্রভৃতি চিত্র আমরা দেখতে পাইনি; কিন্তু 'বনানীর কাহিনী' দেখে বিমুগ্ধ না হয়েছে এমন লোক নেই। প্রাকৃতিক আবেষ্টনীতে প্রাণীদের এই জীবন যে ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে তা অভাবনীয়। আর এই প্রাণিজগৎ দেখতে দেখতে বুঝতে পারি মানুষের জগৎ ও প্রাণিজগৎ কত নিকট। শুধু জীবন-চেতনা মনুষ্য স্তরে অধিকতর প্রকাশিত আর অধিকতর জটিল, এই হল মূল পার্থক্য। জীব-মন ও শিশুমনের এক সার্থক পরিচয়—এই চিত্র। কার্টুনগুলির মধ্যেও অনেকগুলি হাসিতে কৌতুকে এইরূপই সরস। কিন্তু সোভিয়েট চিত্র হিসাবে অভাবনীয় ছিল 'কুবান কসাক্' ও 'জীবন-মহাগীতি।' সংগীতে, বর্ণ-সুষমায়, উদ্যোগময় পরিকল্পনায় এই দুটি চিত্রের সামান্য কাহিনী অসামান্য—রোমান্সের-মূল সত্যে উজ্জ্বল। গীত-মুখর, হাস্য-মুখর, উৎসব-মুখর যে নতুন যুগ, নতুন জীবন, নতুন মানুষ সোভিয়েট ভূমিতে জন্মলাভ করছে—এ সংবাদ আমরা শুনি—জানি না কেমন সে মানুষ, কেমন সে যুগ। দেখি তা 'সাইবেরিয়ার-কাহিনীতে'। 'কুবান কসাকে' এসে ত চমক লাগে—এমন কি, সংশয়াকুল হই—এত হালকা সেই কোল্‌খোজের জীবনযাত্রা? জীবনটা যে শুধু গম্ভীর নয়, হাসিতেও উজ্জ্বল, একথা যেন ভাবতে ভরসা পাই না আমরা। কিন্তু নতুন যুগের প্রধানতম রস ট্র্যাজিডি হবে না, হবে নতুন বীররস আর নতুন

কৌতুকরস ; কারণ তখন প্রাণ-প্রাচুর্যের স্ফূর্তি হবে অব্যাহত ও উজ্জ্বল। সেই "নতুন মানুষ, নতুন মানব জাতি ও জগতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের" আভাস নিয়ে এসেছে সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্প।

গোপাল হালদার

'বহুরূপী'র নাট্যোৎসব

বাঙলা নাটকের আর সাধারণ পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলির দেউলিয়া অবস্থা আজ তর্কাতীত। আমাদের থিয়েটারগুলো বহুদিন ধরে নাটকের নামে যা পরিবেশন করে আসছে, তা যেমন অন্তঃসারশূন্য তেমনি কৃত্রিম আর অবাস্তব। দু-একটি অতিবিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, সাধারণভাবে সে-সব নাটকে না আছে বাঙালী জীবনের যথার্থ পরিচয়, না আছে সুস্থ আর স্বাভাবিক কোন কাহিনীর সূত্র, এমন কি সংলাপগুলি পর্যন্ত অদ্ভুত এক কৃত্রিমতায় ভরা। সমাজের সমসাময়িক রূপ, তার মধ্যে বিভিন্ন শক্তির স্ফূরণ আর তাদের সংঘাত-সংঘর্ষ, তার গ্লানির দিক আর গৌরবের দিক, এই সমস্তকে শিল্পরূপ দিয়ে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে প্রত্যেকটি দেশের জাতীয় রঙ্গমঞ্চের চিরদিনের যে নিজস্ব একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য আর সামাজিক দায়িত্ব আছে, আমাদের নাট্যকলা ক্রমশ তার থেকে বহুদূরে সরে এসেছে। এই সরে আসার কারণ-গুলো খুঁটিনাটি হিসাব করার অবকাশ বর্তমান আলোচনায় নেই। মোট কথা, বাঙলা থিয়েটার যখন থেকে বাঙালী-সাধারণের সঙ্গে আর জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করে উঠতে পারছে না বলে সবাই অনুভব করছেন, বছর দশেক আগে সেই সময়েই সূচনা হয় নতুন নাট্য-আন্দোলনের, যা দু-তিন বছরের মধ্যেই গণনাট্য-সৃষ্টির সার্থক প্রচেষ্টায় রূপ পায় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠায়।

নাট্যকলার দুটি প্রাথমিক সত্যকে গণনাট্য সংঘই প্রথম সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন : প্রথমত নাটক শিল্প হিসেবেই একান্তভাবে জনমুখাপেক্ষী, গণ-সংযোগ ছাড়া তার স্ফূরণ হয় না। দ্বিতীয়ত অন্যান্য শিল্পরূপের চেয়ে নাটকের সামাজিক প্রভাব অনেক বেশি, শুধুই 'বিশুদ্ধ' রসোপভোগের জিনিস তা নয়। সমসাময়িক জীবনসত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা, সামাজিক দায়িত্ববোধ আর শিল্পের প্রতি অনুরাগ—এই তিনের সমন্বয়ে গণনাট্য সংঘ বাংলার নাট্যকলায় এক উর্বর আর ফলবান ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন।

তারপর থেকে সেই নতুন নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করে চলেছেন আপন আপন নিজস্ব সৃষ্টির দানে যে-কয়েকটি নাট্যসম্প্রদায়, তাঁদের মধ্যে 'বহুরূপী' নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিশিষ্ট, অত্যন্ত শক্তিমান। ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাস ধরে পর পর ছ'টি রবিবার সকালে নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে তাঁরা যে তিনটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেন, তা বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, বক্তব্যের বলিষ্ঠতায়, রূপায়ণের বাস্তবতায়, প্রযোজনার নিখুঁত আঙ্গিকে আর অভিনয়ের আশ্চর্য কৃতিত্বে আমাদের নাট্যরসিক সাধারণের কাছে বহুকাল পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'ছেঁড়া তার', 'উলুখাগড়া' আর 'পথিক', এই তিনটি নাটক—বিশেষ করে 'ছেঁড়া তার'—দর্শকসাধারণের মনে যে কী অভূতপূর্ব সাড়া জাগাতে পেরেছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে শেষ দিনের অভিনয়ের শেষে, যখন আবেগ-চঞ্চল পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যিক-অভিনেতাদের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে 'বহুরূপী' নাট্যসম্প্রদায়ের শিল্পীদের উদ্দেশ্যে। 'বহুরূপী'র এই সর্বাঙ্গীন সার্থকতার কারণ কি? মূল কারণ অবশ্যই এই-যে, নাটকের বক্তব্যটিকে তাঁরা ভালভাবে, সুন্দর করে, শিল্পরসোত্তীর্ণ করে বলেছেন এবং এই রসোত্তীর্ণ করে দেবার কাজে পরিচালক শম্ভু মিত্র থেকে প্রত্যেকটি অভিনেতা-অভিনেত্রীর দৃষ্টি ছিল আগাগোড়া সজাগ, মন ছিল সচেতন, অভিনয়-শিল্পের শিক্ষাগ্রহণে 'বহুরূপী'র নতুনতম শিল্পীটি পর্যন্ত ছিলেন একান্ত আন্তরিক।

'বহুরূপী' নাট্যসম্প্রদায় তাঁদের অভিনয় আর প্রযোজনার মারফৎ আরেকবার প্রতিষ্ঠা করলেন শিল্পের সেই পুরাতন সত্যকে যে বক্তব্য যতই ভাল হোক না কেন, ভাল করে বলতে না পারলে তার আবেদন ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিল্পের মাধ্যমে যখন কোন বিষয়কে রূপ দিতে হবে, তখন সেটাকে সার্থক শিল্প করে তুলতে না পারলে সেটা মোটেই গ্রহণীয় হবে না। যত ভাল করে বলা হবে, বক্তব্যটা ততই সহজে আর অনায়াসে অন্যের মনে সঞ্চারিত হবে। কথাটা মোটেই নতুন নয়, কিন্তু তবু আজ কথাটা বারবার করে মনে রাখার দরকার পড়েছে—বিশেষ করে আমাদের নতুন নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে আজ যে-সব উৎসাহী তরুণকর্মীরা এসেছেন তাঁদের পক্ষে। শিল্পের মাধ্যমে জীবনকে ফোটাতে হলে জীবনের প্রতি সততা চাই যতখানি, ঠিক ততখানিই চাই শিল্পকে আয়ত্ত করার শিক্ষাপ্রচেষ্টা। নাটকের

মত একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে সার্থকভাবে ফোটাতে গেলে নিজেকে নাটকের আর্ট ফর্ম-এর শিক্ষায় বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। বিশেষত নবনাট্য-আন্দোলনের কর্মীদের পক্ষে সেই আত্মশিক্ষার দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি—কারণ, জনতার জীবনের থেকে তাঁরা যে সৎ আর মহৎ বিষয়বস্তু আহরণ করছেন, যথার্থ শিল্পশিক্ষা না থাকলে নাটকের মধ্যে দিয়ে সেই বিষয়বস্তুর বোল আনা বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে। শিল্পের ক্ষেত্রে স্থূলতা জিনিসটাই যে কত বড় একটা বিকৃতি, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত 'শান্তি-সংস্কৃতি-সম্মেলনে'র কয়েকটি নাটকাভিনয়ে।

'বহুরূপী' তাঁদের নাট্যোৎসবে যে-তিনটি নাটক উপস্থিত করেন, তার মধ্যে 'পথিক' আর 'ছেঁড়া তার' শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ীর রচনা, 'উলুখাগড়া'র রচয়িতা সঞ্জীব নাম ব্যবহার করেছেন। তিনটিই পরিচালনা করেছেন শম্ভু মিত্র। বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে তৃপ্তি মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, তুলসী লাহিড়ী, গীতা ভাদুড়ী, সবিতাব্রত দত্ত, কালী সরকার, মহম্মদ ইস্‌রাইল, সুলেখা মিত্র এবং শম্ভু মিত্র ছাড়াও অন্যান্য সকলেই উজ্জ্বল অভিনয়ের কৃতিত্বে বিশেষভাবে উল্লিখিত হবার দাবি নিশ্চয়ই রাখেন। নাটক-মাত্রেই অভিনয়ের সার্থকতা অর্জন করে প্রত্যেকটি নট-নটীর সামগ্রিক ও সমন্বিত অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে—যাকে বলি 'টিম্-ওয়ার্ক।' 'বহুরূপী'র বেলাতেও তাই তার অভিনয়ের বিশেষত্বের মূলে আছে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিভা নয়, সমগ্রভাবে প্রত্যেকের যুক্ত প্রয়াস ও উৎসাহিত উদ্যম। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মত সুদক্ষ আর অভিজ্ঞ অভিনেতার পাশাপাশি যখন গীতা ভাদুড়ীর মত একেবারে নবাগতা কিশোরী অভিনেত্রীও দর্শকের মনে স্থায়ী দাগ কেটে দেন, তখন আশ্চর্য হয়ে উপলব্ধি করতে হয় যে নাট্যকলার মূল সূত্রই হচ্ছে অভিনয়ে সমগ্রের সম-বিকাশ, একজন ক্ষমতাবান অভিনেতাকে কেন্দ্র করে বাকি সকলের মন্দ-আবর্তন নয়—যেটা দেখতে বাঙালী দর্শকরা সচরাচর অভ্যস্ত। প্রযোজনার ব্যাপারেও দেখা গেল টেক্‌নিক্যাল খুঁটিনাটির দিকে সচেতন আর সদাজাগ্রত এক অখণ্ড মনোযোগ, যার ফলে সমস্ত নাটকটা পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। মঞ্চের ওপর প্রত্যেকের নিজের আর পারস্পরিক প্রত্যেকটি অ্যাক্‌শন আর চলাফেরা সুনির্দিষ্ট এবং ব্যঞ্জনাময়—যেমন, 'পথিক'-এ রাস্তু ধরের সাইকেলের পাম্প

নিয়ে স্টেজে ঢোকা, যাতে সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করে নেওয়া গেল তাঁর সাইকেলে আসার ব্যস্ততা। একজনের কথার পিঠে অন্যের কথা (cross-dialogues) চলে আসছে সাবলীলভাবে—যেমন, 'উলুখাগড়া'র আগাগোড়া সংলাপে। মঞ্চসংস্থান বা স্টেজ কম্পোজিশন-এর কল্পনাময় রচনা—যেমন, 'ছেঁড়া তার' -এর শেষ দৃশ্যে রহিমুদ্দির মৃতদেহ ঘিরে শোকার্ত আর-সকলের একেবারে পেছনে চালাঘরের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে শিশু বসিরের কান্না : এ-যেন স্টেজের ওপর 'ক্লোজ্-আপ্' এনে ফেলা, সকলের মধ্যে থেকেও বসির যে কত অসহায় আর একা, সেই অনুভূতি দর্শকের আবেগকে অদ্ভুত রকম বাড়িয়ে তোলে। 'ছেঁড়া তার'-এর একটা দৃশ্য-পরিবর্তন (৩য় অঙ্ক, ১ম-২য় দৃশ্য), যেখানে রহিমুদ্দী মহিমের বাড়ি থেকে তার গ্রামের বাড়ীতে ফিরে আসছে, যেমন অভিনব তেমনি সুন্দর। এই সবদিক থেকেই পরিচালকের কৃতিত্বে আশ্চর্য হতে হয়। মঞ্চসজ্জাকে কিছুটা ইঙ্গিতধর্মী করার চেষ্টাটাও একটা পরীক্ষা হিসেবে উল্লেখযোগ্য—যেমন, স্টেজের পেছনে কালো-পর্দার গা ঘেঁষে গাছগাছালির ছবি আঁকা নিচু আর একটানা লম্বা কার্ডবোর্ড বসিয়ে গ্রাম-দিগন্তের কল্পনাকে জাগানো, ইত্যাদি। প্রযোজনার এই সব টেক্নিক্যাল ব্যাপারগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাপস সেনের আলোকসম্পাত : কুশলী আলোকসম্পাতের ফলে দর্শকের মনে নাটকের প্রতিক্রিয়া যে কতখানি বাড়িয়ে তোলা যায়, সেটা তিনি সার্থকভাবে প্রমাণ করেছেন।

তারপর আসে নাটকের কথা। 'পথিক', 'উলুখাগড়া' আর 'ছেঁড়া তার' —এই তিনটির মধ্যে শেষেরটিই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি অভিনন্দন পেয়েছে দর্শকসাধারণের কাছ থেকে। তার কারণ, এই তিনটির মধ্যে 'ছেঁড়া তার' -এর রচনা সবচেয়ে সার্থক, বিষয়বস্তু সবচেয়ে বাস্তব আর আমাদের অভিজ্ঞতার সবচেয়ে কাছাকাছি। বলা বাহুল্য, কিছু কিছু রচনার দুর্বলতা সব কটি নাটকেই আছে এবং খুঁত ধরার জন্যে তৈরি মন নিয়ে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা মোটের ওপর সব মিলিয়ে 'বহুরূপী'র বিপুল সার্থকতা দেখে মোটেই খুশি হতে পারেননি। 'ছেঁড়া তার'-এর নায়ক রহিমুদ্দি উত্তরবঙ্গের এক গ্রামের চাষী—একদিকে যেমন তার মধ্যে আছে গান-বাজনার প্রতি অনুরাগভরা একটি শিল্পীমন, অন্যদিকে সে তেমনি দাঁড়াতে জানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া খাড়া করে। গ্রামের জোতদার হাকিমুদ্দির শয়তানীর জাল যখন তাকে ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়েছিল, তখন সে তার বিরুদ্ধে লড়াই

করে দিতেছিল। কিন্তু পরে একজন শয়তানের লোভের পেছনে ওইরকম আরও অনেক হাকিমুদ্দির যোগাযোগে গত তেরশ' পঞ্চাশের আকাল যখন এল তার ভয়ংকর নৈর্ব্যক্তিকতায়, তখন হল তার প্রথম পরাজয় অন্তত বৌটা যাতে হাকিমুদ্দিদের "সরকারী" লঙ্গরখানায় খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে, তারজন্যে সে ফুলজানকে তালাক দিয়ে শিশু বসিরকে নিয়ে চলে এসেছিল শহরে, ভেবেছিল এ সমস্ত দুর্যোগের পর আবার সে নতুন করে সংসার গোছাবে ফুলজান আর বসিরকে নিয়ে। কিন্তু তারও পরে, আরও বড় আঘাত আসার অপেক্ষায় ছিল—অন্ধ ধর্মের আর সামন্ত-ব্যবস্থার জের টেনে চলা সামাজিক কুসংস্কারের শ্বাসরোধী মূঢ়তা—যার অনুশাসনে রহিমুদ্দি ফুলজানকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না যতক্ষণ না আর কেউ তাকে নিকে করে তালাক দিচ্ছে। যে-ধর্মের অর্থহীন অনুশাসন মানুষের মনের ধর্মকে পিষে মারে, তার সঙ্গে হাকিমুদ্দিদের লোভের পৈশাচিকতা যুক্ত হয়ে গুঁড়িয়ে দিল রহিমুদ্দিকে, আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে ঘটল তার চরম পরাজয়। গত দুর্ভিক্ষের সময়কার গরীব মুসলিম চাষী-জীবনের এ এক অতিসাধারণ মর্মান্তিক ঘটনা। কিন্তু এটাকে শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ী আশ্চর্য সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর নাটকে। আর-কেউ যে এটাকে সাহিত্যে রূপ দেননি, এমন কি মুসলিম লেখকরা পর্যন্ত না, সেটা মনে পড়ায় বিস্মিত হতে হয়। একটা কথা উঠেছে —রহিমুদ্দির মত এমন একজন সংগ্রামী চাষীকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করিয়ে নাট্যকার সুবিচার করেননি। এর সংক্ষিপ্ত উত্তর: সেইটাই হচ্ছে আজকের দিনের গ্রাম-বাঙলার সামাজিক রিয়ালিটি। অবশ্যই আরও বড় রিয়ালিটি এই-যে, এই সমস্ত পরাজয়ের মধ্যে দিয়েই রহিমুদ্দিদের দল আজ ক্রমশই এক দুর্নিবার শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে হাকিমুদ্দিদের চক্রান্ত আর অন্ধ ধর্ম-সংস্কারের মূঢ়তার বিরুদ্ধে, কিন্তু তার ইঙ্গিত কি নাট্যকার একেবারেই দেননি শ্রীমন্ত-গোবিন্দ-মামুদদের চেতনার মারফৎ? নিশ্চয়ই দিয়েছেন এবং সে চেতনাকে তার চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে তুললে সেটা হত নাট্যকারের ইচ্ছা-পূরণ। তুলসী লাহিড়ী মশাই যে সংযত সাহিত্যিক সততার পরিচয় দিয়েছেন 'ছেঁড়া তার'-এ, তার জন্যে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

'পথিক'-এর নাটকীয় মর্মবস্তু বা theme কিন্তু একটা কোন বৈষয়িক সমস্যার ওপর সংহত হতে পারেনি, ছড়িয়ে গেছে—যাকে বলা যেতে পারে diffused হয়ে গেছে। বাঙলা-বিহারের পশ্চিম সীমান্তে এক কোলিয়ারি-

অঞ্চলে—কিন্তু কয়লার খনি থেকে অনেক দূরে—যশপালের চায়ের দোকান। এখানে এসে একে একে সমবেত হচ্ছে নাটকের বিভিন্ন চরিত্র—মাতাল আর খনি-মালিকের পৃষ্ঠপোষিত ইউনিয়নের সংগঠক সুদর্শন, পাদ্রী মেমসাহেবদের অনাথ-আশ্রমে শিক্ষিতা বিধবা তরুণী সুমিত্রা, সাহিত্যিক আর জীবনপথের পথিক অসীম রায়, যুদ্ধে-কাঁপা ইতর-ভদ্রলোক জমিদার নিকুঞ্জ গড়াই, কোলিয়ারি-অফিসের কয়েকটি কেরানী আর অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট রামু ধর, কয়েকটি বাউড়ী-কুলী, ইত্যাদি। প্রথম অঙ্কে কোন ঘটনা নেই, শুধু চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটানো, তাই তার গতি মন্থর আর দীর্ঘায়িত। দ্বিতীয় অঙ্কে একটা ঘটনা ঘটল: অনেক দূরে ভালুকসোঁধা কোলিয়ারিতে খাদ ধ্বসে পড়ে মারা গেল যশপালের সংসারের কাজে সুমিত্রাকে সাহায্য করে যে মেয়েটি সেই বুধনীর স্বামী। এখানে কাহিনীর দানা বাঁধার যে আভাস পাওয়া গিয়েছিল, তা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আভাসই থেকে গেল। বুধনীর স্বামীর মৃত্যুর ফলে খনি-মজুরদের মধ্যে বিক্ষোভ জাগল, ক্ষতিপূরণের টাকা ফাঁকি দেবার জন্যে মালিকের ষড়যন্ত্র ফাঁস হল, অসীম রায় হঠাৎ জড়িয়ে পড়ল সেই আন্দোলনে—এ সবই হল, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নয়, অনেক দূরে খনির আওতায়। আর এই চায়ের দোকানে তার যেটুকু আওয়াজ এসে পৌঁছায়, তারই প্রতিক্রিয়ায় কে কিভাবে তার নিজের নিজের পথ বেছে নিল, তাই দেখানোর চেষ্টা ছিল তৃতীয় অঙ্কে কিন্তু একে ত মূল ঘটনাটাকে বহুদূর নেপথ্যে রাখার ফলে দৃশ্য অংশের চরিত্রগুলো সবই (বুধনী আর রামু ধর ছাড়া, কারণ তারা নাটকের ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত) কাহিনীর কেন্দ্র থেকে বহির্গামী—যাকে ইংরেজি নাটকের পরিভাষায় বলি centrifugal charactere; তার ওপরে শেষের দৃশ্যে সিংড়া সিংয়ের আবির্ভাবের মেলোড্রামা—যে দুর্ধর্ষ ডাকাত সিংড়া সিং পূর্বজীবনে ছিল অসীম রায়ের বন্ধু আর জীবনরহস্যমুগ্ধ ভাবুক আনন্দ—এটা যেন নাটকের সমস্ত সূত্রগুলোকেই গুলিয়ে দেয়। নাটকীয় সংঘাত বেঁকে-চুরে পাশ কেটে গেল, প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল না—রচনার দিক দিয়ে 'পথিক'-এর দুর্বলতা এইখানে। কিন্তু তাই বলে তার সার্থকতা নেই, তা নয়। বর্তমানে চলতি বাঙলা নাটকগুলোর মধ্যে আর কোন্‌টিতে আছে কয়লাখনি আর মজুর-আন্দোলন নিয়ে এমন দুঃসাহসিক বিষয়ের অবতারণা? সুদর্শনের মারফৎ আজকের মালিকদের "জাতীয়" মজুর-রাজনীতির স্বরূপের এমন নির্মম উদ্‌ঘাটন? সিংড়া সিংকে

মালিকপক্ষ যে টাকা খাইয়ে নিযুক্ত করেছিল অসীম রায়কে হত্যা করার জন্যে, এ সত্যটা এমন একটা তীব্রতার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে যে দর্শকের ঘৃণাটা শুধুমাত্র সুদর্শনের ওপরেই আর সীমাবদ্ধ থাকে না। এটা নাটকের স্বপক্ষে একটা মস্তবড় কথা।

সেই একই স্বরূপের আর এক দিক উদ্ঘাটনের ব্যাপারেই 'উলুখাগড়া'র আংশিক সার্থকতা : ক্ষমতার আসনে গদীয়ান হবার লক্ষ্যে খদ্দরের পলিটিক্স করে এসেছেন দেবব্রতবাবু এবং সেই গদী বাগাবার লক্ষ্যেই প্রেমের ধাপ্পা দিয়ে বিয়ে করেছিলেন করুণাকে যাকে ভালবাসার সম্মান দেননি কোনদিন। তঁাদের ছেলে বিনোদ—সিনিক, দায়িত্বজ্ঞানহীন, এই সমাজের গ্লানির দিক সম্বন্ধে সচেতন হলেও সে তার বিরোধী নয়। তার বন্ধু সুরেশ হচ্ছে কর্মী, এই সমাজব্যবস্থাকে বদলে নতুন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সে কাজে নেমেছে। কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে 'উলুখাগড়া' শেষ পর্যন্ত নঙর্থক থেকে গেল। তার প্রয়োজনার ব্যাপারে টেক্‌নিক্যাল উৎকর্ষ যতই থাক, তার নাটকীয় উপাদানকে বেশ খানিকটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে উপস্থিত (over-dramatize) করা হয়েছে, রচনার দিক থেকে তার মধ্যে অগভীরতা থেকে গেছে। তবু, দেবব্রতবাবুদের শ্রেণীগত অন্তঃসারশূন্যতা উপভোগ্য করে ফোটানো হয়েছে 'কমিক স্ট্রিপ্‌স্'-এ হ্যামলেট-পড়া আধুনিকা মেয়ে নীনা থেকে অশিক্ষিত বনেদী ধনী পাঁচুবাবুর প্রেমের হ্যাংলামি পর্যন্ত অনেক কিছুর মধ্যে দিয়েই।

'বহুরূপী'র নাট্যোৎসবে যেটা সবচেয়ে গভীরভাবে দর্শকের মনে রেখাপাত করেছে, সেটা হচ্ছে 'ছেঁড়া তার'-এ ফুলজানের ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রের অনবদ্য আর মর্মস্পর্শী অভিনয়।

রবীন্দ্র মজুমদার

শিল্পী-ছাত্র ধর্মঘট

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে গত ডিসেম্বর মাস থেকে ছাত্র-ধর্মঘট শুরু হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম শিল্পী-ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবি বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়ে দ্রুত এই অপ্রীতিকর অবস্থার অবসান ঘটাতে এগিয়ে আসবেন।

কিন্তু বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের সঙ্গে আপস-আলোচনার পরিবর্তে জনসাধারণের কাছে বিভ্রান্তি পরিবেশনে তৎপর হয়ে উঠেছেন, ছাত্রদের বিরুদ্ধে প্রতি আক্রমণ শুরু করেছেন। এই অবস্থায় বাঙলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সহযাত্রী হিসাবে আমরা শিল্পী-ছাত্র বন্ধুদের ন্যায়সঙ্গত দাবি সমর্থন করছি এবং বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

অনেক দিন আগে থেকেই ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের পরিচালন-ব্যবস্থার বহু গলদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এর উপর আবার যখন শুনি শিল্পী-ছাত্রেরা সামান্যতম রঙ তুলির অভাবে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন অনেক দিন তখন সত্যিই দুঃখ হয় শিল্প-কেন্দ্রের মালিকদের ব্যবসায়ী-সুলভ মনোবৃত্তি দেখে। যে দেশে শিল্প চর্চা একেবারে সীমাবদ্ধ, দুঃখ-জর্জর মধ্যবিত্ত সন্তানের শিল্পীমন যেখানে হাটের ভিড়ে হারিয়ে যায় কৈশরোত্তরে, সেখানে শত-সহস্র বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে, অর্থনৈতিক নিষ্পেষণকে অগ্রাহ্য করে যে সব তরুণ মন ব্যাকুল হয়ে ছুটে যায় শিল্প-সাধনার বন্ধুর ক্ষেত্রে সেখানে তাদের সম্পর্কে এই অবিচার ও অবহেলা অমার্জনীয় নয় কি?

ছাত্রদের প্রধানতম দাবি 'ছাত্র ইউনিয়ন গঠন'—যা বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ কিছুতেই নাকি মানতে রাজি নন। ভাবতে অবাক লাগে, যে দাবি নিয়ে ছাত্র-আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে আলোড়ন শুরু হয়েছিল বাঙলা দেশে, যে দাবি আজ প্রতিটি স্কুল-কলেজে কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নিয়েছেন সেই ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক দাবির প্রতি আর্ট স্কুলের কর্তৃপক্ষ এত বিমুখ কেন? ইতিমধ্যে বাঙলার বহু খ্যাতনামা শিল্পী ছাত্র-শিল্পীদের দাবির পিছনে বলিষ্ঠ সমর্থনে সংঘবদ্ধ হয়েছেন দেখে আমরা আশান্বিত, এবং বিশ্বাস করি, ক্ষীয়মাণ বাঙলা-শিল্পের ক্ষেত্রে যে সব তরুণ শিল্পী এখনও পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে নারাজ, এখনও পর্যন্ত যাঁরা একাগ্র সাধনায় রত তাঁদের অভাব-অভিযোগের প্রতি বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ সুবিচার করে বাঙলা শিল্পের প্রতিই সুবিচার করবেন।

ধনঞ্জয় দাশ

মুক্ত সাহিত্যিক রাজবন্দীদের সংবর্ধনা

গত ১লা জানুয়ারী কলকাতায় 'পরিচয়'-এর পক্ষ থেকে এক বৈঠকে সন্তমুক্ত সাহিত্যিক রাজবন্দীদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী ভট্টাচার্য প্রভৃতি সভায় উপস্থিত থেকে সমবেত বন্ধুজনের অভিনন্দন গ্রহণ করেন।

'পরিচয়ে'র অন্যতম সম্পাদক সুশীল জানা মুক্ত সাহিত্যিকদের অভিনন্দিত করে প্রগতিশীল শিল্পীর গৌরবময় দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আজ সাহিত্য রাজনীতির ছোঁয়াচ এড়িয়ে বাঁচতে পারছে না। বিবেকবান্ সাহিত্যিকের সত্যসন্ধানী রচনা প্রয়াস আজ তাই বার বার রাষ্ট্রিক নিপীড়নের সম্মুখীন। যে সব সাহিত্যিকদের জেলে পোরা হয়েছিল নানা আশ্চর্যজনক এবং অপ্রমাণিত অছিলায়, তাঁরা সকলেই সত্যভাষণের অপরাধে —অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অপরাধেই অপরাধী। আজ তাই প্রত্যেক সাহিত্যিক এবং শিল্পীর আপন আপন দায়িত্ব সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এসেছে।

প্রগতিশীল লেখকদের তরফ থেকে গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও মুক্ত সাহিত্যিকদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর মনোজ্ঞ ভাষায় তাঁর কারাজীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। কৃষক কর্মী এবং শ্রমিক কর্মীদের সঙ্গে সুদীর্ঘ ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে তাঁর মনে হয়েছে যে, প্রগতিকামী সাহিত্যিককে অধিকতর আন্তরিকতার সঙ্গে গণজীবনের শরিক হতে হবে; মানুষকে আরও নিবিড় ভাবে জানতে হবে। তাঁদের ভাষা শিখে, আপন সাহিত্যিক প্রয়াসকে আরও লোকপ্রিয় করে তুলতে হবে

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সূর্য রায়, বিষ্ণু দে, সমর সেন, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বরেন বসু, মণীন্দ্র রায়, খালেদ চৌধুরী, সুপ্রভাত নন্দন প্রভৃতি এবং বহু বিশিষ্ট তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকগোষ্ঠী

'পরিচয়'-এর নবতম পর্যায়

"পরিচয়ে"র শ্রাবণ ১৩৫৭ সংখ্যায় "আলোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে "পরিচয়ে"র নতুন পথের যে খসড়া দেওয়া হয়েছে: "পরিচয়ে"র পাঠকদের আহ্বান জানান হয়েছে সে সম্পর্কে মতামত দিতে। পাঠকদের সমালোচনা এবং নির্দেশ নিয়েই নাকি পূর্ণাঙ্গ পথের সন্ধান মিলবে।

সেই পূর্ণাঙ্গ পথের সন্ধানে একজন পাঠকের সমালোচনা এবং নির্দেশ হিসেবে এই পত্র লিখতে উৎসাহিত হয়েছি।

প্রথমে একটা কথা বলে রাখি, সম্পাদনার নামে লেখা কেটে ছেঁটে ছাপার বদভ্যাস পরিচয়ের বরাবর ছিল, আজও আছে। আপনাদের নতুন পথের প্রথম পদক্ষেপের মধ্যেও তার পরিচয় আছে। এ বদভ্যাসটা ছাড়া দরকার। ব্যাঙ্কের কাউন্টারের ভিতরের বাবুরা যেমন বাইরের লোকগুলোকে যন্ত্রণা দেওয়ার সুযোগ ছাড়ে না এবং সেই লোভে অনেক সময় অধিকার বহির্ভূত কাজ করে ক্ষমতা দেখায়, সে রকম কাণ্ড না হয়, অন্তত সেটা দেখা দরকার।

এ চিঠিতে আমি করতে চাইছি সমালোচনা এবং আলোচনা। এতে কাটাকুটি করলে সেটা 'ইন্দোচায়না'র জায়গায় 'ইন্দোনেশিয়া' করার চেয়ে মারাত্মক হবে। সেটা করবেন না।

প্রথমে গোলাম কুদ্দুস এবং সুরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতভেদটার কথা ধরা যাক। দুজনের ভাষার ভেতরই ঝগড়ার গন্ধ আছে, আর ঝগড়ার ক্ষেত্রে যেমন মানুষ ঠিক সুচিন্তিত বক্তব্যটি গুলিয়ে ফেলে—এ ক্ষেত্রেও তার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

তাছাড়া দুজনেরই কিছু ভুল আছে বলেও মনে হয়, যেগুলো সংশোধিত হলে দুজনেই একমত হতে পারেন, ভারতের বাস্তব অবস্থার ওপর মার্কস-বাদের প্রয়োগের ভিত্তিতে।

(১) জনাব কুদ্দুস "সাম্রাজ্যবাদে"র বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথাও বলেছেন—অথচ সুরাজবাবু সমালোচনায় বলছেন: ভারত যে আসলে সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ সে কথা অস্বীকার করা হয়েছে। তবে কি কুদ্দুস সাহেব ভারতের পরদেশ অধিকারের মতন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে বলেছেন? এখানে সুরাজবাবুর ঝগড়ার মনোভাব-প্রসূত অতিরঞ্জন প্রকাশ হয়েছে।

(২) কুদ্দুস মার্কসবাদী সতীর্থদেরই সমালোচনা করেছেন আত্ম-সমালোচনারূপে। অথচ বলছেন তাঁদের মধ্যে সুরাজবাবুর মতন লোকেরা—শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব এবং শ্রেণী সংগ্রামকে পাকে-চক্রে অগ্রাহ্য করে ধনী-কৃষক, মাঝারি শিল্পপতি বা মুষ্টিমেয় তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে মিলে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের ভাঁওতা দিচ্ছেন।

সত্যিই কি এমন কেউ আছে কুদ্দুস সাহেবের সতীর্থদের মধ্যে? যদি থাকে, তাহলে তাঁরা ভাঁওতাবাজই বলতে হবে। কিন্তু ঠিক ঐ রকমের লোক আছে বলে ত মনে হয় না। বর্তমান মতভেদেব মূলকথা হচ্ছে, সংগ্রামী জনতার সম্মিলিত ফ্রন্টের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা, ধনী কৃষক বা "মাঝারি শিল্পপতি"রা থাকবে কি না? এরা থাকলে যে শ্রেণী সংগ্রামটা মিইয়ে যাবে, এই ভয় থেকেই এই মতভেদ। মাও সে-তুঙ-এর পথের অনুসরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের ধারণাই এ মতভেদের মূল

বুদ্ধিজীবীরা ৯।১০ জন ছাড়া প্রধানত একটা শোষিত শ্রেণীই, সুতরাং তারা এই ফ্রন্টের একটা শক্তি বৈকি! গোলাম কুদ্দুস সাহেবের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বুদ্ধিজীবীই ত প্রধান—আর তার মধ্যে লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিক একটা তুচ্ছ শক্তি নয়—বস্তুত লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকের যে একটা দল প্রতিক্রিয়ার শিবিরের শক্তি, তারই বিরুদ্ধ-শক্তি এই প্রগতিশীলেরা। তাদের ভূমিকার গুরুত্ব নিশ্চয়ই কুদ্দুস সাহেব অস্বীকার করবেন না—যদিও তাঁর লেখার মধ্যে ঝগড়ার মনোভাবের ফলে এই গুরুত্ব খানিকটা অস্বীকার করা হয়েছে।

কিন্তু সুরাজবাবু বলেছেন,—"লেনিন-স্টালিনের শিক্ষা জনাব কুদ্দুস শুধুমাত্র মুখস্থ করেছেন।" অত্যন্ত রাগ না হলে তিনি কথাটা আধা-ছিটলারী ভাষায় বলতে পারবেন কিনা সন্দেহ। তিনি যে বুর্জোয়াদের "আমলাতান্ত্রিক" এবং "জাতীয়" এই দুই ভাবে ভাগ করেছেন—সেটাই কি

নেহাৎ মুখস্থ বিদ্যা নয়, একটা সাম্প্রতিক মুখস্থ বিদ্যা ? আমাদের মতন অজ্ঞ সাধারণ লোক কি ঐ দুটো বিশেষণের সাহায্যে ঠিক চিনতে পারে, সুরাজবাবু ঠিক কাদের কাদের মনে করে বিশেষণ দুটে ব্যবহার করেছেন ? বুর্জো-ক্রাটিক আর ন্যাশনাল ক্যাপিটালিস্ট কথাগুলোর খাঁটী বাঙলা করে দিলেই কি বোঝা যায় ?

বস্তুত "আলোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে ঠিক বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে বুর্জোয়াদের মধ্যে কাদের সঙ্গে টেনে নিতে হবে। সেখানে "ধনবাদের উপরতলার অংশ", "একচেটিয়া ধনবাদ"—এদের বিরুদ্ধে "মাঝারী শিল্পপতি"দের সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। এই মাঝারী শিল্পপতি কথাটার পরিবর্তে পেটি-বুর্জোয়া কথাটা বোধ হয় আরও পরিষ্কার। উপরতলার একচেটিয়া পুঁজিপতিরা সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় কোলাবোরেটর, গণশোষক—আর বর্তমান যুগে পেটি-বুর্জোয়ারাও কতকটা শোষিত বটে এবং যতটা শোষিত, ততটা গণ-ফ্রন্টের দিকে আকৃষ্ট। এই জন্মেই গণফ্রন্টে তাদের টেনে নেওয়ার কথা ওঠে।

(৩) শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব সম্বন্ধে কুন্দুস সাহেব এবং সুরাজবাবুর মধ্যে মতভেদ নেই। কিন্তু দুজনেই কথাটা বলেছেন এমনভাবে—যেন অপরজন সে কথাটা অস্বীকার করে। ঝগড়ার মনোভাবের ফল।

কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব কথাটা যেন জলের মতন সহজবোধ্য ; এঁরা দুজন এবং এঁদের দুই গোষ্ঠী, কারো মুখেই কোনদিন কথাটার ব্যাখ্যা শুনিনি। ব্যাখ্যাটা সবাই এড়িয়ে যান বলেই মনে হয়—অথচ কথাটা শুনতে শুনতে কর্ণপটহে খাঁটা পড়ে গেল।

ধরে নিচ্ছি, সকলেই ঠিক বোঝেন। কিন্তু কেউ বলেননি বলে আমি এই সুযোগে বলে ফেলতে চাই। কারণ একবার কারও বলা দরকার, বললে আলোচনা শুরু হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত একটা মহাপ্রয়োজনীয় কথা সকলেই বুঝতে পারে।

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব কথাটা এমন ভাবে বলা হয়, যেন লেবার লীডারদের বিপ্লবের সেনাপতিত্ব বা কারখানার শ্রমিকদের লড়াইয়ের ফ্রন্ট লাইনে থেকে তোপ দাগা। কথাটা বুঝতে হলে সংগ্রাম পদ্ধতিটা এবং তার পিছনের মতবাদটা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দরকার।

শ্রমিকদের সমস্যা যে মজুরী, ছুটিছাটা, সোশ্যাল ইনসিওরেন্স, কমপেন-

সেশন ছাড়া আর কিছুই নয়, একথা যারা বলেন, তাঁদের আইডিয়াকে মার্কস-বাদী ভাষার বলে ইকনমিজ্‌ম। ওর মধ্যে শ্রমিকের সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা নেই, কারণ ওতে শ্রমিককে চিরন্তন কলের কুলি করেই রাখার ব্যবস্থা হবে। শ্রমিক যে মানুষ, নাগরিক, সমাজের ধনোৎপাদকদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী, শ্রমিককে ঠিক তার ন্যায্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামোই বদলানো দরকার—এবং তার অর্থ যে রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সে ক্ষেত্রেও যে তার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, যন্ত্র, রেল টেলিগ্রাফ, বৈদ্যুতিক শক্তি শিল্পকেন্দ্র ও সহরগুলো, যা কিছু শত্রুর শক্তির মূল, সেগুলো বিপ্লবের স্বপক্ষে কাজ করতে পারে না, যদি না শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবী হয়, এবং যেহেতু শ্রমিক বিপ্লবের লক্ষ্য মানুষকে তার ন্যায্য আসনে বসান, সুতরাং সকল মানুষেরই স্বার্থরক্ষা—নিজেরা রাজা হয়ে অন্য শ্রেণীকে গোলাম বানানো নয়, এই হচ্ছে মার্কসবাদীদের কথা।

সেই জন্য শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকদের দাবির মধ্যে রাজনৈতিক দাবিও থাকবে এবং সেইটেই ধনিকদের পক্ষে মারাত্মক কিন্তু বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে—অবস্থানুযায়ী নির্ভুল স্লোগান এবং কর্মসূচীর সাহায্যে। শক্তির আসনে যে শত্রুর দল প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তাদের উচ্ছেদের জন্য তাদের বিরোধী সকল দলকে সম্মিলিত ফ্রন্টে টেনে নিতে হবে এবং তার জন্য দাবি, স্লোগান, অ্যাকশন এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে সংগ্রাম এগিয়ে যায়, যাতে বিপ্লবের আসল শক্তি দরিদ্র কৃষক এবং মজুর শত্রুর অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে সংগ্রামে এসে জমে এবং সম্মিলিত ফ্রন্টের মধ্যের বাজে মাল, প্রতিক্রিয়াশীল লোকগুলো ঝরে পড়তে থাকে। এই ভাবে বিপ্লব এবং প্রতিক্রিয়ার শিবির পরিষ্কার দু'ভাগ হয়ে গিয়ে সংগ্রামের মধ্যেকার জটিলতা এবং গোঁজামিল দূর হয়ে বিপ্লব পেকে উঠবে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থা বা ঘটনাবলীর যোগাযোগে সুযোগ এলেই বিপ্লব শুরু হবে। আজকের সংগ্রামকে কালকের বিপ্লবে রূপান্তরিত করার এই কাজটা মার্কসবাদী বিপ্লবী শ্রমিকদের অগ্রবর্তী দলেরই দায়িত্ব এবং তারাই সেটা পারে। এ ছাড়া বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব আর কিছুই নয়। মিটিং করে ঠিক করা কে লীডার হবে, ব্যাপারটা এ ধরনের গাঁজাখুরী নয়।

আর একটা কঠিন কথার অবতারনার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারছি না। সে হচ্ছে শ্রমিক, সাহিত্যিক এবং স্টালিন সম্বন্ধে মানিকবাবু এবং

শীতাংশুবাবুর কথাগুলো। কথাটা হচ্ছে, ওঁদের ধারণা মার্কসবাদী সোভিয়েটের সম্বন্ধে, একেবারে ঘোলা, অ আ-ক-খ থেকেই। আমার কথাটা কঠিন হয়ে গেল, কিন্তু আরও কঠিন আছে। কার ধারণা যে ঠিক, তা ভগবানই জানেন—যদি তিনি মার্কসবাদ বোঝেন। কিন্তু ওঁদের সমালোচনা না করে আমি কিছু অ-আ-ক-খ'ই বলতে চাই, যিনি পড়বেন, তাঁর মঙ্গল হবে।

শ্রমিক আর প্রোলেটারিয়েট কথা দুটো আমরা অনেক সময় ঠিক এক অর্থে ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। বর্তমান সোভিয়েট দেশে শ্রমিক আছে, প্রলেটারিয়েট নেই। অনেকে ঠিক করে রেখেছেন প্রোলেটারিয়েট হচ্ছে ফ্যাক্টরি শ্রমিক। সেটাও ঠিক নয়। রুশিয়ায় ফ্যাক্টরি শ্রমিক আছে, প্রোলেটারিয়েট নেই। অনেকে প্রোলেটারিয়েট কথাটার মানে ঠিক করে রেখেছেন সর্বহারা শ্রমিক। তাঁরা অনেক সময় শ্রমিকদের সংগ্রামকে সর্বহারাদের সংগ্রাম বলেন। জোট পাকানো সুতোর মতন একটা বিরাট জোট পাকানো ভুল তাঁদের মাথায় বাসা বেঁধে থাকে। শ্রমিকরা প্রোলেটারিয়েট এবং প্রোলেটারিয়েটরা সর্বহারা—সুতরাং শ্রমিকরা সর্বহারা। একটা প্রাথমিক জ্যামিতির হিসেব।

প্রথমত সর্বহারা কথাটার ভেতর একটা করুণ রস, কাঁদুনির সুর আছে। কথাটার মধ্যে আমাদের মুরুব্বীয়ানার আত্মপ্রসাদও আছে যে দেশে বুর্জোয়া নেই সে দেশে প্রোলেটারিয়েটও নেই। প্রোলেটারিয়েটরা সর্বহারা বললে হঠাৎ মনে হতে পারে বড়লোকদের মতন ওদের প্রপার্টি নেই এইটেই অন্যায়। বুর্জোয়া প্রপার্টি সোভিয়েট দেশে কারোই নেই, কিন্তু কেউই সর্বহারা নয়। নিঃস্ব শ্রমিক কথাটা সর্বহারার চেয়ে ভালো—করুণ রস নেই অথচ ফ্যাক্টরি প্রোলেটারিয়েটই বোঝায়।

সোভিয়েট রুশিয়ায় "ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রলেটারিয়েট" চলেছে কতকাল, আর রুশিয়ায় প্রোলেটারিয়েট নেই? না মশায়, নেই। যতদিন সোভিয়েট সমাজে বুর্জোয়া এলিমেণ্ট ছিল, ততদিন তাদের পাল্টা বিপ্লবের ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনাকে দাবিয়ে রেখে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন এবং বণ্টনের ব্যবস্থা করে সেই বুর্জোয়া এলিমেণ্টকে নস্যাৎ করে দিয়ে ১৯৩৬ সালে 'ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রোলেটারিয়েটে'র প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে, নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করে রুশিয়ায় হয়েছে "পিওর ডেমোক্রেসি", যেটা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক-ওয়ালারা বলে, বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই হওয়া উচিত।

বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদ বলে, সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে যে সময় লাগে, সেই সময়টা জুড়ে সেই সমাজতান্ত্রিক সংগঠনকে পরাজিত বুর্জোয়াদের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচানর জন্য একদিকে বুর্জোয়াদের ভোট এবং অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের সম্বন্ধে অটোক্রেসি চালানো, এবং জনগণের সম্পর্কে সম্পূর্ণ ডেমোক্রেসি গড়ে তোলা—এর উপযুক্ত একটা রাষ্ট্রযন্ত্র বিপ্লবী শ্রমিকদের হাতে থাকা চাই এবং সেইটেই হচ্ছে 'ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রোলেটারিয়েট'।

আজ রুশিয়ায় বুর্জোয়া নেই, কাজেই প্রোলেটারিয়েট নেই, কাজেই ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রলেটারিয়েটও নেই। উৎপাদনের উপায় ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যক্তিগত মালিকানা উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন সকল মানুষের ভোগের সব প্রয়োজনীয় জিনিস—সম্পত্তির পর্যন্ত, সকলেই পেয়েছে, তেমনি প্রোলেটারিয়েট উবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই শ্রমিক পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। মানিকবাবু, শীতাংশুবাবুর মতন লেখক এবং স্বয়ং স্টালিন্ শ্রমিক পর্যায় ভুক্ত।*

মানুষের খেয়ে পরে বেঁচে থাকা চাই—তার জন্যে উৎপাদন চাই, বণ্টনের ব্যবস্থা চাই, শিক্ষা-রুচির উন্নতি ও বিস্তার চাই, আত্মরক্ষা-দেশরক্ষার শক্তি চাই, বিজ্ঞান চাই, শিল্প চাই, আরও কত কি চাই।

তার জন্যে অসংখ্য প্রকারের শ্রম চাই, পেশী, মস্তিষ্ক এবং দুইয়ের অসংখ্য অসংখ্য প্রকারের মিশ্রিত শ্রম চাই, সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম। সুতরাং শ্রমের দায়িত্বও আছে সকলেরই—শিশু, বৃদ্ধ, রোগী, পঙ্গু আর পাগল ছাড়া। সুতরাং এরা ছাড়া সকলেই শ্রমিক এবং শ্রমই আভিজাত্যের মাপকাঠি।

তাই আর্টিস্টদেরও ট্রেড ইউনিয়ন এবং পেনশন আছে, তাই স্টালিনকে গভর্নমেণ্ট সম্মানের উপাধি দেয় "হিরো অব সোশালিস্ট লেবার।"

---

* এঁরা কিন্তু লেখক বা দক্ষ শ্রমিক মাত্র। সাহিত্যিক শিল্পীরা ইন্টেলি-জেন্সিয়া বা বুদ্ধিজীবী বলে যখন অভিহিত হন, তখন সেটা হয় তাঁদের শ্রমের প্রকৃতির পরিচয় মাত্র। কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী এই তিনটে পরিচয় শ্রমেরই প্রকৃতির পরিচয়। প্রোলেটারিয়েট, শ্রমিক, সর্বহারা প্রভৃতির কথাগুলোর চলতি আপসা ধারণার জন্যেই বলতে হয় "স্টালিনও শ্রমিক নন"। আবার ঠিক ঐ কারণেই বলতে হয়, লেখকরা দয়া করে নিজেদের ডি-ক্লাস করলেই শ্রমিক হতে পারেন।

"স্টালিনও শ্রমিক নন" শীতাংশুবাবুর একথাটাও যেমন চমৎকার, শ্রমিকদের জন্যে সেবাধর্ম পালন করলেই শ্রমিকদের একজন মনে করলেই শ্রমিক হওয়া যায়, মানিকবাবুর একথাটাও তেমনি চমৎকার।

যাই হোক, আত্মসমালোচনায় নিষ্ঠা থাকলে জয় হবেই।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক ঐক্য চাই

১

'পরিচয়ে'র পৃষ্ঠায় সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক ঐক্য গঠন সম্বন্ধে আমার মতামত 'পরিচয়ে'র একজন পাঠক হিসাবে লিখে পাঠালাম।

সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের আদর্শগত নেতৃত্বে এই ঐক্য গঠনের পরিকল্পনাটিকে কাজে পরিণত করতে গিয়ে আপনারা যেন কতকগুলি ত্রুটির পরিচয় দিয়েছেন এই পরিকল্পনা প্রয়োগে। 'পরিচয়ের পথে' এ কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, পরিচয় "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে তার পাতায় স্থান দেবে।" কিন্তু গত কয়েকটি সংখ্যার রচনা-পরিবেশনা দেখে মনে হয় যে গত বছরের (গোলাম কুদ্দুস ও সরোজ দত্তের আমলের) বিপর্যয়ের ও বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদের রেশ আজও 'পরিচয়ে'র পাতায় সুস্পষ্টভাবেই থেকে যাচ্ছে। এ বিষয়ে 'পরিচয়ে'র তাদ্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দ কাড়ার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু দলগত কৌলিন্যের মনোভাবকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে না পারলে কোন ক্ষেত্রেই যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের জন্য চিৎকার করে কোন লাভ হবে না—আজকের বিশেষ সমস্যাগুলির পটভূমিকায় যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের সমস্যার কথাও সততার সঙ্গেই ভাবতে হবে। আমরা যদি আমাদের চেষ্টায় সদিচ্ছা ও সততার পরিচয় না দিতে পারি, তবে বহু প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী এই যুক্ত ফ্রন্টের বাইরেই থেকে যাবেন। এঁদের সহযোগিতা পাবার জন্য আপনাদের, অর্থাৎ 'পরিচয়ে'র পরিচালকমণ্ডলীকেও বিশেষ করে সচেষ্ট হতে হবে।

অগুন্তি বাঙলা পত্র-পত্রিকার মধ্যে দু'একটা বাদ দিলে 'পরিচয়'ই একমাত্র প্রগতিশীল পত্রিকা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের প্রয়াস বাঙলার প্রগতিশীল গণ-সংস্কৃতির আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে এই আমার বিশ্বাস। কিন্তু সমস্ত প্রগতিবাদী সাহিত্যিকের সহায়তা না

পেলে, এবং 'পরিচয়ে'র স্ট্যাণ্ডার্ড রচনা-সম্ভারের দিক দিয়ে আরও উন্নত করতে না পারলে, যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের আন্দোলন নিশ্চিতভাবেই অনেকখানি ব্যাহত হবে। 'পরিচয়ে'র নিয়মিত লেখকগোষ্ঠীর বহির্ভূত যে সমস্ত প্রগতিশীল লেখক আছেন যেমন, শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে, সুধীন দত্ত, সমর সেন, অতুল গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুশোভন সরকার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সরোজ আচার্য, গুভো ঠাকুর প্রমুখ (এঁদের মধ্যে অনেকেই ত কিছুদিন আগে পর্যন্ত পরিচয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এমন কি কেউ কেউ 'পরিচয়ে'র প্রথম উদ্যোক্তাও) তাঁদের সবাইকার সহযোগিতা যদি আপনারা পান তবেই সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের আন্দোলন অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হবে।

দীপক দাশগুপ্ত

২

'পরিচয়' নবতম পর্যায়ে যে নতুন আশা ও সম্ভাবনা নিয়ে প্রকাশিত হল তা মনে হচ্ছে সঠিক ভাবে সফল হচ্ছে না। 'পরিচয়' যেন কেমন 'দরিদ্র' হয়ে যাচ্ছে এর রচনাসম্ভার, বিষয়বস্তু, আঙ্গিক-সৌষ্ঠব সব দিক থেকে। একথা ঠিক 'পরিচয়ে'র ক্রমোন্নতি আর লক্ষ্য করছি না। 'পরিচয়ের পথ-এ' যে চীনের সাহিত্যের পথে দৃষ্টিপাত করালেন সকলকে, সেই চীনা সাহিত্য সম্পর্কে আমরা নিয়মিত পরিচিত হবার আশা রাখতে পারি না কি আপনাদের কাছ থেকে? 'পরিচয়' এখনও একটা সংকীর্ণ গোষ্ঠীর পত্রিকা থেকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। অন্যান্য মতাবলম্বী বা দলীয় অথচ যাঁরা 'পরিচয়ের পথে' চলতে চান তাঁদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহের জন্য আপনারা কি চেষ্টা করছেন? এটা না করলে, এই বাঁধ না ভেঙে দিতে পারলে বর্তমান 'স্তরের' যে বিরাট ভূমিকা রয়ে গেছে 'পরিচয়' তা সফলভাবে পালন করতে পারবে না বলে মনে হয়। 'পরিচয়ে'র মাধ্যমে আপনারা অনেকে কিছু করতে পারেন —দেশকে পথ দেখাতে, সাহায্য করতে। শান্তি আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের শ্রমিক, কৃষক, শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী মানুষের সামনে বাস্তবতার কষ্টিপাথরে তুলে ধরতে না পারলে তা হবে অন্তঃসারশূন্য। আপনারা প্রথমটা করছেন, শেষেরটা করছেন না।

গোবিন্দ কাঁড়

বার্নার্ড শ'র মূল্যবিচার

কার্তিকের "পরিচয়"-এ ও "নতুন সাহিত্যে" বার্নার্ড শ'র সাহিত্যিক মূল্যবিচার দেখলাম। "নতুন সাহিত্য" লিখেছে, "অর্জ বার্নার্ড শ বুর্জোয়া সংস্কৃতিরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র" (রবি দাস)। "পরিচয়" লিখেছে, "তাহলে শ'র নাটকের মূল্য আজ কী? বিষয়-মাহাত্ম্যে আজ তার মূল্য সামান্য…" (গোপাল হালদার)।

হয়ত আমার বোঝার ভুল। খুবই সম্ভব। তবু কয়েকটা কথা না তুলে পারছি না।

"Major Barbara"র সম্বন্ধে কি গোপালবাবুর এই কথাগুলো খাটে? Undershaftএর চরিত্রটা কি আজকের ধনতান্ত্রিক সমাজের শীর্ষস্থানীয় কারো স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে না? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সোভিয়েট দেশে আজকে Undershaftকে উদ্ধৃত করা হয় অনেক জায়গায়, যেমন কোরিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে armament kingsদের মনোবৃত্তি আলোচনা করতে গিয়ে; শান্তি সম্পর্কীয় প্রবন্ধে Undershaftকে তুলে ধরা হয় মার্কিনী যুদ্ধবাদীদের বোঝাবার জন্য। "নতুন সাহিত্য" লিখল,—"শ বুর্জোয়া সংস্কৃতিরই অন্যতম মুখপাত্র।" সোভিয়েট সমালোচক Alexander Akinst লিখেছেন "Sovietskoye Iskusstvo"এ (Soviet Art) :

"Over all his *positive* conclusions, there hovered the ideology of *petty-bourgeois* Fabian 'Socialism.' This is why, daring and ruthless as he was in his criticism of capitalist society, Shaw invariably, when the question of the path of social transformation arose, failed in the end to overcome *his petty-bourgeois limitations.*"

Alexander Fadeyev বলছেন :

"A great master of satire, a fervent exposer of all manifestations of v injustice, an advocate of human progress, Bernard Shaw has made an inestimable contribution to the treasury of world literature."

অথচ গোপালবাবু লিখেছেন—"বিষয়-মাহাত্ম্যে আজ তার মূল্য সামান্য।"

Maxim Gorky বলেছেন :

"One of the most courageous thinkers in Europe" (—at the height of his creative power).

'নতুন সাহিত্য' বা 'পরিচয়' কেউই শ'র সোভিয়েট-প্রীতি সম্বন্ধে লেখেনি। খুবই আশ্চর্য লাগে। এটা শ'কে ঐভাবে বাতিল করাটাই স্থির হয়েছে তাই সোভিয়েট সম্বন্ধে শ'র লেখা উল্লেখ করাটা contradictory হয়ে পড়ে বলেই কি ?

১৯৩১ সালে শ' লেখেন :

"The Russian solution of the question of democracy has shown that Soviet Russia is at least a century ahead of the capitalist world."

অনেক বড় বড় কথার ধারে কাছে না গিয়েও কি করে আপনারা ভুলে গেলেন যে, শ' শত হিসেবে Stalin-এর জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠিয়েছিলেন !

দু'টা পত্রিকাতেই শ'কে খেলো করার চেষ্টা করা হয়েছে—এই হল আমার অভিযোগ। বড় বড় কথা দুজনেই লিখেছেন—কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু নতুন বলা হয়নি। আবার আর্নিকন্ট-এর কথায়ই বলি :

"The weapon has not lost its edge, it will *for a long time to come* expose the enemies of mankind with its sharp satire, its *bold message of truth.*"

সরল পাত্র

মতামতের থলি

১

পরিচয়ের আমি একজন নিয়মিত পাঠক। পরিচয়ের রচনা-বিন্যাস সম্পর্কে কিছু আমার বলবার আছে। আপনাদের প্রবন্ধগুলি আর একটু সরস করে পরিবেশন করবার ব্যবস্থা করুন। রচনার মান উঁচু করতে গিয়ে তাকে দুর্বোধ্য করে ফেললে আমরা পাঠকরা যাই কোথায় বলুন ? ছোট গল্পের সংখ্যা যদি বাড়াতে পারেন ত বেশ হয়। মাঝে মাঝে দু'চারটে গণ সংগীতও ত পরিবেশন করতে পারেন। ছবি ছাপেন না কেন ? ছবি মানুষের মনকে সবার চাইতে আকর্ষণ করে ও অনুসন্ধিৎসার প্রেরণা যোগায়।

মানিক মুখোপাধ্যায়

২

অগ্রহায়ণ-এর 'পরিচয়'এ সংস্কৃতি-সংবাদ বিভাগে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে লেখা না দেখে একটু বিস্মিত। এই ব্যতিক্রম নিঃসন্দেহে পরিচয়-এর ঐতিহ্যের বিরোধী। অথচ ঐ মাসের 'নতুন সাহিত্য' তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন, যাই হোক আশা করি আগামী কোন সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে অবশ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এই সংখ্যায় বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে দুটি আলোচনা প্রকাশের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ; অনুরূপ ভাবে বার্নার্ড শ' সম্বন্ধে আলোচনা পেলে খুশি হব। গল্পের দিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না বলেই মনে হয়। আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে আর একটু অবহিত হওয়া প্রয়োজন। পুস্তক-পরিচয় বিভাগটি পূর্বের মত আশানুরূপ হচ্ছে না। আশা করি এদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

চিত্তরঞ্জন দাস

৩

প্রায় এক বছর ধরে দেখে আসছি যে পরিচয় সম্পূর্ণরূপে সাহিত্যিক পত্রিকায় পরিণত হয়েছে। প্রতি সংখ্যায় প্রবন্ধ যদিও বা থাকে, সেগুলি মুখ্যত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে। রাজনীতি, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি technical বা non-literary বিষয়ে যে প্রবন্ধগুলি রচিত ও প্রকাশিত হয় তাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এই স্বল্পসংখ্যক non-literary প্রবন্ধের মধ্যে অর্থনীতি বা মনস্তত্ত্ব বা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্পর্কে একটিও প্রবন্ধ ছিল না। রাজনীতির তত্ত্ব সম্পর্কেও কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। আমার মতে, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রতি ঔদাসীন্যই হয়েছে বর্তমানে 'পরিচয়ে'র প্রধান ত্রুটি।

যে সমস্ত বিষয়ে প্রবন্ধ বেরুলে 'পরিচয়' সর্বাঙ্গসুন্দর হত বলে মনে করি নিচে তার একটা তালিকা দিলাম। বলা বাহুল্য, তালিকাটি শেষ কথা নয়:

১) অর্থনীতি: ভারতের জনবাহুল্য সম্পর্কে প্রচারণার প্রতিবাদ; ভারতীয় পুঁজিপতির বাড়তি মূল্য শোষণের হার; ভারতে পুঁজিবাদের অগ্রগমন, মার্কিন অর্থনীতি, বৃটিশ ও ইওরোপীয় অর্থনীতি ইত্যাদি।

২) রাজনীতি; রাষ্ট্র, জনগণের রাষ্ট্র, চীনের নূতন রাষ্ট্র ইত্যাদি বিষয়; সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি, শাসনতন্ত্র ইত্যাদি।

৩) মনস্তত্ত্ব সম্পর্কেও প্রবন্ধাবলী, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্পর্কেও মাঝে মাঝে প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। অর্থনীতি সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমি অনুসন্ধিৎসু বলেই অর্থনীতিকে এই চিঠিতে প্রাধান্য দিয়েছি।

সলিল আচার্য

ভ্রম সংশোধন

"খবরের কাগজের রিপোর্ট" গল্পটির লেখকের নাম উমানাথ ভট্টাচার্যের স্থানে ভ্রমক্রমে "উমাকান্ত ভট্টাচার্য" মুদ্রিত হয়েছে। এই মুদ্রাকর-প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত। —সম্পাদক